বাংলা নাটকের ইতিহাস

অজিতকুমার ঘোষ

বাংলা নাটকের ইতিহাস

[পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ]

অজিতকুমার ঘোষ এম. এ., ডি ফিল , ডি. লিট
বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
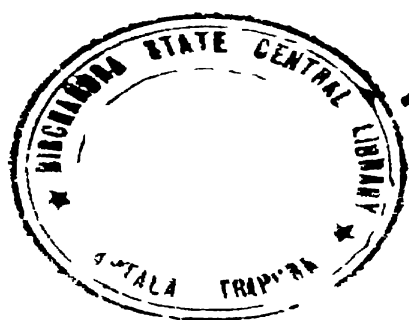
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা নাটকের ইতিহাসে'র পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পঞ্চম সংস্করণেব ২২০০ কপি বেশ কিছুদিন আগে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিল।, এজন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাব কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। এই সংস্করণে মীর মশাররফ হোসেন ও সাম্প্রতিক-কালের কয়েকজন নাট্যকাবের নাটক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। আধুনিকতম কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাটক ও নাট্যাভিনয়েব সমালোচনাও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাম্প্রতিক নাট্যআন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিয়া নাট্যআন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছি এবং নাট্যআঙ্গিক ও প্রয়োগরীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা লইয়া আলোচনা কবিয়াছি। এই কয়েক বৎসব ধবিয়া নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু বইয়েব কলেবব আতরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় সেই সব আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করি নাই। নাটক ও নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে আমার নানা ধরনের আলোচনা, বিশেষ করিয়া মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু ও দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে আমাব বিস্তাবিত সমালোচনা কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাবৃন্দ অন্যত্র পড়িতে পারেন।

বর্তমানে বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু জায়গায় নাট্যপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইসব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া নূতন নূতন নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং মঞ্চকলাকৌশল ও প্রয়োগরীতি লইয়াও অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। তবে একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে যত অনুশীলন ও নূতন নূতন ভাবনা চলিতেছে, পূর্ণাঙ্গ নাটক লইয়া তত হইতেছে না। সুখের বিষয়, নাটক প্রকাশে প্রকাশকদের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বর্তমানে নানা কারণে নাট্যআন্দোলনের বেগ কিছুটা মন্দীভূত। বিপুল অর্থও ব্যাপক প্রচারের হাতিয়ার লইয়া থিয়েটারী মঞ্চে যাত্রা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। তবে আমাদেব আশা, বিবর্তনশীল জীবনের যন্ত্রণা ও ভাবনার জীবন্ত প্রতিচ্ছবিরূপে রচিত ও অভিনীত নাটক সাংস্কৃতিক জগতে তার যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক আত্মীয় ও প্রিয়জনকে হারাইলাম। এক বৎসর আগে আমার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ

কবিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল নাট্যপথপবিক্রমায় আমার চিরসহযাত্রী সাধনকুমাব ভট্টাচার্য অকালে আকস্মিকভাবে আমাদিগকে ছাড়িয়া গিযাছেন। আবও কত প্রিয মুখ মনে আসিতেছে—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বথীন্দ্রনাথ রায়, বিভূতি চৌধুবী, বিভাস বায়চৌধুবী ইত্যাদি। বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে আজ শূন্যতা অনুভব কবিতেছি।

জেনাবেল প্রিণ্টার্স-এর প্রকাশক শ্রীসুবজিৎচন্দ্র দাস আলোচ্য সংস্করণের কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই-এব উচ্চমান বজায বাখিয়াছেন। বইযেব দামও এই আকাশস্পর্শী দুর্মূল্যতার বাজারে তিনি অকল্পনীযভাবে সস্তা কবিযাছেন। এজন্য তাহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত নিবেদক
অজিতকুমাব ঘোষ

জন্মাষ্টমী
১৭ই আগস্ট,
এ. ই. ৫১০, সল্ট লেক সিটি
কলিকাতা—৭০০০৬৪

সূচীপত্র

অবতরণিকা

প্রস্তাবনা

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

পরিশিষ্ট

অবতরণিকা

নাটকের উৎপত্তি

অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি। মানুষ অপরের কথা, ভাব ও ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাহা নকল করিতে ভালোবাসে। এই প্রবৃত্তি আদিম, অসভ্য মানুষ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। অসভ্য লোকেদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্ম হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারাও সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া তাহাদেব অনুকরণ-প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করিয়া তুলিত। নৃত্য মানুষেব ইতিহাসে সবাপেক্ষা প্রাচীনতম কলা। আদিম সমাজে নৃত্যের মধ্য দিয়া লোকে ধর্মভাব এবং হৃদয়ভাব প্রকাশ করিত,[১] সমস্ত প্রকার ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল।[২] সঙ্গীত, তাল এবং সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া এই নৃত্যের উদ্বোধনেই সাহায্য করিত। এই সঙ্গীতসম্বলিত ভাব-প্রকাশক নৃত্যই ক্রমে ক্রমে নাটকেব অভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তিও এই নৃত্য হইতে হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 'নৃৎ' ধাতু হইতে 'নাটক' এই কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নৃত্য হইতে ভারতীয় নাটকের জন্ম—এই মত ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতির সহিত কিথ সাহেবও পোষণ করিয়াছেন।[৩]

প্রাচীনকালে ধর্মসাধনা এবং কলাচর্চা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। ধর্ম-সাধনার বিচিত্র প্রকার ও উপায়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন কলার বিকাশ ঘটিত।

১। Dancing is the primitive expression alike of religion and of love—of religion from the earliest times we know of and of love from a period long anterior to the coming of man

The Art of Dancing—*Selected Essays* by Havelock Ellis, p. 180.

২। For all the solemn occasions of life, bridals and for funerals, for seed time and harvest, for war and for peace, for all these things there were dances. *Ibid* p. 131

৩। 'Hence the doctrine which has the approval of Oldenberg and which finds the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomimic character, combined with song, and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama.'

Sanskrit Drama, p. 26.

নাট্যকলার উদ্ভবও এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে হইয়াছিল। গ্রীসদেশে Dionysus দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের (Dithyramb song) প্রচলন ছিল তাহা হইতে ট্রাজেডির উৎপত্তি এবং ঐ দেবতার উৎসবে হাস্যপরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত (Phallic song) হইতে কমেডির সৃষ্টি। ভারতীয় নাটকের মূলও প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। কথিত আছে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। চতুর্বেদ হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি এই নূতন বেদ সৃষ্টি করেন।[১] ব্রহ্মা এই বেদ তাঁহার শিষ্য ভরত মুনিকে শিক্ষা দেন। ভরতের দ্বারা নাট্যবেদ জগতে প্রচারলাভ করে।

ভারতীয় নাটকের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৈদিক সময় হইতে আলোচনা করিতে হইবে। বেদের অনেক স্তোত্র কথোপকথনের আকারে রচিত। এই সব স্তোত্রই নৃত্যগীতের সহিত যুক্ত হইয়া নিয়মানুবদ্ধ নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছিল অনেকে ইহা অনুমান করেন।[২] বৈদিক যুগের পর রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের অনেক স্থলে নাটকের উল্লেখ দেখা যায়।[৩] ইহাতে ধারণা হয় তৎকালে নাটক ও নাটকের অভিনয় প্রচলিত ছিল। তবে রামায়ণ এবং মহাভারতের পরেই যে নাটকের যথার্থ এবং পূর্ণাবয়ব বিকাশ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক কিথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, রামায়ণ এবং মহাভারতের অংশবিশেষের আবৃত্তি হইতে ক্রমে ক্রমে নাটকের উদ্ভব হয়।[৪] পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের উপর মহাকাব্য দুইখানির প্রভাব যে বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাস,

---

১। 'In order to prepare this Natyaveda or Gandharva Veda (Gandharva or dharma, Gan or Song being its chief component), Brahma is said to have taken the elements of recitation from the Rig-Veda, four kinds of acting or the art of mimicry from the Yayurveda, songs from the Samaveda, and emotions, passions, and sentiments from the Atharvaveda'.

The Indian Stage by H. N. Das Gupta, p. 3.

২। 'These hymns were combined with the dances in the festivals of the gods, which soon assumed a more or less conventional form. Thus, from the union of dance and song, to which were afterwards added narrative recitation, and first sung then spoken dialogue, was gradually evolved the acted drama. ***Encylopaedia Britannica*** (Cambridge Edition).

৩। ***The Indian Stage***—পৃঃ ২৬-২৯ দ্রষ্টব্য।

৪। ....'There is abundant evidence of the strong influence on the development of the drama exercised by the recitation of the epics.'

ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকার রামায়ণের প্রতি তাঁহাদের ঋণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণের কুশ এবং লব হইতে নাটকের ভূমিকা বুঝাইতে কুশীলব এই কথাটির প্রচলন হইয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস

সংস্কৃত নাটকের সূচনা কবে হইয়াছিল তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। কিছুকাল পূর্বে ভাসের নাট্যাবলী আবিষ্কৃত হওয়ার পরে অনেকে তাঁহাকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নাট্যকার বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃ কিথ এবং উইণ্টারনিৎস প্রভৃতি বিশারদগণ কিন্তু ভাসকে অশ্বঘোষের পরবর্তী বলিয়াছেন। যাহা হউক খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী হইতে যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়াছিল এ-সম্বন্ধে মতানৈক্য কম। প্রথম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় বিকাশ চলিয়াছিল। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিরাজমান রহিয়াছে।[১]

সংস্কৃত নাটকের অসাধারণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও একথা মনে না করিয়া পারা যায় না যে, এই নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ও আবেদন অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জাতির ভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই যদি নাটকের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে এই নাট্যসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলা চলে না। দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ের সহিত ইহার কোনো সচল যোগাযোগ ছিল না।[২] সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বুদ্ধিজীবী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই হইয়াছিল। এই সব অধ্যাত্মনিমগ্নচিত্ত, বাস্তববিমুখ, জ্ঞানী-কুলর্ষভ ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট মত ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এই নাটকের গতি ও প্রকৃতি

১। ডাঃ কিথের মত উল্লেখযোগ্য—'The Sanskrit drama may legitimately be regarded as the highest product of Indian poetry and as summing up in itself the final conception of literary art achieved by the very self-conscious creators of Indian literature. *Sanskrit Drama*, p. 276.

২। 'The Indian drama cannot be described as national in the broadest and highest sense of the word : it is in short, the drama of a literary class, though as such it exhibits many of the noblest and most refined, as wall as of the most characteristic features of Hindu religion and civilization.' ***Encyclopaedia Britannica*** (Cambridge Edition).

নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল।[১] অন্য কোনো শ্রেণী ও বর্ণের প্রভাব ইহাতে আশ্রয়লাভ করিতে পারে নাই। নাটক প্রণয়নের পর ইহার অভিনয়ও মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির সম্মুখে হইত। গ্রীসদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে ত্রিশ হাজার দর্শক সমবেত হইয়া যেমন মানবজীবনের নিগূঢ় সমস্যাসকল দেখিতে পারিত, ভারতে গণসাধারণের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। ভারতের রঙ্গালয়ের কথা চিন্তা করিলে ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের এক অপরূপ তরঙ্গলীলা চোখের সম্মুখে খেলিতে থাকে। সুদৃশ্য, সুসজ্জিত গৃহে রত্ন-সিংহাসনে পরিপূর্ণ মর্যাদায় সভাপতি অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ, সভাসদ্‌গণ রাজন্যবর্গ এবং বিপ্রকুল চতুর্দিকে যথাযোগ্য স্থানে আসীন—সর্বত্র অটল গাম্ভীর্য রাজকীয় আভিজাত্যের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্য দেশের সর্বসাধারণের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না[২], থাকা সম্ভবও নহে। সুতরাং দেশের বৃহত্তম মানব সম্প্রদায় যে তাহাদের নাট্যরসভোগেচ্ছাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সংস্কৃত নাটক এত বেশী অলঙ্কারপূর্ণ ও কবিত্বসমৃদ্ধ হইবার কারণ—ইহা কতিপয় নির্বাচিত জ্ঞানী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যই লিখিত হইত, দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত সাধারণ লোকের কথা নাট্যকার চিন্তা করিতেন না।

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের প্রণয়ন এবং অভিনয় চলিয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের দ্বারা ভারত বিজিত হইলে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিলোপ ঘটে। অবশ্য পূর্ব হইতেই ইহার অবনতির সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের বিকাশ মুষ্টিমেয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার ভাষার সহিত লোকের কথ্য ভাষার পার্থক্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল বলিয়াই ইহার পুষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল।

১। The drama bears, therefore, essential trace of its connexion with the Brahmins. They were idealist in outlook, capable of large generalizations, but regardless of accuracy in detail, and to create a realistic drama was wholly incompatible with their temperament.'

Sanskrit Drama by Keith, p. 276.

২। ডাঃ কিথ বলিয়াছেন, শূদ্রদের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকিলেও, ইহারা সম্ভবত রাজ অনুগ্রহ-জীবী সামান্য শূদ্র সম্প্রদায় ছিল—'The rules regarding the play-house contemplate the presence of the Sudra, but that is a vague term and may apply to a very restricted class of royal hangers on.'

***Sanskrit Drama*, p. 379.**

. সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি এবং অভিনয় রাজাদেব অনুগ্রহ এবং আনুকূল্যে হইযা আসিয়াছিল। সেই রাজাদেব বিলোপেব সঙ্গে সঙ্গে নাটকেবও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। সমগ্র মুসলমান রাজত্বে নাটকেব পুনর্বিকাশ এবং বঙ্গালযের পুষ্টি হয নাই। মুসলমানগণ নাট্যকলা ও অভিনয-প্রথাব ঘোব বিবোধী। পৃথিবীর কোথাও তাহাবা নাটকেব উদ্ভাবন করিতে সাহায্য করে নাই।[১] শিক্ষা এবং আমোদেব এই শ্রেষ্ঠ উপাযটি তাঁহাদেব কাছে সম্পূর্ণ অপবিজ্ঞাত ছিল। মুসলমানদেব আগমনে বাংলা সাহিত্যেব অশেষ উপকাব সাধিত হইযাছিল সন্দেহ নাই।[২] তাহাবা বাংলা ভাষা চর্চায এবং বাংলা সাহিত্য প্রণয়নে অশেষ উৎসাহ দিযাছিল। কিন্তু তাহাবা নাটকেব বিবোধী ছিল বলিযাই তাহাদেব আমলে নাটকেব বিকাশ হয নাই কিন্তু নাট্যবস উপভোগ কবিবাব চিবন্তন ইচ্ছা মানুষেব মনে বাস কবিতেছে। যে কোনো উপায়েই হউক সে এই ইচ্ছাকে তৃপ্ত কবিবেই। নাট্যভাবতী বাজদববাব হইতে নির্বাসিত হইলেন বটে কিন্তু সাধাবণেব হৃদশতদলে তাঁহাব আসন লাভ হইল। তবে বাজকীয আনুকল্য না পাইলে বহু ব্যযসাধ্য নাট্যালয স্থাপিত হইতে পাবে না এব সমৃদ্ধ সুনিযমাবদ্ধ নাটকেবও উৎপত্তি সম্ভব নহে। সুতবাং দেশেব লোব বঙ্গশালা এবং নাটক পাইল না বটে, কিন্তু অন্য আব এক অতি সহজ ও সুলভ উপাযে তাহাবা নাট্যবস ভোগ কবিতে সক্ষম হইল। যাত্রাব প্রসাব এইভাবেই হইযাছে। সংস্কৃত নাটকেব মধ্যেও দেশেব সবসাধাবণ নিজেদেব যে প্রাণেব প্রতিধ্বনি শুনিতে পান নাই, এতদিন পবে সেই বাজ সম্মান-বঞ্চিত, ধূলামাটি-চর্চিত যাত্রাব মধ্যে তাহা শুনিতে পাইল। উন্মত্ত আগ্রহে তাহাবা ইহা ববণ কবিযা লইল।

যাত্রা

(ক) উৎপত্তি ও বিকাশ

যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিযা আসিতেছে। অতীতে কোনো দেবতাব লীলা উপলক্ষে লোকেবা এক জাযগা হইতে অন্য আব এক জাযগায় গমন কবিযা নাচ গানেব সঙ্গে সেই দেবতাব মা ্য প্রকাশ কবিত। ইহাই যাত্রা

১। Generally indeed we know of no Mahomedan nation that has accomplished anything in dramatic poetry, or even had any notion of it.'

Dramatic Art and Literature by Schlegel, p 34

২। 'আমাদেব বিশ্বাস মুসলমান কতৃক বঙ্গবিজযই বঙ্গভাষায এই সৌভাগ্যের কাবণ হইযা দাঁড়াইযাছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (ষষ্ঠ সং) পৃঃ ১৩৫।

নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং প্রথমতঃ, যাত্রা বলিতে উৎসব উপলক্ষে গমন এই ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল। কালক্রমে কোনো স্থানে গমন না করিয়া একই স্থানে বসিয়া দেবলীলা অভিনয় করা হইত। এইভাবে দেবযাত্রা অভিনেতব্য যাত্রারূপ লাভ করে।

দেবতার সম্মুখে নৃত্যগীতাদির প্রচলন বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের কালে যজ্ঞস্থলে আনন্দবিধানের জন্য গান, বংশদণ্ড হস্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। পৌরাণিক যুগে দেবতার স্নান-উৎসব-উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসবের প্রচলন হইল।[১] বৌদ্ধযুগে রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে বিভিন্ন সুসজ্জিত রথে বুদ্ধাদিমূর্তি স্থাপন করিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে সেই রথগুলি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। শোভাযাত্রার মধ্যে নৃত্যগীত ও ক্রীড়াকৌতুকাদি অনুষ্ঠিত হইত। বহুদূর হইতে অগণিত নরনারী এই রথযাত্রা উৎসব দেখিতে সমবেত হইত। বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন ক্রমে ক্রমে মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং বুদ্ধের বাম পার্শ্বে ধর্ম স্ত্রীবেশে উপবেশন করিলেন ও সঙ্ঘ পুরুষবেশে তাঁহার দক্ষিণ স্থান গ্রহণ করিলেন। এই ত্রিমূর্তিই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রায় পরিণত হইয়াছেন। বৌদ্ধরথযাত্রা জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের পর বঙ্গদেশে শৈব ও সূর্যপূজার প্রচার হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন সৌরোৎসব সর্বাপেক্ষা আদি উৎসব এবং এই উৎসব হইতে অন্যান্য উৎসবের উৎপত্তি হইয়াছে।[২] সূর্যদেবতা অতি প্রাচীন কালেই শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া যান।[৩] এই শিবঠাকুরের উৎসব বহুকাল ধরিয়া বিচিত্ররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, ইত্যাদি পুরাণে নৃত্যগীতাদিসহ শিবশক্তির

১। বৈদিক সমাজের যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান লইয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হয়, ক্রমে সেই অবভৃত স্নান ব্যাপার লইয়া রাজারা যথেষ্ট শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করিলেন। পল্লী সমাজে ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে।

আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত, পৃঃ ১৫৭।

২। 'বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম 'যাত্রা' হইয়াছে।'

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু, পৃঃ ৪১।

৩। ঐ, পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য।

উৎসবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'ফাল্গুনমাসে শিবের পুষ্পমহালয়া উপলক্ষে শোভাযাত্রা বিধি দেখা যায়।'[১] ধর্মসংহিতায় শিবের সম্মুখে নৃত্যগীত ও হাস্য-কৌতুকের বর্ণনা রহিয়াছে।[২]

শিবোৎসবের ধারা ও প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রাচীন গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাস-এর সঙ্গে আমাদের শিবঠাকুরের আশ্চর্য মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। শিব যে অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন তাহা পণ্ডিতদের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। কালক্রমে আর্যসমাজে তিনি যতই আর্যরূপ লাভ করুন না কেন লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার আদি অনার্যরূপ অবিকৃতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। শিবের ছড়া, শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে তাঁহার এই অনার্য গ্রাম্যরূপই পরিস্ফুট হইয়াছে।

শিবঠাকুর শস্যোৎপাদক কৃষক-দেবতা।[৩] গ্রামের কৃষক নবনারী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহাকেই বন্দনা জানাইত। গ্রীকদেবতা ডায়োনিসাসও এরূপ একজন গ্রাম্য শস্যদেবতা।[৪] শিবের ন্যায় ডায়োনিসাসও লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত হইতেন। শিব গঞ্জিকা ও সিদ্ধিসেবী, ডায়োনিসাসও আসবদেবতা। ডায়োনিসাস-এর শীতকালীন উৎসব হইতে কমেডি[৫], এবং বসন্তকালীন উৎসব হইতে ট্রাজেডির উৎপত্তি।[৬] শিবোৎসব হইতে ক্রমে নাটক ও যাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে।[৭]

১। আদ্যের গম্ভীরা, পৃ ১৮৭।

২। 'কেচিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্বাঃ প্রমাতরঃ।
কাশ্চিদ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥ ধর্মসংহিতা। ৫৫।

৩। একটি গম্ভীরা গানে কৃষক-শিবের কৃষিকর্ম চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে—
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস।

৪। 'As to the attributes of Dionysus, he was essentially in the original conception, a rural god the god of trees and fruits, and vegetable produce of various kinds.

The Tragic Drama of the Greeks by A. E. Haigh (Oxford), p. 5

৫। The winter festivals are associated with the birth of comedy.

Ibid, p. 13.

৬। The tragic drama on the other hand is to be traced back to the spring festivals of Dionysus, p. 13.

৭। 'আমাদের দেশে যে শিবোৎসব উপলক্ষেই নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়।'—বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৯।

শিবোৎসব বর্তমানে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে পরিণত হইয়াছে। গম্ভীরা উৎসবে নৃত্যগীত, শোভাযাত্রা ও সাজসজ্জাসহকারে নানা রঙতামাসা দেখান হইয়া থাকে। গম্ভীরা-মণ্ডপে ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ী নৃত্য ইত্যাদি কৌতুককর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার মুখা বা মুখোশ ব্যবহৃত হয়। হনুমান-মুখা অনুষ্ঠান গম্ভীরা-উৎসবের এক প্রধান আমোদ-অঙ্গ। নৃত্য-গীত ও হাস্যকৌতুকপূর্ণ এই গম্ভীরা-উৎসবের মধ্যে যাত্রার আদি উপাদান নিহিত রহিয়াছে, এই ধারণা অমূলক নহে।

মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান প্রভৃতির মধ্যে যাত্রার অঙ্কুর বিদ্যমান ছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে নৃত্য ও গীতোৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মপূজা উপলক্ষে গীতবাদ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানের বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে।[১] মঙ্গলচণ্ডীর পূজাতেও নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। চামর, মন্দিরা, খোল, তানপুরা লইয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। মূল গায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। মূল গায়েন ও দোহারগণ মন্দিরা লইয়া তালে তালে নাচিত এবং গান গাহিত।[২] মনসার ভাসানও খোল ও মন্দিরা লইয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়। এই ভাসান-গানের গায়কগণ বেহুলা-লখিন্দর-কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসরে নাচিয়া গাহিয়া থাকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ কৃষ্ণলীলার আদি নাট্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলির গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তীকালের যাত্রাগানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঝুমুর ও ধামালী গানেও লৌকিক নৃত্যগীতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।[৩] এই সব

১। ‘পুলকে প্রণাম খাটে পদ্য বাদ্য গীত নাচে
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী।’ —ঘনরামের ধর্মমঙ্গল।

২। আদ্যের গম্ভীরা, পৃঃ ৩০২

৩। একটি ঝুমুর গানের পরিচয় দেওয়া যাক। মানিনী রাধিকা কোপ করিয়া বলিতেছেন—
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কপট আমারে পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমারে
ধিক হে নিঠুর কালা।
শুনহে অশুচি। উচ্ছিষ্টেতে রুচি,
না করে ব্রজেন্দ্র বালা হে॥

প্রভাব যে যাত্রার উপর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাও অনুমান করা চলে। রামায়ণ-মহাভারত হইতে বিভিন্ন করুণ হাস্যমূলক ঘটনার অবলম্বন করিয়া লৌকিক গান ও অভিনয়ের ধারাও বহু প্রাচীনকাল হইতে বাঙালী জনগণের মানসক্ষেত্রকে রসপ্লাবিত করিয়া আসিয়াছে।

মঙ্গলগান ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পূর্বে পাঁচালী-ছন্দে গীত হইত। পাঁচালীর দুই অঙ্গ—গান ও ছড়া বা পয়ার।[১] গানের মুখটুকু ধ্রুব বা স্থিরপদ আর বাকিটুকু অন্তরা। ছড়া বা বর্ণনাময় অংশ গায়ক দ্রুত আবৃত্তি করিয়া যাইত। মূল গায়কের ডান হাতে মন্দিরা, বামহাতে চামর ও পায়ে নূপুর থাকিত। তাহার সহিত দোহার ও মৃদঙ্গবাদক থাকিত। প্রথমতঃ, পাঁচালীর মধ্যে একজন মূল গায়ক গান করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাঁচালীর প্রসার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানি হইতে লাগিল। এইভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটিতেছিল এবং কালক্রমে এই পাঁচালী হইতেই জনপ্রিয় যাত্রা গানের উদ্ভব হইল।[২] উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য পাঁচালীর জন্ম হইয়াছে। এই পাঁচালীর ধারা উদ্ভূত হইয়াছে কীর্তন গান হইতে।[৩]

যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ কি ভাবে হইয়াছে উপরে তাহার আলোচনা করা হইল। বাংলা যাত্রার আদি উপাদান কোথায় কোথায় নিহিত ছিল তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পূর্বে যে যাত্রার অভিনয় হইত তাহার

অনন্তপুর কৃষ্ণ অনুলাপ করিয়া বলিতেছেন —

তোমা বিনে বিধুমুখি ! চারিদিকে শূন্য দেখি

প্রাণ বিরহে জ্বালায় রে

ফুলশরে হানে হিয়া পরে মোরে জোর মদনায় রে ॥

ঝুমুর রসমঞ্জরী—ভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

১। পাঁচালীতে গান থাকে ও ছড়া বা পয়ার থাকে সংক্ষেপে এ কথাটা সাধারণ ভাষায় বলে খানিক তার রাগ-রাগিণী আর খানিক তার মুখজবানি।

— জয়দেব —অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

২। 'পাঁচালি' হইতেই যাত্রার উদ্ভব

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং)—ড° সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৫৯।

৩। 'পাঁচালীর সহিত কীর্তন গানের তফাৎ এইতেছে যে পাঁচালীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত, কখনো কখনো পাত্রপাত্রীর সাজও সাজিত এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিত।'

—ঐ, পৃঃ ৫৫৯

প্রমাণ আমবা "চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থে পাইযাছি। তবে এই যাত্রা কিরূপ ছিল তাহা ভালভাবে জানিবাব উপায নাই নাটকের অনুকরণে এই যাত্রাব উদ্ভব হইযাছিল এবং সম্ভবত কীর্তন ও কবিগানেব প্রচাবের ফলে ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

মহাপ্রভু-প্রচাবিত বৈষ্ণবধর্মেব অভ্যুত্থানেব পূর্বে আমাদেব দেশে যেমন শাক্তধর্ম প্রভাবশালী ছিল, তেমনি এই ধর্মেব মহিমাজ্ঞাপক শক্তিযাত্রাসমূহও দেশেব মধ্যে প্রচলিত ছিল।[১] মহাপ্রভুব সমযে বৈষ্ণবধর্মেব অভ্যুদযেব সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা দেশেব সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই কৃষ্ণযাত্রাসমূহ সর্বসাধাবণেব পাণবসেব সহিত যুক্ত হইযা দেশেব জাতীয অনুষ্ঠানেব রূপ লাভ কবে। গীতিমূলক, ভক্তিবসাত্মক বৈষ্ণব ধর্মেব দ্বাবা পুষ্ট হইযাছিল বলিযা যাত্রাব মধ্যে গান এবং ভক্তিবসেব আধিক্য পরিলক্ষিত। অবশ্য এই গান ও ভক্তিব আতিশয্য যাত্রাব নাটকীয উপাদান গডিযা উঠাব পক্ষে বিশেষ অন্তবায হইযাছিল বটে,[২] কিন্তু সঙ্গীতবসলিপ্সু ভক্তিভাবাপ্লুত জনগণ এই যাত্রাকে তাহাদেব মনোভাবেব পোষক বলিযা ববণ কবিযা লইল।

বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু স্বযং যাত্রাগানেব অনুষ্ঠান কবিতেন। 'চৈতন্য মঙ্গল' এবং 'চৈতন্য ভাগবত'-এ আছে যে চন্দ্রশেখবেব গৃহে তিনি সপাবিষদ কৃষ্ণলীলা অভিনয কবিযাছিলেন। 'চৈতন্য চবিতামৃত'-এ আছে যে তিনি শ্রীবাস আচার্যেব গৃহে একদিন কৃষ্ণলীলা প্রকট কবেন। নীলাচলে থাকিবাব সমযেও তিনি অহোবাত্র নৃত্যগীত অভিনযে বিভোব থাকিতেন। চৈতন্যদেবেব এইরূপ অভিনযলীলা দর্শনেই কিছু পববর্তী কালে যে বৈষ্ণব গোস্বামিগণ সংস্কৃত ভাষায নাটক বচনা কবিতে আবম্ভ কবেন এই

১। The ancient Jatras that were prevalent in Bengal were about the cult of Sakti worship and dealt mainly with the death of Sambhu Nisambhu, or of other Asuras

The Indian Stage (Vol 1) by H N Das Gupta P 112

২। The influence of Baisnabism, therefore was hardly favourable to the development of the inherent dramatic elements of the Jatra on the other hand it cherished its Musical peculiarities developed its melodramatic tendency and emphasised its religious predilections

Bengali Literature in the 19th Century by Dr S K, De, py 449 550

ধারণা অমূলক নহে।[১] রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদের নাটকসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যাপক অভিনয় ও প্রভাব কখনও দেখা যায় নাই। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের মূল্য বেশি নয়।

মহাপ্রভুর পরে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই যাত্রা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, সুদাম অধিকারী প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। তবে এই সব যাত্রাওয়ালাদের যাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বর্তমান নাই।

(খ) কালীয়দমন

কালীয়দমন যাত্রার[২] প্রবর্তন করেন শিশুরাম। জয়দেবের জন্মভূমি বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে শিশুরামের বাসস্থান ছিল। বাংলা সন ১১৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে শিশুরাম বিদ্যমান ছিলেন। শিশুরামের শিষ্য ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামবাটী গ্রামে পরমানন্দ বাস করিতেন। পরমানন্দ তাঁহার যাত্রায় ব্যাসদেবকে আমদানি করিয়া কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গবন্দনার পর কিছুক্ষণ ব্যাসদেবের রসিকতা চলিত। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, নারদমুনি অথবা কোনো গোপী আসিয়া তাঁহার সহিত যে আলাপ সুরু করিতেন তাহা হইতেই কোন পালার অভিনয় হইবে তাহা জানা যাইত। পরমানন্দের পর শ্রীদাম সুবলের যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। শ্রীদাম-সুবলের শিষ্য ছিলেন বদন। তিনি হাওড়ার নিকটবর্তী শালকিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমিক ভাববিভোর বদন কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে করিতে ভাবাশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেন। দান, মান ও মাথুর লইয়া বদনের যাত্রার পালা গঠিত হইয়াছিল। লোচন অধিকারী 'অক্রূর সংবাদ' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' ও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বদন ও লোচনের পর গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে সারা বাংলা দেশের

১। 'যদিও আমরা চৈতন্যের সমসাময়িক বা তদ্‌ভবনাত কোন নাটকের নিদর্শন পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে শ্রীচৈতন্যের প্রাণোন্মাদকর কৃষ্ণলীলা-গীতির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া বা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তৎপরবর্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা করিতে মনোযোগী হন।

যাত্রা— বিশ্বকোষ।

২। 'প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে কীর্তন, মঙ্গলগান ও ঝুমুর মিশাইয়া নাটকের অনুসরণে বর্তমান কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টি হয়।

কালীয়দমন যাত্রা ও নীলকণ্ঠ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫৯)

মধ্যে এক প্রবল উন্মাদনা আনয়ন করেন। গোবিন্দ-দূতী সাজিয়া স্বয়ং গানের আসরে দেখা দিতেন। তিনি 'নৌকাবিলাস' পালার প্রথম রচয়িতা। 'নৌকাবিলাস' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গোবিন্দ অধিকারীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাটোয়ানিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও শ্রীরামপুরবাসী রাধাকৃষ্ণ দাস যাত্রাগান রচনা করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দানখণ্ড-পালা যোগ করিয়া খুবই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন।[১] গোবিন্দের দলে শিক্ষালাভ করিয়া পরে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। নীলকণ্ঠের অপর দুই ভাই শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠও যাত্রাগান করিতেন। নীলকণ্ঠ কয়েকদিন ধরিয়া মান ও মাথুরলীলা গাহিতেন। 'কংসবধ,' 'চণ্ডালিনী উদ্ধার,' 'যযাতির যজ্ঞ' প্রভৃতি কয়েকটি পালাও তিনি রচনা করেন। তিনি ভক্তহৃদয় স্বভাবকবি ছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক আর দুইজন যাত্রা-রচয়িতার অসামান্য প্রভাব ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন—একজন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অপরজন মধুসূদন কান। কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গের অধিবাসী না হইলেও পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের উপর তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার 'রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্নবিলাস', 'বিচিত্র বিলাস' প্রভৃতি পালাগান পূর্ববঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভাবের বন্যায় প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছি। ভাববিহ্বলা, বিরহাতুরা রাধার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অশ্রুকরুণ বাঙালীর হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া আছে।

মধুসূদন কানের ঢপ-কীর্তন তৎকালীন জনচিত্তে বিশেষ রুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মাথুর', 'প্রভাস', প্রভৃতি পালা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'মাথুর' পালার একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

কোন্ গুণে আর কর হে গুন গুন
রে নির্গুণ অলি।
এগুণে যে বাড়ে আগুন,
আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি।
যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেই গুণী,
সদা মরি সে আগুনি,
আবার কি গুণগুণ শুনালি॥

১। নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৫৯ সালের শারদীয় যুগান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

মধুসূদন বিনে ভৃঙ্গ হতেছে বিহ্বল,
মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল,
তবে কেন মধুকর, বৃথা মধু মধু কর,
যাওনা কেন মধুপুর সেখানে মধু সকলি ॥
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
যে ছিল অতি নির্গুণ বেড়েছে তার গুণ,
আমরা সব হয়েছি নির্গুণ
কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ—আগুন,
সূদন কয় জুড়াবে আগুন যদি এসেন বনমালী ॥

কৃষ্ণযাত্রা তৎকালে অধিক প্রচলিত হইলেও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসান-যাত্রা প্রভৃতিও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামজীবন-পুরবাসী আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর 'রামযাত্রা' ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের 'চণ্ডীযাত্রা' এবং লাউসেন বড়ালের 'মনসার ভাসান' এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তখনকার যাত্রার মধ্যে বেশভূষার কোনো নিখুঁত পরিপাট্য ছিল না। 'সাজের মধ্যে কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া এবং যশোমতী বৃন্দাদি সখী ও গোপবালকগণের পরিধেয় একটী রঙ্গিন কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকাংশে চোগার মত), তাহার সম্মুখের দুই পার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসান থাকিত।[১] বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খোল, করতাল ও বেহালা ব্যবহৃত হইত। অভিনয়ের সময় সর্বত্রই একটা সুর থাকিত।

(গ) সখের দল

কালিয়াদমন যাত্রার পরে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সখের যাত্রা-দলের প্রচলন হইল। এই নূতন যাত্রার মধ্যে ক্রমে ক্রমে নাটকীয় উপাদান প্রবেশ করিতে লাগিল। দেবকাহিনী বর্জন করিয়া মানবকাহিনী অবলম্বনের দিকে এই যাত্রার প্রবণতা দেখা দিল। মানবীয় কাহিনীর মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে সবাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খেমটা নাচ প্রবর্তিত হয়। বিদ্যা, মালিনী, রাধা, সীতা, রাম, কৃষ্ণ, কেহই নাচের আসরে বাদ পড়িতেন না। অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত সঙ্গীত ও হাবভাব এই যাত্রাগানের অঙ্গ ছিল।

বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর দল গঠন করেন।

১। বিশ্বকোষ

ঠাকুবদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্প্রদায়ের ঢুলী রামধন মিস্ত্রী নূতন দল গঠন করেন। ইহার পর প্যারীমোহনের বেলতলার দল প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই দল প্রথমে 'নলদময়ন্তী' ও পরে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করে।

প্যারীমোহনের যাত্রার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকেই বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে উদযোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যামবাজারেব নবীনচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। নবীনচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের বহু দৃশ্য চিত্রায়িত কবিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। নাটকীয় দৃশ্যের অনুকূল আবহশব্দ সৃষ্টি করিয়া তিনি অভিনয়ে বাস্তবতা আনিয়াছিলেন। তিনিই সবপ্রথম রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয়-ধারার প্রবর্তন করেন।

হহাব পব গোপাল উডের বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের নাম কবিতে হয়। গোপাল প্রথমে সখেব দল আবম্ভ কবিলেও শেষকালে তাঁহার দল পেশাদারী হইয়া উঠে। কাশীনাথ নামক একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ও নর্তক গোপালেব দলে ছিল। সমসাময়িক চুটকী রসের খরিদ্দারদের কাছে গোপালের গানেব কাটতি ছিল অজস্র।

গোপালেব শিষ্য কৈলাসচন্দ্র বারুইয়ের যাত্রাদলও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কবে। তৎকালে কবিদের হাতে স্বভাববর্ণনা কিরূপ হাল্কা ও হাস্যকর হইযা উঠিত তাহার একটা দৃষ্টান্ত কৈলাসের রচনা হইতে দেওয়া যাইতেছে—

'গা তোলরে নিশা অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপিশাক,
গাধাব পিঠে কাপড দিয়ে রজক যায বাগান।'

এইসব প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছাড়া আরও বহুতর খ্যাত ও অখ্যাত যাত্রাওয়ালা বিদ্যাসুন্দব পালার অভিনয় করিতেন। তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ পেশাদারী দলও গঠন করিয়াছিলেন। যাত্রার পববর্তী পর্বেব নাম অপেবা বা গীতাভিনয। সেই পর্বের ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

(ঘ) যাত্রার বিকৃতি

ভারতচন্দ্রের পবে আমাদের সাহিত্যের ধারা বিকৃত এবং নিম্ন রুচিব খাতে বহিতে লাগিল। মুসলমান রাজত্বেব অবসান হইয়াছে, ইংরাজ শাসনও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং লোকের মনে শৈথিল্য এবং অনাস্থা বাস করিতেছে। এই রকম অবস্থার মধ্যে কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং ভারতচন্দ্রের পরে সেই কারণেই বহুদিন পর্যন্ত কোন শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হয় নাই। অথচ দেশের লোকের রসপিপাসা বর্তমান, তাহাই মিটাইবার জন্য এই সময়ে কবি, পাঁচালী, তর্জা, হাফ আখড়াই এবং যাত্রা প্রভৃতি গানের ব্যাপক চর্চা হইতে লাগিল। এই সব গানের রচয়িতারা ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুর কবিত্বশক্তি, এবং রচনানৈপুণ্য তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গুরুর অশ্লীলতা অবাধ এবং অপরিমিত প্রশ্রয় পাইয়া তাহাদের সাহিত্যের হাট জমাইয়া রাখিল। নিম্ন-রুচিগ্রস্ত দর্শকবৃন্দও এই বিকৃত রস প্রবাহে মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রুচি এবং শালীনতার লেশটুকু পর্যন্ত তাহারা নির্বিকার চিত্তে নির্বাসন দিয়াছিল। তখনকার যাত্রাও সাহিত্যের এই সর্বাঙ্গীন বিকৃতি অশ্লীলতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিল। শিথিল কাহিনী অবলম্বন করিয়া দুর্বল অভিনয়ের মধ্য দিয়া যাত্রাওয়ালারা লোকের ইতর প্রবৃত্তির বিকৃত পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া চলিল। কিন্তু ইহা নিঃশেষের পূর্বলক্ষণ। দেশের লোক চিরকাল এই ধরনের অস্বাভাবিক রস গ্রহণ করে না। ইংরাজ-প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও রুচির সংস্পর্শে আসিয়া দেশের লোকের চাহিদা ও রসবোধ ক্রমে ক্রমে বদলাইতে লাগিল। মার্জিত এবং উন্নত আমোদ উপভোগের ইচ্ছা তাহাদের মনে জন্মিতে লাগিল। থিয়েটার এবং নাটকের মধ্যে সেই ইচ্ছা চরিতার্থ হইল। সেই ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করিব।

(ঙ) অপেরা বা গীতাভিনয়

রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এবং নাটকের অভিনয় সুরু হইবার পরে যাত্রার জনপ্রিয়তা কমিয়া গেল, অথচ একেবারে লুপ্ত হইল না। নাট্যশালা স্থাপন বহু আয়াস এবং ব্যয়সাধ্য ছিল, সকলের দ্বারা এবং সর্বত্র ইহা সম্ভব ছিল না। তখন রঙ্গমঞ্চে-অভিনীত নাটকের অনুকরণে এক নূতন ধরনের যাত্রার উদ্ভব হইল। এই যাত্রার মধ্যে সুসমঞ্জস কাহিনী, এবং নাটকের ন্যায় অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগ সবই ছিল। তবে ইহা প্রকাশ্যস্থানে দৃশ্যপট বিরহিত হইয়া অভিনীত হইত, এবং ইহাতে সঙ্গীতের আধিক্য লক্ষ্য করা যাইত। এই নূতন প্রকৃতি-বিশিষ্ট যাত্রা অপেরা বা গীতাভিনয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।[১] বর্তমানেও এই জাতীয় যাত্রার অভিনয়ই দেশের মধ্যে হইয়া থাকে।

১। ইংরেজী stage বা রঙ্গমঞ্চের অভিনবতা বাঙ্গালা নাটকে জনপ্রিয়তার প্রথম এবং প্রধান হেতু। অথচ রঙ্গমঞ্চ খাড়া করিতে যে পরিমাণ অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োজন তাহা সর্বত্র সব সময় সুলভ ছিল না। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্যই নূতন পদ্ধতির যাত্রার সৃষ্টি হইল, এই যাত্রাগান নাটক

(চ) যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

বহুকাল পূর্বে যাত্রার প্রচলন হইয়াছিল, অথচ এখন পর্যন্তও ইহা একেবারে লুপ্ত হইল না। নানা সময়ে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া ইহা এখনো টিঁকিয়া রহিয়াছে, অথচ ইহার দুই আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বী—আভিজাত্য গর্বিত থিয়েটার এবং যন্ত্রচালিত সিনেমা ইহা অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী। ইহাতে মনে হয় আমাদের দেশের সত্যকার-জাতীয় আনন্দ বিতরণ করিতে পারিয়াছে যাত্রা, থিয়েটার নয় সিনেমাও নয়। মুষ্টিমেয় শহরবাসীর কথা বলিতেছি না, দেশের যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে অগণিত নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমজীবীদের দ্বারা—তাহারা আজও পর্যন্ত তাহাদের প্রাণরসের সন্ধান পাইতেছে এই যাত্রার মধ্যে। আজও দেখিতে পাই, কোনো উৎসব বা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে তীর্থযাত্রীর আগ্রহ লইয়া দূর-দূরান্তর হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া জড় হইতেছে। বাধাবিঘ্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুতেই তাহাদের উৎসাহ দমিত হইতেছে না। স্বল্পালোকিত বিস্তীর্ণ মাঠ বা ময়দানে অনাবৃত আকাশতলে সহস্র সহস্র দর্শক প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্তে অবিচলিত ধৈর্যে অভিনয় দেখিয়া যাইতেছে। অভিনেতাদের মধ্যে অধিকাংশ তাহাদেরই মত নিরক্ষর—তাহাদের উচ্চারণ অশুদ্ধ, কণ্ঠস্বর কৃত্রিম, অঙ্গভঙ্গি হাস্যকর, সাজসজ্জা অসঙ্গত—অথচ দর্শকদের বিন্দুমাত্র অভিযোগ কিংবা নালিশ নাই। গায়কদের বিকৃত সুরের ডুয়েট গান শুনিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে, এবং অভিনেতা করুণ রসের স্থলে গলা ফাটাইয়া রৌদ্ররসাত্মক অভিনয় করিলে তাহারা করতালির দ্বারা সম্বর্ধনা জানায়। এইরূপ অনবদ্য অভিনয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা দেখিয়া যায়। এতটুকু ক্লান্তি, এতটুকু বিরক্তি নাই। শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী সমাজ এই সব যাত্রাওয়ালা এবং দর্শকদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু যাহার সহিত এত অধিক সংখ্যক লোকের অন্তরের যোগাযোগ রহিয়াছে তাহার মূল্য ও প্রভাব একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যাত্রা আমাদের দেশের এত জনপ্রিয় ইহার কারণ, ইহাতে কোনো বিশেষ ধর্মভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া দেখানো হয়। আমাদের দেশের

অভিনয়-পদ্ধতিরই অনুরূপ, কেবল রঙ্গমঞ্চ নাই এবং সঙ্গীতের বাহুল্য আছে। দৃশ্যপট প্রভৃতির অভাবের ক্ষতিপূরণ হইত দীর্ঘ স্বগত অথবা প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ায় নূতন যাত্রা-পদ্ধতির—গীতাভিনয়ের প্রবর্তন হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডক্টর সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৭।

সাধারণ লোক ধর্মপ্রাণ। ভক্তিরসাত্মক উপাখ্যান অপেক্ষা তাহাদের কাছে প্রিয়তর আর কিছুই নাই। সেজন্য যাত্রা তাহাদের মর্মস্থানে আবেদন জানাইয়াছে। নাটকে কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়া তোলা হয়, কিন্তু যাত্রার পাত্রপাত্রীদের পরিণতি নিজেদের চিন্তা এবং কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেখানে সব কিছুই অলৌকিক দেবলীলার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য যাত্রায় কোনো চরিত্র-প্রাধান্য কিংবা ঘটনার স্বাধীন গতি লক্ষ্য করা যায় না। সঙ্গীতের অপরিমিত আতিশয্য যাত্রার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের সুরে ভাববিহ্বল চিত্ত অধিকতর তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেজন্য ইহাতে সঙ্গীতের এত প্রাধান্য। প্রত্যেক যাত্রার মধ্যে একটি চরিত্র অবধারিতরূপে থাকিবে, সে বিবেক। এই বিবেকের কাজ গ্রীক নাটকের কোরাসের অনুরূপ।[১] কোরাসের ন্যায় সে কাহিনীর সহিত যুক্ত না থাকিয়াও অভিনয়ে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। সে পাত্রপাত্রীর ভিতরকার মনের সন্ধান রাখে কোনো চরিত্র মনের মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা সঙ্কল্প করিলে সে তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া দেয়। দর্শকদের সহানুভূতির সহিত তাহার সচল যোগ বিদ্যমান। থিয়েটারের তুলনায় যাত্রায় রস ফুটাইয়া তোলার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে কোনো পশ্চাদ্বর্তী দৃশ্যপট এবং পার্শ্ববর্তী আচ্ছাদন নাই। থিয়েটারের মধ্যে আকস্মিক আগমন এবং নিষ্ক্রমণের যে সুযোগ আছে, এবং যেভাবে অভিনেতা নিজেকে যখন ইচ্ছা প্রকাশিত অথবা গুপ্ত করিতে পারে তাহাতে দর্শকদের মনে সহজেই বিভ্রম (illusion) জন্মিয়া যায়। কিন্তু যাত্রায় চতুর্দিক অনাবৃত ও উন্মুক্ত। সেখানে অভিনেতা যেন দর্শকদেরই মধ্যস্থ একজন। কখন যে তাহাদের মধ্য হইতে কে উঠিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অধুনা বাংলা দেশে যাত্রা অভিনয়ের সময় পাত্র-পাত্রীগণ সাজঘর হইতে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করে, কিন্তু প্রাচীনকালে

১। গ্রীক কোরাস সম্বন্ধে W. M. Dixon তাহার গ্রন্থ '*Tragedy*'তে বলিয়াছেন—
'This band of singers who employed an archaic dialect, who were remotely connected with the persons on the stage were neither sharers in the action nor yet spectators only, witnesses who were present at the most private interviews, knew all and might have interfered at the most critical moments, yet did not, observers who embroidered the text of the action with a running commentary or interrupted it by lyrical outbursts.' p. 53.

তাহারা সকলে সর্বক্ষণ আসরে বসিয়া থাকিত, এবং যখন যাহার অভিনয় করিয়া যাইত। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এই প্রথা এখনো বর্তমান রহিয়াছে।[১]

আমাদের দেশের যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশের সহিত ইংরাজী নাটকের ইতিহাসের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার ন্যায় ইংরাজী নাটকও ধর্মভাবকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লইয়াছিল। এই ধর্মমূলক নাটক Mystery এবং Miracle নামে খ্যাত।[২] শাস্ত্রে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে Mystery এবং মহাপুরুষদের জীবন অবলম্বনে Miracle রচিত হইত। প্রথম এই নাটকগুলি গীর্জায় এবং পরে বাজারে অভিনীত হইত। কিছুকাল পরে এই সব নাটক Morality এবং Interlude নামক নাটকে পরিণতি লাভ করে। অবশেষে Tragedy এবং Comedy-র উদ্ভব হয়। Mystery এবং Miracle যেমন ক্রমে ক্রমে খাঁটি নাটক Tragedy ও Comedy-তে রূপান্তরিত হইয়াছিল, আমাদের যাত্রা সেইভাবে পূর্ণাঙ্গ নাটকে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই কেন সেই প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থিত হয়। ইহার উত্তর ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁহার Bengali Literature in the 19th Century নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে দিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যাত্রার মধ্যে দর্শকবৃন্দ কোনো মানবীয় সমস্যার অবতারণা দেখিতে চাহিত না, ইহাতে তাহাদের ধর্মবোধ উদ্বোধিত হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইত। সেজন্য যাত্রায় কখনো কোনো নাটকীয় ক্রিয়া (action) এবং সুসমঞ্জস কাহিনী সৃজন করিতে কেহই মনোযোগী হয় নাই, সঙ্গীতকেই ইহার প্রধান অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মমোহ এবং শাস্ত্রানুগতা হইতে মুক্ত হইয়া জগৎ এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে না পারিলে সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ ঘটিতে পারে না।[৩] আমাদের দেশের লোকেরা তাহা পারে নাই বলিয়া বস্তুনিষ্ঠ নাটক জন্মে নাই। পাশ্চাত্য, ভাবধারার

১। 'যাত্রা'—বিশ্বকোষ

২। 'Mystery is applied to the stories taken from the scripture narrative, while Miracles are plays dealing with incidents in the lives of Saints and Martyrs' *History of English Literature* by A Compton-Rickett p.60

৩। 'The prevalence of the rigoristic (sannyas) ideal and the natural prominence given to Sattvik over the Rajasik qualities fostered an indifference to mundane activities and an absorption in supermundane affairs which materially hampered free expansion of art science and literature of the nation.

Bengali Literature in the 19th Century by Dr. S. K. De, p. 446

সংস্পর্শে আমাদের চিরদিনকার আদর্শ ও সংস্কার বদলাইয়া গেল এবং তখনি প্রথম বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাত হইল। মাত্র তখন হইতেই নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। এই সময়কার ইতিহাসই বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস

সহস্র বৎসর পূর্বে নাট্যশালার যে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল তাহাই পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া নাট্যভারতীর মুখশ্রী অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হইয়াছিল, নব আলোকস্পর্শে সেই অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িল। সেদিন দেশী ও বিদেশী নাট্যামোদী যাঁহারাই নাট্যশালার এই প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহারা চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বিকৃত যাত্রারসের নিস্তরঙ্গ স্রোতে যে-জাতি এতদিন গা ঢালিয়া দিয়াছিল, নাট্যশালার নবোচ্ছ্বসিত রসধারা তাহাদিগকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই রসধারা বিদেশী মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবোন্মত্ত বাঙালী সেদিন সহজেই ইহাকে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া লইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা হইয়াছিল, তবে যিনি সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন তিনি হইলেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশদেশবাসী বিদেশী। তিনি Bengally Theatre নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে অভিনয়ের উদ্দেশে তাঁহার ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা Disguise ও Love is the Best Doctor নামক দুইখানি ইংরাজী প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করাইলেন। প্রহসন দুইখানির মধ্যে বাঙালী দর্শকের রুচি অনুযায়ী অনেক দৃশ্য ও চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল।[১] Disguise-এর বাংলা অনুবাদ

---

১ লেবেডেফ তাহার 'A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

'I translated two English dramatic pieces, namely—'The Disguise' and 'Love is the Best Doctor' into the Bengali language, and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays and which were most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokeydars, savoyards, canera ; thieves, ghoonia, lawyers, gumosta and amongst the rest a corps of petty plunderers.'

অভিনীত হইয়াছিল।[১] সম্ভবত ইহাই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক (১৭৯৫—২৭শে নভেম্বর)।

বিদেশাগত ইংরাজদেব দ্বাবা কয়েকটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন কবিয়াছিল সাঁসুসি রঙ্গালয়। অবশ্য তাহার পূর্বেও ক্যালকাটা থিয়েটার ও চৌরঙ্গী থিযেটার স্থাপিত হইয়াছিল। তবে এই সব রঙ্গালয়ে সাধারণ বাঙালী দর্শকেব যাতায়াত ছিল না। সাঁসুসি রঙ্গালয়ে হোরেস হেমান উইলসন প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ইংবাজ অভিনয় করিতেন। ইহার অনেক পরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করিয়া যেসব অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল অনেক ইংবাজ সেগুলিব পরিচালনা ও শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। ডেভিড হেয়ার একাডেমিতে অভিনীত 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে অভিনীত 'ওথেলো' নাটকেব অভিনয় এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ওরিয়েন্টাল থিযেটাবে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'চতুর্থ-হেনরী'ব অভিনয় হইয়াছিল। এই সব নাট্যাভিনয় ইংবাজী-শিক্ষিত লোকেদেব প্রশংসা উদ্রেক করিল, নাট্যশালার প্রতি নাট্যামোদী লোকদেব আগ্রহ উদ্দীপিত কবিল, কিন্তু আপামব জনসাধারণেব মনে পবিতৃপ্তি সঞ্চাব কবিতে পাবিল না। ইংবাজী নাটকের ভাষা তাহাদের বসসম্ভোগে প্রধান বাধা হইয়া বহিল। বাঙালী কবে বাংলা নাটকেব অভিনয় দ্বাবা দেশেব হৃদয মাতাইয়া তুলিবে জনসাধাবণ তাহাব দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া ছিল।

নাট্যশালা স্থাপনেব চেষ্টা শুধু কেবল ইংবাজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বহিল না, নাট্যপ্রিয় ধনশালী বাঙালীও এবিষযে উদ্‌যোগী হইয়া উঠিলেন। প্রসন্নকুমাব ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটাবই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ইহাতে 'জুলিয়াস সিজর' ও উইলসন-অনূদিত 'উত্তরবামচবিত'-এব অভিনয় হয়। বাঙালী-পরিচালিত নাট্যশালায় প্রথম যে বাংলা নাটকের অভিনয হয় তাহাব নাম হইল 'বিদ্যাসুন্দর'। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় নাটকখানি অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য, যে, নাটকেব স্ত্রীভূমিকায় বালিকারাই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর নন্দকুমার রায় রচিত, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতে হয়। আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর বাড়িতে ইহার অভিনয় হয়। বাংলা নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হইতে

১। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ [illegible]

লাগিল এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নাট্যশালা স্থাপনায় সচেষ্ট হইলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহাদের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বাংলা নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিনায় নাট্যকারগণ আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইতে বাংলা নাটকের জন্মলাভের ইহাই হইল অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জন্ম-সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রকৃত জন্ম হইয়াছিল বহু পরে। লেবেডেফ ও নবীনচন্দ্র বসু ব্যতীত প্রথম দিকে কেহই বাংলা নাটকের অভিনয় দেখাইতে সাহস করেন নাই। বিদেশাগত নাট্যশালা বিদেশী নাটকেরই অভিনয়-স্থল হইয়া ছিল বহুকাল পর্যন্ত। এই সব নাটকের অভিনয় বাঙালী জনগণের নাট্য-তৃষ্ণা উদ্দীপিত করিল মাত্র, পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। অথচ যাত্রা, হাফ-আখড়াই, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারাও সেই তৃষ্ণা আর নিবারিত হইতে পারে না, কারণ ঐ সব নাট্যগীতের রসবিকৃতির জন্য উহাদের প্রতি একটি ঘৃণা ব্যাপক আকারে সমাজমনের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। সুতরাং নাটক চাই এবং সে নাটক বাংলা হওয়া দরকার। জনচিত্তের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাংলা নাটকের এক প্রবল প্রেরণা আনিয়া দিল এবং তাহারই ফলে বাংলা নাটকের আত্মপ্রকাশে আর বিলম্ব রহিল না।[১] অবশ্য বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্যায়ে তাহার আত্মনির্ভরশীল রূপ আমরা দেখি না, এবং তাহা দেখিতে প্রত্যাশাও করি না। সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মবিশ্বাস আসিয়াছিল এবং যেদিন সে স্বাধীনভাবে চলিতে সুরু করিল সেদিন হইতে তাহার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল।

১। 'In the absence of original Bengali plays they proceeded influenced as they were by the charm of the English performances, to meet their want by enacting plays in English. But it hardly satisfied the dramatic appetite' of the general public for it was all Greek to them. They had already imbibed an inordinate taste for the theatrical amusements and naturally looked forward to being entertained by appropriate plays written in their own language.'

The Bengali Theatre—S. P. Mookerjee, Calcutta Review (1924).

প্রস্তাবনা

মধুস্থদনের পূর্বে বাংলা নাটকের যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় নাই। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল, সেগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের আভাস বলাই সঙ্গত। সেই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম প্রসিদ্ধ। অবশ্য ইহাদের নাটক কোনো অভিনব মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে না। সংস্কৃত সূতিকাগৃহের চিহ্ন ইহাদের অঙ্গে স্থপরিস্ফুট। ইহারা ভোরের আকাশের ক্ষণস্থায়ী রক্তিমচ্ছটা মাত্র! সূর্যোদয়ের পর হইতেই ইহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য নাট্যধারার প্রস্তাবনায় ইহাদের একমাত্র স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

অনুবাদ-যুগ

(হরচন্দ্র—কালীপ্রসন্ন—রামনারায়ণ)

অনুবাদক নাট্যকারদের দ্বারাই বাংলা নাটকের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাটকেরই অনুবাদ হইয়াছিল বটে কিন্তু অনুবাদ-যুগে ইংরাজী নাটকের কোনো লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকের উপর পতিত হয় নাই, ইংরাজী নাটক হইতে অনূদিত নাটকের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনূদিত বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। শুধু কেবল ভাষা নহে, আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়াও নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্য-ধারাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ হইত এবং স্থানে স্থানে তাঁহারা যে দুই একটি স্বকপোলকল্পিত চরিত্র ও ঘটনা ঢুকাইয়া দিতেন না তাহাও নহে। অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন।

হরচন্দ্র ঘোষ

অনুবাদকের মধ্যে প্রথমেই হরচন্দ্র ঘোষের নাম করা উচিত। হরচন্দ্রের প্রায় সব নাটকই কোনো না কোন গ্রন্থের অনুবাদ। স্থতরাং কাহিনীর দিক

দিয়া মৌলিকতা দাবি করিবার তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার নাটকের ভাষা সংস্কৃত শব্দে আড়ষ্ট এবং নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি সংস্কৃত রীতিও ইহাতে আছে। দৃশ্যের স্থলে তিনি অঙ্গ এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২) শেক্‌সপীয়রের 'Merchant of Venice' নাটকের ভাবানুবাদ। নাটকের মধ্যে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি দুই একটি নূতন চরিত্র আমদানি করিয়াছেন, এবং মূল নাটকের কোনো কোনো চরিত্রকে একটু নূতন ভাবে দেখাইয়াছেন।

'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক। নাটকখানির ইংরাজী মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ যত্নের সহিত ইহার বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি কোনো শ্রমের ত্রুটী করেন নাই।[১] তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, 'কৌরব বিয়োগ'-এর ন্যায় অনাটকীয় নাটক বাংলা সাহিত্যে আর একখানিও আছে কিনা সন্দেহ। নাট্যকার বলিয়াছেন যে, ইংরাজী নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে তিনি তাঁহার নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।[২] কিন্তু একমাত্র পঞ্চাঙ্ক বিভাগ ব্যতীত ইংরাজী নাটকের কোনো রীতিই ইহার মধ্যে নাই। সংলাপের স্বাভাবিকতা, গতিবেগ, ক্রিয়া-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুই ইহাতে নাই। একান্ত দুরূহ সংস্কৃত বাক্যের বিষম ভাবে ইহার সংলাপ নিষ্প্রাণ আড়ষ্টতায় আবদ্ধ। সংলাপ সম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক, মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি মহাভারতের বাংলা গদ্য অনুবাদ শুনিতেছি। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় প্রভৃতি যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবতনয়ের হত্যায় পাণ্ডবগণের বিলাপ

১। It now remains for me to add that the subject upon which I have written is of great interest and the change which has been carefully introduced in it being altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the country, and no pains and expense having been spared to render the work useful and acceptable I indulge in the hope that it will meet with the approbation of the reader

—Preface.

২। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ অর্থাৎ রাজা দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু ভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া 'কৌরব বিয়োগ নাটক' এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম।

—ভূমিকা।

এবং কৌরবগণের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কৌরব বধূদের খেদই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও নাট্যকৌশলের দুর্বলতায় দুঃখশোকের অত্যধিক আতিশয্যও মর্ম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। চরিত্রাঙ্কনে লেখকের অক্ষমতার জন্য কোনো চরিত্রই সজীব রসমূর্তি লাভ করিতে পারে নাই।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকের নাম 'চারুমুখ-চিত্তহরা' (১৮৬৪)। ইহা Romeo and Juliet-এর অনুবাদ। এই নাটকখানাও তিনি দেশীয় লোকের রুচি অনুযায়ী মূল হইতে কিছু কিছু অদল বদল করিয়াছিলেন, এবং নাটকের সংযোগস্থল ভারতবর্ষে দেখাইয়াছেন। বঙ্গমঞ্চে অভিনয়েব উপযোগী করিবার জন্য তিনি ইহাতে কথ্যভাষা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার সর্বশেস নাটক 'রজত গিবি নন্দিনী' (১৮৭৪) ব্রহ্মদেশের এক উপাখ্যান অবলম্বন কবিয়া প্রণয়ন কনেন। নাটক হিসাবে ইহাব কোনো উৎকর্ষ নাই।

হরচন্দ্রের কোনো নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। কোনো নাট্যমঞ্চেব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তাঁহাব ছিল না। সুতরাং তাঁহার নাট্যাবলীও দেশের মধ্যে কোনো সাড়া ও প্রভাব আনিতে পাবে নাই।[১] বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহাব মূল্য বেশী নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বাঙালী জাতিব মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাদেব মধ্যে অন্যতম। বস্তুত একাধারে এরকম সর্বগুণান্বিত লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সে অনন্যসাধাবণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব সাহিত্য-প্রতিভা, অতুলনীয় বদান্যতা এবং অশেষ সহৃদয়তাগুণে তিনি সকলেব প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি হয়তো খুব উৎকৃষ্ট মৌলিক নাটক রচনা করেন নাই, কিন্তু তবুও নাটকের ইতিহাসে তাঁহার সম্মানিত স্থান আছে। কারণ, রঙ্গালয় স্থাপন এবং বাংলা নাটকের অভিনয়ে এবং উৎসাহদানে তিনি ভবিষ্য নাট্যকারদের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।[২]

১। 'As there is no evidence of his works having ever been staged, he could have no practical influence on the theatre of the country except in the sense of having created a taste among the readers of his works'.

Western Influence in Bengali Literature by P. R. Sen, P. 225.

২। 'যে নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণে লোকশিক্ষা বিস্তৃত কবা যায, যে নাটকের অভিনয়

কালীপ্রসন্নের প্রথম নাট্যরচনা 'বাবু' নামক একখানি প্রহসন। ইহা কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। বামনারায়ণ 'বেণীসংহার' অনুবাদ করিবার পর তিনিও একখানা সংস্কৃত নাটক অনুবাদ কবিতে মনস্থ কবেন, এবং 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) বাংলায় রূপান্তরিত কবেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ইহাব অভিনয় হয়, এবং নাট্যকার নিজে পুরুরবার ভূমিকায অবতীর্ণ হন। নাট্যকার মূলেব হুবহু অনুবাদ কবিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইযাছেন, কাবণ সংস্কৃত নাটকেব দীর্ঘ উক্তি, উচ্ছ্বাস এবং কাব্যময়তা বাংলা নাটকে কৃত্রিম হইযাছে।

'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) নাট্যকাবেব মৌলিক বচনা। 'মহাভাবতীয বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানেব সাবিত্রী-চবিত হইতে কেবল মর্মমাত্র পবিগৃহীত হইয়াছে।' এই নাটকেব মধ্যে ইংবাজী এবং সংস্কৃত উভয নাট্যবীতিই অনুসবণ কবা হইযাছে। সংস্কৃত নাটকেব তবল উচ্ছ্বাস এবং দীর্ঘ খেদ ও বিলাপ নাট্যকাব বর্জন কবিতে পাবেন নাই। নাটকেব চবিত্র-সৃষ্টিও সবল ও প্রাণময নয।[১]

'মালতী মাধব' (১৮৮৫) ভবভূতিব প্রসিদ্ধ নাটকেব অনুবাদ। অবশ্য ইহা অবিকল অনুবাদ নহে।[২] ইহা চাব কাণ্ড ও বাব অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটিব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয হইতেছে ইহাব ভাষা।[৩] নির্ভুল চলতি ভাষায যে ইহা আদ্যোপান্ত বচিত শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষাব সন্ধি-সমাস-অলঙ্কাবযুক্ত

দ্বাবা জাতিকে উন্নত কবা যায, সেই নাটকেব দ্বাবা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট কবিবাব জন্য কালীপ্রসন্ন যে চেষ্টা পাইযাছিলেন তাহা সাহিত্যেব ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষবে লিখিত হওযা উচিত।'

কালীপ্রসন্ন সিংহ —মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৯২।

১। 'কথাবস্তু চিত্তাকর্ষকভাবে গ্রথিত হইলেও নাটকখানি খুব উঁচুদবেব নহে। দৃশ্যগুলি স্বল্পাযতন, ক্ষিপ্রগতি ও অবাস্তব বিষযেব বাহুল্য-বর্জিত, কিন্তু চবিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পবিস্ফুট হয নাই। গ্রন্থকাব পুস্তকগত নাযক নাযিকাব আদর্শের আশ্রয লইযাছেন, জ বন্ত চিত্র আঁকিতে পাবেন নাই।'

—কালীপসন্ন সিংহ ও তাঁহাব নাট্যাবলী—ডক্টব সুশীলকুমাব দে, প্রবাসী—আষাঢ (১৩৩৮)

২। নাট্যকার 'বিজ্ঞাপনে' বলিযাছেন—'বাঙ্গালা ভাষায সংস্কৃতেব অবিকল লালিত্য বক্ষা কবিতে চেষ্টা করা নিবর্থক কারণ অবিকল অনুবাদিত গন্থ সহজেই পাঠ কবিতে ঘৃণা বোধ হয। বিশেষতঃ প্রত্যেক পদেব বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকবণে যথার্থ ভাবসংবক্ষণ কবা কাহাবও সাধ্য নহে।'

৩। নাটকেব ভাষা সম্বন্ধে নাট্যকাব লিখিয়াছেন—'মদ্রচিত, মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতী মাধবেব ভাষাবও প্রভেদ হইযাছে, কাবণ অভিনযার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন কবিযা ঈপ্সিত বিষয সুসিদ্ধকরণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম'। —বিজ্ঞাপন।

ভারগ্রস্ত আড়ষ্টতা হইতেও ইহা সর্বাংশে মুক্ত। অবশ্য 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখকের পক্ষে এই ভাষা আশ্চর্য ও অভিনব নহে।

অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণের কৃতিত্বও অনেকখানি, তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইয়াছে অন্যত্র—মৌলিক সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে। সেজন্য তাঁহার নাটকের আলোচনা পরে করা হইবে।

বাংলা নাটকের উপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের আদর্শে বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে-সব নাটক রচিত হইয়াছিল সেগুলি পরবর্তী-কালে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শই সম্মুখে রাখিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক দুইখানি—'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই নাটক দুইখানি বাদ দিলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্য যে-সব নাটক লিখিত হইয়াছিল সেগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সময় হইতে খাঁটি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত নাটক লিখিত হইলেও তাঁহারাও যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তাহা বলা যায় না। পরবর্তীকালে এই প্রভাব খুব কমিয়া আসিলেও চরিত্রচিত্রণে, সংলাপপ্রয়োগে ও রসসৃষ্টিতে এই প্রভাব অনেক স্থানে লক্ষিত হইয়াছে।

নবস্থাপিত রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শনের জন্য যখন নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন কয়েকখানি পাশ্চাত্ত্য নাটক, বিশেষত শেকসপীয়রের নাটক অনূদিত হইলেও নাট্যকারগণ প্রধানত আমাদের বিস্মৃত সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। বহুকাল এই সংস্কৃত নাটকের সহিত আমাদের কোনো মানস-সংযোগ ছিল না, এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ধারাও দেশের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই সংস্কৃত নাটকের সহিত আমাদের পুনঃপরিচয় স্থাপিত হইল। বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়া সংস্কৃত নাটকের রচনারীতি ও আঙ্গিকের প্রভাব নাট্যকারদের চিত্তে সঞ্চারিত হইল। অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবান্বিত রঙ্গমঞ্চ এবং শিক্ষিত নাট্যদর্শকের রুচি ও রসবোধ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। সেজন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই নাট্যরীতির প্রভাব নাট্যকারদের নাট্যচেতনা ও নাট্যকৃতিকে কিছুকাল ধরিয়া বিশেষ

দ্বিধাগ্রস্ত ও মিশ্রিত আঙ্গিকযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য রীতিরই জয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রতীচ্য রীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটকের নাট্যকারদ্বয় সচেতন ভাবে, শেক্‌সপীয়রের নাট্যরীতি অনুসরণ করিলেও তাঁহারাও সংস্কৃত নাটকের অনেক রীতিই রক্ষা করিয়াছিলেন। 'কীর্তিবিলাস' নাটকে নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার প্রভৃতি রহিয়াছে এবং সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ দীর্ঘ বিলাপোচ্ছ্বাস চরিত্রের মুখে দেওয়া হইয়াছে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে অবশ্য সংস্কৃত প্রভাব খুবই কম। 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুনে'র পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সব মৌলিক নাটক রচিত হইয়াছিল সেগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রধান অনুবর্তক হইলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণ ব্যতীত আরও কয়েকজন সমসাময়িক নাট্যকার সামাজিক নানা সমস্যা লইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত, গতিবেগ, অবিচ্ছিন্ন দৃঢ়সংহত রূপ এই সব নাটকে দেখা যায় না। সংলাপের মধ্যে যেখানে নাট্যকারগণ লঘু, কৌতুকরসাত্মক ভাবের অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই সংলাপ বাস্তব, স্বাভাবিক ও নাটকীয় হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তাঁহারা কোনো করুণ ও গম্ভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানেই সংলাপ সংস্কৃত প্রভাবে চালিত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ শব্দ ও অলঙ্কৃত বাক্যপ্রয়োগ, সুদীর্ঘ ভাবতরল উচ্ছ্বাস, মাত্রাতিরিক্ত কারুণ্য প্রভৃতি সেখানে সংলাপকে নিতান্ত আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য এ দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির প্রভাব কোনো কোনো নাটকে দেখা গিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে নিষিদ্ধ বিষাদান্তক পরিণতি যেখানে যেখানে দেখানো হইয়াছে সেখানে সেখানে পাশ্চাত্ত্য ট্রাজেডির প্রভাবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব সচেতনভাবে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনিই ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের অনুবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ এবং ঘটনাবিন্যাস প্রভৃতি শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুরূপ, কিন্তু সংলাপের সংস্কৃত শব্দবহুলত্ব, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও উচ্ছ্বাসময়তা প্রভৃতির উপর সংস্কৃত নাটকের

প্রভাব বিদ্যমান। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর মধ্যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অনেক কমিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শেষ নাটক 'মায়া-কাননে'র মধ্যে পুনরায় সংস্কৃত প্রভাবের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বাস্তবতা ও নাটকীয়তার দিক দিয়া দীনবন্ধুর নাটক তখনকার নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনিও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' নাটকের ভদ্র চরিত্রগুলির সংস্কৃত শব্দবহুল ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ সংলাপ, অনাটকীয় আতিশয্যদুষ্ট শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই ব্যক্ত করে। দীনবন্ধুও তখনকার অন্যান্য নাট্যকারদের ন্যায় করুণ ও গম্ভীর ভাব উদ্রেক করিবার সময় বাস্তবতা, পরিমিতি, পরিবেশ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া সংস্কৃত নাটকের আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নাট্যকাররা হয়তো ভাবিতেন, সংলাপ দীর্ঘ ও ভারী না হইলে, ভাবাবেগে অতিবিস্তারী ও তরল-রসপ্লাবিত না হইলে তাঁহাদের নাটক সম্যক মর্যাদা-সম্পন্ন হইবে না। সংস্কৃত নাটকের পরিবেশ ও রসাদর্শের পক্ষে যে ভাষা ও ভাবাবেগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উপযোগী, বাংলা নাটকের পক্ষে সেগুলিই যে বিরূপ ও বিসদৃশ হইয়া উঠে, নাট্যকারগণ সম্ভবত সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। 'নীলদর্পণ'-এর বাস্তব পরিবেশ ও তীব্র সমস্যা-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নবীনমাধবের আড়ষ্ট উক্তি, বিন্দুমাধবের বিলম্বিত লয়ে বাঁধা অলঙ্কারভূষিত শোকোচ্ছ্বাস, সরলতার তরলিত প্রণয়রসাত্মক স্বগতোক্তি নিতান্তই কৃত্রিম ও অনাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রণয়, মিলন ও শোক প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার সময় দীনবন্ধু তাঁহার প্রিয় ও পরিচিত বাস্তব জগতের দিকে না তাকাইয়া তাঁহার পঠিত ও বহুমানিত পুস্তকের জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকে ললিত ও লীলাবতীর প্রণয়বর্ণনাতেও নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের নায়ক-নায়িকার আদর্শই সম্ভবত সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। সেজন্যই তাহাদের প্রণয়ের চিত্র স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় না হইয়া কৃত্রিম ও বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে।

মাইকেল-দীনবন্ধু যুগের পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল। করুণ ও গম্ভীর ভাবপরিস্ফুটনের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দাবলী, বাংলাভাষার প্রকাশরীতি ও বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্ম ও গভীর জগতের উদ্‌ঘাটন-রীতিটি দেখাইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

পর গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির নাটকে করুণ ও কোমল ভাব অনেক স্থানেই ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু প্রকাশরীতির স্বাভাবিকতার জন্য সেই সব ভাব কৃত্রিম আড়ষ্ট মনে হয় নাই। গিরিশযুগে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেজন্য রঙ্গালয়ের দর্শক, মঞ্চের প্রয়োজন এবং অভিনয়-সম্ভাবনা সম্বন্ধে নাট্যকারদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ ছিল। সেজন্য তাঁহারা মঞ্চাভিনয় ও দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংলাপ রচনা ও চরিত্রসৃষ্টি করিতেন। পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বহু পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সব নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের রীতিই তাঁহারা অবলম্বন করিলেন। পুরাণের জগৎকে বাংলার মাটিতে তাঁহারা নূতন করিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। পুরাণের চরিত্রগুলি তাঁহাদের নাটকে রসে ও অনুভাবনায় সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া উঠিল। তবে সংস্কৃত নাটকের কোনো কোনো চরিত্র পৌরাণিক বাংলা নাটকে ঢুকিয়া পড়িল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি চরিত্রের নাম করা যাইতে পারে।

মাইকেল মধুসূদনের সময় হইতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত হইয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির সচেতন অনুবর্তিতার যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল তাহা প্রথম রূঢ় আঘাত পাইল রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত, গতিবেগ, দৃশ্যচিত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। নাটকের মধ্যে নাটকত্ব অপেক্ষা কাব্যত্বের দিকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তাঁহার এই মনোভাব সংস্কৃত নাট্যাদর্শ-সম্মত এবং পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ-বিরোধী। তাঁহার নাটকে স্থান ও কাল সম্বন্ধে যে শিথিলতা, দৃশ্যসংস্থাপনা ও চরিত্রের আগমন-নির্গমন সম্বন্ধে যে উদাসীনতা দেখা যায় তাহা পাশ্চাত্ত্য নাটকের বাস্তবনিষ্ঠা, সংহতি ও দৃঢ়বিন্যাসের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপহীন অবজ্ঞাই যেন ব্যক্ত করে। সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই।[১] 'মালিনী' নাটক হইতে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিরও অঙ্কবিভাগে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কোনো দৃশ্যবিভাগ নাই, আধুনিক ইবসেনীয় নাটকেও অবশ্য দৃশ্যবিভাগ নাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অধিকাংশ নাটকে দৃশ্যবিভাগ বর্জন করিয়াছেন।

১। দশ রূপকের মধ্যে নাটক ও প্রকরণের অঙ্ক-সংখ্যা পাঁচ হইতে দশ, ঈহামৃগ ও ডিম চার অঙ্কের; সমবকার তিন অঙ্কের; ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ, ও বীথী এক-অঙ্কযুক্ত হইয়া থাকে।

বাংলা নাটকে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব

শেক্‌সপীয়র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। পৃথিবীর এমন কোনো নাটক ও নাট্যমঞ্চ নাই যেখানে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব পড়ে নাই। ইংরাজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে দেশে গিয়াছে সেই দেশেই সকলেব চেয়ে বেশী সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছেন শেক্‌সপীয়র। বাংলা দেশের নাটক ও নাট্যমঞ্চও ইংরাজ-প্রভাবে জন্মলাভ করিয়াছিল। সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা নাটকের বিষয়, আঙ্গিক ও রসের ধারা শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বাংলা নাটকের সূচনা হইতে বর্তমান শতকেব প্রথম কয়েক বৎসর পযন্ত শেক্‌সপীয়রের নাটককে আদর্শ করিয়াই নাট্যকারগণ নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন এবং সমস্যামূলক বাস্তবধর্মী নাটকের উদ্ভবের সময় হইতেই শেক্‌সপীয়রের নাট্যরীতির স্থলে ইবেসনীয় এবং অন্যান্য আধুনিক বাস্তব নাট্যরীতি বাংলা নাটকে স্থান পাইয়াছে।

শেক্‌সপীয়বের সঙ্গে বাঙালীর প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়াছে প্রধানত শিক্ষা ও অভিনযের মাধ্যমে। বাংলাদেশে ইংবাজী শিক্ষা প্রচলিত হইবার পর শেক্‌সপীয়রের নাটকগুলি বরাবার পাঠ্যপুস্তকেব তালিকায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা বিভিন্ন স্থানে স্কুল স্থাপন করিবার জন্য গঠিত হইল। ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে এই হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটির দান অসামান্য। ইংরাজী সাহিত্য পঠন-পাঠনে স্বভাবতই শেক্‌সপীয়রের স্থান ছিল সকলের উপরে। হিন্দু কলেজে অনেক কৃতবিদ্য অধ্যাপক শেক্‌সপীয়রের অধ্যাপনায় বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের কাছে যাঁহারা অধ্যায়ন করিয়াছিলেন শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে এক প্রবল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইত। এ-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রিচার্ডসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, 'তিনি শেক্‌সপীয়র পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি স্ফুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে শেক্‌সপীয়র শুনিয়া ছাত্রগণ শেক্‌সপীয়রেয় ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই,

এই জ্ঞানেই বর্ধিত হইতেন।' রিচার্ডসন শুধুমাত্র কলেজের শিক্ষার মধ্যেই ছাত্রদের নাট্যজ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন না, রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিয়া সেই জ্ঞান পরিপূরণ করিয়া নিতে বলিতেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 'তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, are you going to the theatre to-day? তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা, আবৃত্তিবিদ্যা শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।' এই রিচার্ডসনের প্রতি মধুসূদনের যে কিরূপ অন্ধভক্তি ছিল তাহা তাঁহার জীবনীগ্রন্থের মধ্যে লেখা রহিয়াছে। শেকুসপীয়র ও নাট্যশালার প্রতি রিচার্ডসনের প্রবল অনুরাগ যে তাঁহার অনুরক্ত ছাত্র মধুসূদনের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে তাহা স্বাভাবিক। মধুসূদন যে নাট্যশালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং শেক্সপীয়রের নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার মূলে রিচার্ডসনের প্রভাব যে অনেকখানি ছিল এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না।

বাংলাদেশে রিচার্ডসনের শেক্সপীয়রীয় শিক্ষাধারা আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বহু খ্যাতনামা দেশী ও বিদেশী অধ্যাপক শেকৃসপীয়রের নাটক আবৃত্তি ও বিশ্লেষণের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুরাগ উদ্রেক করিয়া আসিয়াছেন। মনোমোহন ঘোষ, জানকী ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথা ছাত্রগণ চিরদিন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়া আসিয়াছেন। কেবলমাত্র স্কুল কলেজে পঠনপাঠনের মধ্যে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে ছাত্রদের উৎসাহ ও অনুরাগ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শেকৃসপীয়রের আবৃত্তি এবং মাঝে মাঝে শেক্সপীয়রের অভিনয়ের মধ্য দিয়া তাহারা শেক্সপীয়রের নাট্যরসও শ্রোতাদের চিত্তে সঞ্চার করিতে চাহিয়াছে। এমনিভাবে ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিরকাল শেক্সপীয়র সম্বন্ধে একটি গভীর সংস্কার স্থাপিত হইয়াছে। সেই সংস্কার নানাভাবে তাঁহাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শেক্সপীয়রের প্রভাবে নাটক-রচনায় ব্রতী হইয়াছেন, কেহ অভিনেতারূপে রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়াছেন, কেহ বা নাটকসম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন আর অন্যান্য

অনেকে শুধু নাটকের পাঠক ও নাট্যশালার নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিয়াছেন।

॥ ২ ॥

শেক্‌সপীয়রের সঙ্গে বাঙালীর মানস-সংযোগের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হইল নাট্যশালা। অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতেই বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সব রঙ্গমঞ্চ বিদেশাগত নাট্যামোদী ব্যক্তিদের দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাথমিক নাট্যশালাগুলির মধ্যে ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৬), মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার (১৭৮৯), বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫), চৌবঙ্গী থিয়েটাব (১৮১৩—১৮৩৯), সাঁস্‌সি থিয়েটাব (১৮৩৯—১৮৪৯) প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য। এ-সব নাট্যশালায় কি কি নাটকের অভিনয় হইত তাহাব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু শেক্‌সপীয়বেব নাটকই যে এ-সব স্থানে প্রধানত অভিনীত হইত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বাঙালীব উদ্যোগে নাট্যশালা স্থাপিত হইবার পরেও উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে বহু বিদেশী নাট্যসংস্থা শেক্‌সপীযরেব নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্য এদেশে আসিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশেব শেক্‌সপীয়রীয় অভিনয়ধারাব ঐতিহ্য বহন কবিয়া আনিয়াই এ-সব দলের অভিনেতাবা আমাদের দেশের নাট্যামোদী দর্শকদেব কাছে শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যরসেব চমৎকারিত্ব ও গভীবতা ফুটাইয়া তুলিতেন। গ্যাবিক, কিন, কেম্বল, হেনরী আরভিং, মিসেস সিডনস, এলেন টেরী প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়রীতির আভাস বিদেশাগত দলগুলিব অভিনয়েব মধ্যে পাওয়া যাইত। এই সব দলের অভিনয়, নাট্যপ্রয়োগরীতি, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি আমাদেব দেশের অভিনয়ধারা ও মঞ্চসজ্জাব উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদেশাগত লুইস থিয়েটারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পাবে। লুইস থিয়েটারের স্বত্বাধিকাবিণী মিসেস লুইসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার ফলেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রতিভা স্ফূর্ত হইবার প্রবল প্রেরণা পাইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'প্রতিভাশালিনী প্রৌঢ় অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশসহ লুইস থিয়েটারের অভিনয়দর্শনে গিরিশচন্দ্রের

নাট্যপ্রতিভা ক্রমশ স্ফুরিত হইতে থাকে। সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ—স্বীয় পল্লীতে "সধবার একাদশী" নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয়ে।'

ইংরেজদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার অনুকরণে যখন নাট্যামোদী বাঙালীদের দ্বারা নাট্যশালা স্থাপিত হইল তখন সেখানেও কিন্তু ইংরেজী ভাষায় শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের অভিনয়-ধারা প্রথমদিকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রহিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বাঙালীর উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম নাট্যশালা—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ইংরেজীতে অনূদিত 'উত্তর রামচরিত' ও 'জুলিয়াস সিজার' লইয়া। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালী অভিনেতাদের দ্বারা বহুস্থানে ইংরেজী ভাষায় শেক্‌সপীয়রের নাটক অভিনীত হইয়াছে। এ-সব অভিনয়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের অভিনয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল, ডেভিড হেয়ার একাডেমি ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দুইটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল এবং শেক্‌সপীয়রের 'Merchant of Venice', 'Othello', 'Henry IV' প্রভৃতি নাটক ঐ সব স্থানে অভিনীত হয়। সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইবার পরেও মাঝে মাঝে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের মধ্যে রসবৈচিত্র্য আনিবার জন্য মঞ্চের প্রযোজকগণ শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা নাটকের রসে তখনকার দর্শকদের চিত্ত এমনভাবে নিমগ্ন ছিল যে, বাংলায় অনূদিত শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় জনপ্রিয় হয় নাই। এমন কি, গিরিশচন্দ্রের স্ব-অনূদিত ও অভিনয়সমৃদ্ধ 'ম্যাকবেথ' নাটকও জনসম্বর্ধনা লাভ করিতে পারে নাই।

॥ ৩ ॥

বাংলা নাটকে শেক্‌সপীয়রের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে অনূদিত শেক্‌সপীয়রীয় নাটকগুলির কথা উল্লেখ করিতে হয়। অনূদিত নাটক-গুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, যথা—রূপান্তরিত অনুবাদ ও অবিকল অনুবাদ। রূপান্তরিত অনুবাদের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সেই নাটকগুলি যে-গুলিতে পাত্রপাত্রীর নাম ও পরিবেশ পরিবর্তন করিয়া, তাহাদের সম্পূর্ণরূপে দেশী ভাবায়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কোনো কোনো নাটকের আবার শুধুমাত্র ভাব-অবলম্বনে তাহাদের উপন্যাসরূপ দেওয়া হইয়াছে।

শেক্‌সপীয়রের নাটকের প্রাথমিক অনুবাদগুলির মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের নাটকগুলির কথা উল্লেখ করিতে হয়। হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'চারুমুখ-চিত্তহরা' (১৮৬৩) যথাক্রমে 'The Merchant of Venice' ও 'Romeo Juliet'-এর অনুবাদ। 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' অবিকল অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ মাত্র। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন :

'এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি শেক্‌সপিয়র নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে মরচেণ্ট অফ ভিনিস ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণপূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক গদ্য-পদ্যে রচনা করিলাম।' 'চারুমুখ-চিত্তহরা' নাটকখানিও নাম ও ঘটনাস্থান প্রভৃতির দিক দিয়া সম্পূর্ণ নূতন নাটকে পরিণত হইয়াছে। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন…'অতুল সদ্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থের অপূর্ব রসমাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি করা যায় নাই।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেক্‌সপীয়রের 'Comedy of Errors'-অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর ভূমিকা পড়িলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় শেক্‌সপীয়রের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং কি প্রবল অনুরাগ লইয়া তিনি শেক্‌সপীয়রের নাটক অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে, এ-পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্তনের রীতি সমর্থন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা পুস্তকে ইউরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষতঃ যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহারবাসনায় ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে, এতদ্দেশীয় নাম

নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোন অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে উপাখ্যানে সেরূপ নহে।'

অন্যান্য রূপান্তরিত অনুবাদ-নাটকগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুশীলা-বীরসিংহ (Cymbeline), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নলিনী-বসন্ত' (Tempest), হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' (Macbeth) প্রভৃতি নাটকগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নলিনী-বসন্ত' ছাড়াও Romeo Juliet-এর ছায়া অবলম্বনে হেমচন্দ্র ঐ নামে একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। ঐ নাটকের ভূমিকায় রহিয়াছে, 'বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্য-কঠোর হয় যে, তাহা বাঙালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেইজন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম।'

পরবর্তী কালে শেক্‌সপীয়রের অনেকগুলি নাটক যথাযথভাবে অনূদিত হইয়াছিল এবং আজও পর্যন্ত সেই নাটকগুলিই বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠকের কাছে অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমানে শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের অভিনয়ে অবিকল অনুবাদ-নাটকগুলিই শুধু স্থান পাইতেছে, ভাবানুবাদগুলি আর বর্তমান দর্শক ও পাঠকের কাছে জনপ্রিয় নহে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটি অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন আজও পর্যন্ত তাহা বোধ হয় ম্যাকবেথের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ হইয়া আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই অনুবাদসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশবাবুর অনুবাদের এই বিশেষত্ব দেখিলাম যে, যে-স্থানে অনুবাদ করা অতীব দুরূহ, সেই সেই স্থানে শক্তিমত্তা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে।' দেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত 'ওথেলো' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে বিভিন্ন লেখকের অনূদিত শেক্‌সপীয়রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাটকের সংকলন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

॥ ৪ ॥

মৌলিক বাংলা নাটকগুলির উপরে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ মৌলিক নাটকের সূচনাকাল হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রভাব প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত শেক্‌সপীয়র অপ্রতিহত গৌরবে নাট্য-জগতের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তারপর আধুনিক নাট্য-কারদের যখন অভ্যুদয় হইল, তখনও প্রথম দিকে তাঁহারা শেক্‌সপীয়রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি প্রথমত শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যরীতিতে নাটক রচনা করিলেও কিছুকাল পরে তাঁহারা ইবসেনীয় নাট্যরীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার নানা অভিনব রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিষয়বস্তু-নির্বাচনে এবং ট্র্যাজিক রস-চেতনায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বাংলা দেশে যে নাট্য-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব খুবই সামান্য। সমাজের বাস্তব সমস্যার প্রচণ্ডতা, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-জটিলতা, গণতান্ত্রিক জীবনরূপ, ব্যক্তিজীবনের প্রাধান্যবিলোপ, মঞ্চের রূপ ও রীতির পরিবর্তন, দর্শকদের রুচি ও রসবোধের নূতনত্ব প্রভৃতির ফলে আজ আর শেক্‌সপীয়রের নাটক বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেছে না। আজ দর্শকদের সময় কম, পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখিবার সময় তাঁহাদের কোথায়? আজ তাঁহাদের রুচি সিনেমার প্রভাবে অনেকখানি গঠিত হইয়াছে, সেজন্য টুকরা টুকরা দৃশ্যের ফলে নাটকের ঘটনার মধ্যে যে ঘন ঘন বিচ্ছেদ ঘটে তাহা সহ্য করিবার ধৈর্য বর্তমান দর্শক কোথা হইতে পাইবে? ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তনের দ্বারা দর্শকদের মনোযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও বার বার দৃশ্যপরিবর্তন তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করে, এমন কি অঙ্কের স্থলে তিন চারবার যবনিকা পতন হইলেও যেন বর্তমান কালের অসহিষ্ণু দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। অতএব অঙ্ক-সংখ্যাও কমাইতে হইবে। সেজন্য বর্তমান প্রবণতা হইল একই দৃশ্যসজ্জায় অবিচ্ছিন্নভাবে নাট্যঘটনার উপস্থাপন। শেক্‌সপীয়রের নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য

হইল তাঁহার ভাষাসম্পদ ও সুগভীর কাব্যময়তা। আধুনিক নাটকের এই দুইটি গুণেরই বড় অভাব। আজ নাট্যকারকে যেখানে পদে পদে প্রযোজকের নিকটে নতি স্বীকার করিতে হইতেছে, সেখানে ভাষাসম্পদ কিভাবে স্থান পাইতে পারে? নাট্যকারের কথার জোর অপেক্ষা মঞ্চের আলোক ও শব্দের জোরের দিকে আজ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে, সেজন্য আজিকার নাটক শুধুমাত্র অভিনেয়, পাঠ্য হইবার গুণ তাহা হারাইয়া ফেলিতেছে। তাই-তাহার আবেদন শুধুমাত্র বর্তমানকালেব দর্শকসমাজের কাছে, নিত্যকালের পাঠক সমাজের কাছে নয়।

বাংলা নাটকে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিভিন্ন নাট্যকারের মানসপ্রকৃতি কিভাবে শেক্‌সপীয়রের প্রভাবে গঠিত ও চালিত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা দবকার এবং তারপব তাঁহাদের নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, আঙ্গিক ও রসের মধ্যে শেকসপীযরের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখান প্রয়োজন। অবশ্য সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা অনেক সময় প্রভাবের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু এমন হইতে পারে যে, সেই সাদৃশ্য আকস্মিক, যেখানে আমরা প্রভাব সন্ধান করিয়া থাকি সেখানে হয়তো নাট্যকার সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও চরিত্রচিত্রণের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা নাটকের ত্রিবিধ ধারা অর্থাৎ পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের মধ্যেই শেক্‌সপীয়রের প্রভাব সবাপেক্ষা সুস্পষ্ট। কাবণ শেক্‌সপীয়রের নাটকের উদাত্তগম্ভীর পরিবেশ, চরিত্রের পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা, উচ্চাঙ্গেব ভাবকল্পনা, ট্র্যাজেডির সীমাহীন গভীরতা ও মর্মবিদারী বেদনাময়তা বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যে মৌলিক নাটক দুইটি রচিত হয় সে-নাটক দুইটি সচেতনভাবে শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যরীতি অবলম্বনে রচিত। 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় লেখক শেক্‌সপীয়রেব কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ শেক্‌সপীয়রনামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

'আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী।'

'কীর্তিবিলাস'-এর বিয়োগান্তক পরিণতি এবং শেক্সপীয়রীয় রীতিতে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের মধ্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ভদ্রার্জুন' নাটকটিও শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রচিত। নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'এই নাটকক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয়বিষয়ে ইউরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে…।' ইউরোপীয় নাটক বলিতে শেক্সপীয়রীয় নাটকের কথাই ধরিতে হইবে, কারণ গ্রীক নাটকের কোনো লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকে পড়ে নাই।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকাল বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। এই সময়ে যে সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। এই সময়কার সংস্কৃতপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। কিন্তু এই সংস্কৃত প্রভাবের যুগেও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। ঐ নাটকখানি বিয়োগান্তক, স্পষ্টতই এখানে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরসপরিণতির প্রভাব পড়িয়াছে। এই সময়ে সংস্কৃত ও শেক্সপীয়রীয় নাটকের মধ্যে যেন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইল বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবে। মধুসূদন দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শই গ্রহণ করিলেন। অবশ্য মধুসূদন এবং তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু সচেতনভাবে শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শ গ্রহণ করিলেও অজ্ঞাতসারে তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত নাট্যরীতি কিছু কিছু তাঁহাদের নাটকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য এই সংস্কৃত প্রভাব হইতে পরবর্তীকালে বাংলা নাটক অনেকখানি মুক্ত হইতে পারিয়াছে।

শেক্সপীয়রের নাট্যরীতি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক হইতে। মধুসূদন এই নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন—'I am aware, of dear fellow, that there will in likelihood, be something of a foreign air about my Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if

there be a foreign air about the thing?' 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্যে নাট্যকার এই যে সচেতনভাবে পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রবর্তন করিলেন, এই রীতিই বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থায়ী রীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' ও পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'র মধ্যে শেক্‌সপীয়রীয় রীতি কেবল মাত্র বহিরঙ্গে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের অন্তর্জগতে তাহার সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ও সুগভীর ট্র্যাজিক বেদনায় 'কৃষ্ণকুমারী'তে শেকসপীয়রীয় নাটকের ধর্ম অতি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী' লেখার সময় নাট্যকার শেক্‌সপীয়রের নাটক সম্বন্ধে যে অতিশয় সচেতন ছিলেন তাহা সমসাময়িক বন্ধুদের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপের মধ্যে বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক ট্র্যাজেডির অনুরূপ ট্র্যাজেডি লিখিতে যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'What a romantic tragedy it will make!' একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মধুসূদন কাব্যরচনায় গ্রীক ও লাতিন কবিদের দ্বারা অনেকখানি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যরচনায় তিনি গ্রীক নাটক হইতে প্রেরণা লাভ করেন নাই, শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক নাটকই তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী'র শেষ অংশে 'King Lear' নাটকের প্রভাব স্পষ্ট। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ঝড় ও গর্জনের মধ্যে ভীমসিংহ নিরুপায় বেদনায় আর্তনাদ করিয়া বলিতেছেন—

'বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! একি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (ঊর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর।' ভীমসিংহের উক্তি উন্মত্ত রাজা লীয়রের অনুরূপ উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়—

Lear—Blow, winds and crack your cheeks
rage! blow
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drenched our steeples, drown'd
the cocks!

দীনবন্ধু ঐতিহাসিক নাটক লিখেন নাই, সেজন্য তাঁহার নাটকের চরিত্র শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের বিশালতা ও বলিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় তিনিও শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের রীতি অবলম্বনে

নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'নীলদর্পণ' 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রায় সমকালীন রচনা। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রভাবে এই নাটকের পরিণতিও বিষাদান্তক হইয়াছিল। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্রের অন্তর্বেদনা দীনবন্ধুর নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। ওথেলোর তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা নিমচাঁদের হৃদয়মূল হইতে মর্মরিত হইয়া উঠিয়াছে, যখন সে বলিয়াছে—

'So sweet was ne'er so fatal, I must weep
But they are cruel tears !

'জামাইবারিক'-এর গর্বিণী স্ত্রী কামিনীর বশীভূত হওয়া কাহিনীর সঙ্গে 'Taming of the Shrew' নাটকের ক্যাথারিনার কাহিনীর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের জলধর-বৃত্তান্তটি স্পষ্টতই 'Merry Wives of Windsor' নামক প্রহসনের প্রভাবে লিখিত। জলধর, মল্লিকা ও মালতী যথাক্রমে সার জন ফলস্টাফ, মিসেস পেজ ও মিসেস ফোর্ডের চরিত্র অনুসরণে অঙ্কিত। ফলস্টাফের জব্দ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে জলধরের শাস্তি পাইবার ঘটনাও সাদৃশ্যযুক্ত।

গিরিশচন্দ্র যে শেক্সপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখিয়া এবং মিসেস লুইসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াই গিরিশচন্দ্র নাট্যজগতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'মিসেস লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতায় এবং লুইস থিয়েটারে প্রায়ই অভিনয়দর্শনে যুবক গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা স্ফুরিত হইয়া থাকে। তৎপরে কলিকাতায় আগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু বিলাতী থিয়েটারে শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।' গিরিশচন্দ্র শেকসপীয়রের নাটক ও সেই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে এত বেশী উৎসাহী ও অবহিত ছিলেন যে, তিনি নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সবগুলির মধ্যেই শেক্সপীয়রের নাটক ও তাহার অভিনয় সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। শেক্সপীয়রের প্রতি গভীর আকর্ষণের ফলেই তিনি 'ম্যাকবেথ' বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বাঙালীর দ্বারা বাংলা ভাষাতেও বিলাতের সুবিখ্যাত অভিনেতৃগণের ন্যায় রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি যথা, 'চণ্ড', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতি এবং চরিত্র

ও রসসৃষ্টির প্রভাবে লিখিত। সামাজিক নাটকগুলির অধিকাংশই যে ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার মূলেও শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজিক নাটকের প্রেরণা বিদ্যমান। কোনো কোনো নাটকের ঘটনার মধ্যেও শেক্‌সপীয়রের কোন কোন নাটকের প্রভাব স্পষ্ট। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে রমেশ যোগেশকে মাতাল করিয়া তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা ও আত্মসংযম সব বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রমেশের এই আচরণ 'Othello' নাটকেব নীচ ও ক্রূর ইয়াগোর আচরণের সঙ্গেই তুলনীয়। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ইয়াগো ক্যাসিওকে ঠিক এমনিভাবে মাতাল করিয়া নিয়াছে। ওথেলোর দ্বারা তিরস্কৃত ও বর্জিত হইয়া অনুতপ্ত ক্যাসিও বলিয়াছিল—'Reputation, reputation, reputation! O! I have lost my reputation. I have lost the immortal part of my self, and what remains is bestial. My reputation Iago, my reputation!'

অনুরূপ উক্তি আমরা যোগেশের মুখে শুনিয়াছি—'সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি!' গিরিশচন্দ্র যে সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল সমবেদনাকরুণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী বিদূষক-জাতীয় চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার মূলেও শেক্‌সপীয়রের fool চরিত্রের প্রভাব রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র যে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেশীয় হইলেও সেগুলির নাট্যরীতি, নাট্যদ্বন্দ্বরূপায়ণ ও চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বহুলাংশে শেক্‌সপীয়রের নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত। সেজন্য তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেশী ভাবের সহিত শেক্‌সপীয়রীয় আঙ্গিক ও নাটকীয়কতার সমন্বয় ঘটিয়াছে, এ-কথা বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জনা' নাটকের কথা বলা যাইতে পারে। জনা নাটকের পরিণতি ভক্তিরসাশ্রিত হইলেও তাহার মধ্যে তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত ও দ্রুত ঘটনার গতি দেখা গিয়াছে। 'Richard III' নাটকেব পতিপুত্রহীনা মার্গারেটের মতই জনাকে তীব্র জ্বালা ও প্রতিহিংসাময়ী রূপেই দেখিতে পাই। জনা-চরিত্রের বলিষ্ঠ সক্রিয়তা ও তাহার নিরুপায় নিষ্ফল পরিণতি তাহাকে শেক্‌সপীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালও শেক্‌সপীয়রের কাছে তাঁহার ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজের নাট্যজীবনের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

'বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বারংবার পড়িতাম ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, মুখস্থ করিতাম।' তিনি তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাঈ' শেক্‌সপীয়রের ছন্দরীতি অনুসরণে রচনা করেন। তাঁহার কথায়, 'প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি।' শেক্‌সপীয়রের প্রভাব সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। ঘটনার তীব্র বেগ, প্রবল নাট্যোৎকণ্ঠা, চরিত্রগুলির বলিষ্ঠ ট্র্যাজিক রূপ, বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাবেশ, সংলাপের কবিত্বসম্পদ প্রভৃতির দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্‌সপীয়রকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্‌সপীয়রকে অনুসরণ করিলেও আবার কোনো কোনো দিক দিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মঞ্চসচেতনতা, মঞ্চসজ্জার নির্দেশ, আদর্শপ্রবণতা ও বিস্তৃত সচেতন উদ্দেশ্যমূলকতা প্রভৃতি তাহার নাটকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার নাটকের অনেকগুলি চরিত্রের উপর শেকসপীয়রের চরিত্রের ছাপ অতি স্পষ্ট। 'তারাবাঈ' নাটকের সুরমল ও তাহার স্ত্রী তমসার চরিত্র ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র অনুসরণে রচিত। 'নুরজাহান' নাটকে অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী ও অসামান্যা শক্তিমতী নুরজাহানের করুণ ও শোচনীয় পরিণতি লেডি ম্যাকবেথের পরিণতির কথাই মনে করাইয়া দেয়। অপ্রকৃতিস্থা নুরজাহান শেষ দৃশ্যে হৃদয়বিদারী প্রলাপের মধ্যে নিজেকে অতি অসহায়ভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে বলিত, 'উঃ' কি ক্ষমতাটাই ছিল! কি অপচয়ই কর্লে! নিঃশেষ কর্লে। কিছু নাই (হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরে খুলিলেন) এই দেখ।' এই অংশের সঙ্গে লেডী ম্যাক্‌বেথের অসংবদ্ধ আচরণের শোচনীয়তা তুলনীয়—'Here's the smell of the blood still : all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh! Oh! Oh!' নুরজাহানের রূপমদিরামত্ত জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া ক্লিওপেট্রার প্রেমজালে আবদ্ধ আত্মবিস্মৃত অ্যান্টনীর কথাই আমাদের মনে হয়। মোহবিহ্বল জাহাঙ্গীরের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—'তোমার সাম্রাজ্য তুমি শাসন কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে এসো আমার সাম্রাজ্য—সুরা, সৌন্দর্য, সংগীত।' অনুরূপ উক্তি মোহপাশবদ্ধ অ্যান্টনীর মুখেও শোনা গিয়াছিল—

'Come,
Let's have one other gaudy night, call to me
All my sad captains ; fill our bowls once more ;
Let's mock the midnight bell'.

'সাজাহান' নাটকের পরিকল্পনা এবং সাজাহান চরিত্রের ট্র্যাজিক রূপ অবিকল 'King Lear' নাটকের প্রেরণায় লিখিত। সাজাহানের অনেক উক্তি রাজা লীয়রের উক্তির অবিকল প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। কূট, ক্ষমতালোভী, সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রকারী ঔরংজীব-চরিত্রের সঙ্গেও তৃতীয় রিচার্ডের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঔংরজীব নাটকের শেষ দিকে জাগ্রত বিবেকের বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইয়াছে। তৃতীয় রিচার্ডের শয়তানী অন্তরের মধ্যেও আত্মগ্লানির দুঃসহ প্রদাহ আমরা দেখিয়াছি—

'It is now dead midnight.
Cold fearful drops stands on my trembling flesh.
What ! do I fear myself ? there's none else by :
Richard loves Richard , that is I am I,
Is there a murderer here ? No. Yes I am :
Then fly : what from myself Great reason why ?
Lest I revenge.'

রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনকে আমরা দুই পর্বে বিভক্ত করিতে পারি—জোড়াসাঁকো পর্ব ও শান্তিনিকেতন পর্ব। শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা ও মঞ্চচিন্তায় স্বকীয় মৌলিকতা আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি নাটকের বাঁধাধরা আঙ্গিকের বাঁধন ভাঙ্গিয়া দিলেন, সাঙ্কেতিক রীতিতে নাটক লিখিয়া চলিলেন এবং নাটকের মঞ্চপ্রয়োগের ব্যাপারেও মঞ্চমায়াসৃষ্টিকারী আঙ্গিকের বাহুল্য বর্জন করিয়া সরল, স্বাভাবিক যাত্রারীতি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জোড়াসাঁকো পর্বে রচিত নাটকের মধ্যে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'শেক্‌সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।' 'মালিনী' নাটকে অবশ্য তিনি শেক্‌সপীয়রের প্রভাব অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু

তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায়, 'মালিনী' রচনার পূর্ব পর্যন্ত শেক্সপীয়রের প্রভাব তাঁহার মনকেও অধিকার করিয়াছিল। অবশ্য জোড়াসাঁকোতে অবস্থানকালেও তিনি যে গীতিনাট্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন সেগুলিতে তাঁহার মৌলিক ভাব ও নাট্যরীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যে দুইখানি পূর্ণাঙ্গ, গভীর ভাবসমৃদ্ধ, ট্র্যাজিক-রসাত্মক নাটক তিনি এই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন সেই 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন' পুরাপুরি শেকসপীয়রের প্রভাবে রচিত। পৌরুষকঠোর, বীর্যদীপ্ত, প্রচণ্ড আবেগচালিত বিক্রমদেব-চরিত্র তো খাঁটি শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রবল ও বেগবান্ ধর্মে জীবন্ত। চন্দ্রসেন ও রেবতীর উপরে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ক্ষুধার্ত জনতার কথোপকথন 'Coriolanus' নাটকের প্রথম দৃশ্যের বিদ্রোহী জনতার কথাবার্তার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের কমেডিগুলির মধ্যেও শেকসপীয়রের রোমান্টিক কমেডির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শেকসপীয়রের রোমান্টিক কমেডিতে প্রণয়ের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের মিলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের দুইখানি কমেডিতে অন্তত—'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র মধ্যে এই প্রণয়রস ও কৌতুকরসের সঙ্গম সুস্পষ্ট। 'চিরকুমার সভা'য় শৈলবালার পুরুষবেশ ধারণ দেখিয়া 'As you Like it' নাটকের রোজালিণ্ডের পুরুষবেশ ধারণের কথাই মনে হয়। বিভিন্ন যুগল-চরিত্রের সমাবেশের দ্বারা একটা Parallelism বা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা শেক্সপীয়রের কমেডির একটি রীতি। যেমন 'The Merchent of Venice' নাটকের ব্যাসানিও-পোরশিয়া, গ্রাসিয়ানো-নেরিসা ও লরেঞ্জো-জেসিকা এই তিন জোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সমাবেশের ফলে নাটকের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রসও ঘনীভূত হইয়াছে। এই সাদৃশ্যরীতি রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করিয়াছেন। 'চিরকুমার সভা'য় অক্ষয়-পুরবালা, শ্রীশ-নৃপবালা, বিপিন-নীরবালা, ও পূর্ণ-নির্মলা এই চারিজোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সমাবেশ হইয়াছে। আর 'শেষরক্ষা'য় প্রেমের লীলাখেলা ঘটিয়াছে চন্দ্র-ক্ষ্যান্তমণি, বিনোদ-কমল ও গদাই-ইন্দুমতী এই তিনজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে।

॥ ৬ ॥

শেক্সপীয়রের নাট্যরীতি যে বাংলা নাট্যরীতির উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সেই নাট্যরীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা

করিলেই বুঝা যাইবে। শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে কাহিনীর বৈচিত্র্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কমেডিতে প্রধান কাহিনীর সঙ্গে এক কিংবা একাধিক উপকাহিনীর সংযোগ নাট্যঘটনা সংস্থাপনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ট্র্যাজেডির মধ্যেও এই কাহিনীবৈচিত্র্য দুর্লভ নয়। 'King Lear' নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে গ্লস্টারের উপকাহিনীটি যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে আমরা দেখিতে পাই ভীমসিং-কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে জগৎসিংহ-বিলাসবতীর আর একটি কাহিনীর ধারা মিলিত হইয়াছে। 'সাজাহান' নাটকের মধ্যে মূল কাহিনীর সঙ্গে দারা, সুজা, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন উপকাহিনীর সুকৌশলে সংযোগ ঘটান হইয়াছে। 'রাজা ও রানী' নাটকেও বিক্রমদেব-সুমিত্রার প্রধান কাহিনীর সঙ্গে কুমার-ইলার উপকাহিনীটি স্থান পাইয়াছে।

ব্র্যাডলে শেক্‌সপীয়রের নাটকের গঠনরীতির আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শেক্‌সপীয়রের নাট্যঘটনার তিনটি অংশ, যথা উপস্থাপনা (Exposition), বিবর্তন ও জটিলতা এবং পরিসমাপ্তি। প্রথম অঙ্কে উপস্থাপনা এবং নাট্যসংঘাতের সূচনা, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং কোনো কোনো স্থলে পঞ্চম অঙ্কের কিয়দংশে নাট্যসংঘাতের জটিলতা ও তীব্রতা এবং পঞ্চম অঙ্কে পরিসমাপ্তি। বাংলা নাটকের ঘটনা-সংস্থাপনরীতি আলোচনা করিলে দেখা যায় বাংলা নাটক মোটামুটি শেকসপীয়রীয় রীতি অনুসরণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'নীলদর্পণ' নাটকখানির ঘটনা বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম অঙ্কের চরিত্রগুলির উপস্থাপনা নবীনমাধবের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের বিরোধের সূচনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই বিরোধের তীব্রতা—ঘটনার দ্রুত গতি। চতুর্থ অঙ্কে গোলোক বসুর মৃত্যুতে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস—ঘটনার গতি শ্লথ। পঞ্চম অঙ্কে নবীনমাধবের মৃত্যু—নাটকের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি (Catastrophe)। আর একটি নাটকের কথা ধরা যাক। 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কে নাট্যঘটনার উপস্থাপনা—মেহেরুন্নিসার মানসিক দ্বন্দ্ব, শেরখাঁর মৃত্যু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে প্রকৃত সংঘাতের আরম্ভ, মেহেরুন্নিসার নুরজাহান হওয়া—ক্ষমতার উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ এবং অবশেষে শীর্ষস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। চতুর্থ অঙ্কে বিরুদ্ধ শক্তির প্রাধান্যের সূচনা—নুরজাহানের পতনের আভাস। পঞ্চম অঙ্কে অতি শোচনীয় পতন—নাটকের Catastrophe।

শেক্‌সপীয়রের নাটকে স্বগতোক্তি ও জনান্তিকে ভাষণ নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শেক্‌সপীয়রের শ্রেষ্ঠ কাব্যাংশে জীবনের গভীরতম ও মহত্তম সত্যের উপলব্ধি এই স্বগতোক্তির মধ্যে আমরা পাইয়াছি। বাংলা নাটকেও আধুনিক নাট্যরীতির পূর্ব পর্যন্ত শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের এই দুইটি বিশিষ্ট রীতি অনুসৃত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'আলমগীর', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির সেরা উক্তিগুলি স্বগত উচ্চারিত হইয়াছে। স্বগতোক্তি ও জনান্তিকে ভাষণ ইবসেনীয় বাস্তব রীতিতে লেখা নাটকের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক কালে বিদেশের ব্রেখট, টেনেসি উইলিয়ামসের নাটকের ন্যায় আমাদের এ-দেশের নাটকে এই দুই নাট্যরীতি আবার নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক নাটকে আরো কয়েকটি নাট্যরীতির ব্যবহার দেখা যায়, যেমন উচ্চ ও গভীর ভাব প্রকাশ করিবার জন্য পদ্য সংলাপ ও সাধারণ জনতা-চরিত্রের সংলাপরূপে এবং কৌতুকরস পরিবেষণের জন্য গদ্য সংলাপের প্রয়োগ। এই সংলাপের রীতিবৈচিত্র্য বাংলা নাটকের মধ্যেও দেখা যায়। করুণ রসের পাশে কৌতুকরসের অবতারণা শেকসপীয়রীয় নাটকের আর একটি বিশিষ্ট রীতি। এই রীতিটি বাংলা নাটকেও ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

শেক্‌সপীয়রের প্রধানতম প্রভাব সম্বন্ধে কিন্তু এখনও আলোচনা করা হয় নাই। সেই প্রভাব শুধুমাত্র নাটকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সেই প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রে। বিষয়গত নহে, শিল্পগত নহে, সেই প্রভাব হইল রসগত। এই কথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না যে শেক্‌সপীয়রের সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলেই বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজিক রসচেতনার রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে বাঙালী এই রসচেতনা লাভ করে নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে—মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যে কান্না ও করুণা অনেক ছিল কিন্তু জীবনের ট্র্যাজিক রূপ সেই সাহিত্যে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সেই সাহিত্যের সমস্ত দুঃখই পরিশেষে তৃপ্তিজনক মিলন এবং সমস্ত সংকটই অলৌকিক দৈবশক্তির বিধানের মধ্যে সান্ত্বনাজনক পরিণতি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনবোধের সংস্পর্শে আসিয়া পরলোক অপেক্ষা ইহলোকের প্রতি আমাদের অনুরাগ

বর্দ্ধিত হইল এবং স্বর্গ অপেক্ষা মাটির মহিমা আমাদের কাছে বড় হইয়া উঠিল। তখন ট্র্যাজেডির অনুভূতি আমাদের রসচেতনার মধ্যে স্থান পাইল। ট্র্যাজেডি জীবনের দুঃখময় দিক উদ্‌ঘাটন করে বটে, কিন্তু সেই দুঃখময় জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জীবনকে আমরা অধিকতর মূল্যবান মনে করি। ট্র্যাজেডির দুঃখ জীবন সম্বন্ধে আমাদের নৈরাশ্যবাদী করিয়া তোলে না, বরঞ্চ সেই দুঃখ জীবনকে আরও নিবিড়ভাবে, আরও পূর্ণভাবে পাইবার জন্য আমাদের আশান্বিত করিয়া তোলে। উনিশ শতকে নবজাগ্রত জাতির জীবন-রসাশক্তির ফলে ট্র্যাজেডির দুঃখময় রূপের প্রতি আমাদের একটি কৌতূহল ও অনুরাগ দেখা দিল। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির সহিত পরিচয়ের ফলে আমাদের সাহিত্যে এক ট্র্যাজেডির রসরূপ ফুটিয়া উঠিল। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি প্রতিকূল দৈবশক্তির নিষ্ঠুর নির্যাতন হইতে উদ্ভূত হয় নাই, ব্যক্তিসত্তার প্রবল সংগ্রামশীল রূপ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। উনিশ শতকের মুক্তিকামী জাতি শক্তিসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। সেই জন্য শক্তিশালী মানুষের কঠোর সংগ্রাম ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার কল্পনাকে বিশেষভাবে উল্লসিত করিয়াছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই ট্র্যাজেডির রূপই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। বাংলা নাটকও এই ট্র্যাজিক রূপই অবলম্বন করিয়াছিল। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সবপ্রথম বিষাদান্তক নাটক 'কীর্তিবিলাস'-এর নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন 'অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ শেক্‌সপীয়রনামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন,—'আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।' 'কীর্তিবিলাস'-এ এই ট্র্যাজেডির আনন্দের কথা বলা হইল, এই আনন্দ পরবর্তী বহু নাট্যকার তাঁহাদের নাটকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই জীবনের ট্র্যাজিক দিকের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা তীব্রতর যে দ্বন্দ্ব—সেই অন্তরদ্বর্ন্দ্বই বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। দুই বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানুষের মন যখন ক্ষতবিক্ষত তখনই তো মানুষের ট্র্যাজেডি সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক! এই ট্র্যাজেডি বাংলা নাটকের মধ্যে অনেক স্থানেই অত্যন্ত

নিষ্ঠার সহিত রূপায়িত হইয়াছে। ভীমসিংহ, সাজাহান, আলমগীর, বিক্রমদেব প্রভৃতি চরিত্র প্রবল ও শক্তিমান, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে এবং বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পারস্পরিক সংঘর্ষ তাহাদের চরিত্র সীমাহীন বেদনায় আলোড়িত। এই সংঘাত, সংঘর্ষ ও বেদনা শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট দান। বাংলা সাহিত্যে শেক্‌সপীয়রের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এইখানে—ট্র্যাজিক রসোপলব্ধিতে।

অবশ্য এ-কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির রূপ আমরা অবিকল আমাদের সাহিত্যে গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনরূপ, নীতি ও ধর্মের মূল্যবোধ, জলবায়ু ও মাটির বিশিষ্ট প্রভাব প্রভৃতির ফলে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিকে আমরা একটু রূপান্তরিত করিয়া একটু কোমলায়িত করিয়া বাঙালী জীবন-পরিবেশ ও চিত্তপ্রবণতার সঙ্গে সুসমঞ্জস করিয়া লইয়াছি। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু একটি অনিবার্য অঙ্গ। কিন্তু 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান', 'নুরজাহান', 'রাজা ও রানী', প্রভৃতি বহু নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতিতে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু ঘটে নাই। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের যে বলিষ্ঠতা ও সংগ্রামশীলতা দেখা যায়, বাংলা ট্র্যাজেডিতে তাহা খুব কমই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী', 'নুরজাহান' ও 'রাজা ও রানী'র মত সার্থক ট্র্যাজেডি বাংলা সাহিত্যে বেশি লেখা হয় নাই। বাংলা নাটকে নিরুপায় দুঃখভোগ ও নিরবচ্ছিন্ন কান্নার আতিশয্যই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। 'নীলদর্পণ', 'সরলা', 'প্রফুল্ল', প্রভৃতি নাটকের ট্র্যাজিক রূপ বাঙালী জীবনধারা এবং রসপ্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মৌলিক নাটকের সূচনা
(কীর্তিবিলাস-ভদ্রার্জুন)

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন'-এর বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইহারাই হইল বাংলা নাটকের আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবান্বিত পথিকৃৎ। দুর্বল হউক, দরিদ্র হউক, ইহারা যে অনুবাদের পরবশ্যতা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল তাহাই ইহাদের অসীম শক্তি ও অমেয় সম্পদ। এই দুইখানি নাটকই পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত। তৎকালে যে নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলি প্রায় সবই

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী লিখিত। স্থতরাং তৎকালীন প্রচলিত রীতি অতিক্রম করিয়া বিদেশী রীতিতে নাটক রচনার প্রচেষ্টা সাহসিক মৌলিকতা সন্দেহ নাই। বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ রূপ যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ অবলম্বন করিবে তাহার স্থচনা আমরা এই নাটক দুইখানির মধ্যে পাই।

কীর্তিবিলাস নাটক (১৮৫২)

প্রাথমিক নাটকগুলির মধ্যে 'কীর্তিবিলাস'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। তখনও বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। তৎকালীন লেখকবৃন্দ সংস্কৃত নাটকের রীতি নিজেদের অপূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে অক্ষমভাবে অনুবর্তন করিতেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিষাদান্তক নাটক নিষিদ্ধ বলিয়া এই নিষেধ ভাঙ্গিবার দুঃসাহস তখনও বাংলা নাটকে আসে নাই। সেই সময় লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত নাটকের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। প্রচলিত নাট্যধারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। নাটকের ভূমিকায় যে কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রাচ্য নাট্যরীতি বর্জন করিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি পোষণ করিয়াছেন। ভূমিকায় নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক যে অ্যারিস্টটলের Poetics পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার আলোচনা হইতে জানা যায়। ট্র্যাজেডি আমাদিগকে দুঃখে অভিভূত করিলেও ইহা আমাদের চিত্তে এক অনির্বাচ্য মহৎ অনুভূতি জাগ্রত করে। ট্র্যাজেডির এই আনন্দজনকতা সম্বন্ধে নাট্যকার বলিয়াছেন—

'অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ শেক্‌সপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

"আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।" [১]

যাঁহারা জীবনে মিলনের আনন্দই কেবল দেখেন, বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করেন না তাঁহারা জীবনকে অতি সামান্য ভাবেই বুঝিয়াছেন। মানুষের জীবনে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে, বোধ হয় অনেক বেশি পরিমাণেই আছে। এই দুঃখের সার্থক রূপায়ণ যাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে তিনিই তো সত্যিকার জীবন-রসিক ও সত্যদ্রষ্টা।[২] লেখকের মত উদ্ধৃত করা হইল—

'ভারতবর্ষীয় পূবতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়েরি ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।'

নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় আমরা পাইলাম। সেই আদর্শ তিনি তাঁহার নাটকে কতখানি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখন আমাদের বিচার্য। কিন্তু নাটকখানি পড়িলেই সকলেরই মনে হইবে যে, লেখক যত বড় পণ্ডিত ছিলেন তত বড় স্রষ্টা ছিলেন না। তাঁহার মন ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যও ছিল না। কারণ, ভূমিকায় যে সংস্কৃত নাটকের প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন, নাটকে বোধ হয় অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রতি আনুগত্য

১। ট্র্যাজেডি কেন আনন্দ দেয় সে সম্বন্ধে F. L. Lucas তাঁহার 'Tragedy' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। Lucas বলিয়াছেন, "So the essence of tragedy reduces itself to this—the pleasure we take in a rendering of life both serious and true. It must be serious, whether or not it has incidentally comic relief. It must seem to matter, or the experience would belong to a different category and need a different name. And it must also seem true, or it will not move us. It may be good for us, but that is not why we go to it……And, again tragedy may teach us to live more wisely, but that is not why we go to it, we go to have the experience, not to use it." —*Tragedy* by Lucas. p. 54-55

২। 'Life is a comedy to those that think but a tragedy to those that feel'.

দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য নাটকের ন্যায় 'কীর্তিবিলাস'ও পঞ্চাঙ্ক নাটক।[১] কিন্তু সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী আলোচ্য নাটকের গোড়ায় 'নান্দী' ও 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' রহিয়াছে। লেখকের ভাষা ও রচনারীতিও সংস্কৃতের ভাবে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে। নাটকের মধ্যে যে সব অলঙ্কার-সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ খেদোক্তি রহিয়াছে সেগুলি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।[২]

লেখকের গদ্যের মধ্যে যেমন আড়ম্বর পদ্যের মধ্যে আবার তেমনি চাপল্য। জায়গায় জায়গায় গুরু ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দ্বারা গুরু ভাব তো প্রকাশ পায় নাই, বরঞ্চ লঘু চাপল্যে ভাবের অধোগতি হইয়াছে। মরিবার সময়েও নায়িকা সৌদামিনীর মুখে পয়ারের ছড়া—

কামিনীর কোমল প্রাণে সহেনা যাতনা
যে জানে সে জানে কেমন প্রেমের লাঞ্ছনা।

এই কবিতা পাঠকের মনে মৃত্যুজনিত বেদনা উদ্রেক করিতে পারে কি? লেখকের পদ্য পয়ারের নিগড়ে বাঁধা, সুতরাং সেই পদ্যের মধ্য দিয়া কি করিয়া গভীর দুঃখময় ভাব প্রকাশ করা সম্ভব? তৎকালে যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে যে অলঙ্কার-পঙ্কিল মরানদার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল লেখকের রচনায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।[৩]

১ [illegible] গ্রন্থের অন্তর্গত [illegible] নামের [illegible] 'তড়িৎ' [illegible] নাম ব্যবহার করিয়া[illegible]

২ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, রাজপুত্র তাহার মৃত বধূর জন্য বিলাপ করিতেছেন—

'হায়! আমার প্রিয় বদন দেখিতে পাইব না! স্বপ্নের অগোচর। [illegible] দর্শন করিব তাহা— [illegible] বসন বার বার উন্মোচন হওয়াতে [illegible] অবলোকন করিতাম [illegible] গাত্রোত্থান করহ [illegible] উদ্বিগ্নচিত্তা [illegible] জাগরণপ্রায় [illegible] উন্মিষিত [illegible] হে প্রাণাধিকে, আমার পদ্মমুখি, হৃদয় প্রফুল্ল হইবে গাত্রোত্থান করহ, [illegible] অকাল নিদ্রাভাবে মগ্ন—গাত্রোত্থান করহ বিশেষ আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছি' ইত্যাদি রামচন্দ্র অথবা পুরূরবার বিলাপ বলিয়া মনে হয় না কি?

৩। যমক-অনুপ্রাসের বাহুল্য তৎকালে যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে দেখা যাইত, আলোচ্য নাটকেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে—

সই, রাখিব প্রাণ কেমনে।
দেশান্তরে থাকে কান্ত, সদা ভাবি মনে মনে॥
নিষ্ঠুর নিদয় কান্ত, আসিবে না একান্ত, হইল মোর প্রাণান্ত, যাতনা সহে না প্রাণে।

সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার-কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শীত-বসন্তের রূপকথায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়-বসন্তের কাহিনী লইয়া বহু যাত্রা ও নাটক লেখা হইয়াছে, অমৃতলাল বসুর নাটকখানি তন্মধ্যে প্রধান। আলোচ্য নাটকেও কুৎসিত সপত্নী-পুত্র-বিদ্বেষ এবং তাহারই নিষ্ঠুর পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক ট্র্যাজেডি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেজন্য নাটকের শেষে সুলভ মিলন এবং গতানুগতিক ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়-দৃশ্য দেখান নাই। তথাপি ইহা না বলিয়া উপায় নাই যে, নাট্যকার দুঃখময় বিষয়বস্তু সুনিপুণভাবে ব্যবহার ও বিন্যাস করিয়া ইহাকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করিতে পারেন নাই। বিষাদান্তক পরিণতি মাত্রই আমাদের মন অভিভূত করিতে পারে না। এই পরিণতি সম্ভাব্য কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অনিবার্য হইয়া উঠিলেই ইহা আমাদের অন্তর দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আলোচ্য নাটকের কার্য-কারণের শৃঙ্খলা নাই, ঘটনাসূত্রের সংলগ্নতা কিংবা ক্রমবিবর্তন-শীলতা নাই। রাজপুত্রের প্রতি রাজমহিষীর বিদ্বেষভাব এমনভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই যাহাতে মহিষী সপত্নী-পুত্রের প্রতি ভয়ঙ্কর অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে চাহিবে। লালসাময়ী মহিষীর প্রণয়-লালসা দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রাণনাথের প্রতি, রাজপুত্রের প্রতি নহে। সুতরাং রাজপুত্রের পক্ষ হইতে কোনো প্রত্যাখান অথবা অপমান এবং তজ্জনিত প্রতিহিংসা-বৃত্তির স্ফুরণের কোনো কারণই ঘটে নাই। সেজন্য তাহার পক্ষে রাজপুত্রের জীবননাশের এতখানি হিংস্র আয়োজন অকারণ ও অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই আয়োজনেরও কোনো পরিণতি নাই। কারণ পরিশেষে অনুতপ্ত মহারাজ মৃত্যুশয্যায় রাজকুমারের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন (কি ভাবে তাঁহার সন্দেহের নিরসন ঘটিল এবং তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন তাহা অবশ্য নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই)। ইহার পরে রাজপুত্রবধূ ও রাজপুত্রের মৃত্যুও অনেকটা অকারণ ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুত্রের দ্বারা প্রাণনাথের হত্যাও এ রকম নিতান্ত অহেতুক ও বিসদৃশ ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণনাথকে বার বার অত্যন্ত নীচাশয় ও দুষ্কর্মকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু লাম্পট্যদোষ ব্যতীত তাহার আর কোনো অনিষ্টকারিতা নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহাকে হত্যা করাতে রাজপুত্রের চরিত্রের কোনো বীরত্ব কিংবা গৌরবের প্রকাশ হয় নাই।

ভদ্রার্জুন (১৮৫২)

'ভদ্রার্জুন' শুধু প্রথম নাটক নহে, ইহা প্রথম সার্থক নাটক। ইহার পরে বহু নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নাটক নহে, সংলাপ-যুক্ত রচনা মাত্র। কিন্তু 'ভদ্রার্জুন' সে ধরনের নাটক নহে। কাহিনীর সুসংহত ক্রিয়াশীল গতি, নাটকীয় কৌতূহল ও আবেগের সঞ্চার এবং সংলাপের আড়ম্বরহীন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ইহা প্রকৃতই নাট্যপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তিনি ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।[১] 'ভদ্রার্জুন'-এর পরে বহু নাট্যকার পাশ্চাত্য নাট্যপ্রথা অনুসরণ করিয়া নাট্য-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহাদের অনেকেই (এমন কি স্বয়ং মাইকেল পর্যন্ত) বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই সংলাপ ও আঙ্গিকে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তারাচরণ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য নাটকের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয়। লেখক পাশ্চাত্য প্রথা-অনুযায়ী তাঁহার নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্ক আবার কয়টি দৃশ্যে (লেখক দৃশ্যের স্থলে 'সংযোগস্থল' নামটি ব্যবহার করিয়াছেন) বিভক্ত করিয়াছেন। নাটকের একটি 'আভাস' (প্রস্তাবনা—Prologue) রহিয়াছে। নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। গদ্য সাধু ভাষায় রচিত হইলেও খুবই সরল ও উপযোগী। পদ্যরচনা পয়ার ও ত্রিপদীতে বিভক্ত। বাংলা মহাভারতের পদ্যের সহিত ইহার মিল আছে। জায়গায় জায়গায় যোটকের ন্যায় বিভিন্ন চরিত্রের কথার মধ্যে অন্ত্য মিল লক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

> বসুদেব—এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
> রোহিণী—তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥
> বসু—আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
> রোহি—রহস্যে নাহিকো কাম যাও মেনে চল॥
> বসু—কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
> রোহি—তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥

১। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইয়োরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মে অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথা—প্রথমে নান্দী তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি।

বসু—তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি—তোমারে কি দিব দোষ আমাদেরি ভ্রম॥
বসু—ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি—সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু—সকলের ক্লেশ আমি দেখি সম ভাবে।
রোহি—তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥
বসু—আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই॥
—(২য় অঙ্ক, ১ম সংযোগস্থল)

কবিগানের যমক-অনুপ্রাস ও শ্লেষপ্রিয়তার প্রভাবও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। নাটকের কাহিনী দ্রুত-ঘটমান ঘটনারাশির মধ্য দিয়া বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়া এক ঘনীভূত রস-চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়াছে। অসংলগ্ন ও অবান্তর ঘটনার উত্তাপে সেই রস ফিকে হইতে পারে নাই। প্রথম অঙ্কে যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং তাঁহারই কূট চক্রান্তে অর্জুনের বার বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ। দ্বিতীয় অঙ্কে সুভদ্রার বিবাহের উদ্‌যোগ এবং বলরাম কর্তৃক দুর্যোধনের সহিত ভগ্নীর বিবাহের আয়োজন। তৃতীয় অঙ্কে প্রভাসতীর্থে অর্জুনের আগমন, সুভদ্রা ও অর্জুনের পারস্পরিক পূর্বরাগ এবং সত্যভামার সহায়তায় গান্ধর্ব বিবাহ। চতুর্থ অঙ্কে নারদ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া দুর্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় যাত্রা। পঞ্চম অঙ্কে সুভদ্রাহরণ, কৌরবদের অপমান এবং বলরামের ক্ষোভ। নাট্যকার যে পরিশেষে চিরাচরিত প্রথা-অনুযায়ী সকলের মধ্যেই একটা সুলভ মিলন ঘটাইয়া দিলেন না, অভিমানক্ষুব্ধ বলরামের অসন্তুষ্ট অনুযোগবাক্যের একটা প্রদাহ রাখিয়া গেলেন, ইহাতে তাঁহার নাটক প্রাণময় বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেও লেখক বাংলার স্বভাবধর্মের তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে আধুনিক বাঙালী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের দুশ্চিন্তা, অন্তঃপুরিকাদের প্রবাদ-সংস্কারাশ্রিত আলাপ, বিবাহের প্রথা ও স্ত্রী-আচার ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালীসমাজের বাস্তব পরিবেশ নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা পাঠক ও দর্শকের কাছে অত্যন্ত আগ্রহ ও আমোদপ্রদ হইতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই।

প্রথম অঙ্ক

বাংলা নাটকের আদি পর্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইবার পর বাংলা নাটক যখন আত্মপ্রকাশ করিল, তখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মনের কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাহার কথাবার্তা, হাবভাব সব ছিল নিষ্প্রাণ পুত্তলিকার মত—সে চালিত হইত এক অদৃশ্য-হস্তধৃত রজ্জুদ্বারা। সে হস্ত হয় কালিদাসের আর না হয় শেক্‌সপীয়রের। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহার মনে এই শুভবুদ্ধির উদয় হইল যে, দেহের মধ্যে যে প্রাণটি থাকে সেই প্রাণটি যদি নিজের না হয় তবে দেহের কান্তি ফোটে না, আয়ুও বাড়ে না। সেজন্য নিজের প্রাণের সন্ধান করিতে সে প্রবৃত্ত হইল।

যেদিন অনুবর্তনের সোজা রাস্তাটি পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির জটিল পথে চলিতে বাংলা নাটক আরম্ভ করিল সেদিন হইতে সমাজের ভাববিপ্লব তাহার অন্তর্দেশ আলোড়িত করিয়া তুলিল। সমাজের বিভিন্ন প্রকার জাগ্রত মানস-চেতনার গতি ও সংঘাত বাংলা নাটকে রূপায়িত হইয়া উঠিল। নাটকের মধ্যে যে চেতনা মূর্ত হইতে লাগিল তাহার স্বরূপ জানিতে গেলে তৎকালীন বাংলার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলার সমাজের নবজন্ম হইতেছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার পুরাতন নির্মোক খসিয়া পড়িতেছিল এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে এক নব-বলদৃপ্ত জাতক আত্মপ্রকাশ করিতেছিল—হাতে তাহার বিদ্রোহের শাণিত তলোয়ার এবং দৃষ্টি অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। প্রাচীন-বিলাসী সাবধানীর দল তাহার গতি রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কারণ স্বল্পকালের মধ্যেই সীমিত অনল দাবানলের আকার ধারণ করিয়াছিল। মেকলে ও বেণ্টিঙ্কের যুগ্ম চেষ্টায় ইংরাজি শিক্ষা এদেশে মূল প্রোথিত করিল। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার তাহার মূলে জলসিঞ্চন করিলেন। হিন্দু কলেজ হইতে স্বাধীন চিন্তার ধারা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল—নবযুগের সক্রেটিস হইয়া উঠিলেন ডিরোজিও। ডিরোজিওর শিষ্যগণ আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন, আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া দিলেন প্রাচীন সমাজের বুকে। সমাজের আর্তনাদ

তাহাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিল না। এদিকে রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মধর্ম প্রাচীন ধর্মের মাঝে আনিয়া দিল প্রবল বিক্ষোভ। ব্রাহ্মরা শুধু ধর্মের মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না। সমাজের দূষিত ব্যাধিসমূহ দূর করিবার জন্য তাহার বুকেও ছুরি চালাইলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একজন মহাপুরুষ সমাজের কর্ণধার হইলেন, হাতে তাঁহার বজ্রের শক্তি এবং বুকে মত্ত হস্তীর বল। তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল সমাজের সম্মিলিত প্রবল শক্তি, কিন্তু সেই শক্তি নস্যাৎ করিয়া নিজের একেশ্বর সংগ্রাম তিনি জয়যুক্ত করিলেন—বিধবা-বিবাহ আইন পাস হইল এবং বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে সমাজের জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিল।

বাংলার রাজনৈতিক গগনও ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুন নির্বাপিত হইল বটে, কিন্তু আগুন লাগিয়াছিল সমাজের অন্তরতম প্রদেশে। সেই অগ্নিজ্বালায় পরাধীন সমাজ ফোঁসাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়েই বাংলার এক প্রান্তে প্রথম গণ-উত্থান দেখা দিল। দরিদ্র, উপায়হীন কৃষকগণ এতকাল নীলকরদের হাতে যে কোড়ার আঘাত পাইতেছিল, অত্যাচারের চরম সীমায় আসিয়া একদিন তাহারা উদ্যত মুষ্টিতে সেই কোড়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহা ঘুরাইয়া অত্যাচারীর পৃষ্ঠদেশে উত্তোলন করিল। সেদিন সর্বহারার দল বিপ্লবের প্রথম অগ্নিদীক্ষা লাভ করিল।

বাংলার সমাজধর্ম ও রাজনীতির এই ভাববিপ্লুত অবস্থায় প্রথম যুগের বাঙালী নাট্যকারদের আবির্ভাব। সমাজের নবজাগ্রত ভাবতরঙ্গ অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের নাটকের মধ্যে সংক্রামিত হইল। যাঁহারা নবীন ভাব-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের শক্তিসামর্থ্যও খুব বেশি ছিল না। সেজন্য তাঁহাদের লিখিত নাটক পরবর্তীকালে তাঁহাদের পরিচয় বহন করিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা ছিলেন সংস্কার ও প্রগতির ধারক তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সেদিন উড্ডীন হইল, তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত শেল সমাজের বুকে প্রবেশ করিল।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ছিল তৎকালে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবশালী—প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই বিধবা-বিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হইলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ নাটক' করুণরসে সমাজের পাষাণ-হৃদয় গলাইতে চাহিল। 'চপলাচিত্ত-চাপল্য'-এর

মধ্যে লেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমস্যার উপর একেবারে যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। দুঃসাহস বটে! পঁচাত্তর বৎসর পরে শরৎচন্দ্রও এতখানি সাহস দেখাইতে পারেন নাই। সমস্যাটির বিপজ্জনক সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করিলেন শিমুয়েল পিরবক্স তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ নাটক'-এ। মনোমোহন বসুর ন্যায় প্রাচীনপন্থী নাট্যকারও বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার 'আনন্দময় নাটক'-এ ইহার সাক্ষ্য মিলিবে।

বহু-বিবাহ ও সপত্নী-সমস্যা লইয়া তৎকালে অনেকগুলি নাটক লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে ছিল করুণ রসের আবেদন এবং অপরগুলিতে ছিল কৌতুকরসের আঘাত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষাদান্ত নাটক 'কীর্তিবিলাস' এই সমস্যা লইয়াই লিখিত। 'নব-নাটক'-এ নাটুকে রামনারায়ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গব্যঙ্গের আসর ছাড়িয়া দুঃখ-বেদনার দরিয়ায় হাবুডুবু খাইয়াছেন। তবে তিনি হাসির বুঁদ ছাড়িয়াছেন 'উভয়-সঙ্কট'-এ। মনোমোহন বসু তাঁহার 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকে সপত্নী-বিদ্বেষের এক ভীষণ পরিণতি দেখাইয়াছেন, অবশ্য সমস্যার ভীষণতা দেখাইতে যাইয়া নাটকের নাটকত্ব যে তিনি অনেক ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সপত্নী-সমস্যার সরসতম বর্ণনা পাই আমরা তৎকালের সবশ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটক 'জামাই বারিক'-এ। আজও পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা অধিকতর হাস্যরসাত্মক নাটক বোধ হয় লেখা হয় নাই।

শিক্ষিত জনমত একদিকে যেমন বিধবা-বিবাহের প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি বাল্য-বিবাহের দিকে প্রতিকূল হইয়া পড়িতেছিল। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক'-এ। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক, রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ' নাটকের নামও উল্লেখযোগ্য। কুলীন রামনারায়ণ আঘাত করিলেন কৌলীন্যপ্রথাকে। রামনারায়ণ শিখাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিখাতে বাঁধা ছিল বিদ্যুৎ। কৌলীন্যপ্রথার দোষ উল্লিখিত হইয়াছে বিচ্ছিন্নভাবে আ.. একটি প্রহসনে, তাহার নাম 'কলিকৌতুক নাটক'।

প্রাচীন ধনশালী, প্রভুত্বকামী সমাজের বিকৃতি ও ব্যাধি অনেক নাট্যকারের নির্মম খোঁচায় বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সম্মান ও সম্পত্তির সুযোগ লইয়া যাহারা ইন্দ্রিয়-বিলাসে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা শাস্তি

পাইল অনেক নাট্যকারের হাতে। রামনারায়ণ 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নামক প্রহসন দুইখানির মধ্যে কৌতুকের আঘাতে লাম্পট্য-দোষ শোধন করিতে চাহিলেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর মধ্যেও মাইকেল ব্যঙ্গের চাবুক চালাইলেন। তবে এবিষয়েও সেরা শিল্পী হইলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার জলধর ও রাজীবলোচন বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

অনেক নাট্যকার নব্যভাবাপন্ন আদর্শবাদী চরিত্র অঙ্কন করিলেন। তবে মজার ব্যাপার এই যে, তাঁহারা যাহাদের নিন্দা করিলেন তাহারা হইল জীবন্ত আর যাহাদের প্রশংসা করিতে চাহিলেন তাহারা হইয়া পড়িল কৃত্রিম পুত্তলিকা। স্বয়ং দীনবন্ধু পর্যন্ত শিক্ষিত, আলোকপন্থী চরিত্রকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার ললিত ও লীলাবতী নিষ্প্রাণ আদর্শের প্রতীক মাত্র। 'নবনাটক'-এর সুবোধ ও সুধীরও নীতিকথার শুষ্ক বাণ্ডিল মাত্র, নাটকীয় সরস চরিত্র নহে। 'প্রণয় পরীক্ষা'র শান্তশীল এবং সরলাও অনেক ভালো ভালো করুণ কথা বলিয়াছে বটে, তবে রক্তমাংসের স্বাভাবিক মূর্তি হইতে পারে নাই।

প্রাচীন সমাজের বিকৃতি নাট্যকারদের হাতে কঠোর আঘাত পাইলেও নব্য সমাজের অধোগতিও যে একেবারে নিস্তার পাইয়াছে তাহা নহে। ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়গুলিকে সংযত করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সর্বপ্রথম আগাইয়া আসিলেন ইয়ংবেঙ্গলের সর্বপ্রধান পাণ্ডা মাইকেল মধুসূদন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে বোধ হয় তিনি আত্মঘাতী হইতে চাহিলেন। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকই এরূপ নির্দয়ভাবে আত্ম-সমালোচনা করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়েও পুনরায় পুরস্কার দিতে হয় দীনবন্ধুকে। তাঁহার 'সধবার একাদশী' কমেডি না ট্র্যাজেডি? বলা শক্ত। তবে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নাটক বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হইয়াছে কিনা জানি না।

রাজনৈতিক চেতনা তখনও ব্যাপকভাবে নাটকে রূপায়িত হইতে পারে নাই। তবে তখন এমন একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল যাহা সুদূর ভবিষ্যতের দিক্‌নির্দেশ করিয়াছিল। একখানি নাটকে যে এতখানি সমাজ-বিপ্লব জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা পূর্বে ও পরে কখনও আমরা দেখি নাই। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এর মধ্যে গণবিদ্রোহের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করিলেন। সেই ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়া শোষিত, মুক্তিকামী জনগণকে উদ্দীপিত

করিয়া তুলিল। তাহারা অত্যাচারের অমানিশার পরে পূর্বপ্রান্তে আশার রক্তিম লিখা দেখিতে পাইল।

প্রথম গর্ভাঙ্ক (ক)

সামাজিক নক্সা নাটক

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা লইয়া অনেক নাটক রচিত হইয়াছিল। বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, দুশ্চরিত্রতা এই সমস্যাগুলিই প্রধানত তৎকালীন নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং নবজাগ্রত সংস্কার-প্রেষণার দ্বারা যে তাঁহারা চালিত হইয়াছিলেন, সেই পরিচয় তাহাদের নাটকের মধ্যে সুচিহ্নিত। বস্তুত নাট্যশিল্প অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যই যে তাঁহাদের মনে অধিকতর প্রবল ছিল তাহার প্রমাণ অতি সহজেই তাঁহাদের যে কোনো নাটকে মিলিবে। কারণ প্রায় সব নাটকেই নাটকীয় সংঘাত ও চরিত্র-সৃষ্টি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ সামাজিক তত্ত্ব ও মতবাদই অত্যধিক আতিশয্য লাভ করিয়াছে। এই সব নাটকের প্রচার ও প্রভাব বেশি ছিল না, আজ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতির অবিসংবাদী সাক্ষী। আজিকার প্রগতি-সাহিত্যের মূল ইহাদের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সব নাটকের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নবীনত্ব থাকিলেও ইহাদের শিল্পরীতি ও রচনাভঙ্গি প্রাচীনত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে নাই। নান্দী-সূত্রধার-নটী ইত্যাদির মধ্য দিয়া অধিকাংশ নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ এবং সংলাপের দীর্ঘতা ও উচ্ছ্বাসময়তা প্রভৃতির দিক দিয়াও ইহারা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। তবে সমস্যার বিষাদময়তা দেখাইবার জন্য নাট্যকারগণ অনেকগুলি নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক করিয়া তুলিয়াছেন। 'বিধবা-বিবাহ নাটক', 'সপত্নী নাটক', 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' প্রভৃতি নাটকের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে হইবে। সংস্কৃত নাটকের মিলনাত্মক পরিণতির সহিত এই সব নাটকের পরিণতির কোনো মিল নাই। এই সব নাটকের ঘটনাস্থল পল্লীগ্রাম। সেজন্য দৃশ্যভূমি ও চরিত্রগুলির মধ্যে বাংলার খাঁটি পল্লীরস সঞ্চারিত হইয়াছে। কলিকাতার নাগর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ইহাদের মধ্যে আসে নাই। পরবর্তী কালে সামাজিক নাটকের পরিবেশ প্রধানত কলিকাতার

সমাজকেই অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অবশ্য দীনবন্ধুর পরবর্তী সামাজিক নাটকের কথাই আমি বলিতেছি। পল্লীর পুকুরঘাট, ছায়াঢাকা পথ, কামিনীকণ্ঠ-কলিত অন্তঃপুর ও তাম্রকূট-ধূমাচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপের দৃশ্য দ্বারা এমন একটি অকৃত্রিম পরিবেশ এই নাটকগুলির মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বাংলা নাটকে আমরা বেশি দেখি নাই। এই নক্সা নাটক-গুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে বিষাদ-গম্ভীর করুণ রস অপেক্ষা লঘু চপল হাস্যরসই অধিক স্বভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, তৎকালীন নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। করুণ রসাত্মক গম্ভীর দৃশ্য অঙ্কন করিতে যাইয়া নাট্যকারগণ তাঁহাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীকে এমন আড়ষ্ট ও ভাবগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেন যে, তাহার ফলে নাটকের প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কিন্তু লঘু ও হাল্কা ভাবের অবতারণায় তাঁহারা অতখানি মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতেন না বলিয়াই তাহা সরস প্রাণবত্তায় এমন স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

নিম্নে কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করা গেল। দুইখানি প্রসিদ্ধ নাটক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহাদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

॥ কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮)॥ বিভিন্ন যুগে কলি ও তাহার সঙ্গীদের পাপপ্রভাবে পৃথিবীর যে কিরূপ অবনতি ও দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহাই নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে পরীক্ষিতের কাহিনী। দ্বিতীয় অঙ্কে বুদ্ধের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিদ্রোহ। তৃতীয় অঙ্কে কামদেবের সবময় প্রভাব। চতুর্থ অঙ্কে আদিশূরের কাহিনী ও বল্লালের জন্মবৃত্তান্ত। কৌলীন্য প্রথার প্রচারও ইহাতে রহিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে শ্রীচৈতন্যদেবের বৃত্তান্ত, ম্লেচ্ছপ্রভাব ও পাশ্চাত্যগামী যুবকসমাজের বিকৃতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আদ্যোপান্ত কলি ও তাহার সহকারীদের কু-প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের গোড়ায় সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু বই-এর ভাষার মধ্যে সচল স্বাভাবিক কথ্যভাষার প্রাধান্য রহিয়াছে। Mystery ও Miracle Play-র ন্যায় কলি, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ঘটনার সঙ্গতি ও সংলগ্নতা মোটেই নাই। দীর্ঘ পয়ারের দৌরাত্ম্য এখানেও আছে।

॥ চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা (১৮৫৮)॥ এক মদখোর, এক আফিংখোর, এক গুলিখোর ও এক গাঁজাখোর এই চার নেশাখোর ইয়ারের দুর্গতি আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে অনুতপ্ত ও দুর্দশাপন্ন ইয়ারগণ বৃন্দাবন

গমন করিয়া সৎভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহা নাট্যকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে, সেজন্য নাটকের নাম অর্থহীন। সংস্কৃত রীতিতে নাটকের আরম্ভ, পয়ার ও ত্রিপদীর বানে নাট্যসংঘাত ভাসিয়া গিয়াছে। ঘটক গৌরদাস বাবাজীর চরিত্র সর্বাপেক্ষা জীবন্ত।

॥ সপত্নী নাটক (১৮৫৮)॥ কৌলীন্যপ্রথা ও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য নাটকে ঘটনাবিন্যাস ও নাটকীয় সংহতি কিছুই নাই। পয়ারেব দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘ খেদোক্তির বাহুল্য ইহাকে অত্যন্ত একঘেযে ও ক্লান্তিকর করিয়া তুলিয়াছে। তবে একথা সত্য যে, নাট্যকাব একশত বৎসর পূর্বেকার বাঙালী পরিবারজীবনের সমস্যা আমাদেব চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। নায়িকা সৌদামিনী বাংলা-সমাজের চিরলাঞ্ছিত গৃহ-বধূর একটি নিখুঁত বেদনা-করুণ চিত্র। স্বামীকে বুকভরা ভালবাসা দান করিয়া সে বিনিময়ে পাইল সপত্নী-যন্ত্রণা। ধর্মসাধনা করিতে যাইয়া সে দেখিল, গুরুভক্তিব মন্ত্র অপেক্ষা প্রেমের তন্ত্র শিক্ষা দিতে গুরু অধিক উৎসুক। তারপব জটিলা কুটিলার ন্যায় শাশুড়ী ননদিনীব নিত্য অত্যাচার তো আছেই। তাহার ভাগ্যহীন জীবনেব এই নিরুপায় নির্বাক বেদনা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

॥ বিধবা বিরহ নাটক—শিমূয়েল পিরবক্স (১৮৬০)॥ নাটকেব নায়িকা মনোমোহিনী যুবতী বিধবা। অনঙ্গেব শরাঘাতে তাহাব হৃদয় জর্জরিত, অথচ চারিদিকে নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তাহার পিতা অতিবৃদ্ধ হইয়াও একটিব পর একটি নারীব সর্বনাশ কবিতেছেন, কিন্তু সমাজেব বিধান সেখানে সহিষ্ণু। আর যত বাধা-নিষেধ কি বিধবাদের বেলাতেই? মনোমোহিনী বেশিদিন আব নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। একদিন তাহার শূন্য হৃদয়েব দ্বারে শ্যামেব বাঁশি বাজিয়া উঠিল। হাড়ীর ছেলে—কিন্তু হাড়ী, ডোম বিচার করিবার ক্ষমতা এখন তাহার নাই। বামা নামক নষ্টচরিত্রা ঝিয়ের দ্বাবা সে তাহার প্রেমাস্পদ নঙ্গরাব সহিত মিলিত হইল। সুন্দরের মতই নঙ্গরা গোপনে মনোমোহিনীর ঘরে আসিয়া প্রেমের লীলা চালাইল। অবশেষে মনোমোহিনী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া নঙ্গরার সহিত গৃহত্যাগ করে। দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া তাহার পিতা-মাতাও ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় পিতা একখানি লিপি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া যান। তাহাতে লেখা ছিল, 'হে দেববংশ হিন্দুলোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক, এইজন্য তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি কুল শীল জাতি

মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয়' এমন চেষ্টা কর।'

বিধবা-বিবাহের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া নাটকখানি রচিত বলিয়া সমস্যার বীভৎস বাস্তবতার দিকটি নাট্যকার অসঙ্কোচে উন্মোচন করিতে চাহিয়াছেন। সেজন্য রুচির দিকে চাহিয়া তিনি কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অথবা সহনীয় কাহিনীর অবতারণা করিতে চাহেন নাই। সমাজের নিষ্ঠুর বিধানের ফলে তাহার তলায় তলায় দুর্নীতি ও বিকৃতির পঙ্ক কিভাবে জমিয়া উঠিতেছে তাহাই তিনি দুঃসহ বাস্তব চিত্রের মধ্যে দেখাইয়াছেন।

॥ বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০)॥ শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' বাল্যবিবাহের অশেষ কুফল প্রদর্শনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত।[১] কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে উৎকট হইয়া উঠে সেখানে শিল্পের বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক। আলোচ্য নাটকেও সেই বিকৃতি আমরা লক্ষ্য করি। সুধীর চরিত্রটি সম্ভবত নাট্যকারের মুখপাত্র। দীর্ঘ খেদোক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া তাহার দ্বারা নাটকীয় কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুত সুধীর ও ধনহীন মহদাশয় এই দুইটি চরিত্রের মুখে বাল্যবিবাহের যে সব দোষ ও দুঃখ উল্লিখিত হইতে দেখা যায়, নাটকের কাহিনীর মধ্য দিয়া সেগুলির কোনো সার্থক রূপায়ণ হয় নাই। বিদ্যাহীনের বিষভক্ষণ এবং বলহীন ও গোপালের মৃত্যু ঘটাইয়া নাট্যকার নাটকে যে বিষাদাত্মক সুর আনিয়াছেন তাহা বাল্যবিবাহেরই অনিবার্য পরিণাম মনে করা সত্যই শক্ত। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির নামকরণ খুবই কৌতুকাবহ। নামের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আভাসিত হইয়াছে; যথা, বলহীন ধনাঢ্য, স্বার্থপর ঢোল, অজনস্পৃহ ভট্টাচার্য, লজ্জাহীন স্ত্রৈণ, রঙ্গীণী, চতুরা, বিলাসিনী ইত্যাদি। এরূপ নামকরণ সুস্পষ্টরূপে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর প্রভাব সূচনা করিতেছে।[২]

॥ বাল্যবিবাহের—রামচন্দ্র দত্ত॥ প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে যে সমাজ-সংস্কার-মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল আলোচ্য নাটক তাহারই একটি স্মারকমাত্র। বাল্যবিবাহের কুফল দেখাইবার জন্যই বোধ হয় নাটকখানি

১। নাট্যকারের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'এক্ষণে বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎও যদিস্যাৎ এই নাটকে কীর্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব।' 'বিজ্ঞাপন'।

২। 'নাটকের একস্থলে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর উল্লেখ আছে —'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রসাদে এ বিষয় জ্ঞাত হোতেও আবাল-বৃদ্ধ কেহই বাকি নাই।'—পৃঃ ৪৭।

লিখিয়াছেন এবং ইহার বিষাদাত্মক পরিণতি দেখাইয়া তিনি সম্ভবত সমস্যার আঘাতে আমাদের হৃদয়কে বিচলিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু অন্য একটি ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-ঘরে স্বামী ও শাশুড়ী দ্বারা নিগৃহীতা বধূর প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি এমনই প্রবল ছিল যে, তাহার আচরণের বিসদৃশতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সেজন্যই ভূষণের সহিত বিবাহিতা বধূ সরলার অবৈধ প্রণয় তাহার কাছে অপরিমিত প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। বস্তুত সরলার নিরুপায় দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহার দুর্দম প্রণয় কোনো সামাজিক বাধার ফলে দ্বন্দ্ব-জটিল নয়, ইহা বাধা-বন্ধহীন রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে তরল। সরলার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হইল সাংসারিক দুঃখ-নির্যাতন ভোগের ফলে নয়, রোমান্টিক প্রণয়-সুলভ ভ্রান্তিবশত। সুতরাং তাহার মৃত্যু বাঙালী বধূর করুণ সমস্যা আমাদের মনে জাগরূক করে না, ইহা চিরন্তন প্রণয়-বিষাদিনী জুলিয়েটের সমস্যাই উপস্থাপিত করে। তবে যেভাবে এই মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে তাহা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি হাস্যকর। নাট্যকারের বিষাদাত্মক পরিণাম একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নাটকের মধ্যে ইতরামি, মাতলামি, হিন্দী-বাত ও ইংরাজ বকুনি অনেক কিছু পাঁচ মিশালি উপাদান রহিয়াছে, তবে সেগুলি নাটকখানিকে কেবল উদ্দেশ্যহীন করিয়াছে, সরস করিতে পারে নাই।

॥ চপলাচিত্ত-চাপল্য—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৬১) ॥ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল আলোচ্য নাটক তাহাদের অন্যতম। বিধবা চপলার চিত্ত-চাপল্য এবং পরিশেষে বিবাহে সেই চাপল্যের সমাধান,—ইহাই নাটকের বিষয়বস্তু। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন যে সমাজের মধ্যে সহৃদয় লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে কতখানি সমর্থ হইয়াছিল এই নাটকে তাহার কিছু প্রমাণ মিলিবে। কিন্তু নাটকটিতে বৈধব্য-জীবনের দুঃখময় সমস্যার বেদনা অপেক্ষা বিধবার অনুরাগ বর্ণনাতেই অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এজন্য করুণ রস অপেক্ষা আদি রসই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নাটকটি ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। প্রত্যেক অঙ্কের অন্তর্গত ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রী সমাবেশের মধ্যে সঙ্গতি নাই। চপলা ও চারুচন্দ্রের প্রেম আদ্যন্ত স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই কৌশল অনাটকীয় কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।[১]

১। 'চপলাচিত্ত-চাপল্য' নামে মাত্র নাটক, পদ্য বর্চযিতার হাতে পড়িয়া ইহার নাট্যশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।' —দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃঃ ৩২।

গদ্য সংলাপের মধ্যে ঠিক গুরুত্বপূর্ণ স্থলে হঠাৎ লঘু পয়ার অথবা ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা করিয়া নাট্যকার ঘনীভূত ভাবগাম্ভীর্য নিতান্ত তরল করিয়া ফেলিয়াছেন। সমসাময়িক বহু সামাজিক নাটকের ন্যায় এই নাটকটিও স্ত্রী-প্রধান (পাত্রপাত্রীদের মধ্যেও আট জন পুরুষ ও এগার জন স্ত্রী)। এই সব স্ত্রী-চরিত্রের কথাবার্তা এখন অনেক স্থলেই গ্রাম্য ও অশ্লীল বোধ হইবে কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া যে তৎকালীন অন্তঃপুররমণীদের স্বভাব ও প্রকৃতি অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ-চিত্র হিসাবে নাটকটির মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

॥ বুঝলে কিনা (১৮৭৩)॥ আলোচ্য প্রহসনখানির রচয়িতা কে সে বিষয়ে মতভেদ আছে।[১] অর্থশালী, কুক্রিয়াসক্ত সমাজপতির ব্যঙ্গচিত্র তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাটকে পাওয়া যায়। মধুসূদনের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি নাটকে এরকম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রহসনেও অটলকৃষ্ণ বসু নামক এক দলপতির আসল চরিত্র অতি নির্মমরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নবীন ও প্রাচীনের সংঘর্ষে নাট্যকার স্পষ্টতই নবীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সহানুভূতির পাত্র নিরুপায় যুবক নীলাম্বর আর তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য লম্পট, মদ্যপায়ী, হৃদয়হীন সমাজপতি ও নীচ, কুখাদ্যলোভী স্তাবক ব্রাহ্মণ। অটলকৃষ্ণের শাস্তি, দীনবন্ধুর জলধর-চরিত্রের অনুরূপ পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রহসনের শেষ দিকে দর্পনারায়ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালঙ্কারের ছদ্মবেশে অটলের সহিত কথা বলিয়া গেল অথচ তাহার কণ্ঠ অটল বিন্দুমাত্র ধরিতে পারিল না, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয়।

মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান লইয়া এ সময় কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। বাঙালী হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারে প্রধান অংশ মেয়েদের। বর ও বধূকে কেন্দ্র করিয়া, আবহমানকাল ধরিয়া তাহাদের যে আমোদ-অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে তাহার ধারা এই প্রগতি-গর্বী আধুনিক কালেও একেবারে

১। প্রহসনখানি সাধারণত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নামে প্রচলিত। কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহা আসলে রামনারায়ণের রচনা।

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, প্রহসনখানির রচয়িতা প্রিয়মাধব বসু।

দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃঃ ৪৯।

লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তবে আজ এই সব অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে না বলিয়াই সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাদের কোনো স্থান নাই। কিন্তু একদিন যখন ইহারা সমাজের অবশ্য-পালনীয় অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হইত তখন সাহিত্যের আসরেও ইহারা একেবারে অপাংক্তেয় ছিল না। অবশ্য যেসব নাটকে ইহাদের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের নাট্যমূল্য কমই। তবে সমাজ-চিত্ররূপে সেই সব নাটকের পরিচয় জানা আবশ্যক বোধ হইতে পারে। এই নাটকগুলির মধ্য হইতে দুইখানি নাটকের আলোচনা আমরা করিব।

প্রথম নাটকখানি হইল শ্যামাচরণ দের 'বাসর কৌতুক নাটক' (১৮৫৯)। নাটকখানি ক্ষুদ্র, বাসরঘরে বর ও রঙ্গরসিকা কামিনীদের রসালো উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়াই ইহা রচিত। বাসরঘরের চিত্ররূপে নাটকখানি সম্পূর্ণ বাস্তব। মেয়েদের রসিকতার বাক্য ও ভঙ্গি নাট্যকার অবিকল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ছড়াজাতীয় গান প্রাচীন রসিকতার অঙ্গ ছিল, সেই ধরনের বহু গান আলোচ্য নাটকে রহিয়াছে। বর ও বরাঙ্গনাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে যে চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ উপভোগ্য।

দ্বিতীয় নাটকখানির নাম 'পুনর্বিবাহ নাটক' (১৮৬২)—লেখক গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বে বাল্যবয়সে মেয়েদের বিবাহ হইত বলিয়া পুনর্বিবাহ-উৎসব একটি অবশ্য-পালনীয় আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবরূপে পরিগণিত ছিল। সেই উৎসবের এক অতি বাস্তব বর্ণনা বর্তমান নাটকে রহিয়াছে। বিবাহের ন্যায় পুনর্বিবাহ উৎসবও প্রধানত মেয়েদেরই উৎসব। সেজন্য আলোচ্য নাটকের ক্রিয়াও স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষ কয়েকজন আছেন বটে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীও আছেন, তবে তাঁহারা দূরবর্তী দ্রষ্টা মাত্র, তাঁহারা কোথাও কোনো নাটকীয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। নাট্যকার মেয়েদের মুখের কথা হুবহু বসাইয়াছেন, সেজন্য স্থানে স্থানে নাটকখানি অত্যন্ত অশ্লীল ও অমার্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কুলটা ও লম্পটের দৃশ্যটি একেবারেই অবাস্তর।

প্রথম গর্ভাঙ্ক (খ)

রামনারায়ণ তর্করত্ন

মধুসূদনের পূর্বে যাঁহারা নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। রামনারায়ণের নাটক সংস্কৃতপন্থী হইলেও ইহার বাস্তবতা এবং স্বচ্ছন্দ সরসতার জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া 'নাটুকে রামনারায়ণ' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। সামাজিক সমস্যা লইয়া তিনিই সর্বপ্রথম নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং নিজে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার মতের উদারতা আমাদের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁহার নাটকে একদিকে যেমন উপমা-অনুপ্রাসবহুল সংস্কৃত শব্দের আধিক্য আছে, অন্যদিকে আবার তেমন ছড়া, প্রবচন এবং গ্রাম্য কথোপকথনের মধ্য দিয়া দেশের নিজস্ব রসধারাও স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। রামনারায়ণের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকগুলি খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং ঐগুলি পরে একাধিক নাট্যকারের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোকে, আমাদের সমাজের বহুকাল-পোষিত অনেক কুৎসিত ব্যাধির নগ্ন রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সমাজ হইতে এই সব ব্যাধি দূর করিবার জন্য তৎকালে অনেক সমাজ-নেতার উদ্যমশীল আন্দোলনের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। যে নবীন ও প্রাচীন ভাবের সংঘর্ষ তৎকালীন সমাজ-জীবনকে মথিত করিয়াছিল সাহিত্যেও তাহার প্রতিফলন অনিবার্যভাবে দেখা গিয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট নবীন ভাবেরই জিত হইয়াছিল। সেজন্য সাহিত্যেও নূতনত্ব-বিলাসী, সংস্কারপন্থী মতবাদ উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইতেছিল। ভবানীচরণ, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, রামনারায়ণ, মনোমোহন, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যিকের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ মিলিবে। নাট্যক্ষেত্রে সংস্কারের মুদ্গর লইয়া প্রথম অবতীর্ণ হইলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণের জন্ম ও মানসিক চর্যা প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে, অথচ এই সমাজের বিরুদ্ধেই তিনি মুদ্গর হানিলেন। এটা আপাতদৃষ্টিতে একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ থাকিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

রামনারায়ণ সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নাট্যরচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে হাস্যরসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রহসনে। সামাজিক সমস্যার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এই সমস্যার বাস্তব রূপ দেখাইতেও তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু কান্নার ভারী অস্ত্র অপেক্ষা হাসির হাল্কা শস্ত্রই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। এদিক দিয়া তিনি দীনবন্ধুর সমধর্মী ছিলেন। প্রহসনের মধ্যে তিনি যে শাসনের বেত হাতে লইয়াছেন তাহা গুরুমহাশয়ের বেত নহে, বাজিকরের বেত। তাহাতে আঘাতের বেদনা মরমে চাপিয়া রাখিয়া হাসির হুল্লোড়ে যোগ দিতে হয়। কিন্তু যখন তিনি গম্ভীর হইয়া তত্ত্বকথা কি ধর্ম-কথা শুনাইয়াছেন, তখনই তাহার কথা মরমে না পশিয়া পিষিয়া দেয়।

॥ কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪) ॥ তাহার প্রথম নাটক। ইহাকে সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের আদি নাটক বলা হইয়া থাকে। অবশ্য পূর্বে আমরা যেসব নাটকের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহাকে আদি নাটক হয়তো বলা চলে না, কিন্তু ইহাকে প্রথম সমাজিক নাটক বলিতে বোধ হয় কাহারো আপত্তি হইবার কারণ নাই। ইহার পূবেকার নাটকগুলি দেশের লোকের মনের মধ্যে কোনোই প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'ই প্রথম সাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাপল্য ও সন্তোষের সঞ্চার করিল।[১]

'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এ কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া দেখাইয়া ইহার নিন্দা করা হইয়াছে।[২] এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক চার কন্যার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বিবাহ দিতে সক্ষম হন নাই।

. 'Kulin Kulasarvasva', for such was the name of the play, found ready acceptance at the hands of the Bengalees who had the satisfaction to feel that they were doing immense benefit to society by playing a drama the sole purpose of which was to point out the glaring evils of polygamy and of that exceptional social custom known as Kaulinya'.

The Bengali Theatre—S. P. Mookherjee.

। লেখক বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন –'পূর্বকালে বল্লাল সেন, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় এক্ষণে বঙ্গস্থল যেরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম'…।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় বলিয়াছেন—'গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—বল্লালী প্রথার সহিত তাহার সমাজের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন না, তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল—বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় নাই।'
প্রবাসী—আশ্বিন (১৩৩৮)

অবশেষে এক কুরূপ বৃদ্ধের সহিত কন্যাদের বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই নাটকের বর্ণিত বিষয়। নাটকখানি ছয় ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এক ভাগের সহিত অন্য ভাগের সংযোজনা নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই। প্রত্যেক ভাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়া সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বরের পার্শ্বে সরস ও লঘু ভাষার চাপল্য স্থান পাইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্রের ভাষার মধ্যেই এই ব্যবধান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো সংস্কৃত নাটক অনুসরণ করিয়াই এই ব্যবধান তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পুরুষদের কথা যেমন আড়ষ্ট, নারীদের কথা তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। রামনারায়ণ একদিকে সংস্কৃত কবিতা, এবং অন্যদিকে ছড়া ও প্রবচনের সমাবেশ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রভাব ভাষা ও ভাবের মধ্যে লক্ষিত হয়। সেই প্রভাবের ফলেই জায়গায় জায়গায় উপমা-অনুপ্রাসের ঘটা রহিয়াছে, যেমন—

বসন্ত অশান্ত বড় দুরন্ত নিতান্ত।
বিরহী বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥
কুটিল বিরহিমন ফুটিল বকুল।
জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥

নাটকের মধ্যে নানা বিচিত্র চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রগুলির নাম বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি। নামের মধ্যে ইহাদের অন্তঃপ্রকৃতি ব্যক্ত হইয়াছে। ঘটক, পুরোহিত, ঔদরিক, মূর্খ প্রভৃতিকে লইয়া সরস ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

রামনারায়ণের 'নবনাটক' বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত।[১] জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জন্য ইহা রচনা করিয়া নাট্যকার পুরস্কার লাভ করেন। ফরমায়েসী রচনায় যে দোষ অবশ্যম্ভাবী, আলোচ্য নাটকেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। অর্থাৎ ইহাতে উদ্দেশ্যের চাপে নাটকত্ব গুঁড়াইয়া গিয়াছে।[২] বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে ইহাতে এত তত্ত্বকথা আছে যে, আধুনিক যুগে বার্নার্ড শ'-এর কোনো নাটকেও বোধ হয় তত

১। নাটকে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি উপহার-পত্রে লিখিত আছে, 'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।'

২। 'প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতায় প্লটের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার হানি হইয়াছে।'
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২য় সং)—ডক্টর সুকুমার সেন।

তত্ত্বের কচকচি নাই। ভালোমানুষী উপদেশের ভিড় ঠেলিয়া যদি আমরা গবেশবাবুর পারিষদের মধ্যে কিছুক্ষণ বসিতে পারি কিংবা অমলা-কমলা-বিমলা-চপলার রঙ্গ-আসরে যোগ দিতে পারি, তবে আমাদের ভারাক্রান্ত চিত্ত যে অনেকখানি হাল্কা বোধ করে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রকৃতপক্ষে গুরু বিষয় অপেক্ষা লঘু চুটকিতে রামনারায়ণের হাত ভালো খোলে। কৌতুক ও রসময়ী গোয়ালিনীর যে দৃশ্য তিনি দেখাইয়াছেন তাহা বিলক্ষণ হাস্য-সরস হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্গপ্রিয় 'নাটুকে'র হাতে মাঝে মাঝে করুণ পরিবেশও রঙ্গ-মিশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ চন্দ্রলেখার হাতে চিত্ততোষের প্রহার-লাভের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রলেখা স্বামী ভাবিয়া নিরীহ পুরোহিতকে আড়াই হাত লম্বা হালিশহুরে 'খেঙরা' দিয়া যে-ভাবে উত্তম-মধ্যম দিয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রচ্ছন্ন কারুণ্যে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত যথেষ্ট কৌতুকাবহ হইয়াছে। নাট্যকার জায়গায় জায়গায় বিলাপোক্তির ক্ষেত্রে যে সব কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলিতে বিলাপের অপলাপ ঘটিয়াছে। ছড়ার ন্যায় হাল্কা-জাতীয় কবিতা গুরু রসের ঘন মেঘকে লঘুবিস্তারী বাষ্পে পরিণত করিয়াছে।[১]

নাটকখানির মধ্যে কোনো জটিল কাহিনী নিরঙ্কুশ গতিতে বিবর্তন লাভ করিয়া অনিবার্য পরিণতিতে শেষ হইতে পারে নাই। নানা টুকরা মূল-বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে নাটকের মূল ভাব পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছে। সে সব দৃশ্যে তৎকালীন সামাজিক জীবনের নানা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল কাহিনীর রস তাহাদের দ্বারা ঘনীভূত হয় না। বহু-বিবাহ ছাড়াও নাটকের মধ্যে বৈধব্য-বেদনা, স্তাবকতা-দোষ, ভাষা-সমস্যা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নাট্যকারের মুখপাত্র হইলেন সুধীর। তাঁহার মুখ দিয়া তিনি যাবতীয়

১। দুঃখময়ী সাবিত্রীর আত্মবিলাপ উদাহরণস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ।
দেখ কপালের গুণ লো কপালের গুণ॥
নগরে উঠিতে লাগে বাজারে আগুন।
দিদি বাজারে আগুন লো বাজারে আগুন॥
করিব সংসার সুখে বড় ছিল সাধ।
মনে বড় ছিল সাধ লো বড় ছিল সাধ॥
সে সাধে বিষাদ হলো ঘটিল প্রমাদ।
তাতে ঘটিল প্রমাদ লো ঘটিল প্রমাদ॥

তত্ত্বোপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাকে সপ্রাণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিষ্প্রাণ সাবয়ব তত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয়। নাটকের নায়ক স্থবোধের চরিত্রও কারুণ্যের কুজ্ঝটিকায় এমনি আবৃত যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই। তৎকালীন সামাজিক নাটকে যে অস্বাভাবিক আতিশয্য এবং একতরফা তুঃখভোগের নিয়ম ছিল, আলোচ্য নাটকেও তাহার কোনো ব্যতিক্রম নাই। এখানে একমাত্র তুঃখদাত্রী হইতেছেন গবেশবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চন্দ্রলেখা, আর সকলে কেবল তুঃখভোগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই অস্বাভাবিক, আতিশয্যতুষ্ট করুণ রস হৃদয়কে স্পর্শ করে না, বরং ইহা বিরক্তি উৎপাদন করে। বহু-বিবাহের ভয়াবহ কুফল দেখাইবার জন্যই নাট্যকার নাটকখানি বিয়োগান্তক করিয়াছেন। সংস্কৃত আদর্শপ্রাপ্ত নাট্যকারের পক্ষে যে ইহা অভিনব সৎসাহস তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রহসন

॥ যেমন কর্ম তেমনি ফল—(দ্বি-স ১২৭৯)॥ প্রহসন-রচনায় রামনারায়ণের পটুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। যে স্বচ্ছ ও লঘু সংলাপ এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রহসনের অনুকূল, সেগুলিতে ছিল তাঁহার দক্ষ অধিকার। ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা যে, সমাজ-মন শোধন করিতে—তত্ত্বোপদেশের গদাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর, রামনারায়ণের প্রহসন তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আলোচ্য প্রহসনখানি তুই অঙ্কে বিভক্ত। প্রকৃত প্রহসনের ঘটনা দ্বিতীয় অঙ্কেই স্থাপিত। প্রথম অঙ্ক বর্ণনামূলক এবং ঘটনাহীন। পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি এব তাহার হাস্যকর শাস্তি লইয়া প্রহসনখানি রচিত। আলোচ্য কাহিনীর সহিত দীনবন্ধুর 'নবীন-তপস্বিনী'র কাহিনীর অনেকটা মিল আছে। তবে সেখানে অপরাধী জলধর একা আর এখানে মুন্সোব এবং তাহাব সেরেস্তাদার উভয়েই সমান অপরাধী। নাগর-যুগলের করুণ পরিণাম, নিষ্ঠুর পাঠক ও দর্শকের কাছে বিলক্ষণ আমোদজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই। মুন্সোব চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক তৎকালীন মূর্খ, অযোগ্য, পক্ষপাতী মুন্সেফ-সমাজের উপর এক-হাত লইয়াছেন। ইহাকে দেখিয়া দীনবন্ধুর ঘটিরাম ডেপুটির কথা আমাদের মনে হয়।

॥ চক্ষুদান (১৮৬৯)॥ এই ক্ষুদ্রাকার প্রহসনখানি লাম্পট্যব্যাধির প্রতিকারের উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। স্বামী নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করিয়া অন্য নারীতে নিমগ্ন। স্ত্রী বসুমতী একদিন এক ছলনার আশ্রয় লইয়া

স্বামীর চিত্তে চৈতন্য উদ্রেক করিতে সমর্থ হন। ইহাই চক্ষুদান। তবে এ চক্ষুদান শুধু নিকুঞ্জবিহারীর নয়, এ চক্ষুদান বোধ হয় নাট্যকার দিতে চাহিয়াছেন তৎকালীন লাম্পট্যদুষ্ট সমাজকে। নিকুঞ্জবিহারীর শেষ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য—'বসুমতি, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো। (সভা প্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্বক) সভ্য-মহাশয়েরা কি বলেন? আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান।'

॥ উভয় সঙ্কট (১৮৬৯) ॥ ক্ষুদ্রাকার প্রহসন। কিন্তু ইহার উৎকর্ষ ক্ষুদ্র নয়। ইহাতেও সপত্নী-সমস্যার সরস অবতারণা করা হইয়াছে। তবে আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে অহেতুক আতিশয্য এবং অবিশ্বাস্য নির্মমতা নাই। রহস্য-মধুর ঘটনার মধ্য দিয়া সমস্যাটির উপর পরিহাস-স্নিগ্ধ আলোকপাত করা হইয়াছে। এই জাতীয় প্রহসনে স্ত্রী-ভূমিকার প্রাধান্য থাকে এবং আলোচ্য প্রহসনেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বড় বৌ, ছোট বৌ এবং গয়লানী—তিনটি চরিত্রই বাস্তবধর্মিতায় উজ্জ্বল। দুই সতীনই কর্তাকে বিকৃত আদর-যত্নের আতিশয্য দেখাইতে যাইয়া যে রকম মজার সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই প্রহসনের মধ্যে হাস্যজনকতা সঞ্চার করিয়াছে। কলহ-তিক্ত, যত্ন-পীড়িত বেচারা কর্তা শেষকালে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ—

'ওড়ে ছেড়ে দে, প্রাণ যায়, একবার ছাড়, আমি সভ্যমহাশয়দিগের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাত ছাড়ে না যে, কৃতাঞ্জলি হতে পেলেম না, কি করি সভ্যমহাশয়েরা। একটা কথা বলি, ওরে একটু স্থির হ, অগো মহাশয়েরা, আমার দুর্গতি আপনারা দেখচেন, আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ কেহ থাকেন, তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এইরূপ উভয় সঙ্কট।'

পৌরাণিক নাটক

॥ রুক্মিণী হরণ (১৮৭১) ॥ 'রুক্মিণী হরণ'-এর কাহিনী রামনারায়ণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পুরাণের অনুবাদ করেন নাই, অন্ধ অনুবর্তনও করেন নাই। নাটকীয় প্রয়োজনে নূতন চরিত্র-সৃষ্টি এবং কুশলী ঘটনাবিন্যাস করিয়া তিনি পৌরাণিক বৃত্তান্তকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। রসিক 'নাটুকে'র হাতে পড়িয়া প্রাচীন চরিত্রগুলি অলৌকিক রহস্য-মহিমার যবনিকা ছিন্ন করিয়া লৌকিক বাস্তবরসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের কথাবার্তা, হাবভাব, আমাদের সমাজান্তর্গত পরিচিত মানুষের সাক্ষ্য

বহন করে সংস্কৃত শব্দবর্জিত চলিত ভাষার মধ্যে নাট্যপ্রবাহের স্বচ্ছন্দগতি সঞ্চারিত হইয়াছে। সরল, লোভাতুর, তোতলা ব্রাহ্মণ ধনদাসের চরিত্রটি সহজে ভুলিবার নহে।

॥ কংস বধ (১৮৭৫)॥ কংস কর্তৃক অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ হইতে নাটকের আরম্ভ এবং কংসবধ ও উগ্রসেনের পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি। সংলাপের দীর্ঘতা ও আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের জন্য এই নাটকখানি রামনারায়ণের অন্য নাটকের মত সরস হইতে পারে নাই।

'রুক্মিণী হরণ' ও 'কংস বধ' ছাড়া রামনারায়ণ 'ধর্ম বিজয়' (১৮৭৫) নামে আর একখানি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ চারখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম হইতেছে—বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৮৬০) ও মালতী মাধব (১৮৬৭)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(মাইকেল-দীনবন্ধু পর্ব)

মাইকেল মধুসূদন

(ক) ভূমিকা

'মেঘনাদ বধ' প্রণেতা মাইকেল মধুস্দন দত্ত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যাবলীর ভাষা ও ভাব লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রভাবও সুস্পষ্ট-ভাবে নির্ণীত ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি মধুস্দনের শিরে অক্ষয় যশোমুকুট অর্পণ করিয়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুস্দনের যোগ্য মূল্য ও মর্যাদা দান করিতে আমরা সক্ষম হই নাই, কারণ, মাইকেলের অনালোচিত নাট্য-প্রতিভা যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভার মতই যুগান্তকারী ও প্রভাবশালী এ বিষয়ে আমরা তেমন দৃষ্টি দিই নাই। মধুস্দন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার নহেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণে তিনিই প্রথম সার্থক নাটক লিখিয়া বাংলার ভবিষ্য নাট্য-সাহিত্যের একমাত্র পথ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া যান। সুতরাং এই বিদ্রোহী, অসমসাহসিক, অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যকারকে, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের জনক ও প্রবর্ত্তকের সম্মানিত আসন সর্বাগ্রে দান করিতে হয়।

অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ সাধারণত নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকেন, মধুস্দনেরও এমনি নিজের ক্ষমতার উপর একান্ত নির্ভরতা ছিল ; তাই যেদিন পাশ্চাত্ত্যবিলাসী, বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ মাইকেল বন্ধু গৌরদাসের কাছে বাংলা নাটক লেখার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন, সেদিন তিনি উপহসিত হইলেও[১] তিনি যে অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার সঙ্কল্প অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তাহা আমরা সকলেই জানি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাট্যকারই কোনো না কোনো রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসিয়া নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। মধুস্দনের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বেলগাছিয়া থিয়েটার ও ইহার কর্মকর্তাদের সহিত জড়িত না হইলে হয়তো মধুস্দন নাটক লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন না এবং কে জানে, হয়তো তাঁহার প্রতিভার বিকাশে ব্যাঘাত এবং বিলম্ব ঘটিত।

১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুস্দনের জীবনচরিত'—পৃঃ ২২৭।

মধুসূদন তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় খেদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদন অকারণে অযৌক্তিক খেদ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহার পূর্বে বঙ্গে রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঐ সব রঙ্গশালায় অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচিত হয় নাই। ইংরাজ প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে রঙ্গশালার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনো ইংরাজী নাটকের সমধর্মী আধুনিক নাটকের জন্ম হয় নাই। মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে প্রধানতম হইতেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন। কিন্তু তাঁহারা হয় কোনো না কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় নবশিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট নাট্যশালায় বসিয়া নান্দী, প্রস্তাবনা, প্রভৃতি-যুক্ত উপমা-অনুপ্রাস-বহুল, দীর্ঘ হা-হুতাশ-বিলাপ-সমন্বিত নাটক দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ পাইতেন না, এবং মাইকেলও পান নাই। মাইকেল তখনকার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নাটক-উপভোগেচ্ছাকে তৃপ্ত করিবার জন্যই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গৌরদাস বসাককে লিখিত মাইকেলের তদানীন্তন একখানা পত্র হইতে ইহা স্পষ্টভাবে জানা যায়—'Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen, who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit'.[১]

অবশ্য সংস্কৃতের আনুগত্য সজোরে অস্বীকার করিলেও তিনি যে তাঁহার নাটকে সংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত হইতে পারেন নাই, সেই আলোচনা আমরা পরে করিব। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য যে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বন্দীশালা হইতে তিনিই নাট্য ভারতীকে উদ্ধার করিয়া আধুনিক সাজসজ্জা ও অলঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের প্রথায় তাহার নাটকসমূহ পঞ্চ অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্ক আবার কয়েকটি দৃশ্য অথবা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। দর্শকগণের মন

১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত', —পৃঃ ২৩১।

লঘু ও হাল্কা করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে গান সংযোজিত করিয়া তাহার নাটককে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মাইকেলের নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুণ এই যে, নাটকের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কাহিনীকে এক দৃঢ়-সূত্রে সংবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ঐক্যের (unity) জন্য তিনি গ্রীক নাটকের কাছে ঋণী কিনা বলা যায় না, তবে একথা সত্য যে, মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকারদের নাটকে কাহিনীর এই জমাট ঐক্য খুব কম লক্ষ্য করা যায়। আমরা পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকে ইহা দেখাইয়া আলোচনা করিব। তাঁহাদের নাটকের মধ্যে অনেক স্থলেই অসংলগ্ন ঘটনা অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করিয়া নাটকের গতি বিক্ষিপ্ত ও মন্থর করিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের নাটকের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ একেবারে নাই বলিলে চলে। পড়িতে পড়িতে আমাদের মন মূল ঘটনা হইতে কখনো বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না এবং কাহিনীও নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ ও গতিশীল হইলেও মাইকেলের নাটক রঙ্গমঞ্চে কখনো জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার কারণ তাঁহার নাটকের মধ্যে নাটকীয় ভাব খুব কম। এই নাটকীয় (dramatic) ভাব না থাকিলে কোনো নাটক রঙ্গমঞ্চে জমিতে পারে না। আকস্মিক, অসাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়ের সমাবেশ না হইলে এই নাটকীয় ভাব নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ সমালোচক নিকলের কথায় বলিতে গেলে—

…'the word dramatic has a connotation signifying the unexpected, with usually the suggestion of a certain shock occasioned either by a strange coincidence or by the departure of the incidents narrated from the ordinary tenor of life'[১]

মাইকেল আকস্মিক এবং অতর্কিতভাবে চরিত্র ও ক্রিয়ার সন্নিবেশ দ্বারা এই নাটকীয় ভাব সৃজন করিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য অভিনয়ের সময় তাঁহার নাটক একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। দর্শকেরা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া একই ভাবে একই ধরনের কথাবার্তা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং নাটকের রস গ্রহণে বঞ্চিত হয়। উপন্যাস এবং নাটকের কথোপকথন ঘটনার গতি সম্পাদন করে এবং দর্শকের মনকে ভাবাবেগে চঞ্চল করিয়া তোলে। নাটকীয় কথোপকথনের

১। Theory of Drama by A. Nicoll,—p. 36.

এই নীতি মাইকেল ভালো ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সেজন্য কোলরিজের ভাষায় নাটকের অভিনয়ের সময় আমাদের যে 'Willing suspension of disbelief' হয়, মাইকেলের নাটকের অভিনয়ের সময় তাহা হয় না। মাইকেলের বৈচিত্র্যহীন কথোপকথন দর্শকের মনের মধ্যে অবসাদ ও ক্লান্তির উদ্রেক করে। অবশ্য তাঁহার নাটক যখন পাঠ করা যায় তখন এই রকম কবিত্বপূর্ণ চমৎকার কথোপকথন পড়িতে আনন্দই বোধ হয়, কিন্তু নাটকের বিচার করিতে গেলে বঙ্গমঞ্চে ইহার উপযোগিতার দিকে সব সময়েই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে, কারণ—

'The stage affords the first test of a play's emotional appeal and perhaps the best test of its dramatic power.'[১]

মধুসূদনের নাটকেব কথোপকথন একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হওয়ার আর একটা কারণ ইহার অনাবশ্যক ও আত্যন্তিক দীর্ঘতা। এই দীর্ঘ কথোপকথন নাটকের রস সৃজনে এক প্রধান প্রতিবন্ধক, কিন্তু বাংলার অধিকাংশ নাট্যকাব এই দোষের দ্বারা তাঁহাদের নাটকসমূহকে নাটকত্ববর্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকে বীররসাত্মক চরিত্রের কথায় ক্রমোচ্চ ভাবের অভিব্যক্তিতে এই রকম সুদীর্ঘ বক্তৃতা অনেক সময়েই অভিনয়ের গুণে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির ঐতিহাসিক নাটকে এই রকম দীর্ঘ বীরত্বব্যঞ্জক ভাবাবেগপূর্ণ কথা অনেক সময়েই বিশেষ চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লঘু ভাবের পরিস্ফুরণে এই রকম কথোপকথন কখনো চিত্তাকর্ষক হইতে পারে নাই। নাটকেব মধ্যে পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ উক্তি নাটকের গতিকে অনেক স্থলে একেবারে খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে। 'উত্তররামচরিত'-এর মধ্যে রামের বিলাপ কিংবা 'বিক্রমোর্বশী'র মধ্যে পুরূরবার খেদ নাটকের দিক দিয়া মূল্যহীন।

মধুসূদনের নাটকের কথোপকথনের দীর্ঘতার কারণ তিনি তাঁহার নাটকের মধ্যে নিসর্গ বর্ণনা এবং উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া কবিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুল করিয়াছেন যে, কাব্যের পক্ষে যে কবিত্ব মনোহর ও সার্থক, নাটকের পক্ষে তাহাই অনাবশ্যক ও হাস্যোদ্দীপক। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে যে চমৎকার অলঙ্কার ও বর্ণনা দ্বারা তিনি তাঁহার কাব্যসমূহ সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা দ্বারাই আবার তিনি তাঁহার নাটককে কৃত্রিম ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার লালিত্য, সুষমা ও

১। *Tragedy* by Thorndike, p. 15.

ঝঙ্কারের জন্য সংস্কৃত নাটকের অলঙ্কৃত বর্ণনা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট মনে হয় না, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অথবা সংস্কৃত নাটকসদৃশ বাংলা নাটকে এইরূপ বর্ণনা কখনো স্বাভাবিক মনে হয় না। মাইকেলের নাটক পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যে, আমরা বুঝি কোনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পাঠ করিতেছি। মাইকেলের নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পড়িলে এই কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে—

'রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি একথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশে গমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে। যেহেতু, তারা তথায় বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে! (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হ'য়ে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেরূপ হলেম? প্রভো অনঙ্গ! তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে ব'লে কি প্রতিহিংসার নিমিত্ত মানব জাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘ নিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য। আমি কি মৃগয়া কত্তে গিয়ে কামব্যাধের লক্ষ্য হ'য়ে এলেম?'

'শর্মিষ্ঠা', দ্বিতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

পাত্রপাত্রীর মুখে এই রকম কথা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলিয়া নিশ্চয়ই মনে হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংযত ও সার্থক অলঙ্কারকে এইরূপ ব্যঞ্জনাময় করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার নাটক গতিশীল ও মাধুর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মাইকেলের নাটকে অনেক স্থলেই দীর্ঘ স্বগতোক্তি দেখা যায়। প্রাগাধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাটকে এই রকম স্বগতোক্তি নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট অনেক চরিত্রের স্বগতোক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্বগতোক্তি সাধারণত নাটকীয় চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অভিনয়ের সময় এইরূপ স্বগতোক্তির সার্থকতা দেখা যায় না, কারণ কোনো চরিত্র তাঁহার উক্তি রঙ্গমঞ্চস্থ অপর এক চরিত্রের কাছে অশ্রুত রাখিয়া পঁচিশ হাত দূরের দর্শককে শুনাইতে পারেন না। এই নাটকীয় কৌশলটি কৃত্রিম এবং অপ্রাকৃত বলিয়া আধুনিক নাট্যকারদের দ্বারা বর্জিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ইবসেন প্রথম ইহা তাঁহার নাটক হইতে

বাদ দেন। ইবসেনের নাটকের বাস্তবতা আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যারিয়ট্ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

'The 'aside' must be abolished, because in real life people do not use it. A man may murmur a secret thought under his breath on occasion, but he does not declaim so as to be audible a hundred yards away. If he should do so, it is ridiculous for the character at his side to pretend not to hear'[১]

মাইকেলের নাটকের পাত্রপাত্রীর স্বগতোক্তিতে কোনো কোনো স্থলে অনুপম কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ উক্তি নাটকের গতিকে মন্থর করিয়া ফেলিয়াছে।

মধুসূদনের মানস-কল্পনা সুগম্ভীর দূরাস্তৃত জগতে বিলাস করিতে চাহিত। সেজন্য তাঁহার কাব্য ও নাটকে প্রাত্যহিক জগতের পরিচিত ক্ষুদ্রতা নাই, অতীত জগতের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তাহা রহস্যালোকিত। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', ও 'মায়াকানন'—ইহাদের মধ্যে যে-সব নাট্যকাহিনী রহিয়াছে সেগুলি গৃহীত হইয়াছে অতীত পুরাণ ও ইতিহাস হইতে। ইহাদের পরিবেশে রহিয়াছে এক অসচরাচর-দৃষ্ট জগতের ভাব-মহিমা ও রসগাম্ভীর্য। সেজন্য ইহাদের ভাষা ও ভঙ্গিতে স্বভাবতই এক অসুলভ গুরুত্ব ও অসঙ্গত আড়ম্বর আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 'শর্মিষ্ঠা'য় সংস্কৃত-প্রভাবিত ভাষা ও বর্ণনা-রীতির যতখানি প্রাধান্য, 'পদ্মাবতী'তে ততখানি নাই এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার 'মায়াকানন' রচনা করিবার সময় তাঁহার প্রতিভার অন্তর্মুখী দুবলতার সুযোগ লইয়া সংস্কৃত প্রভাব পুনরায় তাঁহার নাট্যগতিকে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

(খ) নাটক

মাইকেলের নাটকগুলি আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনখানা নাটকেরই নামকরণ নায়িকাদের নাম অনুসারে হইয়াছে। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বলিয়াছেন—'নামকার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থ প্রকাশকম্', অর্থাৎ নাটকের নাম গর্ভস্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। মাইকেলের নাটক নায়িকা নামাঙ্কিত

১। *Modern Drama* by J. W. Marriott, p. 36.

হইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় নায়িকাগণই ঐ নাটকগুলির প্রধান চরিত্র, তাহাদিগকে ঘিরিয়াই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হইয়াছে। নায়িকাদের চরিত্র নাট্যকার হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ এবং দেশীয় ইতিহাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা'ই তাঁহার প্রথম নাটক, আমরা আগে ঐ নাটকের আলোচনাই করিব।

॥ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)॥ মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসবাবুর লিখিত পত্রে জানা যায় যে, মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' লিখিবার পূর্বে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' হইতে কয়েকখানা বাংলা ও সংস্কৃত বই আনিয়া পড়িয়াছিলেন।[১] সম্ভবত সেজন্যই মহাভারতোক্ত কাহিনী লইয়া তিনি তাঁহার নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যপ্রভাবাপন্ন খৃষ্টান মাইকেলের পক্ষে হিন্দুর পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করা বিস্ময়োদ্দীপক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, তাহার মন হইতে হিন্দু সংস্কার কখনো লুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন বিধর্মী হইলেও যে হিন্দু ধর্মে আস্থাবান ছিলেন, সমাজত্যাগী হইয়াও যে হিন্দু সমাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'আত্মচরিত'-এ লিখিয়াছেন যে, মধুসূদনের সহিত তাঁহার একদিন কথোপকথনের সময় তিনি মধুসূদনকে বলিয়াছিলেন, 'আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু'। তিনি (মধুসূদন) বলিলেন, 'তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু। কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না এইজন্য খৃষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি।'[২]

পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাহার পরে অনেকেই পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নাটক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয়-সমন্বিত হইয়া অনেক স্থলেই যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মাইকেল তাঁহার নাটকে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেন নাই, এবং ঘটনা-সংস্থাপন ও চরিত্র-সৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মধুসূদন তাঁহার নাটক লিখিয়াছেন, তবে তিনি এই উপাখ্যানের গোড়া হইতে নাটকের

১। গৌরদাস বসাকের পত্র, 'জীবনচরিত'—'পরিশিষ্ট', পৃঃ ৬৫০।

২। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', পৃ ১০৯।

কাহিনী আরম্ভ করেন নাই। শর্মিষ্ঠার নির্বাসন হইতে নাটক শুরু হইয়া যযাতির জরামুক্তিতে ইহার শেষ হইয়াছে। মহাভারতের উপাখ্যানে প্রথম-ভাগে দেবযানী এবং শেষের দিকে শর্মিষ্ঠা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মাইকেল ঐ উপাখ্যানের অন্ত্যভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য শর্মিষ্ঠাই তাঁহার নাটকের প্রধান চরিত্র। মধুসূদন মহাভারতের কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন; পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার কাব্যে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে যে আদর্শ-লঙ্ঘনের দুঃসাহস দেখাইয়াছেন, নাটকের মধ্যে তাহার চিহ্ন নাই। কেহ কেহ 'শর্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মধুসূদন খুব সম্ভবত রামনারায়ণ তর্করত্নরচিত 'রত্নাবলী'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।[১] কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র উপর 'রত্নাবলী'র প্রভাব বাহির করিয়া মাইকেলের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করা অনর্থক ও অনাবশ্যক। কারণ মধুসূদন আর কোনো মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নাই; মহাভারতের কাহিনীর সহিত 'রত্নাবলী'র সাদৃশ্য আছে, এবং মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়াই 'শর্মিষ্ঠা'র সহিত 'রত্নাবলী'র সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়। বস্তুতপক্ষে 'শর্মিষ্ঠা'র সহিত আরও অনেক সংস্কৃত নাটকের ভাবসাম্য বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' এবং হর্ষদেব প্রণীত 'প্রিয়দর্শিকা'র নাম করা যাইতে পারে।

কোনো প্রচলিত কাহিনীর অবিকল বর্ণনা নাটকের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতপক্ষে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁহার পূর্বপ্রচলিত কোনো উপাখ্যান হইতে নাটকীয় অংশ নির্বাচন করিয়া নাটকের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। 'শর্মিষ্ঠা' পড়িলে মনে হয় মধুসূদন মহাভারতের উপাখ্যান পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গতি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। যে সমস্ত ঘটনা কি ক্রিয়া নাটকীয় রস সৃজনে অনুকূল, তিনি সেগুলি ভালোভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই। পাত্রপাত্রীর কথার মধ্য দিয়া যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করিতে হয়, মধুসূদন তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সেজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র অধিকাংশ স্থলে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। ঐ সব কথোপকথন চরিত্র-বিকাশে মোটেই সহায়তা করে নাই। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দৈত্য ও বকাসুরের আলাপে পূর্ব ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যকে প্রস্তাবনা

১। যোগীন্দ্রনাথ বসু এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ডাঃ প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা তাঁহার **'Bengali Drama'** নামক গ্রন্থে ঐ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

(Prologue) বলা যাইতে পারে। একমাত্র পূর্ব ঘটনা পাঠক এবং দর্শককে অবগত করান ছাড়া ইহার আর কোনো সার্থকতা নাই। শর্মিষ্ঠা, দৈত্যপতি এবং শুক্রাচার্যের দ্বারা যদি এই দৃশ্য অভিনীত হইত তাহা হইলে এই অংশ বিশেষ নাটকীয় হইয়া উঠিত এবং শর্মিষ্ঠার চরিত্র-স্ফুরণে বিশেষ কার্যকর হইত। ডাঃ গুহঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথম দৃশ্য নাটকের মধ্যে সবাপেক্ষা বেশী নাটকীয়-ভাবপূর্ণ।[১] কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় ভাব ও নাট্য কলা-কৌশলের কোনো পরিচয় নাই। শর্মিষ্ঠা নায়িকা এবং দেবযানী প্রতিনায়িকা। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পূর্বে কেবলমাত্র একবার ব্যতীত আমরা শর্মিষ্ঠার সাক্ষাৎ পাই নাই। এই পর্যন্ত দেবযানীই মুখ্য চরিত্র এবং তাহার সহিত রাজার প্রণয় এবং পরিণয় ব্যাপার লইয়াই কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। যদি শর্মিষ্ঠাই নাটকের নায়িকা হন, তাহা হইলে এত বিস্তৃতভাবে প্রতিনায়িকার কাহিনী বর্ণনা করার কোনো সার্থকতা নাই। রাজার পক্ষে একই ভাবে একবার দেবযানীর প্রতি এবং আবার শর্মিষ্ঠার প্রতি আসক্ত হওয়ার চিত্র কাহিনীর রস-সৃজনে পরিপন্থী হইয়াছে। রাজা এবং তাঁহার দুই প্রণয়ভাগিনী ভার্যা দ্বারা যে ত্রিকোণ-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সেই সমস্যার সংঘাত নাট্যকার পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠা-যযাতির প্রেম আবিষ্কারের পর কুপিতা, ঈর্ষান্বিতা দেবযানীর সহিত সমস্যা-পীড়িত রাজার চমৎকার ঘাত-প্রতিঘাতমূলক কথোপকথনের সুযোগ ছিল। কিন্তু নাট্যকার রাজার মুখ দিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইহার পর দেবযানী পিতার দ্বারা রাজাকে অভিশাপিত করিয়াছেন কিন্তু তার পরদৃশ্যেই অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর জন্য দুঃখাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ ইতিমধ্যে এমন কোনো কথা হয় নাই, যাহাতে দেবযানীর মতির পরিবর্তন হইতে পারে। তাহার চরিত্র পরিবর্তনের পূর্বে স্বামীর সহিত তাহাকে একবার দেখা করান উচিত ছিল। নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানী উভয়কেই রাজার সহিত মিলিত করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিয়োগান্তক নায়িকা করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের চরিত্রগুলি সুবিকশিত হয় নাই, এবং নাটকীয় সংঘাত জমে নাই, তাহার কারণ

১। *Origin and Development of Bengali Drama* by P. C. Guha Thakurta.

নাটকখানির সংলাপ চরিত্র-বিকাশক ও ঘটনার গতিবিধায়ক হয় নাই। সংলাপের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে কাহিনীর বর্ণনা হইয়াছে মাত্র, সেজন্য নাগরিক, সখী, দৈত্য ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রের অনাবশ্যক অবতারণা করিয়া তাহাদের মুখ দিয়া অধিকাংশ স্থলে কাহিনী ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলি-সম্বন্ধীয় ঘটনা যদি তাহাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে চরিত্রগুলি বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত, এবং কাহিনীও নাটকীয় ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া উঠিত।

শর্মিষ্ঠার নাম অনুসারে মাইকেল নাটকের নামকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শর্মিষ্ঠার চরিত্র মোটেই সজীব হয় নাই। নাটকেব গোড়া হইতেই তাঁহাকে আমরা দেবযানীর দাসীপদে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সুখৈশ্বযে পালিতা রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে নাটকের মধ্যে দেখান হয় নাই। সেজন্য পূর্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার দুঃখপূর্ণ হীন অবস্থায় দর্শক সহানুভূতি বোধ করে না। শর্মিষ্ঠা সহিষ্ণু, ক্ষমাশীলা ও কোমলপ্রাণা; দেবযানী তাঁহার প্রতি গুরুতর অন্যায় করা সত্ত্বেও তাঁহার বিরুদ্ধে শর্মিষ্ঠাব কোনো অভিযোগ কিংবা ক্রোধ নাই। শর্মিষ্ঠা-চরিত্রের মধ্যে মাইকেল ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠার কোমল মাধুর্য সত্ত্বেও নায়িকার প্রভাব এবং ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে নাই। বরং দেবযানীর চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়াছে। নাটকেব মধ্যে দেবযানীই সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব কাহিনীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নাটকের প্রথম দিকে যযাতি ও দেবযানীর প্রণয়ব্যাপারই ব্যক্ত হইয়াছে, এবং দেবযানীকে পতিপরায়ণা প্রেমময়ী স্ত্রী-রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার সীমাহীন প্রেমধারা, যযাতিব বিশ্বাসঘাতকতার কঠিন প্রস্তরে রুদ্ধ হইয়া দুর্জয় অভিমানরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি একবার কিশোর বয়সে প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে প্রেমাস্পদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় প্রতারিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইলেন। পিতাকে অনুরোধ করিয়া তিনিই স্বামীকে জরাগ্রস্ত করেন, কিন্তু পবে অনুতপ্ত হইয়া নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকেন, এবং পুনরায় তিনিই স্বামীর জরামুক্তির ব্যবস্থা করেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম এবং প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং অনুতাপ বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইয়া দেবযানীর চরিত্র বিশেষ সজীব ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেবযানীকেই নাটকের নায়িকা বলা উচিত।

যযাতি চরিত্রের মধ্যে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। যযাতি সংস্কৃত নাটকের

প্রসিদ্ধ নায়কসমূহ—দুষ্মন্ত, অগ্নিমিত্র, উদয়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রণয়-ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া তাঁহাদের ন্যায় যযাতির পক্ষেও অমার্জনীয় অপরাধ নয়। প্রথমা স্ত্রীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহারা স্ত্রী ও প্রণয়িনীর মধ্যে আপস বিধান করিয়া থাকেন। আলোচ্য নাটকে যযাতি নিজে শাপগ্রস্ত হইয়া তাহার দুই স্ত্রীর মধ্যে মিলন সাধন করিতে পারিয়াছেন।

বিদূষকের চরিত্র মধুসূদন সংস্কৃত নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ন্যায় 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষকও স্থূলবুদ্ধি, চেটী ও নটীর সহিত পরিহাস-রঙ্গরত এবং রাজার প্রেমব্যাপারে সহায়ক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বিদূষক চরিত্র যেমন নূতনভাবে অঙ্কন করিয়াছেন মধুসূদন তাহা পারেন নাই।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আলোচনা কালে ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে 'শর্মিষ্ঠা'ই আধুনিক নাটকের পথপ্রদর্শক, সুতরাং প্রাথমিক নাটকের দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহার মূল্য যে অনেকখানি ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হইলে ইহা শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে বন্দিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন —'তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে 'শর্মিষ্ঠা'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।'[১]

॥ পদ্মাবতী (১৮৬০) ॥ 'শর্মিষ্ঠা'র পরে মাইকেল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন।[২] পদ্মাবতীর বিষয়বস্তু তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেল চিরদিনই গ্রীক সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। এই অনুরাগের ফলে তাঁহার নাটক ও কাব্যের অনেক স্থলে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে Apple of discord নিয়া জুনো, ভিনাস ও প্যালাস দেবীত্রয়ের বিবাদ বাধিয়াছিল, এবং যাহার ফলে ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সেই উপাখ্যান সকলেরই সুবিদিত। ঐ গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন। 'পদ্মাবতী'র শচী, মুরজা ও রতি যথাক্রমে গ্রীক আখ্যানের জুনো, প্যালাস ও ভিনাসের অনুরূপ। প্যারিস ভিনাসকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া হেলেনকে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ট্রয় নগরীর ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী'র নায়ক ইন্দ্রনীলও রতিকে সর্বোত্তমা সুন্দরী এই অভিমত প্রকাশ করিয়া পদ্মাবতীকে লাভ করিয়াছিলেন এবং আবার হারাইয়াছিলেন। হেলেন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী এবং

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শকাব্দ, মাঘ।

২। অবশ্য 'পদ্মাবতী'র পূর্বেই তিনি তাঁহার প্রহসন দুইখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন

পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের নিজের স্ত্রী, তাহাদের মধ্যে এই পার্থক্য। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করিয়া মধুসূদন শেষে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন সাধন করিয়াছিলেন ইহাও তাঁহার মৌলিকতা বটে।

'শর্মিষ্ঠা'য় পরোক্ষভাবে নাটকীয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া নাটকের ঘাতপ্রতিঘাত ফুটিয়া উঠে নাই, একথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু 'পদ্মাবতী'তে মধুসূদন নাট্যকলা বিষয়ে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই নাটকের চরিত্রগুলি নিজেদের উক্তি দ্বারা বিকশিত হইতে পারিয়াছে। প্রথম অঙ্কে ইন্দ্রনীলের সহিত দেবীত্রয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং সৌন্দর্য-কলহ ও ইন্দ্রনীলের অভিমত দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার সূত্রপাত এই অঙ্কেই হইয়াছে। ইহার পর প্রসন্ন রতি এক দিকে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলনে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাজর্জরিত শচী তাঁহাদের সর্বনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইন্দ্রনীল ছদ্মবেশে মাহেশ্বরীপুরীতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশের কারণ জানা যায় না, এবং যে রকম তুচ্ছ কারণে ছদ্মবেশ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ছদ্মবেশের রহস্যময়তা নষ্ট হইয়াছে। পদ্মাবতী ইন্দ্রনীল রাজা নহেন একথা মনে করিয়া মর্মপীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় পদ্মাবতীর সম্মুখে ব্যক্ত হইলে পদ্মার বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যে নাটকটি রসঘন হইয়া উঠিত। ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া নাট্যকার যে নাটকীয় বিস্ময় ও উদ্বেগ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। শচীর আদেশে ইন্দ্রনীলের রাজপুরী হইতে কলি পদ্মাবতীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন। রাজরানীর পক্ষে রাজার এই অকারণ এবং অবিশ্বাস্য আদেশ অনুসারে সারথির সহিত পুরীর বহির্গত হওয়াটা যেন আমাদের বিশ্বাস-প্রবণতাকে আঘাত করে। কলি দুঃখিনী পদ্মাবতীকে রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার মনে প্রচণ্ড শোক ও গভীর নৈরাশ্য উদ্রেক করিয়াছেন। স্বামীর পুনর্মিলনের পূর্ব পর্যন্ত যদি পদ্মা স্বামীকে মৃত মনে করিতেন, তবে মিলনের মুহূর্তটি আরো বেশী নাটকীয় হইয়া উঠিত। যে ভাবে নাট্যকার রাজা ও পদ্মাবতীকে অঙ্গিরার আশ্রমে মিলিত করিয়াছেন এবং শচী ও রতির বিরোধ অবসান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাট্যকলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির শেষ হইয়াছে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে। সংস্কৃত নাটকে যেমন পরিপূর্ণ মিলনে ভরতবাক্যের মধ্যে সকলের শুভ কামনায়-নাটকের শেষ হয়, পদ্মাবতীতেও তাহাই হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যে সব চরিত্র বিষাদাত্মক হইতে পারিত তাহাদের মিলনেও যেন

বিষাদের ধাক্কা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। 'পদ্মাবতী' নাটকে তেমনি সকলের আনন্দপূর্ণ মিলনের মধ্যে ঈর্ষাদগ্ধ প্রতিশোধপরায়ণা অথচ পার্বতী আদেশে নিরুপায় শচীর ট্র্যাজেডির দুঃখপূর্ণ সুর ধ্বনিত হয়।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'পদ্মাবতী'র উপর 'শকুন্তলা'র স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের মিলন ও বিচ্ছেদ, এবং অবশেষে অঙ্গিরার আশ্রমে তাঁহাদের পুনর্মিলন—এ সমস্ত ঘটনা 'শকুন্তলা'র সহিত সাদৃশ্য ব্যক্ত করে। ইহা ছাড়া নাটকের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও 'শকুন্তলা'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'পদ্মাবতী'র তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষ দিকে সখীকে পদ্মা বলিতেছেন—

পদ্মা—'সখি! দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উঁ! আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)।

এই অংশটি একেবারে শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের শেষাংশের অনুরূপ।[১]

পদ্মাবতী নায়িকা হইলেও এই নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্র শচী। এই শচী মহিমময়ী দেবী স্বর্গের ইন্দ্রাণী নহেন, ইনি ঈর্ষা-কলহপরায়ণা অলিম্পিয়ার রাজ্ঞী জুনোর সমগোত্রীয়া। মাইকেল 'মেঘনাদবধে' হিন্দুর চির আরাধ্য দেবদেবীর চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে গুরুতর অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ বর্তমান নাটকে প্রযোজ্য হইলেও একথা সত্য যে শচীর চরিত্র চমৎকারভাবে সজীব ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। শচী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বিচারককে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং নানাভাবে নাটকের মধ্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শেকসপীয়রের গনেরিল ও লেডী ম্যাকবেথের ন্যায় শচীর দৃঢ় সংকল্প, প্রখর বুদ্ধি, সুচতুর উপায় উদ্ভাবনী শক্তি নিষ্করুণ কাঠিন্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিজের দলিত মর্যাদা উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীলের বিচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং কলিকে দিয়া পদ্মাবতীর কাছে ইন্দ্রনীলের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশোধস্পৃহা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দেবী পার্বতীর আজ্ঞায় তাঁহার মাথা নত

১। শকুন্তলা—অণসূয়ে, অহিণবকুসসূইএ পরিক্খদং মে চলণং। কুরবঅ সাহাপরিলগ্গং চ বক্কলং। দাব পরিপালেব মং, জাব ণ মোআবেমি।

(রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)।

করিতে হইল। নিরুপায় শচীর পরাজয় বাস্তবিকই দুঃখাবহ। শচী যখন শেষকালে বলিতেছেন—'হায়! আমার এত পরিশ্রম কি বৃথা হলো? অবশেষে রতিই জিতলে!' তখন তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত না হইয়া পারে না। মুরজা শচীর সহযোগিনী হইলেও তাঁহার মধ্যে আমরা বরাবর দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। তাঁহার মাতৃহৃদয় সচেতন মনের অজ্ঞাতসারেই কন্যাকে পীড়া দিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সহিত সম্বন্ধ-রহস্যোদ্‌ঘাটনের চমৎকার সামঞ্জস্য হইয়াছে।

রতি শচীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বুদ্ধি ও চাতুর্যে বার বার তিনি শচীর উদ্দেশ্য ব্যহত করিয়াছেন, এবং অবশেষে ভগবতীর সহায়তায় তিনিই সর্বশেষে জয়লাভ করিয়াছেন। এই তিন দেবীর প্রবল প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্তে মানব-চরিত্রগুলি নিতান্ত অসহায়ভাবে আবর্তিত হইয়াছে। রতির আনুকূল্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী মিলিত হইয়াছেন, শচীর প্রতিকূলতায় তাঁহারা আবার বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এবং ভগবতীর প্রসাদে তাঁহারা পুনর্মিলিত হইতে পারিয়াছেন। দেবচরিত্রের এই প্রাধান্যের জন্য মানবচরিত্র মোটেই ফুটিতে পারে নাই। পদ্মাবতী সরলা, কোমলপ্রাণা এবং পতিব্রতা স্ত্রী। কিন্তু ভাগ্য ও ঘটনার প্রতিরোধ করিয়া নিজের চরিত্র তিনি বিকাশ করিতে পারেন নাই। রাজা ইন্দ্রনীলকে নাটকের মধ্যে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায় এবং সৌন্দর্য বিচারে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত তাঁহার চরিত্রের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য নহে। বিদূষক অনেকস্থলে অনাবশ্যকভাবে নিজের স্থূল বুদ্ধির দ্বারা সকলকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছে। 'পদ্মাবতী'র বিদূষক 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষক অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাভাবিক, তবে তাহার রসিকতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর।

॥ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)॥ 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। পূর্ববর্তী নাটক দুইখানিতে তিনি সংস্কৃত প্রভাব একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রাচ্যনাট্যকল্প-বহির্ভূত বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিয়া তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি অর্থাৎ বিষাদান্তক নাটক, সাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বেই 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) এবং 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬) নামে দুইখানি বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, 'কৃষ্ণকুমারী'র

পূর্বে বিয়োগান্ত নাটক প্রণীত হইলেও সাধারণ্যে ঐ সব নাটকের প্রচার নাই, সুতরাং মধুসূদনকে সার্থক বিয়োগান্ত নাটকের প্রবর্তক বলিলে অন্যায় হইবে না।

'কৃষ্ণকুমারী' শুধু মাত্র প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নহে, ইহা মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভার প্রধানতম কীর্তি। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' উভয় নাটকেই ছিল পুরাণের কাহিনী—একটিতে হিন্দুপুরাণের কায়া আর একটিতে গ্রীক পুরাণের ছায়া। কিন্তু পুরাণ পুরাণই, তাহাতে বাস্তব নরনারীর জটিল হৃদয়দ্বন্দ্ব বিকাশ করিয়া দেখাইবার অবসর নাই। নাট্যকারের হাত সেখানে সুবিদিত কাহিনীর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সেজন্য এই দুইখানি নাটকে তিনি তাঁহার মৌলিক প্রতিভার লীলানৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত নাটকের রীতি ও নির্দেশ না মানিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' তাঁহার নাট্যপ্রবাহের বাধাটি সরাইয়া দিল, আপন প্রাণোচ্ছ্বাসে তখন তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। রাজপুত ইতিহাস প্রাচীন হইলেও তাহা আমাদের মত মানুষেরই ইতিহাস। এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাস্তব নরনারীর বিচিত্র হৃদয়-সংঘাত পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন। চরিত্রগুলি অন্তরাবেগ ও সৌন্দর্যে প্রাণময় হইয়া উঠিল বলিয়া বাহিরের সাজ-সজ্জার আর প্রয়োজন রহিল না।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করিবার সময় তাঁহার বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে যে সব চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি হইতে তাঁহার নাট্যজ্ঞান ও আলোচ্য নাটকের প্রেরণা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাটকের মৌলিক বিভিন্নতার কারণ সম্বন্ধে যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনি রসগ্রাহী। উক্ত পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands. The genius of the drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our language, has been compelled to admit this. In the Sermistha, I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play, I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look

this way or that way for poetry, if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.'

এই মূল্যবানপত্রখানি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মধুসূদন কাব্যোচ্ছ্বাস-বিরহিত, দ্বন্দ্ব সংঘাতমূলক নাটকের আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াও তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকে অত্যধিক কাব্যবশ্যতার জন্য সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে পারেন নাই। এই কাব্যবশ্যতা হয়তো কিছুটা তাঁহার স্বভাবগত কবিধর্মের কারণে, হয়তো বা কিছুটা জনচিত্তের সুলভ স্বীকৃতি পাইবার লোভে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে তিনি নিজের স্বভাব ও পরের রুচি উভয়কেই উপেক্ষা করিলেন, অবিমিশ্র নাট্য-প্রেরণা লইয়া তিনি নাট্যজগতের মূল মর্মলোকে প্রবেশ করিলেন। কবি মাইকেল তাঁহার নাট্যসত্তার পরিপূর্ণ গৌরবালোকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেলেন।

মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন, বস্তুজগতের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও তাহার অনিবার্য দুঃখময় পরিণাম প্রাচ্য রুচি ও আদর্শসম্মত না হইতে পারে কিন্তু তাহাই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি—মানবের সর্বোৎকৃষ্ট রসচেতনার অঙ্গীভূত শুধু নাটকে নহে, কাব্যেও এই অপূর্ব ট্র্যাজিক চেতনার পরিচয় মাইকেলই সবপ্রথম দিয়াছিলেন। পঙ্গু ও অক্ষম মানুষের দৈবনিয়ন্ত্রিত দুঃখ ও বিলাপের বিগলিত প্রবাহ যে করুণরসের পঙ্কিল ও আবর্তহীন জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ট্র্যাজেডির প্রখর জ্বালাস্পর্শে শুষ্ক-কঠিন সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইল। এই ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এ আর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। ১৮৬১ সাল মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বৎসর। ঐ সালে তাঁহার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য', শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ও শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' রচিত হয়। এই তিনখানি গ্রন্থই বিষাদান্তক ইহা মনে রাখিলে তৎকালে মানবজীবনের এই শাশ্বত শোকাবহ দিকে কবির চিত্ত কতখানি নিমগ্ন ছিল তাহা সহজেই ধারণা করা যাইবে। শুধু এই তিনখানি গ্রন্থে নহে তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ,—যথা 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'মায়াকানন', 'হেক্টর বধ কাব্য' প্রভৃতি দুঃখ ও বেদনাভারাক্রান্ত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এই সজীব প্রবৃত্তির সুতীব্র সংঘাতজনিত বাস্তব দুঃখশোকের চেতনা তাঁহার চিত্তে গভীরতম মূলে আবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য দুঃখশোকের চেতনামাত্রই সাহিত্যকে যথার্থ বিষাদকরুণ করিতে পারে না; সেই দুঃখশোকের যথোপযুক্ত প্রকাশরীতিও আয়ত্ত থাকা

দরকার। এই প্রকাশরীতি মধুসূদনের আয়ত্ত ছিল বলিয়াই তিনি মানবজীবনের বিষাদময় দিকটি এত গভীর ও উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন, ভাষার শব্দগাম্ভীর্য ও বর্ণনাশক্তির ওজস্বিতা প্রভৃতি দ্বারা তিনি যেমন 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর মধ্যে ট্র্যাজেডির সমুন্নত মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তেমনি দ্বন্দ্ব-জটিল ঘটনা-সমাবেশ সংলাপের অলঙ্কারভারমুক্ত ক্ষিপ্রতা ও চরিত্রের অন্তঃসংঘাতের চিত্র অঙ্কন করিয়া নাটককে যথার্থ ট্র্যাজিক গৌরবে ভূষিত করিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' সার্থক ট্র্যাজেডি শ্রেণীভুক্ত হইবার কারণ, নাট্যকার গোড়া হইতেই একটি অনুত্তীর্য অবস্থা-সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া নাটকের ঘটনাবেগকে এক অনিবার্য দুঃখপরিণতির দিকে অলজ্ঘ্য আকর্ষণে লইয়া চলিয়াছেন। সেজন্য মাঝে মাঝে ধনদাস, মদনিকা প্রভৃতির সরস কথোপকথন থাকিলেও কোথাও কোনো লঘু হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাট্যকার ইহার রসগাম্ভীর্য তরল করিয়া ফেলেন নাই।[১]

'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক শুধু যে সমকালীন রচনা তাহাই নহে, উভয়ের মধ্যে ট্র্যাজিক সহধর্মিতাও বিদ্যমান। উভয় রচনার মধ্যেই পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনার এক বহ্নিমান রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে অথচ এই ব্যক্তিগত বেদনার সহিত এক সুমহান স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণা উভয় চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণচরিত্রের বিশালতা অতলস্পর্শী সমুদ্রের সঙ্গেই উপমেয়। এই পাষাণসদৃশ পুরুষের অশ্রুবিধৌত রূপ দেখিয়া কঠিন হিমগিরির গাত্রবাহিত বিগলিত তুষারধারার কথাই মনে হয়। দৈব ও পুরুষকারের যুগপৎ প্রভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বে মিলিয়াছে বীরের হুঙ্কারের সহিত বিলাপীর হাহাকার। এই বিশালতা ও বিচিত্র রহস্যঘন বিরোধজটিল ব্যক্তিত্ব ভীমসিংহের নাই বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে পিতার করুণবাৎসল্যের সহিত রাজার কঠোর কর্তব্যের যে নিদারুণ সংঘাত ও তাহার ফলে যে অসহায় সঙ্কট ও

১। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

'As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this :—never strive to be comic in a tragedy. but if an opportunity presents itself unsought to be gay. do not neglect it in the less important scenes so as to have an agreeable variety '

অপরিমেয় অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বোধ হয় রাবণ চরিত্রেও নাই। রাবণের দুঃখে রহিয়াছে মর্মভেদী আত্মবিলাপের উর্ধ্বচারী বিস্তার আর ভীম সিংহের দুঃখে ফুটিয়াছে আত্মঘাতী হৃদয়ের ভূমিলুণ্ঠিত আর্তনাদ।

'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী মাইকেল টড-প্রণীত 'রাজস্থান' হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক নাটকের জনয়িতা, তেমনি ঐতিহাসিক নাটকেরও প্রবর্তয়িতা বটে। তাঁহার পরে বহুতর নাট্যকার 'রাজস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানা বীরত্বব্যঞ্জক ও স্বদেশপ্রেমমূলক আখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন। দেশের অতীত গৌরবময় কাহিনী নাটকের মধ্যে রূপ নিয়া আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে অনেকখানি জাগ্রত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। মাইকেলের পরে নাট্যকারগণ অনেক নাটকে ইতিহাসের গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নাটকে ইতিহাসেব সহিত মিল রাখিয়াই চলিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। মধুসূদন তাহাব ট্র্যাজেডির জন্য কৃষ্ণকুমারীর শোকাবহ কাহিনী নির্বাচন কবিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের বিষাদান্ত পরিণতি যথেষ্ট করুণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু করুণ হইলেও নাটকটি প্রকৃত ট্র্যাজিক হইয়াছে কিনা তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য।

নাট্য সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁহার 'Theory of Drama'তে একটি চমৎকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষচরিত্রই সব সময়ে ট্র্যাজেডির নায়ক হইয়া থাকে। স্ত্রীচরিত্র যেখানে প্রধান চরিত্র সেখানে সেই চরিত্র নিশ্চয়ই বিশেষ শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, পুরুষভাবাপন্ন হইবে।[১] কোমল-ভাবাপন্ন, দুর্বলচিত্ত নারী ট্র্যাজেডির মধ্যে অপ্রধান ও প্রভাবহীন। প্রকৃতপক্ষে 'ওথেলো' এবং 'হ্যামলেট' নাটকে ডেসডিমনা ও ওফেলিয়ার কোনো গুরুত্ব এবং প্রভাব নাই। পক্ষান্তরে লেডী ম্যাকবেথ, ইফিজেনিয়া, ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা, মিডিয়া, গনেরিল এ সব চরিত্র নারীত্ব-ভাববর্জিত, অসম শক্তিশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পুরুষায়িত। কৃষ্ণকুমারীর নামে নাটকের নাম হইলেও সে সরলা, কোমলপ্রাণা, অনভিজ্ঞা বালিকা; ট্র্যাজেডির নায়িকা হইবার মত বৈশিষ্ট্য তাহার নাই। অ্যারিস্টটল তাঁহার 'Poetics'এ বলিয়াছেন যে ট্রাজেডির নায়ক অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ হইবেন না বটে, কিন্তু তিনি

১। *Theory of Drama* by A. Nicoll, p. 127-158

পাপী ও দুষ্কৃতকারীও হইবেন না এবং কোনো মানবীয় ভ্রান্তির জন্য ট্রাজেডি সংঘটিত হইবে—

'But a character of this is one who neither excels in virtue and justice, nor is changed through vice and depravity, into misfortune from a great renown and prosperity, but has experienced this change through some (human) error.'[১]

এইরূপ অজানিত ভ্রান্তির জন্যই ইডিপাসের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছিল। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি সব সময়েই নায়কের স্বকৃত কোনো ক্রিয়ার দ্বারা স ঘটিত হয়। লীয়র, ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট ইহাদের ট্র্যাজেডি নিজেদের কোন ইচ্ছা কিংবা ক্রিয়ার ফলেই হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি তাহার নিজের কোনো ভ্রান্তির দ্বারা ঘটে নাই, অথবা তাহার কোনো কার্যের দ্বারাও ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে নাই। মদনিকা, ধনদাস প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির জন্য দায়ী। সুতরাং কৃষ্ণকুমারীকে কখনো ট্র্যাজিক নায়িকা বলা চলে না।

তবে ইহা সত্য যে, ভীমসিংহের চরিত্র যথার্থই ট্র্যাজিক হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই নাটকখানি উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ভীমসিংহের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া দুই প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাজা তাঁহার কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কাহাকে তিনি অসন্তুষ্ট করিবেন? স্নেহান্ধ পিতা যদি কন্যাকে রক্ষা করিতে যান, তবে ইহাদের প্রদীপ্ত ক্রোধানলে দেশ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আবার দেশপ্রাণ রাণা যদি দেশের হিত চান তবে কন্যাকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই নিদারুণ সঙ্কটে পড়িয়া বৃদ্ধ রাজার জীবন নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে দেশহিতৈষণাই জয়লাভ করিল। দেশ এবং জাতির কল্যাণার্থ গ্রীক সেনাপতি অ্যাগামেমনন নিজের কন্যা ইফিজেনিয়াকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এখানে দেশের ও প্রজার মঙ্গলের জন্য ভীমসিংহ নিজের কন্যাকে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিজের কর্তব্যবোধকে উচ্চে স্থান দেওয়াতে দেশ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। নিদারুণ দুঃখ ও গ্লানিতে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। কন্যা-স্নেহান্ধ রাজা লীয়র উন্মত্তভাবে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির

১। *Europen Theories of Drama* by Clark, Aristotle, ch. ix

মধ্যে যেমন নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ভীমসিংহকেও ঝড়-দুর্যোগের মধ্যে নিতান্ত অসহায়ভাবে প্রলাপ বকিতে দেখিয়া, প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে আমাদের অন্তর রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভীমসিংহ শেষদিকে একেবারে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য যদি কেহ সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী হইয়া থাকে, তবে সে মদনিকা। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনার সহচরী মদনিকার মতই সে চতুরা এবং বুদ্ধিশালিনী। মদনিকা মধুসূদনের প্রিয় চরিত্র, ইহা তাঁহার এক পত্রে জানা যায়।[১] ধনদাস ধূর্ত, কিন্তু মদনিকা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি ধূর্ত। ধনদাস উদয়পুরে জগৎসিংহের বিবাহ প্রস্তাব নিয়া গিয়াছে কিন্তু মদনিকা বিলাসবতীর দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সেই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী যাহাতে মানসিংহের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেজন্য মদনিকা তাহাকে চিত্রপট দেখাইয়াছে, মানসিংহের কাছে কৃষ্ণকুমারীর আসক্তির কথা জ্ঞাপন করিয়াছে, ধনদাস ও মরুদেশের দূতের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়াছে, এবং সব সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। মদনিকা এ সমস্ত ব্যাপার না করিলে জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহে কোনোই বাধা হইত না এবং নাটকের পরিণতি বিষাদান্ত হইত না।

মদনিকার পরেই নাটকের মধ্যে ধনদাসের স্থান উল্লেখযোগ্য। ধনদাস ইয়াগোর মতই ক্রূর স্বভাব, অনিষ্টান্বেষী এবং দুর্মতিপরায়ণ। তবে ইয়াগোর সহিত ধনদাসের এই পার্থক্য যে, ইয়াগোর মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীন ক্রূরতা (motiveless malignity) লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধনদাস স্বার্থসিদ্ধির আশাতেই মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়াছে। তবে ধনদাসের খলতা ও নীচাশয়তা কখনো শক্তিশালী ও নাটকের মধ্যে বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই; কারণ অধিকতর চতুর ও বুদ্ধিশালিনী মদনিকার দ্বারা তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কার্য বার বার ব্যাহত হইয়াছে। মদনিকা-চরিত্র মধুসূদনের প্রিয় ছিল বলিয়া সে গুরুতর অন্যায় করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোনো শাস্তি দেন নাই; অথচ ব্যর্থ ও বিফল ধনদাসকে অপমানিত, শাসিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছেন।

প্রথম দুই নাটকে মধুসূদন যে কৃত্রিম কবিত্বের অনাবশ্যক আধিক্য দ্বারা নাটকের গতি মন্থর ও চরিত্রগুলিকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকুমারী'

১। 'But that Madanika is my favourite'—'জীবনচরিত,' পৃ° ৪৬৫।

নাটকে সেই দোষ অনেকখানি পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাটকে চরিত্রগুলি তাহাদের অর্থপূর্ণ উক্তিদ্বারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে এবং নাটকের কাহিনী ঘটনার জটিলতা সত্ত্বেও কেন্দ্রচ্যুত কিংবা ঐক্যহীন হইয়া পড়ে নাই। জগৎসিংহ-বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাসের কাহিনী উদয়পুরের রাজপরিবারের সহিত চমৎকারভাবে সুসমঞ্জস হইয়া উঠিয়াছে, এবং মদনিকা যে কারণে উদয়পুরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া যেভাবে মরুদেশের রাজাকে নাটকের মধ্যে আনয়ন করিয়াছে, তাহার বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য ও কৌশলপূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী চিত্রপট দেখিয়াই মানসিংহের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হইলেন, এই ব্যাপার যদিও মধুসূদন রুক্মিণীর সহিত তুলনা করিয়া স্বাভাবিক বলিতে চাহিয়াছেন, তবুও এরূপ প্রেম আমাদের মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও সংশয় জন্মাইয়া দেয়। কৃষ্ণকুমারীর এই প্রেমের জন্য তাহার মনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই, এবং বাহিরের কোনো ঘটনা কি চরিত্রের সহিত তাহার কোনো সংঘাতও দেখা দেয় নাই। সুতরাং তাঁহার প্রেমাসক্তি নাটকের মধ্যে মূল্যহীন ও নিরর্থক। নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে অভিনয়ের অযোগ্য দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কস্থ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ধনদাসকে জব্দ করিবার জন্য মদনিকা জগৎসিংহকে লইয়া অন্তরালে অবস্থিত হইয়া রাজাকে ধনদাস ও বিলাসবতীর কথোপকথন শুনাইয়াছে। এখানে রাজা ও মদনিকা নিশ্চয়ই ধনদাস ও বিলাসবতীর অদৃশ্য কোনো স্থলে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই দর্শকবর্গের কাছেও অদৃশ্য থাকিবেন। অথচ মধুসূদন এইখানে মদনিকা ও রাজার কথপোকথন নিবদ্ধ করিয়া রঙ্গমঞ্চের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। এ সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং প্রকৃতই 'বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।'

॥ মায়াকানন (১৮৭৪) ॥ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের তের বৎসর পরে মধুসূদন 'মায়াকানন' রচনা করেন। তখন তাঁহার আয়ুর চক্র শেষ পরিক্রমণ করিতেছে, প্রতিভার গোধূলিছায়া ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে। যে শোকাবহ দুর্গতি ও দুরবস্থার মধ্যে তিনি নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ইহার দোষগুণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।[১] তখন তাঁহার চোখের সম্মুখে

১। 'নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।
—জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

নামিয়াছে কাল রজনীর ভয়াল অন্ধকার—'আসিছে রজনী' নাহি যার মুখে কথা বায়ু রূপ স্বরে, নাহি যার কেশ পাশে তারা রূপ মণি।' সেই অন্ধকারের ছায়া 'মায়াকানন'-এর সর্বত্রই বিরাজমান। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকও বিষাদময় ও বিয়োগান্তক। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে বিষাদের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটি সবল সংগ্রামের রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে; সেখানে দ্বিধাবিভক্ত সত্তার নিষ্ঠুর সংঘাতে একটি উত্তেজনাকর গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। সেই সংগ্রাম ও সংঘাতের কোনো চিহ্ন 'মায়াকানন'-এ নাই।[১] ইহাতে দৈবঘটিত দুঃখের কাছে নিরুপায় মানুষের প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণই বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য ইহাতে জ্বালা ও উত্তেজনার পরিবর্তে আছে কেমন কান্না ও কাতরতা। ট্র্যাজেডির গৌরবচূড়া লুটাইয়া পড়িয়াছে কারুণ্যের কলধারায়। 'শর্মিষ্ঠা' হইতে 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার ক্রমোচ্চ ঊর্ধ্বে আরোহণ আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র পর আবার সেই প্রতিভার নিম্নপথে অবরোহণ হইয়াছে। সেজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র দোষ পুনরায় 'মায়াকানন'-এর মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ সেই সংস্কৃত নাটকের অনুকৃতি—সংলাপের দীর্ঘতা, ভাবের কৃত্রিম আতিশয্য, কাব্যমিশ্রিত কারুণ্যের একাধিপত্য—সব আবার যেন মাইকেলের জীর্ণ হস্তের ক্লান্ত লেখনীকে পাইয়া বসিয়াছে।

'মায়াকানন' একটানা দুঃখের কাহিনী, কিন্তু এই দুঃখের সঙ্গত কারণ ও অনিবার্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে এক অবিশ্বাস জাগিয়া থাকে। অজয় ও ইন্দুমতীর প্রেম নিতান্তই কল্পনাচারী; উভয়ের মধ্যে কোনো গভীর প্রেমের দৃশ্য আমরা দেখি নাই, শুধু কেবল দর্শন ও শ্রবণেই এই প্রেমের উৎপত্তি ও অধিষ্ঠান। সেজন্য তাহাদের বিলাপ ও খেদোক্তি অনেকটা কৃত্রিম ও প্রাণহীন মনে হয়। আর একটি কথা—উভয়ের প্রেমে দুর্নিবার প্রতিবন্ধক কোথায়? আমরা কেবল জানিয়াছি, দেবতারা তাহাদের বিবাহ চান না এবং অজয়ের মৃতপিতার আত্মাও ইহার প্রতিকূল। অথচ অজয় ও ইন্দুমতীর মিলন না হওয়া সত্ত্বেও তো উহাদের চরম ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। মিলন হইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর আর কি সর্বনাশ ঘটিতে পারিত? প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা তাহাদের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা

১। 'মায়াকানন' এর ট্র্যাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন এখানেও তেমনি নায়ক-নায়িকার সব আশা ভরসা নিঃশেষে চুকিয়া গিয়া যবনিকা পতন হইয়াছে।'

—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৪৯

হইতেছেন মন্ত্রী ও অরুন্ধতী। ষড়যন্ত্র করিয়া ধূমকেতুর কাছে দূত প্রেরণ না করিলে ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। নাটকখানির যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দৈবনির্ভরতা ও সংস্কৃত নাটকের প্রতি আনুগত্যের ফলে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তবে নাট্যরচনার এই অসিদ্ধির মধ্য দিয়াও কিন্তু কবিমানসের একটি রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং তাহা হইতেছে এই যে, মাইকেল জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া দুঃখবাদী, দৈবনির্ভরশীল, ভারতীয় ভাবমগ্ন শ্রীমধুসূদন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রহসন

মধুসূদনের নাটকের দোষত্রুটির উল্লেখ আমরা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রহসন ঐ সব দোষত্রুটি হইতে আশ্চর্য ভাবে মুক্ত। প্রহসন দুইখানা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলায় যে দুই এক জন শ্রেষ্ঠ প্রহসন-রচয়িতা জন্মিয়াছেন মাইকেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি দুইখানির বেশি প্রহসন লিখেন নাই। যদি লিখিতেন তবে প্রহসনকাররূপে তিনি দীনবন্ধু মিত্র ও অমৃতলাল বসুর ন্যায় খ্যাতি অর্জন করিতেন। মধুসূদনের প্রহসনগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিতম প্রহসন বলা যায় কারণ তাঁহার পূর্বে প্রহসন লেখা হইলেও বর্তমানে তাহা পাওয়া যায় না।[১] প্রহসন লিখিতে তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রহসন দুইখানা লিখিবার জন্য পরে আক্ষেপ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার সমসাময়িক লোকেরাও এই বই দুইখানাকে বেশি ভালো চোখে দেখে নাই। মধুসূদনের ব্যঙ্গ সার্থক ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল সেজন্য তখনকার সমাজ তাঁহার প্রহসনকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' তখনকার যুবকসমাজের দোষ ও অনাচার লইয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া সেই যুবকসমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি, পাইকপাড়ার রাজাদিগকে ঐ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়া যথেষ্ট সৎসাহসের (?) পরিচয় দিয়াছিলেন। মধুসূদনের অন্যতর প্রহসন বন্ধ করিবার জন্য কোনো লোক আসিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না বটে, তবে রাজদ্বয় বিরক্ত হইয়া উভয় প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া সমাজের প্রাচীন ও নবীন উভয় সম্প্রদায়ের মান

১। *Western Influence in Bengali Literature* by P. R. Sen p 233

২। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—'জীবনচরিত', পৃঃ ৩১০-৩১১

রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রহসনের অভিনয় না হওয়াতে নিরাশ হইয়া মধুসূদন তাঁহার বন্ধু কেশববাবুকে এক পত্রে লিখিয়াছেন—

'Mind, you broke my wings once about the farces : if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese.'[১]

আমরা কল্পনা করিতে পারি যে সমসাময়িক সমাজের দ্বারা এভাবে নিরুৎসাহিত না হইলে হয়তো তিনি আরও প্রহসন লিখিতেন। প্রহসন-লেখক সমাজের দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি ও গ্লানি অনাবৃত করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধন করেন বটে, কিন্তু সমাজের কাছে তিনি চিরকালই নিন্দা ও তিরস্কার লাভ করেন। শুনা যায় জগদ্বিখ্যাত প্রহসনকার মলিয়ের সমসাময়িক সমাজে এত অপ্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁহার সংকার করিবার লোক জুটে নাই।

মধুসূদনের প্রহসন আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে হয় যে যাহার দৃষ্টি ও কল্পনা সব সময়ে গুরু ও গম্ভীর ভাবদ্যোতক বিষয়ে লিপ্ত থাকিত তাঁহার দ্বারা কি ভাবে এই লঘু, তরল ও হাস্যোদ্দীপক প্রহসন লেখা সম্ভব হইল? যিনি হোমার ও মিলটনে ডুবিয়া থাকিতেন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী', 'মেঘনাদ বধ' লেখা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু তিনি যে বাস্তব সমাজে মিশিয়া এভাবে হাসিতে ও হাসাইতে পারেন তাহা বিস্ময়কর নয় কি? বিস্ময়কর হইলেও মধুসূদনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সহজ ও সুসাধ্য হইয়াছিল।

মধুসূদনের নাটকের আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার নাটকের মধ্যে যথেষ্ট সংস্কৃত প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রহসনের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব মোটেই নাই। প্রহসনের সংলাপ নাটকের ন্যায় মোটেই আড়ষ্ট ও কৃত্রিম নয়। সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় সংলাপ লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নাটকীয় হইয়াছে।

সামাজিক প্রহসন রচনা করিতে গেলে সমাজ ও ইহার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। মধুসূদনের প্রহসনগুলি পড়িলে মনে হয় যে, তিনি 'মধুকরী কল্পনা'য় মগ্ন থাকিলেও তাঁহার সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানের মোটেই অভাব ছিল না। মধুসূদন দুইখানা প্রহসনে সমাজের দুই বিপরীত ধারার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর

১। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পত্র—'জীবনচরিত'—পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৭৭

মধ্যভাগে পাশ্চাত্যবিলাসী 'ইয়ং বেঙ্গল' যেমন সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছিল, রক্ষণশীল প্রাচীন সম্প্রদায় তেমনি ভিত্তিহীন প্রথা ও যুক্তি-হীন আচারসমূহ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি, মূঢ়তা ও কাপট্য মধুস্থদন পরম উপভোগ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং 'ইয়ং বেঙ্গল'-ভুক্ত হইয়াও যেমন এই সম্প্রদায়ের অধঃপতিত অবস্থার কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে দ্বিধা করেন নাই, তেমনি তাঁহার বিপক্ষ প্রাচীন সম্প্রদায়ের কথা বলিতেও অতিরঞ্জন কিংবা অতিকথন দোষে দোষী হন নাই; প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ন্যায় নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী দৃষ্টি লইয়া স্বয়ং দূরসংস্থিত হইয়া হাস্যে, কৌতুকে, ব্যঙ্গে, সহানুভূতিতে তাঁহার চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজকে তিনি আঘাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই আঘাতের পিছনে তাঁহার করুণার্দ্র হৃদয়ের সন্ধান পাইতে দেরী হয় না। প্রহসন দুইখানা উদ্দেশ্যমূলক হইলেও সেই উদ্দেশ্য কখনো প্রধান হইয়া ঘটনা কিংবা চরিত্রকে খর্ব করে নাই। নাটকীয় রস আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বইখানাকে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক করিয়া রাখিয়াছে।

॥ একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ॥ মাত্র দুই অঙ্কে প্রহসনখানি বিভক্ত। প্রহসন সমাজের কোনো বিশেষ দিক আলোকিত করিয়া ইহার দোষ, অসঙ্গতি অনাবৃত করিয়া দেয়, মানবজীবনের কোনো গভীর কি মৌলিক সমস্যার আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য এই জাতীয় নাটকের মধ্যে বিস্তৃতভাবে চরিত্র-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মানুষে. জীবনের কয়েকটি অসঙ্গত, ভ্রান্ত মুহূর্তকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা ইহাতে করা হয়। ঘটনার দ্বন্দ্বে ও ভাবের বিরোধিতায় হাস্যরস সৃজন করিতে পারিলেই ইহার উদ্দেশ্য সদ্ধ হয়, সেজন্য প্রহসন আকারে সাধারণত ছোট হয়। কিন্তু ছোট হইলেও মাইকেল কয়েকটি খণ্ডচিত্র আঁকিয়া তৎকালীন সমাজের এক নিখুঁত পরিচয় দিয়াছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার এবং কালীনাথের কথোপকথনে তখনকার সমা.জর 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রকৃতি অনেকখানি ব্যক্ত হইয়াছে। মদ্যপানে আসক্তি প্রথম হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। নবকুমার এবং কালীনাথ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, কুসংস্কার-বর্জিত সভ্য যুবক। সুতরাং তাহাদের পক্ষে মদ খাওয়াটা সভ্যতার অঙ্গবিশেষ। রাজনারায়ণ বসু তখনকার যুবকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ

খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা'।[১] এই মদ্যপানাসক্তি এরূপ ব্যাপক-ভাবে এক দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজের মধ্যে সংক্রামিত হয় যে, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি সুরাপান নিবারণী আন্দোলন করিয়া সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২] মাইকেলের পরে দীনবন্ধু মিত্র এবং অন্যান্য প্রহসনকার ঐ সমস্যা নিয়া প্রহসন রচনা করিয়াছেন। কালীনাথ ও নবকুমারের কথোপ-কথনে প্রচুর ইংরাজী শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আমরা তখনকার যুবকগণের কথাবার্তার বিকৃত ধরনের পরিচয় পাই। 'আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctorকে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেশ অপারেট করছিল, four, five times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন'[৩] —এরূপ হাস্যাস্পদ বাক্য তখনকার লোকে ব্যবহার করিত। কালীনাথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং গীতগোবিন্দের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, ইহাতেই স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাৎকালিক যুবকসমাজের বীতরাগ প্রকাশ পাইতেছে। স্বয়ং মধুসূদন 'পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকেও তিনি অতি নিম্নস্থানীয় মনে করিতেন।'[৪] সুতরাং কালীনাথের পক্ষে গীতা কিংবা গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অস্বাভাবিক নহে। প্রথম গর্ভাঙ্কে যেভাবে কালীনাথ ও নবকুমার পরম ভক্তিমান বৈষ্ণব সাজিয়া বৃদ্ধ কর্তামহাশয়কে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের মধ্য দিয়া একদিকে কর্তামহাশয়ের সারল্য ও বাৎসল্য ও অন্যদিকে যুবকদ্বয়ের চরিত্রের আত্যন্তিক হীনতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অভিনব চাতুরী না খেলিলে নবকুমারের পক্ষে বাহিরে গিয়া 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা'য় মদ ও বারবনিতার পবিত্র সংসর্গে জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় কতকগুলি চিত্র দ্রুত আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয়। বিমূঢ়, সরলপ্রাণ, বিপর্যস্ত বাবাজী, পরিহাস-রঙ্গিণী বারবিলাসিনী, সন্ত্রস্ত চৌকিদার ও অর্থলোলুপ সারজেণ্ট, পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান মুটিয়াদ্বয়, নর্তকী নিতম্বিনী ও পয়োধরী প্রভৃতি মিশিয়া এক বিচিত্র রস ও কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। নিখুঁত বাস্তবতায় ও বর্ণনার সরসতায়

১। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ২৭

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৩৫৯-৬০

৩। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৫২

৪। 'জীবনচরিত', পৃঃ ৪৫

চিত্রগুলি উজ্জ্বল ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। রুচিবাগীশ সমালোচক হয়তো রূঢ় বাস্তবের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মাইকেলের নিন্দা করিবেন, কিন্তু সত্যসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার নির্ভীক সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিবেন। বার-বনিতা-পল্লীর বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি মূল কাহিনীর সহিত অসংলগ্ন নয়, কারণ এই রকম পল্লীর কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা'র আলোকপ্রাপ্ত সভ্যবৃন্দের সমাগম হইবে। মধুসূদনের ব্যঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার অধিবেশন। সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও রীতিধর্ম পরিত্যাগ করিতে সভ্যগণ সোৎসাহে বদ্ধপরিকর। ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ যেভাবে মাণিকতলার সিংহবাবুদের উদ্যানে 'একাডেমি'র অধিবেশনে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া বাংলার সমাজ ও ধর্ম ধ্বংস করিতে চাহিতেন এখানে যেন তাহারই পুনরভিনয় চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত বাক্‌সর্বস্ব বিদ্রোহী যুবকবৃন্দের মূল লক্ষ্য যে সমাজ-সংশোধন কিংবা ধর্ম-সংস্কার নয়, পরন্তু ইন্দ্রিয়বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল এপিকিউরীয় নীতিই ইহাদের সার কথা, নবকুমারের উক্তির মধ্য দিয়া মাইকেল ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—'ইন দি নেম অফ ফ্রীডম লেট যাস এঞ্জয় আওযারসেল্‌ভ্‌স্'। যাহারা অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সর্বময় স্বাধীনতার পথ আলোকিত করিতে চাহিতেছিল, তাহারাই আবার তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে বিবাদে মত্ত, স্বাধীনতার বাহিনী সুরা ও গণিকাদেবীর উপাসক—মাইকেল সরস ব্যঙ্গের আঘাত দিয়া ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, একেই কি বলে সভ্যতা? মাইকেলের পরিহাস-রসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তখন দেখা গিয়াছে, যখন নবকুমার ইংরাজী গালিতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছে—'ট্রাইফ্‌লিং? —ও আমাকে লায়ার বললে আবার ট্রাইফ্‌লিং? ও আমাকে বাংলা ক'রে বললে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু লায়ার—এ কি বরদাস্ত হয়?'

শেষ দৃশ্যে মদোন্মত্ত নবকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যে কুৎসিত ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছিল তাহার পূর্বে নাট্যকার অন্তঃপুরিকা রমণীদের একটি লঘু চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাসখেলারত, রসিকতাপ্রিয় রমণীগণ তৎকালীন নারী-সমাজের প্রকৃতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই রমণীয় চিত্রদ্বারা আমাদের মনকে তরল করিবার পরক্ষণেই নাট্যকার প্রমত্ত নবকুমারের উন্মত্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আমাদিগকে আঘাত করিয়া আমাদের মন ভারাক্রান্ত

করিয়া তুলিয়াছেন। তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গল,' মাতাপিতা ও ভগ্নী প্রভৃতির সম্মুখে নবকুমারের এই বীভৎস আচরণ সুস্থিরভাবে প্রত্যক্ষ করিলে অনেক শিক্ষালাভ করিতেন সন্দেহ নাই। এই দৃশ্য দর্শনে অস্বস্তি, লজ্জা ও ঘৃণায় যেমন শরীর, মন আকুঞ্চিত হইয়া উঠে, তেমনি সমাজের গুরুতর সমস্যার প্রতি অব্যর্থভাবে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। মধুসূদনের ক্ষমতা অসীম বটে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' মাত্র একদিনের ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একদিনের কাহিনীর মধ্যে মাইকেল কোনো বিষয় বর্ণনা করিতে বাকি রাখেন নাই। অথচ তিনি অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় একটা বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। খণ্ড-চিত্রগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া এক অখণ্ড রসের সৃষ্টি করিয়াছে। চরিত্রগুলির সংলাপ সম্পূর্ণ বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চিত্রাঙ্কন এমন সার্থক হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—'আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট'—ইহা অত্যুক্তি নয়।

পূর্বতন প্রহসনখানি যে বৎসর লিখিত হইয়াছিল সেই বৎসরেই (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) মধুসূদনের অন্যতব প্রহসন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। প্রহসনখানির অদ্ভুত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দিয়াছিলেন। নাম যেমন অদ্ভুত, ইহার বিষয়বস্তুও তেমনি বিস্ময়জনক। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল', এবং এই প্রহসনখানির মধ্যে তাঁহার উপহাসের পাত্র ভণ্ড, দুষ্কৃতিকারী, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজ। পূর্ব প্রহসনখানি যেমন নবীন সমাজের বিরাগের কারণ হইয়াছিল, এখানিও তেমনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের দ্বারা নিন্দিত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সে-কারণেই প্রহসনখানির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মুসলমান রমণীর প্রতি ভক্তপ্রসাদের আসক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই রকমের লোক তখনকার সমাজে প্রকৃতই ছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—'মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ; সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্যব্রত ছিল।'[১]

১। 'জীবনচরিত',—পৃঃ ৩০৪

'একেই কি বল সভ্যতা'র ঘটনাস্থল নবীন সমাজের লীলাক্ষেত্র কলিকাতা শহর, কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র সংযোগস্থল প্রবীণ সমাজের পীঠস্থান পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিলেও মাইকেল তাহার কথা জীবনের কোনে দিনই ভুলেন নাই, 'চতুর্দশ পদাবলী'তে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যেও তিনি পল্লীজীবনের কথা স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের হানিফ, ফতেমা, ভগী, পঞ্চীর মত দরিদ্র দুঃস্থ ও উপদ্রুত লোকের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত দুর্বল লোকের চরিত্র তিনিই প্রথম দরদের সঙ্গে অঙ্কন করেন। তাঁহার পরে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক ইহাদের কথা সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছেন। বিধর্মী, সমাজদ্রোহী মাইকেলের পক্ষে পল্লীসমাজের দুর্গত লোকের চরিত্রসম্বন্ধে আগ্রহবান হওয়া বিস্ময়কর বটে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫১ সনের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য' সম্বন্ধে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মলিয়ের-এর 'তারতুফ' (Tartuffe) নাটকের প্রভাবে লিখিত। তারতুফ নামে এক ব্যক্তি ধর্মের ভান করিয়া অর্গ (Orgon) নামে সরলপ্রাণ লোকের সংসারে প্রবেশ করে, এবং তাহার পত্নীকে ফুসলাইতে চেষ্টা করে। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সে ঐ পরিবারের অনিষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই মোটামুটি 'তারতুফ'-এর বর্ণিত বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'তারতুফ'-এর সহিত মাইকেলের প্রহসনের জায়গায় জায়গায় মিল থাকিলেও অবিকল সাদৃশ্য নাই। মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

প্রথম প্রহসনখানির ন্যায় দ্বিতীয় প্রহসনখানিও দুই অঙ্ক ও চার গর্ভাঙ্কে সমাপ্ত। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে সমগ্র 'ইয়ং বেঙ্গল সমাজ মাইকেলের বর্ণনীয় বিষয়। আর এই প্রহসনখানিতে ভক্তপ্রসাদই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কাহিনী যেন তাঁহার চরিত্র বিকাশ করিবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কাহিনীর সহিত অসংলগ্ন ভক্ত ও আনন্দের কথাবার্তার মধ্য দিয়া ভক্তপ্রসাদের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভক্তপ্রসাদ বড়ো হুঁশিয়ার জমিদার, গরীব চাষীর খাজনার এক পয়সা মাপ

তাঁহার কাছে চলিবে না, এক কানাকড়ি সাহায্যও তাঁহার কাছে কেহ পাইবে না। অথচ তিনি পরম রসিক ব্যক্তি, পরস্ত্রীর রূপবর্ণনা শুনিলে তিনি ভাববিহ্বল হইয়া ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করেন। হানিফের স্ত্রী ফতেমার কাছে কুটনী পাঠাইয়া তিনি তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, বৃদ্ধ চেহারাকে সাজসজ্জার দ্বারা যথাসম্ভব নব্য যুবার মতো বানাইয়া তিনি অভিসারে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। যিনি সর্ববিধ কুকর্মে রত তিনিই আবার পুত্রের ধর্মাচরণের প্রতি বিশেষ সতর্কদৃষ্টি, হিন্দুধর্ম সংরক্ষণে নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যিনি মুসলমানী স্ত্রী-সংসর্গে প্রবৃত্ত, মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য খাওয়াসম্বন্ধে তাঁহারই বিষম আতঙ্ক। মধুসূদনের ব্যঙ্গ এইখানে সর্বাপেক্ষা তীব্র ও সার্থক হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদ তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইয়াছে; এবং তাহার মতিবও পরিবর্তন হইয়াছে। ভক্তপ্রসাদের যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়া নাট্যকার poetic justice দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু মাত্রাধিক্যের জন্য দৃশ্যটি একটু অসঙ্গত হইয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে নবকুমারের চরিত্র শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না করিয়া মধুসূদন আমাদের মনকে বেশি করিয়া বিচলিত করিয়াছেন। 'বুড়ো শালিকে'র মধ্যেও যদি তিনি ভক্তপ্রসাদের চরিত্র শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে না দেখাইতেন তাহা হইলে সমস্যার আঘাত অধিকতর মর্মস্পর্শী হইত। প্রহসনের শেষে যে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি যোজিত হইয়াছে তাহা কৌতুকপূর্ণ হইলেও ভক্তপ্রসাদের মুখ দিয়া বাহির হওয়াতে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

গরীব চাষী হানিফের চরিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। হানিফ দারিদ্র্য-পীড়িত, দুঃখগ্রস্ত, কিন্তু কোপনস্বভাব ও গোঁয়ার। তবে শেষ দৃশ্যে ভক্ত-প্রসাদের সঙ্গে তাহার শ্লেষাত্মক কথাগুলি অস্বাভাবিক হইয়াছে। চিন্তাক্লেশ-ভারাক্রান্ত, সরল-স্বভাব ব্রাহ্মণ বাচস্পতির চরিত্র ভক্তপ্রসাদের বিপরীতধর্মী হইয়া নাট্যকারের অপক্ষপাতী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিও type হিসাবে চমৎকাররূপে ফুটিয়াছে। কুটনী পুঁটীর চরিত্র মাইকেল প্রাচীন বাংলা সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পল্লীগীতিকা প্রভৃতিতে অনুরূপ চরিত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাইলকের ভৃত্য লনসিলট গোবোর (Launcelot Gobbo) ন্যায় ভক্তপ্রসাদের অনুচর গদা প্রহসনের মধ্যে হাস্যরস যোগাইয়াছে। তাহার 'আজ্ঞে-এ-এ-এ' অভিনয়ের সময় দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদন যতখানি সূক্ষ্ম নাট্যকলা-বোধ

ও নিঁখুত পরিপাটি রচনার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসনখানার মধ্যে ততো পাবেন নাই। সেজন্য জায়গায় জায়গায় রচনার স্বতঃস্ফূর্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়। রাম ও গদার কথোপকথন হাস্যরসাত্মক হইলেও অবাস্তব। শেষ দৃশ্যের কৃত্রিমতার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য দোষ থাকিলেও সামাজিক প্রহসনরূপে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মূল্য অনেকখানি, কোনো কোনো দিক দিয়া দ্বিতীয় প্রহসনখানার মূল্য ও প্রভাব প্রথমখানার অপেক্ষাও অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাইকেল গ্রামের মূর্খ, অশিক্ষিত কৃষক পরিবারের মুখে গ্রাম্যভাষা দিয়া ঐ সব চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, হানিফ মুসলমান, সেজন্য প্রহসনকার তাহার কথায় প্রচুর মুসলমানী শব্দ (আরবী, পারসী) ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রটি আরো বেশি সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। মাইকেলের পরে তাহার প্রভাবপুষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং অন্যান্য অনেকে প্রাদেশিক ভাষায় নাটকীয় চরিত্রের কথোপকথন লিখিয়াছেন। আলোচ্য প্রহসনখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে মধুসূদন ছড়া, প্রবাদ ও কবিতার অংশ সন্নিবেশ করিয়া ইহাকে সরস ও কৌতুকপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে এই সব দেখা যায় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবচালিত মধুসূদনের পক্ষে প্রাচীন ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতির প্রভাব পরিস্ফুট করা আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই। ছড়া, প্রবাদ, কবিতা প্রভৃতিতে নাটক যে কতো রঙ্গরসপূর্ণ হইয়া উঠে দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

দীনবন্ধু মিত্র

(ক) ভূমিকা

শেক্‌সপীয়র তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিষ্টোফার মারলোর বহু নাটক হইতে ভাবগ্রহণ করিয়াও যেমন এলিজাবেথীয় সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, দীনবন্ধু মিত্রও তেমনি অগ্রবর্তী পথিকৃৎ মধুসূদনের দ্বারা অশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াও মাইকেলী যুগের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকাররূপে অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। দীনবন্ধুর নাটকে, বিশেষত তাঁহার প্রহসনে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু কাব্যধর্মী মাইকেলের নাটকে যে সৃষ্টি প্রভাতী অরুণছটায় আভাসময় হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকে তাহাই সুদূর-প্রসারী প্রদীপ্ত আলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে যে উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিয়া দেন, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারবৃন্দ তাহা অপেক্ষা খুব উচ্চতর স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। নাট্যকারের পক্ষে যে বস্তুনিষ্ঠ, অপক্ষপাতী, সমাজ-সচেতন ও মানব চরিত্র-অভিজ্ঞদৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, বাংলার অধিকাংশ নাটক-রচয়িতার মধ্যে তাহা নাই। সেজন্য আমাদের নাট্যসাহিত্য বহু উচ্চ ও মহৎ idea-র বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে বটে, নাট্যকারদের মন ও মত অনেক নাটকেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু খাঁটি নাটক খুব বেশি রচিত হয় নাই। আমাদের দেশের ভাবাবেগচালিত পাঠকসমাজও প্রকৃত কৃতীর যোগ্য মর্যাদা দিতে তৎপর হয় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। শৈশবে গন্ধর্বনারায়ণ মিত্রকে[১] তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধুগণ 'গন্ধ' 'গন্ধ' বলিয়া উপহাস করিত। ক্ষুব্ধ অপমানিত বালকের মাতার স্নেহশীল, সান্ত্বনা-বাক্য সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে। গন্ধবনারায়ণের গন্ধে একদিন নাট্যামোদী সমাজ বিভোর হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতের রসজ্ঞ সমাজও তাহা দ্বারা সুরভিত হইবে এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনীতে লিখিয়াছেন, "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে 'আর হাসিতে পারি না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দীনবন্ধুর

১। দীনবন্ধুর প্রকৃত নাম গন্ধবনারায়ণ, নিজের নামে বিরক্ত হইয়া তিনি দীনবন্ধু এই নাম গ্রহণ করেন।

নাটক ও প্রহসনগুলি তাঁহার স্বভাব জাত পরিহাস পটুতার অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। শেক্‌সপীয়রের প্রথম যুগের কমেডি 'Merry Wives of Windsor', 'Comedy of Errors' প্রভৃতি নাটকের ন্যায় অজস্র-উচ্ছ্বসিত হাস্যরসই দীনবন্ধুর নাটকের প্রাণ। মনে হয় আমাদের অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যতকিছু হাস্যরসের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকে ব্যঙ্গ আছে, আঘাতও আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সর্বস্থলেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের বেন জনসন, সুইফট প্রভৃতির ন্যায় ভ্রান্ত, পতিত মানব-জীবনকে নিষ্করুণ আঘাত করিয়া তিনি তাঁহার মানব-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকরা মানবসমাজের ভ্রান্তিস্খলন ও বিপর্যয় দেখাইয়া দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করা, এবং এই হাস্যরসের মধ্য দিয়া তাঁহারা পাঠক কিংবা দর্শকের মন আর্দ্র করিয়া মানুষের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল করিয়া তোলেন। কার্লাইলের উক্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ উঠে না যে, 'Humour is sympathy with the seamy side of things' হাস্যরসিক লেখক যাহাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন তাহারাই আবার তাঁহার কাছে সবাপেক্ষা প্রিয়, তাহাদের জন্য লেখকের সবকিছু স্নেহ ও ক্ষমা সঞ্চিত হইয়া থাকে। ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের-এর আদর্শ নায়ক হয়তো অ্যালসেসটিস, যে পৃথিবীকে ও মানবসমাজকে অকৃত্রিম, অকপট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাহারা কৃত্রিম, ভণ্ড, অনুদার তাহাদের নিয়াই মলিয়ের-এর চিত্ত উল্লসিত থাকিত।[১] আমাদের দীনবন্ধুও যখন কোনো আদর্শ, সৎ ও মহৎ চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াছেন তখন তাঁহার মন সায় দিয়াছে বটে, কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় নাই। কিন্তু যখন জলধর, নিমচাঁদ, রামমাণিক্য, কেনারাম, রাজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার নাটকের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র রঙ্গরসে জমিয়া গিয়াছেন।

হাস্যরসের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, যাহা কিছু সঙ্গত, স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনধারার ব্যতিক্রম করিয়াছে তাহাই হাস্যরসের কারণ হইয়া

১। Everyman's Library হইতে প্রকাশিত মলিয়েরের নাটকাবলীর প্রথম খণ্ডে F. C. Green-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উঠিয়াছে। সেজন্য উদ্ভট ঘটনা ও অদ্ভুত চরিত্রই সাধারণত হাস্যরস জোগাইয়া থাকে। দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি বিচার করিলে তাঁহার সৃষ্ট ঘটনাগুলিকে অপ্রাকৃত ও চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে। কিন্তু অসাধারণতা ও অতিরঞ্জন প্রহসনের পক্ষে দোষাবহ নহে। সূক্ষ্ম লেখনীর সংযত চালনায় ঈষদ্‌স্ফুরিত ওষ্ঠাধরের মৃদু হাস্য সঞ্জাত হইতে পারে বটে, কিন্তু সশব্দ অনর্গল হাস্য উদ্রেক করিতে হইলে হাস্যরসিককে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা ভুলিয়া একটু বাড়াইয়া বলিতে হয়। হয়তো আধুনিক সভ্যতাভিমানী সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্ন যুগে আকর্ণ-বিসারিত উচ্চ হাসি অভদ্রোচিত বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে এইরূপ হাসি লোকে হাসিত ও ভালোবাসিত।

দীনবন্ধুর হাস্যরস অনেক স্থলেই অশ্লীলতার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে এই অভিযোগ আজকাল অনেকে করিয়া থাকেন। হাস্যরসবোধ সমাজের মধ্যে চিরকাল একরূপ থাকে না। যে পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র বুদ্ধিমার্জিত হাস্যরসে তৃপ্ত হইবেন তিনি বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহে বিরক্ত হইবেন এবং পেঁচোর মার রসিকতা অশ্লীল মনে করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু দীনবন্ধুর সমসাময়িক সমাজ এসবের মধ্যে অজস্র আনন্দের উপাদান ব্যতীত দূষণীয় কিছুই লক্ষ্য করিত না। দীনবন্ধুর নাটকের শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার করিবার পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তৎকালীন সমাজই একরকম অশ্লীল ও নিন্দিতরুচিসম্পন্ন ছিল। কবি ভারতচন্দ্রের সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেশের মনকে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া দিয়াছিল। এই শিথিল, স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি সাহিত্যের মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার টপ্পা, পাঁচালী, খেউড় প্রভৃতি সাহিত্য তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। বিকৃতরসলিপ্সু সমাজ ঐ সব সাহিত্য হইতে প্রচুর আনন্দ লাভ করিত। পাশ্চাত্য ভাবধারা এই দেশে প্রবেশ করিবার পরে সমাজের নৈতিক উন্নতি বিশেষ হইল না। তফাতের মধ্যে ইহাই হইল যে, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে রুচিহীনতা ও নীতিশৈথিল্য ছিল তখন তাহাই সভ্যতার ছদ্মবেশে ভূষিত হইয়া শিক্ষিত শহরবাসী লোকের মধ্যে আশ্রয় নিল। দীনবন্ধু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই ভাবধারার সন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছিলেন। সেজন্য 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'জামাই বারিক' এর মধ্যে বিকৃত গ্রাম্যসমাজের কথা আছে, আবার 'সধবার একাদশী'র

মধ্যে কলুষিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর পরিচয়ও আছে। দীনবন্ধু হাস্যরসের রসাল কাচের মধ্য দিয়া তাঁহার সমসাময়িক বাস্তব সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেজন্যই তাঁহার সাহিত্য স্থানে স্থানে অশ্লীল মনে হয়।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, 'লোকের সঙ্গে মিশিবার তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন।' দীনবন্ধু সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, সুতরাং তিনি উচ্চস্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণের সহিত মিশিবেন ইহা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত, কিন্তু সমাজের নিম্ন, অশিক্ষিত ও অবজ্ঞাত পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতা থাকা বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিস্ময়জনক হইলেও ইহা সত্য যে শেষোক্ত শ্রেণীর নরনারী সম্বন্ধেই তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর ছিল। নীলকর-নিপীড়িত অসহায় দুঃস্থ রায়ত, পরমুখাপেক্ষী দয়াপ্রার্থী ঘরজামাই, মূর্খ হাস্যাস্পদ ডেপুটি, রঙ্গরস-রতা পরিচারিকা, গুলীখোর বয়াটে যুবক—কেহই দীনবন্ধুর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইহাদের ভাবভঙ্গি, স্বভাব-চরিত্র তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, সুদক্ষ শিল্পীর মত তাহাই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। ইহারা স্থূল, লজ্জাস্পদ, ভদ্রসমাজের ব্যতিক্রম, আদর্শবাদীর অনালোচ্য; কিন্তু ইহাদের কথা লিখিতে গিয়া দীনবন্ধুর এতটুকু সঙ্কোচ ও দ্বিধা নাই, ইহাদের অশোভন নগ্নতা ঢাকিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই, ইহাদের ভালো করিয়া দেখাইবার কোন আত্যন্তিক আগ্রহ তাঁহার নাই। নিরক্ষর চাষীদের ভাষাটুকু পর্যন্ত তিনি সযত্নে ব্যবহার করিয়াছেন, অন্তর্বত্নী পতিব্রতা রমণীর প্রতি পাষণ্ড অত্যাচারের দৃশ্য নিঃসঙ্কোচে দেখাইয়াছেন। ঈর্ষাপরায়ণা, কলহরতা সপত্নীদের প্রতিটি অশ্লীল গালাগালি লিখিয়া গিয়াছেন, মদ ও গুলীর কদর্য মত্ততা নির্বিকার চিত্তে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যদি তিনি কেবল রুচি ও শালীনতার দিকে লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে ইহাদের চরিত্র কখনো যথার্থ ও সম্পূর্ণ হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে হয়—'রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।' কিন্তু রুচি অপেক্ষা বাস্তবতার মূল্য তিনি অনেক বেশী মনে করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অগ্রদূত, এবং বোধ হয় তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক।

১। ডাঃ সুকুমার সেনের মত প্রণিধানযোগ্য—'দীনবন্ধুর কৌতুকরস যে স্থানে স্থানে গ্রাম্য তাহা স্বীকার্য, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীল নয়'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০৬

প্রহসন সাধারণত সমাজের কোনো বিকার কিংবা সামাজিক চরিত্রের কোনো অসঙ্গতি দেখাইবার জন্য লিখিত হয়। দীনবন্ধুর প্রহসনেও সমাজের নানা দোষ ত্রুটির উল্লেখ আছে, সমাজ-শোধনের উদ্দেশ্য তাঁহাকেও চালিত করিয়াছে। তিনি সমাজের অহিত সাধনে রত বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধ, মদ্য ও গণিকাসক্ত 'ইয়ং বেঙ্গল', অসহায় রমণীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত সমাজের উচ্চতম ব্যক্তি প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে উপহাসের আঘাত অপেক্ষা পরিহাসের মৃদু হস্তাবলেপই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, নাট্যকার যেন রঙের পিচকারি দিয়া সমাজের চতুর্দিকে ইতস্তত তরল রঙ ছড়াইয়া দিয়াছেন, এবং যাহারাই রঞ্জিত হইয়াছে তাহারা যেন লজ্জিত, অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ হইয়া পলায়ন করিতেছে। লোকে লাঠির বাড়ি সহ্য করিতে পারে কিন্তু লোকের মধ্যে লজ্জা সহ্য করিতে পারে না। দীনবন্ধুর নাটকে সমাজের যেরূপ চেতনা হইয়াছে, প্রত্যেককে একশো ঘা চাবুক মারিলে বোধ হয় তাহা হইত না।

দীনবন্ধুর দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে, যখন তিনি হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়াছেন। দীনবন্ধু হাসিলেই স্বাভাবিক ও মনোহর দেখায়, হাসি বন্ধ করিলেই তাঁহাকে অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর মনে হয়। মাঝে মাঝে যেখানে তিনি ধর্মকথা ও নীতিকথা শুনাইতে গিয়াছেন, সেখানে নিজেই তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন। নিরক্ষর, গ্রাম্য সমাজের মধ্যে নবীনমাধব যখন অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নীলকরদের ধিক্কার দেয়, অথচ চাষীদের জন্য দুঃখ বোধ করে তখন তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, ললিতের অতি উদার ও মহৎ বাক্যাবলী অপেক্ষা উৎকলবাসী ভৃত্যের উড়িয়া ভাষা আমাদের কাছে অধিকতর প্রীতিকর মনে হয়, বিদুষী লীলাবতীর পালিশ-করা বচন অপেক্ষা আদুরী কিংবা হাবার মার কথা অনেক বেশী স্বাভাবিক বোধ হয়। যখনই দীনবন্ধুর কোনো চরিত্র তত্ত্বকথা বলিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় যে সে কলের পুতুলের কয়েকটি শেখানো কৃত্রিম কথা বলিয়া যাইতেছে, ঐ কথার সহিত যেন তাহার অন্তরের সচল যোগ নাই। দীনবন্ধু কাদামাটির মধ্যে লুটোপুটি করিতে ভালবাসিতেন, মলয়-সেবিত মধুর কুঞ্জে বিহার করিতে যাইয়া তাঁহার অস্বাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িত। হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি নিয়া নাটক রচনা করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় ভালো হইত। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন

যে, নেহাত প্রহসন ও হাস্যরসের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু দীনবন্ধু সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক ও ভদ্র পাত্রপাত্রী নিয়া যে নাটকগুলি লিখিয়াছেন সেগুলি কৃত্রিম ও ক্লান্তিজনক হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সব চরিত্রের প্রেম-অনুরাগ, মিলন-বিরহ আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহার এই ধরনের নাটকগুলি প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গবর্নমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি দীনবন্ধু যে 'নবীন তপস্বিনী'ও 'লীলাবতী'র বর্ণিত সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন ইহা মনে হয় না। দীনবন্ধু যে সমসাময়িক ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নত, সুনীতিমূলক আদর্শ সমর্থন করিতেন তাহার পরিচয় 'লীলাবতী'তে আছে, কিন্তু এই সমাজের প্রতি তাঁহার সমর্থন ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহার চিত্র ভালোভাবে আঁকিতে পারেন নাই, ইহার কারণ তাঁহার নাটকীয় কলা-কৌশলের দৈন্য, অভিজ্ঞতার অভাব নহে।

দীনবন্ধু নাট্যরচনায় মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। মধুসূদনের নাটক যে কারণে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকও সেই কারণে অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন হইয়াছে। অর্থাৎ মাইকেলের ন্যায় তাঁহার অনুবর্তী নাট্যকারও বাংলা নাটকের সংস্কৃত আদর্শ অনুকরণ করিয়া নাটককে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। দীনবন্ধু কোমল ভাবমূলক নাটক-গুলিতে সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। মাইকেলের ন্যায় তিনিও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাটকের মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার কথোপকথন নিবদ্ধ করিয়াছেন। সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীদিগকে পদ্যে কথাবার্তা বলিতে দেখিলে তাহা নিতান্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বোধহয়। দীনবন্ধুর কাব্যপ্রতিভা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত-প্রভাবপুষ্ট শিষ্য যখন পয়ার ও ত্রিপদীর তরল ছন্দে বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা করিতে গিয়াছেন তখন তাহা নিতান্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। পাত্রপাত্রীদের সংলাপের ভাষাও তাহাদের চরিত্র বিকাশনে ক্ষতিকর হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে দুরূহ সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে দেখিলে, তাহা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া হাস্যরস উদ্রেক করে। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে—

"এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহ নাই;

লীলাবতী আমার সহধর্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম, আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ করলেন, আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো, আমি দুস্তর বিপদবারিধি জলে নিপতিত হ'লেম।'

—লীলাবতী, ৫ম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দীনবন্ধুর নাটকের নিকর্ষের আর একটি কারণ আতিশয্য দোষ। সংস্কৃত নাটকের ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও অর্থগৌরবে দীর্ঘ ভাবোক্তি বিরক্তিজনক হয় না, কিন্তু বাংলা নাটকের এরূপ উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নিতান্ত অপ্রাকৃত ও ক্লান্তিদায়ক মনে হয়। সুনিপুণ চিত্রকরের সংযত তুলিকার মৃদুটানে যে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, আনাড়ীর রঙ মাখামাখিতে তাহা হয় না। দীনবন্ধু ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনায় সংস্কৃত উপমা ও অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কথোপকথন ভারাক্রান্ত হইয়াছে মাত্র, প্রাণবন্ত হয় নাই। চরিত্র-গুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের অভাববশত সেগুলি নিতান্ত নির্জীব হইয়াছে। যে সংঘাত নাটকের প্রাণ তাহার অভাবে চরিত্রগুলি নিতান্ত goody goody ধরনের হইয়া উঠিয়াছে

(খ) প্রহসন

॥ সধবার একাদশী (১৮৬৬)॥ বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'সধবার একাদশী' প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে দীনবন্ধু তাঁহার বন্ধুর নিষেধ শুনেন নাই।[১] যদি তিনি 'সধবার একাদশী' প্রকাশ না করিতেন তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন লোকের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত—ইহা অত্যুক্তি নহে। হাস্যরস যদি প্রহসনের প্রাণ, এবং সমাজশোধন তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

'সধবার একাদশী' তাৎকালিক নব্য সভ্যতার ধ্বজাবাহী 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নিখুঁত চিত্র। অনুরূপ বিষয় নিয়া লিখিত পূর্ববর্তী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সহিত আলোচ্য প্রহসনের সাদৃশ্য খুব বেশি। দীনবন্ধু তাঁহার পূর্বসূরী মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। ঘটনা-সন্নিবেশ, চরিত্রচিত্রণ, এমন কি কথোপকথনে পযন্ত এই প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু 'সধবার একাদশী' অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। ইহার

১। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'দীনবন্ধু-জীবনী' দ্রষ্টব্য।

নাটকীয় রস অনেক বেশি ঘনীভূত, এবং ইহার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কথানৈপুণ্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

'সধবার একাদশী'তে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব দোষ ও অনাচার দেখা গিয়াছিল এবং তাহার প্রতিকারকল্পে যে সংস্কার-আন্দোলনসমূহের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তখনকার যুবকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সমাজলব্ধ যে গুরুতর দোষটি দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছিল তাহাই আলোচ্য প্রহসনখানির মূল বক্তব্যবিষয়। অনুচিত এবং অপরিমিত মদ্যাসক্তি নিমচাঁদ, অটলবিহারীর মত অনেক যুবককেই সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিঃশেষে নামাইয়া দিতেছিল। যুবকেরা তখন শিক্ষিত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু সুনীতি ও সদাচার অসঙ্কোচে অবজ্ঞা করিতে মোটেই লজ্জিত হইতেন না। প্রকাশ্যভাবে বারাঙ্গনা-বিলাস করিতে তাঁহারা দূষণীয় কাজ মনে করিতেন না। শুধু যে অটলবিহারীর মত উন্মার্গগামী, অপরিণামদর্শী যুবকের মধ্যে এই আসক্তি ছিল তাহা নহে, নকুলেশ্বরের ন্যায় উকীল ও কেনারামের ন্যায় ডেপুটিও এই দোষে কলুষিতচরিত্র ছিল। হিন্দুসমাজের এই সব দুর্নীতি ও দুষ্কর্মপরায়ণতার প্রতিক্রিয়ারূপেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল। নবোত্থিত ব্রাহ্মসমাজ অধঃপতিত, স্খলিত সমাজকে সুনীতি, সদাচার ও শালীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার-প্রবর্তিত সুরাপান-নিবারণী সভা শিক্ষিত সমাজ হইতে সুরাপান নিবারণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, প্রহসনখানার মধ্যে সুরাপান-নিবারণী সভার উল্লেখও আছে।[১] যে সব যুবক মাতাপিতার দ্বারা যথাসময়ে শাসিত ও শোধিত না হয় তাহাদের পরিণাম কি রকম শোচনীয় হইয়া উঠে এই অটল-বিহারীর চরিত্রের মধ্যে তাহার পরিচয় আছে। মাতাপিতার প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিপথগামী যুবকের চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যে অঙ্কন করিয়াছেন। দীনবন্ধুও অটলের স্নেহান্ধ মাতার অবিমৃষ্যকারিতা দেখাইয়া প্রত্যেক মাতাপিতাকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছেন। ঘটিরাম ডেপুটি তখনকার ডেপুটি সমাজের একটি বাস্তব চরিত্র; ঘটিরামের মত

১। 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হইবার পর প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছিলেন—'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে'—ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিত 'সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মূর্খ ও নির্বোধ অনেক ডেপুটি তখন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন যে মুন্সেফ, ডেপুটিদের সম্বন্ধে অনেক হাস্যজনক গল্প দীনবন্ধুর জানা ছিল, ঘটিরামের হাস্যাস্পদ চরিত্র সেই সব গল্পেরই একটি নায়ক। দীনবন্ধু নিজে খাঁটি পশ্চিম-বঙ্গবাসী হইলেও[১] পূর্ববঙ্গের ভাষা তিনি যে কতখানি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সৃষ্ট রামমাণিক্য-চরিত্রটি হইতে বুঝা যায়। রামমাণিক্য-চরিত্র তাঁহার অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। শুধু তাহার কথাই নহে, পূর্ববঙ্গবাসীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং অসঙ্গতিও দীনবন্ধু দেখাইতে ভুলেন নাই। রামমাণিক্যের অনেক কথা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে বহুতর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি লেখক অন্যায় করিয়াছেন একথা বলা অযৌক্তিক, কারণ দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য কেবল অবারিত হাস্যরস সৃষ্টি করা, আঘাত করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। স্বয়ং শেক্সপীয়র পর্যন্ত 'Merry Wives of Windsor' নাটকের মধ্যে Dr. Caius Hugh Evans-এর বিকৃত কথা নিয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছেন।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে কোনো জটিল, রহস্যময় কাহিনী নাই। নাটকের চমৎকারিত্ব কাহিনীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে নাই। কোনো আকস্মিক ঘটনা-সন্নিবেশের দ্বারা হাস্যরস সৃজন করার চেষ্টা করাও এখানে হয় নাই। নাটকের মধ্যে বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা যে নাটকীয় গতি সম্পাদন করা হয়, এই প্রহসনে তাহারও অভাব। তিনটি অঙ্কের মধ্যে দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই একই পরিবেশের মধ্যে নাটকীয় কথোপকথন সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও প্রহসনখানি পড়িবার সময় কোনো স্থলেই একঘেয়ে লাগে না, এবং দৃশ্য-সংযোজনার কোনোখানেই অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা বোধ হয় না। ঘটনার বিক্ষিপ্ততা নাই বলিয়া বইখানার নাটকীয় রস জমাট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। অথচ সংলাপের চমৎকারিত্বের জন্য কাহিনী সর্বত্র সরস ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠ গুণ ইহার একান্ত বাস্তব ও অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় কথাবার্তা। নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন নাটকের কথোপকথন, ইহার মধ্য দিয়া তাঁহাকে চরিত্রসৃষ্টি করিতে হয় ও ঘটনার চলমানতা বিধান করিতে হয়। যে জায়গায় যে কথাটি ব্যবহার করিতে হয় ঠিক সেই কথাটির অভাবে নাটকীয় রস ব্যাহত হয়। এই কথা-ব্যবহারে দীনবন্ধুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো

১। কলিকাতার অনতিদূরে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয়।

নাট্যকার এই বিষয়ে দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। নিমচাঁদের প্রতিটি শ্লেষাত্মক কথা প্রতিটি witty বাক্য দর্শকদের মন হর্ষোদ্বেলিত করিয়া রাখে। ঘটিরাম ডেপুটি, রামমাণিক্য, অটল, ভোলা, কাঞ্চন—প্রত্যেকের কথা তাহাদের চরিত্র বিকাশনে অভ্রান্তভাবে সাহায্য করিয়াছে। দীনবন্ধু কথাকে আবরু দ্বারা ঢাকিয়া তাহার ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, সেজন্য অশ্লীলভাষিণী বারবনিতা, মদ্যপায়ী মাতাল, বযাটে আদুরে দুলাল প্রভৃতির মুখ দিয়া সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে, এবং এক অশ্লীল, অভদ্র রসস্রোতে সমস্ত নাটকীয় প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে অনেক রুচিবিলাসী সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকের অশ্লীলতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়[১] ও ডাঃ প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা[২] নাট্যকারকে অনেক কটু কথাও শুনাইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ভুল করেন যে, দীনবন্ধু যেসব চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের মুখ দিয়া ভব্য ও ভদ্র কথা বলাইলে তাহা শোভন হইত বটে কিন্তু নাটকের পক্ষে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইত, ইহাও সত্য। প্রহসনখানির মধ্যে ঘটনার অদ্ভুতত্ব দেখা গিয়াছে তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সেখানে মোগলবেশী অটলবিহারী ও তাহার কুমুদিনীহরণ-বৃত্তান্তের মধ্যে হাস্যরস সশব্দ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শ-দুষ্ট সমাজের দোষগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রাঙ্কনের নিখুঁত বাস্তবতায় এবং অধঃপতিত চরিত্রগুলির শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমাদের মন ভাবাক্রান্ত ও করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠে। কিন্তু নাট্যকার প্রহসনের মধ্যে কোনো স্থলে নীতি ও আদর্শ লইয়া অযথা বাগাড়ম্বর করেন নাই, এবং শেষে পতিত চরিত্রগুলিকে অনুতাপে দগ্ধ করাইয়া তাহাদের নেহাত ভালো মানুষ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বরং গ্রন্থের মধ্যে যাহারা সুরাপান-নিবারণী সভা ও ব্রাহ্মসভার নাম করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই নিমচাঁদের সুতীব্র ব্যঙ্গের আঘাতে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন। নীতি সততা ও আদর্শের প্রতি দীনবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল না একথা বলিলে ভুল বলা হইবে, কিন্তু জীবনের ভালোমন্দ দুইদিক তিনি সমান করুণামাখা দৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত তিনিও ভাবিয়াছেন—

১। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
২। Origin & Development of Bengali Drama.

"I am not the poet of goodness only,

I do not decline to be the poet of wickedness also."[১]

সেইজন্য তাহার চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত থাকিয়াই তাহাদের জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি দ্বারা আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে, অবিরত হাস্যকৌতুকের মধ্যেও করুণ ফল্গুস্রোত সমস্ত প্রহসনখানিকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

'সধবার একাদশী'-র অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছে নিমচাঁদের চরিত্রের উপর। অটলবিহারীরকে গ্রন্থের নায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার চরিত্রের জঘন্য হীনতা এবং আত্যন্তিক ক্ষুদ্রতা কেবল ঘৃণা ও বিরক্তি উৎপাদন করে। সে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সর্বপ্রকার কুকর্মে রত, কোনো প্রকার পাপেই তাহার অরুচি নাই। নিমচাঁদ অটলের ইয়ার হইলেও তাহার প্রবলতর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বত্রই অনুভূত হয়। তাহার সুতীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সুগভীর অনাসক্ত নির্লিপ্ততা সমস্ত প্রহসনখানিকে অভিনব রসে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকেই বলেন নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, দীনবন্ধু অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মধু কি কখনো নিম হয়?'[২] দীনবন্ধু অস্বীকার করিলেও একথা সত্য যে, মধুসূদনের পরোক্ষ প্রভাব প্রহসনখানার উপর পড়িয়াছে। মাইকেল 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন, এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কোনো চরিত্র অঙ্কন করিতে গেলে মাইকেলের জীবন্ত প্রভাব ইহার উপর পড়িবে তাহা অস্বাভাবিক নহে। অপরিমিত মদ্যাসক্তি মধুসূদনের জীবনের অশান্তির মূলে ছিল, এবং নিমচাঁদের জীবনেও এই আসক্তি তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। মধুসূদন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ও পুরাদস্তুর ইংরাজীনবীশ ছিলেন। তিনি একদিন ভূদেববাবুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই নিমচাঁদ বলিয়াছে, 'I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, and dream in English.' মধুসূদন জীবনের শেষভাগে মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির নিকট যে রকম মর্মান্তিক খেদোক্তি করিতেন নিমচাঁদও মাঝে মাঝে তাহাই করিয়াছে। এই সব সাদৃশ্যবশত নিমচাঁদের উপর মধুসূদনের সম্ভাব্য

১। Song of myself—*Leaves of Grass* by Walt Whitman.

২। ললিতচন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রভাব একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। নিমচাঁদ ইয়ার বটে, কিন্তু ভোলার মতো নির্বোধ ইয়ারকি সে মারে না; জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভের পর সে সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাকথিত ভালো লোক ও সদানুষ্ঠানের প্রতি তাহার কোনো আস্থা নাই। নকুল, গোকুল প্রভৃতি লোক, যাহারা সুরাপান-নিবারণী সভা প্রভৃতির উদ্‌যোগী তাহারা যে বস্তুত কত অন্তঃসারশূন্য ও কপট তাহা সে জানে। সেজন্য তাহাদের সৎকর্ম-প্রচেষ্টাকে সে নিতান্ত অনুকম্পার চোখে দেখে। রামমাণিক্য, ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া কত ছোট তাহাও সে অনুভব করে, সেজন্য সে তাহাদের নিয়া সর্বদা করুণা-মিশ্রিত কৌতুক করে। সে মাতাল এবং উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু তাহার গভীর অনাসক্তি ও সূক্ষ্ম আভিজাত্যবোধ তাহাকে সর্বদা পাপকর্ম হইতে বিরত রাখে। সে পুণ্যাত্মা নয়, নীতিনিষ্ঠ নয় কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় তাহার আসক্তিও নাই। সে কাঞ্চনকে নিয়া ঠাট্টা-তামাশা করে, বন্ধুদের নিয়া অশ্লীল ইয়ারকিও মারে বটে, কিন্তু কোনো প্রকার জঘন্য আমোদে লিপ্ত হইতে তাহাকে দেখা যায় নাই। অটলবিহারী যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে হরণ করিবার নিতান্ত গর্হিত প্রস্তাব করিল নিমচাঁদ তখন অসম্মত হইয়া বলিয়াছিল,—

> 'I dare do all that may become a man,
> Who dares do more, is none.'

নিমচাঁদের সহিত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তুলনীয় চরিত্র শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'র নায়ক জীবানন্দ। জীবানন্দের মতোই নিমচাঁদ নিজেকে নিয়া ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে না। রামধন রায় তাহাকে মারিতেছে, অথচ সে এই মার নিয়া রামধনের সহিত ঠাট্টা করিতেছে, ইহা পরম উপভোগ্য ব্যাপার। জীবনের স্বাভাবিক, সঙ্গত ও শান্তিময় ধারা হইতে সে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেজন্য নিজের জীবনের প্রতিও তাহার কোনো দরদ ও মমত্ব নাই। সে অনুভব করে যে তাহার মত জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিও আজ অবস্থাবৈগুণ্যে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই যখন তাহার ব্যঙ্গ-কুটিল ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাহির না হইয়া হৃদয়ভেদী অনুতাপ উদ্গত হইতে থাকে, তখন আমাদের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। সে যখন মর্মান্তিক নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি করিতেছে—

'So sweet was ne' er so fatal, I must weep
But they are cruel tears.'

তখন মনে হয় দীনবন্ধু কমেডির মধ্যে এক নিতান্ত করুণ ট্র্যাজিক চরিত্র আঁকিয়াছেন এবং তাহার চরিত্র আলোচনাকালে কিং লীয়রের উক্তি মনে হয়—'I am more sinned against than sinning.'

'সধবার একাদশী'-র আলোচনার উপসংহারে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের উক্তি সমর্থন করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি, 'শুধু নিমচাঁদের ভূমিকার জন্যই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও 'সধবার একাদশী' বাঙ্গালার দুই চারিখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থের অন্যতম বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে।'[১]

॥ বিয়ে পাগলা বুড়ো ১৮৬৬)॥ 'সধবার একাদশী' যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুকরণে লিখিত, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও তেমনি মাইকেলের অন্যতম প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর দ্বারা প্রভাবিত। ভক্তপ্রসাদের সহিত রাজীবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই প্রহসনের মধ্যে মাইকেলের ন্যায় দীনবন্ধুও প্রাচীন, সংস্কারবিরোধী সমাজকে উপহাস করিয়াছেন।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নিখুঁত হাস্যরস প্রধান প্রহসন হিসাবে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার মধ্যে ধারালো কথার তীব্র ঝলক নাই, কোনো গভীর সমাজ-সমস্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও নাই, হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসনখানা আগা-গোড়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া রাখা হইয়াছে। এই হাস্যরসের মূল কোনে বিশেষ চরিত্রের মধ্যে নহে। এক সুকল্পিত রহস্য-মধুর ষড়যন্ত্রের উপর ইহা নিহিত। সুতরাং এই প্রহসনের কাহিনীই সর্বাপেক্ষা প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে বিয়ে পাগলা বুড়োকে নিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, সেইরকম ভীমরতিগ্রস্ত, সমাজের সর্বনাশেচ্ছু বৃদ্ধ পূর্বেও ছিল, এবং এখনও যথেষ্ট আছে। খবরের কাগজে এই রকম নবীনম্মন্য বিবাহার্থীর বিবাহনেশা এবং রতা প্রভৃতির ন্যায় যুবক-সম্প্রদায়ের হাতে যথোচিত নাকাল হওয়ার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন নিজে মৃত্যুপথযাত্রী হইয়াও বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত অথচ রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার পিতার ন্যায় বিধবা কন্যাদের বৈধব্য রক্ষা ও ব্রহ্মচর্য-পালন বিষয়ে অতিমাত্রায় কঠোর ও কর্তব্য-পরায়ণ। ছন্নমতি; দয়াহীন পিতার আশ্রিতা কন্যাদ্বয় রামমণি ও গৌরমণির বৈধব্যক্লেশ দীনবন্ধু প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্টত

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৪।

নাট্যকার পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরিপোষণ করিয়াছেন। পুরুষ ও নারীর বিবাহ-ব্যবস্থায় সমাজ-নীতির নিতান্ত গর্হিত ও অযৌক্তিক তারতম্য লেখক চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র যাহাদের নিয়া উপন্যাস রচনা করিয়া অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাদেরই স্থান দরদী নাট্যকারের দ্বারা নাটকের মধ্যে সহানুভূতির সহিত নির্দেশিত হইয়াছে।

রাজীবলোচন 'বুড়ো শালিক'-এর নায়ক ভক্তপ্রসাদের ন্যায় সুরসিক ও কবিতা-প্রিয়। নবীন নায়কের মতো সেও স্ত্রীর সহিত আলাপনে অনেক রসাল কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করিয়া অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু রাজীব ও তাহার 'রতা নাপিত স্ত্রী'র সহিত মধুররস আলাপনের মধ্যে অনেক স্থলে কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন। বাল্যবয়সে তিনি গুরু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণে যে-রকম যমক-অনুপ্রাস-বহুল, তরল পয়ার ছন্দে কবিতা লিখিতেন এই সব কবিতাও সেইরূপ। কোমল ভাববিশিষ্ট নাটকের মধ্যে দীনবন্ধুর কবিতা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য হাস্যরসাত্মক প্রহসনের মধ্যে এই রকম কবিতা বিশেষ সার্থক ও চমৎকার হইয়াছে; কারণ নাট্যকার প্রেমবিহ্বল রাজীব ও তাহার 'ছলনাময়ী স্ত্রী'র আদিরসাত্মক কবিতাযুদ্ধের মধ্যে তাঁহার ঈপ্সিত হাস্যরস ফুটাইয়া তুলিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। রাজীব তাঁহার কল্পিত স্ত্রীকে কবিতা দ্বারা মনোরঞ্জন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, মাঝে মাঝে কবিতা ভুল করিতেছে, অথচ না দমিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাই পাঠক ও দর্শকের পক্ষে চূড়ান্ত হাস্যরসের কারণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের পুত্র হঠাৎ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় আচরণ করিয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। রাজীবও বিবাহার্থী তরুণ যুবকের ন্যায় নিজেকে নিতান্ত কচি ও কাঁচা দেখাইতে গিয়া পদে পদে কি রকম বিপর্যয় ও অসঙ্গতি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা দেখাইয়া লেখক আমাদিগকে যথেষ্ট হাসাইয়াছেন। প্রহসনখানির রস জমিয়া উঠিয়াছে দুই বিপরীত ঘটনাপরম্পরার সংঘাতে। বুদ্ধিহত রাজীব কিছু না জানিয়া ও না বুঝিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আত্মসুখে বিভোর হইয়া চলিয়াছে, অথচ তাহার চারিপার্শ্বে একটি সরস, জটিল ষড়যন্ত্র কুণ্ডলীকৃত হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং বিপর্যস্ত রাজীব শেষে চূড়ান্ত নাজেহাল হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে আশাহত, স্তম্ভীভূত রাজীবের প্রতি

চতুর ঘটক, দুষ্টমতি বালকের ও রাজীবের নবপরিণীতা পাঁচীর মা তাহার প্রতি রাশি রাশি কাদা নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। বিয়ে পাগলা বুড়ো উপহাসের লগুড়াঘাতে যথোচিত শাস্তি পাইয়াছে।

আলোচ্য প্রহসনে রতা ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা রাজীবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ন্যায় চঞ্চলমতি বালকগণের পক্ষে বৃদ্ধকে নিয়া কৌতুক করা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে, বৃদ্ধকে নকল সাপ দ্বারা দংশন করানো এবং শরৎচন্দ্র বর্ণিত 'বিষহরির আজ্ঞে'র অনুরূপ মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি এবং বৃদ্ধকে উত্তম-মধ্যম প্রহারের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের মুখ দিয়া আদিরসাত্মক কবিতা বলানো একটু অসঙ্গত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য—'ঐ ছেলেগুলি বাসর-ঘরে শালীশালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।'[১]

॥ জামাই বারিক (১৮৭২) ॥ দীনবন্ধুর তৃতীয় প্রহসন 'জামাই-বারিক'-এর কাহিনী একটু অদ্ভুত ধরনের। অনেকগুলি জামাইকে একটি-ব্যারাকের মধ্যে পুরিয়া রাখা এবং পাশ লইয়া তাহাদের অন্তঃপুরে যাওয়ার বিষয়গুলি একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রহসনের (Farce) পক্ষে অচলিত ও অতি-রঞ্জিত বিষয় দূষণীয় নহে, যদি তাহাতে রসের হানি না হইয়া থাকে। ড্রাইডেন (Dryden) কমেডি ও প্রহসনের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'Farce entertains us with what is monstrous and chimerical.'[২] সুতরাং দীনবন্ধু যদি হাস্যরসের দমকে পাঠক ও শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিবার জন্য সরস অদ্ভুতত্বের সমাবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে প্রহসনের মূল্য কমে নাই।

'জামাই-বারিক' সমাজের দুই বাস্তব (এবং করুণ) সমস্যা অবলম্বনে লিখিত। পূর্বে কুলীন জামাইরা নিষ্কর্মা ও বেকার অবস্থায় শ্বশুর বাড়িতে থাকিত। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্বশুরের 'পরে নির্ভর করিতে হইত বলিয়া তাহারা সকলের কাছে (স্ত্রী পর্যন্ত) নিতান্ত অবজ্ঞেয় এবং উপহাসাস্পদ হইত। ইহাদের করুণ অবস্থা এবং নিরুপায় দুঃখের কথা দরদী নাট্যকার হাস্যরসের অনাবিল স্রোতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সপত্নী-ঈর্ষা-কলহ-পীড়িত দ্বিপত্নীক স্বামীর

১। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ২৭১।

২। *Dramatic Essays* by John Dryden. p. 78. (Everyman's Library)

সমস্যা প্রহসনে আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়। কিছুদিন পূর্বেও যখন দুই কিংবা ততোধিক পত্নীগ্রহণ সমাজের মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না, তখন ষট্‌শীর্ষ দৈত্য Scylla এবং প্রবল বাত্যা Charybdis-এর মধ্যস্থিত বিপদস্থ নাবিকের ন্যায় অনেক স্বামীর জীবন যে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবশ্য আধুনিক বাঙালী-জীবনে উপরিউক্ত দুই সমস্যাই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সূক্ষ্মমর্যাদাসম্পন্ন আধুনিক জামাতাগণ যেমন পরনির্ভরশীল হইতে অসম্মান বোধ করে, তেমনি অর্থনৈতিক সমস্যাপীড়িত যুবকগণ একাধিক স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নিতান্ত অপছন্দ করে। কিন্তু দীনবন্ধুব সময়ে এই দুই সমস্যা সমাজে একান্ত বাস্তব আকারে ছিল, সেইজন্যই ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।'[১]

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিব মধ্যে হাস্যরসের প্রাবল্য 'জামাই বারিক'-এ সর্বাপেক্ষা বেশি। এই হাস্যরস সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধিকে নাড়া দেয় না, ইহার মূর্তি ছদ্মবেশে আচ্ছন্নও থাকে না, ইহার অনাবৃত অবারিত আঘাত দর্শকগণকে ক্রমাগত কৌতুকে নাচাইতে থাকে। বগলা ও বিন্দুবাসিনীব কলহ, স্বামীর স্নেহকে ভাগাভাগি করিয়া নেওয়াব ব্যাপার, বেচাবা চোবকে স্বামী ভাবিয়া উত্তম-মধ্যম দেওয়ার দৃশ্য প্রভৃতি কৌতুকের মেলা সৃষ্টি করিয়াছে। 'জামাই বারিক'-এর হতভাগ্য জামাইগুলির জীবনযাপনের যে বিচিত্র দৃশ্য নাট্যকার আঁকিয়াছেন তাহাও যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক। নিষ্কর্মা, নেশাখোর জামাইরা অলস সময় আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া কাটাইতে চায়। পাশ পাওয়ার স্ফূর্তিতে মত্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন মিসেস ম্যালাপ্রপ (Mrs. Malaprop)-এর ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিয়া রামায়ণের যে অদ্ভুত ভাষ্য (অদ্ভুত রামায়ণ নহে) করিয়াছে তাহা বিলক্ষণ আনন্দজনক হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের যুগ্ম-ধর্মাশ্রিত বিচিত্র মাণিকপীরের গানটি স্থান ও সময়ের সহিত বিশেষভাবে খাপ খাইয়াছে। দীনবন্ধু আমাদের সমাজের বিচিত্র প্রাণস্পন্দনময় বহুমুখী নাড়িগুলির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ঘরোয়া ঠাট্টা-রসিকতা ও ছড়া-প্রবাদের মধ্যে বাঙালীর প্রাণরস কিভাবে স্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতেন। সেজন্য তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নানা লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ রঙ্গরসেব তালে চরিত্রগুলিকে

[১] বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ২৭৩

সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এই সব সমিল পংক্তিগুলি বাদ দিলে চরিত্রগুলি নিতান্ত প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম রুচিবান আধুনিক শিক্ষিত সমাজ হইতে এই জাতীয় সম্পদগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে, ইহা শুভ চিহ্ন নহে।

দীনবন্ধু এই প্রহসনের মধ্যে আমাদিগকে যথেষ্ট হাসাইয়াছেন বটে, কিন্তু একটানা হাসিতে ক্লান্তি আসিবার সম্ভাবনা, সেজন্য করুণ রসের একটি অদৃশ্য প্রবাহ প্রহসনের মধ্যে আনয়ন করিয়া তিনি আমাদের মানসিক সমতা রক্ষা করিয়াছেন। তটের তলদেশ যেমন তরঙ্গের মৃদু আঘাতে ক্ষয় হইতে থাকে, আমাদের হৃদয়ের গোপন স্তবও তেমন এই করুণ রসে আস্তে আস্তে দ্রব হইয়া উঠে। স্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও অবজ্ঞাত অভয়কুমারের অবস্থা দেখিয়া আমাদের দুঃখিত অন্তঃকরণ এই কথাটির করুণ সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, 'ঘর জামাইয়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ'। সপত্নী-কলহ-জর্জরিত মর্মপীড়িত পদ্মলোচনের অবস্থা আমাদের মনে প্রচুর কৌতুকরসের উৎপত্তি করিয়া বেচারা স্বামীর দুঃখে সহানুভূতিশীল করিয়া তুলে।

'জামাই বারিক' স্ত্রী-প্রধান প্রহসন। অন্তঃপুরের বঙ্গললনা-কলিত-কন্দরে নাট্যকারের রসসন্ধিৎসু দৃষ্টি কিভাবে বিচরণ করিত তাহার যথার্থ পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্তঃপুরিকাদের রঙ্গরস, হাসিঠাট্টা, নর্মালাপ ও খরকলহ দীনবন্ধু বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। গর্বোদ্ধতা ধনী অঙ্গনা কামিনী হইতে গ্রাম্যরসের প্রস্রবিণী হাবার মা পর্যন্ত সকল স্ত্রী-চরিত্র কাহিনীকে গতিশীল ও রসময় করিয়া রাখিয়াছে। 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ', তাই কোমলতায় ইহারা যেমন ললিত পল্লবিনী, উগ্রতায় তেমনি আবার ভীমা উগ্রচণ্ডা। বগলা ও বিন্দুবাসিনী যে ভাষায় পরস্পরের প্রতি উগ্র বিষ ছড়াইয়াছে, তাহা একান্তভাবে এই সব অন্তঃপুরচারিণীদেরই ভাষা, অন্তঃপুরের বাহিরে এই বিচিত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই। 'মাডিপোড়ানির ঝি', 'শতেকখোয়ারি', 'নয়দুয়ারি', 'ভালখাগি', 'হতচ্ছাড়ি' প্রভৃতি চমকপ্রদ বিশেষণে ভূষিত হইয়া সপত্নীদ্বয়ের খরজিহ্বা হইতে যে শাণিত ছুরিসমূহ নির্গত হইয়াছে তাহা পদ্মলোচন কেন, যে কোনো বলবান স্বামীকে জীবন্মৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এইরূপ বাস্তব ঝগড়ার দৃশ্য বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। নির্দোষ ও নিবিরোধ পদ্মলোচন এই দুই নাগিনীর উদ্যত নাগপাশ হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে ইহা মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। অভয়কুমারও অনুরূপ শীতল-প্রকৃতি-

বিশিষ্ট পরাশ্রিত স্বামী। ক্যাথারিন (Katharina)[১] ন্যায় গর্বিণী স্ত্রীকে কিভাবে বশীভূত করিতে হয় তাহা তাহার জানা ছিল না, সেজন্য তাহাকেও অনাশ্রয়ের আশ্রয় ব্রজধামে গমন করিতে হইয়াছিল। গ্রন্থের অন্য কোনো পুরুষচরিত্র উল্লেখযোগ্য নহে।

'জামাই বারিক'-এর কাহিনী দুইভাগে বিভক্ত। বগলা, বিন্দু ও পদ্মলোচনের আখ্যান এবং কামিনী, অভয়, ভবী ও ময়রা বুড়োর গল্প প্রথম তিন অঙ্কে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হইয়া চতুর্থ অঙ্কে একত্রিত হইয়াছে। যেভাবে নাট্যকার গ্রন্থের দুই ধারাকে মিশাইয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম নাট্যকলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহসনের ঘটনা বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত করাতে যে অবিশ্বাসী সন্দেহের উৎপত্তির কারণ ঘটিয়াছিল, লেখকের বর্ণনার কৃতিত্বে ও চরিত্র-সমাবেশের কুশলতায় তাহা হয় নাই। দীনবন্ধুর নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে অপ্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত বিষয়ের অনাবশ্যক উত্থাপন লক্ষ্য করা যায় না। ঘটনা-বৈচিত্র্য যেখানেই আছে, সেখানে তাহা মূল বিষয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

(গ) নাটক

॥ নীলদর্পণ (১৮৬০)॥ নীলের হাঙ্গামা আজ পুরাতন ইতিহাসের বিলীয়মান স্মৃতির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। দেশের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ভগ্নকুঠী এবং লোকপরম্পরায় প্রচলিত কতকগুলি কিংবদন্তী আজ সেই নীলের কাহিনীর জীর্ণ সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্বে এই নীলের সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি দেশজোড়া জাগরণ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা এক আকস্মিক ভূমিকম্পের মত বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি সজোরে নাড়িয়া দিয়াছিল। বোধ হয় তাহাই হইল আমাদের সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ।

বহুকাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইত। ভারতে উৎপন্ন হইত বলিয়া নীলের নাম হইল Indigo। দিল্লী হইতে ঢাকা পর্যন্ত নীলের চাষ হইত বটে কিন্তু বাংলার নীলই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত এবং ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলার নীলই সারা পৃথিবীর চাহিদা মিটাইত। নীলের চাষ প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল এবং তাহারা ইহা হইতে প্রভূত অর্থলাভ

১। শেকসপীয়রের 'The Taming of the Shrew' নাটকের চরিত্র।

করিয়াছিল, কিন্তু ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এই চাষের ভার তাহাদের কর্মচারী এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের হস্তে অর্পণ করে। ইহারা এই ব্যবসার ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে দেশের চাষী রাইতদের দুর্দশা সুরু হয় এবং ক্রমে এই দুর্দশার চরম অবস্থা দেখা দেয়।

নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়া রাইয়তদিগকে নীল বুনিবার চুক্তিতে আবদ্ধ করিত। রাইয়তেরা অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদন লইতে বাধ্য হইত। নীলের চাষে তাহাদের কোনোই লাভ ছিল না, কারণ দাদনের টাকা বাকি-বকেয়া প্রভৃতি শোধ করিয়া তাহাদের ভাগ্যে বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকিত না, অথচ দেনা ও ঋণসমেত চুক্তির বোঝা তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে বহিয়া বেড়াইতে হইত। অসম্মত প্রজাদের নিষ্কৃতিব কোনোই পথ ছিল না, কারণ জালজুয়াচুরি, প্রতারণা, উৎপীডন প্রভৃতি যে কোনো উপায়েই হউক নীলকর সাহেবরা তাহাদের উপর চুক্তির দায়িত্ব চাপাইয়া দিত। অসহায় প্রজাগণ অনাহারে থাকিয়া, সব অত্যাচার সহিয়া নীলের চাষ কবিয়া দিত, প্রতিকাবের কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

কিন্তু এই সব সহায়সম্বলহীন প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া বিদেশাগত নীলকর ব্যবসায়ীরা রাজার হালে দিন কাটাইত। নীলের ব্যবসায়ে অপরিমিত অর্থ উপাজন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিসীম হইয়া উঠিল। স্যার হেনরী কটন নীলকর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'His power in my time was practically unlimited'। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি অনেক সময় নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। কয়েকটি ইংরাজি সংবাদপত্রও তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং তাহাবা বিনা বাধায় তাহাদের শোষণ ও উৎপীড়ন চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারের বিবরণ পড়িলে আজও লোকের শরীর শিহরিত হইয়া উঠিবে। 'নীলদর্পণ'-এ বর্ণিত একটি কথাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে। যেসব রাইয়ত চাষ করিতে অসম্মত হইত তাহাদের গুলি করিয়া অথবা বর্শাবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত; কিংবা নীচু, সংকীর্ণ অন্ধকার গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নীলকরদের শ্যামচাঁদ অথবা রামকান্ত প্রজাদের পিঠে পড়িবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত এবং সাহেবদের সবুট অভ্যর্থনা প্রজারা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। সময় সময় এক একটা গোটা গ্রাম অথবা বাজার নীলকরদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইত। গৃহস্থকন্যা ও

বধুদেরও অব্যাহতি ছিল না। মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া কুঠীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। ক্ষেত্রমণির প্রতি অত্যাচার-বৃত্তান্ত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

অবশ্য তৎকালীন ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহও যে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই তাহা নহে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন ও কৃষ্ণনগবেব ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের ন্যায় কর্মচারীও তখন ছিলেন, যাঁহাবা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিবীহ নিঃসহায় কৃষককুলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদেব নাম বাঙালীজাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। প্রজাদরদী ছোটলাট স্যার পিটার গ্রাণ্ট কার্যভাব গ্রহণ করিয়াই একটি পরোয়ানা জারি কবিলেন যে নীলেব চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া প্রজাদেব সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই পরোয়ানা প্রজাদের অসন্তোষের বারুদে আগুন ধরাইয়াছিল। তাহারা বহুদিন নীরবে সহ্য কবিযাছে কিন্তু এতদিন পরে তাহারা নিজেদের অধিকাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিযা উঠিল। এই আগুনে ইন্ধন দিয়াছিলেন প্রথম দুইজন গ্রামবাসী—বিষ্ণুচবণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। দুর্বল কৃষককল এতদিন পবে একতাব মধ্যে এক মহাশক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিল, বাঙালীব জাতীয জীবনে ইহাই হইল প্রথম মহাশক্তির উদ্বোধন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিবাব জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনেব সভ্য ছিলেন পাঁচজন এবং সিটনকাব ইহাব সভাপতি ছিলেন। চার মাস ধরিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া কমিশন রিপোর্ট দিলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারা জোর করিয়া নীলের চাষ করান হয় এবং এই চাষ তাহাদেব পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। কমিশন-রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট নীলকব অত্যাচার প্রশমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কবিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত নীলকব দমিবাব পাত্র নহে। তাহারা গ্রাণ্ট, ইডেন, হার্সেল, সিটনকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং নানাভাবে ইঁহাদের অপদস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নীলকব-অত্যাচারেব বিরুদ্ধে যাঁহাবা সমগ্র দেশকে উত্তেজিত কবিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম সর্বাগ্রে স্মবণীয়—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র। হরিশচন্দ্র তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁহার অগ্নিস্রাবী লেখনীকে নিয়োজিত রাখিলেন। শোষিত প্রজাবৃন্দেব

জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া লইলেন। নীলকরগণ এই শত্রুতা ভুলিতে পারে নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার সহায়হীন পরিবারের উপর তাহাদের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা পতিত হইয়াছিল। 'নীলদর্পণ'-এর আঘাত বোধহয় আরো তীব্র ছিল এবং সেজন্য ইহার উপর তাহাদের প্রতিহিংসা আরো বেশী হিংস্র ও পৈশাচিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিয়া মাইকেল সুপ্রীম কোর্টের চাকরি হারাইয়াছিলেন, ইহার প্রকাশ করিয়া পাদরী লং কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রচারের সাহায্য করিয়া সিটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। আজ দেশে নীলের চাষ নাই, নীলকরের অত্যাচার নাই, কিন্তু একদিন ইহাদের লইয়া কত না ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং সেই দুর্যোগ-দিনে যে সব স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ হৃদয় অসহায় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কৃতজ্ঞ জাতির ইতিহাসে চিরকাল তাঁহাদেব নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলাব সমাজ ও সাহিত্যে ইহা যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাব তুলনা অন্য কোথাও আমরা দেখি নাই। নীলকর অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যখন নিরুপায় জনসাধারণ দুঃখের অন্ধকারে তাহাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তখন 'নীলদর্পণ' তাহাদের সম্মুখে অগ্নিবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল। সেই অগ্নিতে সেদিন জনগণেব প্রথম দীক্ষা হইয়া গেল, সেই অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল দেশেব প্রান্ত ও প্রান্তরে। অত্যাচারের লেলিহ জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকবের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।' 'নীলদর্পণ'-এ যে বিদ্রোহ-বাণী ধ্বনিত হইল তাহার প্রভাব সাময়িক কালেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহা দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ। সেজন্য তাহার রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকখানি নিষ্ঠুর নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া সত্যপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহার প্রকৃত মর্যাদা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লং, সিটনকার প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তি

ইংরাজ হইয়াও এই পুস্তকের প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় নাটকখানির সমাদর কত বহুধা-বিস্তৃত হইয়াছিল।

'নীলদর্পণ' বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবতার পথনির্দেশ করিয়াছিল। লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দন-কানন হইতে বিদায় লইয়া বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ সুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাস-হর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের কারুণ্য-কুটীরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণিও তাহাদের দুঃখবেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে। আজ বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রতি যে সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল একশত বৎসর পূর্বে লিখিত এই অবিস্মরণীয় নাটকে। আজিকার সাহিত্যিকদের এবিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে।

'নীলদর্পণ' পরবর্তী সামাজিক নাট্যধারাকে যে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 'নীলদর্পণ'-এর কাহিনীর মূল-কেন্দ্র হইল সুখে-শান্তিতে অবস্থিত একটি একান্নবর্তী বাঙালী পরিবার, প্রতিকূল অবস্থার নিষ্ঠুর আবর্তনে যাহা সর্বনাশের অতলতলে ডুবিয়া যায়। এই ধরনের কাহিনী পরবর্তী বহু সামাজিক নাটকে আলোচিত হইয়াছে। করুণ রসাত্মক নাটকের আদর্শরূপেও 'নীলদর্পণ' পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের বিষাদান্ত সামাজিক নাটকে 'নীলদর্পণ'-এর প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মৃত্যু দৃশ্যের আধিক্য, করুণরসের আতিশয্য, প্রতিবাদহীন দুঃখভোগ প্রভৃতি যে যে করুণরসাত্মক লক্ষণ এই নাটকের মধ্যে বিদ্যমান সেগুলি বহুলাংশে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি পরবর্তী প্রসিদ্ধ নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নাট্যশালার ইতিহাসেও 'নীলদর্পণ'-এর মূল্য কম নয়। এই 'নীলদর্পণ-এর অভিনয়ের মধ্য দিয়াই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নাটকের অভিনয় দেশের মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি ও সহানুভূতি রঙ্গালয়ের প্রতি জাগরূক করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং রঙ্গালয়ের গৌরব ও জনপ্রিয়তার মূলে এই অসাধারণ নাটকখানির অবদান যে অনেকখানি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বহু পুরাতন জনপ্রিয় নাটক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার দিনেও যে নূতন করিয়া 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের আয়োজন দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় সমসাময়িক কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিত্যকালের সাহিত্য দরবারে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

গোলক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মূল কাহিনীর সহিত সম্পৃক্ত আর একটি উপকাহিনী সাধুচরণের পরিবারকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই উভয় পরিবার একই অত্যাচারে সর্বস্ব হারাইয়া নিদারুণ শোকাবহ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সাদৃশ্য অথবা Parallelism রহিয়াছে। এই দুইটি কাহিনীর চরিত্রগুলির সহিত নীলকর সাহেবদের সংঘাত বাধিয়াছে এবং এই সংঘাতে সহায়তা করিয়াছে গোপীনাথ ও পদী ময়রাণী। 'নীলদর্পণ'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সংহতি ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের অনুচিত অবতারণা দ্বারা ইহার ঘটনাপ্রবাহ কোথাও তির্যক কি তরল করা হয় নাই। স্বল্পকালের পরিসরের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তুর সীমায়িত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে এক ঘন-গম্ভীর ভাবচেতনা প্রাণময় রূপ লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্যের মধ্যে উত্তেজনামূলক চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার তাঁহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে রাইয়তদের দুঃখভোগ, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা এবং নবীনমাধব ও তোরাপের দ্বারা তাহার উদ্ধার প্রভৃতি দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল যেখানে যেখানে আদিরসাত্মক ও করুণরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে সে-সব জায়গায় কাহিনীর গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যকারের সহানুভূতি ও আত্মময়তা যেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই তাঁহার আর্ট দুবল হইয়া পড়িয়াছে। এক ধনী গৃহস্থ পরিবার ও আর এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সহিত দুর্বৃত্ত নীলকরদের সংঘর্ষের সূচনাতে নাটকের আরম্ভ এবং সেই সংঘর্ষের শোচনীয় পরিণতিতে নাটকের উপসংহার। প্রথম অঙ্কে সংঘর্ষের আভাস—গোলোক বসু চিন্তিত, সাধুচরণ বিব্রত, তাহাদের সুখী পরিবার আসন্ন দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের সূচনা—গোলোক বসুকে কারাবদ্ধ করিবার জন্য নীলকরদের গোপন ষড়যন্ত্র। তৃতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের চূড়ান্ত অবস্থা—প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবীনমাধব নীলকরদের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত, গোলোক বসুর কারাবাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ-সাহেবের অত্যাচার। চতুর্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি—গোলোক বসুর আত্মহত্যা, সর্বনাশের মুখে গোলোক বসুর পরিবার। পঞ্চম অঙ্কে সর্বনাশের গর্ভে গোলোক ও সাধুর পরিবার, সর্বগ্রাসী দুর্ভাগ্যের অতি নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার অনবদ্য সমালোচনার মধ্যে বলিয়াছেন যে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি—এই দুইটি গুণের ফলে তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি এত বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অনেকাংশ সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। শুধু কেবল অভিজ্ঞতা নহে, সহানুভূতি নহে, চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্ট কলাকৌশল অবলম্বন না করিলে কোনো চরিত্রই যথার্থ-ভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। এই কলাকৌশলের একদিকে সংযম আর একদিকে আবেগ। নাটকীয় চরিত্রের ভাব ও আচরণ যেমন একটি পরিমিত স্বাভাবিকতার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে হয় তেমনি আবার আবেগ ও দ্বন্দ্ব সঞ্চার করিয়া তাহাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিতে হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকের কোনো কোনো চরিত্র যে সবল ও জীবন্ত হইয়াছে আবার কোনো কোনো চরিত্র যে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই কলাকৌশলের সার্থকতা ও ব্যর্থতা। তোরাপ, রাইচরণ, আঁদুরী, গোপীনাথ প্রভৃতি চরিত্র যে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ,—তাহাদের হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবলরূপে দেখান হইয়াছে, তেমনি আবার তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গি অতি স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। নীলমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র যে নির্জীব ও নীরস হইয়াছে তাহার কারণ দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার অভাব নহে, সহানুভূতির স্বল্পতাও নহে। তাহাদের চরিত্র বেশি ভালো বানাইতে যাইয়াই নাট্যকার তাহাদিগকে মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাদের মুখের ভাষার তোড়ে হৃদয়ের ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে। হৃদয়বৃত্তির কোনো প্রবল সংঘাত তাহাদের মধ্যে নাই, ক্রিয়া অপেক্ষা কথাদ্বারাই তাহা আমাদের সহানুভূতি অধিক আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে। এই সব কারণেই তাহাদের চরিত্র সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। সংলাপের শুধু দীর্ঘতা নহে, ইহার অসংগত অস্বাভাবিকতার ফলেও ভদ্র ও উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি এরূপ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের চরিত্র প্রাণ লাভ করে তাহার সংলাপ হইতে, সেই সংলাপ যেখানে অবাস্তর সেখানে চরিত্র কখনো বাস্তব হইতে পারে না। প্রণয়ে কিংবা প্রলাপে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় নাই, তাহা আহৃত হইয়াছে সংস্কৃত নাটক হইতে। সেজন্য তাহাদের কথা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, তাহাদের মূর্তিও আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিকৃতমস্তিষ্কা মাতার হাতে নিজের স্ত্রীর মৃত্যু দেখিয়া

বিন্দুমাধব বলিতেছে, 'আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত; শোকশার্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।' বিন্দুমাধবের এই কথাগুলি নিদারুণ শোকাবহ অবস্থাতেও যে আমাদের অন্তর নাড়া দেয় না তাহার কারণ নিতান্ত কৃত্রিম সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ছাড়া আর কিছুই নহে, খাঁটি বাংলা ভাষায় ব্যক্ত হইলে কথাগুলি আমাদের চিত্তে অন্য-রকম প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করিত। সুস্থ ও সভ্যশ্রেণীর ভাষার এই কৃত্রিমতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দীনবন্ধু তৎকালীন প্রচলিত ভাষাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য,—'মনে হয়, সাধুভাষার সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।' তৎকালীন হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও গম্ভীর রসাত্মক নাটকের ভাষা সম্পূর্ণ দুই রকম ছিল। প্রহসনের ভাষা যেমন সচল ও স্বাভাবিক, নাটকের ভাষা তেমনি অচল ও অস্বাভাবিক ছিল। রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' অথবা 'উভয়-সঙ্কট'-এর ভাষার সহিত 'নবনাটক'-এর ভাষার প্রভেদ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অথবা 'জামাই বারিক'-এর সহিত 'লীলাবতী অথবা নবীনতপস্বিনী'-র তুলনা করিলেও ভাষার গুণে তাঁহার প্রহসনের চরিত্রগুলি কত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। নাটকের মধ্যেও তিনি যেখানে লঘু হাস্যরসের অবতারণার সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রাণরসের প্রতিমূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন; নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, জলধর, জগদম্বা প্রভৃতি চরিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নীলদর্পণ'-এও প্রধানত এই ভাষার একান্ত সজীব স্বাভাবিকতার জন্য আদুরী, গোপীনাথ, তোরাপ, রাইচরণ, পদী, রোগ, উড ও রাইয়তগণের চরিত্র এত সরস হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবীনমাধব, বিন্দু-মাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র নিতান্ত নীরস হইয়া পড়িয়াছে। নবীনমাধব নাটকের নায়ক। এই উদার নির্ভীক ও মহাপ্রাণযুক্ত যুবক প্রকৃত মর্যাদা দুর্দান্ত নীলকর সাহেবদের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। সুতরাং তাহার চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, সুঅঙ্কিত হইলে ইহা আমাদের মনে অবিস্মরণীয় প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিত, কিন্তু এই ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্যের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবার সময় অথবা নীলকর সাহেবদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার অবস্থায় তাঁহার ভাষার আড়ম্বরে অন্তরের কোন প্রবল আবেগ ও প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

'নীলদর্পণ'-এ দরিদ্র কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষক এবং আদুরীর মত ঝি আর কোথাও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না। শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু তাহাদের প্রাণের বন্ধু হইয়া নিজেকে তাহাদের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের উন্মুক্ত অমার্জিত জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও ভঙ্গি তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। তোরাপ সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র কৃষক কিন্তু দুর্দান্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাহার ভয় নাই, জীবন সম্বন্ধে তাহার একেবারেই কোনো পরোয়া নাই। সুনিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে একবার ক্ষেত্রমণি ও আর একবার নবীনমাধবকে উদ্ধার করিয়াছে। তাহার হাত গিয়াছে কিন্তু দাঁতের দ্বারা সে প্রতিশোধ লইয়াছে। নবীনমাধবের ন্যায় সে শিক্ষিত ও উদার নহে, ক্ষমার মহিমা সে জানে না, আবেদনের কোনো মূল্য তাহার কাছে নাই, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত আর চোখের বদলে চোখ। কিন্তু তাহার এই ক্রুদ্ধ হিংস্র প্রতিহিংসার নীচে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম—নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম প্রভুভক্তি আর স্নেহসিক্ত মনুষ্যপ্রীতি। সাধুচরণ ও রাইচরণ এই দুই ভাইয়ের মধ্যে রাইচরণের চরিত্রই অধিকতর সজীব হইয়াছে। তাহার কারণ সাধুচরণ একটু হিসাবী, সাবধানী, সহিষ্ণু ও আপসপন্থী, তাহার কথাবার্তা একটু আড়ষ্ট ও ভদ্রঘেঁষা, কিন্তু রাইচরণ খাঁটি চাষা—গোঁয়ার, বেপরোয়া ও চিন্তাভাবনাহীন। তাহার পেটের জ্বালার কাছে বিষয়ের চিন্তা তুচ্ছ, পদী ময়রাণী মেয়েলোক হইলেও দামঠাসা করিতে তাহার দ্বিধা নাই। আদুরীচরিত্র নাট্যকারের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আদুরী ঝি হইলেও নাটকের মধ্যে সে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং নাটকের বিষাদ-ঘন পরিবেশের মধ্যে সে এক সরস কৌতুকের ধারা সঞ্চার করিয়াছে। নাটকের স্ত্রী-মহল জমাইয়া রাখিয়াছে সে—তাহার রসাল ছড়া আর শাঁসাল মন্তব্যের মধ্য দিয়া। সে সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল, সব ব্যাপারে সে একটি মত প্রকাশ করিয়া ছাড়িবে। নাড়ের বিয়ে দেয় যে সাগর সে যে তাহার দলে নয়, দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়িলে সে যে কখনও সাহেবের কাছে যাইবে না, কুটির বিবির মাচের টক সাহেবের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যে সে মোটেই সমর্থন করে না—ইত্যাকার বিবিধ মন্তব্য দ্বারা সে সকলের মাঝে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করিয়া বসে। কিন্তু আদুরীর আর একটি দিক আছে—প্রভুপরিবারের সকলের সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ তাহাদের দুঃখবেদনার সহিত তাহার একান্ত একাত্মতা।

দীনবন্ধুর সহানুভূতি আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।" এই সর্বব্যাপী সহানুভূতির ফলেই তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক—শেক্‌সপীয়র, ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্রের সহিত একই পংক্তিতে তিনি অধিষ্ঠিত। পুণ্যবানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আছে কিন্তু পাপীর প্রতিও তাঁহার ঘৃণা নাই। সেজন্য গোপীনাথ ও পদী ময়রাণীর চরিত্রও তিনি সহানুভূতির সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোপীনাথ নীলকর পদলেহী, নীচ স্বার্থপর ভৃত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটি বেদনাকরুণ, আত্মসচেতন ধিক্কারবোধ আছে যাহাতে তাহার প্রতি আমরা একপ্রকার অনির্দেশ্য সমবেদনা বোধ করিয়া থাকি। শেক্‌সপীয়রের ফলস্টাফ-চরিত্রের ন্যায় দীনবন্ধু একটি নীচ ঘৃণ্য চরিত্রকে সরস-রহস্যপ্রিয় উপভোগ্য চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। পদী ময়রাণীও একটি নষ্টচরিত্রা কুটনী হইয়াও যে একেবারে নির্লজ্জ হৃদয়হীন হইয়া পড়ে নাই নাট্যকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। সকলের ঘৃণা ও পরিহাস কুড়াইয়া সে নিজের কলঙ্কিত মুখটি সমাজের দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়াই রাখিতে চাহে। নবীনমাধবকে দেখিয়া সে লজ্জায় ধিক্কারে বলিয়াছে, 'ও, মা, কি লজ্জা, বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।' ক্ষেত্রমণিকে সে রোগ সাহেবের কাছে ভুলাইয়া আনিয়াছে বটে কিন্তু এই নরপিশাচের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেও সে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই! তাহার নিজের কাজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। সে নিজেই বলিয়াছে, 'আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে আপন পায় আপনি কুড়ুল মারি? ...আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই?'

'নীলদর্পণ' নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। এই উদ্দেশ্য নাট্যকার প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই। নাটকের ভূমিকায় এবং নাটকীয় চরিত্রের কথায় অত্যাচার-পীড়িত কৃষকদের দরদী মুখপাত্র নিজেকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে নাটকের শিল্প ও রসপরিণতিও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিরুপায় কৃষককুলের নিদারুণ সমস্যাটি সকলের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই নাট্যকার তাঁহার নাটকে সর্বব্যাপী করুণ রসের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' করুণ রসাত্মক নাটক সন্দেহ নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহার মধ্যে ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব সব কিছুই দেখান

যাইতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র করুণ রসাত্মক বলিয়া 'নীলদর্পণ'-এর বিচার শেষ করা চলে না। 'নীলদর্পণ' পাশ্চাত্ত্য প্রভাবাশ্রিত পঞ্চাঙ্ক নাটক সুতরাং পাশ্চাত্ত্য নাট্যলক্ষণ অনুসরণ করিয়া ইহা বিষাদান্তক হইলেও যথার্থ ট্র্যাজেডি হইয়াছে কিনা সেই বিচার অবশ্যই সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। নাটক বিষাদান্তক হইলেই ট্র্যাজেডি হয় না। যে বিষাদ শুধু কেবল বাহ্য ঘটনা ও শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত, যে বিষাদ চরিত্রের কোনো দুর্বার চিত্তবৃত্তি অথবা দুর্লঙ্ঘ্য আচরণ দ্বারা উদ্রিক্ত হয় নাই তাহা ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত নহে। মানুষ নিষ্ঠুর ভাগ্যের সহিত দুর্দান্ত সংগ্রাম করিয়া যখন পরাজিত, সে তাহারই দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের নিদারুণ দ্বন্দ্বে যখন ক্ষতবিক্ষত তখনই তো তাহার ট্র্যাজেডি। কিন্তু সেই ট্র্যাজেডি 'নীলদর্পণ'-এ নাই। এই নাটকে দুঃখ আছে, আঘাত আছে, কিন্তু সেই দুঃখ ও আঘাতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ কোথায়? নিছক দুঃখ-ভোগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাই, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মধ্যেও কোনো ট্র্যাজিক মহিমা নাই। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, 'Tragedy is an imitation of action and primarily on that account, of persons acting'। কিন্তু 'নীলদর্পণ'-এর বিয়োগান্তক চরিত্রগুলির মধ্যে এই সচল, সক্রিয় ভাব আমরা দেখি না। স্বরপুর-বৃকোদর নবীনমাধবের বলবীর্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রমণির উদ্ধারদৃশ্য ব্যতীত আর কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। অ্যারিস্টটল আর একটি অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—'Now, persons possess certain qualities in virtue of their characters but are happy or the reverse in virtue of their actions'। কিন্তু নাটকে গোলোক, নবীনমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতির করুণ পরিণতি তাহাদের কোনো আচরিত কর্মের ফলে হয় নাই। তাহারা বাহিরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে নীরব আত্মাহুতি দিল। ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এই দুঃখ বিশ্ববিধানের কোনো নিগূঢ়, অনির্দেশ্য রহস্যবেদনা আমাদের মনে জাগ্রত করে না। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন, 'প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে।' কিন্তু তাহাও বোধ হয় ঠিক নহে। গ্রীক নাটকে যে মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে সেই রকম কোনো ভ্রান্তিও এই নাটকে নাই। এখানে দুঃখের কোনো কারণ, কোনো দায়িত্ব নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত নাই, সেজন্য এই দুঃখ তাহাকে করুণ করিয়াছে কিন্তু জীবন্ত করিতে পারে নাই। নাটকের মধ্যে যে সর্বব্যাপী

বিষাদমগ্নতা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাও অতিকথন ও আতিশয্যদোষে সংহত-গম্ভীর রূপ হারাইয়া যেন ফেন-তরল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের রুদ্রজ্বালার তপ্ত নিশ্বাসে অশ্রুবাষ্প শুকাইয়া যায়, বাক্যপ্রবাহ সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া এক নির্বাক অন্তর্বেদনায় গুমরিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এই নাটকে অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে, বাক্যের বন্যা বহিয়াছে দুঃখের জ্বালা-বেদনা ইহাতে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে মৃত্যুর অসঙ্গত আতিশয্য দেখিয়া মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মুছিয়া যায়। যেখানে মৃত্যু এত সুলভ, এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের মনে দুঃখ উদ্রেক করে না, আতঙ্কও সঞ্চার করে না। শ্মশান-দৃশ্যে মৃত্যুর শোভাযাত্রা দেখিয়া আমরা বিচলিত হই না, অথচ কোন কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। এই নাটকেও মৃত্যু শুধু ঘটানো হইয়াছে মাত্র, উহাকে শিল্পরসের অঙ্গীভূত করা হয় নাই। সেইজন্য ইহা আমাদের চোখের দৃষ্টিতে শেষ হইয়া যায়, মনের মর্ম পর্যন্ত আর পৌঁছিতে পারে না।

॥ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)॥ এই নাটকখানির মধ্যে ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য ইহার নাটকীয় গতি বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইটি কাহিনী গ্রন্থের মধ্যে নাটকীয় রসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রমণীমোহন-তপস্বিনী-বিজয়-কামিনীউপাখ্যান প্রেম এবং বিচ্ছেদমূলক এবং জলধর-জগদম্বা-মালতী-বিনায়ক ঘটিত কাহিনী হাস্যরসাত্মক। নাটকের নাম হইতে মনে হয়, নবীন তপস্বিনী কামিনী এবং তাহার আখ্যানের উপরেই নাটকের গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পাঠক ও দর্শকের কাছে যে অদ্ভুত কৌতুকজনক গৌণ বিষয়টিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও আদরণীয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। দীনবন্ধুর নাটকের অনেকস্থলে মধুসূদনের নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। দীনবন্ধু সম্ভবত তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত নাটকের ন্যায় সুদীর্ঘ কাব্য রসাত্মক উক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রেমমূলক নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বাংলা কাব্যে বাংলার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের রাজা ও রাণীর ন্যায় অঙ্কিত দীনবন্ধুর নাটকের পাত্র-পাত্রী কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইবার সর্বপ্রধান কারণ এই যে, দীনবন্ধু ঐ সব চরিত্রের অনুকূল আবহাওয়া (atmosphere) সৃষ্টি করিতে

পারেন নাই। যে দূরত্ব ও মোহিমোন্নত বিশিষ্টতা থাকিলে দর্শক ও পাঠক কল্পনা-নয়নে ইহাদের কাহিনী স্বাভাবিক মনে করিত, তাহার অভাবে এই সব পাত্র-পাত্রী নিতান্ত ঘরোয়া ও আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। রাজার বয়স্যমাধব সভাসদ ও পণ্ডিতবর্গ, জলধর ও বিনায়ক, সুরমা—ইহাদের চরিত্র একান্তই আমাদের সচরাচর দৃষ্ট আধুনিক চরিত্র। সুতরাং এই রকম আধুনিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিজয় ও কামিনীর প্রেম এবং অভিজ্ঞান দর্শনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ন্যায় এই নাটকে রাজা ও রাণীর মিলন ব্যাপার বেমানান ও অসঙ্গত হইয়াছে। প্রেমে দোষ নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র-নিন্দিত courtshipও আপত্তিজনক না হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া স্খলিত সংস্কৃত উক্তিসমূহ অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইযাছে। দীনবন্ধু মাইকেলকে অনুসরণ করিয়া মাঝে মাঝে অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত আড়ষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে। নাটকের প্রধান কাহিনীর পাশে যে সরস, কৌতুকোজ্জ্বল পরিহাস-পূর্ণ উপাখ্যানটি রহিয়াছে তাহার রসোচ্ছ্বসিত সংঘাতে প্রেম, মিলন, বিরহ প্রভৃতি করুণ ও আদিরসাত্মক বিষয়গুলি নিতান্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

জলধর-জগদম্বা-মালতীর কাহিনীটি—শেক্‌স্‌পীয়রের 'Merry wives of Windsor' নাটক অবলম্বনে রচিত, ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। উভয় কাহিনীর মধ্যে ঘটনা এবং চরিত্রগত বিলক্ষণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকেও আছে যে সার জন ফলস্টাফ মিসেস পেজের কাছে প্রেমপত্র পাঠাইয়া তাহাদের প্রেম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রণয়-প্রাবল্যের জন্য নোংরা বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আবৃত হইয়া কর্দমাক্ত জলে পতিত হন, দ্বিতীয়বার ফোর্ডের হাতে প্রহৃত হন, অবশেষে নকল পরীদের খোঁচায় বিব্রত হন। জলধরও দুইবার শাস্তি পায়, এবং তাহার শাস্তিও ফলস্টাফের অনুরূপ। তবে জগদম্বা চরিত্রটি মৌলিক, এবং এই দুই 'দেবদেবী'র মধ্যে যে লড়াই ও পাল্‌টাপাল্‌টি চলিয়াছে তাহাতে কাহিনীটি আরো বেশী সরল হইয়াছে। মল্লিকা ও মালতি যথাক্রমে মিসেস পেজ ও মিসেস ফোর্ডের ন্যায় রঙ্গরসময়ী স্ত্রী (merry wives), এবং তাহাদের সুচতুর বুদ্ধি, witty কথাবার্তা ও রঙ্গরসপ্রিয়তা বিশেষ উপভোগ্য। তবে বাঙালী ললনার পক্ষে লজ্জাশীলতা বর্জন করিয়া এভাবে একজন পুরুষের সহিত সাহসিক রসিকতা করা একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। 'Merry wives'-এর মধ্যে ঈর্ষাপীড়িত স্বামী ফোর্ড যেমন ঠকিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকেও তেমনি রতিকান্ত মালতীর সতীত্বে সন্দেহ করিয়া বেয়াকুব বনিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়রের

প্রহসনখানিতে আগাগোড়া কৌতুকরসের উচ্ছল স্রোত প্রবাহমান। মিস্ অ্যানি পেজের প্রণয়ার্থীদের মধ্যে যে কৌতুকাবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মূল কাহিনীর সহিত সুকৌশলে লগ্ন হইয়াছে. কিন্তু 'নবীন তপস্বিনী'র দুইটি উপাখ্যানের মধ্যে কোন দৃঢ়-সংলগ্ন যোগ নাই, একটি কাহিনী অপরটির উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে নাই, এবং ফলে নাটকের ঐক্য নষ্ট হইয়াছে। নাটকখানির নাম 'নবীন তপস্বিনী' হইলেও তপস্বিনী কামিনীর চরিত্র মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। যে রকম তুচ্ছ কারণ দেখাইয়া কামিনী ও বিজয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার এবং পারস্পরিক আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত দুর্বল ও অবিশ্বাস্য বোধ হয়। বড় রাণীর প্রতি রাজার বিদ্বেষ সন্দেহ পরোক্ষভাবে দর্শকদিগকে জ্ঞাপিত করা হইয়াছে, নাটকের মধ্যে প্রদর্শিত হয় নাই, সেজন্য রাজার অনুতাপদগ্ধ বিলাপ আমাদের কাছে অনর্থক এবং আবেদনহীন, রাজা ও রাণীর পুনরায় মিলনও আমাদের আনন্দ উদ্রেক করে না। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ঘটকগণের পাত্রী বর্ণনার মধ্যে নাট্যকার বিভিন্ন স্থানের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

॥ লীলাবতী (১৮৬৭)॥ 'লীলাবতী' নাট্যকারের পরিণত লেখনীর রচনা দীনবন্ধু উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'অপরিমিত আয়াসসহকারে 'লীলাবতী' নাটক প্রকটন করিয়াছি।' বিষয়বস্তুর রহস্যঘনতায় এই আয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় বটে। বস্তুত তাঁহার সমস্ত নাটকের মধ্যে 'লীলাবতী'ই ঘটনার সংঘাত ও আকস্মিকতা দ্বারা দর্শকের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ-চঞ্চল করিয়া রাখিতে পারে। নাটকের শেষদিকে কাহিনী অত্যন্ত গতিমান হইয়া উঠিয়াছে। অরবিন্দ, যোগজীবন, চাঁপা ও তাহার পরিচয়ের রহস্যময়তা আমাদের মনকে নিতান্ত কৌতূহলী ও বিপর্যস্ত করে। ইহাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস গড়িয়া ওঠে বার বার তাহা সজোরে নাড়িয়া দিয়া নাট্যকার আমাদের সহিত যথেষ্ট কৌতুক করিয়াছেন। যোগজীবনকে প্রথমে একজন তপস্বী, পরে অরবিন্দ, তারপর একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং অবশেষে একজন 'আউরাং' বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টরের মত দর্শকেরও বলিতে ইচ্ছা হয়—'আমি বড় হয়রান হয়েছে'। অবশ্য নাট্যকার ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বের প্রশ্ন নিরসন করিয়া দিবার জন্যই যোগজীবনকে চাঁপা রূপে পরিণত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই রকম একজন করিতকর্মা সন্ন্যাসী যে প্রকৃত একজন স্ত্রীলোক—ইহা আমাদের বিশ্বাসকে আঘাত করে। চরিত্রের সবল সংঘর্ষও 'লীলাবতী'কে বিশেষ নাটকীয় রসসম্পন্ন করিয়া

তুলিয়াছে। লীলাবতীর বিবাহ-নির্ণয় এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে একদিকে হরবিলাস, ভোলানাথ এবং নদেরচাঁদ এবং অন্যদিকে শ্রীনাথ, সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহন দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। ললিত এবং লীলাবতীর একাগ্র অনুরাগ বাধাপ্রাপ্ত এবং বিঘ্নগ্রস্ত হওয়াতে পাঠক ও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য কাহিনীর চমৎকারীত্ব সত্ত্বেও ইহার মধ্যে দুর্বল অংশও আছে। অরবিন্দের নিরুদ্দেশ এবং তাঁহার পুনরাগমন দর্শকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক নয়। অরবিন্দ যদি প্রকৃতই কোন অন্যায় করিত, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা থাকিত। কিন্তু সামান্য ভুল এবং লোকাপবাদের জন্যই সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তপশ্চর্যায় নিরত রহিল। তাহার নিরুদ্দেশে ক্ষীরোদবাসিনীর মর্মান্তিক বিলাপ এবং প্রত্যাগমনে সকলের আনন্দোল্লাস দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এ সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একথা সত্য বটে যে অরবিন্দের নিরুদ্দেশের জন্য নাটকের বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

'লীলাবতী' প্রেম এবং প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক। কিন্তু দীনবন্ধু কোন নাটকেই আদিরস বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই, এবং এই নাটকেও তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। ললিত এবং লীলাবতীর প্রেমের দৃশ্য আমাদের মনে আনন্দের পরিবর্তে ভীতির সঞ্চারই করে। নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর যখন অভিনীত হয় তখনও দর্শকগণ ললিত এবং লীলার প্রেমপূর্ণ কথোপকথনে নিতান্ত বিরক্ত হইত। ইহার কারণ বিশ্লেষণে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যে অতি উৎকৃষ্ট সমালোচনা করেন আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১]

১। 'লীলাবতী' নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ, সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন? আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করি। একখানি পাঠোপযোগী নাটক সাধারণত অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থানে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া লই। অনেক স্থলে একটি ভাবে নানাভাবের উদয় হয়। অভিনয়ের সময় আমরা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া জীবনের কার্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা করি, সুতরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখবোধ করিতে পারি না; প্রত্যুত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এইজন্য প্রধান প্রধান লেখকদিগের নাটকও অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয়। পাঠকালীন যাহাই হউক অভিনয়ের সময় দুই ব্যক্তির পদ্যে কথোপকথন এ দেশীয়দের রুচিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিজনক। এইজন্য সেদিন ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপের সময় অনেকে ইংরাজীতে 'প্রেমিকারা প্রেমালাপে ক্ষান্ত হউন' বলিয়া বারংবার চীৎকার

দীনবন্ধু অনেক নাটকেই সামাজিক কুপ্রথা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই নাটকেও তিনি কৌলিন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তখনকার সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনে তাঁহার সাগ্রহ সমর্থন ছিল। 'লীলাবতী'তেও ব্রাহ্ম-আন্দোলন এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি যাহাদিগকে সমর্থন ও প্রশংসা করিতেন, যাহাদিগের মহত্ত্ব বহুতর সুদীর্ঘ উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেন তাহারা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। শালীনতা, সদাচার, সতীত্ব প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণগুলি দ্বারা তিনি কয়েকটি চরিত্রকে কেবল ভারগ্রস্ত করিয়াছেন, স্বাভাবিক করিতে পারেন নাই। নায়ক ললিত সুশীল, সুবোধ ও সদাচারী বটে, কিন্তু বিশেষত্ববর্জিত এবং প্রভাবহীন। নায়িকা লীলাবতীর চরিত্রও আড়ষ্ট ও আবেগহীন। দীনবন্ধু শিক্ষিতা ব্রাহ্মভাবাপন্না স্ত্রী-চরিত্র আঁকিতে যাইয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। লীলার মিলনানন্দ ও বিরহবেদনা—দুইটিই সমানভাবে বিরক্তিকর। সংস্কারনিষ্ঠ, পুত্রবিচ্ছেদকাতর, কন্যাবৎসল পিতা হরবিলাসের চরিত্র দর্শকের মনের পরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই ধরনের দৃঢ়চেতা অথচ প্রাচীনপন্থী, দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্র দীনবন্ধুর অন্য কোনো নাটকে দেখা যায় না। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র অনেক সৃজন করিয়াছেন, সুঅভিনয়ে উজ্জ্বল হইয়া অনেকগুলি চরিত্র দর্শকের মনে অমর হইয়া আছে।[১] হরবিলাসের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের স্থির সঙ্কল্পের জন্যই নাটকের অন্যান্য চরিত্র ক্রিয়াশীল এবং সংঘাতমূলক হইয়া উঠিয়াছে। হরবিলাসই সমস্ত ঘটনার শক্তিমান নিয়ন্ত্রী।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক এবং প্রহসনের ন্যায় এই নাটকেও যে চরিত্রগুলি নিন্দিত এবং ঘৃণিত তাহারাই পাঠক ও দর্শকের কৌতূহলী এবং আগ্রহসিক্ত

করিয়াছিলেন। লীলাবতী রোগে বা বিরহশয্যায় অচেতন হইয়াছেন, তাহার মুখ দিয়া তখন কবিতাস্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩।

('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'—পৃঃ ১২৭ হইতে পুনরুদ্ধৃত।)

১। হরবিলাসের ভূমিকায় বাগবাজার 'এমেচার থিয়েটারে' শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টিকে অব্যাহতভাবে জাগাইয়া রাখে। আত্মীয় চিত্তের অজ্ঞাত সহানুভূতি যে গোপনে ইহাদের চরিত্র সরস মাধুর্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সম্ভবত স্বয়ং নাট্যকারও তাহা জানিতে পারেন নাই। মূর্খ, নির্বোধ, নেশাখোর নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে। 'হরিণের শিং', 'দানেন ন ক্ষয়ংযাতি', 'স্ত্রীরত্ন মহাধনং' ইত্যাদি কথা শিক্ষিত দর্শককে যথেষ্ট আমোদ দিতে পারে। নদেরচাঁদের ন্যায় অধঃপতিত মূর্খ ও ধিক্কৃত চরিত্র আমাদের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পা উদ্রেক করে। শ্রীনাথের witty ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিমচাঁদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীনাথ নিজে মদ্যপায়ী, আড্ডাধারী—দোষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তাহার আছে। সেজন্য তাহার ব্যঙ্গ ও উপহাস অব্যর্থ ও চিরস্থায়ী। গোরু খেদাইতে সে গাছের মোটা মোটা ডাল বাছিয়া নেয়, পাতলা ছড়ি ব্যবহার করে না। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের তিরস্কার এবং উপদেশ শিরোধার্য বটে, কিন্তু মর্মস্পর্শী নহে।

॥ কমলে কামিনী (১৮৭৩)॥ 'কমলে কামিনী' দীনবন্ধুর সবশেষ নাটক। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকে রাজা, রাণী এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত থাকিলেও প্রহসনের পরিচিত আবেষ্টনীর আঘাতে নাটকের গুরুত্ব তরল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের কেবলমাত্র পূর্বাপর ঐতিহাসিক চরিত্রোপযোগী গম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু হাস্যরসলিপ্সু নাট্যকার জায়গায় জায়গায় তরল হাস্যপরিহাসের দ্বারা নাটকের রসে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকে হাস্যরসই প্রাণ, কিন্তু এই নাটকে হাস্যরস অনেক স্থলেই মূলরসের পরিপন্থী এবং বিরক্তিজনক হইয়াছে। ঐতিহাসিক কিম্বা বীররসাশ্রিত নাটক রচনার প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না, সুতরাং নাটক হিসাবে এইখানাও ব্যর্থ ও অসার হইয়াছে।

দীনবন্ধুর অনেকগুলি নাটকে জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রকৃত পরিচয়ের গোলমাল দেখান হইয়াছে। এই নাটকেও শিখণ্ডিবাহনের জন্ম প্রথম রহস্যাচ্ছন্ন, এবং পরিশেষে রহস্য উদ্ঘাটনে নাটকের সমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু জন্ম-অপবাদের জন্য শিখণ্ডিবাহনের মনে কোনো ক্ষোভ কিংবা দ্বন্দ্ব নাই, এবং তাহার চরিত্র বিকাশেও ইহা তেমন বাধা দিতে পারে নাই। ব্রহ্মরাজ প্রথমে জারজ বলিয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে সামান্য আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তাহার সৌন্দর্য ও বীর্যদর্শনে তাহাকে স্বীয় কন্যা এবং কাছাড় সিংহাসন প্রদান করিতে সম্মত হয়। শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর মিলনেও

কোনো বাধা উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং নাটকের শেষদিকে ঘটা করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া ঘটনার গতি বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারা যায় নাই। 'কমলে কামিনী' অভিনয়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী নাটক। শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর প্রথম সাক্ষাৎকার-দৃশ্যটি রঙ্গমঞ্চে দেখান সম্ভব নহে। অশ্বারূঢ় শিখণ্ডিবাহন, প্রাসাদ উপরিস্থ রণকল্যাণী, উপর হইতে নিম্নে মালানিক্ষেপ ইত্যাদি ব্যাপার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা অসাধ্য। অশ্বপৃষ্ঠলগ্ন বক্কেশ্বরের হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটিও প্রদর্শিতব্য নহে। নাটকের মধ্যে অবান্তর এবং বিরক্তিকর দৃশ্য যথেষ্ট আছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রণকল্যাণীর দিদিমাকে দিয়া স্থূল হাস্যরসের দৃশ্যটির অবতারণা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক বক্কেশ্বর এবং পরিষদবর্গের যে নির্জলা ভাঁড়ামির চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও দর্শকের ধৈর্যের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। নাটকের মধ্যে রামলীলার যে দৃশ্য দেখান হইয়াছে তাহা সংস্কৃত নাটকের মদনোৎসবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকের স্ত্রী-ভূমিকাগুলি পুরুষচরিত্রগুলি অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত। বিশেষত রণকল্যাণীর প্রখরবুদ্ধিশালিনী রঙ্গরসবতী সখী সুরবালার ক্রিয়াকলাপ এব কথাবার্তা বিশেষ মনোহারী হইয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপেরা বা গীতাভিনয়

বাঙালীর মন স্বভাবতই কোমল এবং ভাবপ্রবণ। সেজন্য তরল, উচ্ছ্বাসময় ভক্তিধারা তাহার অন্তরে যেমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এমন আর কিছুই পারে নাই। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক দেখিবার সুযোগ পাইলেও দর্শকসাধারণ ধর্ম্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা দেখিতে অভিলাষী ছিল। নাটকের প্রচলন হইলেও সর্বত্র রঙ্গালয় স্থাপন করা সম্ভব এবং সাধ্য ছিল না। এই দুই কারণই নাটকের মত লিখিত অথচ যাত্রার ন্যায় অভিনেতব্য এইরূপ একপ্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হইল। ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইত। ইহার সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে। অপেরা লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন শ্রেষ্ঠ। মনোমোহনের পরে তাঁহার অনুসরণে বহুতর অপেরালেখক তাঁহাদের নাটকের দ্বারা বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মনোমোহন বসু

(ক) গীতাভিনয়

মাইকেল এবং দীনবন্ধুর পরে বাংলা নাটক সাধারণত পাশ্চাত্ত্য রীতিতে রচিত হইলেও প্রাচ্য রীতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মনোমোহন বসু ইঁহাদের পরবর্তী (১৮৩১-১৯১২) হইলেও, তিনি প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করিয়া নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[১] মনোমোহন দুই তিনখানা সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নূতন ধরনের পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াই তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বাংলা নাটক প্রচলিত হইবার পূর্বে পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যান লইয়া যাত্রা রচিত হইত। যাত্রাগুলি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও ক্রমে ক্রমে বৈচিত্র্যহীনতার জন্য এবং রুচি পরিবর্তনের ফলে লোকের কাছে অনাদৃত হইয়া পড়ে। যাহার বিষয়গুলি খুবই সীমাবদ্ধ, সাধারণত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কোনো পালা লইয়া যাত্রাগান হইত,

১। 'এদেশের নাটকারগণ দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। এক শ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ। আর এক শ্রেণীর নাম বাংলানবিশ। বাংলানবিশদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমরা এইজন্য বহুদিন হইতেই ইহার গুণ পক্ষপাতী।'

বান্ধব, বৈশাখ, ১২৮৮ সাল

এবং এইরূপ বিষয়ের গতানুগতিকতা লোকের মন আর আকর্ষণ করিতে পারিত না। যাত্রাগুলির মধ্যে যে নিম্ন রুচি ও অশ্লীল রসের অবতারণা থাকিত তাহাও পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট জনসাধারণ প্রশংসার চোখে দেখিত না। থিয়েটারের প্রবর্তনের ফলে লোকে আধুনিক রুচিসম্মত নাটকের অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য রঙ্গালয় স্থাপন এবং অভিনয় দর্শন সম্ভব হইত না। সুতরাং তখন হইতে নাটকের ধরনে রচিত, অথচ রঙ্গমঞ্চের অভাবেও অভিনেতব্য এইরূপ একপ্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়, ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইয়া থাকে।[১] এই রকম নাটকের মধ্যে দৃশ্যপটের অভাব গীতের আধিক্যদ্বারা পরিপূর্ণ হইত। যাত্রার ন্যায় ইহাতেও ভক্তি এবং করুণ রসের প্রাবল্য, তবে যাত্রা অপেক্ষা ইহাতে সাজপোশাকের বৈচিত্র্য এবং ভাষার অধিকতর শালীনতা ও পরিপাট্য দেখা যাইত।[২] দৃশ্য-সংযোগ এবং ঘটনা-সংস্থাপনের দিক দিয়া এইসব অপেরা বা গীতাভিনয় নাটকের সমধর্মী। বস্তুত তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাটক রঙ্গমঞ্চের বাহিরে গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইত।[৩] মনোমোহন বসুর নাটকগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, খাঁটি নাটক অপেক্ষা এইগুলিকে গীতাভিনয় নাম দেওয়া অধিকতর সঙ্গত। মনোমোহন প্রধানত একজন গীতিকার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবি, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সমস্ত গানের রসে তাঁহার চিত্ত সিক্ত ছিল, সেজন্য নাটক লিখিতে যাইয়া ইহাদের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সব নাটকেই গীতের অত্যধিক প্রাচুর্য বিদ্যমান, এমন কি তাঁহার সামাজিক নাটকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তিনি বুঝিয়া ছিলেন, আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। সেজন্য তিনি স্বীয়

১। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মানুল কানুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হয়। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালা-স্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেন।'

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মন্তব্য—ব্রজেন্দ্রবাবু দ্বারা পুনরালোচিত—'নাট্যশালার ইতিহাস' পৃঃ ৮৮।

২। In an Opera there is a variety of dress and costumes, elegant language and other imposing things.

—'*Indian Stage*, Vol. I, by Hemendra Nath Das Gupta. P. 133.

৩। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী,' কালীপ্রসন্নের ''সাবিত্রী-সত্যবান' এবং মাইকেলের 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয় রূপে অভিনীত হইয়াছিল।

নাটকে গীতের বহুলতা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এব লোকরঞ্জক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।[১] বঙ্গমঞ্চের মধ্যে দৃশ্যপটের সাহায্যে অনেক নৈসর্গিক চিত্র উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে, দৃশ্যপটের অভাবে কথার মধ্য দিয়া অনেক প্রাকৃতিক চিত্র ফুটাইয়া তোলা দরকার হইতে পারে, এবং সেজন্য গীতাভিনয়ে সংলাপ দীর্ঘ এবং কবিত্বপূর্ণ হয়। মনোমোহনের নাটকের সংলাপও অধিকাংশস্থলে খুব দীর্ঘ এবং নাট্যকার সংস্কৃত রূপক, উপমা প্রভৃতি দ্বারা ইহাকে কবিত্বময় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা অনেক স্থলেই ব্যর্থ এবং নিষ্ফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ এবং অলঙ্কার বাংলা ভাষার সহিত মানাইয়া খাপ খাওয়াইয়া ব্যবহার করিতে না পারিলে ইহা নিতান্ত কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক হয়, মনোমোহনের নাটকে তাহাই হইয়াছে। দুঃখ এবং বিলাপের স্থলে উক্তি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে, এবং ভাষাও এখানে অত্যন্ত ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মনোমোহনের নাটকে গীতের বাহুল্য তো আছেই, এবং মাঝে মাঝে পয়ার অথবা লঘুত্রিপদী ছন্দে কবিতাও আছে। দীনবন্ধুর মতো তিনিও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য, এবং উভয়েই নাটকের মধ্যে অযথা গুরুর কাব্যধারার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর ন্যায় মনোমোহনের নাটকেও অনেক ছড়াপ্রবাদ রহিয়াছে বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর ছড়াপ্রবাদগুলি যেমন স্বতঃস্ফূর্তির আবেগে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে, মনোমোহনের সেইরূপ হয় নাই। তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অধিকাংশ নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে প্রাথমিক প্রস্তাবনার মধ্যে নট-নটীর কথোপকথনে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাত্রা ও গীতাভিনয়ের প্রধান ধর্ম করুণরসের আধিক্য তাহার নাটকে ভালোভাবেই রহিয়াছে। এই করুণরসের নির্ঝর পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয় নাই। ইহা নিতান্তই কোমল জলাস্থান হইতে স্বতোচ্ছ্বসিতভাবে নির্গত হইয়াছে। জটিল ঘটনার অনিবার্য প্রবাহের মধ্য দিয়া করুণরস স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়

১। 'সতীনাটকে'র ভূমিকায় মনোমোহন লিখিয়াছেন—"যে বাঙ্গালা নাটককারের গান অধিক থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রশংসা। এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বর না যোগ ভিন্ন সাধিত হয় না যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গ তত্র রঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, মরিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী। অধিক কি, যে দেশের দিবাভিক্ষু ও পথভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি?"

নাই, সংলাপের ক্ষেত্রে করুণরস সেচন করা হইয়াছে। সেজন্য কারুণ্যের মধ্যে অনেক স্থলেই নাট্যকারের হস্তস্পর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়েই পাত্র-পাত্রীরা যথাসাধ্য কাঁদিয়াও আমাদিগকে কাঁদাইতে পারে নাই।

মনোমোহনের পৌরাণিক চরিত্রগুলি নিতান্তই সাধারণ মানবীয় চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। অতীত পুরাণ কিংবা স্বর্গ হইতে তাহারা আসিয়া যেন আমাদের ঘর-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ দর্শকেরা দেব-দেবী এবং পৌরাণিক চরিত্র এইরূপ সহজ ও সাধারণ দেখিতেই ভালবাসে এবং মনোমোহন তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে যে রকম আধ্যাত্মিকতা ও তন্ময়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল মনোমোহনের নাটকে তাহার কোনো আভাস নাই। সাধারণের রুচি সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই তিনি পৌরাণিক নাটকেও অনেক স্থূল, হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

॥ রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস (১৮৬৭) ॥ ইহাই মনোমোহনের প্রথম পৌরাণিক নাটক। রামের অভিষেকের আয়োজন হইতে বনগমন পর্যন্ত নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকার রামায়ণের প্রসিদ্ধ করুণরসাত্মক অংশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নাট্যরূপ দিয়াছেন,[১] কোনো স্থলেই পরিবর্ধন কিংবা পরিবর্জন করেন নাই। সেজন্য কাহিনীর দিক দিয়া আলোচনা করিবার কিছুই নাই। তবে নাট্যকার কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণতি সাজাইয়া নাট্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। অভিষেকের আনন্দ-উৎসবের সহিত বনগমনের বিষাদ-বেদনার অতি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। দশরথের উপায়হীন বেদনা, দুরতিক্রম্য সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার আত্মঘাতী বিলাপ খুবই করুণরসপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মর্মান্তিক দুঃখ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটার স্থলেই নাটকের উপসংহার হওয়ায় নাটক উপভোগের পর তাঁহার বিষাদময় চরিত্রের প্রভাব আমাদের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বোধ হয় মনোমোহনের কেবলমাত্র এই নাটকখানার পরিণতি বিয়োগান্ত হইয়াছে, এবং তাহাতে নাটক হিসাবে ইহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই নাটকে প্রথমে চাষাদের পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় যে কথোপকথন সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা

১। 'যে সপ্তকাণ্ডময় কল্পপাদপ, সমস্ত ভারতবর্ষীয় কাব্যকাননের বীজবৃক্ষ স্বরূপ, এই নাটকখানি তাহারি একটি পল্লবমাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইল।'

'রামাভিষেক নাটকে'র প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

নেহাত দর্শকদেব হাস্যবস উদ্রেক কবার জন্য বটে, কিন্তু ত্রেতাযুগেব কাহিনীব মধ্যে আধুনিক চাষাব দশ্য নেহাত বেমানান ও অসঙ্গত হইযাছে। ইহাতে আমাদেব বসাচ্ছন্ন দৃষ্টি যেন খণ্ডিত কবা হইযাছে।

॥ সতী (১৮৭৩) ॥ শিব অনায দেবতা বলিযা বহুদিন আযসমাজে স্থান পান নাই। দক্ষযজ্ঞে শিব অন্যান্য দেবতাদেব সহিত নিমন্ত্রিত হন নাই, ইহা দ্বাবাই প্রমাণিত হয যে তিনি আযেতব সমাজসম্ভূত। যাহা হউক দক্ষযজ্ঞেব সুপ্রচলিত কাহিনী আশ্রয কবিযাই 'সতী নাটক' বচিত হইযাছে। মনোমোহন তাঁহাব প্রায সমস্ত নাটকেই কাহিনীকে নাটকেব উপযোগী কবিযা তুলিতে বিশেষ তৎপবতাব পবিচয দিযাছেন। 'সতী নাটক'-এ সতীব চবিত্রই প্রধান বর্ণিতব্য বিষয। সেইজন্য সতীব দেহত্যাগেই নাটকেব শেষ হইযাছে। নাট্যকাব দক্ষযজ্ঞভঙ্গ প্রভৃতি নিতান্ত লোভনীয এবং আকর্ষণীয বিষয পবিত্যাগ কবিযাছেন। মনোমোহনেব নাটকে অবান্তব কিংবা অহেতুক অংশ খুব কমই থাকাতে নাট্যকাবরূপে তিনি প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। 'সতী নাটক' দেব-দেবীব লীলা লইযা বচিত হইলেও ইহা একান্তই মানবভাবপ্রধান নাটক।[১] নাট্যকাব চতুষ্পার্শ্বস্থ সামাজিক নবনাবী এবং তাহাদেব স্বভাব ও প্রকৃতিব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিযাই নাটক লিখিযা গিযাছেন। প্রসূতিব কন্যাস্নেহ, সতীব পিত্রালয প্রীতি, মঘা-অশ্লেষা প্রভৃতিব ঈর্ষা এবং কোন্দলপবাযণতা বাঙালীঘবেব নিতান্ত সুলভ এবং সাধাবণ বৈশিষ্ট্য। নাটকেব পুরুষ চবিত্রগুলিব মধ্যে দক্ষেব পবেই শান্তিবামেব নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তিবামেব সবস ছড়া এবং কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি বিশেষ আনন্দদাযক হইযাছে। নাবদেব কথাতে শান্তিবামেব চবিত্র যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হইযাছে—'নিষ্ক্রিয ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিবত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দাবিদ সেবক' (২য অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক)। কিন্তু শান্তিবাম বাহ্যত নির্বোধ এবং পাগলরূপে আচবণ কবে। তাহাব বাহ্য এবং আন্তব অবস্থাব বৈষম্যই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্বে আমাদেব সমাজে হাস্যবসেব উৎস ছিল ছড়া ও কবিতা। শান্তিবামও এই ছড়া ও কবিতাব মধ্য দিযা হাস্য উদ্রেক কবাব চেষ্টা কবিযাছে। অবশ্য আধুনিক রুচিতে তাহাব অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গি এবং অসংলগ্ন প্রলাপ বিবক্তিকব। 'সতী নাটক'-এব শেষে একটি মিলনাত্মক অঙ্ক সংযোজিত হইযাছে। এইরূপ সুখকব ক্রোড অঙ্ক ভক্তিবিলাসী ভাবুক দর্শকেব মনোবঞ্জনেব জন্যই

১। 'দক্ষেব সংসাব যেন বাঙ্গালী গৃহস্থেব ঘব'—বাঙ্গলা সাহিত্যেব ইতিহাস ২য খণ্ড পৃঃ ১১১

রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকেও এইরূপ ধর্মভাবপোষক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা আমরা লক্ষ্য করিব।

॥ হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) ॥ দাতাশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃতে 'চণ্ডকৌশিক' নামক নাটক আছে, মনোমোহনের পূর্বেও কেহ কেহ ঐ নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মনোমোহন প্রধানত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক অনুসরণ করিলেও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে তাহার কৃতিত্বপূর্ণ মৌলিকতাও রহিয়াছে। খগেন্দ্র-নাগেশ্বর-কমলাঘটিত উপাখ্যান এবং পাতঞ্জলের ন্যায় বিশেষ মনোহর চরিত্র মনোমোহনের নিজস্ব সৃষ্টি। নাট্যকার হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার মূল কাহিনীর সহিত খগেন্দ্র এবং নাগেশ্বরের বিরোধপূর্ণ উপকাহিনীটি অতি সুকৌশলে জুড়িয়া দিয়াছেন। পুরাণে এবং সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য গ্রহণ বিশ্বামিত্রের একটা খেয়ালমাত্র। রাজাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্য সেখানে সুপরিস্ফুট। কিন্তু মনোমোহনের নাটকে শরণাপন্ন নাগেশ্বরকে রাজ্য দিবার মধ্যে বিশ্বামিত্রের একটা সুস্থির সঙ্কল্প এবং সকারণ চণ্ডত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য এই নাটকে বিশ্বামিত্রকে আর কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণেচ্ছু মহাপ্রাণ বলিয়া মনে হয় না। দুরাচার নাগেশ্বরকে রাজ্য দেওয়াতে তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগরিত হয়। কমলা এবং মল্লিকা স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে। উপকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলি না থাকিলে নাটকখানি নেহাত একঘেয়ে করুণরসের মধ্যে মজিয়া যাইত। 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের প্রথম দৃশ্যও 'চণ্ডকৌশিক'-এর অনুরূপ নহে। মৃগয়াবেশী হরিশ্চন্দ্র 'শকুন্তলা' নাটকের প্রথম দৃশ্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, এবং এইরূপ আরম্ভ যথার্থই নাটকীয় হইয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য পাতঞ্জল চরিত্র। পাতঞ্জল বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইলেও চণ্ড গুরুর ন্যায় দণ্ডদানে তাঁহার উল্লাস নাই। গুরুভক্ত হইলেও গুরুর অন্যায় কাজ তিনি সমর্থন করেন নাই, এবং রাজার দুঃখে তিনি প্রকৃতই ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরে মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার কোনো আগ্রহ তাঁহার নাই। তাঁহার পাগলাটে এবং অসংলগ্ন সংলাপের মধ্যে ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপের খোঁচাগুলি খুবই কৌতুকপূর্ণ। খগেন্দ্র নাটকের প্রথম ভাগে বিকৃতমস্তিষ্করূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহাকে বীরপুরুষরূপে দেখাইবার জন্যই নাট্যকার তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়াছেন।

রচিত। কিন্তু ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য নাটকীয় আগ্রহ ও কৌতূহলকে কেন্দ্রবিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যে ঘটনার টুকরাগুলিকে একত্রিত করিয়া জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে সেইগুলি যেন মিশিয়া যায় নাই, চিড়গুলি বড়ো বেশি প্রকট হইয়া রহিয়াছে। ভূষণ, পুলিন, ললিত, নির্মল, কিরণশশী, এতোগুলি চরিত্রের পরিচয় গোপন রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে হইয়াছে ; সেইজন্য অনেক সময়েই অতর্কিত এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইয়াছে, যথাযোগ্য বিশ্লেষণের অভাবে দর্শকের মন সন্তুষ্ট হয় না। ভূষণ, তাহার পুত্রত্রয় এবং কিরণশশীর পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের কৌতূহল শান্ত হয় এবং নাটকের প্রকৃত প্রয়োজন এইখানেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে নীলুঠাকুরের কন্যার ব্যভিচার এবং ললিতের ষড়যন্ত্রজালে জড়িত হওয়ার বিষয়টি অনর্থক নাটকের উপর চাপানো হইয়াছে। ভরতিপেটে পুনরায় খাবারের আয়োজন দেখিলে যেমন বিরক্তি উপস্থিত হয়, শেষ অঙ্কের বিষয়ও আমাদের মনে তেমন এক বিতৃষ্ণ ভাবের উদ্রেক করে। নাট্যকার হয়তো বিধবা-বিবাহ না দেওয়াতে সমাজের কি ক্ষতি হয় তাহা ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তেলের মতো উপরে ভাসিয়াছে, ঘটনাস্রোতের সহিত মিশিতে পারে নাই। নাটকের কাহিনীর সব সঙ্কটের প্রধান পাত্রী হইয়াছে ভৈরবী। সে যেন এক সর্বজ্ঞ সর্বময় সত্তার ন্যায় সমস্যার মুহূর্তে উপস্থিত হইয়া চরিত্রগুলির কাজ সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া দিয়াছে, নাট্যকার তাহার কর্মশীলতার সম্ভাব্যতা বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাহার ন্যায় প্রাক্তন পতিতা অথচ মহৎ অবস্থান্তরিত চরিত্র পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকে লক্ষ্য করা যাইবে। কান্ত এবং রাধু এই দুইজনের দ্বারা ক্রূর ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্তু নির্মম নৃশংসতা রাধুর মধ্যে বেশি, খুনখারাপি প্রভৃতি চরম পাপকাজ সাধন করিতে কান্ত বরাবর দ্বিধা এবং অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

মীর মশাররফ হোসেন

॥ জমীদার দর্পণ (১৮৭৩) ॥ 'বিষাদ সিন্ধু' রচয়িতা প্রখ্যাত মুসলমান লেখক মীর মশাররফ হোসেন দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। যথা, 'বসন্তকুমারী' ও 'জমীদার দর্পণ'। বসন্তকুমারী নাটকের কাহিনী 'কীর্তিবিলাসে'র কাহিনীর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার প্রণয়-লালসা এবং তাহার শোচনীয় পরিণতি নাটকের মধ্যে দেখান হইয়াছে। কিন্তু 'জমীদার দর্পণ' সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে লিখিত দুঃসাহসিক বাস্তবধর্মী নাটক। বহুদিন নাট্য-পাঠক ও দর্শক সমাজ এই নাটকটির কথা ভুলিয়া ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নাটকটি কয়েকবার অভিনীত হইবার ফলে নাট্যানুরাগী সমাজ নাটকটি সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে এবং এরূপ একখানি বাস্তব সমস্যামূলক সামাজিক প্রতিবাদের নাটক এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছিল কেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছে।

জমিদারসমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য নাটকখানি রচিত। লেখক বলিয়াছেন, 'জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং, জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।' দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় নীলকর সাহেবদের সম্মুখে যে ভাবে দর্পণ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন মীর মশাররফও তেমনি বলিয়াছেন, 'আপন মুখ আপনি দেখিলেও হইতে পারে। সেই বিবেচনায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।' জমিদারী প্রথার উদ্ভবের সময় হইতে জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে, গল্প ও উপন্যাসের অনেক কাহিনীতে সেই সব শোষণ ও অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষকে' লিখিয়াছিলেন, 'জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।' জমীদারদের অত্যাচারের নানা ধরন ছিল, যথা জোর করিয়া খাজনা আদায় করা, নানা উপলক্ষে নজর ও সেলামি দাবী করা, মিথ্যা মোকদ্দমায় প্রজাদের জব্দ করা, কাছারীতে আটক

রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, জমি হইতে উচ্ছেদ করা, ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। এই সব অত্যাচারের সঙ্গে আর একটি অত্যাচারের ভয়ে কৃষকদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। সেই অত্যাচার প্রকাশ পাইত কৃষক পরিবারের কন্যা ও বধূদের সতীত্বনাশের মধ্য দিয়া। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে জমিদার সম্প্রদায়ের শোষণ ও পীড়নের বিভিন্ন দিক দেখান হয় নাই। শুধু কেবল লম্পট জমিদারের পাশবিক অত্যাচারের দিকটিই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সে জন্য নাট্যকার যে দর্পণটি ধাবণ করিয়াছেন তাহাতে বিকৃত জমিদারসমাজ আংশিকভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র।

'জমীদার দর্পণ' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।' বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গত কারণেই 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে 'জমীদার-দর্পণের' তুলনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে 'জমীদার দর্পণ' যে 'নীলদর্পণ' দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'নীলদর্পণ' সমাজের মধ্যে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে কোন নাট্যকার সামাজিক অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করিবার সময় 'নীলদর্পণে'র কথা চিন্তা না করিয়া পারেন নাই। 'জমীদার দর্পণে'র নামকরণের মধ্যেই নীলদর্পণের প্রভাব স্পষ্ট। 'নীলদর্পণে'র ভূমিকার সঙ্গে 'জমীদার দর্পণের' 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদনে'র বক্তব্যের কিছু মিল রহিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দুই নাটকেই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার শরণ লওয়া হইয়াছে। 'নীলদর্পণের' ভূমিকায় দয়াশীলা, প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাদরদী রূপ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 'জমীদার দর্পণে' 'কাতরে ডাকিমা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী' বলিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাধুচরণ ও রাইচরণের সঙ্গে আবুমোল্লার, ক্ষেত্রমণির সঙ্গে নুরুন্নেহারের এবং পদী ময়রানীর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। উভয় নাটকের বিচার দৃশ্যের মিলও অত্যন্ত স্পষ্ট।

তবে 'নীলদর্পণ' ও 'জমীদার দর্পণে'র মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অমিলও কম নাই। 'নীলদর্পণ' শেক্সপীরীয় রীতিতে লেখা পঞ্চাঙ্ক নাটক। কিন্তু 'জমীদার দর্পণ' তিন অঙ্কে লেখা ক্ষুদ্রাকার নাটক। 'নীলদর্পণে' সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ করা হয় নাই, যদিও সংলাপের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু 'জমীদার দর্পণ' নাটকে সংস্কৃত প্রস্তাবনা দৃশ্যের অনুরূপ প্রস্তাবনা দৃশ্য রহিয়াছে। তবে সংলাপ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত। 'নীলদর্পণে'

ক্ষেত্রমণির উপর বলাৎকারের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' গর্ভবতী নুরন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারের ফলে গর্ভের সন্তানসহ তাহার মৃত্যু দেখান হইয়াছে। 'জমীদার দর্পণে' বাস্তবচিত্র শিল্পের অনুমোদিত সীমানা ছাড়াইয়া পৈশাচিক বীভৎসতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। 'নীলদর্পণে' শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শক্তিই জয় লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই শক্তির বিরুদ্ধে নবীনমাধব, তোরাপ এবং অদৃশ্য প্রজাবৃন্দের ব্যর্থ প্রতিরোধও দেখান হইয়াছে। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' পাশবিক শক্তির নিরঙ্কুশ প্রতাপ সর্বত্র দৃশ্যমান, অত্যাচারিত প্রজাদেব অসহায় ক্রন্দন সেই শক্তির পথে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি করিতেও পারে নাই। দুইটি নাটক তুলনা কবিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, নীলদর্পণ নাটক দোষত্রুটি সত্ত্বেও রসের নিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারিযাছে, কিন্তু 'জমীদাব দর্পন' বাস্তবের অবিকল চিত্র হওয়া সত্ত্বেও চরিত্র বিস্তৃতি ও শৈল্পিক উপাদানের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে নাটকটি নক্সাধর্মী হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। প্রস্তাবনা দৃশ্যও নাটকটিকে নক্সাই বলা হইয়াছে। সূত্রধার বলিয়াছে, 'জমীদার দর্পণ নাটকে যে নক্সাটি এঁকেছে, তাব কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।'

নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া নাট্যকার নাটকের বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গত গান ও সংলাপের মধ্য দিয়া জমিদার সম্প্রদায়ের নানা প্রকার কুকীর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত নাটকের প্রথম দৃশ্যেই জমিদার হায়ওয়ান আলী ও তাহার মোসাহেবদের কথোপকথনের মধ্য দিয়া নুরন্নেহারকে ধরিয়া আনবার ষড়যন্ত্রই ব্যক্ত হইয়াছে। নুরন্নেহারের স্বামী আবুমোল্লাকে বাঁধিয়া আনিয়া কয়েদ রাখার আসল উদ্দেশ্য হইল নুরন্নেহারকে হাত করা। কৃষ্ণমণির কুপ্রস্তাব যখন ব্যর্থ হইল তখন নুরন্নেহারকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া তাহার উপর দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অঙ্কেই নাটকেব ঘটনা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দর্শকদের কৌতূহলেরও সমাপ্তি ঐ অঙ্কে। তৃতীয় অঙ্কে মৃত্যুপরবর্তী পুলিশী তদন্ত ও বিচারের সবিস্তার উপস্থাপনা রহিয়াছে। ঐ অঙ্কের মধ্য দিয়া নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, তৎকালীন আইন আদালতও অত্যাচারী জমিদারদেরই পক্ষে ছিল এবং গরীব অসহায় প্রজাদের দুঃখ ও লাঞ্ছনার প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষককে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে

দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত, আদালত কিসের'? 'জমীদার দর্পণে'র আইন আদালত ও বিচারদৃশ্য দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নগুলি যে কত সত্য তাহাই শুধু মনে হয়। তবে তৃতীয় অঙ্কে উপস্থাপিত দৃশ্যগুলি বাস্তব ও চমকপ্রদ বটে কিন্তু নাট্যরসের দিক দিয়া প্রয়োজনহীন।

'জমীদার দর্পণে'র চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র হায়ওয়ান আলীই নাটকীয় চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দান্ত চরিত্রটি স্বল্প কথায় ভীষণতম সঙ্কল্প ব্যক্ত করে এবং অতিশয় শান্ত ও অবিচলিত ভাবে জঘন্যতম কাজটি সম্পন্ন করে। পাপকাজ করিতে তাহার যেমন কোন দ্বিধা নাই, পাপকাজ করিবার পরেও তেমনি কোন প্রতিক্রিয়া নাই। অন্য কোন পুরুষ চরিত্রই নাটকীয় চরিত্র হইয়া উঠে নাই। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যেও শুধু নুরন্নেহার চরিত্রটিই আলোচনার যোগ্য। অধিকাংশ গ্রাম্য নারীচরিত্রের মতই সেও পবিত্রতা, ধর্মশীলা এবং অত্যাচারের প্রতিরোধে অক্ষম অবলা নারী। তার অন্তিম পরিণতিতে করুণ রস অপেক্ষা বীভৎস রসই যেন মুখ্য হইয়া উঠে। নাটকের সংলাপ আঞ্চলিক নহে বটে, কিন্তু চরিত্রানুযায়ী, বাস্তবধর্মী ও নাট্যরসাত্মক। নাটকে কয়েকটি গান আছে, সেগুলি প্রধানত নেপথ্যে গীত হইয়াছে। গানগুলি কোরাস সংগীতের মত নাট্য ঘটনা ও চরিত্রের উপর মন্তব্য করিয়াছে এবং উপদ্রুত প্রজার দুঃখ, হতাশা, আকুল প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। গুলির আড্ডার গানটি শুধু নিছক কৌতুক রসাত্মক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জাতীয় ভাবাত্মক রোমান্টিক নাটক

(১৮৭০—১৮৮০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে বাংলা নাটকের সূচনা হইয়াছে তাহার আদি পর্বে সমাজ-সংস্কার-চেতনা যে প্রধান নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বিরাজমান ছিল সে আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে এই শক্তির রূপান্তর হয়, সমাজচেতনা সম্প্রসারিত হয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে। সেজন্য নাটকীয় কাহিনী স্থানান্তরিত হইল সামাজিক পরিবেশ হইতে ঐতিহাসিক পরিবেশে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে জনগণমানসের দুই বিশিষ্ট জাগৃতি লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম জাগৃতি রূপায়িত হইয়াছে সমাজ-বিপ্লবে। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও-রিচার্ডসন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃবৃন্দ এই বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষা দান করেন। কিন্তু সেই দীক্ষা কল্যাণচিত্তে গ্রহণ করিবার সময় তখনও আসে নাই। এজন্য নব্য যুবকদের চোখে দীপ্তি অপেক্ষা দাহই ফুটিয়া উঠিল অধিক। এই দাহ ধ্বংসে উল্লসিত হইল, কিন্তু সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতে পারিল না। বাংলা সমাজের প্রাণকেন্দ্র তখনও অবস্থিত ছিল অবারিত পল্লী-পরিবেশে, সেজন্য এই ধ্বংসলীলা সেদিন সেই শান্ত পল্লী-পরিবেশ স্পর্শ করিয়াছিল। এই বিশ্লেষণ-ধারা অনুসরণ করিয়া আদি পর্বের সামাজিক নাটক বিচার করিতে হইবে।

বাঙালী জনমানসের দ্বিতীয় জাগৃতি ঘটিয়াছে সম্মিলিত জাতীয় চেতনায়। শ্মশানের চিতাগ্নি ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া আসিয়া তপোবনের হোমাগ্নি-শিখায় পরিণত হইল। শুধু কেবল আঘাত নহে, বিভেদ নহে, এক মহামিলনের ভূমিতে সব আঘাত-বিভেদ বিসর্জন দিয়া সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। এবার বিরোধী শক্তি ভিতরে নহে বাহিরে, তাহাতে আঘাত করিয়াই নিস্তার নাই, প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সেজন্য চাই নিশ্ছিদ্র সংহতি ও নির্নিমেষ সাধনা। এই চেতনাই এক অখণ্ড সার্বভৌম জাতীয়তার রূপ গ্রহণ করিল।

যে শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের ধ্বংসোন্মুখ অচলায়তনকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাই আবার আমাদিগকে জাতীয় গৌরব মহিমার সুদৃঢ় ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রেরণা যোগাইল। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বাহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের উদার উন্মুক্ত আলোক আমাদের রুদ্ধ কক্ষতলে প্রবেশ করিয়া ইহার রত্নভাণ্ডার চোখের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিল। বাঙালী জানিল যে তাহারা এক বিরাট মহিমময় জাতির অধঃপতিত বংশধর। তখন হইতে অবলুপ্ত প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাহারা মানসিক এষণা বোধ করিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে সাহিত্যে, শিল্পে এবং রাজনীতিতে পরাধীনতা-ক্ষুব্ধ, মর্মপীড়িত জাতির আশা ও উৎসাহের বাণী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাই হইল বাঙালীর জাতীয়তাবোধের গোড়াকার কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি-আলোচনার ফলে আমাদের দেশে স্বদেশী ভাব গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সময় হইতেই এই স্বদেশী ভাব লোকের মনে উদিত হইতে থাকে।[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল পরেই সিপাহী-বিদ্রোহ এবং নীল হাঙ্গামার দ্বারা বাংলার সামাজিক জীবন বিশেষভাবে বিপ্লুত হয়। এই সমস্ত গণ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বাঙালীর স্বাধিকার-বোধ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহার পর কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দ্বারা 'হিন্দু-মেলা' প্রতিষ্ঠিত হইল।[২] এই হিন্দু-মেলা স্থাপিত হওয়ার পরে দেশে উচ্ছ্বসিত স্বদেশ-প্রেমের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। হিন্দু-মেলার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম। সেই স্বজাতিধর্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্বপ্রযত্নে বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অগ্রে আত্মনির্ভরনামা শানিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে অদ্বিতীয় উপায় তাহা

১। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩১।

২। 'নবগোপাল মিত্র মহাশয় স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কল্পনা অনুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র মেলার (পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাত) অনুষ্ঠান করেন। এই মেলায় স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত এবং বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ১৯।

প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য।' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ স্বদেশী-সঙ্গীত—'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' হিন্দু-মেলার জন্য রচনা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লেখেন। এই সব গানে অতীত ভারতের গৌরবকীর্তির সহিত বর্তমান হীন দুরবস্থার তুলনা করিয়া এক নব জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত করা হইয়াছে, যেমন—

> কোথা ক্ষত্রবীর সব—ক্ষত্র রাজগণ!
> কোথা ভীষ্ম কার্তবীর্য পাণ্ডুর নন্দন!
> কোথায় হামির রায়,—কোথা ভীমসিংহ হায়,
> কোথায় প্রতাপ আদি বীরবরগণ!
> দেখুক ভারতে তারা কি দশা এখন।[১]

এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয়-ভাব-অনুপ্রাণিত নাট্যকারদের দ্বারা স্বদেশের গৌরবসূচক অতীত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নাটক প্রভৃতি লিখিত হয়। কাব্যে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যেমন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনাইলেন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বন্দেমাতরম্-এর মন্ত্রে বাঙালীকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেমনি গৌরবোজ্জ্বল অতীত বীরত্ব-কাহিনী আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ধারা তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লেখকদের স্বদেশীভাবোদ্দীপ্ত নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় স্বদেশপ্রেমিক জনগণ তাঁহাদের বিগত ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত হইয়াছিলেন। সেই ইতিহাসে তাঁহারা হিন্দুগৌরব এবং বিদেশীর আগমনে সেই গৌরবের ম্লানিমা বিষণ্ণ নেত্রে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহাদের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের ইতিহাস এবং সেই সংঘর্ষের হিন্দুদের বীর্য ও মহত্ত্ব দেখান হইয়াছে। টড প্রণীত রাজস্থানের বৃত্তান্তে হিন্দু রাজপুতগণের বীরত্বকাহিনী লেখকেরা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত গৌরব-কাহিনীর উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়া তাঁহারা পতিত, মোহগ্রস্ত হিন্দুজাতিকে পুনরায় স্বাধীনতা লাভের আশায় উদ্বোধিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

১। 'হিন্দু-মেলা'র কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত একটি কবিতার অংশ।

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নব জাতীয় উদ্দীপনা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সর্বনিয়ন্তা শক্তিরূপে রাজত্ব করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রভৃতি এই সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯) তো ইতিপূর্বেই বাহির হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' (১৮৬৯), 'ভারত ভিক্ষা' (১৮৭৫) ও 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫) প্রভৃতি কাব্য-মহাকাব্য এই সময়েই রচিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী' (১৮৭১) ও 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর (১৮৭৬) রচনাকাল এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নাট্যকারগণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার সমকালীন স্বদেশপ্রাণ সমকর্মিবৃন্দ এই যুগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাঁহাদের নাটকসমূহ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পরেই প্রণীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। একদিকে জ্ঞানের বিচার অন্য দিকে রসের বিকাশ—এই দুই দিক দিয়াই জাতীয় আন্দোলন কলকল্লোলিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল তৎকালীন নাটকের মর্মমূলে। কাব্যক্ষেত্রে হেম-নবীন এই জাতীয় সাহিত্যের উত্তরসাধক মাত্র। তাঁহাদের বহুপূর্বেই ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন সেই সাধনা সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে সগোষ্ঠী জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ইহার প্রবর্তক।

জাতীয় ভাবৈষণা তৎকালীন নাটকের প্রবল প্রেরণা ছিল বটে কিন্তু একমাত্র প্রেরণা ছিল না। আর একটি প্রেরণা ইহার সহিত মিলিয়াছিল এবং তাহা হইল রোমাণ্টিকতা। নাট্যকারগণ জাতীয় গৌরব-কাহিনীর মধ্যে নরনারীর প্রণয়-স্পর্শ আনিয়াছিলেন, বীরের আসর-সহিত প্রণয়ীর বাঁশী আসিয়া মিলিত হইল। অনেক সময় রোমাণ্টিক ধর্ম জাতীয় ধর্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহাও আমরা দেখিয়াছি। 'অশ্রুমতী', 'বীরবালা', 'হেমলতা', 'হেমনলিনী' প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। এই রোমাণ্টিকতার আবেগে ইতিহাসের বেগ ব্যাহত হইয়াছে সেই রকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেজন্য সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক এই সময়ে খুব বেশী লেখা হয় নাই। রোমাণ্টিকতার এতখানি প্রাদুর্ভাবের কারণ কি ? পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আদর্শ, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক উপন্যাসের প্রভাব প্রথমেই মনে আসিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং এই সব নাটকে যে ভয়লেশহীন অকুণ্ঠ প্রণয়ের মর্যাদা ঘোষিত হইয়াছে তাহার প্রেরণা আসিতে পারে শুধু কেবল এমন

এক সমাজ হইতে, যেখানে পুরুষের ন্যায় নারীও সমান অবস্থা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের একটি সাম্যবোধও তখন সমাজের মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্ত যাহাই বলুন, পদ্মিনী-প্রমীলা-আয়েষা-বিমলা বাংলা সাহিত্যে এমন এক নারীকুলের আদর্শ স্থাপন করিল যাহারা প্রেম ও পরাক্রম উভয় ক্ষেত্রেই অশঙ্কিনী। এই অশঙ্কিনী নারী-চরিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে তৎকালীন স্বদেশীভাব-রঞ্জিত নাটকে। উপেন্দ্রনাথের সরোজিনী ও বিনোদিনী চরিত্রও অবলা বাঙালী রমণী-মাঝে সবলা নারীর আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নাট্যকারগণ রণক্ষেত্রের জয়-পরাজয় হইতে নরনারীর মিলন-বিরহ-সিক্ত প্রেমকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কখনও পরাজয়ে মলিন নহে, তাহা জয়ের গৌরবে দীপ্তিময়। ভাব ও আদর্শের এই মহিমার ফলে কি তৎকালীন নাটক বিশেষ সমৃদ্ধরূপ লাভ করিয়াছিল? না, তাহা করে নাই। তাহার কারণ শিল্পের ত্রুটি, ভাষা ও আবেগের অসংযম। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটক আলোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহার বিকাশ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে তাহার পূর্ণতম পরিণতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটকসমূহের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে যে স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং অদৃষ্টপূর্ব। তিনি তাঁহাব জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি, উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তকতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে।[১] কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও জ্যোতিবিন্দ্রনাথ তাঁহার মানস ইচ্ছা ও আদর্শ অনুযায়ী ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন। একমাত্র 'পুরুবিক্রম' ব্যতীত অন্যান্য নাটকের নাটকীয় রস ও গুরুত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের প্রাধান্যের উপব নির্ভর করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের নাটকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী নাট্যকারের হস্তে অপরূপ দ্বন্দ্ববহুল হইয়া রূপলাভ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিবিন্দ্রনাথের নাটকীয় পাত্র-পাত্রী নাট্যকারের কোনো বিশেষ idea অথবা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক চরিত্রকে নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন, এবং অনৈতিহাসিক অনেক ঘটনা সন্নিবেশ কবিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে অনেকাংশে সংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে মাইকেল ও দীনবন্ধুব নাটকে সংস্কৃত প্রভাব আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার ভাষা ও পাত্র-পাত্রীর আচরণে অনেকখানি বাস্তবনিষ্ঠ ছিলেন, তবে ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ, পবিণত রূপ তখনো আসে নাই, সেজন্য লক্ষ্য করা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের সংহত পরিমিতি অনেক স্থলেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণত তাঁহার নাটকগুলি দীর্ঘ এবং অভিনয়ের অনুপযোগী,

১। জ্যোতিবিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১।

নাটকের মধ্যে দৃশ্য-পরম্পরা আলগা (loose) এবং বিস্তৃতভাবে যুক্ত; সেজন্য বহু জায়গায় নাটকীয় রূপ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। কথোপকথন অনেক স্থলেই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর, এবং অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত দুর্বল ও সাদাসিধা হইয়াছে। অবশ্য অভিনয়নৈপুণ্যে সাধারণ কথাও অত্যন্ত উদ্দীপক এবং সংঘর্ষশীল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সংলাপের অন্তর্হিত শক্তি নাটককে গতিমান করিবার প্রধান উপায়। জেহেনা ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নাই; সকলেই একধরনের—সবলা, পতি অথবা প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠা, এবং সহনশীলা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয় ভাব উদ্দীপিত কবিবার জন্য নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দেশিত জাতীয় ভাব অপেক্ষা স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতির দ্বন্দ্বসমস্যাই বেশিভাবে তাঁহার নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার নাটকসমূহের বিস্তৃত আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের মতের যাথার্থ্য নিরূপণ করিব।

(ক) ঐতিহাসিক নাটক

॥ পুরুবিক্রম (১৮৭৪) ॥ স্বদেশীভাব উদ্বোধনের আশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের স্বাধীনচেতা এবং গবোন্নত বীর রাজা পুরুর বিক্রম-কাহিনী লইয়া প্রথম নাটক রচনা করেন। অবশ্য নাট্যকার ইতিহাসকে যে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার কল্পিত আদর্শ অনুযায়ী ঘটনা এবং চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করা নাট্যকারের অভিপ্রেত হইলেও নাটকের শেষের দিকে পুরু-ঐলবিলা তক্ষশীল-অম্বালিকা ঘটিত প্রেম এবং ঈর্ষামূলক ঘটনাবলীই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'পুরুবিক্রম' প্রকাশিত হইলে রসিক এবং পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল[১], কিন্তু ইহা সমালোচনার কড়া পাহারার সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া চিরকালীন রসিক দরবারে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। নাটকখানির মধ্যে স্বদেশী ভাবোদ্দীপনা এবং বীররসোদ্বেলতার জন্য ইহা সাময়িকভাবে দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত দোষত্রুটির জন্য ক্রমে

১। নাটকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রশংসা করিয়াছেন, বেভারেণ্ড লালবিহারী দে-ও 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' লিখিয়াছিলেন—'The story is well-told; the descriptions are lively, some of the characters are well-drawn, and the language is simple and idiomatic.'

মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'—পৃঃ ৪১-৪২ হইতে পুনরুদ্ধৃত।

ইহার মূল্য কমিয়া আসিয়াছিল। নাটকের উক্তিগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সাধারণ, লেখক বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাটকের ভাষা বীররসাত্মক হয় নাই। কথার বেগে দর্শককে উত্তেজিত না করিয়া যখন তিনি সস্তা-ধরনের মাতামাতি-দাপাদাপির মধ্যে বীররসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাহা নিতান্ত তরল ও কৃত্রিম হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন যথার্থই বলিয়াছেন—'পুরু-বিক্রমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধের ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা থিয়েটারী যুদ্ধের মত।'[১]

নাট্যকার পুরুচরিত্রকে সর্বত্র মহৎ এবং বীর্যবান দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার একটু এদিক-ওদিক করিয়াছেন। পুরুর সহিত সেকেন্দরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সেকেন্দরের পরাজয়, অন্যায়ভাবে পুরুর প্রতি আক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপার নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত।[২] তক্ষশীলের মুখে সামান্য শ্লেষবাক্য শুনিয়া পুরু ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া বসিলেন—ইহা যেমন পুরুর বীরত্ব ও মহত্ত্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে, তেমনি তক্ষশীলের চরিত্র আকস্মিক এবং অপূর্ণভাবে শেষ করিয়াছে। কাপুরুষ যুদ্ধভীরু তক্ষশীল পুরুর মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ উদ্রেক করা ব্যতীত আর কোনো সক্রিয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অম্বালিকার প্রেমমুগ্ধ সেকেন্দরের চরিত্রের মধ্যে বিরাট মহত্ত্ব এবং সংহত গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠে নাই। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে কুলুপর্বতের রাণী ঐলবিলার স্বদেশপ্রাণতা এবং বীর্যবত্তা অবশেষে হৃদয়বত্তার লীলাতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নাটকের একমাত্র ট্র্যাজিক এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল চরিত্র—অম্বালিকা। সে দুর্বল ভ্রাতাকে সেকেন্দরের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিয়াছে। সেকেন্দরকে আশ্রয় করিয়া তক্ষশীলের সহিত ঐলবিলার মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে এত সব করিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। রণলিপ্সু সেকেন্দর তাহার সর্বত্যাগী মর্মান্তিক প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতীব্র অনুতাপ এবং সুগভীর নৈরাশ্যে তাহার পক্ষে

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২।

২। ইতিহাসে পুরুর পরাজয় এবং আহত হওয়ার ঘটনা এইভাবে বর্ণিত আছে—'Poros himself a magnificent giant, six and a half feet in height, fought to the last, but at last succumbed to nine wounds, and was taken prisoner in a fainting condition'.

Early History of India by V. H. Smith, P. 74

সন্ন্যাসিনী হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। অম্বালিকার বিষাদান্ত পরিণতিতে পুরু এবং ঐলবিলার মিলনের আনন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

॥ সরোজিনী (১৮৭৫)॥ 'সরোজিনী' পূর্বতন নাটক 'পুরুবিক্রম' অপেক্ষা অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। একটা অতি দ্বন্দ্ববহুল, উত্তেজনাময় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া নাটকের ক্রিয়া অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। কুটিল ষড়যন্ত্রের সর্পিল গতিতে, এবং বিরুদ্ধ শক্তির সবল সংঘাতে দর্শকের মন উদ্বেগচাঞ্চল্যে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বিশেষত চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে সবলপ্রাণা, কুসুমকোমলা সরোজিনীর হত্যার আয়োজনের দৃশ্য এত অধিক লোমহর্ষণকারী বিভীষিকায় পরিপূর্ণ যে দর্শকের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। 'সরোজিনী'র অভিনয়ের সময় এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।[১] নাটকখানি সরোজিনীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভৈরবাচার্য এবং রণধীর সরোজিনীকে বলি দিবার যে সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী আয়োজন করিয়াছিল তাহা ফাঁসিয়া যাইবার পর নাটক সুপরিণত সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। বিজয় এবং সরোজিনীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়া নাটকখানিকে বিষাদান্ত ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ঠেলিয়া আনিতেছিল, রহস্যোদঘাটনের পর তাহা মিলনের শান্তিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং পঞ্চমাঙ্কে প্রকৃতপক্ষে নাটকের শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে ষষ্ঠ অঙ্কে যে অগ্নিকুণ্ড-দৃশ্য দেখান হইয়াছে, নাটকের দিক দিয়া তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বিজয়সিংহ এবং সরোজিনীর মৃত্যু ট্র্যাজিক হয় নাই। কারণ এই রকম মৃত্যুর সম্ভাবনা তাহাদের চরিত্রবিকাশের অভ্যন্তরে নিহিত ছিল না। শেষ অঙ্কের মৃত্যুদৃশ্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অভিযোগ এবং দুঃখপূর্ণ নির্বেদ দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে বটে, কিন্তু তবুও উহা ট্র্যাজেডি হয় নাই, কারণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠে।[২]

অনেকেই বলিয়াছেন যে, 'সরোজিনী'র উপর ইউরিপিডিসের Iphigenia

১। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে এই দৃশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য তলোয়ার হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বলে— 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যা, ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর', অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তারা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

২। What we do feel strongly, as a tragedy advances to its close, is that

at Aulis' নাটকের প্রভাব আছে। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ উভয় নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের ঐক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসিংহ, রণধীর এবং বিজয়সিংহের সহিত যথাক্রমে অ্যাগামেমনন-মেনেলাউস-অ্যাকিলিসের সাদৃশ্য আছে। ইউরিপিডিসের নাটকেও অ্যাগামেমনন সন্তানবাৎসল্য ও স্বদেশহিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বোধ করিয়াছেন, বিজয়সিংহের ন্যায় অ্যাকিলিস নিরপরাধা বালিকাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং নায়িকা ইফিজেনিয়া 'Hellas'-কে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নাটকের সমস্ত ষড়যন্ত্রের নিয়ন্তা ভৈরবাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতিকে মনে করাইয়া দেয়। ভৈরবাচার্যের কথার মধ্যে তাহার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট না হইলেও সমস্ত নাটকের মধ্যে তাহার অলক্ষ্য প্রভাব ক্রুদ্ধ ঝড়ের মত সকলকে সচকিত ও সন্ত্রস্ত করিয়াছে। পরাজিত, বিপর্যস্ত ভৈরবাচার্য যখন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে নিজের ছলনাজালে আবদ্ধ হইয়া কন্যাকে হত্যা করিয়া বসিল তখন তাহার চরিত্রের মধ্যে 'Dramatic Hedging'-এর[১] সৃষ্টি হয়, এবং দর্শকদের মন তাহার প্রতি সহানুভূতি-সিক্ত হইয়া উঠে। রাজা লক্ষ্মণসিংহের মধ্যে কন্যাস্নেহ এবং স্বদেশপ্রাণতার অতি সুন্দর দ্বন্দ্ব দেখান হইয়াছে। কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহপীড়িত রাজার চরিত্র মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সরোজিনী নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বটে, কিন্তু এই নাটকের কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তিসমূহের সংগ্রামই মূল বিষয়। সেইজন্য নাটকখানি নায়িকা-নামাঙ্কিত হইলেও সরোজিনীর প্রভাব কোনো স্থানেই অনুভূত হয় নাই। তবে সরোজিনীর মধুর সৌরভে নাটকখানি আমোদিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সরোজিনী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা।

॥ অশ্রুমতী (১৮৭৯) ॥ 'অশ্রুমতী' নাটকের ললাটদেশে টডের 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃতি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয় যে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থস্থ

---

the calamities and catastrophe follow inevitably from the deeds of men and that the main source of these deeds is character.'

Shakespearean Tragedy by Bradley, p 13

১। অধ্যাপক মোলটন (Richard G. Moulton) Dramatic Hedging ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'Dramatic Hedging by which unpleasant elements in the characters of Shylock and Brutus are met by another treatment bringing out peculiarities in the position of these personages which restored them to our sympthy.'

'Shakespeare as a Dramatic Artist' (3rd. edition) p. 327

প্রতাপসিংহের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রতাপসিংহের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইলেও সেলিম ও অশ্রুমতীকে কেন্দ্র করিয়া যে মূল কাহিনীটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতেই নাটকের লক্ষ্য ও প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। অশ্রুমতী এবং তাহার প্রেমবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অমূলক এবং অনৈতিহাসিক, গ্রন্থকার নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। নাটকখানি প্রকাশিত এবং অনূদিত হইবার পর প্রতাপসিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিণী হইয়াছে দেখিয়া অনেক অবাঙ্গালী পাঠক ও দর্শক বিশেষ ক্ষুব্ধ হন, এবং গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানী সমাজে কিছুদিন প্রবল আন্দোলন চলে।[১] এই সমস্ত বিক্ষোভ এবং অভিযোগের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন যে, অশ্রুমতীর কাহিনী কাল্পনিক হইলেও, তাহা দ্বারা প্রতাপসিংহের চরিত্র-গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমরা সেই বিষয়টি আলোচনা করিয়া দেখিব।

'অশ্রুমতী' নাটকখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে দুইটি কাহিনী দর্শকের মনকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখে। নাট্যকার যদি প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের চিত্র অঙ্কন না করিতেন তবে অশ্রুমতীর কাহিনী যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করিবার স্বাধীনতা তাঁর ছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহের সুমহান, স্বদেশহিতব্রতী চরিত্র সতত দর্শকের মনে জাগরূক থাকাতে, তাঁহার কন্যার প্রেমকে আর আলাদা, বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপ মৃত্যুপণ সংগ্রাম করিয়াছেন, যাহাকে তিনি নিজের এবং স্বদেশের ঘোরতর শত্রু মনে করেন, তাঁহাকেই যখন প্রাণসমা কন্যা আত্মদান করিয়া বসিল, তখন যে প্রতাপের অভ্রভেদী গৌরব-চূড়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্রুমতীর পক্ষে সেলিমকে ভালবাসা অন্যায় নহে, কিন্তু সেই ভালবাসা যে পিতার আদর্শ ও গর্বকে আঘাত করিয়া ছোট করিয়া দিয়াছে ইহাতেই দর্শকের মন অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মানসিংহ প্রতাপের অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্যই অশ্রুমতীকে অপহরণ করাইয়া, ফরিদের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া প্রতাপের কুলগৌরব নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। সেলিমকে হৃদয় দান করিয়া অশ্রুমতী স্বেচ্ছায় মানসিংহের সেই সঙ্কল্পে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে অশ্রুমতী ভীলদের মধ্যে পালিত হইয়াছিল,

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'—পৃঃ ৭৬-১১০ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং পিতার আদর্শ ও গৌরব সে জানিত না।[১] ইহার উত্তরে বলা যায় যে অশ্রুমতী যখন অপহৃত হইয়াছিল, তখন সে ভীলদের মধ্যে ছিল না, পিতামাতার সহিত পর্বতের কন্দরে কন্দরে ঘুরিতেছিল, সুতরাং পিতার কষ্টস্বীকার এবং সুদৃঢ় সংকল্প সে বুঝিত না ইহা অস্বাভাবিক। সেলিমের বন্দিনী হইয়া যখন সে বাস করিতেছিল তখন সে যথেষ্ট সেয়ানা হইয়াছে, কামদেবের রীতিনীতি বুঝিতে পারিয়াছে, কেবল এইটুকু সে বুঝে নাই যে তাহার প্রেমাস্পদ তাহারই পিতার ঘৃণিত শত্রু। প্রকৃতপক্ষে 'Love is ever blind' এই নীতি দেখাইয়া অশ্রুমতীর প্রেমকে সহানুভূতির চোখে দেখা যাইত, যদি নাট্যকার তাহার মনের মধ্যে প্রেম এবং কর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু অশ্রুমতী সেলিমের প্রেমে এতই সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের পরাধীন অবস্থাতেও তাহার কোনো অ-সুখ নাই, এবং পিতামাতা ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহার কোনো অসন্তোষ কিংবা অশান্তি নাই। সেলিম তাহাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাতেও তাহার মনের মধ্যে কোনো অভিমান কিংবা অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, পিতার সুকঠোর আদেশ সত্ত্বেও সে তাহার প্রণয়াস্পদকে ভুলিতে পারে নাই—এই সব কারণে তাহার প্রেমের মধ্যে একটা আত্যন্তিক হীনতা এবং বিরক্তিকর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

নাটকের মধ্যে প্রতাপসিংহের কাহিনী প্রথম অঙ্কে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইলেও পরে নিতান্ত গৌণ হইয়া আসিয়াছে। নাট্যকার দুইটি কাহিনীকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করিয়া শেষ পর্যন্ত চালিত করিতে পারেন নাই। নাটকখানি অত্যন্ত দীর্ঘ, কেবলমাত্র চতুর্থ অঙ্কেই সপ্তদশটি দৃশ্য রহিয়াছে। এইজন্য অভিনয়ের পক্ষে উহা উপযোগী নহে। সেলিম, ফরিদ খাঁ, মলিনা, অশ্রুমতী প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের বারবার প্রবেশ দর্শকের পক্ষে নিশ্চয়ই বিরক্তিজনক।

সেলিমের মধ্যে ঈর্ষা ও বিশ্বাসের যে অস্থির দোলায়মান অবস্থা নাট্যকার

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারতমিত্রে'র সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে 'অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলেদের নিকট থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে জানিত না—কে রাজপুত, কে মুসলমান, সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৮৩।

দেখাইয়াছেন তাহা খুবই চমৎকার হইয়াছে। ওথেলোর মতই সে ঈর্ষা-বিষে জর্জরিত হইয়া নিতান্ত অন্যায়ভাবে প্রণয়িনীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং পরে অনুতাপের সুতীব্র অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সেলিমের যে উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়ে অশ্রুমতী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে সেইসব গুণ তাহার মধ্যে নাই। পৃথ্বীরাজের কাছে মুক্তিপণ পাইয়াও সে অশ্রুমতীকে মুক্তি দিতে রাজী হয় নাই, এবং নিজের স্বার্থপর প্রেমকে নির্বাধ, নিষ্কণ্টক করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র ফরিদ খাঁর। ইয়াগোর মতই সে তাহার ক্রূর ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলীকৃত চক্রের মধ্যে সকলকে আনিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে। মলিনার প্রেমমুগ্ধ পৃথ্বীরাজ অকস্মাৎ কিভাবে অশ্রুমতীর প্রতি আসক্ত হইলেন তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। মলিনার প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়াও যদি শুধুমাত্র প্রতাপসিংহের গৌরব রক্ষা করিবার কর্তব্যের প্রেরণায় অশ্রুমতীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইতেন তবেই তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য ও সার্থকতা থাকিত। পৃথ্বীরাজের দ্বারা অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি নির্লজ্জভাবে প্রেম নিবেদন করিয়া নিজের চরিত্রকে হীন ও ছোট করিয়া ফেলিযাছে। ট্রাজিক নায়িকার নির্লিপ্ত উদাসীনতা এবং সংহত শোক তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। ভ্রাতৃবৎসল, কুলরক্ষাব্রতী শক্তসিংহের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

॥ স্বপ্নময়ী (১৮৮২)॥ আরংজীবের রাজত্বকালীন তালুকদার শুভসিংহের বিদ্রোহকে ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। 'স্বপ্নময়ী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক অতীত হইতে আমাদের দৃষ্টিকে বিসারিত করিয়া সামাজিক বর্তমানের উপর নিবদ্ধ করে। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং গূঢ় কৌতুকরসে নাটকখানি বিশেষ প্রাণবান এবং উপভোগ্য হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের সূক্ষ্ম, ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গ-কৌতুক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য কোনো নাটকে দেখা যায় নাই। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই নাটকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য যে সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন তখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখনও ক্ষমতাশালী

হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে 'স্বপ্নময়ী'র নাটকীয় ভঙ্গি ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের পূর্বাভাস বটে। 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে যে গীতিকাব্যের প্রাধান্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিদ্রোহী নেতা শুভসিংহের মধ্যে দয়া ও কোমলতার সমাবেশ দেখিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির সহিত তাহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। ভাবময় idea-রূপিণী স্বপ্নময়ীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের স্ত্রী চরিত্রের অনুরূপ। নকল দেবতা এবং তাহার প্রতি স্বপ্নময়ীর দুর্বার, দুষ্প্রতিরোধ্য আকর্ষণ 'রাজা' নাটকের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। সাধারণ লোকেদের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার লইয়া নাট্যকার যে রকম পরিহাস করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বহু কবিতা ও নাটকে সেই ধরণের পরিহাস অনেক করিয়াছেন।

শাস্ত্র-বিলাসী, সংসার অনভিজ্ঞ, স্নেহপরায়ণ রাজা কৃষ্ণরামের ভূমিকা খুবই মনোরম হইয়াছে। এই সরল, যুদ্ধবিমুখ, অনুকম্প্য বৃদ্ধের বিরুদ্ধে যে হিংস্র বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হইয়া নির্মম আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে—তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক হইয়াছে। কৃষ্ণরামের শোকাবহ পরিণতি এবং স্বপ্নময়ী ও শুভসিংহের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া দর্শকের মনে উগ্র স্বাদেশিক বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তবে এই নাটকে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রুর ষড়যন্ত্রকারী রহিম খাঁর চরিত্রের মধ্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা সঙ্গত হয় নাই; কারণ বাতিকগ্রস্ত, পাগলাটে লোক দেখিলে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে অজ্ঞাতসারে অনুকম্পাশীল সহানুভূতি জমা হইয়া থাকে। কিন্তু রহিম খাঁর প্রতি উদ্যত সহানুভূতি তাহার কুটিল এবং চক্রান্তকারী ক্রিয়া দ্বারা আহত হয়। জেহেনা চরিত্রের মৌলিক অভিনবত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছলনাময়ী, কুহকিনী রমণী যে ভাবে তাহার বাহ্য সারল্য এবং কোমলতা দ্বারা অন্তরের কাম-কুটিল অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়াছে তাহা দর্শকের আগ্রহশীল চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া রাখে।

(খ) প্রহসন

বীর-রসাশ্রিত, বিষাদাচ্ছন্ন নাটক রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তরল ও চপল হাস্যমুখর প্রহসনেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে মাইকেল ও দীনবন্ধু শ্রেষ্ঠ প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্য

উদ্‌ঘাটনের ব্রত লইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের পঙ্কপল্বলে নামিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের অঙ্গের স্থানে স্থানে ক্লেদ ও কলুষের ছাপ লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্লেদাক্ত বাস্তব-সমাজের গভীর প্রদেশে দৃষ্টিপাত করেন নাই, সমাজের কোনো দুরূহ সমস্যার উপর অভ্রান্ত আলোকপাত করেন নাই। সেজন্য শালীনতার গণ্ডি কোনো সময়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। দীনবন্ধু প্রভৃতি ঝড়ো হাওয়ার বেগে সমাজের ছদ্মবেশটি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৃদু মলয় পবনের ন্যায় সেই বেশটি লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং তাঁহার নাটকে বাস্তবের নগ্নতা ফুটিয়া উঠে নাই। যেখানে ভদ্রতার বালাই নাই, নীতি ও নিয়মের চোখ-রাঙ্গানি নাই, সেখানে হাস্যরস অনর্গল ও সশব্দ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন, ব্রাহ্ম-ধর্মাশ্রয়ী নাট্যকারের কাছে হাস্যরস এইরূপ অবাধ প্রশ্রয় পায় নাই। প্রহসনকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হাস্যরসকে রুচির বশীভূত করিয়াছিলেন।

॥ কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) ॥ তাঁহার প্রথম প্রহসন। এই প্রহসনে নব্যতন্ত্রী স্বাধীনতা-প্রয়াসী ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ব্যঙ্গে জ্বালা নাই. এবং তাহা গ্রন্থের সর্বত্রপ্রসারীও নহে। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই কেবল পূর্ণ ও বিধুমুখীর কথোপকথনে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রহসনের কেন্দ্রীয় ঘটনার মধ্যে কোনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিস্ফুট হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর ঈর্ষাদগ্ধ সন্দেহ, এবং সেই সন্দেহের সুখকর নিরসনই প্রহসনের মধ্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছে। যে পূর্ণচন্দ্র কিছুক্ষণ আগে পত্নীর কাছে জোর গলায় বলিয়াছেন যে, 'বাস্তবিক আমার মনে কোনো কু-সন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না', সে-ই যখন পেরুরামকে দেখিয়া ঈর্ষা-ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে তখন নিজেই সে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত হাস্যরস অব্যর্থলক্ষ্য তীরের ন্যায় কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আঘাত করে না, ইহা তারাবাজির ন্যায় চতুর্দিকে আগুনের ফুলকি ছড়াইতে থাকে। ইহার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। পূর্ণচন্দ্রের মিথ্যা সন্দেহে বিধুমুখী দর্শকের সহিত মিলিয়া খুব হাসিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই সন্দেহের খপ্পরে পড়িয়া বেয়াকুব বনিয়াছে। এইভাবে সকলকে নাকাল ও বিপর্যস্ত হইতে দেখিয়া পরিতুষ্ট হাস্যরসে আমাদের চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠে, হাসির বাতাসে বিদ্বেষ ও গ্লানির কণাটুকু পর্যন্ত উড়াইয়া নেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যখন পেরুরামের পিছনে তরবারি লইয়া ধাওয়া

করিয়াছে, অথবা বিধুমুখী পেরুরাম ও তাহার স্বামীর নকল যুদ্ধ দেখিয়া আশঙ্কায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তখনই আমাদের হাস্যরস বেশি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের সন্দেহ অমূলক এবং বিধুমুখীর আতঙ্ক অকারণ, অথচ তাহারা ইহা জানে না, কিন্তু দর্শকের কাছে ইহা অজ্ঞাত নাই। সেজন্য সে বিশেষ কৌতুক বোধ করে, এবং পাত্রপাত্রীদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ মনে করে।

॥ এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭)॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না' পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে সরস পরিহাসের লক্ষ্য দুইটি - মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। ঘটনার পরম কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য গদার দ্বারা ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অলীক অপেক্ষাও গদার সুচতুর কর্মতৎপরতার দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করে। গদা বার বার সাহায্য না করিলে অলীকের মিথ্যাবাদ যে কোনো মুহূর্তেই ধরা পড়িত; এবং অলীক ও গদার পরস্পর-সান্নিধ্যে গদার কথার তুবড়ির কাছে অলীককেও চুপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে গদা অলীকের মিথ্যাভাষণের সহকারী ছিল তাহার দ্বারাই একই অবস্থার মধ্যে অলীকের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াটা যথার্থ হয় নাই। বস্তুত প্রহসনের শেষের দিকে ঘটনার সমাধান খুব স্বাভাবিক হয় নাই, অলীক মিথ্যা অস্ত্রের বলে বেশ জিতিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ যেন সকলে মিলিয়া তাহাকে 'অভিমন্যুবধ' করিয়া বসিল। ঘটনার অনিবার্য গতির পাকে পাকে জড়াইয়া যাইয়া তাহার আসল রূপটি যদি বাহির হইয়া পড়িত তবেই হাস্যরসের ধারা কোনো স্থলে ব্যাহত হইত না। গদার মুখে লম্বা বর্ণনার মধ্য দিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটনের উপায়টি খুবই দুর্বল হইয়াছে। অলীকের বাক্য ও আচরণ সত্যসিন্ধুর কাছে হাস্যরসাত্মক নয়, কারণ সে অলীক অপেক্ষাও মূর্খ ও সরল, কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দর্শক শেক্‌সপীয়রের 'ওয়েবস্টার ডিকস্তনারি', বায়রনের 'চেম্বার্স অ্যাটলাস' এবং কালিদাসের 'মুগ্ধবোধ'-পড়া অলীকপ্রকাশের বিদ্যার দৌড় বুঝিতে পারে। তাহার মূর্খতা এবং সত্যসিন্ধু ও হেমাঙ্গিনীর নির্বুদ্ধিতা—দুই কারণেই দর্শক যথেষ্ট কৌতুকবোধ করে। হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমের নভেল পড়িয়া, নভেলী নায়িকার ন্যায় নিজেকে ভাবিতে শিখিয়াছে, এবং তাহার ভাব ও আচরণ বাস্তব সংসারের সম্পর্ক হারাইয়া কল্পলোকে বিহার করিতে চাহিয়াছে মলিয়েরের 'Romantic Ladies নামক প্রহসনের নায়িকাদ্বয়ের মত হেমাঙ্গিনীও রোমান্সের সন্ধানে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অলীকপ্রসাদ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, যে কোনো লোককেই সে নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার সহিত সে নায়িকার ন্যায় আচরণ করিত।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং চরিত্র সংস্থানের উপর রসের বিকাশ এবং তাৎপর্য নির্ভর করে। মদের আড্ডাখানায় কেহ ধর্মকথা শুনাইলে ভক্তির উদ্রেক না হইয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়। হেমাঙ্গিনী প্রেমমূলক গুরুভাববিশিষ্ট কোনো কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতই নায়িকা হইতে পারিত কিন্তু তরল হাস্যোজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে তাহার প্রেমপরায়ণতা নিতান্তই বেমানান হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

॥ হিতে বিপরীত (১৮৯৬) ॥ এক বৃদ্ধ কৃপণের জব্দ হওয়ার কাহিনী লইয়া 'হিতে বিপরীত' প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। বিবাহ এবং বাসর ঘরের দৃশ্যের সহিত দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়োর' সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই প্রহসনখানিতেও নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং ঘটনার অদ্ভুতত্ব এই হাস্যরসের মূল।

॥ হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) ॥ 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ'—এই দুইখানা প্রহসন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কাছে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফরাসী সাহিত্যের গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'হঠাৎ নবাব' মলিয়েরের 'The Cit Turned Gentleman' (Le Burgeois Gentil homme) নাটকের অনুবাদ। অনুবাদ অবিকলভাবে মূল নাটকের অনুসরণ করিয়াছে, সেজন্য একমাত্র ভাষা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা কিছুই নাই। মূল নাটকের পাত্রপাত্রীর নামের সহিত পর্যন্ত বাংলা অনুবাদগ্রন্থের পাত্রপাত্রীর সঙ্গতি রহিয়াছে। Jordan, Cleontes, Dorimene, Dorantes, Nicola, Coviel প্রভৃতি বাংলা প্রহসনে যথাক্রমে জুর্দনখাঁ, খেলাৎখাঁ, ডেলমনিয়া, দৌলৎখাঁ, নকুলিয়া, কবলুখাঁ রহিয়াছে। মলিয়েরের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য এই যে, দৃশ্যের গোড়াতেই সব চরিত্রগুলির সমাবেশ হইয়া থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় কোনো প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ নাই, এবং অনেক দৃশ্যই খুব সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, অথচ ইচ্ছা করিলেই তিনি এই রীতি ত্যাগ করিয়া সাধারণ এবং সচরাচর প্রচলিত রীতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। মলিয়েরের প্রহসনখানায় উচ্চ এবং অভিজাত শ্রেণীতে স্থান পাইবার জন্য Jordan যে সব হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছে সেগুলি লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হইয়াছে। তুর্কী উৎসব এবং অনুষ্ঠানের কৌতুকময় বর্ণনা অত্যন্ত সরস এবং হাস্যরসপূর্ণ হইয়াছে।

॥ দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ (১৩০৯) ॥ মালিয়েরের Marriage Force জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই

প্রহসনের অন্তর্গত ন্যায়রত্ন এবং বেদান্তবাগীশের দৃশ্য দুইটি লেখকের রসজ্ঞ মৌলিকতার পরিচায়ক। এই ধরনের জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের নির্বুদ্ধিতা লইয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা ও নাটক-প্রহসন রচনা করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিবার পূর্বে তিনি যে সংস্কৃত নাটকগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন সেইগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব উল্লেখ না করিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় হইবে। তিনি সমুদয় বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সাবলীল স্বাভাবিকতার গুণে অনূদিত নাটকগুলি মূল গ্রন্থসমূহের ভাবের চমৎকারিতা এবং বর্ণনার পরিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তিনি নাটকেব বসধারা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহারা কৃতী অনুবাদকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান পুরোভাগে ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

(২) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' এই দুইখানি নাটিকা অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও জাতীয় ভাবাত্মক নাট্য-আন্দোলনের সূচনায় ইহাদের প্রভাব ছিল অনেকখানি। নাট্যকার এই নাটিকা দুইখানিকে মাস্ক (রূপক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'ভারতে যবন'-এর ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় ভারতমাতা প্রথম মাস্ক (রূপক সাধারণ ব্যক্তিগণ ভারতমাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে ভারতে যবন দ্বিতীয় মাস্ক রচনা করিলাম।' ভারতমাতা'র মধ্যে ইংরাজ রাজত্বকালীন অবস্থা ও 'ভারতে যবন'-এর মধ্যে মুসলমান শাসনাধীন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দুইখানি নাটিকাতেই ভারতীয় সন্তানগণের দুঃখদুর্গতি দেখাইয়া ইংরাজ ও মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপিত করা হইয়াছে।

॥ ভারতমাতা (১৮৭৩) ॥ 'ভারতমাতা'র মধ্যে জাতীয় ভাবের অবতারণা হইলেও শেষ পর্যন্ত দীনদুঃখী ভারতসন্তানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ শাসনমুক্তির অভিপ্রায় ইহাতে অদৃশ্য। দুইটি সাহেবের চিত্র অঙ্কন করিয়া লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, সাহেবদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। সেজন্য সৎ সাহেব ও সদয়া মহারাণীর করুণা-উদ্রেকের চেষ্টাই রহিয়াছে নাটিকার মধ্যে। পরিশেষে ধৈর্য,

সাহস ও একতা এই তিনটি চরিত্র আনিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, এইগুলিই পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তিপথের ঐকান্তিক অবলম্বন।

॥ ভারতে যবন (১৮৭৪) ॥ 'ভারতে যবন'-এর মধ্যে মুসলমানগণের নানাবিধ অত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই অত্যাচার সহিয়াও ভারত-সন্তান নিশ্চেষ্ট ও প্রতিকারহীন। দুঃখে অভিমানে ভারতলক্ষ্মী বলিলেন, 'যতদিন আর্যসন্তানগণ পুণ্য-ভূমি হতে যবনগণকে দুরীভূত ক্লোরতে না পারবে, ততদিন অবধি প্রিয় ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্য সন্তানগণের নিকট হতে বিদায় হলেম। যদি কখন ভারতমাতার দুঃখ দূর হয়, আমারও হবে। নচেৎ এই শেষ।' নাটকার শেষে ভারত-সন্তানের উদ্দীপিত ভাষণ ও সাহসিক সংগ্রামের বর্ণনা রহিয়াছে।

(৩) হরলাল রায়

হরলাল রায়ের নাটকে রোমাণ্টিক কাহিনী থাকিলেও জাতীয় ভাবোদ্দীপনাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ হরলালকে উদ্বোধিত করিয়াছিল, সেজন্য স্বদেশী ভাবানুপ্রাণিত জনসাধারণের কাছে তাঁহার নাটক সহজেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। হরলালের কয়েকখানি নাটকের মধ্যে তাঁহার জাতীয় ভাবাত্মক নাটক দুইখানিই সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ঐ দুখানি নাটকের নাম 'হেমলতা নাটক' ও 'বঙ্গের সুখাবসান'।

॥ হেমলতা (১৮৭৩) ॥ 'হেমলতা নাটক' নায়িকা হেমলতার নামাঙ্কিত। কিন্তু হেমলতার প্রভাব নাটকের মধ্যে নিতান্তই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রধান চরিত্র হইল বীরশ্রেষ্ঠ সত্যসখা। সে-ই তেজসিংহের কবল হইতে চিতোররাজ বিক্রম সিংহকে উদ্ধার করিয়াছে এবং যবনের আক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিয়াছে। যেভাবে সত্যসখার আসল পরিচয় গোপন করিয়া ঘটনার পর ঘটনার মধ্য দিয়া দর্শকদের সাগ্রহ কৌতূহল বজায় রাখা হইয়াছে তাহাতে নাট্যকারের সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বহ্বাড়ম্বর ও অতিনাটকীয় উপাদান কম আছে বলিয়াই এই নাটকের প্রতি কোথাও আমাদের মনে তেমন অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মায় না।

॥ বঙ্গের সুখাবসান (১৮৬৪) ॥ বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় বাংলার ইতিহাসের এক চিরকলঙ্কিত অধ্যায়। নাট্যকার সেই অধ্যায়টি অপরিমেয় অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বঙ্গবিজয়ের

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা লইয়া নাটকখানি রচিত। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন গুরু গোবিন্দ ভট্টাচার্যের আদেশে ও মন্ত্রী মহেন্দ্রের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া বাংলার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য হইলেও নাট্যকার তাঁহার চিত্তে তীব্র আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি সঞ্চার করিয়া তাঁহার প্রতি করুণা আকর্ষণ করিয়াছেন। বস্তুত এই নাটকের মধ্যে কোনো চরিত্রকেই অবিমিশ্র মন্দ করিয়া অঙ্কন করা হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক মহেন্দ্রের মধ্যেও যথেষ্ট দ্বিধা ও অন্তিম মনস্তাপ দেখান হইয়াছে এবং বক্তিয়ার বিধর্মী পররাজ্যহারী হইলেও ক্ষমা ও মনুষ্যত্ব-ধর্ম হইতে বঞ্চিত তাহাই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের দুঃখব্রতী বীর ভ্রাতুষ্পুত্র যেন ভীরুতার লতাগুল্মের মধ্যে এক উচ্চশির শালবৃক্ষ। বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা করিয়াও সে এই নির্জীব জড়ীভূত জাতিকে জাগাইতে পারিল না। মর্মান্তিক বেদনায় সে বলিয়াছে—'কোটি বাঙালীর মধ্যে দশ জন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুর্দিনের নিশ্বাস প্রশ্বাস কি এতবড় হল, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়। বাঙালীরা কি জীবিত আছে? বাঙালীরা জীবিত নাই—সেদিন ছিল না, আজও নাই।'

(৪) উপেন্দ্রনাথ দাস

রোমাঞ্চকর ও অতিনাটকীয় উপাদান দ্বারা সুলভ জনপ্রিয়তার অধিকারী হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। স্থায়ী নাট্যরসসমৃদ্ধ না হওয়াতে সমসাময়িক কালের সীমিত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া এই জনপ্রিয়তা পরবর্তীকালে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।[১] নাটক যে আরব্য উপন্যাস নয় এবং নাটকের action ও ফুটবল খেলার action এর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তৎকালীন রোমাঞ্চপ্রিয় অনেক নাট্যকারই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উপেন্দ্রনাথও এই ভুল কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী-সমাজ লইয়া তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন, সেজন্য একটা স্বতন্ত্র, সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে যে একটু আড়ষ্ট ও অসামাজিক বোধ হয়

১। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক তৎকালে যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা 'শরৎ-সরোজিনী' সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা হইতে কিছুটা অনুমান করা যায়—'বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনি সর্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই একখানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই।'

তাহাও সত্য। শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে যে তৎকালে ইংরাজবিদ্বেষী ও স্বদেশ-হিতৈষী স্বদেশগর্বী ভাব জাগ্রত হইয়াছিল নাট্যকার নাটকে তাহার অবতারণা করিলেন। কিন্তু কোনো মহৎ ভাব, স্থান, কাল, পরিবেশের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে যে তাহা লঘু ও নিরর্থক হইয়া পড়ে তিনি সম্ভবত তাহা জানিতেন না। 'শরৎ-সরোজিনী'র কথাই ধরা যাক। এক ইংরাজ সার্জনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শরৎ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় হয়তো দিয়াছে, অথবা কয়েকটি গোরা ডাকাতকে নিপাত করিয়াছে কিন্তু সেই জন্যই এই কর্মগুলিকে উচ্চধরনের জাতীয়তার অঙ্গ বলা যায় না। সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও জাতীয় ভাবের অনুকূল পরিবেশ নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে তরল জাতীয়তার বহ্বাস্ফোট থাকিলেও ইহাকে জাতীয় ভাবোদ্দীপিত নাটক বলা চলে না।

॥ শরৎ-সরোজিনী (১৮৭৯)॥ শবৎ-সরোজিনী এবং বিনয়-সুকুমারীর অনুরাগ ও নানা বাধা-বিপত্তির অবসানে তাহাদের মিলনই হইল নাটকের আখ্যান বস্তু। পাষণ্ডচেতা মতিলালের দ্বারাই নাটকের যাবতীয় সঙ্কট-জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত ঘটনা সরোজিনীর গৃহত্যাগ। শরতের গৃহে পালিতা হইয়া হঠাৎ তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার মধ্যে কোনো বিশ্বাস্য কারণ অনুমান করা যায় না। তাহাদের অনুরাগের মধ্যে কোনো বাধা-বিপত্তিও উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সরোজিনীর আকস্মিক বৈরাগ্য অর্থহীন। যদ প্রণয়-সঙ্কট এড়াইবার জন্যই সে শরতের আশ্রয় ছাড়িয়া গেল তবে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনবায় আসিয়া আবার সেই সঙ্কটের মধ্যে ধরা দিল কেন? যাহাই হউক সরোজিনীব ছন্ম পরিচয়-প্রকাশের দৃশ্য যে অত্যন্ত কৌতূহলসূচক ও নাটকীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নই। মুসলমান দস্যুদের হস্তে শরতের বন্দী হইবার ঘটনা একেবারেই উদ্ভট ও নাট্যসম্পর্কহীন। মূল চরিত্রগুলি অপেক্ষা কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র অনেক বেশি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান-পাগল হরিদাস কলঙ্কিতা অথচ পরহিতপ্রাণা ভুবনমোহিনী এবং দুর্দান্ত শয়তানরূপী মতীলাল-চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

॥ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (১৮৭৫)॥ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রণয়মূলক সামাজিক নাটক হইলেও ইহা সুলভ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত নাটকে চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিবার জন্য লেখক মারামাবি ও পিস্তল ছোড়াছুড়ির আধিক্য দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বীররসের গাম্ভীর্য নাই, আছে কেবল নকল বীরত্বের হাস্যকর তারল্য। সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী নাটকের নায়ক ও নায়িকা।

ইহাদের প্রণয়, প্রণয়ের বাধা ও পরিশেষে মিলনই নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। কিন্তু ইহাদের যে প্রণয় চিত্রিত হইয়াছে তাহা ভাবাতিশয্যে এবং উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যে তরল ও সংবেদনহীন হইয়া পড়িয়াছে। 'The course of true love did never run smooth' একথা সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে যে সাময়িক ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে তাহার তেমন জোরালো কারণ নাই। তাহাদের মনে যে ভ্রান্ত সংশয় ও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কোনো জটিল ঘটনার আবর্তে ঘটে নাই। একমাত্র হরিপ্রিয়ের বাক্যে ও চক্রান্তে এই সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হরিপ্রিয়ের অনিষ্ট-কারিতা ইয়াগোর মত একেবারেই অকারণ ও উদ্দেশ্যহীন। হরিপ্রিয় সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিতে যাইয়া নিজেই বলিয়াছে—'ছেলেবেলা সকলের সঙ্গে খুঁসুড়ি নুসুড়ি করতেম বলে, বাবা আমাকে শয়তানের অবতার বলে ডাকতেন। তা, মা দুষ্ট সরস্বতী এখনও আমার ঘাড় থেকে নাবেন নি। মানুষে মানুষে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে পারলে আমার বড়ই আহ্লাদ হয়।' কিন্তু শুধু কেবল একটা দুষ্ট খেয়ালের ফলস্বরূপ একরূপ ঘনীভূত সঙ্কট সৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয় নাই। হরিপ্রিয় সুরেন্দ্রের ভগ্নী বিরাজমোহিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, সুতরাং নিতান্ত অকারণে সুরেন্দ্রের ক্ষতি করিতে যাওয়া তাহার নিজের পক্ষেও সঙ্গত ও লাভজনক নহে। মাক্রেণ্ডেলের সহিত সুরেন্দ্রের শত্রুতার ফলে নাটকের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ও স্বাদেশিক ভাবালুতার অবতারণা হইয়াছে। মাক্রেণ্ডেল তৎকালীন গর্বোদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী ইংরাজ রাজকর্মচারীর এক অতি নিখুঁত প্রতিনিধি। সুরেন্দ্রকে সে বলিয়াছিল, 'নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙালির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।' কথাগুলি দেশীয় লোকদের প্রতি তৎকালীন ইংরাজের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছে। ঔদরিক ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং সরল-স্বভাব নীলকণ্ঠ নাটকের মধ্যে যে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে তাহা স্থূল হইলেও উপভোগ্য। পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি বিদ্রূপপ্রিয়তা ন্যায়রত্নের চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। হাস্যপরিহাসপ্রিয় বৃদ্ধ রাজচন্দ্র বসুর কথাগুলি বিশেষ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

॥ দাদা ও আমি (১৮৮৮)॥ আলোচ্য নাটকখানিও রোমান্টিক ভাবাপন্ন, তবে নাট্যকারের পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ নাটক দুইখানির ন্যায় ইহা বীররসাত্মক নহে,

লঘু হাস্যরসাত্মক। ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার দুই ভাই, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভালোবাসা এতই গভীর যে তাহারা ভাইয়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া বন্ধুর সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের বড়ই অনিচ্ছা, নারীসমাজ সম্বন্ধেও তাহাদের আশঙ্কার অন্ত নাই। অবশ্য কিভাবে তাহাদের অনিচ্ছা কাটিয়া গেল এবং আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষায় পরিণতি লাভ করিল তাহা নাটকের মধ্যে যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের কাহিনীর মধ্যে রহস্যজটিল ভাবটি অক্ষুন্ন রাখিয়া নাট্যকার ঘটনাবিন্যাসের কৌশল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রণয় ও পরিহাসের দুই ধারা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া নাটকের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সরস পরিবেশ রচনা করিয়াছে। তবে জায়গায় জায়গায় দুই ভাইয়ের ছেলেমি ও ছ্যাবলামি একটু অশোভন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) উমেশচন্দ্র গুপ্ত

॥ হেমনলিনী (১৮৭৪)॥ কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক রোমাণ্টিক নাটক যে কতখানি নিকৃষ্ট হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত বর্তমান নাটকখানি। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সবরকম হাবভাব ও পরিবেশ ইহাতে আছে। বীর, রৌদ্র, আদি, হাস্য ও করুণ কোনো প্রকার রসেরও অভাব নাই ইহাতে, কিন্তু তবুও নাটকের কোনো গুণই ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটক, এমন কি রঙ্গলাল-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও আলোচ্য নাটকে অতি সহজেই ধরা যায়; কিন্তু ভাব, চরিত্র ও কার্যকারণের কোনো প্রকার সঙ্গতি ইহাতে চোখে পড়ে না। উদয়পুরের বর্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহ অন্যায়ভাবে রাজ্য হস্তগত করিলেও নাটকের মধ্যে তাহার যে চরিত্র ও আচরণ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে তো তাহার প্রতি বরং অনুকম্পা ও সহানুভূতিই জাগ্রত হয় এবং হেমচন্দ্র ও নাগরিকগণ যে ব্যবহার তাহার সহিত করিয়াছে তাহা নিতান্তই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলিয়া মনে হয়। ছদ্ম ব্রহ্মচারীর কারসাজিতে নলিনী ও হেমচন্দ্র উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল, অথচ তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় সকলেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এরকম উৎকট অসঙ্গতি যে নাটকের মধ্যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

॥ বীরবালা (১৮৭৫)॥ নাটকের শিরোনামা ব্যাখ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে —'সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সিলিউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ'। কিন্তু এই যুদ্ধ অপেক্ষা বীরবালা এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়কাহিনীই নাটকের মধ্যে বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'উমেশচন্দ্রের বীরবালা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পরিকল্পনা যোগাইয়াছিল। কিন্তু উভয় নাটকের পরিকল্পনা, পরিবেশ এবং পাত্রপাত্রীদের চরিত্রসৃষ্টিতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। গ্রীক চরিত্রগুলির নামগুলিই যে শুধুমাত্র হিন্দু হইয়াছে তাহা নয় (যথা—শিলবক্ষ, বীরবালা, দামিনী, কুশলা) তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতিও আগাগোড়া বদলাইয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-বাঙালীর অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বীরবালা যেন পূর্বানুরাগিণী শ্রীরাধা, শুধু কেবল চন্দ্রগুপ্তের নাম শুনিয়াই সে উন্মাদিনী 'নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো'—তাহার উদ্বেলিত ভালবাসা উচ্ছ্বসিত প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে —পিতার পরাজয়, অপমান—কিছুতেই সেই প্রবাহে ভাঁটা কিংবা কোনো আবর্তও দেখা যায় নাই। নাটকের মধ্যে হিন্দু-গৌরব ও বীরত্বের উদ্দীপিত বর্ণনা আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বীররসের অনুপ্রেরণা ইহাতে সঞ্চার করা হইয়াছে। চাণক্যের ছায়াপাত নাই বলিয়া এই নাটকে চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃত শৌর্য-বীর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। নাটকেব নায়িকাকে বীরবালা না বলিয়া নীরবালা বলাই সঙ্গত, অর্থাৎ তাহার মধ্যে বীররস অপেক্ষা করুণ-রসেবই আধিক্য বেশি।

॥ মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক (১৮৭৫)॥ লেখকের মতে আলোচ্য নাটকখানি 'আরঙ্গজীবের সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্যকাব্য।' কিন্তু এই প্রকৃত ঘটনা ইতিহাসের নেপথ্যেই ঘটিয়াছে, সেইজন্য নাটকখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব সামান্যই। আরঙ্গজীবকে নাটকের শেষে নিতান্তই অকারণে অতর্কিতভাবে আনা হইয়াছে। নাটকের মূল ঘটনাগতির সহিত শম্ভুজী-আরঙ্গজীবের সংঘাত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নহে। শম্ভুজীর কামলালসা ও তাহার ফলে একটি উদারচেতা বীর সৈনিক ও তাহার নিষ্পাপ প্রণয়িনীর শোকাবহ পরিণতিই নাটকের আসল আখ্যানবস্তু। তবে নাট্যকার শম্ভুজীর চরিত্রে যে অন্তিম অনুতাপ ও স্বদেশপ্রাণতার লক্ষণ চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে চরিত্রটি অন্যায়কারী অপরাধী হইলেও আমাদের অনুকম্পা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না। তৎকালীন রোমান্টিক নাটকগুলির ন্যায় এই নাটকেও প্রেমের সর্বময় প্রভাবকেই একটু অসঙ্গত আতিশয্যের দ্বারা সকলের উপরে স্থাপন করা হইয়াছে।

(৬) প্রমথনাথ মিত্র

॥ নগ-নলিনী (দ্বি-স ১২৯৩)॥ 'নগ-নলিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন; "পাঠকগণ! নগ-নালিনী নাটকমধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই, 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই 'হায়, স্বাধীনতা!' নাই 'ফোর্ট উইলিয়ম'

নাই, . পিস্তল, বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্যের বিষয়! বাঙালীদের চরণে নমস্কার তাঁদের আর ভরসা নাই —তাঁদের এমন রুচি যে, তাঁহাবা এই বইও এত লোকে কিনিয়া পড়িয়াছেন ও পড়িবেন।" নাট্যকারের ব্যাজস্তুতিসত্ত্বেও তাঁহার নাটককে কখনই উচ্চাঙ্গের নাট্যশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ইহার যেমন বিষয়বস্তু তেমনি সৃষ্টি-কৌশল! নাট্যকারের উচ্ছ্বসিত কাব্যলহরী তাঁহার নাটকের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়াছে। কন্যার সর্বনাশে ক্ষিপ্তচিত্ত গোবিন্দরায়ের চরিত্র ব্যতীত আর কোনো চরিত্রই আলোচনার যোগ্য নহে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরিশ যুগ

নাটকে ধর্মবিশ্বাস ও পৌরাণিক লীলা

(১৮৮০-১৯০০)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর ইতিহাসে দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাবের সংঘাতে নব নব রূপান্তর লাভ করিয়াছে। দীর্ঘকালীন সুপ্তির পর বাঙালী যখন জাগিল তখন বিচিত্রের নেশায় তাহার দৃষ্টি চঞ্চল, আর অস্থির ভাবের মদিরায় তাহার অন্তর মশগুল। পিঞ্জরাবদ্ধ পশু হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যেমন অকারণ ছুটাছুটি করিয়া মুক্তির আনন্দটা উপভোগ করে বাঙালীর জীবনও সেদিন তেমনি নিছক্ চলার উত্তেজনাতেই মাতিয়া উঠিয়াছিল। সেই চলার ঘূর্ণিপাকে পথের লক্ষ্য সরিয়া গেল, শুধু কেবল জাগিয়া রহিল এক ঘূর্ণিত বিক্ষোভের চক্রাবর্ত। ইয়ং বেঙ্গলী আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম আন্দোলন সেদিন বাঙালী জীবনকে এরূপ নিত্যনূতন আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই চলিষ্ণু উত্তেজনা একটু শান্ত হইয়া আসিল, স্তম্ভিত জাতীয় মন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল,—বুঝিল মুক্তি শুধু সংহারে নহে, সৃষ্টিতেও বটে। এই সৃষ্টিকর্ম প্রথম আরম্ভ হইল জাতীয়তার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী গর্ভাঙ্কে আমরা সেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সৃষ্টিকর্মের পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম জাতির আত্মিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাহার নবায়িত ধর্মচেতনায়।

১৮৮০ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধর্মচেতনা বাঙালীর ভাব-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক অনন্য প্রভাবজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য এই ধর্ম-চেতনার মূল উৎস ছিলেন ধর্মাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার কর্ম-যোগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পুরোহিত সেদিন যে অদৃশ্য আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন সেই আলোকের কাছে শিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী বাঙালীর জ্ঞান-বুদ্ধি, সব আলোকেই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সেই আলোকের বাণী বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দের দ্বারা দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইল। অবহেলিত ধর্মবিশ্বাস অদম্য শক্তি লইয়া জাতির চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু এই ধর্মবিশ্বাস শুধু কেবল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-গ্রাহ্য হইয়া রহিল না, ইহা যুক্তির বর্মে আবৃত হইয়া এবং বিচারের কষ্টি-পাথরে নিরীক্ষিত হইয়া বহির্জীবনের এক

শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। এই যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষদিকের তিনখানি উপন্যাস, যথা, 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম'-এ (১৮৮৭) জাতীয়তাকে ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদর্শনের লেখকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি আবিষ্কার করিলেন ও চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুত্বের গৌরব লইয়া আলোচনা করিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিকী মহিমা নবীন গৌরবে ছন্দোবদ্ধ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯২) ও ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) এবং নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) ভাবগত-ধর্ম ও মানব-ধর্মকে এক উদার সূত্রে বাঁধিয়া দিল। আর একজনের কথা উল্লেখ না করিলে এই যুগের ধর্মপ্রাণতার কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। তিনি হইলেন ধর্মিষ্ঠ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মজ্জমান আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার দৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করিলেন, সেই বাহুতে ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস ও কুশাগ্র যুক্তির অমিত তেজ।

এই সর্বাঙ্গীণ ধর্মপ্লাবন হইতে বাংলার নাট্যসাহিত্যও দূরে থাকিতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে) সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যশালা এখন আর মুষ্টিমেয় ধনশালী লোকের বিলাসভূমি নহে। ইহা সর্বসাধারণের সম্মিলিত আনন্দভোগের ক্ষেত্র। যে ভাবাদর্শের আবেগে এই সর্বসাধারণ মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহাদের আনন্দরসের আঙিনাতেও অতি স্বাভাবিক কারণেই আত্মপ্রকাশ করিল। ভাবোন্মত্ত জাতির সাগ্রহ সম্বর্ধনায় নাট্যক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রেই পরিণত হইল। এই সময় নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি ধর্মভাব ও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের প্রবল অনুরক্তি লক্ষ্য করিলেন। শুধু তাহাই নহে, অন্তরের গভীরে তিনি এক অলৌকিক স্পর্শ অনুভব করিলেন। সেই স্পর্শে তাঁহার সমগ্র সত্তা অকপট ভক্তির রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যুক্তিদর্পিত, নাস্তিক গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী কৃপায় ভাবতন্ময় ভক্ত গিরিশচন্দ্রে পরিণত হইলেন।[১]

১। রামকৃষ্ণদেবের কৃপা সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন, "অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা পতিত-পাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার চিন্তার কোন কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।"

বাহিরে ও ভিতরে এই ধর্মভক্তির প্রেরণা লইয়া গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা করিতে স্থরু করিলেন। সেজন্য জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী যেমন নাটকের বিষয়বস্তুকে তিনি পৌরাণিক জগতে লইয়া গেলেন, তেমনি অন্তরের ভক্তিরসে সেই নাটকের প্রাণকেন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিলেন। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, এমন কি প্রহসন পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার খাঁটি ও স্বাভাবিক ক্ষেত্র হইল পৌরাণিক নাটক—এখানে দর্শকের রুচি ও নাট্যকারের ইচ্ছা এক হইয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সহবর্তী ও অনুবর্তী নাট্যকারগণও এই সর্বজনীন ধর্মাদর্শে[১] অনুপ্রাণিত হইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই নাম করিতে হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের। তিনি অসংখ্য পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সব নাটকের শিল্পগুণ যাহাই থাকুক না কেন সমসাময়িক ভক্তিমত্ত দর্শকের কাছে তাহাদের অনাদর হয় নাই। আর দুইজন নাট্যকারের উল্লেখ এখানে করা উচিত, তাঁহারা হইলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এইসব উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের বিষয় ও ভাব অবলম্বন করিয়া যে-সব নাট্যকার নাট্যক্ষেত্রে প্লবগলীলা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থহীন ভাব, অকারণ উচ্ছ্বাস ও অসংলগ্ন দৃশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এইসব নাটক ক্ষণকালের জন্য দর্শকদেব ভক্তিবিভোর আকর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবে এই সব অসার্থক নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে একটি মূল মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা হইল পৌরাণিক জগতের দৈবলীলার প্রতি এক অন্ধ আনুগত্য।

এই আনুগত্যের ফলে আমাদের সনাতন অধ্যাত্ম-জীবনের মুক্তি হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বস্তুজীবনের মধ্যে আমরা বন্ধন আনিয়া ফেলিলাম। আমাদের ধর্ম শুধু ঈশ্বর-সাধনার উপায় ও অঙ্গ নহে, ইহা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক-জীবনের সম্বন্ধকেও নিয়ন্ত্রণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব-ধর্ম-জাগরণের ফলে আমাদের আত্মার প্রভূত উন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র-নির্দেশিত জীবন-প্রণালীকে পুনঃস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইল বলিয়া আমাদের

১ ধর্মপ্রাণ পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে গিবিশচন্দ্র নিজে বলিযাছেন, "ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থাযী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব।"

সামাজিক অগ্রগতি অকস্মাৎ রূঢ় আঘাত পাইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবে নবায়িত মুক্ত আদর্শ আমাদের সমাজ-ক্ষেত্রকে উন্নত ও প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র-শাসনে পুনরায় ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অধ্যাত্মসাধনা ও আত্মোপলব্ধির পথ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মানুষের গড়া সমাজের পথ কখনই এক ও অভিন্ন থাকে না। যুগে যুগে প্রাকৃতিক ও বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পথ ও লক্ষ্যস্থল পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। কিন্তু অনেক সময় আমরা মানুষের আইনে ভগবানের দোহাই দিই, রক্ষণশীলতাকে ধর্মের বর্মে অভেদ্য করিতে চাই, তখনই হয় সমস্যার উদ্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই সমস্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। সমাজ সব সময়েই গতিশীল, সেই গতি কখনো প্রগতি আবার কখনো বা পরাগতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে এই প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এককালে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইতে দেখিয়াছি সেই বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কঠোরভাবে নিন্দিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্যালোকিত মুক্তজগতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যম্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৌরাণিক আদর্শপ্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামী-ভক্তির এক ধন্বন্তরি-সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, অন্নপূর্ণা, কিরণময়ী, জোবি, জহরা ও অমৃতলালের তরুবালা প্রভৃতি চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য-ভাবের সংঘাতে আমাদের মুক্তিপাগল চিত্তের যে শৃঙ্খল-ঝঙ্কার শুনা গিয়াছিল, তাহাতে দৈববিধানের বিরুদ্ধে পুরুষ প্রতিবাদের সহিত মিশিয়াছিল মানবতার জয়দৃপ্ত উল্লাস। দৈবকে ছাড়িয়া মানবতার প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। ইহাতে দৃঢ়তা ও কাঠিন্য প্রয়োজন, অথচ ইহার ফল অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। এই দৃঢ়-কঠিন, অশান্ত ও অনিশ্চিত মানবাত্মার যে-বেদনা আমরা দেখিলাম মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে, সেইরকম চরিত্রের সন্ধান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে মানব-চরিত্রের তীব্রতম দ্বান্দ্বিক রূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন, সেজন্য সেই চরিত্র ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ট্র্যাজিক-চরিত্র আমরা নাট্য-সহিত্যে বিশেষ দেখি না। তখন মানুষের মন মানুষকে ছাড়িয়া পুনরায় দেবতার

দিকে ঝুঁকিয়াছে। সেজন্য তৎকালীন নাটকে দৈব-শক্তির অলঙ্ঘ্য অনিবার্যতা ও মানুষী-শক্তির ব্যর্থ পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া দেবতার প্রতি একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

গিরিশ-যুগের সামাজিক নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তখনকার-বাঙালী-সমাজের ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী-পরিবার। এই একান্নবর্তী-পরিবারের বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমাজ-নিয়ন্ত্রিত পারস্পরিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে। সেই পরিবারের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত, বিশেষত পরিবারের সকল লোক মূল-কর্তার চালনাধীন। সেজন্য পরিবার-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন-মানবসত্তার সমস্যাময় প্রকাশ তখনকার সমাজে ছিল না, পারিবারিক অংশগুলির আভ্যন্তরীণ অমিল ও অসামঞ্জস্যের ফলেই যত কিছু জটিলতার উদ্ভব হইত। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। তখনো আমাদের সমাজে খণ্ড খণ্ড পরিবারগত চাকরিজীবী জীবন প্রসার লাভ করে, নাই, যৌথ-সম্পত্তির আয়ের উপরেই সমগ্র পরিবারকে নির্ভর করিতে হইত। সেজন্য সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলমাল, জাল-জুয়াচুরি, মামলা-মকদ্দমা প্রভৃতি সমস্যাই সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিত। এই সামাজিক পটভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই গিরিশচন্দ্র ও তাহার সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটক বিচার করিতে হইবে।

রাজকৃষ্ণ রায়

ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিপ্লাবিত বাংলা দেশে পৌরাণিক কাহিনীমূলক তরল নাট্যধারা চিরদিন অবারিত প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহা আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও লক্ষ্য করিব। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ প্রবর্তিত হইল, বস্তুতান্ত্রিক নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, কিন্তু জনসাধারণের মন নিরবচ্ছিন্ন নাট্যরস অপেক্ষা অবাস্তব দৃশ্যসমন্বিত, অলৌকিক ভাবময় ভক্তিরসের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিল। গ্রামে যাত্রার আদর বজায় রহিল, এবং শহর-বাজারের নাট্যরীতির ছদ্মবেশে ভূষিত হইয়া ধর্মাত্মক যাত্রাভাব অব্যাহত পোষকতা লাভ করিতে লাগিল। মনোমোহনের দ্বারা অপেরা জাতীয় নাটকের সূচনা হইয়াছিল, সেই আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। মনোমোহনের পরে বহুতর নাট্যকার এই ধরনের নাটক লিখিয়া তাঁহাদের অপরিমিত কলরবের দ্বারা নাট্য-সাহিত্যের অঙ্গন অতিমাত্রায়

মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন।[১] এই শ্রেণীর নাটক বাংলা সাহিত্যে এত বেশী লেখা হইয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা অনুমান করাও অসাধ্য ব্যাপার। এই রকম নাটক লিখিতে হইলেও বিশেষ কোনো নাট্যকলা-কৌশলের দরকার হইত না; সাধারণত কতকগুলি গান বসাইয়া, জোড়াতালি দিয়া কয়েকটি অসংলগ্ন ও অসমঞ্জস দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া দর্শকদের মনের মধ্যে ভক্তিমত্ততা উদ্রেক করিতে পারিলেই নাট্যকারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সেজন্য এই নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বহু অক্ষম ও অনভিজ্ঞ নাট্যকার খিড়কি পথে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। গীতাভিনয় লেখকদের অনেকের পরিচয় ও আলোচনা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অমূল্য তথ্যবহুল গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ রহিয়াছে।

মনোমোহন বসু গীতাভিনয়রূপ যে নাট্যধারার সূত্রপাত করেন তাহারই পরিণতি হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে। রাজকৃষ্ণ রায় বহুসংখ্যক নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সহজ স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি নানা ধরনের নাটক লিখিলেও পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তিনি অধিকাংশ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কাহিনীর কোনো নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া অথবা বিশেষ কোন নাটকীয় ভাবপূর্ণ ঘটনাকে রঞ্জিত ও চিত্রিত করিয়া কাহিনীর নাটকত্ব সঞ্চার করিতে তিনি দৃষ্টি দেন নাই। ঘটনা-সংস্থাপনেও কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তিনি দাবী করিতে পারেন না। যাত্রা এবং আপেরা-লেখকগণ অনেক সময় স্থূলরুচি দর্শকদের চিত্তরঞ্জনের জন্য পৌরাণিক নাটকেও মাঝে মাঝে পৌরাণিক ভাব ও পরিবেশের প্রতিকূল নিতান্ত আধুনিক ও সাংসারিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিয়া ফেলেন, ইহাতে পৌরাণিক নাটকে দর্শক দেবলীলার সহিত সামাজিক রস একসঙ্গে উপভোগ করিতে পারেন। সূক্ষ্মদর্শী দর্শকের কাছে এইরূপ ভাবময় অলৌকিক বৃত্তান্তের সহিত বাস্তব-জগতের সাংসারিক বিষয়ের সমাবেশ বিসদৃশ, বেমানান ও রসহানিকর মনে হইবে, কিন্তু সাধারণ লোক ইহাতে দোষ ও অসঙ্গতি ধরিতে

১। গীতাভিনয় অর্থব্যয়-সাধ্য, তাহার উপর, বক্তৃতাময় ও গীতিবহুল হওয়াতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই মনোরম। এই কারণে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বদ্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গীতাভিনয়ের পালা অজস্রভাবে রচিত হইতে লাগিল।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩৪৪।

পারে না। রাজকৃষ্ণ অনেক স্থলে হাস্যরসের পরিবেষণের জন্য এমন অনেক প্রাত্যহিক তুচ্ছতা-মিশ্রিত অবিমিশ্র ভাঁড়ামির দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন যে সব জায়গায় আমাদের উচ্চ পৌরাণিক গগনবিলাসী ভাবতন্ময় চিত্ত অকস্মাৎ পরিচিত আবেষ্টনীর পঙ্কে নিপতিত হয়।

যাত্রা ও গীতাভিনয়ের যে উদ্দেশ্য রাজকৃষ্ণের নাটকেও তাহা সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ তাঁহার নাটকও তরল ভক্তিরসে প্লাবিত। পুরাণের দেবলীলার মত তাঁহার নাটকেও দেবলীলা অনেক স্থলে সাধারণ ধারণার পরিপন্থী, এবং মানবীয় বুদ্ধির পক্ষে দুরধিগম্য অথচ সর্বত্র দেবলীলার প্রতি আমাদের প্রশ্নহীন ভক্তি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যে ভক্তির পিছনে কেবল শাস্ত্রনির্দেশ এবং গতানুগতিক সংস্কার রহিয়াছে, যাহা প্রাণের সাগ্রহ সম্মতি হইতে উৎসারিত হয় না, তাহার প্রভাব এবং স্থায়িত্ব বেশী নহে। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে প্রদর্শিত ভক্তি অনেক সময়েই আমাদের চিত্তে কোনো সাড়া সঞ্চার করিতে পারে না।

গীতাভিনয়ের প্রধান লক্ষণ গানের অতিশয্য রাজকৃষ্ণের নাটকেও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। গীতাভিনয়-লেখকগণ বাঙালী দর্শকের সঙ্গীতপ্রীতির সুযোগ লইয়া স্থানে অস্থানে অনর্গল গানের সমাবেশ করিয়া যান। রাজকৃষ্ণও অনেক সময়ে এমন অনেক চরিত্রের মুখে গান দিয়েছেন যাহা নিতান্ত অশোভন ও বিসদৃশ বোধ হয়। অথচ গীতাভিনয়ে এরকম সর্বময় সঙ্গীত-প্রবাহ লেখক ও দর্শকের কাছে অসঙ্গত মনে হয় না।

বাজকৃষ্ণ গদ্য ও পদ্য—উভয় ভাষারীতির মধ্যেই তাঁহার নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকের ন্যায় তাঁহার নাটকে ভাব অনুযায়ী সুস্পষ্ট ভাষা-বিভাগ নাই। অনেক জায়গাতেই তিনি গদ্য কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ পদ্য কথোপকথন নিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ গদ্য পদ্যের আকস্মিক সমাবেশে রসভোগের ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। পদ্য রচনায় ভাঙ্গা মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনে বাজকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'হরধনুর্ভঙ্গ' হইতে তিনি ঐরূপ ছন্দে নাটক লিখিয়াছেন। 'হরধনুর্ভঙ্গ'-এর ভূমিকায় তিনি ঐ ছন্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।[১]

১। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল। নহিলে আধুনিক 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বাংলায় হইত কিনা সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে 'জলবৎ তরল' এবং লেখকের পক্ষে তাহাই; লোকের অনুরোধে

রাজকৃষ্ণ রামায়ণের কাহিনী লইয়া কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, সেগুলির নাম 'অনলে বিজলী', 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'রামের বনবাস', 'তরণীসেন বধ' ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) শ্রেষ্ঠ। রাবণের মৃত্যুর পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি পরে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মাইকেলী ছন্দ ও ভাষার প্রভাব নাটকের মধ্যে বিদ্যমান। ইহার কথোপকথন অত্যন্ত দীর্ঘ, অভিনয়ের উপযোগী নহে।

'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪) বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। অথচ নাটক হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট, এমন কি বিশেষ উল্লেখযোগ্যও নহে। ইহাতে কেবল অপরিমিত ভক্তিরসের প্লাবন, কোনো দ্বন্দ্ব নাই, চরিত্রসৃষ্টিও নাই। বার বার প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার চেষ্টা একটু একঘেয়ে এবং চিত্তবিকর্ষক হইয়াছে। যাত্রার ন্যায় ইহাতে স্থূল, অসংলগ্ন এবং গ্রাম্য হাস্যরস উদ্রেকের চেষ্টা আছে।

'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮) পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহাতে সামাজিক ভাব ও বিষয় প্রাধান্য পাইয়াছে। রত্নদত্ত চরিত্রের মধ্যে সমাজের কুসীদজীবীর প্রকৃতি কিরূপ জঘন্য হইতে পারে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।[১] তবে রত্নদত্তের শাস্তি তাহার মন হইতে উৎসারিত হয় নাই, নিতান্তই একটা বাহ্য ঘটনার মধ্য দিয়া জোর করিয়া তাহাকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। যযাতি পিতা নহুষের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য নরমেধ যজ্ঞ করিতে আদিষ্ট হন, অথচ তাঁহার কোমল দয়াপ্রবণ চিত্ত কিছুতেই অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে হত্যা করিতে দিতে পারেনা—এই মানসিক সংগ্রাম ভালোভাবে বিকশিত হইয়াছে। নাটকে গানের আতিশয্য দ্বারা করুণরস ও ভক্তিরস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। সকলেই গান গাহিতেছে, এমন কি কুশধ্বজের মা কাত্যায়নী পর্যন্ত।

বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারিদিনের মধ্যে এক একখানা ক দ ন্দ নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই জলবৎ তরল ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দই বিশেষরূপে উপযোগী।"

'হরধনুর্ভঙ্গের' ভূমিকা।

১। রাজকৃষ্ণ নিজে জীবনে ঋণ করিয়া ও দারিদ্র্যের নিপীড়নে এই শ্রেণীর লোকের স্বভাবের পরিচয় ভালোভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য এই চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা রঙ ফলাইয়াছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'নরমেধ যজ্ঞে'র অভিনয় দেখিয়া জনৈক ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন রাজকৃষ্ণের সমস্ত সুদ রেহাই দিয়াছিলেন।

'বামন ভিক্ষা'র (১৮৮৫) মধ্যে বিষ্ণুর বামন লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। বামনের জন্ম, বাল্যলীলা ও উপনয়ন ঘটা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশেষে বামন বলির কাছে যাইয়া তাহাকে কায়দায় জব্দ করিয়া পাতালে প্রেরণ করেন ও দেবগণের স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

'যদুবংশ ধ্বংস'-এ (১২৯০) বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ নিজ বংশীয়দিগকে প্রভাসে লইয়া যান, এবং সেখানে পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়া তাহারা যদুবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে। কৃষ্ণের লীলা সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, যাদবগণের ধ্বংসে তাঁহারই হাত রহিয়াছে, অথচ বলরাম সেবকম নহেন, বলরাম যাদবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধক ও ভক্তের জীবনী লইয়া রাজকৃষ্ণ 'মীরাবাই', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক লেখেন। 'মীরাবাই,' (১২৯৬) এর মধ্যে মীরাবাই-এর ভক্তি-সাধনা অপেক্ষা রসকুম্ভের চক্রান্তে কুম্ভসিংহের স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ এবং আত্মজ্বালাই বেশি ফুটিয়াছে। ভক্তিভাব নাটকে গৌণ হইয়া গিয়াছে। 'হরিদাস ঠাকুর' (১২৯৫) নাটকের মধ্যে ব্রহ্মার অবতার, মহাপুরুষ হরিদাসের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের নিগ্রহ এবং তাঁহার অসাধারণ দৈন্য ও সহিষ্ণুতা দেখানো হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলিকে কখনো প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। ঐতিহাসিক নাটকের ভাব ও পরিবেশ ঐ সব নাটকের মধ্যে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা কিংবদন্তীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই ইহাতে নাই। মানুষ এবং দেবতার লীলা ইহাতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ কয়েকখানি অনালোচ্য গীতিনাট্য এবং প্রহসনও লিখিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলার নাট্যভারতী অভিজাতের অন্তঃপুরে ভীরু পাদক্ষেপে সঞ্চরণ করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপূর্ব মহিমা সর্বসমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সব রঙ্গালয়ে সাধারণের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং নাটকীয় রস মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তিনিচয়ের পক্ষে মাত্র আস্বাদ্য হইয়া রহিল, দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে ইহার সচল ব্যাপ্তি ঘটিল না। যে শুভদিনে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইল,[১] সেইদিন হইতে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হইল। রঙ্গালয়ের প্রসারেই নাটকের প্রচার সম্ভব হয়। দীনবন্ধু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নাটকাদি পূর্বে রচিত হইলেও তাহাদের প্রকৃত এবং যথাযোগ্য সমাদর সাধারণ নাট্যশালার প্রশংসামুখর জনগণের দ্বারাই হইয়াছিল। এই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় অম্লান তেজে আমৃত্যু বিরাজ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নাট্যগগনকে সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিবৃন্দ দ্বারা বাংলা দেশের নাটকীয় আন্দোলন চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয়-শিল্পের শিক্ষাদানে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ লোক বাংলায় কেহ জন্মান নাই। গিরিশচন্দ্র অনেক নাটক লিখিয়াছেন বটে, এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাহাও সত্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথা বোধ হয় এই যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও পরিচালক। তাঁহার পূর্বে রঙ্গালয়ের নিতান্ত শৈশব অবস্থা, এবং তাঁহার পরেই আবার ইহার অকাল বার্ধক্যের সূচনা দেখা গিয়াছে। রঙ্গালয়ের গৌরবময় যৌবন কেবল গিরিশচন্দ্রের সময়েই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যক্ষ এবং অভিনেতা, ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রকাশ্য আদি রূপ, এবং হয়তো একমাত্র এইরূপেই তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটিত, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রয়োজনেই তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটি প্রকাশিত হইল, এবং তখন হইতেই কীর্তিমান নটের জনমুখর লীলার সহিত

১। ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

খ্যাতনামা নাট্যকারের নিভৃত সাধনার যোগাযোগ হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র লেখনী ধারণ করিবার পূর্বে মাইকেল, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকীকৃত উপন্যাসগুলি রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেইগুলি পুরাতন হইয়া আসিল, এবং দর্শকগণ নূতন নাটকের অভিনয় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে লাগিল। দর্শকগণের এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, এবং রঙ্গালয়গুলিকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করার আশা লইয়া গিরিশচন্দ্র নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১] তখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত লেখনী অবিরামভাবে নিত্য নূতন নাটক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই সব নাটক তৎকালীন রঙ্গমঞ্চগুলিকে নব নব রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।[২] গিরিশচন্দ্রের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক নাটক বাংলার কোনো নাট্যকার লেখেন নাই, সৃষ্টির এই অনন্যসাধারণ বহুলতা যথার্থই সকলের মনে সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব, তবে গোড়াতেই একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনিই বোধ হয় বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান নাট্যকার। আমাদের দেশের অনেক ভাগ্যহীন নাট্যকার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সমালোচকের কাছে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পান নাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ দীনবন্ধুর নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত রত্ন-সিংহাসনের অধিকার মাত্র তাঁহারই ভাগ্যে জুটিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের বহু ভক্ত সমালোচক তাঁহার মস্তকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ঈপ্সিত মুকুট দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাট্যকারের সমসাময়িক এবং নিকটজন ছিলেন। সেইজন্য পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক এবং সর্বোপরি

১। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের সহিত কথোপকথনের সময় গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন 'দায়ে পড়ে—Out of sheer necessity'—যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হ'ল স্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য', পৃঃ ১৮

২। অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন —'গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দ্বারা ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Fathar of the Native Stage—ইহার খুড়ো জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না'। পৃঃ ৪৩

অসাধারণ অভিনায়ক গিরিশচন্দ্র ইঁহাদের প্রশংসমান দৃষ্টিকে এমনিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, নাট্য-সমালোচনায় ইঁহারা অপক্ষপাতী বিশ্লেষক দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'নাটকের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য ততটুকুই যতটুকু দ্বারা ইহাতে মানবজীবনরস কালদেশাতিশায়ী শিল্পসৌন্দর্য লাভ করিতে পারে'।[১] আমরা যথাসম্ভব নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া সেই মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটকরচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের সূচনা দেখা গিয়াছে। তাঁহার পূর্বেই প্রতিভাবান নাট্যকারবৃন্দ বিভিন্ন নাট্যধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই সব নাট্যধারা আরও পুষ্ট করিয়া অগ্রগাতর পথে চালিত করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক অনেক প্রকারের নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অগ্রবর্তী পথিকৃতের সুনির্দেশিত পথ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর নাটক বিশেষ করিয়া 'নীলদর্পণ'-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত। করুণরসের প্রাবল্য, অকারণ মৃত্যুর আতিশয্য এবং চরিত্রের অতিরঞ্জন প্রভৃতি 'নীলদর্পণ'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি গিরিশচন্দ্রের নাটকে সমভাবে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবপুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে যে বীররসের পরিস্ফুরণ এবং স্বদেশী ভাবোদ্দীপন লক্ষ্য করা যায় গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকেও সেই সব বিশেষত্ব রহিয়াছে। ধর্মপ্রবণ বাংলা দেশে পৌরাণিক নাটকের অপ্রতুল দেখা যায় নাই, বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে হইলে পৌরাণিক নাটক লেখা দরকার গিরিশচন্দ্রও ইহা বুঝিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু হইতে রাজকৃষ্ণ রায় পযন্ত যে পৌরাণিক গীতাভিনয়, অপেরা প্রভৃতির ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাট্যক্ষেত্রও সেচন করিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক নাটকে তাঁহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা একেবারে যাত্রা কিংবা গীতাভিনয়ের স্তরে নামিয়া যায় নাই। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে বহুতর কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ বাঙালীর ন্যায় কৃত্তিবাসী

১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, ১ম সং. পৃঃ ৩৭৪

রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতই তাঁহার মানসিক সংস্কৃতি গঠন করিয়াছিল। এই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও ভাষা তাঁহার অনেক নাটকেই অবিকল অনুসৃত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মাইকেল মধুসূদন রাম এবং রাবণ চরিত্রের পরিকল্পনায় অভিনব মৌলিকত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের জন্য তিনি মধুসূদনকে অনুসরণ করেন নাই, এবং তাঁহার রাম, রাবণ-প্রভৃতি চরিত্র খাঁটি কৃত্তিবাসী চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে। স্বয়ং নাট্যকারও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।[১]

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেশীয় এবং জাতীয় ভাবই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। তবে বিদেশী ভাব ও সাহিত্যের আদর্শও তিনি কিছুটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে শেক্‌সপীয়রের নাট্যাদর্শই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] শেক্‌সপীয়রের ন্যায় তিনিও নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ সর্বত্র মানিয়া চলিয়াছেন। শেক্‌সপীয়রকে অনুসরণ করিয়া তিনি আদিম প্রবৃত্তির সংঘাত এবং প্রবল ভাবের (passion) আতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন। মানব সমাজে যত রকম অন্যায় ও দুষ্কৃতি আছে শেক্‌সপীয়র নির্ভীক লেখনীর দ্বারা সব কিছু অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন।[৩] গিরিশচন্দ্রও নাটকে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি সর্বরকম অপরাধ ও পাপ দেখাইয়াছেন। বিদূষক প্রভৃতির চরিত্রের উপরেও শেক্‌সপীয়রের Fool-এর প্রভাব পড়িয়াছে। শেক্‌সপীয়রের ন্যায়[৪] গিরিশচন্দ্রও লঘু ও হাস্যরসাত্মক ভাবপ্রকাশের জন্য গদ্য এবং গম্ভীর ও ওজস্বী বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন।

১। 'কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও দেখতে পাবে।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সাহিত্য'—কুমুদবন্ধু সেন, পৃঃ ৩৮

২। 'মহাকবি সেক্ষপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।'

ঐ, পৃঃ ৩৮

৩। শেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডিগুলির বিষয় সম্বন্ধে A. H. Thorndike বলিয়াছেন, Their themes are revenge, madness, tyranny, conspiracy, lust, adultery and jealousy. They abound in villainy, intrigue, and slaughter',

Tragedy, p. 185

৪। শেক্‌সপীয়রের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে A. W. Schlegel-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য— 'In the use of verse and prose Shakespeare observes very nice distinction according to the ranks of the speakers, but still more according to their characters and disposition of mind.'

Dramatic Art and Literature. P. 374

শেক্‌সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাটকে যেমন প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে, গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'কালাপাহাড' ইত্যাদি নাটকেও তেমনি অশরীরী ছায়ামূর্তির আবির্ভাব দেখান হইয়াছে। শেক্‌সপীয়রের সহিত এসব সাদৃশ্য সত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাঁহার নাট্যগুরুর আদর্শের গুরুতর প্রভেদ বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটক ধর্মভাব ও নীতিভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাঁহার নাটকের মধ্যে দেশের অন্তঃশায়ী ভাব ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত, এবং তাঁহার নাটকীয় রীতিও সর্বতোভাবে শেক্‌সপীয়রের অনুযায়ী নহে। সুতরাং সেক্‌সপীয়রের নাটকের সহিত তাঁহার নাটকের ঐক্য বেশি দূর পর্যন্ত অন্বেষণ করা সঙ্গত হইবে না।

ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়াই গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি সংস্কার করিয়াছিলেন। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারের গদ্য সংলাপ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে নিতান্ত আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ছিল। গিরিশচন্দ্রই নাটকীয় সংলাপ সর্বপ্রথম সচল ও সাবলীল করিতে সক্ষম হইলেন, নাটকীয় চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার পাইল। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও তাঁহার ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার অভাব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাট্যকারের ভাষায় যে wit এবং অপরূপ কারুকার্য লক্ষ্য করা যায় গিরিশচন্দ্রের ভাষায় তাহা নাই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রভৃতি যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক চরিত্রও তেমনি কলিকাতা অঞ্চলের ইতর ভা৹ (slang) ব্যবহার করে। গম্ভীর এবং মার্জিত ভাষার সহিত বৈপরীত্য দেখাইয়া নাট্যকার এই ভাষা হাস্যরস উদ্রেক করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তবে একই ধরনের চরিত্রের মুখে প্রত্যেক নাটকে একই ভাষা একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার গৈরিশী ছন্দ। অবশ্য তিনি এই ছন্দের সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা নহেন তাহা ঠিক; কারণ তাঁহার পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম পেঁচার নকসা'য়, ব্রজমোহন রায় 'দানব-বিজয' গ্রন্থে এবং রাজকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ সংস্কার এবং নাটকের উপযোগী করিয়া ইহার অমরত্ব দান করিয়া যান। তাঁহার পরেও বাংলা নাটকে ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা গিয়াছে। নাটকের পক্ষে দীনবন্ধু-ব্যবহৃত পয়ার এবং মাইকেল-প্রবর্তিত চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট অমিত্রাক্ষর

ছন্দ কোনোটাই অনুকূল নহে, কারণ ঐ দুই ছন্দে ভাবের দ্রুত এবং অবিরাম গতি সম্ভবপর নহে, কিন্তু গৈরিশী ছন্দের মধ্য দিয়া নাটকীয় ক্রিয়া এবং চরিত্র দ্রুতগতি চলিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়, এবং কথোপকথন কখনো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রের এই মৌলিক এবং নাটকীয় ছন্দের জন্যই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি গতানুগতিক একঘেয়েমি হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র যখন নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন তখন বাংলা দেশে হিন্দু ধর্মের গৌরবময় নবোত্থানের যুগ। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কালাপাহাড়ী দিনগুলি অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাময়িক চাঞ্চল্যও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙালী পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিজের ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণে ব্রতী হইয়া উঠিয়াছে। তখন হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভারতের পৌরাণিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনী বৈজ্ঞানিকভাবে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব অনুশীলনে নিরত রহিয়াছে। এইরকম সর্বজনীন ধর্মপ্লাবন গিরিশচন্দ্রের ধর্মভাবকে পরিপোষণ করিলেও, তাঁহার জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রভাব আসিয়াছিল ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুর্লভ সঙ্গ হইতে। অশেষ সৌভাগ্যক্রমে তিনি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং এই দুই মহাত্মা ধর্মনেতা তাঁহার মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমনি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমস্ত নাটকে ভক্তিভাবের অবারিত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।[১] 'বিল্বমঙ্গল'-এর পাগলিনী, নসীরাম, এবং 'কালাপাহাড়'-এর চিন্তামণি প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের উপর রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। 'জনা'র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরব' এর কঞ্চুকী, 'গৃহলক্ষ্মী'র অবধূত প্রভৃতি ধর্মমূলক চরিত্রগুলিও রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে কল্পিত হইয়াছে। 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল, 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর, 'বলিদানে'র কিশোর এবং 'শাস্তি কি শান্তি'র পাগল প্রভৃতি চরিত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম ও সেবাধর্মের মূর্তিমান আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ভক্তিমূলক কোনো বিশেষ চরিত্র নাটকের অঙ্গহানি করে না, এবং পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য দোষাবহ নহে। কারণ এই ধরনের নাটক ধর্ম ও ভক্তির আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্যই দর্শক আশা করিয়া থাকে।

১। গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'গিরিশ-প্রতিভায়' বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—পৃঃ ১৩০-২১৩ এবং ২৪১-৫৩ দ্রষ্টব্য।

'রূপ সনাতন', 'ধ্রুব-চরিত্র', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটকে ধর্মভাবের আধিক্য দর্শকের মনকে বরং আপ্লুত করে। কিন্তু যখন এই ধর্মভাব সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতি বাস্তব নাটকে সংক্রামিত হইয়াছে, তখনি ইহা নাটকীয় রসের পরিপন্থী হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং ধর্মাদর্শ গিরিশচন্দ্রের মনপ্রাণকে এমনিভাবে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাস্তব রাজ্যে স্থূল বিষয়ে তিনি তাঁহার দৃষ্টি অধিকক্ষণ নিবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না। বিভিন্ন স্রোতস্বিনী যেমন ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়াও অবশেষে একই সাগরে পরিণতি লাভ করে, তাঁহার নাটকের বিচিত্র ভাবও কিছুক্ষণ ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত হইয়া ধর্মের পারাবারে নিমজ্জিত হয়। মনে হয় বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য ধর্মশক্তির দ্বারা অমোঘভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সব নাটক কিছুক্ষণ দেখিয়াই তাহাদের সুনিশ্চিত পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের এই সর্বব্যাপী ধর্মভাব ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তাঁহার নাটককে আদরণীয় করিয়াছে, আবার বাস্তবনিষ্ঠ সমালোচকের কাছে ইহাকে দোষাবহ করিয়া তুলিয়াছে। এই ধর্মভাবের প্রাবল্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক', 'কালাপাহাড' প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা নষ্ট করিয়াছে, এবং সামাজিক নাটক 'শাস্তি কি শান্তি', 'মায়াবসান' প্রভৃতিকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছে। অনেক সময়েই তিনি পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার অভীষ্ট ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তাহার স্বরূপ নাটকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নাট্যকারকে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া দর্শকের মন অনেক স্থলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্রের এই প্রবল ধর্মভাব ও নীতিভাবের জন্য নাটকের চরিত্রগুলি তাহার মানসিক আদর্শ অনুযায়ী পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি তাহার নাটকে পাপী এবং পুণ্যাত্মা দুই রকম চরিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম ও নীতির জয় এবং গৌরব দেখাইবার জন্যই ইহাদের চরিত্র বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাপের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘটিয়া থাকে ইহা সাধারণ নীতিশাস্ত্রের কথা। ইহা প্রদর্শন করিয়া আমাদের নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে হয়তো পরিতৃপ্ত করা যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে শিল্পকলার সূক্ষ্ম নৈপুণ্য নাই। অবশ্য বড়ো সাহিত্যিক বিশ্বজনীন মানবনীতিকে কখনো অগ্রাহ্য করেন না বটে, কিন্তু সেই নীতি খুব গূঢ় এবং গভীর। সাধারণ মানুষের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা এবং পাপপুণ্যবোধ দ্বারা ইহার পরিমাপ করা যায় না। সেইজন্য অনেক সময়েই অপরাধী এবং পাপীও তাঁহার কাছে সহানুভূতি ও দরদ পাইয়া থাকে এবং ভয়াবহ পরিণতির

মধ্যে সব সময়ে তাঁহাদের চরিত্র পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। শাইলক নিষ্ঠুর নরাধম চরিত্র, কিন্তু তাহার চরিত্রও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, 'King Lear'-এর Edmund চরিত্র মানব সমাজের জঘন্য অপরাধে অপরাধী, কিন্তু তবুও মনে হয় যে সমাজের কাছ হইতে সে কেবল ঘৃণা ও ধিক্কার পাইয়াছে বলিয়াই সে সমাজের প্রতি এরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চরিত্রমাত্রই এরূপ জটিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলি নিতান্ত সরল ও সহজবোধ্য, হয তাহারা খুব ভাল অথবা নিতান্ত মন্দ। মন্দ চরিত্রগুলির পরিণতি হয় তাহাদের প্রাপ্য শাস্তিতে, অথবা তাহাদের আমূল পরিবর্তনে। গিরিশচন্দ্রের অনেক মন্দ চরিত্র কঠোর শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণাম লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত খুবই সৎ ও ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। 'হারানিধি'র মোহিনী, 'মায়াবসান'-এর যাদব ও মাধব এবং 'বলিদান'-এর মোহিত ও দুলাল প্রভৃতি এইভাবে ধর্মের স্পর্শ পাইয়া নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ পরিণতি দিতে না পারিয়াছেন, ততক্ষণ গিরিশচন্দ্রের ধর্ম ও নীতিবোধ সন্তুষ্ট হয় নাই। অনেক পতিতাচবিত্রও তাঁহার নাটকে সাধু ও ধর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোণা, কাদম্বিনী, গঙ্গা, সাহানা, চিন্তামণি প্রভৃতির নাম কবা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গিরিশচন্দ্র বার্নার্ড শ' এর ন্যায় পতিতা-সমস্যা[১] নিয়া আলোচনা কবেন নাই, এবং শরৎচন্দ্রেব ন্যায় পতিতার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেন নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া গিরিশচন্দ্র পতিত ও অভাজনে কৃপা করিবার মহৎ প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য লাঞ্ছিতা হতভাগিনী পতিতাদিগকে ধর্মপথে নিয়োজিত করিয়া তিনি তাহাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় বিধান করিয়াছেন।[২] সোণা, গঙ্গা, চিন্তামণি প্রভৃতি সকলেই ধর্ম আশ্রয়

১। বার্নার্ড শ' 'Mrs. Warren's Profession' নাটকে পতিতাবৃত্তির অর্থ নৈতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

২। রঙ্গালযেব মধ্য দিযা গিরিশচন্দ্র পতিতাদেব জীবন পরিশোধন কবিতে চেষ্টা করিতেন। 'অভিনেত্রীর কটাক্ষ' নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'নালার জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়া গঙ্গাজল হইয়া যায়। পবশমণি স্পর্শে ব্যাধ-গৃহের লোহাও কাঞ্চনে পবিণত হয়: সাধুসঙ্গে কুচরিত্রা সন্ন্যাসিনী হন; ভগবদ্ভক্ত হরিদাসকে ছলনা করিতে গিয়া বেশ্যা মোহিনী পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিল। আমাদেরও আশা, সদাশয় ব্যক্তির পদার্পণে রঙ্গালয় পবিত্র হইবে, ও ঘৃণিত অভিনেত্রীরাও স্বীয় শিল্পানুরাগিণী মাতৃদুগ্ধে পুরিপুষ্ট বৃত্তি পরিহারপূর্বক সাধুজনের কৃপার ভাজন ও প্রশংসার পাত্রী হইবে।'

করিয়া তাহাদের বেশ্যা-জীবনের কলুষ এবং কলঙ্ক ধৌত করিবার বাসনা করিয়াছে। সুতরাং পতিতাদের প্রতি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি পতিতাপাবক মহাপ্রাণের দৃষ্টির সহিত অভিন্ন। পতিতাজীবনের প্রেম এবং সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সংঘাত, সেই জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি গিরিশচন্দ্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চান নাই। যে সব পতিতা নাট্যকারের অনুকম্পা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলকেই মানবীর দুর্বলতার উর্ধ্বে অবস্থিত ধর্মব্রতী সন্ন্যাসিনী। কেবল 'মোহিনী-প্রতিমা'র গিরিশচন্দ্র সাহানাকে ধর্মার্থিনী যোগিনী না করিয়া তাঁহার জীবনের অতি মধুর অথচ বেদনাময় স্পর্শটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাহানা তাহার প্রেমাস্পদকে অন্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া যে চরম আত্মত্যাগ করিল তাহাতে তাহার চরিত্র নিতান্ত ট্র্যাজিক অথচ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। সাহানা শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, বিজলী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চরিত্রকে মনে করাইয়া দেয়। নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও নাটকাদি আলোচনা করিলেই মনে হয় যে জীবন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর ও দার্শনিক ধারণা ছিল। তাঁহার তত্ত্বসন্ধিৎসু চিত্ত জীবনের সব সমস্যার মূল অনুসন্ধান করিয়াছিল। তাঁহার ধর্মপ্রবণতা এবং সাধুসঙ্গ তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে আরও বেশি জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য জীবনের হাল্কা এবং হাস্যতরল দিকটা, রামধনু বিচিত্র রঙের ছটার ন্যায় যাহা গুরুগম্ভীর জলভারানত মেঘের উপরিভাগ ক্ষণকালের জন্য রঞ্জিত করিয়া রাখে—গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার কোনো যোগ ছিল না।[১] দীনবন্ধু কিংবা অমৃতলালের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেইজন্য জীবনের পরিহাস-মধুর, চপল-চটুল মুহূর্তগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। করুণরস অথবা ভক্তিরসের গম্ভীর এবং সমাহিত ধ্বনি তাঁহার সমস্ত নাটকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।[২] সেইজন্য প্রাণ খুলিয়া তিনি কখনো হাসিতে ও হাসাইতে পারেন নাই। তাঁহার

১। 'গিরিশচন্দ্রের কল্পনা উচ্চ ধ্যানে ও উচ্চ আদর্শ চিন্তায় সর্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকিত। এজন্য প্রহসনের নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে চাহিত না।'

গিরিশচন্দ্রের জীবনী—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

২। গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনকে বলিয়াছিলেন—'আমার dramaগুলো light নয়, serious moodএ seriously think না করলে সব বুঝতে পারবে না। superficially আমার drama পড়া চলবে না।'

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য', পৃঃ ৭৩

নাটকের মধ্যে যেখানে একটু আধটু হাসির অবকাশ আছে, সেখানে আমাদের অতি সন্তর্পণে থাকিতে হয়, কি জানি আমাদের লঘু চাপল্যের জন্য কখন নাট্যকার রক্তচক্ষু হইয়া তাঁহার গুরুভাবের লগুড় দ্বারা আঘাত করিয়া বসেন। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের হাস্যরসের তারল্য ধর্মভাবের প্রাবল্যে সমাধি লাভ করিয়াছে। তিনি যে পঞ্চরংগুলি (Extravaganza) লিখিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কদর্য রসিকতা আছে, কিন্তু বিমল হাস্যরসের স্নিগ্ধ ধারা নাই।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দোষত্রুটি থাকিলেও তাহাতে অকপট আন্তরিকতার অভাব কেহই লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন, অকুণ্ঠ লেখনীর মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[১] ধর্মগুরুর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাটকে ধর্মভাবের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, আবার বেশ্যা-সংসর্গেও বাস করিতে হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের কথাও তিনি লিখিয়াছেন।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষ এবং পরিণতি হইয়াছে পৌরাণিক নাটকে। নাটকের মধ্য দিয়া যে ধর্মমূলক পৌরাণিক আদর্শ প্রচারণের ব্রত তিনি 'রাবণবধ'-এ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছিলেন 'তপোবল'-এ। গিরিশচন্দ্র সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক নাটকে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ যেমন উল্লসিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কোথাও হয় নাই। সাধারণ বাঙালীর প্রাণধারার সহিত তাঁহার মানসভঙ্গির এমন একটা নিবিড় অকপট সঙ্গতি ছিল যে নাটক লিখিতে যাইয়া ব্যবসায়ের অঙ্কুশ-আঘাতে তাঁহাকে অবহিত থাকিতে হয় নাই, এবং তাহাতেই তৎকালীন দর্শকের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের মানসিক ভাব-প্রবাহের ক্রমবিকাশ যদি আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করি, তবে ইহা লক্ষ্য করিব যে আশৈশব পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল প্রভাবে তাঁহার মনে পৌরাণিক আদর্শ চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া

১। 'আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিই নি। যেটা feel করছি, যে সত্য practical life-এ realise করেছি,' যা জীবনে মরণে পরম সত্য ব'লে জেনেছি তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।'

'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যসাহিত্য'—পৃঃ ৭৩

যায়। বাল্যকালে তিনি খুল্লপিতামহীর কাছে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের নানা কাহিনী আগ্রহশিক্ত কৌতূহলের সহিত শুনিতেন।[১] বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই সব কাহিনী এবং গল্প সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যাত্রা, কথকতা, হাফ-আখড়াই প্রভৃতির রস-উপভোগের মধ্য দিয়া তাঁহার ধর্মানুরাগ এবং ভক্তিপরায়ণতা পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে তিনি বিদেশী ভাবধারাবাহিত নানা মত ও তত্ত্বের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রসধারার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল যাত্রা, পাঁচালী ও কথকতার মধ্য দিয়া, তাহা তাঁহার মনপ্রাণের সহিত এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে, যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতেই সেই রসধারা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মনোমোহন বসু হইতে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত অনেক নাট্যকার বহুতর অপেরা, গীতাভিনয় প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙালী দর্শকগণ তাহাদের ধর্মালু ভাবোন্মাদনা চরিতার্থ করিবার জন্য এই সব অনুল্লেখ্য নাটকের অবাধ প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'।[২] তিনি 'নাট্যকার' নামক প্রবন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন যে, রচয়িতাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এই বিধান অনুযায়ী তিনি ভারতের দেশীয় ভাবধর্মের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন এবং দেশীয় জনসাধারণের মনে অক্ষয় আসন লাভ করিয়াছিলেন। আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, গিরিশচন্দ্রের যুগ—ধর্মমূলক জাতীয়তার যুগ। দেশের মন তখন হিন্দুধর্ম ও পুরাণ প্রভৃতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, এবং পৌরাণিক কাহিনী, উপাখ্যান প্রভৃতির প্রতি লোকে আগ্রহ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক অতি সহজেই সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক লোকের কাছে সমাদর লাভ

১। গিরিশচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন--'গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করিয়া বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁহার [illegible] বসিয়া সেই সকল গল্প শুনিতেন এবং উহা তাহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পৌরাণিক চিত্রসকল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে।'

গিরিশচন্দ্র—পৃঃ ১৮

২। 'পৌরাণিক নাটক'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

করিলেই সমালোচনার শাশ্বত কষ্টিপাথরে চিরন্তন মূল্য নির্ধারিত হইয়া যায় না। দাশরথি রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবি একদিন সাহিত্যের আঙ্গিনা জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক সমালোচনায় তাঁহাদের সেখান হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের বহু সমাদৃত পৌরাণিক নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কি তাহা আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করা উচিত।

পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার পুরাণ অথবা প্রাচীন কোনো ধর্মগ্রন্থ হইতে কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। সাধারণত এইসব কাহিনী বহু প্রচলিত এবং অন্যান্য বহুতর গ্রন্থে আশ্রিত, সুতরাং এই সব নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো অভিনব মৌলিকত্ব নাই। গিরিশচন্দ্র প্রাচীন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থে অটুট আস্থাবান ছিলেন, সেইজন্য কোনো কাহিনীর রূপান্তর করিয়া তিনি নাটকের উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা কি আখ্যান কথোপকথনের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিলেই তাহা নাটক হইল না। নাটকের মধ্যে একটা জটিল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। যে নাটকে দ্বন্দ্ব সংঘাত নাই, যেখানে কোনো বিশেষ দেবমাহাত্ম্য অথবা ধর্মভাব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে শুধু থাকে তাহা নাটক নয়, যাত্রা। যাত্রার মধ্যে কোনো চরিত্রের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ নাই, সেখানে দেবতা ও মানবের সীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবতারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করিয়া থাকেন। সেজন্য ইহাতে মানব-জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা দেখিয়া দর্শক হৃষ্ট অথবা দুঃখিত হইতে পারে না। যাত্রার উদ্দেশ্য লোকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করা সুতরাং ধর্মভাবের পরিপূর্তির জন্যই লোকে যাত্রা দেখিতে যায়; মানব-জীবনের জটিল সমস্যার পরিচয় পাইতে যায় না। সুতরাং যে পৌরাণিক নাটকে কোনো ভাব অথবা ভক্তিরই প্রাধান্য, যেখানে ঘটনা চমৎকারী এবং চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমূলক নয়, তাহা যাত্রার স্তরে অবনীত হইয়া পড়ে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহ আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে সেইগুলি অনেকাংশে যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত। যাত্রার ন্যায় তাঁহার নাটকেও ভক্তিরসের প্রাবল্য, এবং অলৌকিক, অপ্রাকৃত ব্যাপারে অবাধ সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকের চরিত্রগুলিরও কোনো স্বাধীন, স্বতন্ত্রসত্তা ফুটিয়া উঠে নাই, তাহাদের ক্রিয়াকর্ম নিরন্তর কোনো ধর্মভাব অথবা দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 'জনা' নাটকের জনাচরিত্র ও 'পাণ্ডবগৌরব'-এর

ভীম প্রভৃতি দুই একটি ভূমিকা স্বাধীন ক্ষমতা ও আত্মনিষ্ঠার দ্বারা জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের শেষ পরিণতি যাত্রার অনুরূপ হইয়াছে। এই সমস্ত নাটক দেখিয়া ধর্ম ও ভক্তির মহিমা এবং পাপ ও অধর্মের পরাভব সম্বন্ধে দর্শকের শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে কখনো মনে করিতে পারে না ইহাদের সহিত তাহার পার্থিব জীবনধারার কোন সংযোগ আছে। ইহাদের চরিত্র তাহার মনের আবেগতন্ত্রীগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না। সে সব সময়েই মনে করে যে চরিত্রগুলির অদৃষ্ট সুনির্ধারিত রহিয়াছে, কোনো ঘটনা-বিপর্যয়ের কিংবা চরিত্রের কোন অভিনব বৃত্তির পরিস্ফুরণে সেই অদৃষ্টের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। গিরিশচন্দ্র চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছেন, ইহাদের মানবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধর্মজীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি লইয়া তিনি চমৎকারভাবে নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু নানা অপ্রাকৃত ও অতিলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিনি ইহাদের চরিত্র মানবীয় কৌতূহল ও ধারণার অতীত করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্য এই চরিত্রগুলি নাটকীয় রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে নাই। এই সব নাটক পাশ্চাত্য দেশে Miracle Play-র সদৃশ, ধর্মভাব প্রচারই ইহাদের মূল লক্ষ্য। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার ভাষা ও ছন্দে এবং দুই এক প্রকার অভিনব চরিত্রসৃজনে। গৈরিশী ছন্দের মধ্যে এমন একটা নাটকীয় গতি ও ব্যঞ্জনা আছে, যাহা অনিবার্যভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কনেও নাট্যকার নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সব কারণে তাঁহার পৌরাণিক নাটক একেবারে যাত্রার স্তরে নামিয়া যায় নাই, ইহা যাত্রা ও প্রকৃত নাটকের মাঝামাঝি স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলি আলোচনা করিলেই ইহাদের মধ্যে দুইটি সুস্পষ্ট স্তর সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। প্রথম স্তরের নাটকগুলির বিষয় তিনি রামায়ণ, মহাভারত অথবা অন্য কোনো পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়া অবিকল সেই সব কাহিনীর নাট্যরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। এই সব নাটকের মধ্যে ভক্তির অতিশয্য প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নিজেকে ধরা দিয়া ফেলেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের নাটকগুলির মধ্যে ভক্তিরসের প্রাবল্য এবং গ্রন্থকারের নিজের ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক সঙ্গ লাভ করিবার পর হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকের এই দ্বিতীয় স্তরের সূত্রপাত। শ্রীযুক্ত

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই যুগকে 'নামভক্তি প্রচারের যুগ' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই যুগের নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর অনুবর্তন নাই। কোনো মহাপুরুষের লীলা উপলক্ষ করিয়া ধর্মতত্ত্ব প্রচারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথম স্তরের নাটকগুলির মধ্যে 'রাবণ-বধ', 'সীতার বনবাস,' 'লক্ষ্মণ-বর্জন,' 'সীতার বিবাহ,' 'রামের বনবাস' এবং 'সীতাহরণ'—এই কয়েকখানি নাটক কৃত্তিবাসী রামায়ণের যথাযথ অনুসরণে রচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গিরিশচন্দ্রের কাছে কত প্রিয় ছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণের কাহিনী গ্রহণ করিতে যাইয়া তিনি কৃত্তিবাসের ভাব ও ভাষাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঘটনা সংস্থাপনের কোনো কৃতিত্ব, কিংবা চরিত্রসৃষ্টির কোনো বৈচিত্র্য তাঁহার নাই। তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণ-বধ' (১৮৮১) রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং সমালোচকরাও একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু 'রাবণ-বধ'-এর রাম, রাবণ প্রভৃতি চরিত্র সব কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে অঙ্কিত। রাবণের দর্প, তেজস্বিতা, প্রচ্ছন্ন ভক্তি—এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কৃত্তিবাসে যেমন আছে, গিরিশচন্দ্রেরও তেমনি রহিয়াছে। 'রাবণ-বধ'-এর ঘটানর পারম্পর্যও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া নাট্যকার হুবহু রক্ষা কবিয়াছেন। 'রাবণ-বধ' নাটকের মধ্যে সীতার অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্য অবান্তর এবং রস-পরিপন্থী হইয়াছে। রাবণকে ঘিরিয়া যে আগ্রহ ও কৌতূহল নাটকের মধ্যে গড়িয়া উঠে, রাবণেব মৃত্যুতে তাহার অবসান হয়। সীতার অগ্নিপবীক্ষার দৃশ্যে পুনরায় দর্শকেব মনে আগ্রহ ও উদ্বেগ উদ্রেক করা উচিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র এইখানে সূক্ষ্ম নাট্যকলাব পবিচয় দেন নাই। 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৮২) নাট্যকার কৃত্তিবাসের অনুবর্তন করিয়াছেন। সীতাকে বনবাসে প্রেবণের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ, সীতা ও লব-কুশের অযোধ্যায় গমন, এবং অবশেষে সীতার পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা যেমন রামায়ণে আছে, গিরিশচন্দ্রও তেমনি নাটকের সহিত বজায় রাখিয়া বর্ণনা করিয়া গিযাছেন। নাট্যকার চরিত্র ও ঘটনার কোনো নাটকীয় স্থল বিশেষভাবে রঞ্জিত করিয়া তোলেন নাই। সেইজন্য কাহিনীর মধ্যে কোনো চমৎকারিত্ব নাই। তবে ঈর্ষাপীড়িত রামেব চরিত্র ভালোভাবে দেখান হইয়াছে বটে। 'লক্ষ্মণ-বর্জন' (১৮৮২) নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অনুল্লেখ্য নাটক। 'সীতার বিবাহ'-এর মধ্যে নাট্যকারের কথঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে, কারণ এই নাটকে ভৃত্য, সৈন্য, পুরস্ত্রী প্রভৃতি ইতর লোকের মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃজনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে কোনো নাটকে

এই ভাবে হাস্যরস প্রবর্তন করা হয় নাই। সীতা ও রতির কথোপকথনও গ্রন্থকারের নিজস্ব সৃষ্টি। 'রামের বনবাস'-এও (১৮৮২) এতো বিভিন্ন ঘটনার শিথিল সমাবেশ যে, কোনো একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নাটকীয় রস জমাট হইয়া উঠিতে পারে নাই। দশরথের আক্ষেপ এবং নাটকের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটকীয় সংস্থান, তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পুত্র-বিচ্ছেদাকুল, নিরুপায়-দুঃখকাতর দশরথের চিত্র কৃত্তিবাসও অতি মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই নাটকেই সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্র হাস্যরসাত্মক চরিত্র কঞ্চুকীকে আনয়ন করিয়াছেন। অবশ্য ঐ চরিত্র এখানে অপরিস্ফুট, সে নিতান্তই অবজ্ঞেয় হাস্যাস্পদ ভাঁড়, নিজের স্থূল অসঙ্গতি দিয়া সে সকলের মনে অনুকম্পামিশ্রিত হাসির উদ্রেক করে। 'সীতাহরণ'-এও (১৮৮২) ঘটনাগুলি ঘটিয়া গিয়াছে মাত্র, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে জমিয়া উঠে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠকমাত্রই নাটকখানির আদ্যন্ত না পড়িয়াই ধারণা করিতে পারেন। নাটকের মধ্যে লক্ষণীয় চরিত্র হইল শূর্পণখার। শূর্পণখার কথাগুলি অত্যন্ত চমকপ্রদ—

নিটোল দুটো ছোঁড়া গো
নিটোল দুটো ছোঁড়া!
খালি বিষের গোড়া গো
খালি বিষের গোড়া।

এই ধরনের ছড়ার মত কথা তাঁহার মুখে দিয়া নাট্যকার এই চরিত্রটিকে বড়ই সরস করিয়া তুলিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পাত্র-পাত্রীর ভাষা প্রয়োগ করিবার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলেন। তাঁহার গৈরিশী ছন্দ কেবল গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে; তরল হাস্যরসাত্মক ভাবের জন্য হয় গদ্য অথবা সমিল কোনো চপল ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র রামায়ণ-কাহিনী লইয়া যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাম-চরিত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামের ন্যায় তাঁহার রামও সত্যসন্ধ, ভক্তবৎসল, ক্ষমা ও করুণার অবতার; বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামের ন্যায় তিনি কুলিশ-কঠোর, মহাশক্তিধর বীর-পুরুষ নহেন। গিরিশচন্দ্রের সীতাও কৃত্তিবাসের সীতার ন্যায় নবনীত-কোমলা, লাবণ্য ও কারুণ্যের ঊর্মি নিতান্ত বাঙালী ললনা।

'অভিমন্যু-বধ' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এই দুইখানা নাটক গিরিশচন্দ্র মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। 'অভিমন্যু-বধ'

(১৮৮১) তাঁহার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটকসমূহের অন্যতম। বীররস এবং করুণ-রসের এইরূপ একত্রিত পরিস্ফুরণ তাঁহার খুব কম নাটকেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। নাটকের প্রথম ভাগে সুভদ্রা ও উত্তরার আশঙ্কা, গণকের অমঙ্গল গণনা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কৃষ্ণ ছায়াপাত করিয়া দর্শকের মন আগ্রহ ও উদ্বেগে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে উত্তরার কাতর মিনতি ট্রোজান বীর হেক্টরের পত্নী অ্যাণ্ডোম্যাকির করুণ আলাপের সহিত সাদৃশ্য জাগাইয়া দেয়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধাচারী, পুরুষকারের প্রত্যক্ষ আধার, সিংহশাবকসম সমরে দুর্বার অভিমন্যু যখন অন্যায় সমরে অসহায়ভাবে ভূপতিত হয় তখন দর্শকের ভাবাবেগ সম্বরণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য খুবই বীর-রসাত্মক হইয়াছে। বোধ হয় একমাত্র 'অভিমন্যু-বধ'ই পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ট্র্যাজিক অথবা বিয়োগান্তক হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ক্রোড় অঙ্ক অথবা কোনো স্বর্গীয় দৃশ্যের দ্বারা ইহার ট্র্যাজেডি নষ্ট হয় নাই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে কীচক বধ ও কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ এই দুইটি প্রধান ঘটনা। প্রথম অংশে ভীম মুখ্য চরিত্র এবং দ্বিতীয় অংশে অর্জুন। দ্রৌপদীর ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত ও চরিত্রগুলিকে চালিত করিয়াছে। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মূল চরিত্র দক্ষ অনমনীয় দৃঢ়তা, পুরুষ কাঠিন্য ও সুকঠোর সঙ্কল্পে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই নাটকখানার উপর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এমন কি কোনো কোনো পংক্তিতে পর্যন্ত এই প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'কে-রে, দে-রে সতী দে আমার' ভারতচন্দ্রের প্রসিদ্ধ অংশ 'সতী দে দে দক্ষ দে রে সতী' ইত্যাদির প্রতিধ্বনি মাত্র।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় স্তরের পৌরাণিক নাটকে যে ভক্তি-বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার আভাস 'ধ্রুব-চরিত্র'-এ লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রথমে বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্বেই 'রামের বনবাস'-এ এই ধরনের কঞ্চুকী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'ধ্রুব-চরিত্র' এবং 'নল-দময়ন্তী'র বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অনুরূপ মূর্খ, ঔদরিক ও রাজার প্রেমব্যাপারে সহায়ক। কিন্তু 'শ্রীবৎস-চিন্তা'র বাতুল হইতে এই ধরনের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বাতুল, 'অশোক' নাটকের আকাল, 'জনা'র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর কঞ্চুকী, 'চণ্ড' নাটকের পূর্ণরাম ভাট চরিত্রগুলির গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। ইহারা ইতর গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, বাহ্যত ইহারা মূর্খ ও নির্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও

বস্তুত, ইহারা সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ও অনুভূতি-প্রবণ, এবং ইহাদের তরল হাস্যোদ্দীপক কথার অন্তরালে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটাগুলি গুপ্ত হইয়া থাকে। এই সব চরিত্রের সহিত শেক্‌সপীয়রের Fool অথবা Jester-এর সাদৃশ্য আছে।[১] গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রচ্ছন্ন ভক্তিভাবে আগাগোড়া অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে। বাতুলের লক্ষ্মী-নিন্দা এবং 'জনা'র বিদূষকের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ ব্যাজস্তুতি বই আর কিছুই নয়।

'কমলে-কামিনী' চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিশেষত্বহীন নাটক। 'নল-দময়ন্তী' (১৮৮৭), এবং শ্রীবৎস চিন্তা'র কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রথমখানিতে নল কলির দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়খানিতে শ্রীবৎস শনির দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। দুই নাটকের পরিণতিও একইরূপ মিলনাত্মক হইয়াছে।

'শ্রীবৎস-চিন্তা'য় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের যুগ শেষ হয়, এবং তাহার পরে তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন সেইগুলি ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা চলে না, কারণ সেই সব নাটকের অধিকাংশ মূল চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক পুরুষ, তবে ভক্তিরসই তাহাদের প্রাণ। সেইজন্য এই নাটকগুলিকে ভক্তিমূলক নাটক বলা সঙ্গত। অবশ্য এই যুগে 'প্রভাস-যজ্ঞ,' 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব' প্রভৃতি কয়েকখানা পৌরাণিক নাটক আছে বটে, কিন্তু এই সব নাটকের সহিত পূর্বস্তরের পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য আছে। পূর্বেকার নাটকগুলিতে নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীকে কোনো প্রকারে রঞ্জিত কিংবা বিশেষ রসে সিক্ত করেন নাই, কিন্তু এই যুগের নাটকের কাহিনী সর্বত্র উচ্ছ্বসিত ভক্তিরসে প্লাবিত, নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকারের ভক্তিবিহ্বল চিত্তই যেন অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলেই গিরিশচন্দ্রের নাটকের এই রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।[২] 'চৈতন্য-লীলা' এই প্রভাবের পূর্বে লিখিত হইলেও এইখান হইতেই ভক্তিরসের সূচনা হইয়াছে।

১। 'Shakespeare's fools along with somewhat of an overstraining for wit, which cannot altogether be avoided when wit becomes a separate profession, have for the most part an incomparable humour, and an infinite abundance of intellect, enough indeed to supply a whole host of ordinary wise men.'

Dramatic Art and Literature by Schlegel, p. 373

২। গিরিশচন্দ্র লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা অবলম্বন করিয়া 'চৈতন্য-লীলা' (১৮৮৬) রচিত হইয়াছিল। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও[১] ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার মধ্যে নাটকত্ব খুব কম আছে। চৈতন্যদেবের মানবীয় লীলা বঙ্গের জনসাধারণকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নাট্যকার তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির আধার—ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নাটকীয় কৌতূহল নষ্ট করিয়াছেন। মনে হয় চৈতন্যের বাল্যলীলা গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্য-ভাগবত' অনুসরণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাপ, কলি, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া নাট্যকার সম্ভব অসম্ভব সমস্ত সীমার পরপারে এক ধ্যানগ্রাহ্য জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। 'চৈতন্য-লীলার দ্বিতীয় ভাগ 'নিমাই-সন্ন্যাস'-এ সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। হয়তো বিচ্ছেদে নাটকের শেষ হয় ভাবিয়া নাট্যকার সর্বশেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই-এর 'ভাব-সম্মিলন' করাইয়াছেন। 'নিমাই-সন্ন্যাস'-এ গুরুতত্ত্বের আলোচনা খুব বেশি, সেইজন্যে সাধারণ দর্শক সর্বত্র ইহার রস গ্রহণ করিতে পারে না। 'রূপসনাতন' (১৮৮৮) নাটকে গোস্বামিপ্রবর সনাতনের ভক্তিতন্ময়তা ভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয় দ্রাবিত করে সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় স্তরের ধর্মমূলক নাট্যরচনার সময় তিনি ধর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। ধর্মার্দ্রচিত্তে তিনি নানা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। সেইজন্য এই সব বিষয়ের আলোচনা তিনি নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রকম আলোচনা 'নিমাই-সন্ন্যাস' হইতে আরম্ভ হইয়া 'শঙ্করাচার্য'-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের পুণ্য প্রভাবে তিনি পাপী ও পতিতাদের প্রতিও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেজন্য হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণদ্বেষী হইয়াও কৃষ্ণের চরণরেণু পাইবার অভিলাষী। প্রহ্লাদের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং 'প্রভাস-যজ্ঞ'-এ রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক নীতিবিগর্হিত সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মহিমময় করার চেষ্টা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে উদারতা ছিল, 'যত মত তত পথ'—এই মন্ত্রের সাধকের কাছে এই উদারতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ—সব কিছু সম্বন্ধে তিনি নাটক রচনা

১। 'চৈতন্য লীলার অভিনয় দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে নাচিয়া উঠিয়াছিল।'
'গিরিশচন্দ্র'—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৯

করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেব-চরিত'-এ বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া দেখান সত্ত্বেও সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের spirit বজায় রাখা হইয়াছে।

।। বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮) ।। 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বাধিক জনসম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'বিল্বমঙ্গল, Shakespeare-এরও উপরে গিয়াছে, আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।' 'বিল্বমঙ্গল' যে একদিন বাঙালী দর্শকের চিত্তে এতখানি অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই নাটকখানির নাট্যোৎকর্ষ নহে, কারণ 'বিল্বমঙ্গল'-এ নাট্যগুণের অভাব না থাকিলেও কোনো অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্য ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ইহার জনপ্রিয়তার কারণ সন্ধান করিতে হইবে দর্শকদের মানস-প্রকৃতি ও যুগানুগত প্রবণতার মধ্যে। ধর্মপ্রাণ বাঙালী ধর্মসাধনায় জ্ঞান-নিষ্ফল অপেক্ষা প্রেমাশ্রমুকুল খাইতেই অনেক অধিক আসক্তি দেখাইয়াছে। এই প্রেমাশ্রমুকুলের আস্বাদনা রহিয়াছে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে। এইজন্য এই নাটক প্রেমাপ্লুত-ভক্ত বাঙালী-হৃদয়ে এতখানি উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অলৌকিক আকর্ষণেই সমাজ-মন যখন ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হইয়াছে তখন মানুষের সংসার-লীলা অপেক্ষা বৈরাগ্য-লীলাই যে তাহার কাছে অধিকতর সত্য ও জীবন্ত মনে হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। যেদিন হইতে সমাজ-মন পুনরায় বস্তুমুখী হইয়াছে সেইদিন হইতেই 'বিল্বমঙ্গল'-এর সমাদর কমিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে নাট্যকারের ব্যক্তিসত্তা কখনও নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। তাঁহার গভীরতম মর্ম হইতে অনুভূতির অবিরত আবেগধারাই নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইত, সুতরাং এই সব নাটক নাট্যকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় ধর্মজীবনের আলেখ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'বিল্বমঙ্গল'-এর কাহিনী তিনি 'ভক্তমাল' হইতে লইয়াছিলেন সত্য কিন্তু ইহা কি তাঁহারই আত্মকাহিনী নহে? নাট্যকার বিল্বমঙ্গলের মতই ভোগাসক্ত ছিলেন, বিল্বমঙ্গলের মতই তিনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার মানসিক ব্যাকুলতা নিজের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন, 'বন্ধু-বান্ধবহীন চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম ঈশ্বর কি আছেন, তাহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও।'

বিল্বমঙ্গলের মতই তিনি অবশেষে সদ্‌গুরুর কৃপায় পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের অহেতুকী কৃপার ফলে লম্পট ও পতিতাও ত্রাণ পাইয়া যায়, ইহাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের অনুভূত বাস্তব সত্য। সেই সত্যই তো তিনি প্রকাশ করিয়াছেন বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্রে। পাগলিনী চরিত্র যে পরমহংসদেবের লীলাকীর্তন করিয়া লিখিত, তাহাও অতি স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'গিরিশ-প্রতিভা'য় লিখিয়াছেন যে, 'এক পাগলী প্রায়ই রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসিত, রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই পাগলীই বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে।'

পরমহংসদেবের আদর্শ এখানে যে স্ত্রী-চরিত্রে কল্পিত হইয়াছে তাহা অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ তাঁহার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি-ভাবের সমান বিকাশ হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গলের মধ্যে যে বৈষ্ণব-ধর্ম-সাধনা মুখ্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত গিরিশচন্দ্রের কতখানি অন্তরের যোগ ছিল সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। ধর্মবিশ্বাসে গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব ছিলেন কি, শাক্ত ছিলেন সে বিচার নিরর্থক, কারণ আর পাঁচজন বর্তমান বাঙালীর ন্যায় তিনি শাক্ত ছিলেন আবার বৈষ্ণবও ছিলেন। তবে বৈষ্ণবধর্মের প্রেমাপ্লুত ভক্তি-বন্যার প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে; 'চৈতন্য-লীলা', 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব' প্রভৃতি নাটক দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'বিল্বমঙ্গল'-এর ধর্মতত্ত্বই মুখ্য। কিন্তু সেই ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ কি সে আলোচনা এখন করা আবশ্যক। নাটকখানি প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটকরূপে কথিত হইয়াছে, এই প্রেম ও বৈরাগ্য কথা দুইটির মধ্যে নাটকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সংসার-বৈরাগ্যের মহিমা ইহাতে দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ সাধারণত সংসারের বাহিরেই ধর্মপথের আরম্ভ। আসলে আলোচ্য নাটকের মূল ভাববস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে প্রেমতত্ত্বটিকে অবলম্বন করিয়া। ধর্মসাধনার মধ্যে প্রেমতত্ত্বের অবতারণা আমাদের কাছে নূতন নহে। মহাপ্রভুর রাগানুগা ভক্তি বাঙালীর মানসক্ষেত্রে এক নবায়িত ভক্তির আলোকপাত করিয়াছে, সেই আলোকে ভগবানের প্রেম-মাধুর্যমণ্ডিত রূপ চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। সেই প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের আরাধ্য দেবতা। বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, বণিক, অহল্যা, পাগলিনী সকলের কাছেই ভগবানের এই প্রেমরূপই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। বিল্বমঙ্গল সখারূপে,

অহল্যা মাতৃরূপে ও পাগলিনী প্রণয়িনীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রাগের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য পাগলিনীর মধ্যে শুধু কেবল রাগ নহে তত্ত্বেরও সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলার সহিত যাহাদের পরিচয় রহিয়াছে তাহারা সহজেই পাগলিনীর আপাত-অসংলগ্ন উক্তির রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত মর্মে পৌছিতে পারিবে, কিন্তু তত্ত্বের জন্য নহে, চরিত্রটির আর্তি ও অভিমান-জড়িত লীলাময় ভাবের জন্যই ইহা এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সোমগিরি বিল্বমঙ্গলের গুরু হইয়াও কৃষ্ণকে সহজে পান নাই অথচ বিল্বমঙ্গল অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণের অহেতুকী কৃপা লাভ করিলেন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে অবারিত প্রেমের মন্দাকিনী বৈকুণ্ঠ অভিমুখে চলিয়াছে তাহার পরিপূর্ণ সন্ধান তিনি পান নাই, সেই সন্ধান পাইয়াছেন বিল্বমঙ্গল। সেইজন্য কৃষ্ণের সন্নিধানে পৌছিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু শুধু প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপ নহে, ইহার বাস্তব মানবিক রূপও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে দেখান হইয়াছে। সেজন্যই এই প্রেমতত্ত্ব এত জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ। চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের যে প্রেম তাহা গভীরতম পার্থিব প্রেমের দৃষ্টান্ত। বিল্বমঙ্গল বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াও সেই প্রেম অন্তর হইতে বিসর্জন দেন নাই, অবশ্য পার্থিব প্রেম তখন অপার্থিব জগতের সন্ধান পাইয়াছে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রেমের এই ক্রমবিকশিত রূপ মানব-প্রেমের ভাবগত প্রেমে মুক্তি, ইহাই নাটকের প্রেমতত্ত্বটির প্রকৃত পরিচয়।

নাটকের মূল তত্ত্ববস্তুটি নায়ক বিল্বমঙ্গলের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তাহারই পরিপূরক পটভূমি রচিত হইয়াছে অন্য চরিত্রগুলির ভাব ও আচরণের দ্বারা। বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝা যাক। প্রথমেই চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের আসক্তি। এই আসক্তি এত তীব্র যে তাহার ধর্মাধর্ম, মানমর্যাদা সব ইহাতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুর্বার মোহের আকর্ষণে যখন সে প্রবল দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত তখন পাগলিনী তাহার চৈতন্য জাগ্রত করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের হৃদয়-মন জুড়িয়া চিন্তামণির রূপের দীপ্তি-জ্বালা, পাগলিনী তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। কিন্তু যাহার জন্য এই দুর্নিবার মোহ তাহার কাছেই আঘাত খাইয়া ইহা বেদনা ও বৈরাগ্যে মর্মরিয়া উঠিল। চিন্তামণির তিরস্কার ও গলিত শবের দৃশ্য দেখিয়া পার্থিব প্রেমের প্রতি

বিল্বমঙ্গলের নির্বেদ জন্মিল। কিন্তু প্রেমের লক্ষ্য পরিবর্তিত হইল বটে, তবে প্রেম রহিয়া গেল। যে প্রেম আগে এক নারীকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে বলিয়াছিল, 'তুমি অতি সুন্দর', তাহাই এখন বিশ্বরূপ ভগবানের সন্ধানে উন্মাদ। 'কে তুমি, তোমার কি রূপ, অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর'। প্রেমপাগল বিল্বমঙ্গল গুরুর কাছে পথের সন্ধান জানিতে চাহিলেন, কিন্তু গুরু বুঝিলেন পথের আলোক রহিয়াছে শিষ্যেরই অন্তরের মধ্যে, তাই সেই আলোক তিনি তাহাকে জ্বালিয়া রাখিতে বলিলেন। বিল্বমঙ্গলের সাধনা সুরু হইল বটে, কিন্তু তখনও পূর্ব সংস্কার প্রবল। তখনও তাহার উদ্বেলিত অনুরাগ ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে দোদুল্যমান। অহল্যার অনিন্দিত রূপ দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গলের দ্বন্দ্ব এখন নয়ন ও মনের ভিতরে। মনের আশা বিশ্বরূপের দিকে, কিন্তু নয়নের নেশা নারীর রূপের প্রতি। এই নয়নই তাহার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু, তাই নয়ন যখন গেল তখন—

'বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়
আঁধার হৃদয় নীল উৎপল চিরদিন রবে পায়।'

এই আঁখিহীন দৃষ্টি দিয়াই তিনি পরম সুন্দর বংশীধারী বনমালীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার এতদিনকার সৌন্দর্য-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল।

বিল্বমঙ্গল ভক্তিসাধক চরিত্র হইলেও তাঁহাব মানসিক ভাবাবেগের দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখান হইয়াছে, তাহার ফলে এই ভক্তিতত্ত্বমূলক নাটকের মধ্যে নাটকীয় বসের কোনো অভাব ঘটে নাই। বস্তুত নাটকটির মধ্যে একদিকে অধ্যাত্মরাজ্যের আকুতি, অন্যদিকে বাস্তব সমাজের আলেখ্য। বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমুগ্ধ বেশ্যা, শ্মশানচারিণী পাগলিনী, ভিক্ষুক চোর, কপট সাধু প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে যথেষ্ট বিচিত্র রস আনিয়াছে সন্দেহ নাই। একদিকে ভক্তিভাব ও গিরিশচন্দ্রেব ভক্তিভাবনা ঊর্ধ্ব আধ্যাত্মিক গগনে বিহার করিয়াছে, অপরদিকে সমাজদ্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সমাজের কুটিল জীবন-পথে সঞ্চরণ করিয়াছে। এই দুই ব্যবহিত জগতের একত্রিত সমাবেশের ফলে নাটকটি এত সজীবতা ও সরসতা লাভ করিয়াছে। নাটকের সংলাপেও রহিয়াছে একদিকে গৈরিশী ছন্দের দুরাস্তৃত গতি, আবার অন্যদিকে কথ্য-ভাষার বাস্তব ইতরতা। অবশ্য নাটকের পরিণতি অলৌকিক দেবলীলায়। পঞ্চম অঙ্কে এই লীলার আকর্ষণে চরিত্রগুলির সামাজিক মানবত্ব একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু 'বিল্বমঙ্গল'-এ সামাজিক মানবের চিত্ত-সংঘাতে অধ্যাত্মচেতনার উদ্ভব হইয়াছে এবং সেইজন্যই নাটক হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট হইয়া যায় নাই।

'বিল্বমঙ্গল'-এর ন্যায় 'করমেতিবাই' ও (১৮৯৫) কৃষ্ণভক্তি-রসাশ্রিত নাটক। করমেতি মীরাবাই-এর মত কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ও তন্ময় হইয়া সংসার ও সমাজকে ভুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে মানুষ ও দেবতার ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

'পূর্ণচন্দ্র,' 'নসীরাম', 'বিষাদ' ও 'কালাপাহাড'—এই কয়খানা নাটক ভক্তিমূলক হইলেও ইহাদের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর সমাবেশিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিরস থাকিলেও উহাদের কাহিনীর স্বতন্ত্র চমৎকারিত্ব এবং ক্রমবিকাশ বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। ভাবতন্ময়তা এবং ভক্তিবিহ্বলতা না থাকিলে এই নাটকগুলি খাঁটি নাটকের মর্যাদা-সম্পন্ন হইত, কারণ ইহাদের প্রত্যেকখানির বিষয় যথেষ্ট নাটকীয় ভাবাত্মক। এই নাটক-গুলির কাহিনী এবং চরিত্রের মধ্যেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। নাটকগুলির মধ্যে যে প্রেমের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে তাহা অসুস্থ ও বিকৃত, প্রত্যেক নাটকেই একটি বেশ্যাচরিত্র রহিয়াছে। সুন্দরা, সরস্বতী, বিরজা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যশালী এবং বুদ্ধি ও চাতুর্যবতী। গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, নসীরাম ইত্যাদি এক একজন কেন্দ্রীয় মহাপুরুষের চরিত্র প্রত্যেক নাটকে বিদ্যমান আছে।

উপরিউক্ত নাটকগুলির মধ্যে 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৮) শ্রেষ্ঠ। ধর্মমূলক হইলেও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সুতীব্র আলোডনে কাহিনীটি বিশেষ চিত্তচাঞ্চল্যকারী হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের কাছে কামান্ধ বিমাতার অতিনগ্ন প্রেমনিবেদন, এবং ঈর্ষাহত পিতার হৃদয়বিপ্লবের দৃশ্যের ন্যায় হৃদস্পন্দন-রহিতকারী বাস্তব দৃশ্য গিরিশচন্দ্রের খুব কম নাটকেই আছে। শেষের দিকে ধর্মাচ্ছন্ন হইয়া নাটকটি দুর্বল হইয়া পরিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের যে লক্ষণগুলি খুবই সাধারণ, যথা—বেশ্যাসক্তি, বিষপ্রয়োগ, হত্যা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি—সে সব 'বিষাদ' নাটকে (১৮৮৯) থাকা সত্ত্বেও ইহা উঁচু দরের নাটক নয়। সরস্বতীর বহুদিনকার ছদ্মবেশের পরে রাজার সহিত তাহার প্রাণ-বিসর্জনের দৃশ্য অসঙ্গত হইয়াছে। মনে হয় কমেডির দিকে যে নাটকের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তাহাকে জোর করিয়া যেন ট্র্যাজেডির দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'বিষাদ'-এ ভক্তিরসের সূত্র খুবই ক্ষীণ। বয়স্ক

মাধবের চরিত্রও অভিনব, নিজের মৃত্যুতেও সে তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। 'নসীরাম'-এর (১৮৯৬) কাহিনীর চমৎকারিত্ব থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ভক্তিরসে ইহার নাটকত্ব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নসীরামের নামে নাটকের নামকরণ হইলেও ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাঁহার চরিত্র পার্শ্ব-প্রাধান্য লাভ করিতে পাবে মাত্র, মূল কাহিনীর সহিত তাঁহাব অবিচ্ছেদ যোগ নাই। তিনি নাটকের চরিত্রগুলিকে ধর্মাভিমুখী করিয়াছেন, বাস্তবজীবনের সীমাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অবাস্তব রাজ্যের মোহন প্রাণমাতানো সঙ্গীত শুনাইয়াছেন বটে কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী ধূলিমলিন বাস্তব-রাজ্যের পথচলার ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ধর্মমূলক নাটকের ন্যায় এই নাটকেরও শেষ হইয়াছে অলৌকিক দৃশ্যে।

'কালাপাহাড' (১৮৯৬) নাটকের মধ্যে যদিও ক্ষীণ ঐতিহাসিক সূত্র রহিয়াছে, কিন্তু তবুও ধর্মতত্ত্বের পীডাদায়ক আলোচনা এবং ভক্তিনির্ঝরের উচ্ছ্বসিত প্রবাহে সেই ঐতিহাসিকতা ভাসিয়া গিয়াছে। নাটকখানির মধ্যে ঘটনার ঐক্য, চরিত্রের বিকাশ কিছুই নাই, অসঙ্গতি এবং অসংলগ্নতা দোষে ইহা নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং ক্লান্তিজনক হইয়াছে।

॥ জনা (১৮৯৪) ॥ 'জনা' এবং 'পাণ্ডবগৌরব' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'জনা' কাহিনীর মূল আমরা দেখিতে পাই জৈমিনি ভারতে। কাশীরাম দাস খুব সম্ভবত জৈমিনি-ভারত হইতেই এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈমিনি-ভারতের আশ্বমেধিক পর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ে গঙ্গাশাপ বৃত্তান্তে জনার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে জনার নাম হইয়াছে জ্বালা। এই জ্বালা হইতে জনা নাম কিভাবে আসিল তাহা ভাবিবার বিষয়। জনা নামটি শ্রুতিমধুর হইলেও জ্বালা নামের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা জ্বালাময়ী মাতৃরূপের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। জৈমিনি-ভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীর মোটামুটি মিল থাকিলেও জনার পরিণতি বর্ণনায় একটু পার্থক্য রহিয়াছে। জৈমিনি-ভারতে জনার তেজস্বিতা ও প্রতিহিংসার রূপই বেশি ফুটিয়াছে, কিন্তু কাশীরাম দাস এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কবিগণ জনার পুত্রশোকাতুরা কারুণ্যময়ী রূপটিই বিশদভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। জনাচরিত্রের জটিল, বিচিত্র ও আপাতবিরোধী দিকগুলি ধরা পড়িয়াছে মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায়। জনার গৌরবময় মাতৃত্ব, স্বদেশহিতৈষণা, তেজস্বিতা এবং সর্বোপরি তাহার জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি মধুসূদন তাঁহার সংক্ষিপ্ত কবিতায় অঙ্কন করিয়া

গিয়াছেন। মধুসূদনের সংহত এবং সংক্ষিপ্ত চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকে বিস্তৃত এবং বিশ্লেষিত হইয়াছে।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সাধারণত দুই প্রকার রসের মিশ্রণ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, মানুষের জীবনে দেবশক্তির লীলা ও মাহিমা দেখাইয়া এবং অলৌকিক বিধানের প্রতি দর্শকদের আবিষ্ট চিত্তকে উন্মুখ করিয়া ভক্তিরস উদ্রেক করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া লৌকিক আনন্দবেদনামিশ্রিত মানবরসসৃষ্টিও ইহার লক্ষ্য। মনে রাখিতে হইবে, পৌরাণিক নাটক যাত্রা ও বাস্তব নাটকের মধ্যবর্তী পথই অনুসরণ করিয়াছে। অর্থাৎ, ভক্তিবিশ্বাসের দূরাস্তৃত জগতের চিত্র ইহাতে যেমন পরিস্ফুট, বাস্তব নাটকের স্থূল ও প্রত্যক্ষ ধূলিমলিন জগতের রূপই তেমনি উদ্‌ঘাটিত। পৌরাণিক নাটকের বাঁধুনি ও বিন্যাস পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তাহার ভাববস্তু পৌরাণিক জগৎ হইতেই গৃহীত। পাশ্চাত্ত্য নাটকের বাস্তবতা ও আমাদের নিজস্ব নাট্যধারার অধ্যাত্মবাদিতার একটা সমন্বয় এবং কোথাও কোথাও বা একটা বিরোধ এই নাটকে দেখা যায়। তবে একটি বিষয়ে পৌরাণিক নাটকের ধারা কাঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। পাশ্চাত্ত্য নাটকের ঘাত প্রতিঘাত ও ট্র্যাজিক চবিত্ররূপ এই নাটকের মধ্যে স্থান পাইলেও ইহার পরিণতি কিন্তু ভারতীয় আদর্শ ও রসসংস্কাব অনুযায়ী সর্বত্র ঘটিয়াছে। অর্থাৎ পার্থিব দুঃখ, অশান্তি থাকিলেও এই নাটকের শেষ হইবে শান্ত রসে এবং দেবতার অলঙ্ঘ্য লীলা ও অপরিমেয় মহিমার উপলব্ধিতে।

'জনা' নাটকের মধ্যেও উপরি-উক্ত দুইপ্রকার রসধাবার মিশ্রণ আমরা দেখিতে পাই। জনা ও প্রবীরচরিত্রকে অবলম্বন করিয়া নাটকের বাস্তব আবেগ ও প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতজনিত লৌকিক নাট্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্যদিকে নীলধ্বজ, বিদূষক, অগ্নি, বৃষকেতু প্রভৃতির মধ্য দিয়া অলৌকিক ভক্তিরস নাটকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রবীরের বীরধর্ম, স্বাদেশিকতা, মাতৃভক্তি, প্রেমমোহ প্রভৃতি বিচিত্র মানবীয় গুণের সমাবেশে এই চরিত্রটির কথা ও কাজ সব কিছু ঘনীভূত লৌকিক রসে অভিষিক্ত হইয়া দর্শকদের সুতীব্র কৌতূহল সতত জাগ্রত করিয়া রাখে। আবার জনার পুত্রস্নেহ, স্বদেশপ্রীতি, স্বামী ও অন্যান্য কৃষ্ণভক্ত লোকেদের বিরোধিতা, অনির্বাণ পাণ্ডববিদ্বেষ, বহ্নিময় প্রতিহিংসা প্রভৃতি নাটকের গতিকে একান্তভাবে বাস্তবমুখীন করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রবীর ও জনার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হইতে উৎসারিত দ্বন্দ্ব-জটিল বাস্তব ঘটনা যে পর্যন্ত তীব্রবেগে

অগ্রসর হইয়াছে সেই পর্যন্ত নাটকের রস দর্শকচিত্তকে মানবীয় আবেগে চঞ্চল করিয়া রাখে। কিন্তু প্রবীর ও জনার চরিত্রাশ্রিত লৌকিক রসের অবতারণা থাকিলেই 'জনা' পৌরাণিক নাটকরূপে সার্থক হইত না। সেজন্য নাট্যকার প্রবীরের মৃত্যুর পরেও নাটকের দুইটি অঙ্কের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকের এই শেষ দুই অঙ্কে নাট্যকার কৃষ্ণের লীলারহস্য ও সীমাহীন মহিমা ব্যক্ত করিবার জন্যই নাট্যঘটনাব বর্ণনা কবিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত বিদূষকই এই দুই অঙ্কে প্রধান চরিত্র এবং তাঁহার গূঢ় কৃষ্ণভক্তির চরিতার্থতা দেখানোই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য চবিত্রগুলিও কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর ভক্তি দেখাইবার ফলে নাটকের শেষ দিকে যেন এক ভক্তিমন্দাকিনীর প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধুমাত্র জনা তাঁহার প্রতিহিংসাজ্বালা লইয়া এই মিলিত ভক্তিধারার ব্যতিক্রম হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু জনাব প্রতিহিংসা এক ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখাব মত নিজেকেই অহরহ দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত কবিয়া ফেলিয়াছে, সেই শিখা অপর কাহাবও চিত্তে বিন্দুমাত্র দাহ আনিতে পাবে নাই। জনার মৃত্যুতে নাটকের ঘটনার শেষ, কিন্তু নাটকের বস সেখানেই শেষ হইতে পারে নাই। জনার মৃত্যুর প্রভাবই যদি শেষ পর্যন্ত বাঁচিযা থাকে তবে তো দর্শকচিত্তে বাস্তবজগতের দুঃখ ও ব্যর্থ বিদ্রোহই স্থায়িত্ব লাভ করিবে। যে জগতে কৃষ্ণ স্বয়ং লোকের ত্রাতা ও ভাগ্যবিধাতা সেখানে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের স্থান কোথায়? সেজন্য তিনি তাঁহার ভক্তজনের তৃপ্তি ও শান্তির জন্য একটি অলৌকিক দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন,—

হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,—
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।

সুখদুঃখ সব মায়ামাত্র, দেবতার প্রতি একান্ত নির্ভরতাতেই একমাত্র মুক্তি, এই ভক্তিসিক্ত পরিতৃপ্তি লইয়া দর্শকগণ এই নাটকের জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ কবে।

'জনা'র মধ্যে ভক্তিবসেব একটি প্রধান স্থান থাকিলেও এবং ইহার পরিণতি ভক্তিরসের দাবীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও এই নাটকের নাট্যবস প্রধানত জনা চরিত্রকেই আশ্রয় করিয়াছে। জনা চরিত্রটি প্রতিকূল অবস্থাব সাহত অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম, সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুগভীর বেদনা ও অতৃপ্ত প্রতিহিংসার মধ্য দিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। জনা গঙ্গাভক্ত ও কৃষ্ণের প্রতি ঘোর শত্রুভাবাপন্ন। তাঁহার এই কৃষ্ণ-বিরোধিতার ফলেই তাঁহার জীবনে সুকরুণ

ট্র্যাজেডির আঘাত নির্মমভাবে আসিয়াছে। তাঁহার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায় এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে একটি স্তর পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জনাকে প্রথম দেখি শান্ত ও স্নেহশীলা জননীরূপে, পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তারপর পুত্রের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি শুনিয়া তিনি পুত্রের সহিত একমত হইলেন—'রণসাধ যদি তোর, রণ পণ মম'। একবার পুত্রের ইচ্ছায় সম্মতি দিয়া জনা অতঃপর পুত্রের সব বাধা দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। নীলধ্বজ, মদন-মঞ্জরী প্রভৃতির যুদ্ধবিমুখ মনোবৃত্তির তীব্র বিরোধিতা তিনি করিয়াছেন। বাৎসল্যময়ী জনার পরবর্তী রূপ হইল বীরাঙ্গনা রূপ। যুদ্ধবিমুখ নিস্তেজ সৈনিকগণকে তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। প্রবীরের মৃত্যুর পর জনার আর এক রূপ দেখিতে পাই—তিনি তখন পুত্রশোকের আঘাতে বিহ্বলা বাঁধনহারা অশ্রুর স্রোতে নিমগ্না। কিন্তু জনার এই রূপ ক্ষণেকের, ইহার পরেই তাঁহার শেষ রূপ দেখিতে পাই—তাঁহার অগ্নিদগ্ধ প্রতিহিংসার রূপ। সেই প্রতিহিংসাবিষবাষ্পে তিনি চতুর্দিক ভরিয়া দিতে চাহিয়াছেন, সমস্ত জগৎটাকে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্ত সুখ ও শান্তির মর্মে আগুনের শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই হইল না। মাহেশ্বরী পুরীর রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম লোক পর্যন্ত কাহারও চিত্ত একটুও বিচলিত হইল না। সকলের উপেক্ষিতা, সকলের পরিত্যক্তা জনা অবশেষে তাঁহার ব্যর্থ প্রতিহিংসার জ্বালা লইয়া জাহ্নবীর শীতল জলে আশ্রয় লইলেন। এত চেষ্টা, এত উদ্যম, এত সংগ্রাম সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। জনার ট্র্যাজেডি নাটকের সর্ব প্রকার ভক্তিরসের স্নিগ্ধ প্রলেপ উপেক্ষা করিয়া আমাদের চিত্ততলে যেন এক নিত্যকালের কান্না জাগাইয়া রাখে।

॥ পাণ্ডব গৌরব (১৯০০) ॥ 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর কাহিনীর উৎপত্তি যদিও দণ্ডী এবং উর্বশীকে লইয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান চরিত্র হইতেছে ভীমসেন এবং সুভদ্রা। কৃষ্ণের প্রতি অবিচল ভক্তি থাকা সত্ত্বেও শরণাগতকে রক্ষা করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং ঐকান্তিক আয়োজন ইহাদের চরিত্রকে বিশেষ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে দুই পক্ষের যে বিরাট আয়োজন এবং অষ্টবজ্র-সম্মেলনের যে পৌনঃপুনিক আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে খুব একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের জন্য আমাদের মন প্রস্তুত হইতে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতি লঘু পরিণতিতে নাটকের উপসংহার হইয়াছে। মনে হয় এতক্ষণ পর্যন্ত

পুঞ্জীভূত মেঘের যে গুড়্ গুড়্ ধ্বনি আমাদের মনকে আতঙ্কিত করিতেছিল, এক মুহূর্তের ফুৎকারে যেন তাহা উড়াইয়া দেওয়া হইল।

গিরিশচন্দ্র এতদিন পর্যন্ত ভক্তিরসাশ্রিত নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু 'শঙ্করাচার্য' (১৯১০) নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নাট্যকার নিজে বলিয়াছেন যে স্বামীজীর আদর্শে তিনি শঙ্করাচার্যের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।[১] নাটকখানি আগাগোড়া দুরূহ তত্ত্ব-আলোচনায় পরিপূর্ণ। নাট্যকার হয়তো কোনো ভাবানুপ্রাণতায় নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ দর্শকদের পক্ষে খুব সূক্ষ্ম ধর্মনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বুঝা কষ্টকর।[২] যাহা দৃশ্যমান, স্থূল বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই নাটকের বিষয়বস্তু হইতে পারে। উপন্যাসে কিংবা কবিতায় চিন্তা এবং কল্পনা দ্বারা আমরা অনেক কিছু বিশ্বাস করিতে পারি, বুঝিতে পারি, কিন্তু নাটকের দ্রুত-ধাবমান ঘটনাপুঞ্জ দর্শন করিবার সময় সেই চিন্তা এবং কল্পনার অবসর নাই। বাহ্য ক্রিয়া এবং ঘটনা না থাকিলে দৃশ্যকাব্য কখনো জমিতে পারে না।

(গ) সামাজিক নাটক

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। সাধারণত এই সমস্ত ঘরের নিরুপদ্রব এবং গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুব কমই বিদ্যমান। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র সাধারণ এবং স্বাভাবিক জীবনের যতরকম ব্যাঘাত ও বিকৃতি ঘটিতে পারে সবই নাটকের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার নাটকে জাল, জুয়াচুরি, প্রতারণা, হত্যা প্রভৃতির এত বাড়াবাড়ি। বাঙালী ঘরের বধূ সহনশীলা এবং পতিপরায়ণা, সেইজন্য এই পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের পাশে সর্বত্র বেশ্যা-জীবনের কদর্যতা দেখাইয়া তিনি ঘটনা-বৈপরীত্য সৃষ্টি

১। গিরিশবাবু শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনকে বলিয়াছিলেন—'দেখ শঙ্করাচার্য্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে, তা ঠিক হয়েছে। আমি inspiration-এ লিখেছি। ঠাকুর বলতেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহাপুরুষ এক সত্যের প্রচার করে থাকেন। তবে স্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের ছবি উপলব্ধি করেছি।' গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য—পৃঃ ১০০

২। গিরিশবাবু কুমুদবাবুকে বলিয়াছিলেন—'এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব—internal dramatic actions—যা সামান্য স্থূল ভাবে বাহিরে প্রকাশ পায়, সেই internal actions এঁকে দেখানোই best literary art.' ঐ পৃঃ ৬০

করিয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক নাটকে মোটা মোটা পাপের এত বাড়াবাড়ি কখনো স্বাভাবিক নহে। ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং নিম্নস্তরের সাহিত্যে যে-রকম লোমহর্ষণ উত্তেজক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সস্তায় বাজি মাত করিবার চেষ্টা থাকে, গিরিশচন্দ্রের নাটকেরও সেইদিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা ধারণা করা কষ্টকর নহে যে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যগুরু শেকস্‌পীয়রের নাটকে সর্বপ্রকার পাপের প্রাচুর্য দেখিয়া নিজেও সেই সব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রী অসাধারণ, সেখানকার পটভূমিকা বিস্তৃত। সুতরাং ঐরূপ নাটকে বড়ো বড়ো ঘটনার সমাবেশ অসঙ্গত নহে। কিন্তু সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রী নিতান্ত সাধারণ এবং অতি সামান্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত; সেখানে ঘোর চক্রান্ত, নিষ্ঠুর নরহত্যা প্রভৃতি চরম ঘটনার সন্নিবেশ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। আসল কথা, গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর অসাধারণ প্রভাবশালী নাটক 'নীলদর্পণ'-এ প্রবর্তিত নাট্যধারাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেইজন্য 'নীলদর্পণ'-এর দোষ ও গুণ তাঁহার নাটকে এত স্পষ্ট বোধ হয়। বহিরঙ্গণে যেখানে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র লেখনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরের দ্বার ঠেলিয়া সূক্ষ্ম হৃদয়লীলার তীক্ষ্ম সংঘাত দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সামাজিক রীতিনীতি, বিধিসংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণ্যমান আবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন কিভাবে আবর্তিত হইতে থাকে, মানুষের ধর্মবোধ, নীতিবোধের সহিত তাহার দুর্দম কামনা এবং দুর্বার প্রবৃত্তির কিরকম নিদারুণ সংগ্রাম অহরহ ঘনাইয়া উঠে তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাই। কোনো প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিশচন্দ্রের নাটকের সহিত নরওয়ের যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেনের নাটকের তুলনা করিয়াছেন।[১] কিন্তু ইহা অতিরঞ্জিত উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইবসেনের নাটকে যে গভীর সমাজচেতনা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহ দেখা যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই। 'শাস্তি কি শান্তি' এবং 'বলিদান'-এর মধ্যে তিনি সামাজিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি কোথাও সমস্যার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেন নাই, কেবল বাহিরের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহার সব নাটকে একই

১। 'একমাত্র ইবসেনের সামাজিক নাটকের সঙ্গেই গিরিশের সামাজিক নাটকের বিচার সম্ভব।' গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১৪

রকম ঘটনা এবং একই ধরনের চরিত্রের পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকখানি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতেছেন পরিবারের কর্তা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আঘাতে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক ও অসংলগ্নপ্রলাপী হইয়া উঠিয়াছেন। যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, প্রসন্নকুমার, কালীকিঙ্কর এবং উপেন্দ্রনাথ—ইহারা সকলে মূলত একই চরিত্র। এই ধরনের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র খুব মনোহর অভিনয় করিতেন, সম্ভবত তিনি নিজের অভিনয়োপযোগী ভূমিকাব কথা চিন্তা করিয়াই প্রত্যেক নাটকে এক রকম চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

॥ প্রফুল্ল (১৮৮৯)॥ 'প্রফুল্ল' তাঁহার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অশেষ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে এবং সমালোচকদের অকৃপণ প্রশংসাও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। ইহার নাট্যমূল্য বিচাব করিবার পূর্বেই একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পাবা যায় না। 'প্রফুল্ল' হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্র যতগুলি সামাজিক নাটক লিখিলেন তাহাদের প্রায় সব-গুলিই বিয়োগান্ত ও করুণরসাত্মক। ইহার কারণ কি? কেন তিনি জীবনেব কুশ্রী ও করুণ দিকগুলি নাটকের মধ্যে এমন প্রধান করিয়া তুলিলেন?[১] ইহার কতকগুলি কাবণ নির্দেশ করা যাইতে পাবে। প্রথমত, গিবিশচন্দ্রেব অন্তর-প্রেরণা দুঃখের নিত্য-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াছিল। সেই প্রেবণা যখন সাহিত্যেব কাহিনীকে আশ্রয় কবিল তখন স্বভাবত তাহা কারুণ্যেব কলতানে ভরিয়া উঠিল।[২] দ্বিতীয়ত, গিবিশচন্দ্র প্রাযই বলিতেন যে, তিনি শেক্‌সপীয়রকে আদর্শ করিয়াই নাটক রচনা কবিতেন। শেক্‌সপীয়বের ট্র্যাজেডি যে তাঁহাকে দুঃখময় নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত কবিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত, গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, 'মিলনান্ত নাটক আনন্দপ্রদ হইলেও করুণ রসাশ্রিত নাটক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ।'[৩] চতুর্থত, গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসিয়াছিল 'নীলদর্পণ' ও বিশেষ করিয়া, 'সরলা' নাটক হইতে। 'সবলা'র অভিনয় নাট্যজগতে যুগান্তর আনিয়াছিল এবং এই

১। গিরিশচন্দ্র একবার অমৃতলাল বসুকে বলিয়াছিলেন, 'এসব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।' রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসব—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৭

২। 'এই সদানন্দময় পুরুষের জীবন-সহচব ছিল দুঃখ। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছিল—বিশাল এবং উজ্জ্বল. কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হইত, সে চোখের পিছনে শোক যেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।' গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু (ক. বি.)—পৃঃ ৭

৩। ঐ পৃঃ ২৮

নাট্য-সাফল্য দেখিয়া ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রকে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন।[১] 'সরলা'র প্রভাবে 'প্রফুল্ল' রচিত হইয়াছিল বলিয়া চরিত্র, কাহিনী, রস এমন কি নামকরণের দিক দিয়াও দুইখানি নাটকের মধ্যে সমধর্মিতা দেখা যায়। 'প্রফুল্ল' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি স্মরণ না করিলে পূর্ববর্তী নাটকগুলির প্রতি অবিচার করা হইবে।

অধিকাংশ সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা একখানি সার্থক করুণ রসাত্মক নাটক অথবা ট্র্যাজেডি। আপাত-দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসহ মনে হয়। কারণ এই নাটকে বাঙালী সমাজের একটি পরিবার দুঃখময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া এক অন্তিম হাহাকারে নিঃশেষ হইয়া গেল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। পরিবারের কর্তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগে কিভাবে এক ঘোর স্বার্থান্বেষী বিষাক্ত শক্তির ক্রিয়ায় একটি সাজান বাগান শুকাইয়া গেল তাহারই এক জ্বালাময় বৃত্তান্ত ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক, কিন্তু যাহা সাদা চোখে দেখা যায় না তাহা বিশ্লেষণের পরকলায় ধরা পড়ে। তখন দেখা যায় যে চমকপ্রদ কার্যের পিছনে বিশ্বাসযোগ্য কারণ নাই, দুঃখের বন্যাধারা অনিবার্য বেগে প্রবাহিত হয় নাই, এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, নাটকখানি করুণ রসাত্মক হইলেও ট্র্যাজেডির মর্যাদা লাভ করে নাই। এই বিষয়গুলিই আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমেই একটি কথা স্বীকার করা দরকার যে, ট্র্যাজেডির বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করিতে হইবে। ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রায় সর্বত্রই একটি কি দুইটি চরিত্রের অনন্য প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে—ইডিপাস, অরিষ্টিস, ইলেক্ট্রা, মিডিয়া, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, লীয়র প্রভৃতি নাটকের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।[২] সেজন্য যোগেশ চরিত্রকে অবলম্বন

১। 'সরলার অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমান ভাবেই চলিয়াছিল এবং ষ্টার সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সামাজিক নাটকের এই আদর দেখিয়া ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ গিরিশবাবুকে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফল—প্রফুল্ল।' রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—পৃঃ ১১২

২। নিকলের মত প্রণিধানযোগ্য—'It is to be observed that commonly tragedy differs from comedy in selecting some one or two figures who by their greatness, and by their inherent interest dominate the other dramatis personae. Theory of Drama, p. 141

করিয়াই প্রধানত আমাদিগকে 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্র্যাজিক ধর্ম বিচার করিতে হইবে।

ট্র্যাজিক নায়কের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া অ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন যে, কোন মারাত্মক ভ্রান্তির ফলেই সে সুখ-সমৃদ্ধি হইতে দুঃখ-দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়।[১] এই ট্র্যাজিক ভ্রান্তি অথবা 'hamartia' যোগেশের বেলায় কোথায় ঘটিয়াছে? কেহ কেহ বলেন যে, যোগেশের ট্র্যাজেডির কারণ সাময়িক উন্মত্ততা (Temporary insanity)।[২] কিন্তু সেই উন্মত্ততার কারণ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। সুতরাং এই মত গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াকেই ট্র্যাজেডির কারণ বলিয়া মনে করিতে হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় যোগেশ চরিত্রের প্রকৃতিগত দুর্বলতাকেই ট্র্যাজেডির কারণস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[৩] বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্যও যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই ট্র্যাজেডির মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন।[৪] এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিষয়টি আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে। প্রথমত, এই দুর্বলতা সত্যই অন্তর্নিহিত ছিল কিনা, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বেও ইহা তাঁহার মনে জাগ্রত অথবা সুপ্ত অবস্থায় ছিল কিনা। দ্বিতীয়ত, এই দুর্বলতাকে স্বীকার করিলে যোগেশ চরিত্রের ট্র্যাজিক ধর্ম কিরূপে ও কতখানি বজায় থাকে। প্রথম প্রশ্নটি বিচার করিলে মনে হয়, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকট হইলেও ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে এরূপ দুর্বলতা যে তাহার চরিত্রের মধ্যে ছিল এমন কোনো আভাস অন্তত নাটকের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে যোগেশের যে পরিচয় তাঁহার এবং অন্যান্য সকলের মুখে পাওয়া যায় তাহাতে তো ধারণা হয় যে, তিনি ছিলেন পুরুষকারের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তখন তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও অকলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞানদার মুখে শুনিলাম, 'বাবা ভ্যালা

১। 'Such a person is one who does not excel in virtue and righteousness nor is he brought into adversity through wickedness and depravity, but through some error. Aristotle's Poetics – Tr. by Bouchier, p. 33

২। অপরেশ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গ লয়ে ত্রিশ বৎসর—পৃঃ ১২২

৩। 'মূলত তিনি ছিলেন দুর্বলপ্রকৃতি, শ্লথবুদ্ধি, ভাববিহ্বল ও কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রস্বরূপ। কি আপনাতে কি ভগবানে তাঁহার প্রত্যয় ছিল শিথিল। এত বড় ট্র্যাজেডি সম্ভব হইয়াছে ঐ জন্যই।' গিরিশ প্রতিভা—পৃঃ ৩০০

৪। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (২য় খণ্ড)—পৃঃ ১৩৩-১৩৪

কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!' কিছুক্ষণ পরেই যোগেশ নিজে বলিলেন, 'সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আব আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল।' দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পুনরায় যোগেশ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি লোকে আমায় জানত।' এই দৃঢ়চেতা, আদর্শবাদী, কর্মিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কোথায়? তাহা হইলে মানিয়া লইতে হয়, পরবর্তী দুর্বলতা যোগেশের অন্তর্নিহিত নহে, ইহা একটি আকস্মিক ঘটনার দ্বারা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বলা বাহুল্য সেই আকস্মিক ঘটনা হইল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। যদি কোনো আকস্মিক ঘটনাই মাত্র চরিত্রের কোনো অতর্কিত পরিবর্তন আনিযা ফেলে এবং সেই পবিবর্তনের ফলেই যদি তাহার ট্র্যাজেডি সম্ভাবিত হয় তবে সেই ট্র্যাজেডির মূল্য কতটুকু?

আমাদেব উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, যোগেশ চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা স্বীকাব কবিলেও সেই দুর্বলতার প্রকাশ নাটকের মধ্যে যে ভাবে হইয়াছে তাহাতে তাহাকে ট্র্যাজিক রসোত্তীর্ণ চরিত্র কখনই বলা চলে না। নায়ক যদি তাহার অনিবার্য দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানত দায়ী না হয়,[১] যদি সেই দুর্ভাগ্যকে রোধ করিবার জন্য তাহার প্রাণান্তকর সংগ্রামের পরিচয় না দেয়, যদি তাহার পতন একটি অলঙ্ঘ্য বিশ্ববিধানের প্রতি আমাদেব শোকাহত দৃষ্টিকে উন্মীলিত না করিয়া তোলে তবে তাহার দুঃখভোগের মধ্যে ট্র্যাজিক মহিমা কোথায়? যোগেশের মধ্যে এই ট্র্যাজিক নায়কেব কোনো চিহ্ন নাই। তাঁহার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই চূর্ণ ব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায রমেশের ষড়যন্ত্র-জালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশ চরিত্রেব আব যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে কুৎসিৎ মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখবিলাস। এত বড়

১। ট্র্যাজেডিব বিষয় সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলকে অনুসরণ করিয়া ডিক্সন বলিয়াছেন—'One type of subject, and one only, the familiar type of Nemesis following guilt or error, in which the hero at least contributes to his own misfortune.'
Tragedy—p. 131

একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য! ইহা আকস্মিক পক্ষাঘাত, ট্র্যাজেডি নহে। সাধনবাবু যোগেশের নিষ্ক্রিয়তা বা নিচেষ্টতার অভিযোগ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যোগেশের সক্রিয়তা বা সচেষ্টতার একটি প্রমাণও আমরা পাই নাই। যোগেশ যদি সেরূপ হইতেন তবে নাটকের অনেক দুঃখময় ঘটনাই নিবারণ করা যাইত। যে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ফলেই যোগেশের এই ক্লৈব্যপ্রাপ্তি, সেই ব্যাঙ্ক পুনরায় টাকা দিতে শুরু করিয়াছে, অথচ যোগেশের মানসিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে মনে হয় একটি লঘু ও নিবার্য ঘটনাকেই যেন অনাবশ্যক দুঃখের ফানুসে ভর্তি করা হইল। তারপর পীতাম্বরের সহিত যোগেশ যখন ব্যাঙ্কে যাইতেছিলেন তখনই নাটকের দুঃখগতি প্রায় থামিয়া আসিয়াছিল কিন্তু যোগেশের অনির্দেশ্য ও অশ্রদ্ধেয় নিষ্ক্রিয়তা সেই গতিকে পুনরায় মুক্ত করিয়া দিল। যাঁহার অভিমান এতই টনটনে, একটি ইতর স্ত্রীলোকের মুখে অকারণ জোচ্চোব অপবাদ শুনিয়াই যিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন তিনি তো সামান্য একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হইলেই সব অপবাদ ঘুচাইতে পারিতেন। যিনি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সুনামের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন, দুর্নামে তাহার অতখানি আতঙ্ক ও মর্মবেদনা একপ্রকার কপট আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নহে। সামান্যতম ঘটনাকে আয়ত্ত করিবার শক্তি যাহার নাই, যিনি বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জেব অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালেব কাছে নির্বিবাদ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন ট্র্যাজিক নায়করূপে তাঁহাব মূল্য কতটুকু? অ্যাবিস্টোটল বলিয়াছেন, চরিত্রের কোনো বিশেষ বিশেষ গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাব সুখদুঃখ তাহারই ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া থাকে।[১] যোগেশের দুঃখ তাঁহার কোন্ ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়াছে? নিষ্ক্রিয় হইলেও ট্র্যাজেডির নায়ক হওযা চলে, সাধনবাবু এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লীয়র ও হ্যামলেট নাটক দু'খানিব নাম করিয়াছেন। লীয়র সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, তিনি নাটকের শেষ দিকে নিষ্ক্রিয় দুঃখভোগী (more sinned against than sinning) হইলেও ট্র্যাজেডির সূচনা কিন্তু তাঁহারই অহঙ্কৃত মনোভাব ও ভ্রান্ত আচরণের ফলেই হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু দুঃখের আঘাতে অসহায় ভাবে তাড়িত-বিতাড়িত হইলেও শেক্‌সপীয়রের অদ্বিতীয় লেখনী তাহার সমুন্নত

১। 'Now, persons possess certain qualities in virtue of their characters, but are happy or the reverse in virtue of their actions.'

Poetics—Tr. by Bouchier, p. 20

ট্র্যাজিক মহিমা বজায় রাখিতে পারিয়াছে, কিন্তু যোগেশের সেই মহিমা কোথায় ?[১] হ্যামলেটের সহিত যোগেশের যে সাদৃশ্য তাহাও নিতান্তই বাহ্য ও মৌহূর্তিক। প্রথমত, হ্যামলেট বাহ্যজগতে একেবারে ক্রিয়াহীন নহে, সে বীর ও শক্তিমান, অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম—শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সে তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। তাহার আত্যন্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তা প্রবণতাই তাহার সক্ষম ক্রিয়াশক্তির অন্তরায় হইয়া তাহার ট্র্যাজেডি ঘটাইয়াছে।[২]

> Whether 'tis nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms against a sea of troubles.
> And by opposing end them ?

ইহাই হ্যামলেটের দ্বন্দ্ব। এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব যোগেশের কোথায় ? নাটকের মধ্যে যোগেশের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোজগৎ একেবারেই অপরিস্ফুট।

নাটকের মধ্যে যোগেশের চরিত্র যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ের একটি কারণ নির্দেশ করা যায়, যাহা সমালোচকগণ সজোরে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন এবং যাহা সম্ভবত নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল না—তাহা হইল যোগেশের মদ্যাসক্তি। এই মদ্যাসক্তি এক 'অন্তর্নিহিত দুর্বলতা'-রূপে তাঁহার সুস্থ ও সমৃদ্ধ অবস্থার মধ্যেও ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বেও তাহাকে বোতল হইতে এই বিষামৃত ঢালিতে দেখিয়াছি। জ্ঞানদার মুখে আমরা শুনিয়াছি, 'তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক ক'রে খাওয়া কেন ?' তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে পুনরায় জ্ঞানদা বলিয়াছেন, 'যদি এই ছাই না খান তাহ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে ?' ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে এই সুরাসক্তি সমস্ত মাত্রা ও সংযম হারাইয়া ফেলিল এবং চতুর্দিক হইতে তখন বিপর্যয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় এবং আরও অনেকে বলিয়াছেন, সুরাপান ট্র্যাজেডির কারণ নহে, পরিণাম। আমাদের কিন্তু ঠিক বিপরীতটাই মনে হয় অর্থাৎ সুরাপানই ট্র্যাজেডির (?) কারণ,

১। নিকলের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'It was only a Shakepeare who could present a Lear majestic and exalted in the midst of his affiction and misery.'
Theory of Drama—p. 153

২। F. L. Lucas তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হ্যামলেটের 'Hamartia' অথবা ট্র্যাজিক ভ্রান্তি লইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য—'Hamalet's tragic error is his failure to act ; and this is dcubtless a moral flaw, such as it is usual to suppose that the hamartia must always be.' Tragedy by F. L. Lucas (Hogarth) p. 101

পরিণাম নহে। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'সুরার মোহিনীশক্তি এবং আমোঘ আকর্ষণ এই নাটকের মূল ভিত্তি।' নিমচাঁদ ও যোগেশের দুঃখসমস্যা একই, বরং নিমচাঁদ বোধ হয় অধিকতর উন্নত ও অনুভূতিশীল। সমগ্র 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেই মদ্যপায়ী লোকের একটি ইতর মাতলামির পরিচয়, তাহার ব্যক্তিসত্তার অন্যসব চিন্তা ও চেতনা একেবারেই বিলুপ্ত। এই বিরক্তিকর সুরাসক্তির ফলে তাহার দুঃখ-বেদনা আমাদের অনিবার্য সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। এই সুরাশক্তিই যদি যোগেশের পতনের কারণ হইয়া থাকে তবে তাহার দুঃখ ট্র্যাজেডির অপ্রতিরোধ্য শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া নিতান্তই লঘু ও বহিঃসর্বস্ব হইয়া পড়ে।

যোগেশ-চরিত্রের যে সব দোষত্রুটি পূর্বে উল্লেখ করা হইল তাহাতে কখনই তাহাকে ট্র্যাজিক চরিত্র বলা চলে না এবং নাটকখানিকেও খাঁটি ট্র্যাজেডির মর্যাদা দেওয়া যায় না। অতিরঞ্জিত দুঃখময় ঘটনার অবতারণা দ্বারা ইহাকে অনাবশ্যক কারুণ্য-পীড়িত করা হইয়াছে। মাত্র যোগেশের দুঃখে যে অনিবার্যতা নাই তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। আর একটি দুঃখভোগের দৃষ্টান্তেও এই অনিবার্যতার অভাব লক্ষ্য করা হয়। তাহা হইল সুরেশের চরিত্র। প্রকৃত চুরি নহে, অথচ স্বেচ্ছা-গৃহীত চুরির বদনাম স্বীকার করিয়া অকারণে অমানুষী দুঃখভোগ করিয়াছে সুরেশ। পরিবারস্থ এক অতি নিকট আত্মীয়ার নিকট হইতে সদুদ্দেশ্যে দুইটি মাকড়ি লইয়া সুরেশকে জেলে পাথর ভাঙ্গিতে হইল, এই সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যেই এমন এক হাস্যকর অবিশ্বাস্যতা রহিয়াছে যে, এই দুঃখের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে এক বিরূপ সন্দেহ জাগিয়া উঠে। অধিকন্তু সুরেশের দুঃখ তাহাতেই শেষ হয় নাই, ইহা সমগ্র পরিবারকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। যোগেশ এই অমূলক চুরির অপবাদ শুনিয়া আরও মতিচ্ছন্ন হইয়াছেন এবং উমাসুন্দরী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন। একটি ভিত্তিহীন কারণ হইতে এতখানি অতিশয়িত দুঃখের জাল বিস্তার করা হইয়াছে। জ্ঞানদার মৃত্যু দীর্ঘকালীন দুঃখভোগের পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেলেও প্রফুল্লের মৃত্যু কিন্তু স্থানকালের পরিবেশে নিতান্তই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ইহা একটি অপঘাত-মৃত্যু মাত্র, এবং এই অপঘাতের জন্য কোনো প্রস্তুতি নাই—না নাটকের ভিতর, না দর্শকের মনে। এতগুলি দুঃখভোগের কারণ ঘটনার কোনো অলঙ্ঘ্য সংঘাত নহে, নিয়তির কোনো অপ্রতিষেধ্য লীলা নহে, চরিত্রগুলির কোনো অনতিক্রম্য দুর্বলতাও নহে—

কারণ সর্বনিয়ন্তা রমেশের সর্ববিস্তারী চক্রান্ত। এই রমেশ কি সাংসারিক জগতের কোনো স্বাভাবিক চরিত্র, না নারকীয় জগতের কোনো শয়তানি চরিত্র? সন্দেহ হয়। সংসারের কাহারও প্রতি ইহার আকর্ষণ নাই, ইহার নিষ্ঠুরতা উপায় না হইয়া উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে! যোগেশ যেমন নিষ্ক্রিয়তার একটি নির্জীব দৃষ্টান্ত, রমেশও তেমনি নৃশংসতার একটি অতিজীব দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের আর একটি গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে ইহার নামকরণে। প্রফুল্ল এই নাটকে কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে? চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত যে অল্প কয়বার তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে তাহাতে তাহাকে পরিবারের একজন সরলা স্নেহময়ী বধূ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তখনও ঘটনার নেপথ্যে তাহার অবস্থান মাত্র। তাহার অন্তরের কল্যাণী শক্তি অন্তরেই আবদ্ধ রহিয়াছে, বাহিরের চলমান ঘটনার মাঝে সেই শক্তির কোনো সক্ষম আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি নাই। কেবলমাত্র পঞ্চম অঙ্কে মদনের মতি পরিবর্তনে ও যাদবের প্রাণরক্ষায় তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্বের রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে অনিবার্য দুঃখের গ্রাস পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে যাদবকে বাঁচাইতে পারিল বটে, কিন্তু আর কাহাকেও বাঁচাইবার সাধ্য তাহার ছিল না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লের আত্মবিসর্জনই এই নাটকের মেরুদণ্ড এবং সেই জন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন—প্রফুল্ল।' এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, প্রফুল্লের মৃত্যুকে আত্মবিসর্জন বলা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা আকস্মিক হত্যা, পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্যে ইহার কোনো সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি নাই। রমেশ ও প্রফুল্লের সম্বন্ধ পূর্বে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া তাহার হাতে প্রফুল্লের হত্যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত একটি লোমহর্ষণ ঘটনা বলিয়া মনে হয়। প্রফুল্লের মৃত্যুকালে অনেক ভালো ভালো আদর্শের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার জীবিত অবস্থায় এই সব আদর্শের সহিত কোনো কঠোর সংঘাত ঘটিতে নাটকের মধ্যে আমরা দেখি নাই। এই নাটকের ট্র্যাজেডি বিশেষভাবে যোগেশেরই ট্র্যাজেডি—আকস্মিক অবস্থা বিপর্যয়, মদ্যাসক্তি ও রমেশের কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্র এই ট্র্যাজেডি ঘটাইয়াছে। যোগেশের সঙ্গে তাঁহার আশ্রিত পারিবারিক চরিত্রগুলিও সর্বনাশের মুখে পড়িয়াছে। প্রফুল্ল যোগেশের সাজানো বাগানের একটি সেরা ফুল। বাগানের অনেক ফুলের সঙ্গে 'এই

ফুলটিও শুকাইয়াছে, কিন্তু তাহাই চরম বেদনা নহে। চরম বেদনা বাজিয়াছে বাগানের মালিকের বুকে যাহার চোখের সম্মুখেই একটি একটি করিয়া ফুল ঝড়িয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুর বেদনা বড় নহে, কিন্তু মৃত্যু ভোগ করিবার বেদনাই বড়। সেই বেদনাই 'প্রফুল্ল' নাটকের মূলকথা।

॥ হারানিধি (১৮৯০) ॥ 'হারানিধি' নাটকের বিষয় বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। মোহিনী নরপিশাচ পাষণ্ড হইলেও সে একেবারে রমেশের মতো স্নেহলেশহীন অমানুষ নহে, তাহার একমাত্র স্নেহের পাত্রী ছিল তাহার কন্যা হেমাঙ্গিনী, এবং এই কন্যার অসুখেই তাহার মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া গেল, আর নাটকখানির ঘটনা ঘুরিয়া গিয়া মিলনান্ত পরিণতি লাভ করিল। হেমাঙ্গিনীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দুইপক্ষের মিলন ঘটাইল বটে, কিন্তু তাহার এই মস্তিষ্ক-বিকৃতির তেমন জোরালো কোনো কারণ নাই। হেমাঙ্গিনী সখী সুশীলার সহিত বেশ রসের কথাবার্তা বলে, আবার অন্য সময়ে সে একেবারে ছেলেমানুষের মত সরল ও অনভিজ্ঞ—তাহার চরিত্রের এই ভাবানৈক্য খুবই চোখে পড়ে। 'হারানিধি' নাটকের ক্রিয়া এবং ঘটনা এক-তরফা নয়, মোহিনী শক্তিশালী দুর্বৃত্ত হইলেও তাহার প্রতিপক্ষও প্রবল। নব, অঘোর এবং কাদম্বিনী মোহিনীকে পাল্টা জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে একঘেয়ে করুণ রসের অত্যাচার হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। অঘোরের চমকপ্রদ ক্রিয়াকলাপ এবং witty কথাবার্তা সমস্ত নাটকখানিকে স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ন্যায় সরস, ধারালো এবং হাস্যরসাত্মক চরিত্র গিরিশচন্দ্র খুব কমই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। নাটকের সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট চরিত্র নীলমাধব। 'নীলদর্পণ'-এর নবীনমাধবের ন্যায় সে কেবল হিতোপদেশ আওড়ায় কোনো উত্তাপ উত্তেজনা যেন ইহার নাই।

॥ মায়াবসান (১৮৯৮) ॥ সামাজিক নাটক হিসাবে 'মায়াবসান'-এর কোনোই উৎকর্ষ নাই। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম এবং ক্ষমাধর্মের আদর্শে ধর্মনৈতিক ঐক্যবিধান করা দেশের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর।[১] 'মায়াবসান'-এর মধ্যে তিনি তাহারই আভাস

১। গিরিশচন্দ্র কুমুদবাবুকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বার বার দেশকে ব'লে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণধর্মে। বার বার তিনি সাবধান ক'রে গেছেন যে বিদেশীয় অনুকরণে রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশকে চালিত করো না—করলেই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হবে।'
গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য—পৃঃ ৭-৮

দিয়াছেন। উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া নাটকখানির মধ্যে ধর্ম ও নীতিকথার কচকচি বড় বেশি আছে। দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ধর্ম ও নীতির আদর্শ অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ বক্তৃতা অনেক স্থলেই ক্লান্তিকর ও বিরক্তিজনক হইয়াছে। এই নীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে অন্নপূর্ণা চরিত্রে। সে হঠাৎ যেন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া মৃত স্বামীর জন্য শোকাকুল হইয়া উঠিল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় স্বামীদেবতার জন্য তাহার 'কোথা প্রভু' 'কোথা প্রভু' ইত্যাকার ভাববিহ্বল উন্মাদনা নেহাত হাস্যকর হইয়াছে। কালীকিঙ্করের প্রতি রঙ্গিণীর ভালোবাসা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের (abnormal psychology) অন্তর্গত। তাহার প্রেম 'শেষ প্রশ্ন'-এর আশুবদ্দির প্রতি নীলিমার অনুরাগের কথা মনে করাইয়া দেয়। রঙ্গিণীকে রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ বলিয়া মনে হয় না; তাহার চরিত্রের মধ্যে কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আবেগ, বেদনা কিছুই নাই, সে যেন নিষ্কাম কর্ম এবং সেবাধর্মের একটা idea মাত্র। তত্ত্বকথা বলিতে কেহই ছাড়ে না, এমন কি ভৃত্য শান্তিরামও বাদ যায় না। বিজ্ঞ পণ্ডিতদের মত কথা না বলিলে এই চরিত্রটি ভালোই হইত। কালীকিঙ্করের ভূমিকায় চূড়ান্ত অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। একটা চরিত্র পাগল হইতে পারে, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে সেই পাগলামিরও একটা বিশেষ ঢং ও রীতি থাকা আবশ্যক। কালীকিঙ্করের পাগলামিও স্বাভাবিক নহে। তিনি নেহাত ভান করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, এবং রঙ্গিণীর অনুরোধেই হঠাৎ ভালো হইয়া উঠিলেন। কালীকিঙ্করের শিষ্যা রঙ্গিণী বটে, কিন্তু নাটকের মধ্যে তিনিই রঙ্গিণীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষমাধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।[১]

॥ বলিদান (১৯০৫) ॥ 'বলিদান' সমস্যামূলক নাটক, এবং বোধ হয় একমাত্র এই নাটকেই গিরিশচন্দ্র সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কন্যার বিবাহসমস্যা আমাদের সমাজের এক অতি বাস্তব সমস্যা, এবং অদ্যাপি সেই সমস্যা তিরোহিত হয় নাই। করুণাময়ের ন্যায় অনেক পিতা কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত হইয়া সারা জীবন চির অশান্তি ভোগ করিয়াছে, এবং কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর ন্যায় বহু হতভাগিনী বাঙালী ললনার জীবন শোচনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙালী সমাজের কন্যা যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের পাত্রী এবং বাপের বাড়িরও গলগ্রহ নাট্যকার তাহা নিপুণভাবে

১। 'মায়াবসান'-এর প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কালীকিঙ্করও বলিতেছে—'আমার মতে ভারতের রিলিজস ইউনিটি ভিন্ন অপর কোন ইউনিটি হ'তে পারে না।'

দেখাইয়াছেন। বস্তুত নারীচরিত্রগুলি অঙ্কনে তিনি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত নাট্যকলার সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি হয়তো ভাবিয়াছেন যে ট্র্যাজেডির কারুণ্য আনিতে না পারিলে সমস্যা সম্বন্ধে দর্শককে সম্যক্‌ভাবে অবহিত করা যাইবে না; সেইজন্য যে নাটকের মিলনান্ত পরিণতি হইতেছিল, অকস্মাৎ জবরদস্তি করিয়া তিনি তাহাকে বিষাদের মধ্যে ডুবাইতে চাহিয়াছেন। রূপ-চাঁদ এবং মোহিত-মোহনের সহিত করুণাময়ের মিলনে এবং কিশোর ও জ্যোতির্ময়ীর সুখকর পরিণয়ে বিষাদের সুরগুলি আনন্দের ঝঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ছেঁড়া তারগুলি পুনরায় বাঁধিয়া বীণায় সুর সংযোজন করা হইল, কে যেন এক টানে সেই তারগুলি সজোরে ছিঁড়িয়া লইল। গিরিশচন্দ্র শাস্ত্রবিহিত সতীত্ব-ধর্মকে রমণীর অক্ষয় শিরোভূষণ বলিয়া সর্বত্র দেখাইয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রমাত্রই স্বামীর চিন্তা ও ভক্তিতে তন্ময় এবং বিভোর। কিরণময়ী এবং জোবির স্বামী নরাধম পাষণ্ড হইলেও স্ত্রীর কাছে পরম আরাধ্য দেবতা। ইহাবা স্বামীকে চেনে না, জানে না, বুঝে না স্বামীরূপ idea-কেই ইহারা শ্রদ্ধা করিয়া, ভালোবাসিয়া যায়। 'বলিদান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্বালোচিত অনুরূপ চরিত্রগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁহার মধ্যে নিরুপায় প্রলাপের অতিশয্য নাই। কন্যাদের দুর্দশায় তাঁহার হৃদয় শতধা ছিন্ন হইয়া গেলেও তিনি নীরবে সমস্ত দুঃখ সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কন্যাদের প্রতি স্নেহপ্রাবল্য গোপন করিয়া এক কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

॥ শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮)॥ 'শাস্তি কি শান্তি' সমাজের বিধবা-সমস্যা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। বিধবার প্রেম এবং বিবাহ লইয়া বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক সমস্যাটি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল ছিলেন, সেইজন্য বিধবার চিত্তদৌর্বল্য এবং বিবাহ তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই,[১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্র বিধবাজীবনের করুণ ট্র্যাজেডি মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিধবাকে হৃদয়চালিত না দেখিয়া, শাস্ত্রশাসিত দেখিতে

১। 'গিরিশচন্দ্র যে ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।' গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫৯

চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বিধবা-চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া অমঙ্গলের ক্লেদ-পঙ্ক ঘাঁটিয়া দুর্গন্ধে সমস্ত নাটক ভরপুর করিয়া তুলিয়াছেন। আর্টের তুলিকা ফেলিয়া তিনি নীতির কশা ধরিয়াছেন এবং সেইজন্য চরিত্রগুলির মনোহর চিত্র না আঁকিয়া, তাহাদিগকে নির্দয় আঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছেন। ভুবনমোহিনী এবং প্রকাশের প্রেমের আদানপ্রদান এবং দ্বন্দ্ব তিনি বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখাইতেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে হইল যে এইরূপ অমার্জনীয় স্খলনের জন্য সাজা প্রয়োজন—এবং সাজা তিনি দিয়াছেনও—অবশ্য একটু বেশি কঠোরভাবে। প্রমদার পুনরায় বিবাহ হইয়াছে কিন্তু বিবাহিত বিধবার সুখী হইতে নাই—এই দুর্লঙ্ঘ্য বিধান অনুযায়ী সে তাহাব বিবাহিত জীবনকে ধিক্কাব দিয়া এক রাত্রিকার স্বামীর স্বর্গীয় স্মৃতি বুকে করিয়া জীবন সফল করিয়াছে। নীতিশাস্ত্রে হযতো ইহাব খুব মূল্য ও মর্যাদা আছে, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে ইহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্রের আদর্শ বিধবা নির্মলা, যে হৃদয়ের দ্বারে পাথর চাপা দিয়া কৃচ্ছ্রতা ও ব্রহ্মচর্যের ক্ষুরধাব পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাদের শাস্তি দিযাছিলেন—কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া এবং রোহিণীকে পিস্তলেব গুলিতে বধ করিয়া। কিন্তু গিবিশচন্দ্র একটা মৃত্যুতে সন্তুষ্ট নহেন, নাটকখানিকে করুণ এবং বিষাদান্ত করিতে তিনি শেষ দৃশ্যে পটাপট মৃত্যু ঘটাইযা দিয়াছেন—যেন কে কত ছুবিকাঘাত করিতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা সেখানে চলিয়াছে।

॥ গৃহলক্ষ্মী (১৯১২ ॥ গিবিশচন্দ্রের সর্বশেষ সামাজিক নাটক 'গৃহলক্ষ্মী'। নাটকখানির পঞ্চম অঙ্ক গিবিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃস্বস্রেয় দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু গিরিশ ন্দ্রের নাট্যরীতি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি গিরিশবাবুর অন্যান্য নাটকের অনুকরণে এই নাটকেও প্রলাপ, খুন,[১] দারোগা-পুলিশ প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারগুলি আমদানী করিয়াছেন। 'গৃহলক্ষ্মী' ঘটনা এবং চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের পুনরাবর্তন মাত্র। তবে এই নাটকের চরিত্রগুলি খুব সজীব ও সক্রিয় হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নারীচরিত্র হয় সতীচূডামণি, অথবা সমাজ-চ্যুত বেশ্যা. কিন্তু এই নাটকের চরিত্রগুলি অত স্পষ্ট ও সরল নয়। গৃহলক্ষ্মী বিরজাই প্রকৃতপক্ষে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিরজা সকলের প্রতি অশেষ স্নেহময়ী এবং মমতাময়ী অথচ গৃহকর্ত্রীর শক্তি এবং দৃঢ়তাও তাঁহার আছে,

১। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য

সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সবল প্রচেষ্টা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যাহাদের সহিত তিনি ঝগড়া করেন তাহাদের জন্যই তাঁহার অপরিসীম মমতা হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে। বিরজার ন্যায় ব্যঞ্জনাময় কৌতূহলোদ্দীপক নারী-চরিত্র গিরিশচন্দ্র বেশী সৃজন করেন নাই। তরঙ্গিণী পুত্রের সহায়তায় স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে—ইহাতেও একটু নূতনত্ব আছে। কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকে স্বাভাবিক স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে—এরূপ ঘটনা সুলভ নহে। কুমুদিনী চরিত্রের মধ্যে বেশ্যাজীবনের জঘন্য বাস্তবতা চিত্রিত হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নাই।

(ঘ) ঐতিহাসিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটক যেমন অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক তেমন হয় নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে তৎকালীন জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। গিরিশচন্দ্রের যুগ নব ধর্মোত্থানের যুগ। ধর্মাদর্শ এবং প্রাচীন সংস্কৃতি তখন সর্বসাধারণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্মবিচ্ছিন্ন জাতীয়ভাব তখন লোকের চোখে গৌণ হইয়া আসিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকাবলী দেশের মধ্যে স্বদেশী ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙালীর সেই প্রথম জাতীয় উন্মাদনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর স্বদেশী ভাব-প্লাবন সাময়িক ভাবে শান্ত ও নিরুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়াছিল, ১৯০৪-০৫ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' রচনার পর হইতে আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আরম্ভ হইল এবং ইহাই ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' প্রণয়ন করেন। তখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময়, বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়াছে—পুরুষসিংহ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সর্বত্র উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের আর অন্ত নাই। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে বাঙালীর অতীত স্বাধীনতাসূর্যের অস্ত-রাগের করুণ রশ্মিগুলি ফুটাইয়া তুলিলেন, উৎসাহিত জনগণ সাদরে তাহা বন্দনা করিয়া লইল।[১] 'সিরাজদ্দৌলা'র পরে তিনি 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি

১। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে বৎসর ত্রিশ'—পৃষ্ঠা ১০৭-১১০ দ্রষ্টব্য।

শিবাজী'—এই দুইখানা নাটক রচনা করেন এবং ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে এই তিনখানা সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যথাসম্ভব ইতিহাসের প্রতি অনুগত্য রক্ষা করিয়াই নাটক লিখিতেন। কোনো ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে নাটক লিখিবার পূর্বে তিনি সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করিতেন।[১] ইহাতে তাঁহার নাটকগুলি ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে একটা উন্নত মহিমময় grandeur থাকা প্রয়োজন এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা ভালোভাবেই আছে। বীররস পরিস্ফুটনে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। ঘটনার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শক্তিশালী ভাষার প্রয়োগে নাটকগুলি বীররসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার ভাষা-রীতিই আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে পদ্য একেবারে বর্জিত হইয়াছে এবং ভাষার দিক দিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'।[২] টডের 'রাজস্থান'-এর অন্তর্ভুক্ত Annals of Mewar-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে চণ্ডের কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই কাহিনীর সহিত ঐক্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। কাহিনীটির মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, এবং নাট্যকার নাটকীয় সংস্থান সৃষ্টি করিতে বিশেষ কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রেম ঈর্ষা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির লীলা থাকিলেও মেবার ও রাঠোরের বিরোধের বিষয়টি ভালোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকখানি অমিত্র ছন্দে রচিত এবং মাঝে মাঝে গদ্যও আছে। অমিত্র ছন্দ ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র পরিপূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বীররস পরিস্ফুটনে এই ছন্দ বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। 'চণ্ডে'র মধ্যে অবান্তর ও দুর্বল অংশ খুব কমই আছে। দৃঢ়-সংহত ঘটনারাশি যেন ঝড়ের বেগে বহিয়া গিয়াছে। চণ্ডের আক্রমণ-দৃশ্যের মত উত্তেজনাপূর্ণ

১। 'তাঁহার লিখিবার একটা পদ্ধতি ছিল এই যে তিনি যে বিষয়ে লিখিতেন, যে বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানিয়া "শ্রীদুর্গা" ফাঁদিতেন না।'

'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃঃ ১২৮

২। অবশ্য 'আনন্দ রহো' সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক হইলেও ইহা নিতান্ত-অক্ষম রচনা বলিয়া আলোচনার যোগ্য নহে।

বীররসাত্মক দৃশ্য খুব কম নাটকেই আছে। চণ্ড বীরত্ব ও মহত্ত্বের আধার, ভীষ্মের ন্যায় ত্যাগী এবং উদার—সে কামাতুর পিতার বিবাহ দিয়াছে,' নিজে রাজ্যভোগের সব আশা ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রকৃত বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় ভ্রাতার রাজ্য চালাইয়াছে। যে বিমাতা এত অন্যায় করিয়াছে তাহার প্রতি চণ্ডের ভক্তিশ্রদ্ধার আর সীমা নাই। চণ্ডের চরিত্র আগাগোড়া যদি এরূপ থাকিত তবে হয়তো মহাপুরুষ বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু হৃদয়বান প্রবৃত্তিময় মানুষরূপে তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু শেষে চণ্ডের দুর্জয় প্রতিশোধস্পৃহা এবং অমিত বীর্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকে বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ নাই। চণ্ডের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোরাধিপতি রণমল্ল। তৃষ্ণার্ত অজগরের মত ক্রূর জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া সে সমস্ত মেবার-বংশকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছিল। অন্তিম দৃশ্যে তাহার স্পর্ধিত বীরত্ব দেখিয়া আমরা বুঝি যে সে কামান্ধ নির্দয় দুর্বৃত্ত হইতে পারে কিন্তু কখনো কাপুরুষ নয়। তাহার মৃত্যুর সময় মনে হয় যেন একটা অশুভ নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। নাটকের মধ্যে রঘুদেবজীর সামান্য অংশই আছে। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পরও যেমন তাহার ভাব (spirit) নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনি রঘু'দবের স্মৃতি এই নাটকেও সব চরিত্রগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে।[১] বিজরীর প্রেম এবং প্রতিহিংসা নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। বিজরীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার রঘুদেবের মৃত্যু এবং রণমল্লের পতনের সঙ্গত কারণ দেখাইয়াছেন। বিজরী সব ঘটনাগুলিকে দৃঢ় রজ্জুর দ্বারা একত্রে বাঁধিয়াছে।

॥ ভ্রান্তি (১৯০২) ॥ 'ভ্রান্তি' নাটকখানিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়তো সঙ্গত হইবে না, কারণ নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক বাঁধুনি খুবই আলগা এবং অসংলগ্ন, কোনো ইতিবৃত্তমূলক ঘটনার প্রাধান্যও ইহাতে নাই। ইতিহাসের ছায়া থাকিলেও ইহাকে প্রেম এবং ঈর্ষামূলক রোমান্টিক নাটক বলাই বোধ হয় সমীচীন। নাটক হিসাবে ইহা নিতান্ত নিকৃষ্ট। ইহার ঘটনা-সংস্থাপন, চরিত্র-চিত্রণ. কথোপকথন কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। নাটকের যে মূল ভ্রান্তি

১। **'Raghudeva was so much beloved for his virtues, courage and manly beauty, that his murder became martyrdom, and obtained for him divine honours, and a place amongst the 'Dii patres' (Pitri deva) of Mewar'.**

Annals of Mewar (*Rajasthan*)

তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও সামান্য। নিবঞ্জন যদি ললিতার নাম মাধুবী বলিয়া ভুল না করিত, তবে এই বিরাট নাটকের এত ব্যাপাব কিছুই ঘটিত না। গ্রীকগণ ভুলকে পাপ বলিযা মনে করিতেন বটে, তবে ট্র্যাজেডিব মধ্য দিয়া সেই পাপেব প্রায়শ্চিত্তবিধান করিতেন।[১] কিন্তু সেই ভুল সর্বত্র বিশেষ গুরুতর ও মাবাত্মক হইত। ইডিপাসেব মতো চবম ভুল যে কবিযাছে, তাহাব চবিত্রই কেবল ট্র্যাজেডিতে অবসিত হইযাছে। • কিন্তু 'ভ্রান্তি' নাটকের ভুল নিতান্তই অতি সাধাবণ আকস্মিকতাব উপব প্রতিষ্ঠিত। নিবঞ্জন এবং ললিতাব মধ্যে কয়েকবাব দেখা হইয়াছে, কথাবার্তা হইযাছে, অথচ যাহা মুখেব একটি কথাতেই উডিযা যাইত, তাহাকেই অনর্থক পাকের পবে পাকে ঘোবালো কবা হইয়াছে। কোনো ঘটনাবই যৌক্তিকতা নাই। নাট্যকার গাযেব জোবে যেন কতকগুলি দৃশ্য ঢুকাইযা দিযাছেন। আকস্মিক কিংবা দৈব ঘটনা কমেডির বিষয় হইতে পাবে। আলোচ্য নাটকেব ভ্রান্তিও চমৎকাব কমেডি সৃষ্টি কবিতে পাবিত, নাট্যকাব নাটকখানাকে ট্র্যাজেডি কবিতে যাইয়া সব মাটি কবিযাছেন।

॥ সংনাম (১৯০৪) ॥ মোগল সম্রাট আওবঙ্গজেবেব বিরুদ্ধে যে সংনামী সম্প্রদাযেব বিদ্রোহ হইয়াছিল সেই কাহিনী লইযা গিবিশচন্দ্র 'সংনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক প্রণযন করেন। স্বাধীনতাকামী, ব্রতধারী সম্প্রদায়েব আশা ও আশাভঙ্গেব কথা নাটকে চমৎকাব ফুটিযাছে। প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেমেব সহিত হৃদয-বৃত্তিব দুর্বল তাডনাব দ্বন্দ্ব কিভাবে মহৎ ব্রত ভঙ্গ কবিয়া দিতে পাবে তাহাব শোচনীয দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেখাঃ যাছিলেন 'আনন্দমঠ'-এর ভবানন্দ চবিত্রে, এবং গিবিশচন্দ্র দেখাইলেন বণেন্দ্র চ বত্রে। কিন্তু ভবানন্দ শেষ পযন্ত স্বাধীনতাব যুদ্ধে নিজেব দুর্বলতাব প্রাযশ্চিত্ত করিযাছে, আব রণেন্দ্র যেন মৃত্যুব পূর্ব মুহূর্তেও দুর্বলতাব কাছে আত্মসমর্পণ কবিযাছে। 'আনন্দমঠ'-এব ন্যায় 'বৈষ্ণবী' নাটকেও স্বদেশ প্রেমেব প্রবল জলপ্রবাহেব মধ্যে হৃদযেব দুষ্প্রতিবোধ্য সনাতন প্রবৃত্তি এক একটা জটিল ঘূর্ণাবর্তেব সৃষ্টি কবিযাছে,

১। গ্রীক ট্র্যাজেডিব আলোচনা পসঙ্গে W M. Dixon বলিয ছেন—

'We shall not be far wide of the truth if we say that for the clear eyed intellectualism of the Greeks error was sin and sin error, miscalculation, in short, a form of guilt, for which Nature had no forgiveness.'

Tragedy—P 131-32

এবং সেই আবর্তের মাঝে শক্তিধর ব্রতনিষ্ঠাও তলাইয়া গিয়াছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ব্রতচ্যুত হৃতগৌরব সম্প্রদায়িদের দুর্দশা দেখিয়া বিদ্রোহের মূল চালক ফকিররাম যে মর্মবিদারী খেদোক্তি করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় আমাদের পঞ্জরাস্থি যেন একটার পর একটা খসিয়া যাইতেছে। নাটকখানির সর্বপ্রধান ত্রুটি হইতেছে মৃত্যুর বাহুল্য, পর পর সাতটি চরিত্রের পতন ও মৃত্যু ঘটাইয়া গিরিশচন্দ্র নাটকখানির সর্বনাশ করিয়াছেন, ট্র্যাজেডির গম্ভীর মাহাত্ম্য নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হইয়াছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈষ্ণবী শক্তিশালী বীরাঙ্গনা হইলেও রণেন্দ্র, ফকিররাম, চরণদাস প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভূমিকার পাশে তেমন একচ্ছত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই। চরণদাসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশল এবং গুরুর প্রতি তাঁহার অহেতুকী ভক্তি এই ভূমিকাটিকে বেশ সরস ও প্রাণবান করিয়াছে। গুলসানার প্রেম এবং প্রতিহিংসার দ্বন্দ্বও বিশেষ চমৎকারিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তবে মনে হয়, ঘটনা এবং চরিত্রগুলি যেন তাহার বড়ো বেশি বশীভূত হইয়াছে। সৎনামীরা তাহাকে সর্বনাশের কারণ জানিয়াও যেন নিঃশক্তি হৃতবল হইয়া পড়িযাছে, তাহাকে যেন অলজ্ঘ্য শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে দমন করিবার তেমন চেষ্টা করে নাই।

'বাসর' এবং 'অশোক'-এর প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক, সেই জন্য ঐতিহাসিক নাটকের সহিত ইহাদের আলোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই নাটক দুইখানির মধ্যে ঐতিহাসিক ভাব এবং আবহাওয়ার (atmosphere) একান্ত অভাব। ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গীভূত বীররসও ইহাদের মধ্যে নাই; 'বাসর'-এর মধ্যে গীতি এবং হাস্যরস ও 'অশোক'-এর মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বাসর'কে রোমান্টিক এবং 'অশোক'কে ধর্মমূলক নাটক বলিলে অন্যায় হয় না।

॥ বাসর (১৯০৬) ॥ 'বাসর' নাটকের কাহিনীটি বিশেষ চমকপ্রদ, বিক্রমাদিত্যের পরিচয় বিম্বাবতীর কাছে অপরিজ্ঞাত রাখিয়া নাট্যকার যে suspense-এর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা খুব কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। নাটকটির মধ্যে অনেকগুলি গান আছে। ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো গানগুলি কানের মধ্যে যেন কেবলি অনুরণিত হইতে থাকে। হাস্যরসাত্মক চরিত্র নাটকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হাস্যরস উদ্রেক করে।

॥ অশোক (১৯১১) ॥ ইতিহাসের প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া নিজের মৌলিক কল্পনাও খানিকটা মিশাইয়া গিরিশচন্দ্র 'অশোক' নাটক

রচনা করিয়াছেন।[১] অশোক-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা করিতে যাইয়া নাট্যকার নাটকীয় ঐক্য অনেক স্থলে নষ্ট করিয়াছেন, এবং চরিত্রগুলি ক্রমবিকশিত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক নাটক হইলেও ধর্মভাবের প্রাধান্য ইহার মধ্যে বিশেষভাবেই আছে। শেষদিকে বৌদ্ধ ধর্মাপ্লব নাটকখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে মার ও তৃষা অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্য এই দুই শক্তির সহিত ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদের ধর্মমূলক দ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে যেন বক্তব্য তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অশোক' নাটকে ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বীভৎস পাপলীলার বর্ণনা আছে, কিন্তু অসংলগ্নভাবে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই সব ঘটনা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অশোক চরিত্রের দুই রূপ—চণ্ডাশোক এবং ধর্মাশোক। নাটকের মধ্যে অশোক বহুতর নৃশংস কাজ করিয়াছেন, এমন কি ধর্মত্বলাভ করিয়াও তিনি জৈনদের উপর অকথ্য অত্যাচার, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি পাপ-কর্মে লিপ্ত হইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্যমণ্ডিত, শ্রদ্ধাব্যঞ্জক দিকটা তেমন বিকশিত হয় নাই। শেষ দৃশ্যে অশোক পরিপূর্ণ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বীতশোক চরিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। আকালের ন্যায় প্রভুভক্ত হাস্যরসিক চরিত্র গিরিশচন্দ্র বহু সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য এই ভূমিকার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই।

॥ সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬)॥ গিরিশচন্দ্র যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করেন তখন ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ শুরু হইয়াছে। নবজাগ্রত বাঙালীর চিত্তবিক্ষোভ সে-সময় দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-প্রতিভাকে অনুরণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রও সমসাময়িক নাট্য প্রবণতার দিকে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, কিছু কালের জন্য ভক্তিসিক্ত পৌরাণিক জগৎ ও অশ্রুপ্লুত সামাজিক সংসার হইতে তাঁহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া উদাত্তভাবরঞ্জিত ঐতিহাসিক লীলাভূমির দিকে প্রসারিত করিলেন। এই নূতন নাট্যসাধনাতেও তিনি সাফল্যলাভ করিলেন। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক

১। সে সময় অশোক সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তন্ন তন্ন তাহার অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে নাটক ইতিহাস নহে, ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র নিঃশঙ্কচিত্তে সে সকল গ্রহণ করিয়াছেন।'
'গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৭২

'সিরাজদ্দৌলা' প্রশংসিত ও সম্বর্ধিত হইল—স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের কথায়, 'আমার "সিরাজদ্দৌলা" যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য'। পরবর্তীকালের ফেনকল্লোলিত ঐতিহাসিক নাট্যধারায় সিরাজদ্দৌলার দুঃখভারাক্রান্ত জাতীয়তাবাদ যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই।

'সিরাজদ্দৌলা' রচনা করিবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাংলার এই হতভাগ্য নবাব সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী লেখকদের ইতিহাস হইতে কোনো কোনো ঘটনা গ্রহণ করিলেও দেশী লেখকদের বিশেষ করিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নিখিলনাথ রায়ের নবলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যই তাঁহার নাটকের মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। জাতীয়তাবাদী বাঙালী ঐতিহাসিকদের সত্যসন্ধিৎসা তাঁহাকে এতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে, তাঁহার নাটক পড়িলেই মনে হয়, নানা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা বিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়া একটি নূতন ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটন করা যেন তাঁহারও উদ্দেশ্য। সেজন্য তাঁহার নাটকে অনেকস্থলেই রসাশ্রয়ী কথা ও কাহিনীর পরিবর্তে ইতিবৃত্ত-মূলক ঘটনা ও বক্তৃতার প্রাধান্য দেখা গিয়াছে—ঐতিহাসিক আসিয়া যেন নাট্যকারের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি এতখানি আগ্রহ ও আনুগত্য থাকাসত্ত্বেও তাঁহার নাটকীয় রসের প্রেরণা ও পরিণতির মধ্যে প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে সে আলোচনাই এখন আমরা করিব।

সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় হইতে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁহার শোচনীয় পরিণতির পর মীরজাফরের মসনদলাভে ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। বাংলার এই শেষ স্বাধীন নবাব যে অশুভ মুহূর্তে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন হইতে চতুর্দিকে যে বিষশ্বসিত অন্তর্বিরোধের কৃষ্ণকুটিল মেঘরাশি সেই সিংহাসনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা বাংলার ইতিহাসের চিরন্তন লজ্জাকলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সেই অধ্যায় দুঃখবিচলিত নাট্যকারের নাটকে সম্পূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছে। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী-রাজবল্লভ-মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র, সওকতজঙ্গের পতন, ইংরাজের সহিত বিরোধ ও পলাশীক্ষেত্রে তাহার দুঃখাবহ পরিণতি, সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যু, ইত্যাদি মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি প্রায় যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। দুই এক জায়গায় কেবল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করা হইয়াছে।

নাটকের সাধারণ চরিত্রগুলি মোটামুটি ঐতিহাসিক রূপের সহিত অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। জায়গায় জায়গায় নাট্যকার ইতিহাসের পূর্ণতর রূপ দেখাইয়াছেন, যেমন দানশা চরিত্রটি। দানশার পূর্ববঙ্গীয় কথা ও তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তির যে সকারণ ঘটনাশ্রিত রূপ নাটকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে তাহাতে চরিত্রটির নাটকীয় উপযোগিতা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিরাজপত্নী লুৎফউন্নেসার যে দুঃখ মমতা ও সহিষ্ণুতায় গড়া মূর্তিটি নাটকে দেখান হইয়াছে তাহাও ইতিহাসের বস্তুময়তা ছাড়াইয়া কাব্যের রসলোকে প্রবেশ করিয়াছে।[১] কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, নাট্যকার প্রধান তিনটি চরিত্রের বেলাতেই ইতিহাসকে হয় আচ্ছন্ন, আর না হয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই তিনটি চরিত্র হইল—নায়ক সিরাজদ্দৌলা, প্রধান পার্শ্ব-চরিত্র করিমচাচা ও নাটকের প্রলয়ঙ্করী নিয়ন্ত্রী-শক্তি জহরা।

সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে নাট্যকার কিরূপ ধারণা গঠন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভূমিকাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজে'র যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন তাহাই নাট্যকারের মানসকল্পনায় অঙ্কিত হইয়াছিল। নাট্যকার সিরাজের মুখে শুনাইলেন,

> 'রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার,
> নবাব রাজ্যের ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে,
> প্রজার মঙ্গলকার্য্য সতত সাধন,
> নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।'

নাটকের শেষে করিমচাচা জহরাকে বলিয়াছে, 'বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। সে ছিল মাতাল, - আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব'। এই সব উক্তির মধ্য দিয়া সিরাজচরিত্রের উপর যে আলোকপাত করা হইয়াছে তাহা কি সত্যই প্রকৃত ইতিহাসসম্মত? বিদেশী ঐতিহাসিক বিদ্বেষচালিত হইয়া প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছিলেন তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকগণও এককালে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিরূপ সত্যকে ভাবের মায়াজালে রঙীন ও মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা ঐতিহাসিক নহি, ইতিহাসের সত্যাসত্য

১। নাট্যকার সম্ভবত নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র 'লুৎফ উন্নেসা' ও 'খোসবাগ' প্রবন্ধ দুইটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লুৎফউন্নেসার চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সিরাজের যে চরিত্র চিত্রিত করিলেন তাহার সহিত নবাবের সমসাময়িক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণের কোনো মিল খুঁজিয়া না পাইয়া বিভ্রান্ত হই। সিরাজ সিংহাসনপ্রাপ্তির পরেও মোটেই নিরীহ ও প্রজাবৎসল ছিলেন না, তাহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মুতক্ষরীণে বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। মুতক্ষরীণে সিরাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, অতিশয় নির্বোধ ও দাম্ভিক এবং হিতাহিত ও পাপপুণ্য-জ্ঞানশূন্য ছিলেন।[১] সিরাজের বিরুদ্ধে যে তৎকালীন প্রায় সমস্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী স্বয়ং নবাব। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি এবং সম্মান-ভাজন ব্যক্তিগণ সিরাজের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াই তাঁহার শাসন উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।[২] তাঁহাদের কার্য কোনোক্রমে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু সিরাজের আচরণও কিছুতেই প্রশংসা করা চলে না। শুধু প্রধান ও পদস্থ ব্যক্তিগণ নহেন, সাধারণ লোকও তৎকালে এই বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী নবাবকে যে খুব সমর্থন করিত তাহাও মনে হয় না। পলাশী-ক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর সিরাজ রাজকোষের সমস্ত ধন ও রত্নরাশি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াও সাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলেন না।[৩]

১। 'As for himself, he was ignorant of the world, and incapable to take a reasonable party, being totally destitute of sense and penetration and yet having a head so obscured by the smoke of ignorance, and so giddy and intoxicated with the fumes of youth and power and dominion that he knew no distinction betwixt good and bad, nor betwixt vice and virtue.'

Seir Mutaqherin (Vol. II), p 188-189

২। '.. all commanders of character, all deserving the utmost regard, and all thoroughly estranged from him by his harsh language and his shocking behaviour, nor were the principal citizens of Morshod abad better used' —*Ibid*, p. 193

৩। 'He had never thought of being liberal, nor ever had entertained any thoughts about restraining either his tongue or hand from injuring and oppressing people, and now that the day of retribution was already at hand, the day when he was in the turn to suffer all kinds of torments in his own person, he betook himself to a distribution of treasures.'

Ibid, p. 235

রণক্ষেত্রে ও রাজদরবারে সিরাজের কোনো অসাধারণ সাহস ও স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয়ও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নাটকে সিরাজের মুখে আমরা শুনি—

> শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
> বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
> স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
> হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।

কিন্তু ইতিহাসে এসব কথার কোনো প্রতিধ্বনি আমরা খুঁজিয়া পাই না। মুতক্ষরীণে লেখা আছে যে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও অনুৎসাহের সহিতই সিরাজ পলাশীক্ষেত্রের দিকে রওনা হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণের বিশৃঙ্খলা ও পলায়ন দেখিয়া নিতান্ত কাপুরুষের মতই পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন।[১] রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াও সিরাজ নিজের নিরাপত্তার জন্য যতখানি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ততখানি ব্যাকুল হন নাই। কিন্তু এসবসত্ত্বেও সিরাজ-চরিত্র জাতীয় দৃষ্টিতে অত্যন্ত করুণ ও শোকাবহ। সেই কারুণ্য ও শোকাবহতা ফুটাইতে যাইয়াই নাট্যকারকে ইতিহাসের অপ্রীতিকর সত্যকে আচ্ছন্ন করিতে হইয়াছে।

নাটকের অপর দুইটি প্রধান চরিত্র যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক তাহা নাট্যকারও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে এই অনৈতিহাসিক স্বীকৃতি অত্যন্ত হাস্যকর হইয়াছে। করিমচাচা জহরাকে বলিয়াছে, 'এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে! বেইমান কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না।' এই উক্তি নাট্যকারের মুখে মানায় কিন্তু করিমচাচার মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে সম্ভব? নাটক ইতিহাস নহে; সেজন্য রসপূর্তির প্রয়োজনে ইতিহাসকে সামান্য পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিবার অধিকার নিশ্চয়ই নাট্যকারের আছে। কিন্তু নাটকের মূলশক্তি যদি কোনো অনৈতিহাসিক ঘটনা কিংবা চরিত্র হয় তবে সেই নাটকের ঐতিহাসিকতা কিরূপে রক্ষিত হয়? আমাদের বিশেষ আপত্তি জহরা চরিত্রটি সম্বন্ধে। এই চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের

১। 'Confounded by that general abandonment, he joined the runaways himself, and after marching the whole night, he the next day at about eight in the morning arrived at his palace in the city.'

Ibid, p. 234

অনুচিত পক্ষপাতিত্বের ফলে নাটকের সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার শক্তি ও সংঘাত যেন শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, সমস্ত গুরুতর ঐতিহাসিক কার্যকারণের উপরে একটি প্রতিহিংসাময়ী নারীর প্রলয়ঙ্করী শক্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছে আর বাংলা ও বাংলার নবাব সেই বহ্নিজ্বালায় পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের অসঙ্গত বিকৃতি সন্দেহ নাই। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, 'এরূপ অদ্ভুত চরিত্র বোধ হয় শেকস্‌পিয়রও কোন নাটকে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।'[১] শেকস্‌পিয়রের চরিত্র আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চরিত্রটি যে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জহরা সর্বগ ও সর্বজ্ঞ—সে যেমন নিমেষের মধ্যে ঘসেটী, মীরজাফর, করিম, ক্লাইভ, ওয়াটস্‌ ও সিরাজ, সকলের কাছেই উপস্থিত হইতেছে, তেমনি এক আশ্চর্য শক্তির বলে সব কথা ও কাজই যেন জানিয়া লইতেছে—রাজনীতি, কূটনীতি, রণনীতি, ধর্মনীতি, কোনো নীতি জানিতেই তাহার আর বাকি নাই। তাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া উঠে তখন যখন গোটা বাংলা দেশটা সর্বনাশের মুখে সঁপিয়া দিবার পর তাহার মুখে একটা তরল গরিমান্বিত কৈফিয়ৎ শুনিতে পাই—'নারীর পতি সর্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীতি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর তোমরা স্বার্থপর।' অর্থাৎ পতি-ভক্তির তরণী লইয়া জহরা বুক ফুলাইয়া বৈতরণী পার হইয়া গেল এবং আর সকলে সেই বৈতরণীতে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। যে পতি ঘসেটী ও আমিনার দ্বৈতপ্রেমে মজিয়াছিলেন তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্যই এত বড় অপরাধ, আর সেই অপরাধের এতখানি গৌরবান্বিত স্বীকৃতি! ইহাতে নাটকখানির ঐতিহাসিকতা যেমন ক্ষুন্ন হইয়াছে তেমনি এক হাস্যকর অসঙ্গতিতে চরিত্রটি ভরিয়া উঠিয়াছে।

নাটকের আর একটি প্রধান অনৈতিহাসিক চরিত্র হইল করিমচাচা। করিমচাচার ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অবতীর্ণ হইতেন বলিয়া ভূমিকাটির গুরুত্ব ও খ্যাতি অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চরিত্রটি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহা সরস হইলেও অভিনব নহে। কারণ চরিত্রটি দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে বাতুল, আকাল, বিদূষক, কঞ্চুকী, পূর্ণরাম ভাট, বরুণচাঁদ, ভজহরি প্রভৃতি বহু চরিত্রের কথা মনে পড়িয়া যাইবে। বাহ্যত ইহারা নির্বোধ, নিষ্কর্মা

১। গিরিশ প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৮১

ও নেশাখোর, কিন্তু আসলে ইহারা সহৃদয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল। পৌরাণিক নাটকে ভক্তি, সামাজিক নাটকে পরোপকার ও ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রীতিই হইল ইহাদের মূল ধর্ম। করিমচাচার হাস্য-বিদ্রূপের অন্তরালে লাঞ্ছিত বঙ্গদেশ ও তাহার ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবের প্রতি যে বিষণ্ণ সমবেদনা বর্তমান তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তাহার আপাত-তরল উক্তির আবরণ উন্মোচন করিলেই বিরোধী পক্ষের প্রতি তাহার তীব্র নিন্দা এবং সিরাজের প্রতি সতর্কীকরণের ভাব লক্ষ্য করা যায়। জহরার মত করিমেরও একটা সবজান্তা শক্তি আছে, অথচ একটা নিষ্ক্রিয় জড়তায় তাহাব সমস্ত সুপ্রবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য অনিবার্য ঘটনার উপর কোথাও তাহার সক্ষম ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। করিম নাট্যকারের মুখপাত্র। সেজন্য তাহার বক্তৃতা বক্তব্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং নাটকের সংলাপ বহু স্থানেই ইতিহাসের ভাষ্যে পবিণত হইয়াছে। চরিত্রটি কর্মে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র শেষদিকে, যেখানে সিবাজকে রক্ষা করিরার জন্য সে তাহার সহিত পোষাক অদলবদল করিয়াছে। অসহায় নবাবকে বাঁচাইবার জন্য তাহার একমাত্র সুহৃদের এই সর্বশেষ চেষ্টা আমাদেব অন্তঃকরণ নিঃসন্দেহে এক করুণ বেদনায় পূর্ণ করিয়া তোলে।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের বোধহয় সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল, ইহাব ঘটনা ও চরিত্রের অত্যধিক বহুলত্ব। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নাট্যকাবকে এত বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল যে নাটকেব প্রয়োজন অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সিরাজের পাবিবারিক পরিবেশ সওকতজঙ্গেব বিবরণ, বিদ্রোহী নায়কদের বর্ণনা এবং ইংবাজদের বৃত্তান্ত, সব এই নাটকে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। সেজন্য নাটকের মূল সূত্র অনেক স্থলেই হারাইয়া গিয়াছে এবং অবান্তর ও বিক্ষিপ্ত ঘটনারাশির মধ্যে কোনো সুনিবিড় রসেব ঐক্য জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। সিরাজের চরিত্র নাটকে অনন্য প্রাধান্যলাভ করে নাই বলিয়া দর্শকদের সহিত তাহার কারুণ্য-সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিশেষত সিরাজের মৃত্যুর পর ক্লাইভ ও মীরজাফর-বৃত্তান্ত আমাদের রসবেদনাকে লঘু ও বিভক্ত করিয়া ফেলে।

ইতিহাসে যাহাই থাকুক, নাটকের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাকে আমরা এক স্নেহপূর্ণ, ক্ষমাশীল ও স্বদেশবৎসল নবাবরূপেই দেখিতে পাই। মাঝে মাঝে একটু খেয়ালী অশোভন আচরণ দেখা গেলেও কোনো গুরুতর অপরাধের স্পর্শ

তাঁহার চরিত্রে নাই। উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রীতি ও সুতীব্র ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহার চরিত্রকে গভীর জাতীয়তায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র যতখানি আদর্শান্বিত হইয়াছে ততখানি রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। বহু চরিত্রের ভিড় যেমন তাঁহার আত্মপ্রকাশে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে তেমনি দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে তাঁহার চরিত্রের সচল শক্তিমত্তার দিকটি অপরিস্ফুট:রহিয়াছে। তাঁহার পরিণতি অত্যন্ত ট্র্যাজিক কিন্তু এই ট্র্যাজেডি কোনো আন্তর-সংঘাতের অনিবার্য ফল নহে, ইহা বাহিরের শক্তিসংঘাতের সুকরুণ পরাজয়।

(ঙ) পঞ্চরং এবং গীতিনাট্য

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি প্রহসন রচনা করিয়াছেন, এইগুলি পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তমীতে বিসর্জন',[১] 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতি পঞ্চরংগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পূজা অথবা বড়দিন উপলক্ষে হীন আমোদ-প্রমোদ লইয়া এইগুলি রচিত। ইহাদের আকার খুব সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনা নিতান্ত সাধারণ ও সরল। অধিকাংশ প্রহসনগুলিই ইতর পল্লীর কদর্য আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। পাত্রপাত্রীগুলি কুৎসিত পঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের কথাবার্তা সেই পঙ্কের দুর্গন্ধ বাতাসে কলুষিত। নাট্যকার অনেকগুলি প্রহসনে আধুনিক সভ্যতাভিমানী, উন্মার্গগামী, সমাজের রীতিনীতির কমলবনে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহারী বাবুদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেই ব্যঙ্গের আঘাত প্রহসনগুলিতে আছে, সেইগুলিতে স্নিগ্ধ হাস্যরসের উচ্ছল প্রবাহ নাই। পঞ্চরংগুলির ভাষা কলিকাতার ইতর সমাজের ভাষা, রসিকতার শব্দ এবং বাক্যগুলিও সেই সমাজ হইতে আহৃত।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানা গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছেন। 'মলিনমালা', 'মলিনা বিকাশ', 'স্বপ্নের ফুল', 'দেলদার' প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার

১। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'সপ্তমীতে বিসর্জন' নামক প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতায় নাটকের ধর্ম বিশ্লেষণ করিযাছেন।—'ইংরাজীতে যাহাকে Extravaganza বলে, ইহা সেই প্রকৃতির। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারের ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব রাজ্যের প্রান্ত সীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে—ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।' গিরিশচন্দ্র—পৃঃ ৩৫০

শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'আবুহোসেন'। 'আবুহোসেন'-এর কাহিনীটি যেমন কৌতুকাবহ ইহার মধ্যস্থ রোমান্টিক এবং হাস্যরসাত্মক সুরও তেমনি উপভোগ্য।

অমৃতলাল বসু

(ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও নাটক রচনা করিবার পূর্বে অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত অভিনেতা নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বীয় গুরুর কাছে দুর্লভ শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য এবং মঞ্চাধ্যক্ষের সম্মানিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের শিষ্য হইলেও নাটক রচনা বিষয়ে অমৃতলাল স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের গূঢ় এবং গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত। কিন্তু তরল ও হাল্কা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। গুরু এবং গম্ভীর বিষয়ে তাহার আসক্তি ও প্রবণতা ছিল না, সেইজন্য গভীর ভাবমূলক নাটক তিনি খুব কম লিখিয়াছেন। যে দুইখানা আছে তাহাও প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নহে। দীনবন্ধুর ন্যায় তাঁহারও প্রতিভার উৎস হইতেছে হাস্যরস। এই উৎস হইতে অজস্র ধারা নির্গত হইয়া তাঁহার রচনাবলীকে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের হাস্যরস একরূপ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরস প্রকৃত Humour-এর পর্যায়ে পড়ে। তাঁহার সহিত হাসিতে হাসিতে আমাদের অন্তকরণ আর্দ্র এবং চক্ষু সিক্ত হইতে থাকে, কিন্তু অমৃতলালের হাস্যরস তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের ন্যায় আমাদিগকে আঘাত করে, আঘাতের বেদনায় আমাদের স্বাভাবিক আনন্দময় হাস কাষ্ঠহাসিতে পরিণত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে Satire বলে তাঁহার অধিকাংশ প্রহসন সেই শ্রেণীভুক্ত। কমেডির যত রকম বিভাগ আছে Satire অথবা বিদ্রূপাত্মক প্রহসন তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অনাবিল অনর্গল হাস্যরসই কমেডির প্রাণ, কিন্তু

Satire-এর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক আঘাতের জন্য সেই হাস্যরস ব্যাহত হয়।[১] বিশুদ্ধ কমেডির মধ্যে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সেই হাসিতে লেখক, পাঠক, শ্রোতা, পাত্রপাত্রী সকলেই যোগ দেয়। সেখানে সকলেই উপহাসের ভাগী, এবং সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু যখন আঘাতটা অতি স্পষ্ট এবং অব্যর্থ এবং যেখানে তাহা আমাদের ক্ষমাশীল সহানুভূতি উদ্রেক করে না সেখানে Satire-এর পর্যায়ে হাস্যরস অবনীত হয়।[২] খাঁটি হাস্যরসিক সমাজের ত্রুটি ও ভ্রান্তি লইয়া পরিহাস করেন বটে, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কখনো তাঁহার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় না। ভালো মন্দ দুই-দিকই তিনি হাসির তুলিকা দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেন। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের লেখক তাঁহার নির্দয় কশা দ্বারা ভ্রান্ত, পতিত মানব-জীবনকে আঘাত করিয়া সত্য ও যথার্থ পথ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন। সমাজের নৈতিক দায়িত্ব এবং আবর্জনা নিষ্কাশনের ভার যেন তাঁহার উপর পড়িয়াছে।[৩] তাঁহার এই শিক্ষা দিবার আত্যন্তিক প্রচেষ্টা কিন্তু আমরা আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ তাঁহার হৃদয়ের নির্মমতা আমাদিগকে তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। আমাদের হাসির সুযোগ তিনি নষ্ট করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার প্রতি আমরা বিরূপ হইয়া পড়ি।[৪] অমৃতলালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ প্রহসন, যথা—'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু', 'বৌমা', 'একাকার' প্রভৃতিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটাগুলি অতি তীক্ষ্ণ, অতি মর্মান্তিকভাবে রহিয়াছে। এইগুলি পড়িবার পর মন বিষণ্ণ, ক্লিন্ন এবং গ্লানিময় হইয়া উঠে। আমরা নির্দোষ এবং নিরপরাধ হইলেও পাত্রপাত্রীদের শাস্তিতে যেন আমাদের মন ভারগ্রস্ত হইয়া থাকে; মনে হয়, বুঝি হাসির বাষ্পে সমস্যাটি উড়াইয়া দিলেই ভালো হইত, ইহা যেন জগদ্দল পাথরের মত

১। 'The purest of comedy, usually rules satire in any form out of its province The appeal of this pure comedy is solely to the laughing force within us. *The Theory of Drama*—by A. Nicoll, P, 191

২। 'If you detect the ridicule, and your kindness is chilled by it, you are slipping into the grasp of satire.'
The Idea of Comedy—by George Meredith p 79

৩। 'The satirist is a moral agent, often social scavenger, working on a storage of bile ' *Ibid*, P. 82

৪। 'It is the laughter we look for in comedy, nor the sense of moral right or moral wrong, not the purpose or the significance of the play.'
The Theory of Drama—by A, Nicoll, P. 193

আমাদের বুকে চাপিয়া রহিয়াছে। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, অমৃতলাল হইতেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য।[১] কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ বিদ্যমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রাণ ঘটনার অদ্ভুত চমৎকারিত্বের উপর নির্ভর করিযাছে এবং কোনো স্থলেই তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা জ্বালাময় হয় নাই। কিন্তু অমৃতলালের অনেক প্রহসনেই কাহিনীর কোনো জটিল বৈচিত্র্য নাই। দৃশ্য-পরম্পরা যুক্ত করিয়া এবং কয়েকটি পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব প্রহসনে উদ্দেশ্যই মুখ্য, কাহিনী গৌণ। সেইজন্য প্রহসন হিসাবে ইহাদের মূল্য বেশি নয়। 'খাসদখল' এবং 'তাজ্জব ব্যাপার'-এর মত প্রহসন তিনি খুব কমই লিখিয়াছেন, যে-সব গ্রন্থে ব্যঙ্গ এবং রঙ্গ সরস ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের আতিশয্য অমৃতলালের দোষ হইলেও তাহা অপেক্ষাও বড় দোষ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রন্থকার অতি প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি পাত্রপাত্রীদের মুখে লম্বা বক্তৃতার মধ্য দিয়া সামাজিক দোষ ও অসঙ্গতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হাস্যাত্মক রচনায় এইরূপ জবরদস্তি নিতান্ত দোষাবহ। পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আঘাত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করিবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার রচনা রসসৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অমৃতলালের অনেক প্রহসনেই এমন একটি চরিত্র আছে যাহার কাজ গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্যক্ত করা। 'বাবু' প্রহসনের তিনকড়িমামা এবং 'বৌমা' প্রহসনের মাতলাল এইরূপ মুখপাত্র। অনেক সময়ে এই ধরনের চরিত্র একেবারে বিনা কারণে প্রহসনের মধ্যে চাপানো হইয়াছে। 'একাকার'-এর রাধানাথ এবং 'সম্মতি সঙ্কট'-এর সার্বভৌমের দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা অকারণ গ্রন্থ-গুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। ইহারা নাট্যকারের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, ইহাদের দ্বারা শিল্পকৌশল সম্বন্ধে তাঁহার আস্থাহীনতা সূচিত হইয়াছে।

অমৃতলালের প্রহসনগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্য সর্বত্র পাশ্চাত্যভাববিকৃত পুরুষ ও স্ত্রীসমাজ। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া আমাদের সমাজ কিভাবে সনাতন আদর্শ ও ব্যবস্থা হারাইয়া ঘোর অধঃপাতের পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে তাহারই চিত্র বার

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—পৃঃ ৩৭৫

বার আমরা তাঁহার প্রহসনে দেখিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের দ্বারা নব হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হওয়াতে দেশের লোকের দৃষ্টি পুনরায় অতীতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, সেই বিষয় আমরা গিরিশ-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যবিলাসী জাতিধর্মচ্যুত নরনারীগণ ধিকৃত হইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে আমরা সনাতন ধর্ম ও আদর্শের প্রতি অটুট আস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার 'পঞ্চরং'গুলিতে পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণপ্রিয় যুবকসমাজকে নিন্দা করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পরে অমৃতলাল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই সমাজকে নির্মমভাবে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভাব ও আদর্শের প্রতি এককালে দেশের যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহার পুরাপুরি প্রতিক্রিয়া এই সময়ে দেখা গিয়াছিল। মাইকেল এবং দীনবন্ধুর প্রহসনেও ইংরাজী-শিক্ষিত অধঃপতিত সমাজকে উপহাস করা হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী' লিখিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'জামাইবারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সংস্কারপক্ষপাতী উন্নত মতবাদ লক্ষিত হইয়াছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক এবং প্রহসনে কৌলীন্য, বহু-বিবাহ, বৈধব্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রথার দোষ ও অনিষ্টকারিতা দেখান হইয়াছে। গিরিশ-যুগের প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে এই সব কুপ্রথা সম্বন্ধে কোনো নিন্দাবাদের পরিবর্তে বরং সমর্থনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলালের প্রহসনেও নির্বিচারে সর্বত্র নব্যতন্ত্র উপহসিত এবং প্রাচীনতন্ত্র প্রশংসিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের কুফল দেখাইয়াছিলেন, অমৃতলালও 'খাসদখল', 'বাবু' প্রভৃতি নাটকে বিধবা-বিবাহ যে নিতান্ত একটি হাস্যকর অসঙ্গত ব্যাপার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ-আন্দোলন বঙ্কিম-গিরিশ-অমৃতলালের হাতে এই পরিণাম লাভ করিল। 'তরুবালা' নাটকে অমৃতলাল বালবিধবার ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রতাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; অথচ এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করাতে অন্যায় এবং দোষের কিছুই দেখিতে পান নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর রক্ষণশীলতার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'একাকার'

প্রহসন। যে জাতিভেদ এবং উচ্চ-নীচ বৈষম্যবোধ হিন্দুসমাজকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে তাহাই লেখক অদ্ভুত যুক্তির সহিত রক্ষা করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব আমাদের সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় যে কোনো ত্রুটি ও গলদ ছিল না, এমন কোনো কথা নহে, সুতরাং সেই সমাজব্যবস্থার প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা বেশি ক্রোধ স্ত্রীশিক্ষা এবং স্বাধীনতাব প্রতি। এই বিকৃত স্ত্রী-প্রগতির চূড়ান্ত অতিরঞ্জন হইয়াছে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনে। তাঁহার উপহাসের দ্বিতীয় লক্ষ্য, পাশ্চাত্ত্য ভাবচালিত নব্য যুবকবৃন্দ, যাহারা স্বদেশী আন্দোলন, ভোট, স্বায়ত্তশাসন, সমাজসংস্কার প্রভৃতি লইয়া মত্ত থাকিলেও আসলে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য উন্মার্গগামী অধঃপতিত সমাজের দৃষ্টান্ত। লেখকের মতে অধুনা যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছে তাহাদের মূল্য এবং উপযোগিতা কিছুই নাই। বার বার সমাজের একই ধরনের নর-নারীরচিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রহসনে একই রকম পাত্রপাত্রী ও ঘটনার পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলাল অধঃপতিত সমাজের বিষয় বর্ণনা করিলেও তাঁহার প্রহসনে যৌনবিকৃতি এবং অশ্লীল ব্যাপারের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় না। নব্যতন্ত্রী সমাজের সব দোষ দেখাইলেও এই দিকটা তিনি দেখান নাই। একমাত্র 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ছাড়া অন্য কোনো প্রহসনে গর্হিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না।

অমৃতলালের প্রহসনে Wit এবং Pun-এর যথেষ্ট প্রাচুর্য রহিয়াছে।[১] অনেক সময়েই লেখক শাণিত কথার বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে আমাদিগকে বিস্মিত এবং হতভম্ব করিয়া দেন। শব্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সহিত গূঢ় ব্যঞ্জনার এমন সাদৃশ্য বহুস্থলে দেখা গিয়াছে যাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। শব্দ-ভাণ্ডারের উপর অবিচল অধিকার এবং নানা বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান না থাকিলে শব্দের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা

১। অমৃতলালের ইংরাজী সংলাপের মধ্যেও অনেক স্থলে শ্লেষ এবং অনুপ্রাসের অদ্ভুত চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

'And have you condistanted to confirm the inestimable grass of honourable honour on this City of palaces and policies? This sanitarium of stables and statues? On this Town of Taxes and Taxicabs? Of Rates and Rats, of Riches, and Ditches, of Rupees and রূপসীজ—'

'খাসদখল'—'পূর্বরঙ্গ'

যায় না। লেখকের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়া তাঁহার সংলাপ বিদগ্ধ ও রসিক সমাজের কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ও রুচিকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার সরসতার মূলে এই রসাল কথার মারপ্যাঁচ রহিয়াছে, ঘটনা কি কাহিনীর গভীর প্রদেশ হইতে ইহা উৎসারিত হয় নাই।

অমৃতলালের লেখায় গানের বাহুল্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। থিয়েটারের অভিজ্ঞতায় বাঙালী দর্শকের চাহিদা তিনি জানিতেন, এবং সেই অনুসারেই তিনি এত অধিক গীত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ছড়ার আকারে পদ্য রচনাও আছে। গান এবং ছড়া রচনার সরসতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে।

(খ) প্রহসন

অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) বিদ্রূপাত্মক প্রহসন (Satire) এবং (২) বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce)। বিশুদ্ধ প্রহসনগুলির সংখ্যা খুবই কম, এবং 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'কৃপণের ধন' ব্যতীত অন্য কোনোখানিই প্রসিদ্ধ নহে। বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলি প্রথমে আমরা আলোচনা করিব।

॥ বিবাহ-বিভ্রাট (১৮৮৪) ॥ 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'সম্মতি-সঙ্কট', 'কালাপানি', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'বাহবা বাতিক', 'খাসদখল'—এই কয়খানা প্রহসনের বিষয়বস্তু এবং পাত্রপাত্রী প্রায় একই ধরনের, এবং এইগুলির মধ্যে লেখকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'বিবাহ-বিভ্রাট' অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রহসন। এই বইখানা লিখিয়াই প্রহসন-কাররূপে তাঁহার নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কাহিনীর মধ্যে তেমন জটিলতা কিছুই নাই, কেবল নন্দের দ্বারা গোপীনাথকে প্রতারণার মধ্যে যে irony আছে তাহাই উপভোগ্য। বিজাতীয় ভাবাপন্ন নব্য সমাজ এবং পুত্রের বিবাহে পণ আদায় করিবার অসঙ্গত জুলুম—এই দুইটি বিষয়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনে সাধারণত কোনো অন্যায়ের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে বেয়াকুব ও নাকাল করিয়া হাস্যরসের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য প্রহসনের শেষে গোপীনাথ এইভাবে জব্দ হইয়া শিক্ষালাভ করিল, কিন্তু নন্দের স্বভাব পরিবর্তিত হইল না। প্রহসনকার গোপীনাথকে শাস্তি

দিয়া তাহার সহিত আপস করিয়া লইলেন, কিন্তু নন্দলালের অপরাধ বাঁচাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। শিক্ষিতা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা-জাতীয় চরিত্র গ্রন্থকারের আঘাতের অতি কাম্য পাত্রী। বিলাসিনী আলোকপ্রাপ্তা মহিলা, পরপুরুষের সহিত তাহার অবাধ সংসর্গ, তাহার স্বামী মসলা পেষে, খানা পাকায়—এইরকম অস্বাভাবিক বৃত্তিবিপর্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত পরে 'তাজ্জব ব্যাপার'-এ দেখান হইয়াছে। মিষ্টার সিং-এর কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আমাদের বিরাগ সঞ্জাত হইলেও তাহার কথার মধ্যে বেশ একটা ঝলসানো প্রখরতা আছে যাহা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে। প্রহসনের মধ্যে ঝিকে অত্যধিকবার আনা হইয়াছে। সর্বত্র, সকলের মধ্যেই সে আছে। গোপীনাথ, নন্দলাল, মিষ্টার সিং, বিলাসিনী—ইহাদের ভিতরকার ব্যাপার, ইহাদের আসল চরিত্র ঝি এর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ঝি লেখকের মন্তব্য এবং দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষা জোগাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অকারণ সংস্থান এবং অসঙ্গত কথাবার্তা সর্বত্র স্বাভাবিক হয় নাই।

বাল্যবিবাহ নিবোধ করিবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার নিন্দা করিয়া 'সম্মতি-সঙ্কট' রচিত হইয়াছিল। প্রহসনখানার উদ্দেশ্যমূলক কথোপকথনের মধ্যে লেখকের মত অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনী বলিতে ইহার মধ্যে কিছুই নাই এবং দৃশ্যগুলিও নিতান্ত অসংলগ্ন। একমাত্র অধ্যাপকদের দৃশ্য ব্যতীত কোথাও কৌতুক-রসের কিছুই নাই। নব্যযুবকদের বিলাত যাওয়াব নেশা এবং হুজুগমত্ততা লইয়া 'কালাপানি' (১৮৯৩) লিখিত। 'হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা' এই নামটার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। আধুনিক অনেক পাশ্চাত্ত্য-বিলাসী লোক মনে প্রাণে, কর্মে এবং আচরণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইলেও বাহিরে একটা ঠাট বজায় রাখিতে চান, বাস্তবিক তাহা যে নামাবলীর প্যাণ্টালুনে'র মতই হাস্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ লেখক তাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই নব্য হিন্দুয়ানিও আসলে একটা নবতন হুজুগ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং একটা না একটা হুজুগে মাতিয়া উঠাই আধুনিক যুবক সমাজের ধর্ম। তিনকড়ি ভিখারীদমনের হুজুগ তুলিয়াছিল বলিয়াই বিলাত যাওয়ার হুজুগটা আপাতত মুলতুবী রহিল। অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনের ন্যায় এই প্রহসনের মধ্যেও অবান্তর দৃশ্য ও অপ্রয়োজনীয় নরনারীর 'আনাগোনা' বড়ো বেশি, খামকা বিচিত্র নরনারী বারংবার আসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এইরকম সংক্ষিপ্ত একখানা প্রহসনেও ১২।১৩ খানি গীত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে হাস্যরসাত্মক

ভূমিকা, পণ্ডিতের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজী বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—'রাউণ্ড গুড্‌স ডু নট—গোলমাল করো না'। এই রকম সরস ইংরাজী পণ্ডিতের মুখে আমরা অনেক শুনিয়াছি।

॥ বাবু (১৮৯৪) ॥ 'বাবু' প্রহসনে কাহিনীর কোনো অবিচ্ছিন্ন গতি নাই। ষষ্ঠীকৃষ্ণ, সজনীকান্ত ও বাঞ্ছারাম, কন্দর্প এবং আজিনা স্কুলের ছেলেরা প্রভৃতি বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি দৃশ্যে সমাগত হইয়াছে। কেবল শেষ দৃশ্যে সব চরিত্রকে একত্রিত করা হইয়াছে, এবং 'সেলার' ঘটিত দৃশ্যের মধ্যে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পূর্বে হাসি ফুটিতে পারে নাই, আঘাতের পরে আঘাতে হাসিকে ম্রিয়মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অমৃতলালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ এখানে শুধু কঠোর নয় হিংস্র, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার পরিহাসের কথা বিস্ফোরকের টুকরার ন্যায় প্রবল বেগে ছুটিয়া লক্ষ্যবস্তুতে বিঁধিয়াছে। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন উভয় বিষয়ের বিকৃত এবং আসল মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ষষ্ঠীকৃষ্ণ বড়ো বক্তৃতার মধ্য দিয়া জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ছড়াইলেও, আসলে সে অনুকরণ-প্রিয়, আত্মসর্বস্ব দাম্ভিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহার স্বাধীনতা আন্দোলনেব অর্থ স্কুলের অপরিপক্ক ছাত্রের মস্তক চর্বণ এবং নারী প্রগতির অর্থ স্ত্রীর প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ এবং মার প্রতি অকারণ নিগ্রহ। সজনীকান্ত, বাঞ্ছারাম, দামোদর, কন্দর্প প্রভৃতি চরিত্রকে ব্রাহ্মসমাজেব প্রতিনিধিস্বরূপ অঙ্কন করিয়া অতি নির্দয়ভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এককালে শিক্ষিত লোকেব মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও কালক্রমে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ইহার প্রভাব এব প্রতিপত্তি কমিতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজেব মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে কৃত্রিমতা এবং কুসংস্কার দূর করিতে সহায়ক হইয়াছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত হইতে পাবে না। ব্রাহ্মদের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি স স্কার আন্দোলন চালিত হইয়াছিল। সেইগুলি সম্বন্ধেও আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে উপহাস করা হইয়াছে। অশ্লীল বলিয়া পিতার নাম উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ, এবং চিত্তবিকারের ভয়ে চোখ বাঁধিয়া বহির্গমনের মধ্যে সরস অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রথম বিবাহজাত সন্তানের 'ছোট বাবা' 'ছোট বাবা' বলিয়া ডাকা, স্ত্রীকে বার বার ভগিনী বলিয়া সম্বোধন এবং মাতামহীকে পুনর্বিবাহ দিবার সঙ্কল্পের মধ্যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করা হইয়াছে। তিনকড়ি এবং ফটিক গ্রন্থকারের মুখপাত্র, তাঁহার কটূক্তিগুলি ইহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। ইহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

॥ একাকার (১৮৯৫) ॥ হিন্দুসমাজের জাতিভেদের উৎপত্তির মূলে হয়তো শুধু কর্মবিভাগ ছিল, হয়তো সমাজের সুবিধার জন্যই প্রথমে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃত্তি যখন বংশগত হইয়া উঠিল, এবং এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সকল যোগাযোগ রহিত হইয়া আসিল, তখন হইতে সমাজের উন্নতি এবং বর্ধিষ্ণুতা রুদ্ধ হইয়া গেল। সামাজিক ভেদাভেদ দূর করিতে না পারিলে হিন্দুসমাজের উন্নতির আশা নাই, এ কথা প্রত্যেক দেশহিতৈষী এবং সমাজতত্ত্ববিদ বলিয়া থাকেন। কিন্তু অমৃতলাল এই একাকার সমর্থন করেন না, যার 'যা সনাতন ব্যবসা তার তাই নিয়া থাকা উচিত' এবং কেবল বর্ণ অনুসারেই সামাজিক মান এবং মর্যাদা নির্ণীত হওয়া সঙ্গত ইহাই লেখকের বক্তব্য। কলু এবং ধোপার পক্ষে জাত ব্যবসা ছাড়িয়া অফিসের বড়বাবু এবং মুন্সেফ হওয়া অশোভন, অসঙ্গত এবং হাস্যকর, 'একাকার' প্রহসনে তাহাই দেখানো হইয়াছে।[১] এই প্রহসনখানার মধ্যে কেবল হুলের খোঁচা, মধু একবিন্দুও নাই। কাহিনী বলিতে কিছুই নাই, এক দৃশ্যের সহিত অন্য দৃশ্যের কোনোই যোগ নাই।

॥ বৌমা (১৮৯৭) ॥ নব্য তরুণ-তরুণী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ 'বৌমা' প্রহসনেও আছে, তবে ইহাতে সরস কৌতুকের স্নিগ্ধতায় ব্যঙ্গের আঘাত উগ্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। হিড়িম্বা এবং তাহার অনুগত স্বামী রামাদাসের চিত্র ব্রাহ্মধর্ম এবং স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া উপহাস করিবার জন্যই দেখানো হইয়াছে, উহারা না থাকলেও প্রহসনের মূলধারার কোন হানি হইত না। ব্রাহ্মধর্মের ভ্রাতা ভগিনী সম্বোধন লইয়া এখানেও পরিহাস করা হইয়াছে। নভেল-পড়া রোমান্সমগ্ন রমণী গৃহস্থ ঘরে কি অপরূপ বিপর্যয় ঘটাইতে থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বৌমা কিশোরী। কিশোরী অথবা উপরঙ্গিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনের হেমাঙ্গিনীর ন্যায় বিলিতী নভেলগুলি পড়িয়া নিজেকেও একজন নায়িকা মনে করে, এবং নভেলী নায়িকাদের মত সে-ও সংসার-সম্পর্কচ্ছিন্না প্রণয়-সর্বস্বা হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর গ্রেফতারে তাহার রোমান্টিক অভিনয়ের পরম সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিতান্ত নাটকীয় ধরনে যখন সে সখীদের লইয়া 'জ্বল জ্বল চিতা' প্রভৃতি বিখ্যাত স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে মঞ্চে প্রবেশ করিল তখন তাহা বিশেষ হাস্যকৌতুকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের

১। লেখকের মুখপাত্র রাধানাথ বলিয়াছে, 'কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমী, এই জাতিভেদই সাম্য।' ১ম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্রূপের উদ্দেশ্য, আধুনিক মতে স্বামী-স্ত্রীর যে নাটুকে প্রণয় দেখা যায় তাহা তিনি অপছন্দ করেন। তিনি সনাতন মতে স্বামী-সেবা স্বামী ভক্তিই স্ত্রীর কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।[১] প্রহসনের শেষে মতিলালের দীর্ঘ বক্তৃতায় যে হঠাৎ কিশোরী ও সখীদের শিক্ষা হইল তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মতিলাল বরাবর বাবুরাম ও কিশোরী প্রভৃতিকে ভর্ৎসনা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সমান অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার উপদেশাত্মক শেষ বক্তৃতা যে তাহারা শিরোধার্য করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইবে তাহা অস্বাভাবিক। মতিলালের কঠোর উপদেশ এবং কটু তিরস্কার প্রহসনের কৌতুকাবহ রসের মধ্যে বিরক্তিকর হইয়াছে।

মিউনিসিপাল শাসনকে ব্যঙ্গ করিয়া 'গ্রাম্যবিভ্রাট' (১৮৯৮) ও 'সাবাস আটাশ' (১৯০০) রচিত হইয়াছে। 'বাহবা বাতিক'-এর মধ্যে দরখাস্ত এবং আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়া আধুনিক যুবক-যুবতীর সঙ্কল্প সিদ্ধ করার চেষ্টাকে উপহাস করা হইয়াছে।

আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া অমৃতলালের যে প্রহসনগুলি রচিত হইয়াছিল উপরে তাহাদের আলোচনা করা হইল। ঐগুলি ছাড়া বিভিন্ন বিষয় লইয়া আরও কয়েকখানা অপ্রধান বিদ্রূপাত্মক প্রহসন আছে, যথা, 'তিলতর্পণ', 'রাজা বাহাদুর' এবং 'অবতার'। 'তিলতর্পণ'-এ (১৮৮১) অমৃতলাল তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিত তাহার সরস চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অসংলগ্নতা এবং সস্তায় বাজি মাত করিবার যে সব সুলভ উপকরণ লইয়া অনেক ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক নাটক লেখা হইত, লেখক সেই সব নাটককে হাস্যাস্পদ করিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন।[২] বাপ্পারাও এবং আলিবর্দি খাঁকে এক সময়ে আনিয়া 'তিলতর্পণ'-এর গ্রন্থকার যে রকম অদ্ভুত ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন সেই রকম দৃষ্টান্ত তখনকার অনেক নাট্যকারদের মধ্যেই দেখা যাইত। এককালে ঐতিহাসিক নাটকের বন্যায়

১। লেখকের প্রতিনিধি মতিলালের উপদেশ উল্লেখযোগ্য—"প্রণয়, প্রণয়"—রমণী জন্ম কি কেবল বুকে মাথা রেখে শুতে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে আর ঈর্ষায় জ্বলতে? শেখ নি পার নি যে পতিকে ভক্তি করতে হয়, দাসী হ'য়ে তাঁকে নিজের বশীভূত করতে হয়'।

দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

২। তিল-তর্পণ'-এর গ্রন্থকার তাঁহার নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছে, 'এখানি হচ্ছে Farcical Tragi-Comedy de Pantomimic Operetta…এতে Wit আছে, Humour, চিতোর, Blank verse আছে। নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালিওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, সাহেব মারা, সব আছে, অশ্লীল নাই।'

রঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, সেই সব নাটকের অধিকাংশই যে অনৈতিহাসিক, অসংলগ্ন, বিকৃত এবং দোষগ্রস্ত ছিল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক গ্রন্থে সেই বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য নাটকের যে সব দোষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব দোষ অল্প পরিমাণে আমাদের নাট্যকার স্বয়ং অমৃতলালের মধ্যেও আছে। পাড়াগেঁয়ে মুর্খ ক্ষুদে জমিদার রাজাবাহাদুর উপাধি পাইবার জন্য কিভাবে নাকাল ও বেয়াকুব বনিয়াছে তাহার রঙ্গপূর্ণ চিত্র 'রাজাবাহাদুর' (১৮৯১) প্রহসনে দেখানো হইয়াছে। মাণিক্য এবং তাহার পিতার পূর্ববঙ্গীয় কথোপকথন বিশেষ সরস ও উপভোগ্য। এই প্রহসনখানা পড়িলে অনেক খেতাবপ্রার্থী অপদার্থ লোকের চৈতন্য হওয়ার সম্ভাবনা। 'অবতার' (১৯০২) বহু অবান্তর দৃশ্যসমন্বিত বিরক্তিকর প্রহসন। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গরস এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লমধুর উপাদান থাকিলেও সুনিপুণ রন্ধনের সুস্বাদু আস্বাদ নাই। অবতার ভূমিকায় নকল বৈষ্ণবকে উপহাস করা হইয়াছে।

'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস', 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার' এবং 'কৃপণের ধন'—এই প্রহসনগুলিকে বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce) বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত আছে বটে, কিন্তু সেই আঘাত কখনো পীড়াদায়ক নয়, স্নিগ্ধ হাস্যরসই ইহাদিগকে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। উগ্র শ্লেষ এবং উচ্চ উপদেশের ঘটা না থাকাতে এই সমস্ত প্রহসন-দর্শনে কোথাও বিরক্তি ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে না। বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলির কোনোটাতেই তেমন রসাল, জটিল কাহিনী নাই, কিন্তু এই প্রহসনগুলির প্রত্যেকখানাতে ঘটনার বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্ব বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক।

॥ চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬) ॥ একজন দুশ্চরিত্র বিষয়ী ব্যক্তি এক বেকার যুবকের দ্বারা কোনো ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাইতে যাইয়া কিভাবে জব্দ হইল, এবং তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি তাহারই স্ত্রীকে ফুসলাইয়া বসিল—সেই বিষয় লইয়া 'চোরের উপর বাটপাড়ি' রচিত। প্রহসনখানার ঘটনার সরস জটিলতা এবং রুচি-গর্হিতি, পাশ্চাত্ত্য প্রহসন—বিশেষ করিয়া মলিয়েরের প্রহসনের সম্ভাব্য প্রভাব মনে জাগাইয়া দেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, নারায়ণ অঘোরের কাছে 'রসোদ্‌গার' করিয়াছে, অথচ অঘোর তাহাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিবারই ব্যর্থ এবং বেয়াকুব হইয়াছে।

মলিয়েরের 'The School for Wives' (L'Ecole des Femmes) প্রহসনে ঠিক এইরূপ একটি ব্যাপার আছে। Agnes এর প্রেমিক Horace তাহার গূঢ় প্রেমের কথা বার বার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Agnes এর পালয়িতা প্রেমপ্রার্থী Arnolph-এর কাছে বলা সত্ত্বেও Arnolph প্রতিবার Horace-কে ধরিতে ও শাস্তি দিতে বিফল হইয়াছে। আলোচ্য প্রহসনখানাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে কৌতুকরস বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমূলক সন্দেহ এবং কৌতুকময় ঘটনার মধ্য দিয়া সেই সন্দেহের নিরসন 'ডিসমিস' (১৮৮৩) প্রহসনের কাহিনীর ভিত্তি। এই প্রহসনের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর সাদৃশ্য আছে। তবে ইহাতে ঘটনার বুনন ভালো হয় নাই, অনেক বাজে ব্যাপারের সমাবেশ রহিয়াছে।

॥ চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে (১৮৮৬) ॥ একটিমাত্র দৃশ্য লইয়া 'চাটুয্যে ও বাড়ুয্যে' রচিত হইলেও, ইহারই মধ্যে একটা সরস বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীটি খুব সম্ভবত লেখকের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নহে। ইংরাজী সাহিত্যে Sir F. Burnad-এর 'Cox and Box' এবং J. M. Morton-এর 'Box and Cox' নামে দুইখানা প্রহসন আছে। ঐ প্রহসন দুইখানার বিষয় একই। Box এবং Cox-কে Mrs Bouncer একই ঘর ভাড়া দেয়, উহাদের একজন দিনের বেলায় এবং অপরজন রাত্রিতে সেই ঘরে থাকে। Cox একদিন ছুটি পাইয়া ফিরিয়া আসাতে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দুইজনে আবিষ্কার করে যে উভয়ে একই বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। যাহা হউক গোলমাল এবং রাগারাগির পরে উভয়ের মিলন হয়। 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে'র কাহিনী অবিকল উপরিউক্ত কাহিনীর অনুরূপ। লেখকের সংলাপের মধ্যে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব আছে।

॥ তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০) ॥ 'তাজ্জব ব্যাপার'-এর মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া চরম পরিহাস করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনার আত্যন্তিক উদ্ভটত্ব প্রহসনের মধ্যে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। যখন আমরা দেখি যে পুরুষেরা মেয়েদের কাজ এবং মেয়েরা পুরুষদের কাজ বেশ সহজ গাম্ভীর্যের সহিত করিতেছে, তখন আমাদের হাস্য সম্বরণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। মহিলাদের সভার বর্ণনাটিও খুব কৌতুকাবহ হইয়াছে।

॥ কৃপণের ধন (১৯০০) ॥ 'কৃপণের ধন' মলিয়েরের 'The Miser' (L'Avare) নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মলিয়েরের প্রহসনে Harpagon-এর কার্পণ্য-দোষের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দেখানো

হইয়াছে, এবং পরস্পর-সংযুক্ত জটিল প্রেমকাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। 'কৃপণের ধন'-এও হলধরের কার্পণ্য এবং নারীসম্পর্কিত দুর্বলতা—এই দুই প্রকার দোষ বিদ্যমান এবং মন্মথ-কুন্তলার প্রণয়ব্যাপার হলধরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়া আছে। মধু এবং ইচ্ছা ষড়যন্ত্র করিয়া হলধরকে সম্পত্তিশালিনী বিধবার কথা বলিয়া জব্দ করিবে মতলব করিল। হলধর যদি ঐ বিধবাকে হাত করিতে যাইয়া বেয়াকুব এবং অপদস্থ হইত তবেই তাহার অন্যায় লোভের যথোপযুক্ত সাজা হইত। কিন্তু টাকা সোনা করিবার আর একটি ব্যাপার আসিয়া তাহাকে জব্দ করা হইল। ইহাতে পূর্বের ষড়যন্ত্র এবং হলধরের নারী-আসক্তি চাপা পড়িয়া অর্থহীন হইয়াছে। হলধরের কার্পণ্য-দোষের পরিণাম দেখিলাম; কিন্তু তাহার চরিত্রের অপর দোষটির কোনো সমাধান দেখিলাম না। যে কৃপণ একসঙ্গে পাঁচ টাকা বাহির করিতে মর্মান্তিক ক্লেশ বোধ করে[১] তাহার পক্ষে ফস্ করিয়া দশ হাজার টাকা অন্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বোধ হয়।

(গ) নাটক

অমৃতলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের অবতারণায়, গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় নহে। সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলি একেবারেই বিশেষত্ব-বর্জিত সাধারণ স্তরের। 'খাসদখল' এবং 'নবযৌবন' এই দুইখানা পুস্তক নাটক হইলেও হাস্যরসের অতি মধুর, কোমল এবং স্নিগ্ধ ধারা নাটক দুইখানাকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, অথচ প্রহসনও ইহাদিগকে বলা চলে না, কারণ ইহাদের আয়তন দীর্ঘ এবং কাহিনী রোমান্টিক ভাবাপন্ন। ইংরাজীতে যে শ্রেণীর নাটককে 'Comedy of Romance' বলা হইয়া থাকে, আলোচ্য নাটক দুইখানা সেই শ্রেণীযুক্ত। এই ধরনের কমেডির আবেদন মনের গভীর অনুভূতিময় প্রদেশে এবং ইহাদের অন্তর্গত হাস্যরস সর্বত্র চাপা এবং মৃদুভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।[১] 'খাসদখল' এবং 'নবযৌবন' অমৃতলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

॥ খাসদখল (১৩১২)॥ খাসদখল'-এর মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকলেও ইহাতে কাহিনীর আগ্রহোদ্দীপকতা ও চমৎকারিত্ব অক্ষুণ্ণভাবে

১। ইচ্ছাকে পাঁচ টাকা দিবার সময় হলধর মনের দুঃখে নিরুপায় হইয়া যাহা বলিয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—"দেখছেন কাঁদছেন, মা কাঁদছেন—আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণীমার চক্ষুদুটি দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা চাঁদের বুক ভেসে যাচ্ছে"।

গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। মোক্ষদা অনেকাংশে 'বৌমা' প্রহসনের কিশোরীর সদৃশ, ঘরের বৌ লেখাপড়া শিখিয়া এক কিম্ভুত রোমান্টিক প্রকৃতি আয়ত্ত করে—মোক্ষদা তাহারই উদাহরণ। লোকেন এবং মোক্ষদার কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখক বিধবা-বিবাহ এবং চিকিৎসকের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু মোক্ষদার কাহিনীর পাশে কুসুমকোমলা গিরিবালার রহস্যময় আখ্যান মৃদু সৌরভের মত অগোচরে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে। বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া যেভাবে অপ্রীতিকর গ্লানির বাষ্প সঞ্চিত হইতেছিল লোকেনের আকস্মিক আগমনে পরম পরিতোষের ঝড়ে তাহা উড়িয়া গিয়াছে। প্রভুভক্ত, পাগলাটে নিতাই-এর চরিত্র উপভোগ্য বটে, তবে তাহার 'ইজদি'র অতিরিক্ত আধিক্য অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। ঠাকুরদা লেখকের মুখপাত্র হইলেও তিনি রূঢ় এবং কঠোর নহেন তাঁহার ক্ষমাশীল মহত্ত্ব সর্বত্র অনুভূত হইয়াছে। এই ধরনের ঠাকুরদা চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

॥ নবযৌবন (১৯১৪) ॥ 'নবযৌবন' উচ্ছল প্রাণময় সরস কৌতুকোজ্জ্বল কমেডি। ইহাতে মধুর প্রণয়লীলার কোমল বারিপ্রবাহের উপর বিদগ্ধ এবং বুদ্ধি-দীপ্ত হাস্যরসের আলোকসম্পাত হওয়াতে বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। কাহিনীর রহস্যময়তা শেষপর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া লেখক আমাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবিচলিতভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। দুইটি অভিন্নমুখী ধারা এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে। জটিল আখ্যানবস্তুর মধ্যে যদি ঘটনাসমূহের গতি একই দিকে থাকে তবে সেই গতিকে নাটকীয় ভাষায় 'Similar Motion' বলা হইয়া থাকে। অলকা এবং সুকুমারের প্রণয় ব্যাপার পরস্পরের সহযোগীরূপে একইভাবে অগ্রসর হইয়াছে। Portia-র পাশে Nerissa-র প্রেম এবং Rosalind-এর পাশে Celia-এর প্রেম এইরূপ পরস্পর-সম্পৃক্ত এবং সহযোগী। অলকা এবং সুকুমার শেকস্‌পীয়রের Portia, Rosalind প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাদের ন্যায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়ী সুচতুরা রমণী। বসন্ত এবং

১। All of those Comedies of Romance are full of appeals to our meditative faculties and to our emotions. The laughter is subdued into a kind of feeling of contentment, a happiness of spirit rather than an ebullition of outward merriment. Wherever the laughter is called forth it is immediately stilled or crushed out of existence by some other appeal.' *The Theory of Drama* by Nicoll P. 216-17

অলকার কথার মধ্যে সুপ্রখর বুদ্ধি এবং সুমধুর রসের খেলা বিশেষ চিত্তচমৎকারী হইয়াছে। মূর্খ, নির্বোধ অথচ দাম্ভিক দর্পনারায়ণ এবং তাহার যোগ্য মোসাহেব ভজনলালের চরিত্র স্থূল হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। নাটকের সঙ্গীত এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলি ইহার বর্ণিত জগৎ এবং জীবনকে এক রোমান্টিক ভাবময় পরশে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

॥ তরুবালা (১৮৯১)॥ 'তরুবালা' সরস সামাজিক নাটক। লেখকের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসে বইখানা আগাগোড়া অভিষিক্ত থাকায় ইহা বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের রসিকতা, হারাণের দুঃসহ প্রণয়জ্বালা, বেণী এবং দামিনীর সরস কলহ এবং মাতাল বিহারীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নাটকখানার সর্বজনীন হাস্যরসের সম্মিলিত ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। অখিল অনেক নভেলপড়া বিদ্যা অর্জন করিয়া পবিত্র প্রণয় করিবার জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, স্ত্রীকে ভালবাসা সে ব্যাভচার বলিয়া মনে করে—এই ব্যাপারের মধ্যে তাহার যে অসঙ্গতি ও নির্বুদ্ধিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও বিশেষ হাস্যাবহ। শিক্ষিতা পতিতা পারুল এবং তাহার মাতার বাহ্য ভদ্রতার খোলসের সহিত আন্তর কদর্যতার বৈষম্য দর্শন করিয়াও আমরা যথেষ্ট আমোদ পাই। 'তরুবালা'র মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বহুবার-জ্ঞাপিত অভিমত পুনরায় আমাদের শুনাইয়াছেন। শান্ত তাঁহার মতে বিধবা শিরোমণি। সে কৃচ্ছ্রতা এবং ব্রহ্মচযের তাপে দেহকে শুষ্ক করিয়া এক আধ্যাত্মিক বাষ্পে পরিণত করিতে চাহিয়াছে, ভাসুরের নাম ধরিতে হয় বলিয়া কালীসিংহের মহাভারতকে ফালীসিংহের মহাভারত পর্যন্ত ব[illegible]িয়া থাকে। অতিবৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় তৃতীয়বার বিবাহ করা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রমাফিক ফতোয়া দিয়া থাকেন—ইহাতে অন্যায় কিংবা অসঙ্গতি কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয়কে সুরসিক এবং উপযুক্ত স্বামী দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্ত্রীর সহিত তাঁহার নর্ম-পরিহাসের আলাপ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন যাহা নাতনীর সহিত করিলেই শোভন এবং সঙ্গত হইত। 'তরুবালা' গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লের ন্যায় আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী কিন্তু নাটকের মধ্যে তাহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা নিতান্ত নগণ্য এবং অনুল্লেখ্য।

॥ 'বিমাতা' বা 'বিজয় বসন্ত' (১৮৯৩)॥ রূপকথার কাহিনীর উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। কামান্ধা প্রতিহিংসাময়ী বিমাতা দুর্জয়ময়ীর চরিত্র তীব্র বাস্তবতাপূর্ণ। সপত্নীপুত্রের প্রতি তাহার নগ্ন প্রেম-নিবেদন সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের প্রভাবে রচিত। রাজার সুগভীর মনস্তাপ ও

অন্তর্জ্বালার দৃশ্যও ভালোভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিজয় ও বসন্তের শিক্ষাদাতা বাৎসল্যপূর্ণ বলবন্ত বর্মার পক্ষে অকস্মাৎ ঘাতকের কঠোরতা আয়ত্ত করা অসংলগ্ন বোধ হয়।

॥ 'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০) ॥ গিরিশচন্দ্রের আদর্শে রচিত নাটক। অমৃতলাল ইহাতে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাট্যগুরুকে অনুকরণ করিতে যাইয়া তিনি এক অতি বিকৃত, কৃত্রিম এবং হাস্যকর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। চটসাঁই-এর ভূমিকার উপরেও গিরিশচন্দ্রের বিদূষকজাতীয় চরিত্রের অতি সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের ন্যায় সেও ইতর ভাষায় গূঢ় ব্যঞ্জনাময় ভাব প্রকাশ করে। আলোচ্য নাটকের কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উদ্বেগ ও গতি সঞ্চার করিবার সুযোগ ছিল, কিন্তু সংলাপের দুর্বলতায় কিছুই সুপরিব্যক্ত হয় নাই। মাঝে মাঝে স্টেজ-মাতানো সস্তা বীররস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। দিনকরের ছুরিকাসহ আক্রমণের ব্যাপারটা যেন নেহাৎ জোর করিয়া আনা হইয়াছে। ইহার পিছনে কোনো গভীর উদ্দেশ্যজাত প্রেরণা নাই। ক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত ঘটনাকে কাহিনীর মূল নিয়ামক করিয়া দেখান সঙ্গত হয় নাই।[১]

'হরিশ্চন্দ্র' এবং 'যাজ্ঞসেনী'—এই দুইখানা অমৃতলালের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক। হরিশচন্দ্রের কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছে। মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। অমৃতলালের নাটকখানিও (১৮৯৯) ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' অনুসরণ করিয়া লিখিত। তবে দৃশ্যসংস্থাপনের স্থানে স্থানে তাঁহার মৌলিকতা আছে। কামন্দক এবং বিদূষক গ্রন্থমধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের শিষ্য কামন্দকের সহিত মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের পাতঞ্জলের সাদৃশ্য দেখা যায়।

॥ যাজ্ঞসেনী (১৯১৮) ॥ 'যাজ্ঞসেনী' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনুরূপ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত নাটক। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও গদ্য এবং পদ্য, উভয়ের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকখানি সার্থকনামা নহে। মহাভারত অনুকরণে লিখিত কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিবাদমূলক কাহিনীকে 'যাজ্ঞসেনী' নাম দেওয়া যথার্থ হয় নাই। একমাত্র বস্ত্রহরণের দৃশ্য

১। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "গ্রীক সাহিত্যে যে Damon এবং Pythus এই দুই বন্ধুর কাহিনী আছে তাহা অবলম্বন করিয়া 'আদর্শ বন্ধু'র আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, R. Edwards-এর 'Damon and Pythus' নামক একখানা নাটকও আছে।"

ব্যতীত নাটকের মধ্যে কোথাও নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব নাই। যাজ্ঞসেনী নিজেকে অগ্নির ঘৃত বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি করিয়া অগ্নিকে লেলিহান করিয়া দিলেন তাহার কোনো বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে নাই যাজ্ঞসেনী গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্রও নহেন। গ্রন্থের কাহিনী তিনি তন্মুখী করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভিতরকার কোনো দ্বন্দ্বও নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই। তাঁহার প্রতিহিংসার চরিতার্থতা দেখাইলেই নাটকখানি সম্পূর্ণ হইত। নাটকখানির মধ্যে নাটকত্বের একান্ত অভাব। কোনো বিশেষ ঘটনাকে উদ্দেশ্যরঞ্জিত, ভাবাবেগময় করিয়া দেখান হয় নাই। নাটকের মধ্যে তেমন কোনো আকস্মিক ও আগ্রহজনক ঘটনাও নাই। কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীন সেনের কৃষ্ণের প্রভাব বিদ্যমান। শান্তি ও ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে কৃষ্ণ, অর্জুন ও ব্যাসের মিলন নবীন সেনের কাব্যের প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তবে এই নাটকে কৃষ্ণও মূলত কাহিনীর নিয়ামক হন নাই। পাণ্ডবগণের মধ্যে ভীমের চরিত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক দুইখানি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ন্যায়নিষ্ঠ অথচ দুর্বলচিত্ত পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মানী, বলদর্পী ও পাণ্ডবদ্বেষী দুর্যোধনের চরিত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রূর, স্বার্থসন্ধানী, কূট, রাজনীতিজ্ঞ শকুনির চিত্র ভালোই ফুটিয়াছে।

অমৃতলালের গদ্য কথোপকথন নিতান্ত আধুনিক ও ঘরোয়া হইয়াছে। নাট্যকার অনেক স্থলেই আধুনিক ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ, উদার, স্বাধীন ভারতের কল্পনা তিনি করিয়াছেন। অমৃতলাল নাটকের মধ্যে কোনো অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই। এই দিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের ত্রুটি তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ—আধুনিক নাট্যধারার সূচনা)

দ্বিজেন্দ্র-যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যভাগে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের অতিশয়িত উদ্ভব ও তাহার কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এই নাটকের গতি ভিন্ন পথে চালিত হইল এবং তাহার ভিত্তিভূমি স্থানান্তরিত হইল পৌরাণিক জগৎ হইতে ঐতিহাসিক জগতে। যে ধর্মসন্ধ দৃষ্টি অলৌকিক দৈবলীলার মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল তাহাই মুক্তিসন্ধানী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া লৌকিক মানবলীলায় নিবদ্ধ হইল। নাটকের এই দৃষ্টি-পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন জাতীয় প্রতিবেশ লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বে কয়েকস্থানে দেখাইয়াছি, সমাজ পরিবেশের বিশিষ্টতা অনুযায়ী বাংলা নাটকের ভাব ও রূপের মধ্যে বিশিষ্টতা দেখা গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার সমাজ-মন কখনও সংস্কার-আন্দোলন, কখনও ধর্ম-আন্দোলন, আবার কখনও বা জাতীয়-আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে বাংলা নাটকের সামাজিক, পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক রূপের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়-ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকের পিছনে যে নবোত্থিত জাতীয় প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল সেই বিচার আমরা পূর্বে করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ঐতিহাসিক নাটকের যে গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখা গেল তাহার মূলেও ছিল এক স্মরণীয় জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইলেও, তাহা শুধু এক আদর্শায়িত মানসবৃত্তিতেই পরিণত হইয়াছিল। স্বদেশহিতব্রতী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের জাতীয় কর্তব্য শুধু সভাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য ইহারও প্রয়োজন ছিল। কর্মযোগের পূর্বে ভাবযোগ প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়-ভাবান্বিত সাহিত্যিক ও নেতৃবৃন্দ অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া, পরাধীন

দেশবাসীর মর্মবেদনা উদ্ঘাটন করিয়া এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নলব্ধ গৌরবের চিত্র অঙ্কন করিয়া জাতির চিত্তকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য সংগ্রাম ও আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভারত-সভা স্থাপিত হইল, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে জাতির মনোদীক্ষা হইয়া গেল। কিন্তু তখনও শক্তিসংগ্রহ ও সংহতিস্থাপনের কাল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেল, বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইল—ভাবযুগের অতিক্রান্তির পর শুরু হইল কর্মযুগের। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে ধূমায়মান জাতীয় বিক্ষোভ এক সর্বগ্রাসী অগ্নিবিপ্লবে পরিণত হইল—ভাববিলাসের উত্তুঙ্গ পরিমণ্ডল হইতে মুক্তিকামী জীবন নামিয়া আসিল দুঃখ ও ত্যাগলিপ্ত বাস্তব সংগ্রামক্ষেত্রে। এক অভূতপূর্ব জাতীয় মাদকতায় দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতিয়া উঠিল। জাতীয় নাট্যশালা এই মাদকতা হইতে দূরে থাকিতে পারিল না। জাতির প্রবল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবানুপ্রাণিত নাটক রচনা করিলেন। দর্শকগণ তাহাদের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের প্রেরণা পাইল নাটকের মধ্যে, সুবিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তাহারা সম্বর্ধনা জানাইল। আনন্দরসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনের রাজপথ এক প্রাণের যোগে সম্মিলিত হইয়া গেল। বাঙালী ভীরুতার অপবাদ ফুৎকারে উড়াইয়া দিল, সে বীরত্বের আস্বাদ পাইল, বীরত্বের মহিমা বুঝিল, সেই বীরত্বের সন্ধান করিল জাতীয় ইতিহাসে। নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে সেই বীরত্বের রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন, বাঙালী দর্শকগণ তাহাদের জাতীয় বীর বলিয়া বরণ করিয়া লইল প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি চরিত্রকে। এই সব ঐতিহাসিক বীরপুরুষদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী স্বদেশের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অন্তরে অন্তরে এক জীবন্ত প্রেরণা আনিয়া দিল। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ কেবল নাট্যকারই ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের মহাঋত্বিক।

কিন্তু সাহিত্য শুধু প্রভাব বিস্তার করে না, তাহা প্রভাবিতও হয়। নাট্যকারগণও জাতীয় মনকে চালিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় মনের দ্বারা তাঁহারা নিজেরাও চালিত হইয়াছিলেন: সেজন্য জাতীয় ভাবাবেগের কাছে অনেক স্থলেই তাঁহারা নাটকের প্রয়োজন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অহেতুক বীরদর্প, অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস, অসংলগ্ন ঘটনা-সমাবেশ ও অসঙ্গত চরিত্র-পরিণতি এই কারণেই তখনকার অনেক নাটকে

অত্যধিক আতিশয্য লাভ করিয়াছিল।[১] সমসাময়িক ভাবোচ্ছ্বসিত দর্শকের কাছে সেগুলি হয়তো বহুক্ষেত্রে বাহবা পাইত, কিন্তু পরবর্তী যুগের ভাবাবেগবর্জিত নিরপেক্ষ রসদৃষ্টিতে সেগুলি খুবই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া পড়িল। যুগের প্রতি অনুগত থাকিয়াও যুগাতিচারী রসচেতনা বজায় রাখিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ সার্থকতা। ভাবাবেগের দাবী পরিপূরণ করিতে যাইয়া এই সার্থকতা অনেক স্থলেই ক্ষুন্ন করিতে হইয়াছে।

নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবাবেগের প্রশ্রয় দিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সত্যকে অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন অথবা বিকৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আদর্শ জাতীয় বীররূপে যাঁহাদের চরিত্র চিত্রিত করিলেন তাঁহাদের প্রকৃত জীবনের দোষ ও দুর্বলতা আদর্শের স্বর্ণজালের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ইহাতে সেইসব চরিত্রের জাতীয়রূপ প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু ব্যক্তিরূপ অস্ফুট অথবা অসত্যরঞ্জিত হইয়া রহিল। এইরূপ দুইটি অসত্যরঞ্জনের দৃষ্টান্ত প্রতাপাদিত্য ও সিরাজদ্দৌলা চরিত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশচন্দ্রের নাটক দুইখানি জাতীয় সম্বর্ধনার স্বর্ণমুকুট লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও সিরাজদ্দৌলার প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের যে পরিচয় রামরাম বসুর গ্রন্থে, সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক আলোচনায়, এমন কি ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও রহিয়াছে তাহাতে প্রশংসা করিবার, শ্রদ্ধা করিবার মত কিছুই তাহার মধ্যে নাই। অথচ নাট্যকার ও দর্শকগণের ভাবরঞ্জিত নেত্রে তাঁহার ব্যক্তিচরিত্রের সমস্ত অপরাধ এক উদার ক্ষমাশীলতার প্রসন্ন দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবাবিল দৃষ্টিমুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ সাহসিক আলোচনা করিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে। সিরাজদ্দৌলাকে লইয়াও আমাদের জাতীয় ভাবোন্মত্ততার অনেকখানি অপচয় হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা আদর্শের সুন্দর প্রতিমূর্তি, কিন্তু ইতিহাসের সত্য মূর্তি নহে।

১। ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাশন, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূলমন্ত্র হইয়া নাট্য-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পূরণ করিয়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৮

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে হিন্দুর গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও সার্বভৌম ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়া উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয় নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া সার্থকতালাভের চেষ্টা করিয়াছিল। সেজন্য তৎকালীন জাতীয় ভাবাত্মক নাটকেও এইরূপ একটি আদর্শ সাম্প্রদায়িক মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্য অনেক স্থলেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলাকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আদর্শ জাতীয় বীররূপে চিত্রিত করিবার পিছনে সাম্প্রদায়িক মিলনেচ্ছাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটকে সাম্প্রদায়িক প্রীতি-স্থাপনের আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কর্ণসিংহ ও সাজাহানের বন্ধুত্ব, মহাবৎ খাঁর প্রতি কল্যাণীর নিষ্ঠা, শক্তসিংহের সহিত মুসলমানী নারীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় অবতারণা করিয়া নাট্যকার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাম্প্রদায়িক মিলন-স্থাপনের আগ্রহাতিশয্যে অনেক সময় নাট্যকারগণ সুবিদিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকেও বিকৃত ও পরিবর্তিত করিয়া ফেলিতেন। সাময়িক ভাবাবেগের প্রবল প্রেরণায় এসব গুরুতর অসঙ্গতি নিন্দিত না হইয়া বরং প্রশংসিতই হইত ক্ষীরোদপ্রসাদের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'আলমগীর'-এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাট্যকার চির-হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীর-এর মুখে হিন্দু মুসলমানের তরল মিলন-স্বপ্ন ব্যক্ত করিয়া ইতিহাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় ভাবাচ্ছন্ন দর্শকদের কাছে উচ্ছ্বসিত করতালির কোনো অভাব তাহার হইত না। আলমগীর রাজসিংহকে বলিলেন —'তবু এ মিলনের অভিলাষ হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চ'লে যাক, শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ—মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।' রাতের পর রাত বাঙালী দর্শকগণ ইতিহাসের এই অপরূপ ভাষ্য শুনিয়া আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়া তাহাদের মোহবদ্ধ জাতীয়তার পরিচয় দিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তিনজনে একই সময়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভার ধর্ম ছিল বিভিন্ন; সেজন্য বিষয়বস্তুর অনুরূপতা থাকিলেও তাঁহাদের ঐতিহাসিক নাটকের ভাবপ্রকৃতির

মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'—গিরিশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক হইলেও, ইহাদের পূর্বেও তিনি 'চণ্ড', 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম', 'বাসর', 'অশোক' প্রভৃতি ইতিহাসমূলক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবেশ অথবা উদাত্ত জাতীয় উদ্দেশ্য অপেক্ষা ঐসব নাটকে ব্যক্তি-কাহিনী ও ধর্মভাবই অধিকতর প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক নাট্যকারদের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য যদিও তাঁহাকে ঐতিহাসিক নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার প্রতিভায় ঐতিহাসিক নাটকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ছিল না। ভক্তি ও বিশ্বাসের দূরাস্তৃত জগৎ অথবা চলমান বাঙালী সংসারের সীমায়িত পরিধির মধ্যে তাঁহার কল্পনা ও প্রাণশক্তি যেরূপ সাবলীল প্রকাশ লাভ করিত, ঘাত প্রতিঘাতময় ঊর্মিমুখর উদাত্ত ঐতিহাসিক পরিবেশে সেরূপ লাভ করিত না। 'প্রতাপাদিত্য' ও 'প্রতাপসিংহ'-এর পর তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁহার লেখনীকে নিয়োজিত করিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার মনে কর্তব্যপালনের তাগিদ যতখানি ছিল সৃষ্টির অবারিত আবেগ হয়তো ততখানি ছিল না।

ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতম রূপটি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। তাঁহার পরেও ঐতিহাসিক নাটক রচনা হইয়াছে, কিন্তু উহার মণিভাণ্ডারের শেষ চাবিটী শুধু ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেই। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যখন তাহার শেষ রশ্মিগুলি বিকীর্ণ করিতেছিল নাট্যাকাশের পূর্বদিগন্তে তখন নব স্বর্ণজাল রচনা হইতেছিল।[১] গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় শেক্‌সপীয়র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও ইহা একান্ত সত্য যে, তাঁহার নাটকে দেশের প্রাণবস্তুই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চিন্তা, সংস্কার, আঙ্গিক-পরিকল্পনা ও রসচেতনা সব দিক দিয়াই তিনি দেশের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণসত্তা বলিষ্ঠরূপে প্রকাশিত হইল

১। একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আপনার উপরে আমার অগাধ আশা। ভবিষ্যতে আপনিই এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসা, এ বিষয়ে কি আর কোন রকম সন্দেহ আছে? এই অল্প কয়েকটি বছরের ভিতরে আপনি যা দেখাইলেন, আমাদের সারাটা জীবনের সাধনায়ও তেমনটি হইল না। ......আমাদের তো দিন ফুরাইয়া আসিল; এখন আপনার উপরই সব ভার।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬২৪

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন খাস বিলাতের মাটিতে।[১] তিনি যখন দেশে ফিরিলেন তখন ইংরাজের ভাব, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার জীবনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল। কেবল আহারে-বিহারে নহে, কাব্যে-গানেও তিনি ইংরাজের জগতের সহিত যুক্ত হইয়া ছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের সহিত মানসযোগ লইয়াই তিনি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য ঘটনা-সংহতি, গতিবেগ, ভাবসংঘাত, ট্র্যাজিক রসচেতনা প্রভৃতির দিক দিয়া তাঁহার নাটক এত ঘনিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণধর্মের সহিত যুক্ত। পাশ্চাত্ত্যের প্রতি এতখানি আনুগত্য থাকাসত্ত্বেও এই পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত পরিচয়ের ফলেই তাঁহার মধ্যে জাতীয় ভাব উন্মেষিত হইয়াছিল। তৎকালীন সমাজের দিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন, সেখানে রহিয়াছে এক সর্বব্যাপী ক্লীবত্ব। একদিকে পুরাতনের প্রতি তামসিক মোহ, অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচার আর জাতীয়তার কৃত্রিম ও কপট অভিনয়। এই মোহ ও বিকৃতিকে তিনি আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই আঘাতের পিছনে ছিল হিতৈষী মনের সুগভীর মর্মবেদনা।[২] তাহার বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম প্রকাশের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র পাইল ঐতিহাসিক জগতে। সেখানকার বিচিত্র উত্থান-পতনময় কাহিনীর মধ্যে তিনি তাঁহার উদাত্ত স্বদেশপ্রেম ঢালিয়া দিলেন। রাজপুত-কাহিনী পরাধীন দেশের মুক্তিকামী জনগণের নিজেদের কাহিনী হইয়া উঠিল।

কিন্তু শুধু দেশপ্রেম নহে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক উদার সর্বজনীন প্রেমে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত অনুপ্রাণিত ছিল।[৩] সেজন্য উগ্র জাতিবৈরিতা অপেক্ষা মানবের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রী-স্থাপনে তাঁহার আদর্শান্বিত দৃষ্টি আগ্রহান্বিত ছিল। 'মেবার-পতন' নাটকে তিনি বিশ্বপ্রীতির মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে

১। 'বিলাতে যত রকম রঙ্গমঞ্চে রঙ্গ অভিনয় দেখি, এর মধ্যে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।' আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭

২। 'কিন্তু তার সঙ্গে যে দুদিনও মিশত সেই মুগ্ধ হত দেখে তিনি গভীর বেদনা বোধ করতেন দেশবাসীর জীবনপ্রাণে অসাড়তায়—স্বাধীন চিন্তার দৈন্যে—সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। তার উপর এ বেদনা ছিল কবির বেদনা—বিদ্রূপীর বেদনা নয়। তাই তিনি বিদ্রূপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক ও দেশাত্মবোধের গান গেয়েছিলেন, 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা', চেয়েছিলেন 'আবার আমরা মানুষ হই।' উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়—পৃঃ ৩৩৭

৩। 'দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্বদেশ-ভক্তি সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে এ সমগ্র জগন্মঙ্গলেচ্ছায়। তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না।' দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭৩৭

চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভগবানের প্রতি উদাসীন ছিলেন, কোনো অলৌকিক আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। অথচ মানুষের প্রতি এক সীমাহীন বেদনা ও মমত্বে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। সেজন্য স্বর্গের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণরাজ্য ছাড়িয়া তিনি মর্তের ধূলিতলে সমস্যা-সংঘাত-জড়িত মানবের দিকে আগ্রহ-সিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অধ্যাত্ম জীবন হইতে এই যে বস্তুজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত, ভগবান অপেক্ষা মানুষের প্রতি এই যে গভীরতর কৌতুহল ইহারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আধুনিক নাট্যধারার সগৌরব প্রবর্তন ঘটিয়া গেল। আধুনিক কালে সমাজের বিভেদ-বিরোধ দূর করিয়া যে সাম্যনীতি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে তাহার সুস্পষ্ট রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। এই সাম্যনীতির প্রেরণাতেই তিনি হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও শ্রেণীবৈষম্যকে এরূপ কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছেন।

মানবতার মহৎ গৌরব দেখাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল মানবতার বেদনাও গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। বড় গৌরবের জন্য বড মূল্যও দেওয়া প্রয়োজন। দুঃখকে যে বরণ করিয়া নিল সেই তো অপরাজেয় গৌরব অধিকার করিতে পারিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুঃখের মহিমা দেখাইয়াছেন—দেখাইয়াছেন প্রতাপের দুঃখভোগ, সগরসিংহের অন্তর্জ্বালা, যশোবন্তসিংহের মৃত্যুবরণ, মহাবৎ খাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু কেবলমাত্র আদর্শগত দুঃখ নহে, মানব-চরিত্রের মানসিক বাসনা ও প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে যে দুঃখ অনিবার্য আঘাতে চিত্তকে বিচলিত করে তাহার রূপও নাট্যকার দেখাইয়াছেন। সাজাহানের ক্রুদ্ধ হৃদয়জ্বালা, নূরজাহানের শোচনীয় পরাজয়, চাণক্যের নিরুদ্ধ বেদনা ও দারার মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের হৃদয়ে এক ঘনীভূত ট্র্যাজিক অনুভূতির সৃষ্টি করে। বাঙালীর কোমল, অশ্রুতরল চিত্তভূমিতে ট্র্যাজেডির রুক্ষ-কঠোর মূর্তি স্থান পায় না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের তুলিকায় এই মূর্তি তাহার অসামান্য মহিমা লাভ করিল—অশ্রুর লাবণ্যে সিক্ত হইয়া নহে, অশ্রুহীন আগুনে দগ্ধীভূত হইয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের এই ট্র্যাজিক রূপ দেখাইতে সমর্থ হইলেন, কারণ তিনি জীবনকে দেখিলেন পরিপূর্ণভাবে। বেদনার প্রবল আবর্ত বাহিরে দৃশ্যমান নহে, তাহা চলে অদৃশ্যভাবে অন্তরের অভ্যন্তরে। যিনি এই অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন তিনিই তো গভীরতম বেদনার রূপটি চিনিতে পারিলেন। এই দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল, সেজন্য তাঁহার নাটকে বহির্জগতের বিবাদ অপেক্ষা

অন্তর্জগতের বিপ্লবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এ-পর্যন্ত দেউড়ির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা অনেক হাঁকডাক শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিগকে রস ও রহস্যে ভরা অন্তঃপুরের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও স্বদেশী ভাবপ্রেরণা লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটক জাতীয় ভাবোদ্দীপিত দর্শকদের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার পার্থক্য গুরুতর। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি বস্তুজগতে নিবদ্ধ, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের দৃষ্টি অলৌকিক জগতের রহস্য ও মহিমায় কৌতূহলী। তিনি আধুনিক উদার মতবাদে বিশ্বাসী হইলেও ধর্ম ও শাস্ত্র-নির্দেশিত পুরাতন পথের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের কাহিনী অপেক্ষা চরিত্র-সৃষ্টির দিকেই অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের দৃষ্টিতে চরিত্র অপেক্ষা কাহিনী-বর্ণনার প্রাধান্য ছিল বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি গাঢ় ও উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের চরিত্রগুলি একটু অস্পষ্ট, অস্ফুট, দুর্বোধ ও বিবর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলালের ঘটনার দৃঢ় সংহতি ও কেন্দ্রমুখিতা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাই। অসংলগ্ন দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের আধিক্যের ফলে তাঁহার নাটক দীর্ঘ, শিথিল ও অভিনয়ের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তাঁহার সংলাপে মাঝে মাঝে কাব্যময় উচ্ছ্বাস থাকিলেও শাণিত দীপ্তি এবং ক্ষিপ্র গতিবেগ নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকেও উদাত্ত-গম্ভীর বীর্যদীপ্ত পরিবেশ জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রায়ই তাঁহার চরিত্রগুলি অন্তর্নিহিত রহস্যে জটিল, ভাবাতুর ও অব্যবস্থিতচিত্ত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিছুকালের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের বহুল ব্যাপ্তি দেখা গেল বটে, কিন্তু কেবল এই জন্যই তৎকালীন নাট্যযুগ স্মরণীয় নহে। এই সময়কার নাটকের মধ্য দিয়া আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তনা হইয়াছে, ইহাই এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মানবতার গৌরবায়ন, বস্তুজগতের প্রতি নবজাগ্রত কৌতূহল, চরিত্রদ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজিক রসের অবতারণা, গতিবেগ ও ভাবসঙ্গতির দিকে মনোযোগ, রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ স্থাপন—এ সব দিক দিয়া আধুনিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। এই যুগচেতনা অল্পবিস্তর প্রায় সকল নাট্যকারের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু এই যুগ-প্রবর্তক অবিসংবাদিত ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(ক) ভূমিকা

গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গালয়ের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না। অভিনেতৃ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার নাট্য-জীবন পুষ্টিলাভ করে নাই। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যকার নাটক লিখিবার কালে প্রেক্ষাগৃহের পরিচিত দর্শকবৃন্দের কথা চিন্তা করিয়া লইতেন, এই সব দর্শকের রুচি ও মর্জি খুশি করিবার লক্ষ্য ছিল বলিয়াই তাঁহাদের অধিকাংশ নাটক সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চে সার্থক সম্বর্ধনা লাভ করিত বটে, কিন্তু অনাবশ্যক দৃশ্য, অবান্তর নাচ-গান এবং অশোভন ভাঁড়ামি প্রভৃতি সেই সব নাটকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সাময়িক কোনো রুচি ও চাহিদার অনুকূল সুলভ উপাদানের সদ্ভাব ছিল না। সেজন্য দর্শকের মানসিক বিবর্তনের ফলে তাঁহার নাটকসমূহ অপ্রিয় হইয়া যায় নাই।

নাটক পঠন এবং দর্শনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাট্য-প্রতিভা উন্মেষিত হয়। বিলাতে এবং এই দেশে বহু নাটকের অভিনয় দেখিয়া নাটকের প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মিতে থাকে। প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিচিত্র শতদল তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রহসন এবং নাট্য-কাব্যের সময় ইহ অস্ফুট কোরকের ন্যায় অপূর্ণ ছিল, ধীরে ধীরে ইহার পাপড়িগুলি প্রসারিত হইয়া ঐতিহাসিক নাটকে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া চতুর্দিকে সৌরভ ছড়াইতে লাগিল, এবং অবশেষে সামাজিক নাটকে ইহা ম্লানায়মান ও শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়িল। তিনি যখন প্রহসনগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন হাসির গানের যুগ, স্ত্রী এবং বন্ধুবর্গের মধুময় সংসর্গে তাঁহার কৌতুক এবং আনন্দরস শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, রঙ্গব্যঙ্গের চাপল্যে তিনি প্রাণ খুলিয়া মাতিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হাসির গান লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃত প্রহসনের প্রতিভা তাঁহার ছিল না। সেজন্য প্রহসনের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হয় নাই। প্রহসনের পর শেক্সপীয়রের আদর্শে তিনি অমিত্র ছন্দে কয়েকখানা নাট্য-কাব্য রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাব তখনো প্রবল। সেই প্রভাবে চালিত হইয়াই

হয়তো, তিনি পৌরাণিক নাটক লেখা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিকতাবিরোধী মনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পৌরাণিক নাটক ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক লিখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইহাতে তাঁহার সম্যক্ অধিকার নাই, নাটকের পক্ষে পদ্য স্বাভাবিক নয় তাহাও তাঁহার মনে হইল।[১] সেজন্য তিনি গদ্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে সুরু করেন। এতদিন পরে তাঁহার গৌরবময় সিদ্ধির পথ তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত হইয়া উঠিল। পদ্য-রচনার কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত করিয়া তিনিই সর্বতোভাবে বাংলা নাটককে আধুনিক পদবাচ্য করিয়া তুলিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হয় ঐতিহাসিক নাটক এতদিন চরম সার্থকতা লাভ করিবার আশায় দ্বিজেন্দ্র-লালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, বুঝি তাঁহার পূর্বে কেহ আর ইহাকে একচ্ছত্র মহিমায় ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার পরেই আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর তাহার অভ্যুত্থান হইবে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণ-যুগ বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকসমূহ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে যে তুমুল বিক্ষোভ এবং প্রবল আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সমস্ত জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক তাহা শক্তিশালী করিয়া রাখিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।[২]

যে স্বদেশী উন্মাদনার সূচনা হইয়াছিল 'প্রতাপাদিত্যে', তাহারই পূর্ণ

১। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'তথাপি নাটক অভিনয় করিবার জিনিস। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়ঃ। লোকে কথাবার্তা পদ্যে কহে না, গদ্যে কহে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।' আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭

২। The above movements too would have proved short-lived, were not the aforesaid dramas produced at that time. At such time of the greatest need, these dramas acted like a great inspiration and changed the servile mentality of the people. *The Indian Stage* (Vol. IV)—H. N. Das Gupta

পরিণতি দেখা গেল ‘প্রতাপসিংহ’, ‘দুর্গাদাস’, ‘মেবার-পতন’ প্রভৃতি নাটকে। জাতীয় মন্ত্র-দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটাইয়া তুলিয়া ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোক সংগীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট ত্যাগের মধ্যে মর্মান্তিক কারুণ্য প্রকাশ পাইলেও সঙ্গে সঙ্গে আত্মোৎসর্গের মহিমা, স্বার্থ-ত্যাগের গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, পুনরায় মহাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য হৃদয়ে দুর্বার প্রেরণা বোধ করা যায়। ভারতবাসীর শত প্রকার দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যেও নাট্যকার আবার আমাদিগকে মানুষ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, এই সুগভীর আশাবাদ তাঁহার নাটকগুলিকে অমূল্য জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটকের অনুকূল পরিবেশ সৃজন করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় আর কেহই সক্ষম হন নাই। তাঁহার নাটক আমাদের চোখের সম্মুখে ইতিহাসের পাতা হইতে এক বিরাট জগৎকে জীবন্ত করিয়া উপস্থাপিত করে, সেখানে সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণতা নাই—সেখানকার পাত্র-পাত্রী সব অসাধারণ উপাদানে গঠিত, তাহাদের কথাবার্তা, চালচলন, হৃদয় ও মনের লীলা এক সমুন্নত মহিমা এবং অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রেমে অপ্রতিম, শৌর্যে সীমাহীন, আবার ক্রোধে প্রচণ্ড, হিংসায় দুর্বার। তাহাদের উত্থান-পতন আমাদের হৃদয়ে মৃদু কম্পন জাগায় না, সজোর আঘাতে ইহাতে দ্রুত স্পন্দন সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলিতে মানব-চরিত্রের এক একটি দিক পূর্ণ এবং চরমরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম, দুর্গাদাসের মহত্ত্ব, গোবিন্দসিংহের সুদৃঢ় সঙ্কল্প, মহাবৎ খাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, কাশিমের প্রভুভক্তি—মানবজীবনের এক একটি আদর্শকে অভ্রান্তভাবে রূপায়িত করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে বীররস ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সেই ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রলালের সমধিক পরিমাণে ছিল বলিয়াই তাঁহার নাটকগুলি এইরূপ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বীরত্ব ও শৌর্যের বর্ণনায় তাঁহার চিত্ত উল্লসিত থাকিত। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলির কথায় এবং আচরণে সর্বত্র একটা দৃপ্ত পৌরুষের এবং অটল গাম্ভীর্যের ভাব প্রকাশিত। কিন্তু এই বীররসের আধিক্য আবার অনেক স্থলে তাঁহার

নাটকের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে, অনেক সময়েই অকারণ বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া তাঁহার চরিত্রগুলি হাল্‌কা এবং হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। তখন মনে হয় তাহাদের উত্তেজনাটা কৃত্রিম, এবং তাহাদেব বীরত্বের প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ আস্ফালন বই আর কিছুই নয়। তববারির নিষ্কাশন এবং চালনা তাঁহার নাটকে বড়ো বেশী দেখা যায়।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালেব নাটক সার্থক এবং জনপ্রিয় হইবাব প্রধান কাবণ, ইহার অপরূপ অনবদ্য ভাষা। তাঁহাব পূর্বে এইরূপ শক্তিশালী, কবিত্বপূর্ণ এবং নাটকীয় ভাষা আর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আব কেহই ভাষাব দিক দি া তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তাঁহার পূর্বতন নাট্যকারবৃন্দেব ভাষা আমবা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা সর্বাংশে নাটকীয় নয়। নাটকের ভাষা নিবাবেগ কথাব সমষ্টি নয়, ইহা দ্বারা চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং ঘটনার গতিবিধান কবিতে হইবে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা ভালো-ভাবেই জানিতেন। সেজন্য তাঁহাব ভাষাব মধ্যে সর্বত্র একটা গতিব আবেগ, এবং ভাবেব উচ্ছ্বাস লক্ষ্য কবা যায়। সংলাপের প্রতিটি কথা যেন এক একটা তীক্ষ্ণফলা ছুবিকাব ন্যায় ঝকমক কবিতেছে, যেন নিমেষগতিতে দর্শকের হৃদয়ে ইহা আমূল বিদ্ধ হইয়া যাইবে। শব্দভাণ্ডাবেব উপব তাঁহার অবিচল অধিকার ছিল বলিয়া ভাষাকে তিনি নানা রত্ন-আভরণে সাজাইয়া অনিন্দ্য সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানসিক ভাব ও দ্বন্দ্ব প্রকাশ কবিতে হইলে ভাষার শব্দসমষ্টি নানাভাবে কাটছাঁট করিতে এবং সাজাইতে হয়। দ্বিজেন্দ্র-লাল তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যপ্রণালী স্থানে স্থানে ইংবাজী ধরনের হইয়া পড়িয়াছে, নাটকের দিক দিয়া ইহা মোটেই দোষাবহ হয় নাই। অনেক সময় কোনো বাক্য একবাব বলিলে তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী হয় না। একই ভাবাত্মক কয়েকটি বাক্য পব পর বলিলে তাহা যথেষ্ট আবেগজনক হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষার মধ্যে ভাবের ক্রমোচ্চতা বিধান করিয়া নাটককে বিশেষ সরস কবিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে ইহাব একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

'উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তাব ক'রে উঠুন, হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত

১। ডঃ সুকুমার সেনের একটু কঠোর মন্তব্য উল্লেখ্য—'এই নাটকগুলি উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের মতো অত্যন্ত melo-dramatic, প্রায় প্রত্যেকটিতে গানগুলি ছাঁড়া আছে।'
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩৮

প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন, নিয়তির মত কঠিন হোন, হিংসার মত অন্ধ হোন, শয়তানের মত ক্রূর হোন।'

'সাজাহান'—১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কাব্যশক্তি নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গদ্য নাটক রচনা করিলেও তিনি গদ্যের ভাষাকে কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।[১] সেই কারণেই তাঁহার ভাষার মধ্যে সুললিত শব্দ-পারিপাট্য, সুষম ছন্দমাধুর্য, এবং সুমনোহর অলঙ্কার-সৌন্দর্য এত অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়েই তাঁহার পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায় আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাস এবং গূঢ় ব্যঞ্জনা দেখা যায়।[২] উক্তির এইরূপ চমৎকারিত্বের জন্য তাঁহার নাটকীয় সংলাপ লোকের মুখে মুখে একরকম অমর হইয়া রহিয়াছে। যেখানে কোনো চরিত্র আত্মগত ভাব প্রকাশ করিতেছে সেখানেই তাঁহার কল্পনা উদ্দাম, এবং ভাষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাণক্য এবং সাজাহানের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলির কথা চিন্তা করিলেই এই মতের যাথার্থ্য প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার ভাষায় অলঙ্কারের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালোপমা প্রয়োগ করিয়া তিনি যেমন বাক্যের মধ্যে Climax সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি উৎপ্রেক্ষা এবং সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজী Epigram ও Oxymoron অলঙ্কারের প্রাচুর্য তাঁহার ভাষার মধ্যে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় অলঙ্কারের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং আকস্মিকতা তাঁহার ভাষাকে খুব উপভোগ্য করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইহাতে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার অভাব আছে। তাঁহার অলঙ্কৃত ওজস্বিনী ভাষা সকলেই ব্যবহার করিতেছে—স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ—সর্বশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর ইহাই একমাত্র ভাষা। এই ভাষা সর্বত্র জাঁকজমকপূর্ণ দরবারী

১। 'কিন্তু কবিতায় আমার স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।'

আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩ ৭

২। তাঁহার নাটকীয় পাত্রগুলির কথাবার্তার মধ্যেও অনেক স্থানে সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছ্বাস এবং ঝঙ্কারই লক্ষ্য করিবেন; সময় সময় এক একটি কথা অপরূপ বিদ্যুৎ বিভাসের ন্যায়, সঙ্গীতের আকস্মিক আবেগ মূর্ছনার ন্যায়, উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট করিয়াই হয়ত অচিরে বিলীন হইতেছে।'

'বঙ্গবাণী'—শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ১৪৯

পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আছে, ইহা যেন 'আটপৌরে' শাড়ি পরিতে পারে না। ইহার মহিমা ও গৌরব আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ইহার সর্বজনীন স্বাভাবিকতা দ্বারা যেন আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ করিতে পারে না। বাহিরের ক্ষেত্রে যেখানে বড়ো বড়ো ঘটনা ও চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে সেখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আসন সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যে পায়ে চলা খিড়কির পথটি দিয়া পরিচিত নরনারীর অমার্জিত কথাবার্তা, অশ্লীল রঙ্গ তামাশা মুখরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহার জানা নাই। দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকীয় চরিত্রের উপযোগী ভাষা প্রয়োগ করিতে অবহিত ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ ছিলেন না। সেইজন্য পাত্রপাত্রীর মুখে অনেক সময় ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পাত্রপাত্রীর বিশিষ্ট পরিচয় ভাষার মধ্যে নাই—মুসলমান এবং হিন্দুর ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, মোগল সম্রাট এবং একটা সাধারণ লোকের ভাষার বৈষম্য নাই। মোগল দরবারের গায়িকারা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছে, এমন কি 'সোরাব রুস্তম্'-এ সারিয়া ও হামিদা যে একটি বৈষ্ণব কীর্তন পর্যন্ত গাহিয়া ফেলিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি তাহা ধরিতে পারে নাই। ইহাই তাঁহার ভাষায় প্রধান ত্রুটি।

দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের নাট্যকলার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাটকে আধুনিক টেকনিক এত বেশি দেখা যায়। ইবসেনের পর হইতে বর্তমান নাট্যকারদের নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নানা নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। বার্নার্ড শ'-এর যে কোনো নাটক খুলিলেই দেখা যাইবে তিনি অভিনয়, রূপসজ্জা এবং মঞ্চব্যবস্থা সম্বন্ধে কত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও সম্ভবত ইহাদের অনুসরণ করিয়া অভিনেতার ভাবের অভিব্যক্তি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।[১] এইরূপ মঞ্চনির্দেশের ফলে তাঁহার নাটক স্থানে স্থানে উপন্যাসের মতই বর্ণনাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে—

"পার্বতী তৎক্ষণাৎ শান্তাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে হেলিলেন। শান্তা কিন্তু ছোরাহস্তে পূর্ববৎই দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রায় সকলেই উঠিয়া

১। 'The detailed stage direction so characteristic of him as to be a mannerism point also to a foreign model. and the examples of Shaw and Galsworthy might have supplied him with the hint.'

Western Influence in Bengali Literature—by Sen, p. 274

দাঁড়াইয়াছিল ও নির্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, হিরণ্ময়ী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—'কে তুমি! কে তুমি!—' এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।"

'পরপারে'—২য় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক বলিয়া বর্জিত হইয়াছে।[১] বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব পর্যন্ত স্বগতোক্তির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম এই অস্বাভাবিক ও দুর্বল নাট্যরীতিটি নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। অবশ্য প্রথম যুগে লিখিত তাঁহার প্রহসনগুলিতে এই স্বগতোক্তির ব্যবহার স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

গিরিশ-যুগে যে ধর্মভাব এবং আধ্যাত্মিকতা নাট্যসাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল যেন তাহার দৃপ্ত প্রতিবাদস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের নবোত্থানকালে যে ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্ছ্বসিত প্লাবন শুরু হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা সজোরে প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান এবং আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত চিরকালই ঘোর যুক্তিবাদী এবং সংশয়ী ছিল।[২] সাধারণ লোকে সহজাত সংস্কাররূপে যেগুলিকে মানিয়া লয় তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচায় এবং প্রবল যুক্ততর্কের আঘাতে তাহাদের অস্তিত্ব তিনি উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। শেষ জীবনে যদিও তাঁহার মতের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বাহিরে কখনো তাহা স্বীকার করেন নাই।[৩] তাঁহার মনের ছাপ নাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কোনো নাটকেই আধ্যাত্মিক, কিংবা ভগবদ্‌বিষয়ক কোনো তত্ত্ব এবং রহস্য নাই। কোন স্থানেই চিন্তা এবং কল্পনা দৃশ্য জগতের বাস্তব ধূলামাটি অতিক্রম করিয়া কল্পময় কুয়াসাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক আকাশে সঞ্চরণ করে নাই। একমাত্র 'পরপারে' ব্যতীত

১। 'The practical disappearance of both formal soliloquy and incidental aside from our greater contemporary drama notwithstandin, the fact that this drama is so largely psychological in its interest, is thus a most significant index of a general change in our ideas of dramatic technique.'

The Study of Literature by Hudson, p. 262

২। 'মানববুদ্ধির অতীত যে সকল অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে, সহজাত সংস্কার বা পরিবেশ প্রভাবে, সচরাচর হিন্দু সন্তানের মনে একটা বিশ্বাস ও ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসমূহে তিলমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৮০

৩। 'দ্বিজেন্দ্রলাল'—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৯৪

আর কোন নাটকেই পরলোক সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলা হয় নাই,[১] এবং একমাত্র ভবানীপ্রসাদ ব্যতীত আর কোনো চরিত্রই ধর্মভাবাত্মক নহে। দারা, শক্তসিংহ, চাণক্য, কালীচরণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সংশয়বাদী নাস্তিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত। ভগবান ও ধর্মবিষয়ে ঔদাস্য এবং উপেক্ষা দেখাইলেও তাঁহার দৃষ্টি মানুষের সর্বময় উন্নতি এবং কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ ছিল। ভগবানকে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমর্পণ করা যায় তাহা তিনি মানবসমাজের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাটকের সর্বত্র মনুষ্যত্বের সমুন্নত গৌরবের কীর্তনে মুখরিত। ধর্মভাব না থাকিলেও তাঁহার নাটকের কোনস্থলে সবল এবং সুদৃঢ় নীতিবোধের অভাব ছিল না। এমন কিছুই তিনি দেখান নাই যাহা আমাদের অসৎ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় অথবা আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত এবং বিপথাশ্রয়ী করিয়া তোলে।[২] কিন্তু এরূপ অবিচল নীতিনিষ্ঠা সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে নীতিবাগীশ মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। সেজন্য যাহারা ভ্রান্ত ও পতিত, অবস্থা-বিপাকে যাহারা সমাজচ্যুত, তাহাদের পুনরুত্থানের চিন্তা ও আশ্বা তাঁহার নাটকের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব ছিল। এই সতী-সাধ্বীর দেশে নারীর দুঃখভোগ, আত্মবিলোপ ও নির্বিচার ভক্তির মহিমাই চিরকাল কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নারীর এই আদর্শগুলিকে খুব গৌরবান্বিত করিয়া দেখেন নাই। নারীজাতির অপমান, লাঞ্ছনা এবং দুর্ভোগের অবস্থাই তাঁহার চোখে বিশেষ করিয়া লাগিয়াছিল এবং সেজন্য সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি নারীকে তেজস্বিনী, স্বাতন্ত্র্যময়ী করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত নারীচরিত্র অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা নহে। হেলেন, জাহানারা, নূরজাহান, মহামায়া—ইহারা প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী বীরাঙ্গনা, ইহারা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পার্শ্বচর অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিনী। নারীত্বের এই অভিনব এবং আধুনিক আদর্শ তিনি শাস্ত্রশাসিত সমাজ হইতে পান নাই;

১। 'পরপারে' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার মানসচরিত্র বিশ্বেশ্বরের মুখ দিয়া একস্থানে বেশ ভালো ভাবে মনুষ্যত্বের গৌরব প্রচার করিয়াছেন—'ছি ছি! মানুষের নিন্দা কোরো না। মানুষ আমার ভাই! তার নিন্দাবাদ শুনতে চাই না।' 'পরপারে'—১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

২। শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। 'কবি এরূপ পুণ্যব্রত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে উহাদের মধ্যে মনুষ্য-হৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত ইসারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই; নিঃসন্দেহে বলা যায়— He uttered nothing base.' 'বঙ্গবাণী'—পৃঃ ৩৫১

নারী এবং পুরুষের সাম্যমূলক ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারা হইতে লাভ করিয়াছিলেন।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব বোধ হয় এইখানে যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বিরুদ্ধ ভাব সংঘাতে অতিশয় প্রাণময় এবং আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বাংলা নাটকে দেখিয়াছি যে চরিত্রগুলি নিতান্ত স্পষ্ট এবং সহজ; হয় তাহারা অবিমিশ্র ভালো অথবা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ। কিন্তু এইরূপ চরিত্রগুলিকে একবার দেখিলেই কোন আগ্রহ ও কৌতূহলের অবকাশ থাকে না, তাহাদের অবধারিত পরিণতি যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু মানুষের জীবন যে জলের ন্যায় স্বচ্ছ, স্পষ্ট নহে, ইহা যে গণিতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের ন্যায় অবিচল ও অপরিবর্তিত নহে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মনোবিকলন তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনায় মানুষের চেতন অচেতন স্তরের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ এবং বিস্ময়কর ভাবের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও গভীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সংঘাতগুলি অতি সযত্ন চেষ্টার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। কোনো চরিত্রকে দেখিয়াই আমরা মনের মধ্যে একরূপ ধারণা করিয়া বসি, সেই চরিত্র যদি তাহার কথা এবং আচরণের দ্বারা অকস্মাৎ সেই ধারণার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয় তবে আমরা যেন চকিত এবং চমৎকৃত হই, তেমনি আবার সেই চরিত্র সম্বন্ধে উত্তরোত্তর আগ্রহশীল হইয়া উঠি। লেখক অপ্রত্যাশিত ভাবের আঘাত দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, আমরা যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছি তাহাই চরম নহে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাই অভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তিনি দুর্গাদাস ব্যতীত যেমন কোন দোষাতীত আদর্শ চরিত্র অঙ্কন করেন নাই, তেমনি পার্বতী ব্যতীত আর কোন নির্জলা মন্দ চরিত্রও দেখান নাই। তাঁহার নূরজাহান, আরংজেব, সূর্যমল, চাণক্য—প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চরিত্র—বিচিত্র ভালোমন্দ দোষগুণের মিশ্রিত উপাদানে গঠিত। তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় সুষমা নাই, নারকীয় কালিমাও নাই, তাহা সম্পূর্ণ মানবীয় মহিমার অপূর্ব স্বাভাবিক শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

১। 'তিনি ভাবিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে, আবহমানকাল হিন্দু সমাজ নারীজাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও হতাদর করিয়া আসিতেছে। আজ যে আমরা এ সম্বন্ধে একটু মর্যাদাশীল হইয়াছি, সে শুধু বর্তমান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম মাত্র; নতুবা, হিন্দু সভ্যতার চরমোন্নতির সত্ত্বেও আমরা ইহাদিগকে গৃহস্থ তৈজসপত্রের ন্যায় নগণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৭৩-৭৪

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের আধুনিকতার লক্ষণ আর একটি এই যে, তিনি প্রচলিত নাট্য-সাহিত্যকে অনুসরণ করিয়া বিদূষকজাতীয় কোন চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। তিনি মাঝে মাঝে সাধারণ লোকের কথাবার্তার মধ্যে হাস্যরস সৃজন করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু হাস্যরস কোথাও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই। হাসিতে হইলে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম, দু'একটা আজে-বাজে কথা বলা দরকার; কিন্তু যেখানে অবিরত যুদ্ধের রণ-দামামা বাজিতেছে, অস্ত্রের ঝনৎকার, যোদ্ধার বিজয়-উল্লাস, আহতের আর্তনাদ চলিতেছে, সেখানে হাসিবার অবসর কোথায়? একটু আধটু হাসির সুযোগ আসিলে মনে হয় হাসাটা অন্যায়, কর্তব্যের ত্রুটি হইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের হাস্যরস লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব।

(খ) প্রহসন

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিই তাঁহাকে প্রথম সাহিত্য-দরবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার হাসির গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহার প্রসহনের কৌতুক ও হাস্যরসের মূলেও গানগুলি রহিয়াছে। গানগুলি বাদ দিলে তাঁহার প্রহসন নীরস ও কৌতুকবর্জিত বোধ হইবে। উদ্ভট এবং বিস্ময়কর ঘটনা-সমাবেশে যে হাস্যরস উদ্গত হইয়া উঠে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই হাস্যরস সৃষ্টি করিবার অধিকারী ছিলেন না, দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের ন্যায় সরস এবং কৌতুকাবহ বাক্য-নির্বাচন করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আয়ত্ত ছিল না। বাক্যবিন্যাসের পাকে পাকে যে হাসি জড়াইয়া থাকে তাহা তাহার প্রহসনে নাই। তাহার প্রহসনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটাগুলি একটু তীক্ষ্ণভাবেই আছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো গোঁড়ামি এবং পক্ষপাত-দোষ ছিল না। প্রাচীন এবং নবীন উভয় সম্প্রদায়ের বিকৃতি ও অনাচারের প্রতি তাঁহার রোষ সমানভাবে ছিল। সেইজন্য তাঁহার আঘাতে কাহারো অসন্তুষ্ট ও অভিযোগী হইবার কারণ থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫)। ইহা ছড়ার মত মিত্রাক্ষরে আদ্যন্ত রচিত। ইহাতে বিলাত-ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত—এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। পরিশেষে কল্কিদেব বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দিলেন এবং সকলেই বুঝিল যে,

বিশ্বাস প্রেম এবং মনুষ্যত্বের উপরেই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি। প্রস্তাবনায় লেখক বলিয়াছেন যে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার দ্বেষ কিংবা আক্রোশ নাই, বরং ইহাই সত্য—পরিহাসের মধ্য দিয়া সকলের ত্রুটি ও গলদ ধরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শোধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রহসনখানির মধ্যে ঘটনার কোনো অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নাই, ইহা কাটা কাটা দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। নিতান্ত অসংলগ্নভাবে অকারণ চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। নেহাত বাজে এবং অবাস্তব সংলাপও অনেক স্থলে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

'বিরহ' (১৮৯৭। বিশুদ্ধ প্রহসন। ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যে ইহার হাস্যরস নিহিত। উৎসর্গপত্রে লেখক বলিয়াছেন, 'আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস অংশটুকু দেখানো', কিন্তু সেই উদ্দেশ্য উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিথ্যা ধারণা এবং ভ্রান্ত সন্দেহ-নিরসনের মধ্যে দিযাই প্রহসনখানির কৌতুকরস ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপকাহিনীর রহস্যময় রোমান্সে প্রধান কাহিনী গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। 'বিরহে'র গানগুলি ইহার প্রধান সম্পদ।

'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০) আত্যান্ত নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। জায়গায় জায়গায় হাসির টুকরা ছড়াইয়া থাকিলেও অবিচ্ছিন্ন ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে হাস্যরস জমিয়া উঠে নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবুর ধরনে অঙ্কিত ডাক্তার ভূদেবের চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা সরস।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) প্রহসনে বিলাত-ফেরত, নব্যহিন্দু এবং শিক্ষিতা রমণীদের লইয়া উপহাস করা হইয়াছে। প্রহসনখানার ভাব এবং বিষয়ের উপর অমৃতলালের প্রভাব বিদ্যমান। শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা স্ত্রী চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতিও অমৃতলালের প্রহসনগুলির অনুসরণে অঙ্কিত। চম্পটির সহিত রেবেকার বিচ্ছেদে এবং ইন্দুমতীর বিবাহে অনর্থক একটি ঘোরালো সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের সর্বব্যাপী আনন্দের ব্যাঘাত হইয়াছে। চম্পটি অকস্মাৎ কি ভাবে খাটি হিন্দু বনিয়া গেল তাহারও যথেষ্ট কারণ দেখানো হয় নাই।

॥ পুনর্জন্ম (১৯১১) ॥ 'পুনর্জন্ম' অনেক পরে রচিত হয়। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ইহাতে নীতিকথার অভাব নাই। অবশ্য নীতিকথা শিক্ষা করিতে কেহ নাটক ও প্রহসন দেখিতে চায় না। নীতিকথার ছলে লেখক কি-রকম আমাদের হাসাইতে এবং আনন্দ দিতে পারিয়াছেন আমরা তাহাই জানিতে চাই।

কৃপণ দয়াহীন কুসীদজীবীর পরিণতি দেখানই যদি নাট্যকারের অভীষ্ট নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে, তবে বলিতে আপত্তি নাই যে তাহা সার্থক হইয়াছে। যাদবের মুখ দিয়া এই নীতি ব্যক্ত হইয়াছে—'মরেছিলাম, এ আমার পুনর্জন্ম, আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘটবে চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয় দেখলাম'। যাদব চক্রবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে নিজেকে, আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া, এবং পরের শোষণের মধ্য দিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা বিফলে ব্যর্থ হইয়া যায়, এই জ্ঞানই তাহার পুনর্জন্ম। দারোগা-কনেস্টবলের অহেতুক অত্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ করাও নাট্যকারের অন্যতম গৌণ উদ্দেশ্য। মারের চোটে ইহারা মিথ্যাকে কিভাবে সত্য প্রতিপন্ন করে তাহা যাদবের কথার মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে—'যাক, শেষে রুলের তিন গুঁতোয় প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি যাদব চক্রবর্তী নই, গুঁতার চোটে বাবা বলায়—এ ত তুচ্ছ কথা।' প্রহসনের এই অংশে হাস্যাস্পদ ব্যক্তি যাদব নহে, যাদব এখানে হাস্যরস-উদ্রেক্তা – নাট্যকারের মতের বাহন। অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত, উপহাস-কর্তা যাদব বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দারোগা-কনেস্টবল-ঘটিত দৃশ্যের পূর্বে যাদব নিজেই উপহাসাস্পদ ছিল, এবং যাদবের দুর্দশা ও নিজের পরিচয় পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহার আত্যন্তিক ব্যগ্রতা দেখিয়া পাঠক ও দর্শকের মনে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়।

জটিল এবং ঘোরালো ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্রেক করাই প্রহসনের লক্ষ্য। কিন্তু এই প্রহসনে তেমন ঘটনার জটিলতা ও রহস্যময়তা নাই। ঘটনার একই প্রকার সংস্থানের মধ্যে চরিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃত যাদব কিভাবে কৌতুকপূর্ণ ষড়যন্ত্রের ফলে নকল যাদব বনিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমাদের হাসির উদ্রেক হয়। কোনো মন্দ দুষ্ট লোকের শাস্তি এবং দুর্দশা দেখিলে আমাদের মনের মধ্যে একরকম প্রতিহিংসা-চরিতার্থতাজনক আনন্দের উদয় হয়, যাদবের ভাগ্যবিপর্যয়েও আমরা সে-রকম আনন্দ বোধ করিয়া থাকি। যেভাবে 'দশচক্রে ভগবান ভূতে'র ন্যায় যাদব নকল প্রমাণিত হইয়া গেল তাহা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণা দোষাবহ নহে, সেই দিক দিয়া আলোচ্য প্রহসনের কোনো ত্রুটি নাই। নর্তকীঘটিত দৃশ্যটি নেহাত্ দর্শকের নিম্নরুচির পরিতৃপ্তির জন্য সংযোজিত হইয়াছে, মূল ঘটনার দিক দিয়া ইহা বাস্তবিকই অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়।

'পুনর্জন্ম'-এর পর 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) রচিত হয়। বইখানার প্রচার না থাকিলেই ভালো হইত, কারণ ইহা লেখকের এক শোচনীয় ভ্রান্তির লজ্জাকর সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বিরোধের পঙ্কিল বারি-মন্থনে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালকে তাহা গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। 'আনন্দবিদায়' সুবিমল দ্বিজরাজের তুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্নস্বরূপ।

(গ) পৌরাণিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল যে তিনখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন সেইগুলিকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। তাঁহার বস্তুবাদী ইহসর্বস্ব মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবী চরিত্রের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান ও আগ্রহপরায়ণ ছিল না। সেইজন্য পুরাণ-অন্তর্গত কোনো ঘটনা এবং চরিত্র লইয়া নাটক লেখা আরম্ভ করিলেও তিনি সেই ঘটনা এবং চরিত্রকে আধুনিক বাস্তবের পরিদৃশ্যমান পটভূমিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক মানবীয় ভাবাত্মক হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু অলৌকিক ভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্লাবিত গিরিশ-যুগে আমরা পৌরাণিক নাটকের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছি, এই যুগের পরে ভক্তিভাবাত্মক পৌরাণিক নাটকের প্রসার আর দেখা যায় নাই।

॥ পাষাণী (১৯০০) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'। নাট্যকার রামায়ণের অহল্যা-কাহিনীর এক সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে অহল্যা কোথাও পাষাণময় আকৃতি লাভ করে নাই, তাই 'পাষাণী' নামকরণও যথার্থ হয় নাই। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে একেবারে সাধারণ মানবের স্তরে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র নাটকে কামার্ত লম্পট পুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন। নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র গৌতম। গৌতম প্রেম এবং ক্ষমার আধার এবং সর্বপ্রকার দুঃখক্লেশে স্থির ও অবিচলিত। অহল্যা ভ্রষ্টা হওয়াসত্ত্বেও তিনি নির্বিকার প্রশান্ত চিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। অহল্যার যৌবনের নিষ্ফলতায় ও কামনার ব্যর্থতায় আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইলেও ইন্দ্রের প্রতি তাহার প্রেমের মধ্যে নির্লজ্জ লালসা যেন সর্পের ক্রূর জিহ্বার ন্যায় লকলক করিতে থাকে। কিন্তু তাহাসত্ত্বেও নাট্যকার ইহার পরিণতি ক্ষমাসুন্দর

চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। অহল্যার পতনের জন্য তাহার দোষ আছে, কিন্তু অধিকতর দোষ শঠ, প্রতারক, লম্পট পুরুষজাতির—ইহাই বেশি করিয়া দেখানো হইয়াছে। নারীজাতির প্রতি গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও দরদ মাধুরী-চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায়। মাধুরী পতিত হওয়াসত্ত্বেও সতী-শিরোমণি, তাহার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের তুলনা নাই। কৌতুক-রসের প্রাচুর্য এবং গানের বাহুল্য নাটকখানির গম্ভীর রসের পরিপন্থী হইয়াছে।

॥ সীতা (১৯০৮)॥ রামায়ণ এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অনুসরণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার আধুনিক দৃষ্টিতে চরিত্রগুলিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য সাহসিকতার সহিত অনেক মৌলিক দৃশ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটকের গুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। 'সীতা' মিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, জায়গায় জায়গায় গৈরিশ ছন্দের অনুকরণ আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থাকায় পাত্রপাত্রীদের উক্তিগুলি দীর্ঘ এবং বর্ণনাত্মক হইয়াছে। তবে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রামচন্দ্রের সংলাপ যথেষ্ট নাট্যবেগসম্পন্ন হইয়াছে। সীতা-চরিত্রের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। চরিত্রটিকে অতুলনীয়রূপে মহনীয় এবং কমনীয় দেখাইবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। বনবাসের কথা অবগত হইয়া তাঁহার সীতা স্বামীর সত্য রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসিনী হইয়াছেন। তিনি সম্রাজ্ঞী হইয়াও সুখ ও বিলাসভোগে বিরত, স্বামীর সহিত তপোবনে যে সুখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহার চিন্তায় বিভোর। রামের দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়াও তিনি অনির্বাণ দীপশিখার ন্যায় স্বামীর চিন্তা নিজের অন্তরে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। সীতার চরিত্র যে-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বনবাস এবং ক্লেশভোগের জন্য রামচন্দ্রের প্রতি দর্শকের বিরাগ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু নাট্যকার কৌশলে বশিষ্ঠকে সমস্ত ব্যাপারের জন্য দায়ী করিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ জানিয়াও বশিষ্ঠের আজ্ঞায় তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুনরায় বশিষ্ঠের নির্দেশেই শূদ্রকবধের অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি এবং বশিষ্ঠের আলোচনাকালে বশিষ্ঠের পরাজয়ে তিনি যে ভ্রান্ত, ইহা নাট্যকার প্রমাণ করিয়াছেন। সীতা চরিত্রের মহত্ত্ব এ নাটকে ব্যক্ত হইলেও প্রেম ও রাজকর্তব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত রামচন্দ্রের ট্র্যাজেডিই এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ভীষ্ম (১৯১৪) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় পৌরাণিক নাটকখানি অনেক পরবর্তী কালে রচিত হয়। 'ভীষ্ম' পরিপক্ক লেখনীর রচনা, ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্ব নাটকের মধ্যে সুব্যক্ত। এই নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দপ্রয়োগে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সক্ষম হইয়াছেন। নাটকের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভারতের এক উজ্জ্বল চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে শৌর্য-বীর্য, মহত্ত্ব-উদারতা, প্রেম ক্ষমার চমৎকারী লীলা আমাদের দৃষ্টিকে বিহ্বল ও আবিষ্ট করিয়া রাখে। ভীষ্মের অনমনীয় সঙ্কল্প, আকাশস্পর্শী উদারতা এবং সমুদ্রোপম বিশালতা নাট্যকার সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সহিত বিকশিত করিয়াছেন। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত আমাদের আগ্রহ এবং আবেশ যেভাবে জমিয়া থাকে, পঞ্চম অঙ্কে যেন তাহা কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া যায়। যে যুবক-দেবব্রত পিতাকে সুখী করিবার জন্য এত চেষ্টা-যত্ন করিলেন, তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতামহের বেশে দেখিলে আমাদের রসসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। অম্বা এবং সত্যবতী—এই দুইটি প্রধান স্ত্রী-চরিত্রই করুণ এবং দুঃখময়। অম্বার উচ্ছ্বসিত অবারিত প্রেম, বারবার ভীষ্মের অটল সঙ্কল্পে আঘাত খাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। পাদস্পৃষ্টা ফণিনীর ন্যায় প্রতিহিংসার ক্রুদ্ধ বিষ সে ভীষ্মের উপর ঢালিয়াছে। কিন্তু সত্যবতী তাহার প্রতি অবিচারের জন্য কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে নাই। নিষ্ফল আক্রোশে কেবল নিজের গাত্র দংশন করিয়া ক্ষতবিক্ষত কবিয়াছে। হস্তিনার যে অনন্তযৌবনা সম্রাজ্ঞী ক্ষমতা ও প্রভাবের অহঙ্কৃত আসনে অধিষ্ঠিত ছিল সে-ই পরে সকলের উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অনুকম্পার পাত্রী হইয়া পড়িল। তাহার এই শোচনীয় পরিণাম বিশেষ ট্র্যাজিক হইয়াছে। ট্র্যাজেডিব এই ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যে হাস্যময়ী বিদ্যুৎ-লতা অম্বিকা এবং অম্বালিকা চকিত দীপ্তিতে আমাদের অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

(ঘ) ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে পূর্বে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' ব্যতীত অন্যান্য নাটকগুলিব কাহিনী মোগল আমলের ইতিহাস হইতে লওয়া হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ সাবধান ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন, কেবল নাটকের প্রয়োজনে ইতিহাসের

প্রচলিত কাহিনীর ব্যতিক্রম অথবা বিকৃতি করেন নাই।[১] কিন্তু নাটক ইতিহাসের নীরস ঘটনার শুষ্ক অস্থিপঞ্জর নহে, ইহা রূপে-রসে সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবান, প্রাণবান দেহ। নাট্যরসকে জমাইয়া তুলিতে হইলে ঘটিত কাহিনী এবং চরিত্রের কোনো স্থানে বর্জন করিয়া, আবার কোনো স্থানে অতিরিক্ত ভাব ও বিষয়ের সমাবেশ করিতে হয়।[২] সেইজন্য জায়গায় জায়গায় ইতিহাসের ব্যতিক্রম এবং অতিক্রম নাটকের দিক দিয়া দোষাবহ নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক আলোচনার পূর্বে এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

॥ তারাবাই (১৯০৩) ॥ 'তারাবাই' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। যে-যুগে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিতেছিলেন ইহা সেই যুগের নাটক। ঐতিহাসিক নাটক লেখার দক্ষ ক্ষমতা তখনো তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই, সেইজন্য ইহার মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি পরিস্ফুট। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অধিকার ছিল না, লম্বা ক্রিয়াপদের প্রয়োগে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। নাট্যকার 'রাজস্থান'-এ বর্ণিত বিবরণের অবিকল অনুসরণ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজস্থানের বিবরণের মধ্যে নানা ঘটনার বিক্ষিপ্ততা রহিয়াছে। ঐ বিক্ষিপ্ততা নাটকীয় রসের অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতা নষ্ট করিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র হইতেছে সূর্যমল এবং তাহার স্ত্রী তমসা। সম্ভবত ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের প্রভাব এই চরিত্র দুইটির উপর পড়িয়াছে। ম্যাকবেথের ন্যায় সূর্যমল রাজ্যলাভের উচ্চাশা পোষণ করিয়াছে এবং ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী সেই উচ্চাশাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। লেডি ম্যাকবেথের মত তমসাও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত উত্তেজিত করিয়া দৃঢ় এবং কঠোর করিতে পারিয়াছে সূর্যমলের মধ্যে যে নিরুপায় এবং ইতস্ততঃ ভাব, রাজ্যলিপ্সা এবং বাৎসল্যের যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে,

১। 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানে তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।'

দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী. পৃঃ ৭৫৪

২। 'His task is, not to paint a copy of some contemporary or historical personage, but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action, also invented by the dramatist, will determine the totality of the character which he creates'.

Encyclopaedia Britannica (Cambridge Edition.)

তাহার ফলে চরিত্রটি আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। পৃথ্বীরাজ এবং তাহার কাহিনী নাটকের মধ্যে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। এই নাটক রচনার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন এবং হাসির গানের প্রভাব শেষ হইয়া যায় নাই বলিয়া জায়গায় জায়গায় কৌতুকরসের উচ্ছ্বাস ইহাতে রহিয়াছে। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকের সংহত গাম্ভীর্য এবং অচপল ভাবাবেগ এখনো আসে নাই।

॥ প্রতাপসিংহ (১৯০৫) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আরম্ভ হয় 'প্রতাপসিংহ' নাটকের সময় হইতে। 'প্রতাপসিংহ' হইতেই মহাব্রতনিষ্ঠ স্বদেশী ভাবরঞ্জিত নাটকীয় যুগের সূচনা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম সৈনিক প্রতাপের অতুল বীরত্ব, অনুপম দেশপ্রেম এবং অলৌকিক ত্যাগের চিত্র নাট্যকার সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সহিত ফুটাইয়া তুলিলেন। আধুনিক ধারণায় প্রতাপের সূক্ষ্ম কুলমর্যাদাবোধ সমর্থনীয় না হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশরক্ষার জন্য এরকম আপ্রাণ, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা কে কোথায় দেখিয়াছে? সঙ্কল্পসাধনের জন্য এরূপ দুঃসহ ক্লেশ বরণ করিতে, অসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করিতে আর কে কবে পারিয়াছে? তাঁহার মত দুঃখময় জীবনই বা আর কাহার দেখা গিয়াছে? রাজা হইয়াও তিনি দীনের হইতে দীন, বংশগৌরব রক্ষার চেষ্টায় তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, নিজের ভাই শক্তকে পাইয়াও ছাড়িয়াছেন, অন্যায়ের শাস্তি দিতে যাইয়া নিজের পতিপ্রাণা স্ত্রীকে পর্যন্ত হারাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের বেদনাময় গৌরব আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রতাপের পরই তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। শক্তের উল্লেখ রাজস্থানে থাকিলেও ইহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য গ্রন্থকারের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি। সে বীর, উদ্ধত, বিদ্বান এবং ব্যঙ্গপ্রিয়। জীবনের প্রতি তাহার আসক্তি নাই; সমাজ ও ধর্মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই; প্রেম এবং হৃদয়বৃত্তির সুকোমল লীলার প্রতি তাহার কোনো আকর্ষণ নাই। কিন্তু, তাহার চিত্তও অবশেষে দৌলতউন্নিসার প্রেমে বশীভূত হইল। প্রেমের এই মহিমময়ী বিশ্ববিজয়িনী শক্তি লেখক দেখাইয়াছেন। দৌলতউন্নিসা এবং মেহেরউন্নিসার চরিত্র বিশেষ সরসভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উভয়েই শক্তসিংহকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু একজন বৃক্ষের ন্যায় স্থির এবং নির্বাক, আর একজন তটিনীর ন্যায় চঞ্চল এবং মুখর। তবে মেহেরউন্নিসার পিতার সহিত বিরোধ এবং প্রতাপের আশ্রয় গ্রহণের কোনো জোরালো কারণ নাই, শক্তসিংহের প্রতি তাহার প্রেমও অর্থহীন, তাহার নিজের কথায় ছাড়া ইহা আমরা জানিতে পারি

নাই, এবং এই প্রেমের প্রভাবও কোনো স্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। আকবরের চরিত্রে লেখক ভালোমন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। আকবর উদার ও গুণগ্রাহী, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং নারীদ্বেষী।

॥ দুর্গাদাস (১৯০৬) ॥ 'দুর্গাদাস' নাটকে ঘটনার অতিরিক্ত আধিক্যে নাটকের ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট হইয়াছে। বহুতর চরিত্রের বৈচিত্র্যে এবং নানা ঘটনার বিভিন্নমুখিতায় কোনো বিশেষ কাহিনীর প্রভাব মনে রহিয়া যায় না। জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতী আখ্যান অপ্রয়োজনীয়, শম্ভুজীর ঘটনাও পরিহার্য। সস্তা বীররসের অবতারণায় নাটকের গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য অনেক সময়ে নষ্ট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উদারতা এবং অপক্ষপাত-গুণ কাশিম এবং দিলীর খাঁর চরিত্রাঙ্কনে প্রমাণিত হইয়াছে, দিলীর খাঁর মুখ দিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুর্গাদাসকে তিনি দোষ-দুর্বলতার অতীত আদর্শ চরিত্র করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রটি একটু অস্বাভাবিক এবং অমানবীয় হইয়া পড়িয়াছে। লেখক তাহাকে ট্র্যাজিক চরিত্র বলিতে চাহিয়াছেন।[১] কিন্তু ট্র্যাজেডির আবেগ ও বেদনাময় নিষ্ফল ভাবটি নাটকের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। ঔরংজীবের শেষ বয়সের চিত্র নাটকের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার ক্রূর, কুটিল, দ্বন্দ্বময় চরিত্রের পূর্ণতর রূপ আমরা 'সাজাহান' নাটকে দেখিতে পাইব। এই নাটকেও তিনি কপট, ধর্মদ্বেষী, গোঁড়া ইসলাম-রক্ষক বটে, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের ব্যর্থতা এবং বিষাদময়তা তাঁহার চরিত্রকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে।[২] এখানে তিনি বল, বীর্য এবং প্রভুত্বের গর্বিত আসনে অধিষ্ঠিত নহেন, তিনি রাঠোর এবং রাজপুতের কাছে পরাজিত, দুর্গাদাস এবং দিলীর খাঁর দ্বারা উপেক্ষিত এবং গুলনেয়াবের কাছে ঘৃণাস্পদ। অমিত শক্তিমান ঔরংজীব যেন ইহাদের কাছে নিতান্ত দুর্বল ও ছোট হইয়া পড়িয়াছেন।

১। 'ইহার ট্র্যাজিডি হ'ল বীর জীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায় আজন্ম সাধনায়, অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার ট্র্যাজিডিটা ঐ এক কথায়—"ব্যর্থ হয়েছে—পারলাম না, এ জাতিকে টেনে তুলতে।"' — ভূমিকা, 'দুর্গাদাস'

২। তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।—

'The last years of his life were inexpressibly sad... His domestic life too, was loveless and dreary, and wanting in the benign peace and hopefulness which throw a halo round old age. A sense of unutterable loneliness haunted the heart of Aurangzib in his last years.'

Aurangzib's Reign—Sir Jadunath Sarkar, p. 22

ইহাদের দমন করিবার, শাস্তি দিবার ক্ষমতা যেন তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ভূমিকা গুলনেয়ারের। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রা এবং গনেরিলের ন্যায় সে প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী, ইন্দ্রিয়লালসাময়ী নারীচরিত্র। তাহার দুর্দম প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন চোরাপথে বিচরণ করে না, ইহা ঘূর্ণি হাওয়ার ন্যায় সকলের রোষ ও শাসন উড়াইয়া দিয়া বহিয়া যায়; সে গুরুতর অন্যায় করিয়াও কোন দিন মাথা হেঁট করে নাই, সম্রাজ্ঞীর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় নিজেকে সর্বনাশের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছে।

॥ নুরজাহান (১৯০৮) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি কোন্‌খানি এ বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে, কিন্তু অনেকেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি ও জটিলতা যেমন 'সাজাহান'-এ সর্বাপেক্ষা বেশি, ট্র্যাজেডির তীব্রতা ও গভীরতা তেমনি 'নুরজাহান'-এ সকলের তুলনায় অধিক। 'সাজাহান'-এর ট্র্যাজেডি সঞ্চারিত হইয়াছে সাজাহান, ঔরংজীব, দারা, সুজা, মহম্মদ, সোলেমান প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে; কিন্তু 'নুরজাহান'-এর ট্র্যাজেডি একমাত্র নুরজাহানের চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে। সেজন্য আলোচ্য নাটকখানি শুধুমাত্র নায়িকা-নামাঙ্কিত নহে, সেই নায়িকা পরিপূর্ণভাবে ট্র্যাজিক গৌরবে অধিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক ঐতিহাসিক নাটক নায়িকা-নামাঙ্কিত বটে, যথা—'কৃষ্ণকুমারী', 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' ইত্যাদি, কিন্তু—সেইসব নাটকের ট্র্যাজিক গুরুত্ব নির্ভর করিয়াছে অন্যান্য চরিত্রগুলির উপরে। নায়িকাদের সুকোমল জীবন নীরব দুঃখভোগের মধ্য দিয়া করুণ হইয়াছে, কিন্তু ট্র্যাজিক হইতে পারে নাই। নুরজাহান কিন্তু ইহাদের ব্যতিক্রম, বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে ইহার ন্যায় সংঘাততাড়িত ট্র্যাজিক নারী-চরিত্র আর একটিও নাই। সমালোচক-প্রবর নিকল বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র যদি নারী হয়, তবে সেই নারীকেও পুরুষায়িত হইতে হইবে।[১] স্নেহ, মমতা, করুণা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি নারীর কোমল গুণ বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডির জন্য চাই নির্মম কাঠিন্য, নিষ্করুণ আঘাত ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। সাধারণ নারীর মধ্যে এগুলি সুলভ নহে। কেবল অসাধারণ নারীচরিত্রের মধ্যেই এই গুণগুলি আশ্রয় লাভ করিতে পারে এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-লেখকগণ—ইউরিপিডিস, শেকস্‌পীয়র,

১। 'The central figure, then of all great tragedies will be a man or else a woman who like Lady Macbeth or Iphigenia or Medea, has in her temper some adamant qualities and severity of purpose not ordinarily associated with the typically feminine'. —*The Theory of Drama* p 157

কিংবা ইবসেনের নাটকেই এই নারী-চরিত্রগুলির স্থান হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্র-লালের নুরজাহানও এরূপ একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র—ভারতের সর্বময়ী অধিশ্বরী ছিল বলিয়া নহে, দারুণতম অন্তঃসংঘাতের মধ্য দিয়া তাহার জীবন একান্ত দুঃখময় ট্র্যাজিক-মর্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে অনন্যসাধারণ। সে মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী, লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ ও হেড্ডা গ্যাবলারের ন্যায় দুর্দম প্রবৃত্তির বশীভূত। কিন্তু এ্যাগামেমনন-পত্নী ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার সহিত তাহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। বীর ও উদার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীহন্তাকেই সে ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ন্যায় স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ন্যায় সেও কন্যার নিকট হইতে শক্রর আঘাত পাইয়াছে এবং অন্তত ইউরিপিডিসের ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার ('Electra' নাটকে) সেও তাহার অন্যায় অপরাধসত্ত্বেও আমাদের বেদনা-করুণ সহানুভূতির পাত্রী হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালও ইউরিপিডিস ও ইবসেনের ন্যায় তাঁহার নায়িকা-চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তি, নিষিদ্ধ লীলা দেখাইয়া তাহাকে ঘৃণ্য করিয়া তোলেন নাই, এক উদার ক্ষমাকরুণ সহানুভূতির যোগ্য করিয়াই তুলিয়াছেন। নুরজাহান শুধুমাত্র ক্ষমতালোভী লালসাময়ী শয়তানী নহে; সে দুর্দমনীয় আবেগ ও দুষ্প্রতিরোধ্য বিবেকের নিষ্ঠুর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক অসহায়া নারী। ইউরিপিডিসের মিডিয়ার ন্যায় সম্ভবত তাহার বক্তাক্ত হৃদয়ও আর্তনাদ করিয়াছে—

'Oh,
Of all things upon earth that bleed and grow
A herb most bruised is woman'.

সমগ্র 'নুরজাহান' নাটকের মধ্যে আমরা যেন একটি ক্রুদ্ধ ঝটিকার উন্মত্ত অভিযান লক্ষ্য করি। সেই ঝটিকার রক্তচক্ষু ও পক্ষবিস্তারের আভাস প্রথম দৃশ্যেই দেখি এবং শেষ দৃশ্যে তাহার দলিত, বিধ্বস্ত, সর্বহারা রূপ চতুর্দিকে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই প্রকাশিত হইল নুরজাহান ও শেরখাঁর সুখের দাম্পত্য-চিত্র। নুরজাহান তাহার জীবনের পঙ্কিল আবর্তকে তলদেশে নিরোধ করিয়া তাহার সংসারের সম্মুখে মমতা ও কর্তব্যের এক পূর্ণ বিকশিত পদ্ম মেলিয়া ধরিয়াছিল। সেই পদ্মের সুরভিত সৌন্দর্যে সরল, পত্নীপ্রাণ শেরখাঁর জীবন আত্মহারা হইয়া ছিল। কিন্তু আচম্‌কা ঝড়ের তাড়নায় সেই নিশ্চিন্ত হাস্যময় পদ্মটি দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেলিম ভারতের সম্রাট, শেরখাঁর পাঁচ হাজারীর পদ—কিন্তু নুরজাহানের অন্ধকার

চিত্ততলে অবরুদ্ধ শয়তানীটির দাপাদাপি শুরু হইয়া গেল। এক উৎসব-চঞ্চল রাতের কামনা-বিলোল কটাক্ষের মধ্য দিয়া এই শয়তানীটি তাহার অন্তরের সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়াছিল; বহুদিন ধরিয়া সেখানে সে নিঃসাড় হইয়া ছিল বটে, কিন্তু আবার তাহার ক্ষুধার্ত হুঙ্কার শোনা গেল। আগ্রায় আসিবার পরে পুনরায় সেলিমের সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। শয়তানীটির মত্ততা আরও বাড়িয়া গেল। তাহার নখ ও দাঁতের তীক্ষ্ণ আঘাত-বেদনা বুঝি নুরজাহানের বাহ্য আকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠিল, সরল ও ক্ষমাশীল শেরখাঁর দৃষ্টিও তাহা ধরিয়া ফেলিল। একদিকে স্বামীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধামিশ্রিত আনুগত্য, অন্য দিকে একটি দুর্দম ভোগলোলুপ জিগীষা—এই দুইয়ের প্রাণঘাতী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে স্বামীকে লইয়া বর্ধমানে পলাইয়া আসিল। তাহার বিবেক বাঁচিল, তাহার সংসারও বাঁচিল। কিন্তু বর্ধমানে আসিয়াই সে বুঝিল, এ তাহার আত্মরক্ষা নহে, এ তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা; কারণ অবদমিত হৃদয়াবেগ ততক্ষণে হতাশ আক্ষেপে তাহার অন্তর আকুল করিয়া তুলিয়াছে। শেরখাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তার সময়ে সে স্বামীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। এ তাহার অপরাধ নহে, এ তাহার নিরুপায় পরাজয়। ইহার পর শেরখাঁ হত হইল, নুরজাহান আগ্রার প্রাসাদে আনীত হইল, কিন্তু সমস্যা তবুও মিটিল না। বাহিরের দিক দিয়া নুরজাহানের পথ উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া সেই পথ আরও বিঘ্নিত হইয়া উঠিল। নুরজাহান অঙ্কুশ-আঘাতে দিবারাত্র তাহার মনকে তাড়না করিয়া স্বামীর মৃত্যুর জন্য নিজেকেই পরোক্ষভাবে দায়ী করিতে লাগিল এবং জীবনে যে-স্বামীকে অন্তর দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহারই স্মৃতির প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া স্বামিহন্তার বিরুদ্ধে এক ক্ষমাহীন আক্রোশ জাগাইয়া রাখিল। অথচ যখন আগ্রার অবরোধ হ'তে মুক্তির সুযোগ ঘটিল তখনই এক অনির্দেশ্য বেদনায় তাহার মন হতাশ হইয়া পড়িল। আশ্চয মানুষ, আর তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য মানুষের মন! ইহার পর পুনরায় তাহার সম্মুখে প্রলোভনের পসরা তুলিয়া ধরা হইল—আত্মত্যাগী রেবা ও স্বার্থবাদী আসফ এই পসরা লইয়া আসিল। নুরজাহানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র দাহ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ভিতরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্বত্রই এই দাবদাহ। সে কোথায় পলাইবে? অবশেষে সে সেলিমকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল, নিজের লালসা-তৃপ্তির জন্য নহে, স্বামিহন্তার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য। যে ভূমিকম্পে

সে নিজে কাঁপিতেছিল তাহা এখন সমগ্র রাজ্যখানিকে কাঁপাইতে সুরু করিল। যে শয়তানীটি এতকাল তাহার অন্তরের মধ্যে ছিল, এখন তাহারই হাতে সে ক্ষমতার রজ্জু তুলিয়া দিল। মনে রাখিতে হইবে, ইহাতে প্ররোচনা ছিল তাহার ভাই আসফের ও প্রাথমিক সহযোগিতা ছিল তাহার কন্যা লয়লার। কিন্তু যখন সেই শয়তানীটি সর্বনাশের অতল-পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, তখন আসফ ও লয়লা ফিরিয়া গেল, কিন্তু ফিরিবার উপায় ছিল না নুরজাহানের। এই অনিবার্য শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া সে চারিদিকে নির্বিকার কাঠিন্যের সহিত ধ্বংস ও মহামারীর বীজ ছড়াইতে লাগিল। এই সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলার শোষণে তাহার নারীত্ব ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল এবং যে শ্রদ্ধাশীল পতিনিষ্ঠার প্রেরণাতে ইহার উৎপত্তি তাহাও নিঃশেষে শুকাইয়া গেল। যে আগুন সে পরের ঘর পুড়াইবার জন্য জ্বালিয়াছিল তাহা তৃষার্ত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া তাহার নিজের ঘরখানিকে নিঃশেষ করিয়া অবশেষে তাহাকেও লেহন করিয়া লইল। দুই একবার হাত-পা আছড়াইয়া নিজেকে সে রক্ষা করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। শেষ দৃশ্যে এই অগ্নিদগ্ধ নুরজাহানের অপ্রকৃতিস্থ আর্তনাদ এক আতঙ্কিত বেদনায় আমাদের অন্তঃকরণ স্তব্ধ করিয়া দেয়।

এ্যারিস্টোটল বলিয়াছেন, ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি ভালো (good) হইবে।[১] নুরজাহানের চরিত্রও আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, সে অবিমিশ্র পিশাচী বা শয়তানী নহে; স্বাভাবিক নারীসুলভ গুণ ও ধর্মজ্ঞান তাহার মধ্যেও আছে। কিন্তু দুর্দম প্রবৃত্তির আকর্ষণে সেগুলি তাহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এজন্যই তাহার চরিত্র ট্র্যাজিক-মহিমা লাভ করিয়া আমাদের সহানুভূতির যোগ্য হইতে পারিয়াছে। 'নুরজাহান' নাটকে যেভাবে আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়াচঞ্চল রূপ দেখান হইয়াছে এবং যেভাবে চরিত্রের অভ্যন্তর হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে নাটকখানি শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির সহিত সমজাতীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি চরিত্রের মূল হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহাতে একটি অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য শক্তির অদৃশ্য লীলা থাকিবেই, তাহা না হইলে ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরে এরূপ সীমাহীন হাহাকার উদ্রেক করিত না। এমন কি, শেকস্‌পীয়রের নাটকেও আকস্মিক ঘটনাসংযোগ, আত্যন্তিক দুর্ভাগ্য প্রভৃতি

১। '...The most important is that they should be good'. —*Poetics*

স্থান লাভ করিয়াছে।[১] 'নুরজাহান' নাটকেও ট্র্যাজেডির জন্য দায়িত্ব নুরজাহানেরই সর্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু তবুও ইহাতে কি অনিবার্য শক্তির অলঙ্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ-লীলা বার বার অনুভূত হয় নাই? সে পরোক্ষভাবে শেরর্খা ও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অথচ ইহাদের কাহারও মৃত্যু তো তাহার ইপ্সিত ছিল না, কারণ ইহাদের একজনের নিকট হইতে সে পাইয়াছিল সংসার, আর একজনের নিকট হইতে সাম্রাজ্য। নাটকের ট্র্যাজেডির জন্য তাহারই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই; কিন্তু জাহাঙ্গীর, আসফ, লয়লা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু দায়িত্ব যে আছে তাহাও তো অস্বীকাব করা যায় না। ট্রাজেডির জগৎ এই সর্বগ্রাসী ভুল ও দুঃখের জগৎ। এখানে সকলেই তাহাদের ভাব ও আচরণের দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দেয়—এবং সকলেই এক অলঙ্ঘ্য দুঃখ-পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে অগ্রসর হয়। ট্র্যাজেডির এই অন্তহীন, নিষ্কৃতিহীন সর্বময়তা 'নুরজাহান' নাটকে ফুটিয়াছে। বাহ্যত নুরজাহানের পরাজয় ও পতন ঘটিল মহব্বৎ সাজাহান-কর্ণসিংহের কাছে। কিন্তু আসলে তাহার বড় পরাজয় ঘটিল অন্তরের মধ্যে—সে পরাজয় তাহার শয়তানী সত্তার কাছে নারীসত্তার। নুরজাহান যতই একটির পর একটি অন্যায় কাজ করিয়াছে, ততই তাহার অন্তরতম নারীসত্তা নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিতে করিতে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সেই শয়তানী-সত্তাটির বিলোপ ঘটিল, আর তখন বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহার অন্তরসত্তাটি। দেখিলাম, পরাজিত ক্ষত বিক্ষত অপ্রকৃতিস্থ একটি নারী। উপরের দেবতা তাহাকে শাসন করিবার জন্য ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুতের কশাঘাত শুরু করিয়াছেন, নীচের মানুষ তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার শক্তি ও দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে সহায় সম্বলহীনা এক ভিখারিণী করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি?

শেরর্খা ও জাহাঙ্গীর—এই দুইটি চরিত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি গূঢ় সাদৃশ্য আছে। নারীর প্রেমতৃষ্ণা উভয়ের জীবনের করুণ পরিণতি ঘটাইয়াছে। শেরর্খা স্বেচ্ছায় ঘাতকের কাছে মৃত্যু বরণ করিলেন, আর জাহাঙ্গীর তিল তিল করিয়া নিজের জীবনকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। শেরর্খা

১। Shakespeare, however never relies entirely on the 'tragic flaw' to bring his heroes to ruin. The irony of coincidence, sheer bad luck, always has a hand in the action.'

—*Discovering Drama* by Elizabeth Drew, p. 179

অমিত শক্তিশালী বীর, কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ের সবখানি জুড়িয়া এক সীমাহীন ভালোবাসা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু, সেই ভালোবাসা নুরজাহানের শুষ্ক-কুণ্ঠিত হৃদয়ে আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শেরখাঁর অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তর একটু নালিশ করিল না, একটি কথা বলিল না, মৃত্যুর মধ্য দিয়া এক ব্যথামৌন দীর্ঘশ্বাস চিরকালের জন্য নুরজাহানের চিত্ততলে সঞ্চিত করিয়া রাখিল।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় মনে হইলেও, আসলে তাঁহার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলা দেখা গিয়াছে। তাঁহার একটি অভিমান ছিল যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু এই ন্যায়পরায়ণতা বার বার তাঁহার দুর্দমনীয় রূপতৃষ্ণার কাছে পরাজিত হইয়াছে। তিনি জানেন, অন্যের বিবাহিতা পত্নীর প্রতি লোভ করা অন্যায়; তিনি জানেন, শেরখাঁকে বিনা কারণে হত্যা করা অপরাধ। কিন্তু, তবুও তিনি কঠোরভাবে নিজেকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। নুরজাহানের ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর তাঁহার একটির পর একটি নৃশংস কাজে জাহাঙ্গীরের ন্যায়বোধ তীব্রভাবে আহত হইয়াছে, অথচ প্রতিরোধ করিবার আগ্রহ ও শক্তি তাঁহার নাই। সেজন্য নিজের জাগ্রত বিবেকবুদ্ধিকে জোর করিয়া নিস্তেজ করিবার জন্য তিনি আরও বেশী মদ খাইয়াছেন, আরও অধিক সম্ভোগ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—'সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক! আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, আলিঙ্গন দাও, প্রিয়ে। চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক।' এই সব কথার মধ্যে পরিতৃপ্ত সৌন্দর্যকামনা নাই, ইহাদের মধ্যে এক মরণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অন্তিম বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে।[১]

নুরজাহানের কন্যা লয়লা নাটকের মধ্যে নুরজাহানের এই প্রতিদ্বান্দ্বনী শক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছে। লয়লার সহিত গ্রীক নাটকের ইলেকট্রা চরিত্রের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। ইলেকট্রার ন্যায় লয়লাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সঙ্কল্পবদ্ধ এবং মাতৃ-অপরাধের প্রতিকারে প্রবৃত্ত।[২] লয়লার চিত্তও নুরজাহানের ন্যায় কুলিশ কঠোর, সর্বনাশী শক্তির সহিত সেও প্রথমে হাত

১। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের আলোচনা প্রণিধানযোগ্য—'এই অনিচ্ছা অলসের বা দুর্বলের অনিচ্ছা নহে, এই অনিচ্ছার উৎস আত্মগত অবসাদ—আত্মপীড়ন কামনা। এই সময় হইতেই জাহাঙ্গীরের মধ্যে এক বৈরাগ্যের করুণ সুর বাজিতে থাকে—মনে হয়, তিনি যেন নিজের প্রতি নিজে প্রতিশোধ লইতেছেন।'

২। ইউজিন ও'নিলের প্রসিদ্ধ নাটক 'Mourning becomes Electra'-র এজরা ম্যান্নের স্ত্রী খ্রীষ্টিনের সঙ্গে কন্যা ল্যাভিনিয়ার প্রাতিদ্বন্দ্বিতা এ-প্রসঙ্গে তুলনীয়।

মিলাইয়াছিল। কিন্তু খসরুর মৃত্যুর পর আহত, অনুতপ্ত চিত্তে সে এই শক্তির নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে সে আর প্রতিহিংসাময়ী কন্যা নহে, স্নেহ-মমতা-করুণায় গড়া নারী। তাহার এই নারী-সত্তার সহিত নুরজাহানের শয়তানী সত্তার তীব্র লড়াই চলিয়াছে। কিন্তু যখন নুরজাহানের শয়তানী সত্তা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন আর নুরজাহানের সহিত তাহার কোনো বিরোধ রহিল না। তখন কন্যার অপার স্নেহ ও মমতা লইয়া সে অভাগী মায়ের দুঃখ ও ক্ষত অশ্রুজলে মুছাইয়া দিতে চাহিল। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা উল্কাপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িল, কিন্তু করুণা ও মমতার স্নিগ্ধ জ্যোতি অকম্পিত শিখায় জ্বলিতে লাগিল।

॥ মেবার পতন (১৯০৮) ॥ 'নুরজাহান'-এর পর 'মেবার পতন' লিখিত হয়। 'মেবার পতন' উদ্দেশ্যমূলক নাটক। এক উদার সাম্যমূলক মহানীতি প্রচার করিবার জন্যই তিনি নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই ভূমিকায় বলিয়াছেন—'এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি, সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী—এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে 'বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী'। নাটকীয় ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনে লেখকের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠায় নাটকের ক্রন্দনময় সুর এক সান্ত্বনাময় শক্তিতে নির্বাণ লাভ করিয়াছে। নাট্যকার হঠাৎ অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁর কাল্পনিক মিলনের দৃশ্য সংস্থাপিত করিয়া স্বদেশ-রক্ষার সংগ্রাম ব্যর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং গোবিন্দসিংহ, সগরসিংহ, অজয়-সিংহ প্রভৃতির মহৎ আত্মোৎসর্গ অকারণ ও লঘু করিয়া দিয়াছেন। তিনি কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে স্বদেশপ্রীতিকেই মূল ভাবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্বপ্রীতিকে নহে। বিশ্বপ্রীতি নাট্য ঘটনা ও নাট্যরসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় একটি পার্শ্ব চরিত্রের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই চরিত্র অনুযায়ী নাটকের পরিণতি ঘটান অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। সেইজন্য নাটকের অন্তিম প্রভাব নৈরাশ্যবাদের স্থলে আশাবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্জ্ঞেয় নিয়তি সর্বনাশা বাহু বিস্তার করিয়া যেন সব চরিত্রগুলিকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। ইহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া যেন আর উপায় নাই—গোবিন্দসিংহ, অমরসিংহ ইহার বিরুদ্ধে যুঝিয়াছে, কিন্তু ইহাকে রোধ করিতে পারে নাই। গোবিন্দসিংহ মহিমময় রাজপুতকুলের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। মহারাণা প্রতাপসিংহের প্রিয়তম পার্শ্বচর তিনি। সেই বীরর্ষভ স্বর্গীয় রাণার স্বদেশপ্রাণতা এবং কুলগৌরব তিনি বহন করিতেছেন।

সেইজন্য তিনি কন্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, পুত্রকে হারাইয়াছেন, কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই অটল, অটুট ত্যাগ এবং সঙ্কল্পের তুলনা নাই। অমরসিংহের মধ্যে একটা অনুভূতিপ্রবণ, বিশ্লেষণশীল, সূক্ষ্মদর্শী ভাব দেখা যায়। তিনি যেন ভাগ্যের উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, যেন ভবিষ্যৎ পরিণতি স্পষ্ট দেখিয়াও তাহা এড়াইবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি তাঁহার নাই।[১]

॥ সাজাহান (১৯০৯) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে সমালোচকেরা প্রায় একমত। কালের বিচারে অদ্যাপি এই নাটকখানা জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। নাটকের মধ্যে বহুতর চরিত্র এবং বিভিন্ন উপকাহিনী থাকাসত্ত্বেও নাট্যকার সুনিপুণ শিল্পকৌশলে সব ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সহিত গাঁথিয়া দিয়াছেন। নাটকখানির অভিনয় দেখিবার কালে ঘটনাপুঞ্জ অতি দ্রুত তালে তালে পা ফেলিয়া দৃষ্টির বিভ্রম আনিয়া দেয়। জটিল ভাবতরঙ্গের নিমেষে নিমেষে উত্থান পতন অন্তর রুদ্ধ করিয়া দেয়। মনে হয়, পলক ফেলিবার যেন অবকাশ নাই। নিশ্বাস ছাড়িবার যেন অবসর নাই ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, সেই কাহিনী এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন নাটকীয় রসের মধ্যে জমাইয়া তোলা সহজ কৃতিত্বের কথা নহে, নাট্যকার সেই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। সাজাহানের নামে নামকরণ হইলেও, সাজাহান এই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র নহেন।[২] সাজাহান পুরুষসিংহ বটে, কিন্তু সেই সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ—তাহার ক্রুদ্ধ গর্জন নিরন্ধ্র কারাপ্রাচীরে নিষ্ফলভাবে মাথা ঠুকিয়াছে, বাহিরে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। রাজা লীয়ারের

১। টড অমরসিংহের চরিত্রসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—'He was worthy of Pertap and his race,…he had a reserve bordering upon gloominess, doubtless occasioned by his reverses for it was not natural to him, he was beloved by his chiefs for the qualities they most esteem, generosity and valour, and by his subjects for his justice and kindness, of which we can judge from his edicts, many of which yet live on the column or the rock'

History of Rajasthan—Annals of Mewar, p. 340.

২। 'সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।'

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯০

ন্যায় সন্তানের কৃতঘ্নতায় তিনি নিঃসঙ্গভাবে তাঁহার আক্রোশ ও অভিশাপ রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু জগৎ তাঁহার অতীত ঐশ্বর্য ও প্রাক্তন ক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রম জানায় নাই। তাঁহার চরিত্র আদ্যন্ত একই রূপ—স্নেহাতুর, অপ্রকৃতিস্থ, অসহায়—তিনি চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ঔরংজীব। ঔরংজীবের কুটিল, নিষ্ঠুর চক্রান্ত বোয়া কনস্ট্রীকটারের (Boa Constrictor) ন্যায় অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহারা যেন নিরুদ্ধ হাহাকারে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে। সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ—এতগুলি চরিত্রের করুণ ট্র্যাজেডি কেবল একটিমাত্র লোকের জন্য ঘটিয়াছে। অথচ নাট্যকার তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়হীন পিশাচ করিয়াও অঙ্কন করেন নাই। তিনি নিষ্ঠুর, উৎপীড়ক এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি একেবারে স্নেহহীন, যুক্তিহীনও নহেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ চিরিয়া কোনো সুকোমল বৃত্তি চকিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ঔরংজীবের সূক্ষ্ম শাণিত বুদ্ধি বার বার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। দারার কাহিনী নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখবহ, দুঃখ-দুর্ভোগের সঙ্গে তাঁহার অতি ক্লেশকর সংগ্রাম এবং সর্বশেষে তাঁহার নিদারুণ শোচনীয় পরিণতি হৃদয় শুষ্ক করিয়া দেয়। সোলেমান এবং মহম্মদকে পিতৃভক্ত, কর্তব্যপরায়ণ, উদারহৃদয় চরিত্ররূপে দেখানো হইয়াছে। দিলদার শেকসপীয়রের Fool-এর ন্যায় বাহ্যত মূর্খ এবং নির্বোধ দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হৃদয়বান চরিত্র। জাহানারার চরিত্রে স্নেহ ও ত্যাগ, বুদ্ধি ও হৃদয়, তীক্ষ্ণতা এবং কোমলতাব সমাবেশ করা হইয়াছে। কর্ডেলিয়ার মতই সে পিতার প্রতি স্নেহশীলা এবং মমতাময়ী, আবার বুদ্ধি ও কৌশলের খেলায় ঔরংজেবের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহার এই শক্তিময়ী প্রভাবময়ী চরিত্রের পাশে পিয়ারার উচ্ছল প্রাণময় হাল্কা চরিত্র চমৎকার বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়ারার চপল পরিহাসপ্রিয় ভাসমান বাক্যমেঘের তলায় যে দুঃখ ও ক্লেশের পুঞ্জ পুঞ্জ বারি সঞ্চিত হইয়া আছে তাহাতেই চরিত্রটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

॥ চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য আমরা 'সাজাহান'-এ লক্ষ্য করিয়াছি। সমুদয় শ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহের কাহিনী

শেষ করিয়া নাট্যকার বিশ্রান্ত দৃষ্টিতে হিন্দুরাজত্বের দিকে তাকাইলেন।[১] 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থকারকে হিন্দু পুরাণ ও কিংবদন্তী এবং গ্রীক ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। 'বিষ্ণুপুরাণ' এবং 'মহাবংশ', 'দিব্যাবদান', 'মহাপরিনিব্বাণসুত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে ও জাষ্টিন এবং প্লুটার্কের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। নাট্যকার নাটকের বীজ মোটামুটি এইসব গ্রন্থের বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্বক কোনো স্থলেই তিনি ঐতিহাসিক বিবরণের গুরুতর ব্যতিক্রম করেন নাই। পুরাণ এবং কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া লেখক চন্দ্রগুপ্তকে নীচ শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়াছেন অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, অন্ত্যজ ছিলেন না।[২] (জাষ্টিনের মতে কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত নীচ বংশজ ছিলেন।)[৩] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রথম দৃশ্যে আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসিত থাকিবার কালে আলেকজাণ্ডারের সহিত দেখা করিয়া নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা।[৪] সেলুকাস এবং এন্টিগোনাসের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিকদের বৃত্তান্তে রহিয়াছে।[৫] অবশ্য এন্টিগোনাস যে সেলুকাসের পুত্র ইহা নাট্যকারের স্বরচিত। এখানে স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া তিনি সুনিপুণ নাট্যকলার পরিচয় দিয়াছেন। হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের বিবাহে নাটকের সাঙ্গ হয়, এবং এখানেও নাট্যকার ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়াছেন।[৬] চাণক্যের

১। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী-লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—"মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন, 'রায় সাহেব, এতদিন পেঁয়াজ রশুন খাইয়ে গায় গন্ধ ক'রে দিয়েছেন, এইবার একটু ঘি আলোচাল খাইয়ে দিন না।' দ্বিজেন্দ্র উত্তর দেন, 'আচ্ছা, এইবার তাই হবে।' দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধর মজুমদার মহাশয় বলেন—'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল।" দ্বিজেন্দ্রলাল —নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১০৬

২। 'It is therefore practically certain that Chandragupta belonged to a Kshatriya community, viz. the Moriya (Mourya) clan'.

Political History of Ancient India—by H. C. Roy Choudhury p. 217.

৩। *The Invasion of India*—by Mc. Crindle, p. 327.

৪। V. A., Smith-এর *Early History of India*, p. 123 দ্রষ্টব্য।

৫। 'In the course of the internecine struggle between the generals of Alexander two had emerged as competitors for supreme power in Asia. Antigonos and Seleukos, who afterwards became known as Nikator, or the conqueror'. *Early History of India*—by V. A. Smith, p. 124

৬। '......And the high contracting powers ratified the peace by a matrimonial alliance' which phrase probably means that Seleukos gave a daughter to his Indian rival'. *Ibid*, p. 125

কূট চক্রান্তে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন—ইহাই নাটকের প্রধান ঘটনা এবং এই বিষয়েও ইতিহাস গ্রন্থকারের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।[১] লেখক চাণক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জটিল কূটনীতি এবং অসামান্য ক্ষমতার বর্ণনা সম্ভবত 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রভাবে করিয়াছেন। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকখানির ন্যায় তাঁহার নাটকেও চাণক্য মুখ্যতম চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র ছায়া ব্যতীত আর সব চরিত্রই ঐতিহাসিক; সুতরাং নাট্যকার ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহা বলা যায়। তবে চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া বিকশিত করাই নাট্যকারের দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব, ইতিহাস এখানে তাঁহাকে সাহায্য করে নাই।

'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষ জনপ্রিয় এবং অভিনয়োপযোগী নাটক, কিন্তু ইহার নাট্যকলা এবং ঘটনা-সংস্থাপন নির্দোষ ও ত্রুটিহীন নহে। ঘটনা ও চরিত্রের অসঙ্গতি এবং অস লগ্নতা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। নাটকের নামকরণ যথার্থ হয় নাই। চাণক্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমস্ত কাহিনীকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার পাশে চন্দ্রগুপ্তকে নিতান্ত ম্লান ও অপরিস্ফুট মনে হইয়াছে। শক্তির পরীক্ষায় যে সে অতি ছোট তাহাও গ্রন্থমধ্যে একবার প্রমাণিত হইযাছে। একমাত্র প্রথম দৃশ্য ব্যতীত আব সর্বত্র সে চন্দ্রের ন্যায় ধার-করা দীপ্তিতে শোভা পাইয়াছে। নাটকের মধ্যে দুইটি কাহিনী রহিয়াছে—চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য-মুরাঘটিত প্রধান কাহিনী, এবং সেলুকাস-এন্টিগোনাস-হেলেনঘটিত গ্রীক উপকাহিনী। নাট্যকলা অনুযায়ী উপকাহিনী সর্বথা মূল কাহিনীর অধীন হইবে,[২] এবং ইহা ঘটনা-সাদৃশ্যে অথবা বৈসাদৃশ্যে মূল কাহিনীর গতিকে দ্রুত ধাবমান করিয়া তুলিবে। কিন্তু 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দুইটি কাহিনী একেবারে স্বতন্ত্র, ইহাতে উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয় নাই। শেষে হেলেনের বিবাহদ্বারা দুইটি কাহিনীকে যুক্ত করা হইল বটে, কিন্তু দুইটি নদীধারা যেন সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একটি কৃত্রিম খালের দ্বারা মিলিত হইল। হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধটিকে

১। 'The adviser of the youthful and experienced Chandragupta in the revolution was a Brahmin named Vishnugupta, better known by his patronymic Chanakya or his surname Kautilya, by whose aid he succeeded in seizing the vacant throne'. *Ibid* p. 124

২। '......The relation of the underplot to the main plot may be described as dependence; the term fairly covers constructive support, just as in architecture buttreasses at once lean against and support the main mass'. ***Shakespeare as a Dramatic Artist***—by Moulton p. 366

ভালোভাবে পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করা হয় নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি, হেলেন চন্দ্রগুপ্তের কথা চিন্তা করিতেছে, তারপর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেও সেলুকাস, হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথনের সময় মনে হয়, হেলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু অবশেষে দেখা যায় যে হেলেন চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসে নাই। দুইটি রাজ্যের মিলন সাধন করিবার জন্যই সে চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার আত্মদান যেন হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি নহে, এ যেন একটি রাজনৈতিক চাল। চন্দ্রগুপ্ত এবং হেলেনের মধ্যে কোনো সময়ে হৃদয়ের আদান প্রদান এবং বোঝাপড়াও হয় নাই, হেলেনের সম্মুখে অকস্মাৎ একবার চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের বিস্ফোরণ অসংলগ্ন এবং পূর্বাপর-সম্বন্ধ-রহিত। ছায়ার প্রেম উপেক্ষিত হইল আর এক গভীরতর প্রেমের আকর্ষণে নয়, নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে। ছায়ার প্রেমের মর্যাদা অকারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাটকের সংযোগস্থলের ঐক্য (Unity of Place) নাই। গ্রীস, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষে ঘটনাস্রোত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে নন্দের নিদারুণ নিষ্ঠুর হত্যার যে ভয়াবহ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা রঙ্গমঞ্চে দেখানো অসঙ্গত, দর্শকের পক্ষে এই দৃশ্য অত্যন্ত গ্লানিকর এবং ক্লেশজনক। প্রাচ্য নাট্যকলা-অনুযায়ী এইরূপ হত্যা-দৃশ্য নিষিদ্ধ।[১] প্রতীচ্য নাটকে রঙ্গমঞ্চে হত্যা থাকিলেও হত্যার এইরূপ বিস্তারিত লোমহর্ষণ দৃশ্য কখনো প্রশংসনীয় এবং সমর্থনীয় হয় নাই।

চরিত্রাঙ্কনের কথা আলোচনা করিতে প্রথমেই মনে পড়ে চাণক্যকে। চাণক্য গ্রন্থকারের অদ্ভুত সৃষ্টি। এই রুক্ষকায় শীর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যেন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করিয়া ফুটিয়াছে, যেন সামান্য ফাঁক পাইলেই জ্বলন্ত অগ্নিস্রাব চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছু ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। চাণক্য ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ এবং ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি, অনধিগম্য কূটনীতি এবং বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু চাণক্যের ট্র্যাজেডি এইখানে যে, এইরূপ একটি অসম শক্তিশালী, অমিত প্রভাবশালী চরিত্র অবশেষে যেন হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িল—ইহা হৃদয়ের নিকট

১। 'What is seen should essentially serve to produce the sentiment aimed at, and it must avoid offending the feelings of the audience Hence is is improper to portray on the stage such events as a national calamity, the downfall of a king the siege of a town, a battle, killing or death, all of them painful'. *Sanskrit Drama*—by A B Keith p 300

বুদ্ধির পরাজয়, স্নেহের নিকট শক্তির পরাজয়। যে মূর্তিমান প্রতিহিংসা বীভৎস সর্বনাশী শক্তিকে ক্ষণে ক্ষণে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহা যেন স্নেহ কোমলতার শান্তিবারিতে অবগাহনের পর নব জীবন লাভ করিয়া বসিল। চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা উপনায়ক এন্টিগোনাসের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি এবং ঔৎসুক্য অনেক বেশি আকর্ষণ করে। এন্টিগোনাস বীর, দর্পী, উদার এবং মহৎ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাহার চরিত্র নিতান্ত ট্র্যাজিক এবং বিষাদময়। হেলেনের অচঞ্চল পাষাণ হৃদয়ে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রেমতরঙ্গ আঁছাড় থাইয়া নিষ্ফল আর্তনাদ করিয়াছে, এবং পিতৃপরিচয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাহাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দিশাহারা ভাবে ছুটাইয়াছে। গ্রীক বীর ইডিপাস পিতাকে না জানিয়া হত্যা করিয়াছিল, এবং সেও না চিনিয়া পিতার শত্রুতা করিয়াছে—এমন কি, তাঁহাকে বন্দী পর্যন্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে যে irony আছে তাহা সফোক্লিসের irony-র সমতুল্য। সেলুকাসের মধ্যে সন্তানবৎসল পিতৃত্ব এবং মুরার মধ্যে স্নেহাতুর মাতৃত্বের গৌরব ও মাধুর্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

॥ সিংহলবিজয় (১৯১৫) ॥ 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার দীপ্তি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার কোনোখানাই খুব উচ্চশ্রেণীর নহে। বাঙালী বীর[১] বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া 'সিংহলবিজয়' লিখিত হইয়াছে। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা হৃদয়গত ভাবদ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য এবং সঙ্গতির নিতান্ত অভাব। আবেগের আতিশয্য মাত্রা ছাড়াইয়া অনেক সময়েই তরল হইয়া পড়িয়াছে। হত্যা ও নিষ্ঠুরতার আধিক্যও বিশেষ পীড়াদায়ক। বিজয়সিংহ পিতা ও বিমাতার বিরাগে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া শ্যামদেশ জয় করিয়া বসিল এবং পুনরায় বঙ্গদেশে চলিয়া আসিল, অবশেষে আবার নির্বাসিত হইল। ইহাতে ভাব ও অবস্থার পুনরুক্তি হইয়াছে। কুবেণীর সহিত সমুদ্রবক্ষে বিজয়সিংহের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। বস্তুত নাটকখানিতে একমাত্র কুবেণীর চরিত্র ব্যতীত আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে।

'সুরুচিসঙ্গত অপেরা' রচনার উদ্দেশ্য লইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোরাব-রুস্তম' (১৯০৮) নামক নাট্যরঙ্গখানি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল কয়েকখানা

১। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলেন যে, বিজয়সিংহ গুজরাটের লোক ছিলেন, বাঙালী ছিলেন না।

নাচ-গান থাকিলেই অপেরা হয় না। অপেরার বিষয়বস্তু খুব তরল ও লঘু হওয়া দরকার। কিন্তু 'সোরাব-রুস্তম'-এর কাহিনী অতিশয় করুণ ও ট্র্যাজিক। এই কাহিনী লইয়া অপেরা লেখা চলে না। লেখক নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য খাঁটি অপেরা ইহাকে বলিতে চান নাই।[১] যে-পিতার সন্ধানে সোরাব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইয়াছে, সেই পিতার দ্বারাই সে নিহত হইল—এই বিষয়ের মধ্যে নিয়তির যে নিষ্ঠুর চক্রান্ত পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাদ্বারা এক চমৎকার বিষাদ-ঘন ট্র্যাজেডি রচনা করা যাইত।

৬) সামাজিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দুইখানা সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন। সামাজিক নাটক রচনার সময় তাঁহার প্রতিভা অস্তোন্মুখ ম্লানিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাতে তাহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে চরিত্র ও ভাবের বৈচিত্র্য খুব কমই আছে। গতানুগতিকতার স্রোতহীন স্বল্প বারিরাশির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আবর্তের সৃষ্টি করিয়াই বাঙালী পুরুষ ও নারীর জীবন শান্তিলাভ করে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে এই বাঙালী জীবন লইয়া যথাসম্ভব ঘাঁটাঘাঁটি হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নিরুদ্ধস্রোত নদীর মধ্যে একটু এদিক ওদিক গতায়াত করিয়াছেন, নদীর মুখ কাটিয়া জলধারাকে চঞ্চল তরঙ্গময় ও গতিশীল করিতে পারেন নাই।

॥ পরপারে (১৯১২) ॥ তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'পরপারে'। ইহার কাহিনী পরিণতিহীন, এবং চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যেমন ধর্মমূলক এবং আধ্যাত্মিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, এই নাটকেও সে রকম পরিণতি দেখা গিয়াছে। মনে হয়, নাটকের শেষ কথা এই ক্রিয়াচঞ্চল বাস্তব জীবনে বলা হইল না। ইহা যেন জীবনের পরপারেই ধ্বনিয়া উঠিবে। সেইজন্য যে কাহিনী মিলনান্ত পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অকারণ হঠাৎ কতকগুলি মৃত্যু ঘটাইয়া তাহার গতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দেওয়া হইল। মহিম এবং সরযূ দুইজনই খালাস পাইল, অথচ কাহারও মিলন হইল না। বিশ্বেশ্বর এবং সরযূ পটপট করিয়া মরিয়া গেল, এবং মহিমও ভক্ত সাধক হইয়া পড়িল। নাট্যকার কথায় কাঁদাইতে না পারিয়া, গায়ের জোরে চড় মারিয়া

১। 'সোরাব-রুস্তম দস্তুরমত অপেরা নয়, এক কথায় অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।' ভূমিকা—'সোরাব-রুস্তম'

কাঁদাইলেন। সন্দেহবাদী এবং যুক্তিসর্বস্ব দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এই নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।[১] 'কিন্তু ইহাও সত্য যে, ভক্তিবিশ্বাসের ফলে তাঁহার নাটক কোনো প্রশংসনীয় কৃতিত্ব লাভ করে নাই। নাটকখানির আর একটা ত্রুটি এই যে, ইহাতে পিস্তল ছোঁড়াছুড়ি এবং ছোরা চালাচালি এত বেশি আছে যে, ডিটেকটিভ উপন্যাসের ন্যায় ইহা melo-dramatic হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের নায়ক হয়তো মহিম, কিন্তু চরিত্রটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, নীচ এবং অবিকশিত। মন্দ কাজ করিবার মত হৃদয়ের শক্তি এবং দৃঢ়তাও তাহার নাই। বিবাহের পর সে স্ত্রীর প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িল যে স্নেহময়ী মাকে পর্যন্ত উপেক্ষা এবং অপমান করিতে তাহার বাধিল না; আবার মুহূর্তের মধ্যে সে স্বাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বেশ্যা শান্তার প্রেমে উন্মাদ হইয়া উঠিল। এই একটার পরে একটা অপরাধ করিয়াও তাহার কোনো দ্বিধা নাই, তাপ উত্তাপ নাই। নিজের অপরাধ সরযূর উপর নিতান্ত কাপুরুষের মত চাপাইয়া সে তাহার চরিত্রের চরম জঘন্যতা প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের চরিত্র নাট্যকার তাঁহার দাদামহাশয় প্রসাদদাস গোস্বামীকে আদর্শ করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে এই চরিত্রের স্নেহপরায়ণ, পরোপকারী এবং বঙ্গরসপ্রিয় ভাব বেশ ভালোভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার মনস্তাপ ও আত্মহত্যার দৃশ্য হৃদয় স্পর্শ করে না। কালীচরণের উপর নিমচাঁদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কালীচরণ কালিমাপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক। তাহার উদাসীন, বিরাগী চিত্তের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং সদাশয়তা বিরাজ করিতেছে। পতিতা চরিত্রও যে সংযম ও মহত্ত্বের আধার হইতে পারে শান্তার মধ্যে তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। শান্তা চরিত্রের মধ্যে আমরা যেন শরৎচন্দ্রের কোনো সুপরিচিত নায়িকাকে দেখিতে পাই, তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যেন নোরা অথবা ইসাডোরা ডানকান উঁকি মারিতেছে।

॥ বঙ্গনারী (১৯১৬ ॥ 'বঙ্গনারী'র উপর গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। যে সামাজিক সমস্যা এই নাটকখানির ভিত্তি, তাহা 'বলিদান'-এ আলোচিত হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্র গিরিশচন্দ্রের নাটকের দুঃখশোকপ্রাপ্ত অসংলগ্ন-প্রলাপী পরিবার-কর্তার হুবহু অনুরূপ চরিত্র। উপেন্দ্রও

১। 'এই নাটকখানি রচনাকালে কবির হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়।' দ্বিজেন্দ্রলাল—নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১৭৯

'প্রফুল্ল' নাটকের রমেশের ন্যায় অমানুষী দৌর্বৃত্ত্যের অধিকারী। 'বঙ্গনারী' সামাজিক নাটক হইলেও ইহাতে স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনাদ্বারা সুলভ আবেগ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সদানন্দের মুখ দিয়া গ্রন্থকার নিজের কথা ব্যক্ত করিলেও কেদারের চরিত্র বেশি সরস ও প্রাণবান। লঘুচিত্ত, পাগলাটে কেদারের হৃদয় সততা ও মহত্ত্ব দিয়া গড়া, তাহার অভিনব গালাগালির শব্দগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য। সুশীলা যুক্তিবাদিনী আধুনিক নারী-শিরোমণি, তাহার প্রখর বাক্যঘর্ষণে সমাজ-বিদ্রোহ মুহুমুহুঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

(ক) গীতিনাট্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ রূপকথার ন্যায় কাহিনী লইয়া কয়েকখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'কিন্নরী,' 'বাসন্তী' প্রভৃতি অল্প কয়েকখানা নাটক ব্যতীত এই ধরনের অধিকাংশ নাটকে আরব-পারস্য-তুরস্কের উপাখ্যান নিবদ্ধ হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসে এবং পারস্য উপন্যাসে যে রকম অদ্ভুত, অসম্ভব এবং রোমাঞ্চকর গল্প আছে এই সব নাটকের কাহিনীও সেইরূপ। নাটকের মধ্যে ঘটনার যে রকম বাস্তবতা এবং সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, এই সব নাটকে তাহা নাই। চরিত্র সংঘর্ষের দ্বারা এবং ভাব ও ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সাহায্যে যে নাটকীয় রসের বিকাশ হয়, এই নাটকগুলিতে তাহার কোনো পরিচয় নাই। সুতরাং ইহাদের অভিনয় দেখিয়া মনের কোনো প্রকার আবেগচাঞ্চল্য অথবা নাটকীয় রসানুভূতি হয় না। চরিত্র-সৃষ্ট বলিতে ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। অন্তঃস্থিত আগ্রহবর্ধক গল্পরসই ইহাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এই সব নাটক দেখিতে দেখিতে একপ্রকার কল্পময়, স্বপ্নাচ্ছন্ন, রোমান্টিক রসে মন আবিষ্ট, ভরপুর হইয়া উঠে, শিশুর কৌতূহল লইয়া গল্পের পরিণতি জানিবার জন্য মন ব্যগ্র হইয়া থাকে। এ সব নাটকে ঘটনার কোনো বিপরীত গতি নাই, কাহিনী অবিরাম ঘটিয়া গিয়াছে। নাটক না বলিয়া ইহাদিগকে গল্পের নাটকীয় রূপ বলা অধিকতর সঙ্গত। আমাদের বঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ নাটক অপেক্ষা নাচ-গান বেশি ভালোবাসেন, এবং এই সব নাটকে নাচ-গানের প্রাচুর্য থাকাতে বঙ্গমঞ্চে ইহাদের সমাদরের অভাব হয় নাই। 'আলিবাবা' এবং 'কিন্নরী'র সাফল্যই ইহার প্রমাণ। রোমান্স এবং কৌতুকরস এই নাটকগুলির মধ্যে সরস চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটক লিখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ খ্যাতি অর্জন করিলেও তাঁহার পূর্বেই

ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল গিরিশচন্দ্র 'আবুহোসেন' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

'আলিবাবা'র (১৮৯৭) মত জনপ্রিয় এবং সর্ব-সমাদৃত গীতিনাট্য খুব কমই আছে। নাটকখানির মধ্যে এক অতি রহস্যময় কাহিনী রঙ্গরসের উচ্ছল স্রোতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। রোমান্স, কৌতুক এবং adventure-এর বিচিত্র সমাবেশে ইহা অতিশয় উপাদেয় এবং চিত্তরোচক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রধান চরিত্র মর্জিনা। ইহার রঙ্গব্যঙ্গ, নৃত্যগীতই নাটকের প্রাণরস জোগাইয়াছে।

'বেদৌরা' এবং 'আলাদিন' উদ্ভট এবং অসম্ভব ঘটনাশ্রিত রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বেদৌরা'তে (১৯০৩) খালেদানরাজের পুত্র কমরলজামান এবং চীনরাজকন্যা বেদৌরা কি ভাবে অপ্সর-অপ্সরার তৎপরতায় মিলিত হইল তাহার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পরোপকারী হাস্যময় চরিত্র মার্জমান বিশেষ সরস হইয়াছে। 'আলাদিন' নাটকে আরব্য উপন্যাসের প্রসিদ্ধ গল্পটিকে রূপায়িত করা হইয়াছে।

'বরুণা' (১৯০৮) নাটকের সহিত অমৃতলালের 'নবযৌবন' নাটকের সাদৃশ্য আছে। অভিরাম বসন্তকুমারের অনুরূপ। বরুণার সহিত পুণ্ডরীকের সম্বন্ধ লইয়া সরস ঘটনার সমাবেশ করা হয় নাই, শেষ পর্যন্ত বরুণা-পুণ্ডরীকের মিলনে ও বরুণার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনে যেন কোনো কৌতূহলের নিবৃত্তি হইল না, কোনো কৌতুকের সমাধান হইল না। উদারচিত্ত সত্যনিষ্ঠ রাজা শিবর্বমা এবং কৌতুকময় স্নেহপূর্ণ অভিরামের চরিত্র খুব আনন্দদায়ক হইয়াছে।

'ভূতের বেগার' (১৯০৮) অমৃতলালের প্রহসনের ন্যায় শিক্ষাত্মক রঙ্গনাট্য। বিজাতীয় ভাবাপন্ন চাকুরিয়া বাবুদিগকে চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশে ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশই ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

'বেদৌরা'র ন্যায় 'বাসন্তী' নাটকেও (১৯০৮) অপ্সর-অপ্সরার সহায়তায় রঘুবর ও জয়ার মিলন ঘটিয়াছে। নাটকের ঘটনা সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে। বাসন্তীকে কেবল প্রস্তাবনায় দেখা গিয়াছে, নাটকে তাহার কোনোই অংশ নাই।

'কিন্নরী'র (১৯১৮) বিষয়বস্তুর উপর উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীর প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহিনীর সংযোগস্থল এক রোমান্টিক, কল্পময়, আবেশভরা জগতে। পড়িতে পড়িতে মধুর রহস্যময় সুরে মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে।

উপরোক্ত নাটকগুলি ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ আরব-পারস্য-তুরস্ক প্রভৃতি দেশের কাহিনী লইয়া আরও কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছিলেন ; যথা, 'জুলিয়া' (১৩০৬), 'সপ্তম প্রতিমা' (১৩০৯), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৩১৫), 'পলিন' (১৩১৭), 'মিডিয়া', 'রূপের ডালি' (১৩২০) ও 'বাদসাজাদী' (১৩২২)।

'জুলিয়া' (১৯০০) বোগদাদের স্বনামখ্যাত কালিফ ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ হারুণ-অল-রসিদের অনুপম মহত্ত্ববিষয়ক একটি আখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহের পক্ষে নিজের স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়া সহজ উদারতার পরিচায়ক নহে। কালিফ প্রেমের মহাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই অসাধারণ উদারতার দ্বারা নিজের চরিত্রকে ভূষিত করিয়াছেন।

'পালন'-এর (১৯১১) মধ্যে ঘটনার অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছে। নীলপাহাড় হইতে হারেমের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া যে সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া সিস্তান রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনিই আবার সিস্তানরাজকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার কন্যাকে দেখাইয়া দিলেন। এইরূপ অসঙ্গত দৃশ্য অনেক আছে। মাঝে মাঝে আবার হাস্যকর বীররসের অবতারণাও রহিয়াছে।

'মিডিয়া' (১৯১২) নাটকখানির কথঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। সুলতান মনসুরের চরিত্রের মধ্যে বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। মনসুর দুর্দান্ত অত্যাচারী, অথচ প্রেমের সন্ধানে বিভোর ও ভ্রাম্যমাণ। ঘটনার অসংলগ্নতা এই নাটকেও পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। মিডিয়া মনসুরের প্রতি আকৃষ্ট, অথচ তাহাকে কিছুতেই ধরা না দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, ইহার মধ্যে হাস্যকর অসঙ্গতি বিদ্যমান। জড়শক্তির উপর চৈতন্যশক্তির প্রভুত্ব ইহাই যেন নাটকের পরিস্ফুট নীতি।

(খ) পৌরাণিক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকখানা পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন ; যথা 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'উলূপী' (১৩১৩), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'মন্দাকিনী' (১৩২৮) ও 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩)।

॥ সাবিত্রী (১৯০২)॥ ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা সাধারণত সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু 'সাবিত্রী' নাটকের ভাষা দুরূহ সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ। ভাষার মধ্যে প্রকৃতি-বর্ণনা এবং কবিত্ব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং শব্দের

গম্ভীর আড়ম্বরে নাটকের গতি রুদ্ধ। নাটকের মধ্যেও কোথাও ঘটনার সংঘর্ষমূলক চমৎকারিত্ব দেখা যায় নাই। তুম্বুরু চরিত্র হাস্য-কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে।

॥ ভীষ্ম (১৯১৩)॥ দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'ভীষ্ম' নাটক লিখিতেছিলেন, তখন ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁহার 'ভীষ্ম' প্রকাশ করেন। সামসাময়িক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার দিক দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদেরই জিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তখনকার দর্শকবৃন্দের রুচির মধ্যে রসগ্রাহিতার পরিচয় আমরা পাই না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে তীব্র হৃদয়াবেগ ও চাঞ্চল্যকর ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনীর অতিরিক্ত দীর্ঘতা একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর, এবং শেষ দুই অঙ্কে নানা কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকের কথোপকথন স্থানে স্থানে গদ্যে এবং কোথাও বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্থানবিশেষে ভাষা নিতান্ত তরল ও হাল্কা হওয়ায় রসগাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভীষ্মের প্রতি অম্বার দুর্দম অনুরাগ প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং ভীষ্মের প্রত্যাখ্যান তাহাকে কিভাবে এতখানি প্রতিহিংসাময়ী করিয়া তুলিল তাহার যথাযথ যুক্তি পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্র যেমন অপৌরাণিক চরিত্র লইয়া ভক্তিমূলক নাটক লিখিয়াছিলেন, 'রঞ্জাবতী' এবং 'রামানুজ' সেই ধরনের নাটক। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরে এই রকম নাটক লিখিয়া কেহ তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও কোনো উৎকর্ষতা লক্ষিত হয় না। চরিত্র এবং ঘটনার অসঙ্গতি তাঁহার নাটককে প্রভাবহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন করিয়াছে।

॥ রঞ্জাবতী (১৯০৪)॥ 'রঞ্জাবতী' এবং 'রামানুজ-এর মধ্যে ক্ষীণ ঐতিহাসিক সূত্র থাকিলেও ভক্তিরস উদ্দীপনই নাটকদুইখানির অন্তিম লক্ষ্য। ধর্মমঙ্গল কাহিনী হইতে কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'রঞ্জাবতী' রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে কল্পনা উদ্দামভাবে প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে। কর্ণসেন এবং কালুডোম নাটকে যথাক্রমে নয়ন সেন এবং দলু সর্দার হইয়াছে। রঞ্জাবতীর পুত্র— ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের উল্লেখ নাটকে নাই। ইহাতে রঞ্জাবতীর পুত্রের নাম হইয়াছে সূর্যসেন। নাটকের মধ্যে নিয়ন্তা দেবতা মদনমোহন,ধর্মঠাকুর নহেন। প্রথম দিকে গ্রন্থখানার গল্পরস উপভোগ্য, কিন্তু শেষভাগে মাঝে মাঝে দেবতার লীলা দেখাইতে যাইয়া নাটকীয় সংহতি এবং আবেগ নষ্ট করা হইয়াছে। ধর্মানন্দের আধ্যাত্মিক উক্তিগুলি নিতান্ত নিরর্থক ও প্রভাববর্জিত। মাঝে মাঝে

চরিত্রগুলিকে অবিশ্বাস্য উপায়ে অসম্ভব স্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে। দলু, লক্ষ্মী প্রভৃতি ডোম-ডোমিনীগণের চরিত্রই বীরত্বে, মহত্ত্বে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে।

॥ রামানুজ (১৯১৬)॥ 'রামানুজ' নাটকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তক ধর্মনেতার ধর্মজীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদ্যন্ত ইহা ধর্মলীলায় পরিপূর্ণ এবং ইহাতে মানব ও দেবতার ভেদাভেদ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মহাপুরুষদের জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন সেই রকম দ্বন্দ্বও নাটকের মধ্যে নাই। কুরেশের চরিত্র-মাহাত্ম্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

॥ নরনারায়ণ (১৯২৬)॥ পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণের সুপ্রচলিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পনায় পুরাণ-বহির্ভূত কোনো অভিনব মৌলিকতা দেখাইবার ক্ষমতা নাট্যকারের নাই। কিন্তু নাটক পুরাণ নহে, সেজন্য একটি সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কোনো বড় ঘটনা বাদ দিয়া আবার কোনো ছোট ঘটনার উপর রঙ ফলাইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন নাট্য পরিবেশ গড়িয়া তোলা এবং চরিত্রগুলির রসোত্তীর্ণ নাট্য-পরিণতি দেখানই নাট্যকারের কাজ। এই সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ এবং ঘটনা ও চরিত্রের নাট্যরূপ না থাকিলে পৌরাণিক নাটক পুরাণের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র, নাটক হয় না।

'নরনারায়ণ' নাটকের প্রস্তাবনায় আমরা দেখিলাম নাটকের ভাবাদর্শের আভাস—

দৈব কিংবা পুরুষকার
নিদান বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?

বুঝিলাম, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বই নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করা হইবে। নাটকের আরম্ভ হইয়াছে কর্ণের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি হইতে এবং ইহার সমাপ্তি কর্ণের প্রাণোৎসর্গে। সুতরাং কর্ণই যে নাটকের নায়ক এবং এই চরিত্র অবলম্বন করিয়াই দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব তাহাও বুঝা গেল। অথচ কর্ণের নামে নাটকের নামকরণ হয় নাই। ইহার কারণ কি ? পৌরাণিক জগৎ ও আমাদের বস্তু-জগৎ এক নহে। পৌরাণিক জগতে মানুষের ক্রিয়াকর্ম, ভাব ও আকাঙ্ক্ষার মূলে এক দৈবশক্তির অলঙ্ঘ্য বিধান বিরাজ করিতেছে। সেই দৈবশক্তি সতত প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু এই বস্তু-জগতের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে বার বার তাহার

প্রতি আমাদের আর্ত ও আকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে থাকে। নাটকের গোড়ার দিকে ভীষ্মের মুখে নর-নারায়ণের ব্যাখ্যা আমরা শুনিলাম—

এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হন তাঁরা অবতার।

এই নরনারায়ণের গূঢ় মহিমা নাটকের ঘটনাবলীর উপরে কিরণ বিস্তার করিতেছে। এই মহিমার বস্তুরূপ হয়তো পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু ইহাই নাটকের মূল নীতিরূপে ধর্মবিশ্বাসী মনের কাছে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

কিন্তু কথা হইল, নরনারায়ণের মহিমার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াও তাঁহাদের প্রধান বিরোধী শক্তি কর্ণকেই বা অশ্রদ্ধা করি কি ভাবে? তাঁহাকে তো কোনো-ক্রমেই দুষ্কৃতকারী বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়া নরনারায়ণের কোন্ কল্যাণ মহিমা পরিস্ফুট হইল? তিনি কুন্তীর কানীন পুত্র, কিন্তু মাতার অপরাধের জন্য তাঁহার দায়িত্ব কোথায়? তিনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্মপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাসত্ত্বেও মনুষ্যত্বের কোনো অবমাননা তো তিনি কখনও করেন নাই। তিনি বীর, উদার, দানশীল, সত্যসন্ধ — পুরুষকারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। অথচ তাঁহার এ পরাজয় ও দুঃখভোগ কেন? মহাভারতে যাহাই থাকুক না কেন, কর্ণের অপাপবিদ্ধ জীবনের করুণতম পরিণতি দেখিয়া আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ববোধ বিদ্রোহ করে। বাসুদেব হউন, নারায়ণ হউন, নর-নারায়ণ হউন, তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন জাগ্রত হইয়া উঠে। যদি কর্ণের মত পুরুষোত্তমের এই পরিণতি, তবে সাধারণ মানুষ আর কি আশায়, কি ভরসায় জগতের মহাদর্শগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিবে? মানুষের মনের এই অনিবার্য সমস্যার কিভাবে সমাধান হইবে জানি না।[১] তবে দেখিতে পাই, জগতের বহু বহু ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর অন্যায়ের জন্য এইভাবে ন্যায়ব্রতীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কুন্তী ও দুর্যোধনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল কর্ণকে। কিন্তু শুধু যদি নিরুপায়, নির্বীর্য দুঃখভোগই কর্ণের চরিত্রের মধ্যে দেখান হইত, তাহা হইলে কর্ণের পতন আমাদের মনে কোনো গভীর ট্র্যাজিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। কর্ণ প্রথমে দৈবের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন।

১। Tragedy of whatever type to remain tragedy, must refuse to make all things plain, must prostrate itself before the unknown, nor presume with the sentimentalists lightly to interpret the hieroglyphics of destiny.

Tragedy—by Dixon, p. 38

তিনি মনে করিয়াছেন যে, তিনি অজেয়। সেজন্য এক সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বর্মে তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস যখন তাঁহার ভাঙ্গিয়াছে, যখন তাহার অনিবার্য পরিণতি তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনও তিনি দৈবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, আমরণ সংগ্রাম করিয়া গেলেন।

নাটকের সূচনাতেই নিয়তির চক্রান্ত সুরু হইতে দেখি,। কর্ণের সযত্ন অস্ত্রশিক্ষা ও কঠোর সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্যই যেন ব্রহ্মশাপ। কর্ণের দ্বিতীয় অভিশাপ-প্রাপ্তি গুরু পরশুরামের নিকট হইত। কর্ণ ভাবিলেন, অভিশাপ নিষ্ফল, কারণ তিনি সূতপুত্র। অলক্ষ্য নিয়তি ক্রুর হাস্য হাসিলেন। কর্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে বিষ্ণুভক্ত—কিন্তু তাঁহাব তীব্র বিদ্বেষ নরনারায়ণ— ধনঞ্জয় ও বাসুদেব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণ যে নারায়ণ এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বাঁধিবার জন্য তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বোধহয় তাঁহার অন্তরাত্মা ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই, এই বাসুদেবেরই প্রতি স্নেহে মমতায় বিগলিত হইয়া নিদ্রা-মধ্যে এই বন্ধনের বিরুদ্ধেই পীড়িত প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু কর্ণের আসল আত্মদ্বন্দ্ব সুরু হইল তখন হইতে যখন তিনি কৃষ্ণের কাছেই আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আজন্মপোষিত সঙ্কল্প ও অভিমান একটি নিষ্ঠুর আঘাতে যেন চৌচির হইয়া গেল। জগতের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা কুড়াইয়াও সূতপুত্র বলিয়া তাঁহাব মধ্যে একটি আহত অভিমান ছিল, আজ কৃষ্ণের কথায় যখন তিনি জানিলেন সেই অভিমান বৃথা, তখন তিনি নিজেকে বড় বেশি অসহায় বোধ করিলেন। যে অর্জুনকে বধ করিবার জন্য তিনি ।চরকাল কঠোর সঙ্কল্প পোষণ কবিয়া আসিয়াছেন সেই অর্জুনকে ভ্রাতা জানিয়া এক মুহূর্তেই সদ্যোজাত ভ্রাতৃস্নেহ সেই সঙ্কল্পের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হইল—

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা—বাসুদেব!
মর্মভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি
শুনাতে আসিলে তুমি
মনঃক্ষোভ কথা!

এই কথাগুলিতে মহাবীর কর্ণের মর্মবেদনা হৃদয়ের ক্ষতমুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর কর্ণ তাঁহার সত্য ত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস শিথিল

হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বিদ্বেষও অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, তিনি আর অবধ্য নহেন, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অভিশাপ ভয়-কঠিন মূর্তিতে তাঁহার শিরের উপর ঝুলিতেছে। কবচ ও কুণ্ডলহীন হইয়া তিনি সহজেই অস্ত্রভেদ্য হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র অবলম্বন একাঘ্নী বাণ, কিন্তু যতবার অর্জুনের বিরুদ্ধে তিনি সেই ভয়ঙ্কর বাণ প্রয়োগ করিবার কথা ভাবেন, ততবারই সেই নবীন-নীরদ-শ্যাম কৃষ্ণ আসিয়া সেই বাণের কথা তাঁহাকে ভুলাইয়া দেন। আর বাণ প্রয়োগ করিবেন তিনি কাহার বিরুদ্ধে, নিজেরই ভ্রাতার বিরুদ্ধে তো? সেই চিন্তায় যে তাঁহার অন্তরাত্মা উল্লাসের পরিবর্তে বেদনাই বোধ করিয়া বসে! সেজন্য এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে তাঁহার আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে, সত্যসন্ধ মহাপুরুষ যেন নিরাসক্ত চিত্তে বীরের কর্তব্য-কর্ম করিয়া গিয়াছেন। কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইল—অর্জুনের প্রতি প্রযুক্ত সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইল। দৈবের শেষ জয় সিদ্ধ হইল। কবচকুণ্ডলহীন, ভগ্নরথ মহাবীর অন্তিম মুহূর্তে দেবতার চরণে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দেবতার জয়ে উল্লাস বোধ না করিয়া মানুষের পরাজয়ে আমাদের চিত্ত সীমাহীন বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল।

নাটকের মধ্যে কর্ণের অংশটুকু বাদ দিলে অনেক ঘটনাকেই অকারণ এবং অনেক চরিত্রকেই অস্পষ্ট মনে হইবে। নাট্যকার নাটকের পরিমিত কেন্দ্রমুখী ক্রিয়াশীল ঘটনার কথা বিস্মৃত হইয়া অনেক স্থলেই মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করিয়া বহু অনাটকীয় দৃশ্য ও চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে নাটকের দীর্ঘতা যেমন অপরিমিত হইয়াছে, তেমনি ইহার গতিবেগ শিথিল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সব চরিত্রই যথাযথ মহাভারতের চরিত্র হইয়াছে, তবে দুইটি নারী-চরিত্রের ভাবমূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি হইল দ্রৌপদীর প্রতিহিংসাপরায়ণা মূর্তি। দ্রৌপদীর কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তীব্র বিদ্বেষজ্বালা দেখিয়া বেদব্যাসের সেই অসিতাপাঙ্গী, কেশাকর্ষণ-কুপিতা দ্রুপদনন্দিনীর তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যগুলি মনে পড়ে—

> ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্ বলম্।
> যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি॥
> যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
> ধার্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্॥

আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কর্ণপত্নী পদ্মাবতী। তিনি তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় পূর্ণ অন্তরকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ

স্বামীর কৃষ্ণদ্বেষের সহিত তাঁহার কোন যোগ নাই। বাসুদেব কৃষ্ণকে তিনি আরাধ্য দেবতারূপে পূজা করিয়াছেন। কর্ণ যাহা পুরুষকারের অভিমানে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই, পদ্মাবতী যেন এক অকুণ্ঠ ভক্তির দৃষ্টিতে সেই রহস্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। স্বামীর অমঙ্গলের সম্ভাবনা ভাবিয়াও পাণ্ডব-বধূরূপে তিনি পাণ্ডবের জয় কামনা করিয়াছেন, পতিপ্রাণা বধূর কুলের মর্যাদা-গর্বে এক ত্যাগব্রতচারিণী মহীয়সী নারীরূপে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। সত্যই দ্রৌপদীর কথার পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়—

ওগো নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী
প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে।

(গ) ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতা আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে দেখাইয়াছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকও রচিত হইয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের দোষত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে তাঁহার ন্যায্য সম্মান তাঁহাকে দিতেই হইবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে জাতীয়-মন্ত্রপূত অনুপ্রাণনাময় নাটকাবলীর প্রণয়ন হইয়াছিল তাহার সূচনা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকেই হইয়াছিল। 'প্রতাপাদিত্য' নাটক হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, ইহা অপেক্ষা সব দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতর নাটক পরে অনেক লেখা হইয়াছিল, তবে জাতীয় ভাবের প্রথম প্রবর্তকের গৌরব ইহার অবশ্যপ্রাপ্য—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ উঠিতে পারে না। 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'বঙ্গে রাঠোর' প্রভৃতি নাটকেও স্বদেশী ভাবোদ্দীপনই নাটকের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতাব্রতী, মুক্তিসাধক নাট্যকারপ্রবর দ্বিজেন্দ্রলালের পাশেই ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান আমরা নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু নাট্যকলার দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অপেক্ষা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক নিকৃষ্ট তাহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে রকম বীররসের উন্মাদনা আছে, ভাষা ও ভাবের সর্বত্র যেমন একটা গম্ভীর সংহত এবং ওজস্বী রূপ আছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সে সব নাই। তাঁহার নাটকের ভাষা অনেক স্থানে অনুচিতভাবে তরল এবং হাল্কা, গভীর ও গম্ভীর ভাব কোনো কোনো জায়গায় কৌতুকরসের চাপল্যে অস্ফুট এবং অবিকশিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রধান দোষ—ঘটনা-সংস্থাপনের অসঙ্গতি এবং চরিত্রসমাবেশের অসম্ভাব্যতা। নাট্যকার তাঁহার ইচ্ছা এবং কল্পনা অনুযায়ী এমন জায়গায় এমন সব পাত্র-পাত্রীকে একত্রিত করেন যে তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুকরণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে দ্বন্দ্বময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই চেষ্টা সর্বাপেক্ষা ফলবতী হইয়াছে 'আলমগীর' নাটকে।

গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে গিয়া ইতিহাসকে খুব বিশ্বস্তভাবে অনুবর্তন করেন নাই। অনেক স্থলেই তিনি নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক দুই একটি চরিত্র লইয়া সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি কয়েকখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যথা—'রঘুবীর', 'খাঁজাহান', 'আহেরিয়া', এবং 'বঙ্গে রাঠোর'। পৃথকভাবে ঐ নাটকগুলির আলোচনা করা হইবে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন সেইগুলির নাম 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'অশোক' (১৩১৪), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), 'বাঙ্গলার মসনদ' (১৩১৭), 'আলমগীর' (১৩৩৮) ও 'বিদূরথ' (১৩২৯)।

॥ অশোক (১৯০৮)॥ 'অশোক'কে জোর করিয়া ঐতিহাসিক নাটক বলিতে হয়, কারণ নাটকের মধ্যে ইতিহাসের অনুসরণ খুব কমই আছে। নাটকেব নাম 'অশোক', অথচ অশোককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যও ফুটিয়া উঠে নাই। বীতশোক, ধুন্ধুমার এবং চিত্রা—এই তিনটি চবিত্রেরই পুনঃ পুনঃ আনাগোনা দেখা গিয়াছে। চরিত্র-সমাবেশের অসংলগ্নতা এবং সংলাপের দুর্বলতার জন্য নাটকের কোনো প্রভাব মনের মধ্যে থাকে না।

॥ পদ্মিনী (১৯০৬)॥ 'পদ্মিনী' নাটকের নামও যথার্থ হয় নাই। দুই একবার পদ্মিনীকে দেখা গেলেও তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি নাটকের মধ্যে নাই। ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি এবং ট্র্যাজেডির কারণও তিনি নহেন। যদি কেহ দুর্লঙ্ঘ্য ঘটনাপুঞ্জের জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী হইয়া থাকে তবে সে নসীবন। এই খেয়ালী নারীর ব্যক্তিগত খেয়ালের সহিত একটা জাতি যেন তাহার ভাগ্য বাঁধিয়া দিয়াছে। অথচ নসীবন তাহার স্বামী আলাউদ্দিনের প্রতি এরূপ বিজাতীয়

প্রতিহিংসার বশীভূত হইল কেন তাহার সঙ্গত কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নাই। নাটকের চরিত্র-সমাবেশের মধ্যে গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হয়। যে-কোনো চরিত্রকে যে-কোনো স্থলে অবিশ্বাস্যভাবে স্থাপন করা হইয়াছে—সঙ্গতি এবং সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। নাটকে ট্র্যাজেডির অমোঘ, অব্যর্থ গতি কোনো পাত্রপাত্রীর চরিত্রের ভিতর হইতে সৃষ্ট হয় নাই, বাহিরের ঘটনার আঘাতেই ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে। গোরার চরিত্রই সর্বাধিক সরস ও জীবন্ত।

॥ প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) ॥ 'প্রতাপাদিত্য' একদিন স্বাদেশিক নাট্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও ইহার মধ্যে স্বদেশপ্রাণতা উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। জায়গায় জায়গায় সংলাপের মধ্যে স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের জন্য একাগ্র সাধনা, অনন্ত আশা, মহৎ আত্মত্যাগ নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। দুঃখতাপের আঘাতে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়া লইতে হয় নাই বলিয়াই ইহার idea মনের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রতাপাদিত্যের পতনে কোনো ট্র্যাজেডি হয় নাই, মনে হয় অকস্মাৎ যেন তাঁহার পরাজয় এবং পতন ঘটিয়া গেল। অনিবার্য ঘটনারাশির মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডি যেভাবে গড়িয়া উঠে ইহা তেমন হয় নাই। প্রতাপাদিত্য বাংলার লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র আমাদের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি সাহসী বীর বটে, কিন্তু মানবত্বের দুর্লভ গুণে মণ্ডিত নহেন। তাঁহার স্বকৃত অপরাধের জন্যই তাঁহার স্বোপার্জিত রাজ্যের ধ্বংস নিকটবর্তী হইয়াছিল। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র'তেও আছে যে প্রতাপাদিত্যের অন্যায় এবং অপরাধের জন্য দেবী তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পতন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। স্নেহময়, ক্ষমাশীল খুল্লতাতের প্রতি তাঁহার অকারণ সন্দেহ এবং বিদ্বেষ তাঁহার চরিত্রকে হীন করিয়াছে, এবং অবশেষে যখন তিনি তাঁহারই অভ্যর্থনায় উদ্যত খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া বসিলেন তখন তাঁহার এই কাজ ক্ষমার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ভুলক্রমে এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া অন্যায়কারীকে সহানুভূতি দেখানো যাইত, কিন্তু এই হত্যা প্রতাপাদিত্যের বহুকালপোষিত বিদ্বেষের স্বাভাবিক পরিণতি মনে হয় বলিয়াই তাঁহার প্রতি কোনো সহানুভূতি জাগ্রত হয় না। প্রতাপাদিত্যের এই গুরুতর অন্যায়ের জন্য তাঁহার পরিণতি আমাদের চিত্তকে তেমন বিষাদময় করিয়া তোলে না। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের মধ্যে রাজোচিত গাম্ভীর্য এবং

গুরুত্ব নাই। ভূমিকাটিকে পরিহাসরসিক ভাঁড়ের মত করিয়া অঙ্কন করা অসঙ্গত হইয়াছে। ভবানন্দ দেশদ্রোহী নীচাশয় চরিত্র; মানসিংহকে সেই আহ্বান করিয়া আনিয়া বাংলার সর্বনাশ সাধন করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা দেবী তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্গমাতার কাছে তাহার বিভীষণ-বৃত্তি যে কেবল তিরস্কৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ আলমগীর (১৯২১)॥ 'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকখানি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অম্লানভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ঔরংজীবের দ্বন্দ্বময় চরিত্র ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রসিদ্ধ 'দুর্গাদাস' এবং 'সাজাহান' নাটক দুইখানির মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। রাজসিংহ-রূপকুমারীর কাহিনী লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'রাজসিংহ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদকে তাঁহার পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। নাটকখানি অত্যন্ত দীর্ঘ, নাট্যকার নিজের অভিনয়ের জন্য নাটকের অনেক স্থলে বর্জনের নির্দেশ দিলেও ইহার দীর্ঘতা বিশেষ কম ক্লান্তিদায়ক হয় নাই। নাটকের মধ্যে আলমগীর-উদিপুরী ও রাজসিংহ-ভীমসিংহ-জয়সিংহের কাহিনী পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহাতেও ঘটনা সংস্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। মহারাণী বীরাবাঈ-এর মেবার ত্যাগ করিয়া রূপনগরে উপস্থিতি, ভীমসিংহ-জয়সিংহের মহাশত্রু ঔরংজীবের সম্মুখে গমন, উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর প্রবেশ—এই ঘটনাগুলি এত কষ্টকল্পিত যে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। আলমগীর এবং উদিপুরীর মধ্যে ক্ষমতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর এক অপূর্ব চরিত্র। আলমগীর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, আবার নিতান্ত দুর্বল। তাঁহার অজেয় ব্যক্তিত্বের স্পর্ধিত চূড়া যেন নিমেষের মধ্যে পরাজয়ের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। তিনি আপন ক্রিয়া এবং দুষ্ক্রিয়ার নিষ্করুণ সমালোচক, তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চরণশীল এবং কল্পনাময়; সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার বাক্য অপ্রকৃতিস্থের অসংবদ্ধ প্রলাপের ন্যায় মনে হয়, নাটকের অধিকাংশ চরিত্রের মধ্যে ভাবের অতি দ্রুত লয়-বিলয় হইয়াছে, সেইজন্য জায়গায় জায়গায় চরিত্রের উদ্দেশ্য (motive) ব্যাহত হইয়া গিয়াছে।

॥ চাঁদবিবি (১৯০৭)॥ 'চাঁদবিবি' ঐতিহাসিক নাটক বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কোনো বিরাট ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাহিনী রসঘন হইয়া উঠে নাই। ঐতিহাসিক

নাটকে সাধারণত যে দেশাত্মবোধ ও ভাবোদ্দীপনা থাকে ইহাতে তাহারও অভাব। ইহার তুচ্ছ ঘটনারাশি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া বিশেষ কোনো নাটকীয় উদ্দেশ্য সৃজন করিয়া তুলিতে পারে নাই। 'চাঁদবিবি' নামেরও যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে চাঁদবিবির প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা লক্ষিত হয় না। এখলাস খাঁ, নেহাঙ খাঁ, মিয়ান মঞ্জু প্রভৃতি চরিত্র অতিরিক্ত স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। চাঁদবিবির মৃত্যুও আকস্মিক ও নিরাবেদন।

॥ রঘুবীর (১৯০৩)॥ 'রঘুবীর' গদ্য ও পদ্যে রচিত। গদ্য সংলাপ স্বচ্ছ ও সরস, কিন্তু পদ্য উক্তিসমূহ দীর্ঘ এবং নিরাবেগ। ভীল রঘুবীরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক চরিত্রগুলির ন্যায় ধর্মদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রায়শ এইরূপ দ্বন্দ্ব দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর। ঘটনা-সংস্থাপন অনেক স্থলেই দুর্বল ও অবিশ্বাস্য। জাফর ও রঘুবীর দুই দুইবার মুখোমুখী হওয়াসত্ত্বেও কোনো চরম ব্যাপার ঘটিল না, নিতান্ত সহজেই যেন দুইজন দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া গেল।

(ঘ) কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক

॥ খাঁজাহান (১৯১২)॥ 'খাঁজাহান'-এর মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, কিন্তু কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। ঘটনা-সমাবেশের অস্বাভাবিকতা নাটকীয় কৌতূহল ও আগ্রহ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। নিতান্ত অসম্ভব এবং অপ্রত্যাশিত স্থানে চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে। এক একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, অথচ তাহার যেন কোনো কারণ নাই এবং সম্পর্কও নাই। নারায়ণ রাও একবার মোগলের দিকে, আবার খাঁজাহানের দিকে, কিন্তু তাহার এই পক্ষ পরিবর্তনের পিছনে যথেষ্ট কারণ নাই। সোফিয়াও পিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘর ছাড়িল, অথচ মনে হয় ইহার কোনো দরকার ছিল না। তাহার যেন সর্বত্রই অবারিত গতি, নিমেষের মধ্যেই সে যেন সকল ব্যাপারের মধ্যে যাইয়া একটা সমাধানের অংশ গ্রহণ করিতেছে। তাহার এই গতিবিধি সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নাটকের মধ্যে আবার ঘটনাসংঘর্ষ এবং দ্রুত ভাব-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নাটকীয় রস জমাইবার অতি দুর্বল এবং হাস্যজনক চেষ্টা হইয়াছে। আজিমৎ অতি সামান্য কারণে প্রহরীকে হত্যা করিয়া বসিল এবং তাহাতেই একটা বিরাট হৈ-হৈ ব্যাপার সুরু হইয়া গেল। শেষ দৃশ্যে নারায়ণ এবং খাঁজাহানের মৃত্যু ও সোফিয়ার সহমরণের আয়োজন দেখাইয়া করুণরস সৃজন

করিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস করা হইয়াছে। নাটকের কোনো স্থলই মর্মস্পর্শী হয় নাই।

॥ আহেরিয়া (১৯১৫) ॥ 'আহেরিয়া' অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট নাটক। বারাহালাঙ্গাইয়ের সহিত ভট্টিদের বিরোধের উপব ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত। পরিশেষে সকলের মিলনের মধ্যে নাটক সাঙ্গ হইয়াছে। মূলরাজের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মূলরাজের মধ্যে ভাবদ্বন্দ্ব বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি তনুরায়কে হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাটকেব মধ্যে তাঁহাকে মহাশক্তিশালী, উদার এবং অটুট সংকল্পনিষ্ঠ দেখিতে পাই। নির্বংশ হওয়াসত্বেও তিনি সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার চিরশত্রু, পুত্রহন্তা দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি মহত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কেতু এবং রেবা একেবারে দ্বন্দ্বহীন, নিশ্চিন্ত চরিত্র, অবস্থাবিপাকে পিতৃশত্রুদের পত্নী হইয়া তাহারা বেমালুম স্বামীর পক্ষে ঝুঁকিয়াছে, স্নেহময় পিতার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে তাহাদের বাধে নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলিও অপরিস্ফুট এবং অনুল্লেখ্য।

॥ বঙ্গে বাঠোর (১৯১৭) ॥ ক্ষীয়মাণ পাঠান রাজত্বের শেষ সময়কাব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া 'বঙ্গে রাঠোব' রচিত হইয়াছে। রঙ্গলাল-কালু-ভোলাই-এর মধ্য দিয়া বাঙালীর শক্তিবীর্য দেখানো হইয়াছে। নাটকের মধ্যে জাতিধর্মের বিভেদেব প্রতি নজর দেওয়া হয নাই। কলি বেগম অবাধে হিন্দুপবিবাবে গৃহীত হইল, জৈনুঙ্গিন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পডিল, এবং রতিলাল ধর্মত্যাগ করা-সত্বেও কাহারো কাছে স্নেহ ও সম্মান হাবাইল না। ভুবনেশ্ববীব চরিত্র বেশ স্নেহময়ী ও মহীযসীরূপে ফুটিয়াছে। বঙ্গলাল এবং ভোলাই-এর চরিত্রও সরস হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

(ক) ভূমিকা

শেকস্পীয়র বলিয়াছেন—নামে কি যায় আসে, গোলাপ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন সমান গন্ধ বিতরণ করে। কিন্তু নাম যে কতখানি অর্থবান হইতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে। প্রকৃতই সহস্রাংশুর ন্যায় তিনি তাঁহার কিরণমালায় মানুষের কত চিন্তাক্ষেত্র, কত কল্পলোক, কত

লীলাভূমি শোভিত, সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রতিভার পরশমণির পরশে সাহিত্যের সব বিভাগ সোনা হইয়াছে। কবিতা ও গল্পের রাজ্যে তিনি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি অতুলনীয়। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নাট্যসাহিত্য নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করিয়া নাট্য-রচনা শুরু করিলেন। তাঁহার নাটকের সহিত পূর্ববর্তী নাট্যধারার কোনো যোগ নাই। তাঁহার নাটকীয় চেতনার উৎস হইয়াছে তাঁহারই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের মধ্যে তাঁহার অনুভূত সত্যদর্শন ক্রমিক ধারাবাহিকতাব মধ্য দিয়া এক অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে মানস অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই সৌন্দর্যময় প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার যে মানসের পরিচয় পাই, তাহার অভিব্যক্তি তৎকালীন নাটকেব ভিতরেও রহিয়াছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক বস্তুতন্ত্রতাসত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় সহিত মিলিতভাবে তাঁহার কোন মানস-সত্যকেই প্রকাশ করিয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না।

রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রথমত এবং প্রধানত কাব্যধর্মী। কাব্যের ক্ষেত্রে ইহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এবং এই ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ও রস গ্রহণ করিয়া ইহা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে এই প্রতিভা-তরু বহু বিচিত্র চিন্তা এবং মননের বায়ু হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার মূলদেশের সহিত কাব্যভূমির সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠতম হইয়া বহিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেও তাঁহার সর্বব্যাপী কাব্যময়তা বিরাজ করিতেছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'খেয়া'-যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন, সেইগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। তবে অপরিণত বয়সের প্রাথমিক কয়েকখানা নাটক ব্যতীত এই কাব্যভাব তাঁহার নাটকের নাটকত্বের হানি করে নাই। 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি কাব্যছন্দে লিখিত হইলেও নাটক হিসাবে ইহাদের তুলনা নাই। 'খেয়া'র পূর্ব পর্যন্ত কবির মন বিশ্বের রূপরস-সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, সেইজন্য এই সময়কার নাটকেও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য-তরঙ্গের অবারিত লীলা, বিশ্বজগৎ

এবং মানব-জীবনের অকুণ্ঠিত জয়গান লক্ষ্য করা যায়। তখনকার সদাপ্রফুল্ল চিত্ত হাস্যরসের তরল স্রোতে অতি সহজেই ভাসিয়া বেড়াইতে চাহিত, সেই-জন্য তাঁহার প্রহসনগুলিরও জন্ম হয় এই সময়ে। 'খেয়া'র পরে 'গীতাঞ্জলি' যুগ হইতে তাঁহার মন রূপ হইতে অরূপ রাজ্যে, বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতের পানে অগ্রসর হইল। তখন হইতে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হইল। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'-এ যেমন বাহ্যজগতের আকুতি ও চাঞ্চল্য অন্তর্জগতের মৌন সাধনায় নিমগ্ন হইল, তেমনি পূর্বেকার নাটকগুলির ক্রিয়াময় ঘটনারাশি রূপক নাটকের অন্তর্গূঢ় ভাবময়তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার ইতিহাস। এই নাট্যধারার প্রতিটি বীচিবিক্ষেপ, প্রতিটি গতি-পরিবর্তনের বিশেষত্ব আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান গুণ, ইহার অনবদ্য অতুলনীয় ভাষা। ভাষা-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট তাঁহার ভাষাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠিত এবং চালিত করিয়াছেন। এই ভাষার কৃতিত্বেই তাঁহার নাটক বিরল-ঘটনাময় হইলেও যথেষ্ট আবেগময় ও গতিমান হইয়াছে। তাঁহার নাটকের ভাষা নাটকীয় চরিত্রের ভাব ও দ্বন্দ্ব সুগভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো যে, তাঁহার সংলাপ খুব সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত। বাংলার অধিকাংশ নাট্যকারদের নাটকে সংলাপের অপরিমিত দীর্ঘতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ফলে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা অনেক স্থলে একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। ছোট সংলাপের সমাবেশ থাকিলে আমাদের দৃষ্টি ইতস্তত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকে, ফলে আমাদিগকে বিশেষ সজাগ এবং অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় এবং পাত্রপাত্রীদের সংলাপে সংলাপে সংঘর্ষ লাগিয়া মুহুর্মুহুঃ আবেগকণা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথোপকথন এত ক্রিয়াচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত নাটকে বাহ্য ক্রিয়া এবং সংঘর্ষ খুব বেশি লক্ষ্য করা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত এবং বিশ্লেষিত হইলেও বাহ্য কল্পনার অত্যধিক প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের পূর্বতন নাট্যকারবৃন্দ তাঁহাদের নাটকে দৌড়ঝাঁপ, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি সস্তা ধরনের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া action সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন, আমাদের দর্শকবৃন্দের রুচিও এই রকম নাটক পছন্দ করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। মুগুরের ঘা না

খাইলে যে-রসবোধ জাগ্রত হয় না, তাহা সূক্ষ্ম স্পর্শের সমাদর করিবে কিরূপে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার নাটকের মধ্য হইতে স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন। কিন্তু সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটক যে ক্রিয়াবিরল, নিরাবেগ হইয়া পড়িল তাহা নহে। উত্তাপ তিনিও সৃষ্টি করিলেন, তবে তাহা কাঠখড়ের ন্যায় চোখ রাঙ্গাইয়া থাকে না, সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে ইহা অদৃশ্য, অথচ প্রচণ্ড জ্বালাময় অগ্নি-প্রবাহের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। অন্তর্লীন পাবকে শমীবৃক্ষ যেমন ভিতরে দগ্ধ হইয়াও বাহিরে অক্ষত, অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, তাঁহার নাটকের আবেগময় ক্রিয়াও অন্তস্তল দিয়া তীব্রবেগে প্রবহমান হইয়াও বাহিরে অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং মনপ্রাণ রুদ্ধ করিয়া, শুধুমাত্র চোখ দুইটিকে জাগাইয়া রাখিলে তাঁহার নাটকের রসোপলব্ধি হইবে না। তাঁহার নাটক যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্তর এবং বাহিরের সব ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রস্তুত এবং প্রখর রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথে আসিয়া বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরব লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দেখা যায় নাই, এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার নাটক এখনো ব্যাপক সর্বজন-সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ দর্শকদের মন এখনও যোগ্য ও প্রস্তুত হয় নাই। ভাবী কালের অনাগত সমাজে ইহাব প্রকৃত মূল্য অনুভূত হইবে, তখন লোকে সমস্বরে স্বীকার করিবে—রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে।

মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিভিন্ন সময়ে কিরূপ ছিল, এবং এই মঞ্চশিল্পবোধ তাঁহাব নাটকের রূপ ও রীতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এখন তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সংস্পর্শে না আসিলে কোনো নাট্যকার নাটক লেখার প্রেরণা বোধ করেন না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যদি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত না হইত এবং যদি তিনি অভিনয়ের রসে রসিক না হইতেন তাহা হইলে তিনি নাটক লিখিতে এতখানি উৎসাহী হইয়া উঠিতেন কিনা সন্দেহ। নাট্যগোষ্ঠী-গঠন, মঞ্চ পরিকল্পনা ও পরিচালনা, নাটক-প্রযোজনা, অভিনয়-শিক্ষাদান, অভিনয়ে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানা দিক দিয়া তিনি নাট্যমঞ্চ ও প্রয়োগশিল্পের সহিত যুক্ত ছিলেন। সেইজন্য মঞ্চ-আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি নানাভাবে চিন্তা করিবার

সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং নাটক রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে নূতন নূতন রীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকে রূপ ও রীতির যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা বিচার করিতে হইলে সমসাময়িক যে মঞ্চশিল্প রূপ ও অভিনয় ধারার দ্বারা তাঁর নাট্যপ্রতিভা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল সেগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যমে স্থাপিত সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় একটি নাট্যসমিতি স্থাপিত হইল। সেই নাট্যসমিতির নাম হইল Committee of Five। পাঁচজন সভ্যের নাম—কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়-শিক্ষক হইলেন কৃষ্ণবিহারী সেন।[১] প্রথমেই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হইল। এই অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হইল বলিয়া তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত তৃতীয় নাটক হইল প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ রচিত 'নবনাটক'। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এবং এই বিবরণে আমরা জানিতে পারি যে, 'নবনাটক' যদিও প্রাচ্য আদর্শে রচিত, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য রীতিতে পরিকল্পিত বাস্তবধর্মী রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায়—

'তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত'।[২]

এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছেন, 'নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর, বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৯৮-৯৯

২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৮

হইয়াছিল।' এই প্রকৃত রীতি যে বাস্তবনিষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য মঞ্চরীতি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই।[১]

রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হইবার পূর্বে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা পাশ্চাত্ত্য মঞ্চরীতিই যে অবলম্বন করিয়াছিল তাহা উপরের দুইটি উদ্ধৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায়। অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মতই রবীন্দ্রনাথ আগে অভিনেতা এবং পরে নাট্যকার। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[২] বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যে মদনের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সব অভিনয় বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখেই দেখান হইয়াছিল। সাধারণ দর্শকের সমক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির ভূমিকাতেই তিনি সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন। বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষ্যে এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কেবল নটরূপে নহে, নাট্যকাররূপেও সাধারণের সম্মুখে ইহাই হইল তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। এই নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যসজ্জাও খুবই বাস্তবধর্মী হইয়াছিল এবং সেজন্যই তাহা দর্শকদের বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে এই দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড়-বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া যখন জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টিধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল।'[৩]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় বার বার হইত। পরবর্তী এক অভিনয়ের

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'সুতরাং তথাকথিত প্রকৃত রীতি যে ইংরেজদের দ্বারা গৃহীত রীতি এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়।'

সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—পৃ ১৪২

২। 'বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ-কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার "এমন কর্ম আর করব না" প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।'

জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১০৯

৩। জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১৬১

বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ দিয়াছেন।[১] সেখানেও দৃশ্যসজ্জার বাস্তবধর্মিতার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'হ. চ. হ. এলেন সেবারে, তাঁর উপরে ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে ছুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চ-মিথুন হ'ল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন ; সিন আঁকলেন কচুবনে বন্য ববাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা ববাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন।'

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় অনেক পরবর্তী কালেও যখন হইয়াছে তখনও এই মঞ্চ-বাস্তবতার দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পী তখন মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হাতে মঞ্চসজ্জার আরো নিখুঁত ও পরিপাটি বাস্তবতাই দেখা গিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথের মুখেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে—

'পিছনে আয়না দিয়ে নানা রকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কডমড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি। ছুটো দম্বেল ছিল, দম্বেল জানো তো ? কুস্তিগিরবা কুস্তি কবে, লোহার ডাণ্ডার ছ'পাশে বড়ো বড়ো লোহার বল, নিতুদা দোতলার ছাদ থেকে সেই দম্বেল ছুটো গড়গড় করে এ-ধাব থেকে ও-ধার গডাতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহা খুশি, হাততালিব পর হাততালি পডতে লাগল। যতদূর রিয়ালিষ্টিক করা যায় তার চুড়ান্ত হয়েছিল।'[২]

যিনি পরবর্তী কালে মঞ্চসজ্জার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, তিনিই কিরূপ মঞ্চ বাস্তবতার মধ্যে অভিনয় করিয়া লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য কবিবার মত। তখনকার সৌখীন রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে দৃশ্যসজ্জার যে বাস্তবতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়াছিল[৩] তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালাতেও বাস্তবের অনুকরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

১। ঘরোয়া—পৃঃ ৮৫

২। ঘরোয়া—পৃঃ ১০৬

৩। 'সে যুগের নব্য বাঙালীরা ইংরেজদের অনুকরণ করবার যে কোন সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। তাঁরাও গা ভাসালেন গডডালিকা প্রবাহে, কারণ এই সকল বাস্তবতার মধ্যে পেলেন নূতন চমৎকারিত্বের সন্ধান।' সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ৫৭

ঠাকুরবাড়ির ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্যোগে অলীকবাবুর অভিনয়ের যে বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেখানেও দেখা যায় দৃশ্যসজ্জা সাহেব-চিত্রকরকে দিয়া পাশ্চাত্ত্য রীতিতেই করা হইয়াছিল।[১] ড্রামাটিক ক্লাবের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়েও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য রীতির বাস্তবধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।[২] 'বিসর্জন'-এর পরে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হন। এই 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত কলিকাতায় শেষ অভিনয়। ইহার পর তাঁহার অভিনয় ও নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয় শান্তিনিকেতনে। বহুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার নাটকের অভিনয়ে তিনি পুনরায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন তাঁহার নাট্য-ধারায় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং মঞ্চশিল্প সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির অনেক মৌলিক নূতনত্ব দেখা দিয়াছে। সুতরাং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয়ে তাঁহার কলিকাতাস্থিত নাট্যজীবন ও অভিনেতৃজীবনের যে শুধু সমাপ্তি ঘটিল তাহা নহে, পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা ও মঞ্চকলার প্রভাবও তাঁহার জীবনে শেষ হইয়া আসিল। শান্তিনিকেতনের নাট্যসাধনা ও নাট্য-প্রয়োগরীতির মধ্যে তাহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার চেতনা ইতিমধ্যে তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'রঙ্গমঞ্চ'-নামক একটি প্রবন্ধে তিনি মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব বৈপ্লবিক মতবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদিন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত যে বাস্তবধর্মী মঞ্চ-পারবেশের মধ্যে তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে হঠাৎ তিনি তাহারই বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ব্যক্ত করিলেন। মঞ্চের বাস্তবতাকে নিন্দা করিয়া তিনি লিখিলেন—

'দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে, অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম

১। 'তা অভিনয় তো হবে বয়েল থিয়েটারের সাহেব-পেণ্টারকে ব'লে ব'লে পছন্দমাফিক সিন আঁকালুম। ষ্টেজ খাড়া করা গেল।' ঘরোয়া—পৃ° ৮৮

২। 'হ. চ. হ-র উপর ভার পড়ল ষ্টেজ সাজাবার, সিন আঁকবার। আমিও তার সঙ্গে লেগে গেলুম। এক সাহেব পেণ্টার জোগাড় ক'রে-আনা গেল, সে ভালো সিন আঁকতে পারতো, ইলোরা কেভ থেকে থাম্‌-টাম্ নিয়ে কালিমন্দির হল, মোগল পেন্টিং থেকে রাজসভা হল।' ঘরোয়া—পৃঃ ৮

স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।'

মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁহার এই সুস্পষ্ট মত পরবর্তী কালে অনেক স্থানেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' নাটকে তিনি বলিলেন, 'চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপটের। সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় এই মতবাদ তিনি আরো প্রবলভাবে ব্যক্ত কবিলেন, 'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্য-মঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।'

রবীন্দ্রনাথের এই মৌলিক মঞ্চশিল্পচেতনা তাঁহার নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে পরবর্তী কালে কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছিল সে বিচার আমরা পরে করিব। তৎপূর্বে সেই মঞ্চশিল্পচেতনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের অন্ধ অনুকরণে স্থূল বাস্তবতার প্রাধান্যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কল্পনাশীল শিল্পিচিত্ত যে পীড়িত হইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নাট্যশালার অভিনয়ে কিছুটা কৃত্রিম বাস্তবতা অপরিহার্য। যেখানে উন্মুক্ত আকাশতলে, প্রসারিত প্রাঙ্গণে স্বাভাবিক সূর্যালোকে অভিনয় হয় সেখানে মঞ্চকলা-নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বাস্তবতা দেখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে, সীমাবদ্ধ রঙ্গমঞ্চে ও কৃত্রিম আলোকে অভিনয় করিতে হয় সেখানে মঞ্চের কলাকৌশলের মধ্য দিয়া যে অভিনেয় জগতের বাস্তব-রূপকে ফুটাইয়া তোলার প্রচেষ্টাকে বর্জন করা চলে না! অভিনয়ের মধ্য দিয়া যে জগৎ ও মানবচরিত্র রূপায়িত করিবার চেষ্টা হয় তাহার সহিত রঙ্গমঞ্চের যথার্থ রূপ ও অভি.নতাদের আসল চেহারার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু অভিনযের সময় দর্শকদের মনে করাইতে হইবে যে, রঙ্গমঞ্চ কাঠের পাটাতন ও চটের আবরণের সমষ্টি নহে, তাহা উদ্যান অথবা মন্দির, এবং অভিনেতাদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন তাহারা ক্ষণকালের জন্য বিক্রমদেব অথবা রঘুপতি ছাড়া আর কেহই নহে। দর্শকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কৃত্রিম কলাকৌশল সাজসজ্জার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ 'তপতী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক

স্থলে স্পর্ধা'। নাট্যকারের নাটক যতক্ষণ পাঠ্য থাকে ততক্ষণ তিনি অবশ্যই কবির মতই স্বাধীন কিন্তু যখন তাঁর নাটক অভিনীত হয় তখন তিনি আর পরিপূর্ণ স্বাধীন নহেন। তখন তাঁহার নাট্যকলাকে মঞ্চকলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হয়। তাঁহার সূক্ষ্ম ভাব মঞ্চে রূপ ধারণ করে এবং তাঁহার অবাধ গতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। কাব্যকার ও মঞ্চকারের মাঝে রহিয়াছে নাট্যকার। কাব্যকারের মুক্তিতে নাট্যকারের আরম্ভ, কিন্তু মঞ্চকারের বন্ধনে তাঁহার পরিণতি। এ-সত্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। নাটক যে দৃশ্যকাব্য। এখানে দৃশ্যত্বকে প্রাধান্য দিতেই হইবে। অন্যান্য কাব্যে কল্পনার মাধ্যমে দেখা, কিন্তু নাটকে দেখার মাধ্যমে কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু, দর্শকের দৃষ্টিপটকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে।' কিন্তু দৃশ্যপট সত্যই কি 'মূক, মূঢ়, স্থাণু'? দৃষ্টিপট তো পরিবেশকে সচল ও সজীব করিয়াই তোলে। দৃশ্যপট নেপথ্য জগৎকে আচ্ছাদিত করিয়া অভিনেতাদের সম্বন্ধে দর্শকদের চিত্তে অবিরাম কৌতূহল জাগাইয়া রাখে এবং উহার রঙ ও রেখা অভিনেতাদের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগকে স্পন্দমান ও বাণীময় করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের উল্লেখ বার বার করিয়াছেন তাহার অভিনয়েও তো রঙ্গিন যবনিকার অস্তিত্ব ছিল। কাহারও কাহারও মতে অভিনয়ের ভাব অনুযায়ী যবনিকার রঞ্জন হইত।[১] প্রাচীন ভারতের চার রকম অভিনয়ের মধ্যে আহার্য অভিনয়ে অলঙ্করণই তো প্রধান।[২] নাট্যশাস্ত্রে নেপথ্যবিধানের যে চারটি বিভাগ করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে মঞ্চের কৃত্রিম বাস্তবতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৩] সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ-বাস্তবতা ও দৃশ্যপট ব্যবহার সম্বন্ধে

১। কিথের উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।—'The colour of the curtain is given in some authorities as necessarily in harmony with the dominant sentiment of the play, in accordance with the classification of sentiments already given, but others permit the use of red in every instance'.

The Sanskrit Drama, p. 359

২। আহার্যো হারকেয়ূরবেষাদিভিরলঙ্কৃতিঃ —অভিনয়দর্পণ

৩। 'নেপথ্যের চারিটি ভাগ—(১) পুস্ত, (২) অলঙ্কার, (৩) অঙ্গরচনা ও (৪) সঞ্জীব। পুস্ত—রঙ্গমঞ্চে যে সকল কৃত্রিম বৃক্ষ, পর্বত, যান, বিমান, চর্ম, ধ্বজ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। অলঙ্কার—মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি। অঙ্গরচনা—দেশ, জাতি ও বয়স অনুসারে বর্ণ-বিধান (Painting)। সঞ্জীব—রঙ্গমঞ্চে অপদ, দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিগণের প্রবেশ প্রদর্শনকে সঞ্জীব বলে।

যে প্রবল মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়-রীতিদ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত নহে এবং নাট্যমঞ্চের অভিনয়ে সর্বাংশে গ্রহণ করাও অসুবিধাজনক।

রবীন্দ্রনাথ যাত্রাভিনয় পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার এজন্য ভালো লাগে, যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।' যাত্রা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগিয়াছে নিশ্চয়ই উহার অভিনয়-রীতির জন্য। যাত্রার আর একটা দিক আছে—উহার ভাববস্তু, অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসের দিক। ঐ ভাববস্তুর সহিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যাত্রার অভিনয়-রীতি তাঁহার পরবর্তী সাঙ্কেতিক নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে-আলোচনা আমরা পরে করিব। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই যাত্রারীতি সমর্থনের ফলে বর্তমান কালে যাত্রারীতিতে নাট্যাভিনয় অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে। আঙ্গিকপ্রধান রঙ্গমঞ্চের পাশে এই বিরলসজ্জ স্বভাবাশ্রিত, অভিনয়ের ধারা বহু প্রগতিবাদী নাট্যসংস্থার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, যুগের পরিবর্তন হইতেছে, যন্ত্র ও নাগরিক জীবনের সহিত আমরা অনিবার্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির বহু চিত্র-আঁকা পটভূমিতে যাত্রার যে প্রাণধারাটি মনের আনন্দে বহিয়া চলে, যন্ত্রঘর্ঘরিত পাষাণপিষ্ট স্থানে তাহা বিরস ও নির্জীব হইয়া পড়ে।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করিবার পর পুনরায় আমরা তাঁহার নাটকের অভিনয় ও প্রয়োগরীতি লইয়া আলোচনা করিব। শান্তিনিকেতনে যে অভিনয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল তাহাদের মধ্যে 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো অভিনয় হয়তো যাত্রা-রীতিতে অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' নামক উপাদেয় গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মঞ্চকলার সব দিকেরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

'শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের রীতিমতো ইতিহাস লিখিলে দেখা যাইবে, ইহার পরিণতি কম বিস্ময়কর নহে। প্রথম আমলে দেখিয়াছি, নাটকে কেনা পোশাক

ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোশাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পিগণকর্তৃক পরিকল্পিত 'পোশাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোশাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়ম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশি, এসরাজ দেখা দিল। এক কথায়, অভিনয়ের সৌন্দর্য-কলার উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল' (পৃঃ ৭২)। উপরিউক্ত বর্ণনায় পোশাক, পটভূমিকা, আলো, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদির উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে মঞ্চপ্রয়োগরীতি সম্বন্ধে যে নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা শান্তিনিকেতনের অভিনয়-রীতিতে খুব বেশি প্রতিফলিত হয় নাই। তবে আগে মঞ্চসজ্জায় যে রুচিহীন স্থূলত্ব ও অন্ধ অনুকরণের পরিচয় পাওয়া যাইত তাহা সূক্ষ্ম ভাবাশ্রয়ী, রুচিসম্মত ও দেশীয় উপকরণে সমৃদ্ধ হইতেছিল। শান্তিনিকেতনে মঞ্চসজ্জার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব বোধ হয় দেখা গিয়াছিল 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই অভিনয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'এর অভিনয় নানাদিক হইতে স্মরণীয়। প্রথমেই ইহার সাজসজ্জার মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিমতা, আড়ম্বরশূন্যতা ও নিরাভরণ সৌন্দর্য ছিল—যাহা অচিরে বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চের উপর নীরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।'[১] মঞ্চসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত এই 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়েই সর্বপ্রথম সার্থক রূপ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় পরিণত বয়সে যখন কলিকাতায় তাঁহার নাটক মঞ্চস্থ করেন তখন তাঁহার এই নিজস্ব মঞ্চপরিকল্পনা অনেকখানি রূপায়িত হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার পরিকল্পনা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হস্তস্পর্শেই বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছিল। তবে কলিকাতার সঙ্কীর্ণ ও অবরুদ্ধ মঞ্চে তাঁহার স্বভাবাশ্রয়ী মঞ্চপরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হইতে পারে নাই এবং তাহা হওয়া সম্ভবও নহে। বাস্তব উপকরণের সহযোগে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা বর্জন করা সম্ভব হয় নাই। পূর্বে যেখানে স্থূলরুচি পটুয়া ও কারিগরের অসুন্দর বাস্তবানুকৃতি ছিল সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা স্থান পাইল। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের নাট্যাভিনয়গুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব', 'বিসর্জন', 'তপতী', প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। রবীন্দ্র-জীবনী (২য়)—পৃঃ ৩৮০

'ফাল্গুনী'র অভিনয় হইয়াছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'ফাল্গুনীর স্টেজসজ্জা পরযুগে বাংলা দেশের স্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস-লেখকদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইবে'।[১] অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় এই মঞ্চসজ্জার যে বিবরণ আছে তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, পটভূমি হইয়াছিল নীল মখমলের বনাত, বাদাম গাছের ডালপালা দিয়া মঞ্চ সাজান হইয়াছিল এবং উঁচু ডালের সঙ্গে বাঁধা দোলার মতও ছিল।[২] এখানেও দেখা যায়, অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। স্থূল গৃহপ্রাঙ্গণ এই মঞ্চসজ্জার চাতুর্যের ফলেই রমণীয় প্রাকৃতিক ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। 'ডাকঘর' অভিনয়েও মঞ্চসজ্জা বাস্তবের, অনুরূপ অথচ বিশেষ শিল্পসম্মত হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

'ডাকঘর অভিনয় হবে, স্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার, যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর।'

এই পাড়াগেঁয়ে ঘরটি আবার অবনীন্দ্রনাথের অন্তিম তুলিস্পর্শে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। 'শারদোৎসব' অভিনয়ের মঞ্চসজ্জাতেও একবার তিনি মঞ্চের পশ্চাৎপটে এমন ভাবে বক আঁকিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে মনে হইয়াছিল মঞ্চের উপর দিয়া যেন সত্য সত্যই এক ঝাঁক বক উড়িয়া যাইতেছে।[৩] আলফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটাররেও 'শারদোৎসব'-এর অভিনয় হইয়াছিল।

'তপতী' নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগরীতির শেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেল। ইহার পর তিনি প্রধানত নৃত্যাভিনয় রচনা ও প্রযোজনার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি নাট্য-প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 'তপতী'র অভিনয়ে মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনাতেও তাঁহার এই মত অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'এখানকার অভিনয়ের জন্য নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল, অর্থাৎ

১। রবীন্দ্র-জীবনী (২য়)—পৃ ৭০

২। ঘরোয়া—পৃঃ ১২০

৩। ঘরোয়া, (২য়)—পৃঃ ১২৪

দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই।'[১] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দৃশ্যপট পরিবর্তন না করিয়াই অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু, সত্যই কি দৃশ্যপট পরিবর্তন না করিয়া এই নাটকের সার্থক রসোদ্দীপক অভিনয় করা সম্ভব? 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যপট পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ ঐ সব নাটকের ঘটনা একই স্থানে ঘটিতেছে। কিন্তু পূর্বের লেখা 'রাজা ও রাণী' সংস্কার করিয়া 'তপতী' রচনা করা হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে ঘটনাবলী কখনও জালন্ধরে, আবার কখনও বা কাশ্মীরে ঘটিয়াছে। 'তপতী'তেও সেইভাবে ঘটনা ঘটিয়াছে। দৃশ্যসজ্জা পরিবর্তন না করিলে জালন্ধর ও কাশ্মীরের পার্থক্য কি ভাবে দর্শকদিগকে বুঝান হইবে? জালন্ধর ও কাশ্মীরের পরিবেশ আলাদা। লোকও আলাদা। দৃশ্যপটের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ঘটনার স্থান অনুযায়ী পরিবেশ-রূপ ফুটাইয়া না তুলিলে দর্শকগণ নাটকীয় ঘটনার সহিত কি ভাবে একাত্মতা স্থাপন করিবে? 'তপতী'র ঘটনা কখনও ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে, কখনও কাশ্মীরে, আবার কখনও বা মার্তণ্ডমন্দিরে ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পাঠককে বুঝাইবার জন্য দৃশ্যের নাম লিখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দর্শককে বুঝাইবার জন্য যদি দৃশ্যের রূপ না ফুটাইয়া তোলেন তবে দর্শকসমাজ তাঁহার কাছে অভিমান জানাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটকেরই মঞ্চে প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া যান নাই বলিয়া তাঁহার নাটক মঞ্চস্থ করিবার সময় যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেভাবে মঞ্চসজ্জা করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্র-নাটকের প্রয়োগ-রূপ ও অভিনয়রীতি সম্বন্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চশিল্পচেতনার দুই রূপের মত অভিনয়রীতিরও দুইটি পৃথক্ পৃথক্ আদর্শ তাঁহার প্রথম ও শেষ জীবনে লক্ষ্য করা যায়। যৌবনে জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে, সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে অথবা ভারতসঙ্গীত সমাজে যে-সব অভিনয় তিনি করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ভাবাবেগের প্রবলতা, মুখের রেখাসঞ্চালন ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গির তীব্র ও জোরালো রূপই বেশি প্রকটিত হইত। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-কথা'য় লিখিয়াছেন:

'অভিনয়শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমরা তৎকালে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখানে কিছু দিলে ভবিষ্যতে কলারসিকদের কিছু উপকারে আসিতে পারে। তাঁহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভারএকটিং ভাল,

১। রবীন্দ্র-জীবনী (৩য়)—পৃঃ ২৬৫

যাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সঙ্কোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে.। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-একটিং-এর দিকে। ······মৃদু অভিনয়-ছলা ও মিনমিনে গলা, অঙ্গচালনায় বাধবাধ ভাব দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে রঙ্গমঞ্চস্থিত কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।'[১] অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত ধারণা তাঁহার যৌবনের অভিনয়ে, বিশেষত 'রাজা এবং রাণী' ও 'বিসর্জন' নাটকের বিক্রমদেব ও রঘুপতির ভূমিকায় অভিব্যক্ত হইয়াহিল। মঞ্চরীতির মত তখনকার অভিনয়রীতিও বিদেশী প্রভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। খগেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে অনুষ্ঠিত 'রাজা ও রাণী'র অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'এ-অভিনয়ের প্রশংসায় কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় নাটকীয় ভাবের ও অনুভূতির তীব্রতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হরণ করিল।[২] "বিসর্জন"-এব রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় অনেকের মতেই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।'[৩] রঘুপতিব ভূমিকায় যে তীব্র উত্তেজনা, মুহুর্মুহু যে বিদ্যুৎদাহ ও হৃদয়বিদাবী বজ্রের গর্জন ও মর্মভেদী হাহাকাব রহিয়াছে তাহা রবীন্দ্র-নাটকের অপব কোনো চরিত্রে দেখা যায় না। আমবা কল্পনা করিতে পারি, এই ভূমিকার অভিনয়ে কণ্ঠ ও অঙ্গেব কি অতিশয়িত উত্তেজনা প্রকাশ করিতে হইত এবং কিরূপ দুর্দম ভাবাবেগে তাঁহাকে আলোড়িত হইতে হইত।[৪] মনে রাখিতে হইবে তখন সাধারণ নাট্যশালায় গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের যুগ চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ নাট্যশালাব অভিনয়-সংস্পর্শে না আসিলেও এই সব অভিনেতাদের অভিনয়রীতির সদৃশ অভিনয়বীতি গ্রহণ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইবে, তিনি অর্ধেন্দুশেখরেব সঙ্গে একবার অভিনয়ও

১। ববীন্দ্র-কথা—পৃঃ ২৩২

২। ববীন্দ্র-কথা—পৃঃ ২০৩

৩। 'বিসর্জনেব রঘুপতিব ভূমিকায গ্রন্থকাব যে রূপ ও অঙ্গভঙ্গি দিযাছিলেন তাহা অতুলনীয। দেশে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশে শ্রীশ বোস মহাশয় অনেক নাটকেই গুরুগম্ভীব ভূমিকা শুনিবাব ও দেখিবাব সুযোগ পাইযাছেন, কিন্তু ভাবতসঙ্গীত সমাজে অভিনীত ববিবাবুব রঘুপতিব মত অভিনয়-নৈপুণ্য আব দেখেন নাই। ইহা তাঁহার কৃতিত্বেব কম প্রশংসা নহে।'

রবীন্দ্র-কথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২২৭

টমসনও শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের কাছে শুনিয়াছিলেন, 'It was generally considered his greatest success as an actor'. *Rabindranath p. 94*

৪। রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয়ের সময় ববীন্দ্রনাথ কিরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন তাহা অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় বর্ণিত আছে (পৃঃ ৯৪-৯৫ দ্রষ্টব্য)

করিয়াছিলেন। ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অভিনয়ের মধ্যে যে একটু প্রবলতা ও উচ্চতা আনা দরকার তাহা তিনি তখন বিশ্বাস করিতেন। খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, '‘কবি স্বাভাবিক হাবভাবের পক্ষপাতী হইলেও বিশেষ ভাবব্যঞ্জনার জন্য স্বরের ও বলিবার ধরনের এবং উচ্চারণের কতকটা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন, অন্যথা নাটকের প্রাণস্বরূপ কথোপকথনের সুস্পষ্ট ছাপ দর্শকের মনে অঙ্কিত করা যায় না।'[১] ভারতসঙ্গীত সমাজে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিনয় শিক্ষা দিতেন তখন তিনি উচ্চারণশুদ্ধি ও খুঁটিনাটি অঙ্গচালনার দিকে অতি সূক্ষ্ম নজর রাখিতেন।[২]

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচেতনার দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখিয়াছি, তিনি তাঁহারই সৃষ্ট পূর্ববর্তী মঞ্চচেতনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তেমনি তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনেরও দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের অভিনয়-রীতিকে তিনি যেন সজোরে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। ভাবাবেগময় রোমান্টিক অভিনয়-রীতিকে বর্জন করিয়া তিনি যেন শান্তরসাত্মক গীতিধর্মী অভিনয়-রীতিকেই গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ‘পথের সঞ্চয়’-এর ‘অন্তর বাহির’ নামক প্রবন্ধে তিনি বলিলেন, ‘রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়।’

উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক অভিনয়ে একটু আবেগের প্রাবল্য ও আতিশয্য দেখা গিয়াছিল তাহা সত্য। রবীন্দ্রনাথ হেনরী আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয়ের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আতিশয্য নিন্দনীয় হইলেও অভিনয়ে যে একটু বাড়াইয়া বলা দরকার তাহাও সত্য। আর্টের ক্ষেত্রে তো একটু বাড়াইয়া বলা প্রয়োজন, এ-কথা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের কথা তো শুধু পার্শ্ববর্তী অভিনেতার জন্য নহে, বহু দূরে উপবিষ্ট শ্রোতার জন্যও বটে। সেজন্য কণ্ঠস্বরকে একটু উচ্চ করিয়া বলা দরকার। যাত্রায় শ্রোতাগণ আরো দূরে ছড়াইয়া বসে।

১। রবীন্দ্র-কথা—পৃঃ ২৪৬

২। ‘বাক্যের রসস্ফুরণনিমিত্ত শব্দবিশেষগুলিতে শ্রোতার মন আকৃষ্ট করা ও খুঁটিনাটি অঙ্গচালনা সম্বন্ধে তাঁহাদের এত মনোযোগ ছিল যে, সময়ে সময়ে শিক্ষাকালীন নটদের বিশেষ ধৈর্যপরীক্ষা হইত ও লোকে বলিত সমাজ বড় ফ্যাসটিডিস।’

রবীন্দ্র-কথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২২৬

সেজন্য সেখানে কণ্ঠস্বরের আরও উচ্চতা আবশ্যক। নাটক অনুসারেও কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা এবং আবেগের প্রবলতা ও সংযম ঘটিয়া থাকে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে জীবন যেরূপ উচ্চ ও বলিষ্ঠ সুরে বাঁধা, সামাজিক নাটকে সেরূপ নয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অভিনয়ে যে সংযত ও শান্ত ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার পরিবর্তিত অভিনয়শিল্প-বোধ ও আবেগবিরহিত তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকের জন্য নহে, রবীন্দ্রনাথের বয়সও তাহার একটি কারণ। যৌবনের অভিনয়ে অপরিমিত দেহ-শক্তি ও অবারিত চিত্তবেগের প্রকাশ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, বার্ধক্যের অভিনয়েও তেমনি ধীর সংযম ও অবিচলিত শান্তভাবের প্রকাশ হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-রীতির আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যেমন সাহিত্যের শ্রেণীবিশেষে ফেলা যায় না, তাঁহার অভিনয়কলা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে তাহাতে যেন লিরিক-রীতিরই প্রাধান্য ছিল, সমস্ত ভূমিকাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত। কিংবা, অন্ধ বাউল, সন্ন্যাসী, আচার্য প্রভৃতি ভূমিকা হয়তো কবির নিজস্ব অভিনয় প্রতিভার অনুরূপ করিয়াই সৃষ্ট বলিয়া এমন মনে হইত।' গিরিশচন্দ্র যেমন নিজের অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের বহু চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কয়েকটি চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য এই চরিত্রগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। একদিকে আছে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা, অন্ধ বাউল প্রভৃতি—যেগুলির মধ্যে তাঁহার চঞ্চল, পরিহাসপ্রিয়, সঙ্গীতরসিক রূপটি দেখিতে পাই। অন্যদিকে পাই আচার্য, ভিক্ষু উপালী প্রভৃতি—যেগুলিতে তাঁহার শান্ত, অচঞ্চল, প্রজ্ঞাবান রূপেরই আভাস পাই। একদিকে যৌবনের চঞ্চলতা, অন্যদিকে বার্ধক্যের সংযমশাসিত শান্তি, একদিকে আনন্দের বাঁধভাঙ্গা গতি, অন্যদিকে জ্ঞানের অবিচল স্থিতি—এই দুইটি রূপই রবীন্দ্রনাথের অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে দেখা যায়।[১]

১। রবীন্দ্রনাথের শান্তরসাত্মক অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছেন, 'শান্তভাবে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ ক'রে, চোখের একটুখানি ইঙ্গিতে, ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলী ভঙ্গিমায় তিনি যতখানি গভীর ভাবের ছবি দর্শকের মনের পটে এঁকে দিতে পারতেন, তথাকথিত বীরবরদের সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড কণ্ঠরোল, লম্ফঝম্প ও বাচালতার দ্বারা কোনকালেই তা প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না।'
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ১৪৯

মঞ্চশিল্প ও অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত ও প্রয়োগরূপ আলোচনা করিবার পর এবার আমরা তাঁহার নাট্যশিল্পের বিবর্তন-ধারা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। 'রাজা ও রাণী' নাটক রচনা করিবার পূর্বে তিনি যে গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলি যে তৎকালীন মঞ্চসজ্জাপূর্ণ অভিনয়রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট। প্রত্যেকটি দৃশ্য কোন স্থানে স্থাপিত তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি, স্থানে স্থানে দৃশ্যের মধ্যে কলাকৌশলের মধ্য দিয়া পরিবেশ সৃষ্টি করিবারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কোনো কোনো দৃশ্যে অপরাহ্ণ, রাত্রি, ইত্যাদি দৃশ্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি দৃশ্যে ঝড়বৃষ্টির পরিবেশ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য হইলেও ইহাতে কুটির, কানন ইত্যাদি দৃশ্যরূপের নির্দেশ রহিয়াছে। সুতরাং এই যুগের নাটকগুলিতে কোথাও কাব্য এবং কোথাও সঙ্গীত প্রাধান্য পাইলেও সেগুলির অভিনয়ের জন্য যে বাস্তবধর্মী রঙ্গমঞ্চই পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট। নাটকগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে ঘটনার বিচিত্র জটিলতা ও সঙ্কট নাই, এবং সেগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' যথাক্রমে ছয়টি ও সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ষোলটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য বলিয়াই ঘটনাপ্রবাহের অখণ্ডতা ও সংহতি বেশী প্রয়োজনীয় এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধিকতর নাট্যধর্মী হইবার জন্যই ইহাতে একটু ঘটনার বৈচিত্র্য প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেজন্যই ইহার দৃশ্যসংখ্যাতেও আধিক্য দেখা গিয়াছে।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' এই দুইখানিই শেকস্পীয়রীয় রীতিতে রচিত খাঁটি রোমান্টিক নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যেই পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবৈচিত্র্য রহিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর সহিত কুমার-ইলার উপকাহিনীটি অত্যন্ত সার্থকভাবে মিলিত হইয়াছে এবং 'বিসর্জন'-এ গোবিন্দমাণিক্য-গুণবতীর কাহিনীর সহিত রঘুপতি-জয়সিংহের কাহিনীটি সুকৌশলে যুক্ত হইয়াছে। ঘটনার তীব্র গতি, হৃদয়াবেগের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত এবং হৃদয়বিদারী ট্র্যাজিক বেদনার অভিব্যক্তিতে এই দুইখানি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যে কাব্য আছে, গদ্য-কথা আছে, গান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে নাটকীয়তা। ইউরোপীয় রীতিতে বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়া হইয়াছে ইহাদের

মধ্যে এবং তখন রবীন্দ্রনাথ যে প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন চরিত্রগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কিন্তু 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন'-এ নাট্যকলার যে চরমোৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইল না। পুনরায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনা কাব্যচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী' এই দুইটি নাটকই গদ্যসংলাপহীন কাব্যধর্মী নাটক। তবে 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে নাট্যসংঘাত থাকিলেও কাব্যধর্মিতাই প্রবলতর, কিন্তু 'মালিনী' সম্পূর্ণভাবে পদ্যছন্দে রচিত হইলেও নাট্যসংঘাত ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা'ব দৃশ্যবিভাগ 'রাজা ও রাণী'র পূর্ববর্তী নাটকগুলির অনুরূপ। অর্থাৎ দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত, সংখ্যায় অধিক (এগারটি) এবং দৃশ্যরূপের উল্লেখ বর্তমান। 'মালিনী'র ঘটনা জটিল ও ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ, কিন্তু ইহার দৃশ্যগুলির সংখ্যা খুবই কম (মোট চারটি দৃশ্য)। সুতরাং অল্প কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে ঘটনার বিচিত্র ও প্রবল বেগ আনিবার ফলে এই নাটকের মধ্যে একটা দুর্দমনীয় গতিবেগ ও উদ্দীপনাজনক নাট্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃশ্যরূপের নির্দেশ এই নাটকেও রহিয়াছে। 'মালিনী' রচনার কিছু আগে ও পরে তিনি কয়েকটি নাট্যকাব্য রচনা করিলেন। সেগুলির মধ্যে নাটকত্ব কতখানি ও কাব্যত্ব কতখানি রহিয়াছে তাহা আমরা পরে বিচার করিব। কিন্তু একটা বিষয় এখানেই উল্লেখ করা যায় যে, সেগুলির কোনো দৃশ্যরূপ নাই। বুঝা যায়, সেগুলি পাঠ ও আবৃত্তি করিবার জন্যই প্রধানত রচিত হইয়াছিল, অভিনয় করিবার জন্য নহে।

'শারদোৎসব' হইতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের নূতন পর্ব আরম্ভ হইল এবং তাঁহার নাট্যরচনা, নাট্যাভিনয়েব কেন্দ্র কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হইল। দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে তাঁহাব পরিবর্তিত ধাবণা 'শারদোৎসব' নাটকখানিব মধ্যেই রূপায়িত। বিভিন্ন দৃশ্যে নাটকেব ঘটনাকে ভাগ করিবার রীতিটি শিথিল হইয়া আসিল। দুইটি দৃশ্যে আলোচ্য নাটকটি রচিত বটে, কিন্তু প্রথম দৃশ্যটিকে আমরা প্রস্তাবনারূপেই গ্রহণ করিতে পারি। নাটকের প্রধান ঘটনা দ্বিতীয় দৃশ্যটির মধ্যেই ঘটিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' সাঙ্কেতিক নাটক রচনার পূর্বে রচিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক নাটকরূপে কথিত হইয়াছে এবং ইহা এলিজাবেথীয় নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ-রীতি গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর কাহিনী নাটকে রূপায়িত করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়তো ইহা ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের নাট্যরীতি ও পরিবেশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নাট্যরীতি ও পরিবেশ যাহাই হউক না কেন,

ইহার ভাববস্তু অন্যান্য সাঙ্কেতিক নাটকের ভাববস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত। 'রাজা' ও 'অচলায়তন'-ও কয়েকটি দৃশ্যসম্বলিত নাটক। 'রাজা'র দৃশ্যসংখ্যা কুড়ি এবং 'অচলায়তন'-এর ছয়। দৃশ্যবাহুল্যের জন্য 'রাজা'র কাহিনী বহুধাবিক্ষিপ্ত, কিন্তু দৃশ্যস্বল্পতার জন্য 'অচলায়তন'-এর কাহিনীর মধ্যে একটা সংহতি ও দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। 'ডাকঘর'-এর মধ্যে দৃশ্যসংখ্যা তিনটি হইলেও দৃশ্যরূপের কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তাহাতে নাটকের সংহতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃশ্যসজ্জার যে এককত্বের আভাস পাওয়া গিয়াছিল 'শারদোৎসব'-এ, তাহার একটু দ্বিধাযুক্ত প্রকাশ দেখিলাম 'ডাকঘর'-এ। দ্বিধাযুক্ত বলিলাম এ-কারণে যে, এই নাটকে দৃশ্যবিভাগ নামে আছে, কিন্তু কাজে নাই। দৃশ্যসজ্জাব দ্বিধাহীন ও বলিষ্ঠ এককত্বেব পরিচয় পাওয়া গেল পববর্তী তিনখানা নাটকে—'ফাল্গুনী,' 'মুক্তধারা' ও 'বক্তকববী'তে। ববীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, 'ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোব ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে'—তাহাব সার্থক পরীক্ষা আমরা দেখিতে পাইলাম এই নাটকগুলিতে। তবে 'তপতী' নাটকের ঘটনাসংস্থাপনায় তাঁহার এই উক্তি যে পবিপূর্ণ সার্থকতা লাভ কবে নাই, তাহা পূর্বেই আমবা আলোচনা করিয়াছি।

(খ) গীতিনাট্য

ববীন্দ্রনাথেব গীতিনাট্যবচনাব মধ্যে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কাল মৃগয়া' ও 'মায়াব খেলা'—এই তিনখানি নাটিকা অন্তর্ভুক্ত কবিতে হয। এই গীতিনাট্য কয়খানি যখন তিনি বচনা করিতেছিলেন তখন হইতেই তাঁহার কাব্যনাট্যগুলি পাশাপাশি জন্মলাভ করিতেছিল—যথা, 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', ইত্যাদি। অর্থাৎ, তখন তাঁহাব নাট্যপ্রতিভা কখনো সঙ্গীত এবং কখনো বা কাব্যকে আশ্রয় করিতেছিল। কিন্তু কাব্যনাট্যের সূচনা দেখা গেলেও তখনকাব কবিমানসে কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতেব প্রেরণাই ছিল বোধহয় প্রবলতর। সেজন্য তাঁহার প্রাথমিক কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে যে দ্বিধা ও অপূর্ণতা রহিয়াছে, গীতিনাট্যগুলির মধ্যে তাহা নাই। তাঁহার বিচিত্র সঙ্গীতসাধনার সার্থক রূপায়ণ হইয়াছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'য়। 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'নলিনী' পরবর্তী কালে স্বয়ং কবিকর্তৃক উপেক্ষিত ও বর্তমান পাঠকসমাজের কাছে প্রায় অপরিজ্ঞাত। কিন্তু 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' কেবল যে উহাদের জন্ম সময়েই সমাদৃত

হইয়াছিল তাহা নহে, আশী বছর পরেও উহারা পাঠক ও দর্শকের চিত্তে আনন্দ দান করিয়া চলিয়াছে।

গীতিনাট্যের মধ্যে গীতি ও নাট্যের কোন্‌টি কিরূপ স্থান লাভ করে তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। গীতিনাট্যের মধ্যে গীতি হইল উপায় আর নাটক হইল উহার উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে গীতির রস এমন হওয়া উচিত নহে যাহা নাটকের রস আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থাৎ নাটকের সংঘাত, নাট্য-কৌতহল, আকস্মিকতা, গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব না থাকিলে গীতিনাট্য সার্থক হয় না। গীতি যে নাটকের প্রয়োজনেই এই শ্রেণীর নাটকে প্রযুক্ত হয় তাহা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় চমৎকারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু, এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, এ-কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই।'[১] সঙ্গীতকে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করিবার ফলে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে, কিন্তু 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যরূপে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মত সফল নহে, কারণ, এই নাটিকায় নাট্যকার্যকেই সঙ্গীতের প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, ইহাতে নাটক মুখ্য নহে, সঙ্গীতই মুখ্য।[২] সেজন্য গীতিনাট্য না বলিয়া নাট্যগীতি বলিলেই বোধ হয় এই নাটিকাটির যথার্থ নামকরণ হয়।

রবীন্দ্রনাথ সর্বব্যাপী সঙ্গীতের পরিবেশে থাকিয়া নাটককে সঙ্গীতধর্মী করিবেন তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু নাটক রচনা করিলেন কেন, তাহা বিচার করিতে গেলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নামক একটি গীতিনাট্যে অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই গীতিনাট্যের রস সম্ভবত গীতিনাট্য রচনায় তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল।

১। জীবনস্মৃতি

২। 'মায়ার খেলা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, 'ইহার অনেককাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।' জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১০৮

॥ বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) ॥ ববীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিযাছেন, 'তখন আমাব অল্প বযস, গান গাহিতে আমাব কণ্ঠেব ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না , তখন বাডিতে দিনেব পব দিন, প্রহবেব পব প্রহব সঙ্গীতেব অবিবল বিগলিত ঝবনা ঝবিযা তাহাব শীকবকণা মনেব মধ্যে সুবেব বামধনুকেব বঙ ছডাইযা দিতেছে ; তখন নবযৌবনেব নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলেব পথ ধবিযা ধাবিত হইতেছে , তখন সকল জিনিসই পবীক্ষা কবিযা দেখিতে চাই, কিছু যে পাবিব না এমন মনেই হয না , তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয কবিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুবভাবে ঢালিযা দিতেছি ।' নাটকখানিব মধ্যে দেশী বিদেশী নানা বিচিত্র বাগ-বাগিণীব লীলাদ্বাবা এক অপূর্ব সঙ্গীতেব মাযাপুবী সৃষ্টি কবা হইযাছে। এই সঙ্গীতেব তবঙ্গময উচ্ছ্বাসে নাটকেব ঘটনা ক্ষিপ্রগতি নৃত্যেব ছন্দে নিমিষেব মধ্যে চক্ষু-কর্ণের মোহময বিভ্রম জাগাইযা শেষ হইযা গিযাছে। সে-কাবণে নাটকেব ঘটনা যথেষ্ট দ্বন্দ্বময হয নাই। বাল্মীকিব বত্নাকব দিকটি পবিস্ফুট হয নাই, দযা ও মমতায গলিযা যাইবাব জন্য তাহাব হৃদয যেন প্রস্তুত হইযাই ছিল, বালিকাব এক কথাতেই তাহাব দস্যু-জীবন শেষ হইযা গেল। দস্যুগণেব নির্মমতা এবং বাল্মীকিব সহিত তাহাদেব বিবোধিতা তবল হাস্যবসেব মধ্যে পবিণত হইয়া নিতান্ত কৃত্রিম এবং মূল্যহীন মনে হইযাছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'ব আসল এবং একমাত্র দ্বন্দ্ব বাল্মীকিব মনে—এই দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম, ভাবময এবং অন্তর্নিহিত। এইখান হইতে বিহাবীলালেব 'সাবদামঙ্গল'-এব প্রভাব তাঁহাব নাটকেব মধ্যে পবিব্যাপ্ত হইযাছে। বাল্মীকি লক্ষ্মীব অনুগ্রহ গ্রহণ না কবিযা সবস্বতীব কৃপা মস্তকে ধাবণ কবিযা লইলেন, ইহাতেও 'সাবদামঙ্গল'-এব ভাব হুবহু অনুসৃত ।

॥ মাযাব খেলা (১৮৮৮) ॥ 'মাযাব খেলা'য 'বাল্মীকিপ্রতিভা'ব ন্যায় সুরের মধ্য দিযা নাটকীয ঘটনা বিবৃত হইযাছে। ইহাকে নাটক বলা বোধ হয সঙ্গত নয়, কাবণ ইহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। ইহাব সঙ্গীতেব উচ্ছ্বসিত ঝঙ্কাবে আমাদেব মন আবিষ্ট হইয়া থাকে, ঘটনাব গতিব প্রতি আমাদের আর তেমন ঔৎসুক্য থাকে না। নাটকখানি শেষ হইলে মনে হয আমবা বুঝি এক স্বপ্নময কপকথার রাজ্য হইতে ফিবিযা আসিলাম, সেখানকাব সঙ্গীতেব রেশ গুনগুন কবিয়া আমাদেব কানে ঝঙ্কাব তুলিতেছে, এবং আলো-আঁধারময় নয়নাভিবাম দৃশ্যসৌন্দয যেন আমাদেব চোখ ধাঁধিযা বাখিযাছে। 'মায়ার খেলা'র আখ্যান-বস্তুব সহিত কবিনিন্দিত পূর্ববর্তী নাটিকা 'নলিনী'র সাদৃশ্য

আছে।[১] 'মায়ার খেলা' 'মানসী' যুগে লিখিত হয়। 'মানসী' কাব্যের মধ্যে যে নিষ্ফলতার কারুণ্য এবং অপ্রকাশের বেদনাময় সুরটি প্রতিধ্বনিত, তাহা এই নাটকেও ফুটিয়াছে। দুরাশায় বুক বাঁধিয়া কল্পিত প্রেমের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে কেবল ব্যর্থ হইতে হয়, প্রেম যে ধরা দিবার জন্য সাগ্রহ বাহু প্রসারিত করিয়া আমাদের পাশেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা জানিলে প্রেমকে পাওয়া যাইবে। নাটকটির দ্বিতীয় কথা—দুঃখ ও বিচ্ছেদের হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারিলেই প্রেমের খাঁটি পরিশুদ্ধ রূপের সহিত পরিচয় হয়। আত্মসুখের জন্য প্রেম আশা করিলে সুখ নষ্ট হয়, প্রেমও মিলে না। মায়াকুমারীগণের কথায়—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না
শুধু সুখ চ'লে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা!

(গ) কাব্যনাট্য

॥ রুদ্রচণ্ড (১৮৮১)॥ নাটকের মধ্যে ক্রুদ্ধ জ্বালাময় প্রতিহিংসা এবং মধুর মমতাময় প্রেম—এই দুই বিপরীত ভাবের লীলা লক্ষ্য করা গিয়াছে। অবিচারিত, নির্বাসিত রুদ্রচণ্ড তাহার চিত্তকে বারিবিন্দুহীন শুষ্ক তপ্ত মরুভূমির মত করিয়া তুলিয়াছে, এই মরুদ্বারা সে নিজে দগ্ধ হইয়াছে, এবং অন্যকে দগ্ধ করিবার অবিচল চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মনে হয়, প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার অটল সঙ্কল্পই বুঝি তাহার চরিত্রকে এরূপ কঠোর করিয়া তুলিয়াছে, ইহা যেন তাহার যথার্থ পরিচয় নহে। সেইজন্য পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিহিংসা অর্থহীন হইয়া যাওয়ায় সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিজের রুদ্ধ স্নেহ শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কন্যার কাছে তাহার আসল মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল—

'আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা।
এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।'

রুদ্রচণ্ডের কঠোর প্রতিশোধস্পৃহা তাহার চরিত্রকে ক্ষুদ্র করিতে পারে নাই, তাই মহম্মদ ঘোরীর গোপন সাহায্য প্রার্থনা সে ঘৃণায় অগ্রাহ্য করিয়া

১। 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে পাঠকেরা ইহাকে তাগারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'

বিজ্ঞাপন—'মায়ার খেলা'।

ঘোরীর আগমন-বার্তাই নগরে প্রচার করিতে চলিল। পৃথ্বীরাজ তাহার শত্রু বটে, কিন্তু পৃথ্বীরাজ যেন একমাত্র তাহারই শত্রু, সেই শত্রুর প্রতি বীরোচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প লইয়াই সে বাঁচিয়া আছে। যখন সেই সঙ্কল্প সাধন করার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়েই সে আত্মনাশ করিয়া বসিল। এই অনমনীয়-চিত্ত, উন্নতশির, বিশালপ্রাণ বীরের পরিণতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অমিয়া অরণ্যের আগ্নেয়গিরির পাশে শীতল প্রস্রবণের ধারার ন্যায়, অগ্নিতাপপীড়িত চিত্তকে শান্ত ও তৃপ্ত করিবার জন্য যেন বিরাজ করিয়াছে। সে কারুণ্য ও মমতার মৃত্তিকায় গড়া নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক প্রতিমা, রোষ অভিমানের বিন্দুমাত্র মসীচিহ্ন সেই প্রতিমাকে কলঙ্কিত করে নাই।

॥ প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) ॥ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক হইলেও নাটকত্ব অপেক্ষা একটা বিশেষ তত্ত্বই ইহার মধ্যে প্রধান। এই তত্ত্বটি বার বার রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন—'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।'[১] এই সীমা-অসীমের মিলনতত্ত্বই নাটিকাখানির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। অসীমের প্রয়াসী হইয়া সন্ন্যাসী বুঝিতে পারে নাই যে সীমার মধ্যেই অসীম সুর বাজাইতেছে, অসীম তো সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে যে সীমার নিবিড় সঙ্গ চাহিতেছে। এই সত্য সে শেষে বুঝিল, সে দেখিল—'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।'[২] নাটকের মধ্যেও বার বার কতকগুলি সাধারণ নরনারীকে তুচ্ছ বিষয় লইয়া মাতামাতি করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা অবান্তর এবং নাট্যসম্পর্কবিচ্ছিন্ন মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহারাও একটা সত্যকে প্রকাশ করিতেছে। তাহারা খণ্ডসীমার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া অসীমের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 'প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।'[৩] তত্ত্ব বাদ দিলে নাটক হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর

১। 'জীবনস্মৃতি'
২। ঐ
৩। ঐ

তেমন কোনো মূল্য নাই। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ অন্তর্মুখী উক্তিগুলি নাটকের দিক দিয়া অসঙ্গত এবং মূল্যহীন, নাটকের ঘটনা-সংস্থান দুর্বল এবং অসংলগ্ন ও দৃশ্যগুলি আদি-অন্তহীন এবং নিরর্থক।[১] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর গানগুলি খুব চমৎকার, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলির মধ্যে সরস মাধুর্য তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিয়াছে।

॥ রাজা ও রাণী (১৮৮৯)॥ 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় স্তর সূচনা করিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে পূর্বতন অনেক রচনাকেই প্রশংসা করিতে পারেন নাই। আলোচ্য নাটকখানির তথাকথিত দোষত্রুটিও পরিণত বয়সে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়াছিল এবং পরিশেষে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া 'তপতী' নাম দিয়া একখানি নূতন নাটক রচনা করিয়া তিনি ইহার সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব শোধ করিলেন।[২] চল্লিশ বৎসর পরে লোকের মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। আর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিত্যনব-অনুভূতিশীল কবির পক্ষে তো কথাই নাই। সুতরাং সত্তর বৎসরের বুদ্ধি-বিদগ্ধ মন লইয়া তিনি যদি ত্রিশ বৎসরের হৃদয়-সমৃদ্ধ রচনার সহিত একমত না হইতে পারেন তবে অবশ্য তাঁহাকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সেজন্য পূর্বতন রচনার মধ্যে অসন্দিগ্ধভাবে দোষ অনুসন্ধান করা নিরাপদ ও সমীচীন নহে।[৩] কারণ কবির সুস্পষ্ট মন্তব্যসত্ত্বেও ইহা প্রমাণ করা দুরূহ নহে যে, 'রাজা ও রাণী' একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক এবং বাংলা সাহিত্যে যে দুই একখানি ট্র্যাজেডি আছে ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা সে প্রমাণই করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত, যে যে কারণে নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিন্দনীয় হইয়াছিল সেগুলি আমরা বিচার করিব। কবির আপত্তির প্রথম কারণ হইল ইহার লিরিকের আতিশয্য। যে যুগে তিনি 'রাজা ও রাণী' লিখিয়াছিলেন তখন বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহার হৃদয়কে কানায় কানায় ভাবাবেগে

১। 'The play in the original, is extremely loose in construction; the scenes are ragged, with no clear beginnings or endings."

Rabindranath: Poet & Dramatist by Edward Thompson. p. 5

২। 'অনেকদিন ধরে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। ... তখনই স্থির করেছিলেম এ নাটক আগাগোড়া নতুন ক'রে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।'—'তপতী'র ভূমিকা।

৩। 'রাজা ও রাণী'র ও 'তপতী'র প্রকাশকাল যথাক্রমে—১২৯৬ ও ১৩৩৩ সাল।

উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। তখন যাহা কিছু এই হৃদয় উৎস হইতে নির্গত হইতেছিল তাহাই লিরিকের শতসুরে রণিত হইয়াছিল। লিরিকের আতিশয্য নাটকের মধ্যে দোষাবহ এবং 'রাজা ও রাণী'-ও যে সেই দোষ হইতে মুক্ত নয় তাহা সত্য। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে, নাটকের মধ্যে লিরিকের লক্ষণ থাকিলেই যে তাহা অপাংক্তেয় হইয়া যায় এমন কোনো কথা নহে। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের নাটক হইতে নজীর লইয়া প্রমাণ করা যায় যে লিরিকের উদ্দাম প্রবাহ অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ নাট্যরসে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নাটক, বিশেষত প্রেমমূলক কাব্যনাটকের মধ্যে লিরিকের টান একান্ত অস্বাভাবিক নহে। শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত নাটকের মধ্যে লিরিকের মন্ময়তা নাটকের তন্ময়তার সহিত এক অপূর্ব একাত্মতা লাভ করে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দৃশ্যমান বস্তুজগতের ঘটনার আবর্তে ঘূর্ণ্যমান থাকিয়া মাঝে মাঝে দূরস্থিত ভাবজগতে তাঁহার কল্পনা-বিলসিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভালোবাসেন।[১] 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে কবির কল্পনা-বিলাস অনেক জায়গায় সীমা অতিক্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও মনে হয় কবিতার প্রতি পদক্ষেপে, গানের প্রতি সুরমূর্ছনায় এক সকরুণ ব্যর্থ প্রেম ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। লিরিকের রম্য জগতের মধ্যে স্থাপিত হওয়াতে কুমার ও ইলার প্রেম এক রোমান্টিক বিষাদ সুন্দর রসে পরিস্নাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম যেন এক বেদনাভরা কম্পমানা রাগিণীর ন্যায় ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল।

কুমার ও ইলার প্রসঙ্গে 'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্যতর আপত্তি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব। কবি বলিয়াছেন, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত'। কবির এই উক্তি আংশিক সত্য মাত্র, পুরাপুরি সত্য কখনই নয়। এ-কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে 'রাজা ও রাণী' নাটকের শেষ দিকে কুমার ও ইলার কাহিনী অত্যধিক প্রাধান্য লাভ

১। The dramatic is distinguished from the lyrical in that the latter depends almost wholly on the expression of the poet's personality, whereas the former must ever fuse into a single unity the objective and the subjective.
World Drama by A. Nicoll, P. 914

করাতে বিক্রম ও সুমিত্রার মূল কাহিনী খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে; তথাপি এ-কথা বলা নিতান্ত অন্যায় যে, তাহাদের কাহিনী নাটকের মধ্যে 'শোচনীয় রূপে অসঙ্গত'। মূল কাহিনীর অন্তর্গত উপকাহিনীর উদ্দেশ্যই হইল ঘটনাসাদৃশ্য (Parallelism) অথবা বৈসাদৃশ্য (Contrast) দ্বারা মূলকাহিনীকে রসঘন ও আবেগচঞ্চল করিয়া তোলা। কুমার ও ইলার বৃত্তান্তও এই নাটকে ভাব ও আদর্শের বৈসাদৃশ্য দ্বারা বিক্রম ও সুমিত্রার কাহিনীকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে অন্তর্বিরোধ, আর কুমার ও ইলার প্রেমে রহিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্য। অবশ্য দুই প্রেমেরই পরিণতি ঘটিয়াছে বিষাদে ও ব্যর্থতায়—প্রথম ক্ষেত্রে চরিত্রগত ভ্রান্তি ও মোহের ফলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাহ্য শক্তির প্রতিকূলতার ফলে—একটিতে Othelloর পরিণতি আর একটিতে Romeo-Juliet-এর পরিণতি। অন্য ভাবে বলা যায় বিক্রম-সুমিত্রা এবং কুমার-ইলার পরিণাম হইয়াছে যথাক্রমে ট্র্যাজিক ও প্যাথেটিক। দুইটি কাহিনীর চরিত্র আলোচনা করিলেও সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষিত হইবে। বিক্রমের আসক্তি লালসায় অন্ধ এবং কর্তব্যেব প্রতি পরাঙ্মুখ, কিন্তু কুমারের অনুরাগ ত্যাগসিদ্ধ এবং কর্তব্য-সচেতন। সুমিত্রা বৃহত্তব কল্যাণের আদর্শে উদ্বোধিত হইয়া তাহার অন্তরকামনা নিরুদ্ধ, এমন কি রাজার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছেন, অথচ ইলা তাহার উদ্বেলিত বাসনার উচ্ছ্বসিত ধারায় কুমারের অন্তর ধৌত করিয়া দিয়াছে। দুই কাহিনীর মধ্যে ভাব ও চরিত্রগত বৈপরীত্য দ্বারা যে নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা ছাড়াও কুমার-ইলার কাহিনী অন্য প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছে। ইলার প্রবল ও অচঞ্চল প্রেম স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য রাজার হৃদয়ে উষর প্রতিহিংসাজ্বালা নির্বাপিত করিয়া ক্ষমাসুন্দর স্নেহের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।[১] রাজার মুখেই তাঁহার অন্তরের পরিবর্তন প্রকাশিত হইয়াছে—

> আমি কোন সুখে ফিরি
> দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
> অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
> কোথা আছে কোন স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
> প্রস্ফুটিত শুভ্র-প্রেম শিশির-শীতল।

১। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্যের মত উল্লেখযোগ্য—'ইলার প্রবল প্রেম প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজাকে আবাব স্নিগ্ধ স্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে; রাজার দুর্দান্ত হিংস্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে।'

নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (২য় খণ্ড), পৃঃ—১৮৯

ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্ত-কলুষিত।

'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে বিরূপ হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'তপতী'র মধ্যে উচ্চতর নাট্যকলা-কৌশলের পরিচয় আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে ইলা ও কুমারের কাহিনী যদি কবির মতে 'উপসর্গ' হইয়া থাকে, তবে 'তপতী'র মধ্যে 'নরেশ ও বিপাশা'র কাহিনী কি প্রবলতর উপসর্গ হয় নাই? 'লিরিকের প্লাবন' বলিয়া কবি 'রাজা ও রাণী'কে অভিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু নরেশ ও বিপাশার ঘর-ছাড়া পথচারী-জীবনের কথায় ও গানে তো এই লিরিকের ছন্দই ধ্বনিত হইয়াছে। কুমারসেন, চন্দ্রসেন, শঙ্কর প্রভৃতি চরিত্র 'রাজা ও রাণী'তে যেরূপ সজীব ও সংঘাতশীল ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছিল 'তপতী'তে তাহাদের চরিত্রের সেরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। তাহারা এই নাটকে অস্ফুট, অপূর্ণ ও অকারণ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববর্তী নাটকে নাটকীয় পরিবেশের যে জটিল বিস্তৃতি এবং আবেগ ও প্রবৃত্তির যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব দেখানো হইয়াছে পরবর্তী নাটকে সেগুলির নিতান্তই অভাব। 'রাজা ও রাণী'তে যদি হৃদয়ের আতিশয্য বিসদৃশ হইয়া থাকে, তবে 'তপতী'তে মননের প্রাচুর্যও বিগর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আগের নাটকে বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে যে তীব্র প্রবৃত্তির সংঘাত ও সুচঞ্চল ক্রিয়াশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরের নাটকে তাহার অভাব খুবই চোখে পড়ে। কেবল সুমিত্রার চরিত্রায়ণে 'তপতী'র উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে সুমিত্রার চরিত্র শেষদিকে নিষ্ক্রিয় ও বর্ণহীন, কিন্তু 'তপতী'তে তাহার চরিত্র ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া এক ত্যাগসিদ্ধ অগ্নিতপ্ত মহিমা লাভ করিয়াছে।

'রাজা ও রাণী'র মধ্যে বিক্রমদেবের চরিত্র দুর্বার অন্তঃপ্রবৃত্তির দুষ্প্রতিরোধ্য তাড়নায় যে নিদারুণ ট্র্যাজিক দুঃখের গৌরব লাভ করিল বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা কমই আছে। বিক্রমদেব প্রবল হৃদয়বান মানুষ। তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় অনুনয়ে সুমিত্রার কাছে লুটাইয়া পড়িল। মহাসিন্ধু তাঁহার ঘরে, তবুও তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, সেই শুষ্কতা তাঁহার শিরা-উপশিরায় শত প্রদাহের সৃষ্টি করিল। সুমিত্রা এই প্রদাহ নিবারণ করিতে পারিতেন, স্নিগ্ধ-শীতল প্রতিদানের দ্বারা তিনি সেই ঊষর, অনুর্বর চিত্তভূমিতে কল্যাণ ও কর্তব্যের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু

তিনি তাহা না করিয়া রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যে আগুন রাজার ভিতরে জ্বলিতেছিল, তাহা প্রতিহিংসার লেলিহান সহস্রশিখারূপে ছড়াইয়া পড়িল চতুর্দিকে। কিন্তু ইহার শেষ কোথায়, শান্তিই বা কোথায়? হিংসায় শান্তি নাই, যুদ্ধে শান্তি নাই,—সেই নিষ্ঠুর পলাতকা নারী এখনও দূরে, তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে—হিংসার অন্তরাল হইতে বিক্রমের প্রেমিক আত্মা কাঁদিয়া উঠিল। রেবতীর ক্রূর ও হিংস্র মুখমণ্ডলে তিনি নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অন্যায় ও হিংসার পথে চলিতে চলিতে তিনি থামিলেন। তারপর ইলার ত্যাগনিষ্ঠ, অবিচল প্রেমের পুণ্যজ্যোতি-স্পর্শে তাঁহার চিত্ত হইতে লোভ ও হিংসার কুৎসিত আবরণ খসিয়া পড়িল, স্নিগ্ধ ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হইয়া তাহার আত্মা এক নবজন্ম লাভ করিল। বিক্রমদেবের আসল পরিবর্তন এইখানে। সেজন্য শেষ দৃশ্যে যে আত্যন্তিক দুঃখের অবতারণা করা হইল তাহা কাহিনীর অনিবার্য পরিণাম নহে। বিক্রমের মন কুমারকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বিক্রমের পরিবর্তন কুমারের জানা ছিল না বলিয়াই সে আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং তাহার কর্তিত মস্তক আনিয়া শোকে অভিমানে সুমিত্রা প্রাণত্যাগ করিলেন; ইতিপূর্বেই যে প্রতিহিংসাময় বিক্রম মনুষ্যত্বের নবদীক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। ভ্রান্ত ধারণা ও নিয়তি-নির্দিষ্ট অপ্রতিরোধ্য ঘটনাপরম্পরায় নাটকে দুঃখাবহ পরিণতি ঘটিল।

রবীন্দ্রনাথ ভোগকে ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধ এবং সংযত করিবার কথা বহুস্থানে বলিয়াছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' উপনিষদের এই বাণী কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। যে প্রেম কামনার সুড়ঙ্গপথে চলে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার রাজপথে বিচরণ করে না; সংসারের অশেষ প্রকার কর্তব্য নিয়ত 'অয়মহং ভো' বলিয়া আহ্বান জানাইতেছে, যে প্রেম তাহা শুনিতে পায় না, সেই প্রেম শুভ, মঙ্গলদায়ক নহে, অশান্তি ও অতৃপ্তি তাহার একমাত্র পরিণাম, ইহা ভারতীয় সাধনা-নিমগ্নচিত্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। 'রাজা ও রাণী'তে নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধারা একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেজন্য অনেক স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ইহাতে আছে। কুমারের কর্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা—এইগুলি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ক্রিয়াময় নাটকের যথার্থ পরিচায়ক নহে।

॥ বিসর্জন (১৮৯০)॥ 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের অন্যতম। হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার কখনো প্রকৃত ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে

না ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের মানব-সত্তা সৃষ্টির শান্তি ও কল্যাণের মধুর দিকটিই বরাবর উদ্বোধন করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের অহিংসাতত্ত্ব তাঁহার জীবন-দর্শনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং চিরকাল ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ধর্মের নামে আমাদের দেশে সহিংস ব্যাপার ঘটিয়া আসিতেছে, কবি তাহা কোনোদিন সমর্থন করিতে পারেন নাই। কবির ধর্ম বিশেষ করিয়া তাঁহার গভীর মানবতা-বোধ হইতে উদ্ভূত, সর্বব্যাপী প্রেম এবং কল্যাণের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র মধ্যে হিংসার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত, তাহারই পূর্ণতর এবং বিশিষ্টতর রূপ 'বিসর্জন' নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে। নাট্যকার তাঁহাব তত্ত্ব বিকাশ করিয়া তুলিলেন যেমন একদিকে দুঃখাবহ ট্র্যাজেডির করুণ বসেব মধ্য দিয়া, তেমনি আবার ইতর লোকের নির্বোধ বিশ্বাসকে পরিহাসের স্নিগ্ধ আঘাতের দ্বারা।

'বিসর্জন' নাটকের নাটকীয় গুণ এবং মঞ্চ-সাফল্যের কারণ ইহার অসাধাবণ আবেগময় বিরুদ্ধ শক্তির সবল সংঘর্ষ। নাটকের মধ্যে যেন মুহুর্মুহুঃ দ্রুত ধাবমান মেঘেব পরস্পব-ঘর্ষণে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম এবং প্রতাপ। বঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।'[১] দুই প্রধান শক্তির সংগ্রামে গুণবতী বঘুপতিব সহায়ক হইয়াছিলেন, এবং অপর্ণা রাজাব সহযোগিতা করিয়াছিল। রঘুপাত ক্রুদ্ধ সাগব তবঙ্গের ন্যায় চতুর্দিকে শব্দময় ফেনময় আবর্ত রচনা করিযা উপর্যুপাব আঘাতেব দ্বাবা সম্মুখস্থ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য অচল, অটল পর্বতের ন্যায় তাঁহার সমস্ত আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া স্থির আসনে অকম্পিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। বঘুপতি বিত্তহীন, সহায়হীন পুবোহিত ব্রাহ্মণ মাত্র, অথচ তাঁহাকে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাব বিরোধিতা করিতে হইয়াছে ; সেইজন্য তাঁহার মানসিক শক্তি, বাক্যবল এবং জিগীষাবৃত্তির এরূপ অসামান্য প্রভাব দেখাইতে হইয়াছে যাহাতে তাঁহাকে সর্বক্ষমতাবান রাজাব যোগ্য প্রতিপক্ষ

১। 'রঘুপতিকে বড করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পাত্রগণের মুখে দুর্বল যুক্তি ও ব্যবসায়ের ভাকতা প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহাব নায়কের প্রতি অবিচার করেন নাই।'
'রবীন্দ্র-জীবনী'—প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়, ২১৩ পৃঃ।

বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দমাণিক্যকে কবি জয়যুক্ত করিলেও তাঁহার বিপরীত শক্তিকেও হীন এবং খর্ব না করাতে নাটকের চিত্তচাঞ্চল্যকারী আবেগময় ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুপতি শাস্ত্রাচার এবং সংস্কারনিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক, তাঁহাকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার শক্তিকে লঘু করিয়া লাভ নাই। নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন রঘুপতি তাহা মানিয়া লওয়াতে সেই সত্যের জয় ঘোষিত হইল বটে, কিন্তু সেই জয়ে গৌরব কোথায়? যে বজ্র বিরাট ধ্বংস সাধন করিতে পারিত তাহাকেই যেন কৌশলে তারের সাহায্যে মাটিতে চালান দেওয়া হইল। ভাগ্যের ক্রূর চক্রান্তে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারই হৃদ্‌পিণ্ডরূপ জয়সিংহকে উৎপাটন করিয়া দিল, তাঁহার রুদ্রতেজ, অমিত বলবীর্য মাটিতে মিশিয়া গেল। সেই অবস্থায় একটা নূতন তত্ত্ব আশ্রয় করিলেও তাঁহার চরিত্রের ট্র্যাজিক স্বরটি কেবল আমাদের কানে বাজিতে থাকে। তাঁহার নূতন জীবনকে আমরা সাগ্রহ চিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। রঘুপতি আমাদের উৎসুক, কম্পমান চিত্তকে একরূপভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন যে তাঁহার প্রতিপক্ষ গোবিন্দমাণিক্য সত্যাশ্রয়ী হইয়াও আমাদের চিত্তজয়ী হইতে পারেন না। তাহার শক্তি ও বীর্যবত্তার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই বটে, কিন্তু সেই প্রভাবের বিকাশ আমরা নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করি না। তাঁহার ভাব এত অন্তর্মুখী, আবেগ এত সমাহিত এবং কথা এত শান্ত যে তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়।[১] তাঁহার এই স্থির, নিস্তরঙ্গ বারিধিসদৃশ হৃদয়ে মাত্র একবার তরঙ্গবিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছি,—যখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার নির্বাসন-আজ্ঞা প্রদান করেন। রঘুপতি এবং গোবিন্দমাণিক্য— এই দুই বিপক্ষ শক্তির আকর্ষণে তীব্র দোলায়মান অবস্থার মধ্যে জয়সিংহ বিরাজ করিয়াছে। একদিকে ধর্ম এবং গুরুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে নবজাগ্রত সত্যবোধ—এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব তাহার জীবনকে নিতান্ত করুণ ও বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিশেষে আত্মবিসর্জনের দ্বারা সে সব দ্বন্দ্বের নিরসন করিল। জয়সিংহের বিসর্জনে রঘুপতির আসল পরাজয় এবং পরিবর্তন, সুতরাং এই বিসর্জনই নাটকের তত্ত্বকে সার্থক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ

১। 'গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে, তাহার মধ্যে কোনো বিরা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই। প্রতি মুহূর্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই।'

'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১ম সং) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—৩১৯ পৃঃ।

বলিয়াছেন—'যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল মনে হয়, কার্যত তারই জয় হল।'[১] কিন্তু জয়ী শক্তিকে প্রকাশ করিলেও তাহার চরিত্র আবেগ-চাঞ্চল্যের দ্বারা, ভাবের দ্বন্দ্ব দ্বারা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।[২] 'বিসর্জন'-এর মধ্যে শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধেও যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ রহিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য কেবল যে বলিদান বন্ধ করিয়াছেন তাহা নয়, প্রতিমার প্রতি যেন ভক্তিও তাঁহার নাই। রঘুপতি নিজের অপরাধ প্রতিমার উপরে চাপাইয়া তাহাকে বিসর্জন দিয়া যেন সর্বদোষমুক্ত হইল, শান্তিলাভ করিল, দেবীর প্রতি তাহার আজন্মবিশ্বাস এবং ভক্তি মিথ্যা বলিয়া বুঝিল।

'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে কয়েক জায়গায় অসঙ্গতি এবং অপূর্ণতা চোখে লাগে। প্রভুভক্ত চাঁদপাল কিভাবে বিদ্রোহী হইয়া পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুণবতীর ধ্রুবহত্যার ষড়যন্ত্র আকস্মিক, অস্ফুট এবং পূর্বাপর যোগরহিত।[৩] যে নারী এইরূপ নৃশংস কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ হইয়াছে কিনা, এবং তাহার শান্ত নিরুদ্বেগ পরিণতি সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়।

॥ চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ॥ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কয়েকখানি নাটিকা রচিত হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যখানিও তিনি মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে পঞ্চদশ অধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনী বর্ণিত আছে। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বাদশবর্ষের জন্য বনবাসে যাত্রা করিলেন নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মণিপুর রাজ্যে উপনীত হইলেন। মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, 'রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ভ্রমণ সময়ে অর্জুন

---

১ পরিশিষ্ট 'বিসর্জন (শান্তিনিকেতন ... ন' অধ্যাপনাকালে ... কর্তৃক কথিত)।

২ 'অপর্ণা একটি আইডিয়ার বাহন, কোনও জীবনের প্রকাশ নয়, এজন্য সে একটি মানব কন্যারূপে তাহার মধ্যে বাস্তব ফুটিয়া উঠে নাই।'

'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১ম খণ্ড) —ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ৩১০ পৃ'

৩। 'But it comes far too late more than half way through, is made little of and handled very half heartedly. *Rabindranath* by Thompson, p 98 99

তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন।'[১] রাজার কাছে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মণিপুররাজ বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্রকামনায় অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। ভগবান ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া "তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। ভরতর্ষভ, আমার পূর্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা, সুতরাং আমি ইঁহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইঁহা দ্বারা বংশরক্ষা হইবে, এই আশায় আমি ইঁহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ইঁহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে। হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে।'[২] অর্জুন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন এবং তিন বৎসর কাল মণিপুর রাজ্যে কাটাইয়া পুত্রের জন্মের পর চিত্রাঙ্গদার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

মহাভারতের এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপান্তরিত হইল। এই রূপান্তর নাটকের বাহ্য ও আন্তর উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাহ্য ঘটনার দিক দিয়া বিচার যদি করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এই নাটকের পরিবেশ রাজপুরীতে নহে, রমণীয় প্রকৃতির মধ্যে স্থাপিত। অর্জুন কর্তৃক চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান, অর্জুনকে পাইবার জন্য চিত্রাঙ্গদার সাধনা, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগবিলাস, চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয়দান, ইত্যাদি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত ঘটনা নাট্যকাহিনীর মধ্যে জটিলতা ও কৌতুহলোদ্দীপকতা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে নাটকের আন্তর ক্ষেত্রে। মূল কাহিনীর স্থূল ঘটনারূপকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি বিশেষ ভাবতত্ত্বের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। সেজন্য এই কাব্যনাট্যটিতে বাইরের ঘটনা অপেক্ষা মর্মাশ্রয়ী ভাবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের ভাবতত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, নরনারীর প্রেমসম্বন্ধ অবলম্বন করিয়াই ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। নরনারীর প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিভাবে বিবর্তন লাভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিলেই 'চিত্রাঙ্গদা'র

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।
২। ঐ

অন্তর্নিহিত প্রেমতত্ত্বটি বুঝা সহজ হইবে। 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে দেহাশ্রিত প্রেমের প্রশস্তিই আমরা বেশি লক্ষ্য করি। কিন্তু 'মানসী'র সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম স্থূল ইন্দ্রিয়বিলাস হইতে মুক্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবচারী হইয়া পড়িল। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় তাঁহার প্রেম যেন একটি সূক্ষ্ম সর্বসঞ্চারী আইডিয়া রূপেই ব্যক্ত হইল। 'কল্পনা' কাব্যে মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে কবিতা দুইটিতে মদনদেবের স্থূল দেহী মূর্তি ও সূক্ষ্ম বিদেহী-মূর্তি এই দুইটি রূপ চিত্রিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বিবর্তনধারা লক্ষ্য করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে তিনি প্রেমের দেহী-মূর্তি হইতে বিদেহী-মূর্তিতে ক্রমে ক্রমে যেন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই দুইটি রূপই সত্য। দেহ সত্য, দেহাতীতও সত্য। 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথমে দেহকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তারপর তাহা দেহাতীতের সন্ধান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনেও অনেক গ্রন্থে, যথা—'মহুয়া', 'তপতী', 'শেষের কবিতা' ও 'বাঁশরী'তে নরনারীর প্রেম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রেম দেহসম্পর্কহীন, সূক্ষ্ম ভাবচারী আইডিয়া রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদার মধ্যে প্রেমের আর একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে প্রেম যৌবনের অদম্য কামনারূপে 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'—এই প্রবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া বসে, তাহা কোনো নীতির শাসন মানে না, সামাজিক বন্ধনকে স্বীকার করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম দিকে এই নীতিহীন নিয়মহীন প্রেমকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তখন তিনি প্রেয়বোধের সঙ্গে শ্রেয়বোধের একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাধাহীন যে প্রেম শুধু কেবল বাহিরের আকাশে উড়িয়া চলে, নীড়ের শান্ত আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেই তাহার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ দুই নারীর কথা বলিয়াছেন 'বলাকা' কাব্যে। তাঁহাদের একজন হইলেন উর্বশী—'বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী' আর একজন লক্ষ্মী—'বিশ্বেব জননী তাঁরে জানি।' রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমদিকে এই লক্ষ্মীই বড হইয়াছেন, চিত্রাঙ্গদার উর্বশীরূপও অবশেষে লক্ষ্মীরূপের মধ্যে পরিণতি লাভ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু উর্বশী ও লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিরদিন ছিল, সেজন্য জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রেমের লক্ষ্মীরূপ অপেক্ষা উর্বশী রূপকেই যেন বড় করিয়া তুলিয়াছেন। 'মহুয়া'র প্রেম তো বন্ধন মানে না, 'শেষের কবিতা'য় প্রেম তো সংসারের নিত্যকার সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়াছে

এবং 'বাঁশরী'তে সঙ্কীর্ণ বিবাহের গণ্ডির উপরে প্রেম অম্লান জ্যোতিরূপে বিরাজ করিয়াছে। এ-কথা কখনও বলা চলে না যে, রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' এবং প্রথম দিককার অন্যান্য রচনায় প্রেমের যে আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছে তাহাই চিরকাল অপরিবর্তিতরূপে তাঁহার অন্তরে অবস্থিত ছিল।

'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে প্রেমের কল্যাণময় পরিণতি অপেক্ষা প্রেমের সম্ভোগময় বিকাশই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। ফুলের পূর্ণতা ও পরিণতি ফল—এ-কথা সত্য; কিন্তু, চিরকালই তো ফলের সারবত্তা ও উপকারিতা অপেক্ষা ফুলের প্রগল্‌ভ হাস্যচ্ছটা ও অকারণ দেহসৌরভ আমাদের বেশি আকর্ষণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় বলিয়াছেন, 'জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি মঙ্গল ব্যাপার'। চিত্রাঙ্গদাকেও অবশেষে তিনি জননীত্বের সম্ভাবনায় মহীয়সী রূপে অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার কামিনী-রূপই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন তখন যৌবনের চঞ্চল আবেগে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত ছিল। সেজন্য তাঁহার সুস্পষ্ট তত্ত্বচেতনাসত্ত্বেও তাঁহার লেখনী উত্তপ্ত সৌন্দর্যমদিরার নেশায় আত্মহারা হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই নাটকের নায়ক-নায়িকার ভাব ও আচরণ নেপথ্য স্থান হইতে মদন ও বসন্তের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সেই মদনও বসন্তের ক্রিয়াতেই শেকস্‌পীয়রের সেই Midsummer Night's Dream-এর ন্যায় ক্ষণকালের জন্য একটি পরম রমণীয়, বিভ্রান্তকারী ও স্বপ্নময় জগৎই নাটকের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

॥ মালিনী (১৮৯৬) ॥ 'বিসর্জন' নাটক রচনার (১২৯৭) ছয় বৎসর পরে 'মালিনী' (১৩০৩) রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ছয় বৎসরের ব্যবধানসত্ত্বেও এই দুইটি নাটকের ভাবাদর্শের মধ্যে একটি অবিকল সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, নাটক দুইটির অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ কবির গভীর অন্তর স্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছিল এবং সেই বিশিষ্ট ভাবাদর্শটি কবিজীবনের তৎকালীন পর্বে তাঁহার চিন্তা ও চেতনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। ভাবাদর্শটি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে, দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধর্মাদর্শের সংঘাতের মধ্য দিয়াই উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্মসংঘাতই নাটক দুইটির মধ্যে প্রবল নাট্যদ্বন্দ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া উহাদিগকে বিশেষরূপে প্রাণবান ও গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। উভয় নাটকের মধ্যেই ধর্মসংঘাতের বিশিষ্ট রূপটি গ্রহণ করিবার কারণ, রবীন্দ্রনাথ তখন নিজেই সামাজিক জীবনে ধর্মবিরোধে

একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মের কোন্ আদর্শ ভালো এবং কোন্ আদর্শই বা মন্দ এই প্রশ্নগুলি লইয়া তিনি তখন বিতর্কমূলক ও অসহিষ্ণু মতবাদের আবর্তে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন এবং তখনকার হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্বে তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন। ব্রাহ্মসমাজের উগ্র সমর্থকরূপে তিনি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তীব্র মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে নব্য হিন্দুসমাজকে অত্যন্ত কঠোরভাবে আক্রমণ করিলেন। প্রথা ও আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মকে তিনি তৎকালীন যুগে রচিত বহু কবিতা ও প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়া আঘাত করিলেন। 'বিসর্জন' ও 'মালিনী'র মধ্যে ব্রাহ্মণশক্তি-শাসিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ অতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত প্রথাগত হিন্দুধর্মের স্থানে তিনি কোন্ ধর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন? গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা ও মালিনী প্রচারিত ধর্মই যে নাট্যকারের অভীষ্ট ধর্ম সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধর্মের কি নাম দিব? হৃদয়ধর্ম, কল্যাণধর্ম, অথবা সাধারণভাবে মানবধর্ম বলা যাইতে পারে। এই ধর্ম বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ ও প্রচারিত ধর্ম হইলেও বাহজগতের একটি বহুব্যাপ্ত ধর্ম হইতে ইহার প্রাণপ্রেরণা আসিয়াছে। সেই ধর্ম হইল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের আদর্শ 'বিসর্জন'-এর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে এবং 'মালিনী'তে প্রকাশ্যরূপেই নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তিকে চালিত করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 'বিসর্জন' হইতে 'নটীর পূজা' পর্যন্ত বহু নাটকে, বিভিন্ন সময়ে রচিত অনেক কবিতায় এবং বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত নানা আলোচনার মধ্যে এই ধর্মের প্রতি কবির আগ্রহ ও অনুরাগ ব্যক্ত হইয়াছে। শুধু বৌদ্ধকাহিনী যে কবির লেখনীতে নূতন রস ও তাৎপর্যের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা নহে, সেই কাহিনীর মধ্য দিয়া কবির উদ্দিষ্ট একটি সচল ও সজীব ধর্মাদর্শ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। আচার ও অনুষ্ঠানগত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র প'ড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান ক'রে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্য এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ ক'রে, সর্বভূতে দয়া

বিস্তার ক'রে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় ক'রে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না।' বুদ্ধপ্রচারিত এই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 'বিসর্জন' ও 'মালিনী'তে নাটকীয় রস অবলম্বনে প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যতা ও নৈষ্কর্ম্য কবিকে আকর্ষণ করে নাই, এই ধর্মের প্রেমই তাঁহার মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, 'সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়, সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।' 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য এই প্রেমের আদর্শই জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া কর্মের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। জয়সিংহ এই প্রেমের আদর্শ রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিল এবং রঘুপতি হিংসা ত্যাগ করিয়া অবশেষে এই প্রেমের আদর্শেই দীক্ষিত হইলেন। 'মালিনী' নাটকে মালিনী এই প্রেমের অলৌকিক প্রেরণাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিল এবং সুপ্রিয়ের চিত্তও এই প্রেমের স্বর্গীয় আলোকে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল।

'বিসর্জন' নাটকে হিংসাত্মক বলিদানপ্রথা হইতে যে বিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সমস্যার রূপায়ণে নাট্যকার বৌদ্ধ আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হইয়াছিলেন। ধর্মের নামে জীবহিংসার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন তাহাই যেন পুনরায় বুদ্ধদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল।

মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা এক পুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভবয়ে, অপরিমাণং।

—মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। এই আদর্শ 'বিসর্জন' নাটকের মর্মমূল হইতে উৎসারিত হইয়াছে। পাণং ন হানে—প্রাণীকে হত্যা করিবে না—এই শীল নাটকের আদর্শরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব কথিত উত্তম মঙ্গলের আদর্শ রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে—

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

—লাভক্ষতি, নিন্দা, প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্ম দ্বারা আঘাত পাইলেও যাহার চিত্ত কম্পিত হয় না, যাহার শোক নাই, মলিনতা নাই, যাহার ভয় নাই—সে উত্তম মঙ্গল লাভ করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্যের মত আর কাহার চরিত্র এই মঙ্গললাভের অধিকারী? 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা-চরিত্রও বৌদ্ধধর্মের মূর্তিমতী করুণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধ আদর্শ আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এই জন্যই অহংকে নির্বাপিত ক'রে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।' মালিনী রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই অহংএর গণ্ডিবদ্ধ হইয়াই ছিল—

সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী—স্বর্ণরেণুরাশি মাঝে
মৃত জড়প্রায়।

কিন্তু কাশ্যপের দীক্ষায় যখন সে এই গণ্ডি হইতে মুক্তি পাইল তখনই সে জগতের পরিপূর্ণ আনন্দলোকের সন্ধান লাভ করিল। তখন সে অনুভব করিল—

জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।

বাহিরের আহ্বানে সে যখন তাহার প্রেম লইয়া সাড়া দিল তখনই সে অনির্বচনীয় আনন্দ পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করিল -

আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

ক্ষেমঙ্কর তাহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও সে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছে এবং তাহার প্রণয়াস্পদ সুপ্রিয়কে হত্যা করা সত্ত্বেও সে তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে। মালিনীর এই আচরণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত আদর্শই তো জয়যুক্ত হইয়াছে। সমস্ত জগতের প্রতি বাধা-শূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করাকেই তো ব্রহ্মবিহার বলে। এই ব্রহ্মবিহারে মালিনী-চরিত্র সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। 'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ সুপরিস্ফুট হইলেও মালিনীর চরিত্রের স্থানে স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সুপ্রিয়-চরিত্রে এই আদর্শচ্যুতিও লক্ষ্য

করা যায়। নাটকের ঘটনা ও চরিত্রবিচার প্রসঙ্গে পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকের ধর্মপ্রেরণায় যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিলাম। কেবলমাত্র মূল ধর্মপ্রেরণা নহে চরিত্র রূপায়ণের দিক দিয়াও উভয় নাটকের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। রঘুপতি ও ক্ষেমঙ্কর, অপর্ণা ও মালিনী এবং জয়সিংহ ও সুপ্রিয়ের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য ও গুণবতীর সহিত যথাক্রমে 'মালিনী' নাটকের রাজা ও মহিষীর সাদৃশ্যও আবিষ্কার করা চলে, তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক ও বহির্গত। এখানে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের একরূপতা নাই। অবশ্য চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়—'বিসজন'-এর গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ চরিত্র 'মালিনী'র রাজা ও সুপ্রিয় চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল ও জীবন্ত। রঘুপতি অপেক্ষা ক্ষেমঙ্কর-চবিত্রেব বলিষ্ঠতা ও অনমনীয় দৃঢতা বেশি, ক্ষেমঙ্করের পরিণতিও রঘুপতির পরিণতি অপেক্ষা অধিকতর মহিমাব্যঞ্জক ও নাট্যরসাত্মক। কিন্তু রঘুপতি-চরিত্রের বিস্তৃতি, দ্বন্দ্বময়তা ও সুগভীব বেদনাময়তা ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায় নাই। একমাত্র মালিনী-চরিত্রই 'বিসর্জন'-এর অনুরূপ চরিত্র অপেক্ষা বেশি পূর্ণতা ও সার্থকতামণ্ডিত। অপর্ণা অস্পষ্ট ও অস্ফুট চরিত্রের ভাবসঙ্কেতমাত্র, কিন্তু মালিনী ভাবাবেগময়ী ও ব্যক্তিত্বশালিনী চরিত্র, সমস্ত নাটকের মধ্যে তাহার সত্তা সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে।

'বিসর্জন' ও 'মালিনী'র মধ্যে ভাবগত ও চরিত্রগত অনুরূপতা থাকা সত্ত্বেও উভয় নাটকের নাট্যশিল্পগত অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। 'বিসর্জন', 'রাজা ও রাণী'র ন্যায় শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে রচিত একখানি সার্থক রোমান্টিক নাটক। শেক্সপীয়বের রোমান্টিক নাটকের ন্যায় 'বিসর্জন'-এর অঙ্কসংখ্যা পাঁচটি, প্রত্যেকটি অঙ্ক আবাব বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। নাটকেব সংলাপ কোথাও পদ্যে ও কোথাও বা গদ্যে বচিত, উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রের পাশাপাশি নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে দুর্দমনীয় আবেগ ও প্রবৃত্তির সংঘাত রূপায়িত হইয়াছে। করুণ ও গম্ভীর রসের পাশে তরল কৌতুকরসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকের কাহিনী উপধারায় বিভক্ত হইয়া জটিলতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। খাঁটি রোমান্টিক নাটকের এই লক্ষণসমূহের অনেক-গুলিই 'মালিনী' নাটকের মধ্যে বর্তমান নাই। 'মালিনী'তে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ নাই। শুধুমাত্র চারিটি দৃশ্যে নাটকের ঘটনা বিভক্ত। নাটকের সংলাপ শুধু পদ্য

ছন্দেই রচিত। কাহিনীর উপধারা, চরিত্রবৈচিত্র্য ও বিভিন্ন রসের মিশ্রণও ইহাতে নাই।

'মালিনী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ইহার নাট্যরীতিসম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি শেক্সপীয়রের নাট্য-রীতি বর্জন করিয়া 'সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন' নাটক রচনার আদর্শই 'মালিনী'তে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ট্রেভেলিয়ানের মুখে রবীন্দ্রনাথ গ্রীক নাট্যকলার সহিত 'মালিনী'র সাদৃশ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। এই গ্রীক নাট্যকলার ব্যাখ্যাই 'সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন'—এই কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রীক নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যের কথাই স্পষ্টত উপরিউক্ত বাক্যের মধ্যে আভাসিত হইয়াছে। অ্যারিষ্টটল অবশ্য ঘটনা-ঐক্য ও সময়-ঐক্যের কথাই বলিয়াছেন, স্থান-ঐক্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা-ঐক্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'One action, a complete whole', অর্থাৎ ঘটনা হইবে—একটি, সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ। সময়-ঐক্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'Tragedy endeavours to keep as far as possible within a single circuit of the sun', অর্থাৎ ট্র্যাজেডি একদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। স্থান-ঐক্যের কথা অ্যারিষ্টটল না বলিলেও একই কোরাস দলের উপস্থিতির জন্য গ্রীকনাটকের মধ্যে স্থানের বৈচিত্র্য আনা অস্বাভাবিক ছিল। 'মালিনী' নাটকে গ্রীকনাটকের এই ত্রিবিধ ঐক্য যে নিখুঁতভাবে রক্ষা করা হইয়াছে তাহা নহে। এই নাটকের দৃশ্যগুলি প্রাসাদ-অন্তঃপুর, মন্দির প্রাঙ্গণ ও রাজ-উপবনের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং স্থানের কোনো ঐক্য ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। সময়ের ঐক্যও যে এই নাটকে বজায় রহিয়াছে তাহাও নহে। প্রথম তিনটি দৃশ্যের মধ্যে অবশ্য একটা অবিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে বটে, কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যের ঘটনা ঘটিয়াছে অনেক পরে। এই চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যেই নাটকের সময়গত ঐক্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ঘটনাগত ঐক্যের দিক দিয়া আলোচ্য নাটকখানি গ্রীকনাটকের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। এই নাটকের ঘটনার মধ্যে কোথাও কোনো শিথিলতা, অপ্রয়োজনীয়তা কিংবা পার্শ্বমুখীনতা

নাই। ঘটনাগত এই পরিমিতি ও সংহতির জন্য এই নাটকের মধ্যে একটি ক্লাসিক বাঁধন আসিয়া গিয়াছে। পদ্যছন্দে আদ্যন্ত রচিত বলিয়া ইহাতে গ্রীকনাটকের অবিমিশ্র ও নিয়মনিয়ন্ত্রিত একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গিই যেন ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু গ্রীকনাটকের সঙ্গে এই নাটকের বহিরঙ্গগত কিছু মিল থাকিলেও অমিলও যথেষ্ট রহিয়াছে। গ্রীকনাটকের সেই অদৃশ্য ও অলঙ্ঘ্য দৈবশক্তির লীলা এখানে নাই। শেক্‌সপীয়রের নাটকের ন্যায় এই নাটকেও চরিত্রগত প্রাধান্যই বর্তমান এবং চরিত্রের ভাব ও আচরণের মধ্য দিয়াই তাহার পরিণতিও অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রের যে প্রবল আবেগ ও সংঘাত এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা রোমান্টিক নাটকের মধ্যেই সুলভ ও স্বাভাবিক। চরিত্রগত যে সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও অন্তর্মুখীনতা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে সে-সব বৈশিষ্ট্যও রোমান্টিক চরিত্রের মধ্যেই সাধারণত দেখা যায়। প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াই গ্রীক নাটক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদর্শ রোমান্টিক ধর্মাবেগে ভাসাইয়া দেওয়াই হইল এই নাট্যরচয়িতার উদ্দেশ্য। পরিশেষে ইহাও বলা যায়, গ্রীক নাটকের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব, পটভূমির সুবিপুল বিস্তৃতি এবং সুমহান ভাবগাম্ভীর্য কিছুই 'মালিনী'র মধ্যে পাওয়া যায় না। এই নাটকসম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই বলা চলে যে, বহির্গত শিল্পকলার দিক দিয়া গ্রীক নাটকের সহিত ইহার কিছু কিছু মিল থাকিলেও ভাবায়ন ও চরিত্রায়ণের দিক দিয়া রোমান্টিক নাটকের সহিতই ইহার সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই নাটকে প্রচলিত শেক্‌সপীয়রের নাট্যরীতি বর্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে নূতন নাট্যরীতির পরিচয় দিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট সাহস ও মৌলিকতার স্বাক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালে নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত হয় 'মালিনী' নাটকে। এই নাটকে নাট্যকার অঙ্ক তুলিয়া দিয়া শুধুমাত্র কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৃশ্যগুলি অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্য নহে, ইহারা অঙ্কেরই অনুরূপ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং 'মালিনী' নাটকের চারটি দৃশ্য চারটি অঙ্কেরই নামান্তর মাত্র। 'মালিনী' নাটকটিকে কেহ কেহ ভুল করিয়া একাঙ্ক নাটক বলিয়া থাকেন। একাঙ্ক নাটকের অখণ্ডতা ও স্বল্পবিস্তৃতি তো ইহাতে নাই-ই, অঙ্কের একতাও ইহাতে নাই। দৃশ্যবিরহিত, একমাত্র অঙ্কসম্বল নাটক ছিল আমাদের প্রাচীন

সংস্কৃত নাটকগুলি এবং আধুনিক ইবসেনীয় নাটকসমূহ। এই অঙ্কবিভাগের দিক দিয়া, 'মালিনী' সংস্কৃত নাটক ও ইবসেনীয় নাটকের সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

'মালিনী' নাটকের ভাবাদর্শ ও নাট্যকলা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আলোচনা করা হইল। এবার আমরা নাটকটির ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট বক্তব্য ইহাতে কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে সেই বিচার করিব। নাটকের 'সূচনা'য় নাট্যকার বলিয়াছেন, "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উন্মুক্ত শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।" স্পষ্টতই এই ধর্মপ্রেরণা নাটকের প্রধান চরিত্র মালিনীর মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কাশ্যপের দীক্ষায় মালিনী অহং-এর গণ্ডি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উন্মুক্ত বিশ্বজগতে সর্বমানুষের মধ্যে প্রেম ও করুণার মূর্তিমতী ধারারূপে প্রবাহিত হইল। প্রাসাদের নিরাপদ আরাম, জননীর উদ্বেগকাতর স্নেহ, পিতার করুণ নিষেধ কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মহাসাগরের আহ্বান যখন গিরি নদীর প্রাণ চঞ্চল করিয়া তোলে তখন কি সে নিরাপদ গুহার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে? পাথরের বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আকাশের ঝড় ও বজ্র তাহাকে উল্লাসে স্ফীত করিতে থাকে। মালিনী তাহার আত্মীয়জনের স্নেহসম্পর্ক উপেক্ষা করিয়াছে বিশ্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তার আশায়। বড় স্নেহের জন্য এমনিভাবে ছোট স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব করিয়াছিলেন এবং বোধ করি বিশ্বকল্যাণে উদ্বুদ্ধ সকল মহৎ ব্যক্তিই এভাবে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্নেহের মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মালিনী যখন বিদ্রোহী ও উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাইয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া বসিল তখনই তাহার আদর্শের চরম সার্থকতা ঘটিল। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের দংশনোদ্যত ফণা যেন সুমধুর বংশীরবে সম্মোহিত হইয়া পড়িল। এমনিভাবে অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায়, ক্ষমার দ্বারা প্রতিহিংসাকে বশীভূত করিতে হয়, প্রেমের দ্বারা শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা সম্ভব হয়। তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত 'মালিনী' রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্বের সার্থক বাহন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর যে চরিত্র আমরা দেখিলাম তাহা একেবারেই স্বতন্ত্র এবং বলা যাইতে পারে, মালিনীর এই রূপ পূর্ববর্তী দৃশ্যসমূহে ব্যক্ত রূপের বিরোধী এবং রবীন্দ্রনাথের

অভীষ্ট ভাবাদর্শের সহিত সঙ্গতিহীন। চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীকে সুপ্রিয়ের মুখোমুখি রাজ-উপবনের মধ্যে দেখিলাম। অনন্ত, উন্মুক্ত জগৎপ্রান্তরে যে নিজের জীবনধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় উপবনের শান্তমধুর, নিরালা পরিবেশে দেখিলাম। খাঁচার পাখীটি যেন নীল আকাশে সীমাহীন আলোকে ঠাঁই না পাইয়া পুনরায় খাঁচায় ফিরিয়া নিশ্চিন্ত হইল। যে মালিনী তাহার এক আলোকদীপ্ত মুহূর্তে বলিয়াছিল, 'জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে,' সে-ই আজ করুণ নেত্রে সুপ্রিয়কে একান্ত নির্ভর করিবার জন্য ব্যাকুল। প্রতিকূল প্রজাদের আপন করিবার জন্য যে সকলের বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করিয়াছিল সে-ই এখন দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের সহিত দেখা করিল না। যে নারী একদিন বিশ্বজনের আহ্বান শুনিয়া বলিয়াছিল—

সর্বলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার।

সেই এখন প্রণয়পিয়াসী প্রিয়বিরহিণী সাধারণ রমণীর ন্যায় বলিতেছে—

ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায়!

যে মালিনী একদিন বিশ্বের বিপুল আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিয়াছে—

ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ।
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।

সে-ই এখন বিবাহের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ধরা দিবার জন্য উন্মুখ—

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা।

রাজার সানন্দ উক্তিতে মালিনীর শেষ পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল—

বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে!

মালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে এই উক্তিতে তাহার পূর্ব পরিচয় একেবারে ব্যর্থ ও মিথ্যা হইয়া গেল। কাশ্যপ যাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন—

ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো, সুখ-আশা,
দুঃখ, ভয়, দূর করো বিষয়-পিপাসা।
ছিন্ন করো সংসারবন্ধন, পরিহরো
প্রমোদ প্রলাপ চঞ্চলতা

তাহার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি ঘটিল। এই পরিণতি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মালিনীর চরিত্রের উপস্থাপনা (Exposition) ও বিবর্তনের স্বাভাবিক ও অনিবার্য উপসংহার হয়তো ইহা, আর না হয় ইহা পূর্ব ঘটনাসূত্র ও চরিত্রপ্রবাহের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিসমাপ্তি। মালিনী-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে ঘটনাবেগ ও ভাবধারাকে চালিত করা হইয়াছে তাহাতে মালিনীর অন্তিম গৃহাশ্রয়লোলুপ, প্রণয়রাগরঞ্জিত রূপ কখনই স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে না। গৃহের ক্ষুদ্র স্নেহনীড় ছিন্ন করিয়া বৃহৎ মানব-জীবনের মধ্যে আত্মার মুক্তি লাভ করাতেই মালিনী-চরিত্রের সার্থকতা, সেই সার্থকতালাভের পথে যে সমস্যা, যে বেদনা ও যে প্রতিবন্ধক আসিয়াছে তাহাতেই তো তাহার মহত্ত্ব। গৃহনীড়ের মধ্যে ধরা দেওয়াই যদি তাহার লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে জননীর সঙ্গে এত আলোচনা, পিতার সঙ্গে এত বিতর্ক, এত কঠিন সঙ্কল্প ও দুর্নিবার উদ্দীপনা,—ইহাদের কি প্রয়োজন ছিল? তবে কি মনে করিব, রবীন্দ্রনাথ মালিনীর মানবকল্যাণী রূপের অসারতা দেখাইয়া তাহার প্রেমময়ী সত্তার জয়গান করিবার উদ্দেশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহাও তো মনে করা যায় না। কারণ নাট্যকারের সচেতন ধর্মাদর্শ, ঘটনার উপস্থাপনা ও বিবর্তন, পরিবেশরচনা—কোনো দিক দিয়াই তো মালিনীর ব্যক্তিপ্রেমের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। মালিনীর মধ্য দিয়া প্রেমের আদর্শ নিশ্চয়ই মূর্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা গৃহবদ্ধ প্রেম নহে, তাহা বিশ্বের মানবাশ্রিত প্রেম। বহুকে ভালোবাসিতে হইলে একজনকে বিশেষভাবে ভালবাসিবার মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তর্কচ্ছলে বলা যায়, মালিনী বিশ্বপ্রেমের শূন্যতা উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিপ্রেমের সুরক্ষিত সীমায় আবদ্ধ হইতে চাহিল, তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিবে, কোন্ ঘটনাসংঘাতের পরিণামে, কোন্ অনিবার্য অবস্থার তাড়নায় অথবা অপরিমেয় বেদনার আঘাতে তাহার এই ব্যক্তিপ্রেম-প্রবণতা জন্মিল তাহার কোনো পরিচয়ই তো নাটকের মধ্যে পাইলাম

না। সুতরাং, একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে হয় যে, চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর যে পরিচয় পাইলাম তাহা আকস্মিক, পূর্বাবস্থার সহিত সঙ্গতিহীন ও নাটকের মূল ভাবের পরিপন্থী।

'মালিনী' নাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের প্রেরণার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বপ্নে দৃষ্ট দুই বন্ধুর কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়—এই দুই বন্ধুর চরিত্র মালিনীর আবির্ভাব ও প্রভাববিস্তারের ফলে যে বিচিত্র সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া অবশেষে সুকরুণ পরিণতি লাভ করিল তাহা নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। সুপ্রিয়কে প্রথমে ক্ষেমঙ্করের বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধুরূপেই দেখিলাম। মালিনীর ভাবোদ্দীপ্ত সত্তা তাহার মনের উপর যে সাময়িক কুহকজাল বিস্তার করিয়াছিল ক্ষেমঙ্করের তীক্ষ্ণ ও অকাট্য যুক্তির আঘাতে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং অবশেষে বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া সে বলিল—

সখে, কুহক নূতন,
আমি তো নূতন নহি। তুমি পুরাতন,
আর আমি পুরাতন।

াচরবন্ধুত্বের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্ষেমঙ্কর নিশ্চিন্ত মনে সৈন্যসংগ্রহের জন্য চলিয়া গেল। কিন্তু ক্ষেমঙ্কর চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মালিনীর কুহকজালে সে পুনরায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিল। সংযমনিষ্ঠ, ধর্মব্রত ব্রাহ্মণ তখন মালিনীকে বলিয়াছিল—

দেবী, লহ মোর ভার।
যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে, সর্ব তর্ক করি পরিহার
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

জয়সিংহ অপর্ণাকে ভালোবাসিলেও গুরুর প্রতি কর্তব্য ভোলে নাই। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে কর্তব্য—এই দুইয়ের সংগ্রামে তাহার জীবন ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বন্ধুদ্রোহী সুপ্রিয় আজন্ম নির্ভরশীল বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রণয়িনীর কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিতে উন্মুখ—

সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

মালিনী যতক্ষণ ক্ষেমঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই ততক্ষণ সে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোনো অনুতাপ ও আত্মধিক্কার কিছুই প্রকাশ করে নাই। পরে সে যে খেদ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছে তাহাও নিতান্ত কৃত্রিম ও আবেদনহীন বলিয়াই মনে হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সুপ্রিয় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও মালিনীকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে, এখানেই তো তাহার মহত্ত্ব! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মালিনীকে বাঁচাইবার চেষ্টার মধ্যে তাহার একটি ঘোর প্রেমমোহগ্রস্ত স্বার্থপরতা ছিল। মালিনীর নবধর্ম রক্ষার জন্য নহে, মালিনীর ব্যক্তিসত্তা রক্ষার জন্যই সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। যে চরিত্র এরূপ জঘন্য অন্যায় কাজ করিতে পারে তাহার মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য পুরস্কার। ক্ষেমঙ্করের হাতে যখন এই পুরস্কার সে লাভ করিল তখন তাহার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগ্রত হইল না।

ক্ষেমঙ্কর মালিনী-প্রচারিত ধর্মের প্রবলতম বিরোধী শক্তি, কিন্তু তাহার চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার মহৎ শৈল্পিক নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি-চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের শিল্পীসত্তার উপরে শেষ পর্যন্ত তাত্ত্বিক সত্তাই প্রাধান্য পাইয়াছিল, কিন্তু ক্ষেমঙ্করের চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার শিল্পীসত্তাই শেষ পর্যন্ত অপরাজিত রহিয়াছে। ক্ষেমঙ্কর হয়তো প্রথাগত ও হিংসাত্মক ধর্মের সমর্থক হইয়া ভ্রান্ত পথে চলিয়াছে। কিন্তু তাহার নিষ্ঠা, সঙ্কল্প, ত্যাগ ও উদ্যমের তুলনা কোথায়? বিস্ময়ের বিষয়, তাহার বিরুদ্ধাচারী সকলেই তাহার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। সুপ্রিয় বলিয়াছে—

> ......সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
> আমি তার মহামোহ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
> আমি তার লৌহপাশ।

মালিনী তাহার দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধাবিহ্বল ভাষায় বলিয়াছে—

> মহত্ত্বের অপমান
> মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরান
> ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

যে চরিত্র তাহার বিরুদ্ধ পক্ষেরও প্রশংসা উদ্রেক করিতে পারিয়াছে, তাহার কার্য ও আচরণের প্রতি স্বভাবতই একটা সাগ্রহ সমর্থনের ভাব আমাদের মনের মধ্যে জন্মিতে থাকে। ক্ষেমঙ্করের বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব, একক বনস্পতির ন্যায় তাহার ঋজু ও অটল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাহার অক্লান্ত উদ্যম ও জ্বলন্ত সূর্যসদৃশ সুপ্রখর

তেজস্বিতা—সমস্তই আমাদের বিস্মিত বিহ্বল শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়া রাখে। কিন্তু কেবল কাঠিন্য ও দৃঢ়তা দিয়া যদি তাহার চরিত্র গঠিত হইত তাহা হইলে তাহার চরিত্রের মধ্যে পূর্ণতা ও বিরোধজটিল নাটকীয়তা দেখা যাইত না। নারীর আকর্ষণ তাহাকেও বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ কঠিন কর্তব্যবোধের দ্বারা সে দমন করিয়াছে। কিন্তু নারীর প্রতি দুর্বলতা জয় করিলেও বন্ধুর প্রতি দুর্বলতা সে জয় করিতে পারে নাই। এবং তাহার এই দুর্বলতার ফলেই নাটকের ভয়াবহ ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুকে দুর্বলচিত্ত ও দ্বিধাচঞ্চল জানিয়াও সে তাহাকেই সব গোপন আয়োজনের কথা বলিয়াছে। বন্ধুকে শাস্তি দিবার জন্য যখন তাহার রুদ্র হস্ত প্রসারিত হইয়াছে তখনও তাহার হৃদয়ের এক প্রান্ত বন্ধুস্নেহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষেমঙ্করের মত সু-অঙ্কিত নাটকীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে খুব কমই আছে।

'মালিনী' নাটকে ঘনীভূত ও তীব্র গতিবান নাট্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষ-ভাবে সফল হইয়াছেন। নাটকের মধ্যে মালিনী ও ক্ষেমঙ্করকে আশ্রয় করিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মূল সংঘাত তো আছেই, তাহা ছাড়াও নাট্যকার বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চরিত্রসংঘাত, আকস্মিকতা ও সুতীব্র নাট্যোৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া নাট্যরস জমাইয়া তুলিয়াছেন। স্নেহব্যাকুলা মহিষীর সকাতর মিনতির সঙ্গে নবভাবোদ্বোধিত মালিনীর বহির্গামী আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা দেখাইয়া নাট্যকার প্রথম দৃশ্যে একটি চমৎকার নাটকীয় পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে মালিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহবিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মালিনীর অতর্কিত আবির্ভাবের দ্বারা যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহী প্রজাগণের চিত্তপরিবর্তনে—যাহাকে তাহারা নির্বাসন দিতে চাহিয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া তাহারা বলিল—

জয় জননীর।
জয় মা লক্ষ্মীর। জয় করুণাময়ীর।

কিন্তু এই দৃশ্যের নাটকীয়তা এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের তর্কবিতর্ক ও দুই বিরোধী আদর্শের প্রবল আলোড়নের মধ্যে দর্শকদের কৌতূহলী উত্তেজনা বারে বারে আন্দোলিত হইয়াছে। অবশেষে ক্ষেমঙ্করের প্রতি সুপ্রিয় যখন বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতি জানাইল, তখনই এই উত্তেজনা প্রশমিত হইল। তবে চরম নাটকীয়তা দেখা গিয়াছে নাটকের শেষ দৃশ্যে। ক্ষেমঙ্করের বন্দী অবস্থায় আনীত হইবার সময় হইতেই একটা অজানা ভয়ঙ্কর

সম্ভাবনার আতঙ্কে দর্শকচিত্ত কম্পমান হইতে থাকে। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়া নাট্যকার অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা অনিশ্চয়তার মাঝে দর্শকদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাকে খেলাইয়াছেন। অবশেষে আলিঙ্গনচ্ছলে ক্ষেমঙ্করের দ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে কঠিন শৃঙ্খলাঘাতে দর্শকচিত্ত অতর্কিত আঘাতে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে সুপ্রিয়ের মৃত্যু। সুপ্রিয়ের মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতকের প্রতি ক্ষেমঙ্করের নির্ভীক আহ্বান, খড়্গ আনিবার জন্য ক্রুদ্ধ রাজার আদেশ এবং ক্ষেমঙ্করের জন্য মালিনীর ক্ষমাপ্রার্থনা ও মূর্ছা প্রভৃতি আঘাতের পর আঘাত হানিয়া দর্শকচিত্তের উত্তেজনা-সহনক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলে। কিন্তু এই সর্বাত্মক উত্তেজনাতাণ্ডবের মধ্যে, এই হিংসা রক্তপাত ও শাস্তিদানের মধ্যে একটি বাক্য শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যুদ্ধের দামামা, কোলাহল ও হুঙ্কারের পরে শান্ত যুদ্ধস্থলে যেন একটি মধুর বংশীধ্বনি শুনা গেল। আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ-পীড়িত কালো মেঘের মধ্য দিয়া যেন একটি নক্ষত্রের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে'—মালিনীর এই বাণী শতপ্রকার হিংসাবিদ্বেষের মধ্যে যেন শাশ্বত ও চিরজয়ী সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

(ঘ) নাট্যকাব্য

'চিত্রাঙ্গদা' হইতে রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে নাট্যধর্মিতা অপেক্ষা কাব্যধর্মিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ,' 'রাজা ও রাণী,' এবং 'বিসর্জন' কাব্যনাট্য বলিয়া কথিত হইলেও উহারা অবিমিশ্র কাব্যছন্দ অবলম্বন করে নাই, উহাদের মধ্যে পদ্য ও গদ্য সংলাপের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কাব্যনাট্য এ-কারণেই উহাদিগকে বলা যায় যে, উহাদের সংলাপ প্রধানত কাব্যরীতিকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সাধারণ লোকের কথাবার্তা ও নাট্যস্বস্তির (Dramatic relief) জন্য কৌতুকরসাত্মক দৃশ্যেই গদ্যসংলাপের ব্যবহার করা হইয়াছে। কাব্যনাট্য কথাটিকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করিলে ইহাই উপলব্ধ হইবে যে, এই শ্রেণীর নাটকের কাব্য হইতেছে উপায় এবং নাটক হইতেছে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কাব্যরীতি অবলম্বন করিলেও ইহাদের মধ্যে নাটকীয়তাই প্রধান। এই নাটকীয়তার চরমোৎকর্ষ আমরা দেখিয়াছি 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' নাটক দুইটিতে। কিন্তু ইহাদের পর নাট্যচেতনা পুনরায় কাব্যধর্মিতার দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 'চিত্রাঙ্গদা' ও

'মালিনী'র মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাই। নাটক দুইটি অবিমিশ্র পদ্যছন্দে রচিত, বস্তুমৃত্তিকা অপেক্ষা ভাবের আকাশের দিকে তাহাদের গতি যেন প্রসারিত। কিন্তু তবুও ইহাদিগকে কাব্যনাট্যের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ এই যে, নাটকীয় সংঘাত, গতি ও ঘটনা-বৈচিত্র্য ইহাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে।

রবীন্দ্রনাথের-শেষ কাব্যনাট্য 'মালিনী' রচনায় অব্যবহিত পূর্বে ও পরে কবির কাব্যপ্রবণ নাট্যপ্রতিভা যেন পরিতৃপ্ত আত্মপ্রকাশ করিল। সেই সময়ে তিনি কতকগুলি নাটিকা রচনা করিলেন; সেগুলিতে নাট্যধর্ম অপেক্ষা কাব্যধর্মই প্রাধান্য লাভ করিল। এজন্য ইহাদিগকে নাট্যকাব্য বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে নাটক উপায় ও কাব্যই উদ্দেশ্য। 'বিদায়-অভিশাপ' এবং 'কাহিনী'র নাট্যরীতিতে রচিত কবিতাগুলি, যথা—'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'নরকবাস', 'সতী', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রভৃতি নাটকগুলিকে এই নাট্যকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা চলে। ইহাদের মধ্যে নাট্যত্ব কতখানি এবং কাব্যত্বই বা কতখানি, এবার তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

নাটকের প্রধান লক্ষণ ইহার সংলাপাশ্রিত রূপ ও নাট্যকারের নেপথ্য অবস্থিতি। সেই মৌলিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে আছে বলিয়াই নাটক হিসাবে ইহাদের আলোচনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোনো কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য তিনি কোথাও জোর করিয়া নিজেকে জাহির করিতে চান নাই। প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও মতবাদের প্রতি তিনি সমান মর্যাদা দেখাইয়াছেন। নাটিকাগুলির কোনো চরিত্রই সেজন্য হীন ও দুর্বল হয় নাই। প্রত্যেকটি চরিত্রই তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব মতাদর্শের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার তাঁহার নাটকীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাটকগুলি উপভোগ্য নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কচের মহান আদর্শকে সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু দেবযানীর ভূলুণ্ঠিত বেদনার প্রতিও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। গান্ধারীর মহীয়সী সত্যসাধিকা রূপ তাঁহার লেখনীতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সন্তানবৎসল অন্ধ পিতার নিরুপায় পক্ষপাতিত্বকেও তিনি অশ্রদ্ধা করেন নাই; এমন কি, আত্মপ্রতিষ্ঠায় জাগ্রত দুর্যোধন ও পতিপরায়ণা ক্ষত্রিয় রমণী ভানুমতীর যুক্তিও অবহেলা করেন নাই। মাতৃস্নেহবঞ্চিত কর্ণের বীরধর্ম আমাদের মনে সুগভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি উদ্রেক করে বটে, কিন্তু কুন্তীর চিরতৃষিত মাতৃত্ব ও বিফলীভূত

আশাও তো আমাদিগকে কম অভিভূত করে না। অমাবাইয়ের সতীধর্মকে নাট্যকার সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মাতা রমাবাইয়ের স্বধর্মনিষ্ঠা ও জ্বলন্ত তেজের মহিমাও আমাদের দৃষ্টি অভিভূত করিয়া রাখে। মানুষের জীবননীতি বড় জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। একটি নীতি আমরা সত্য বলিয়া ভাবি, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বিরুদ্ধ নীতি প্রবল আঘাতে আমাদের সুলালিত ভাবনাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। সত্যের সহিত মিথ্যার সংঘাতে প্রকৃত সঙ্কটের সৃষ্টি হয় না, সত্যের সঙ্গে অপর সত্যের সংঘাতেই জীবনে প্রকৃত সঙ্কট ঘনাইয়া আসে। এই সঙ্কটই নাট্যকার তাঁহার নাটকে দেখাইয়া থাকেন। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যকেই একমাত্র সত্য বলেন না। বিরুদ্ধ সত্যের সঙ্গে প্রবল সংঘাতের মধ্য দিয়াই আপন সত্যকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।

নাটকের প্রাণধর্ম নিহিত থাকে তাহার সংঘাতের মধ্যে। সেই সংঘাত আলোচ্য নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে প্রবল আকারেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই সংঘাত বিশেষ বিশেষ ভাবতত্ত্বকে আশ্রয় করিলেও ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির উত্তপ্ত স্পর্শও উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। কর্তব্যের আহ্বান ও প্রেমের আকুতি—উভয়ের প্রবল সংঘাত দেখিলাম 'বিদায়-অভিশাপ' নাটিকায়। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ কত বিচিত্র দ্বন্দ্বই না পরিস্ফুট হইয়াছে—মাতার সঙ্গে পুত্রের, পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর। এই যে অতি-নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ, এখানেই তো নাটকীয় দ্বন্দ্বের তীব্রতা! 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এও মাতা ও পুত্রের আদর্শগত বিরোধের মধ্য দিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ সত্যধর্ম জননীর স্নেহদুর্বলতার উপরে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ সত্যধর্ম স্নেহদুর্বলতার কাছে হার মানিয়াছে। এক জননী চাহিয়াছেন পুত্রকে নির্বাসন দিতে, আর এক জননী আসিয়াছেন স্নেহ-নির্বাসিত পুত্রকে গ্রহণ করিতে। একজনের পুত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে সকলকে বর্জন করিলেন, আর একজনের পুত্র সকলের জন্য নিজেকে চিরবঞ্চিত রাখিলেন। একই স্নেহসম্পর্কের মধ্যে সংঘাত কত বিচিত্র রূপ ধারণ করিতে পারে, এই দুইটি নাটিকার মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম। আবার এই সন্তান ও পিতামাতার সংঘাত 'সতী' নাটিকার মধ্যেও আমরা দেখিলাম। গান্ধারী ও রমাবাই, এই দুই তেজস্বিনী জননীই নিজেদের অত্যাজ্য আদর্শের কাছে হৃদয়ের স্নেহকে বিসর্জন দিয়াছেন—গান্ধারী পুত্রের নির্বাসন চাহিয়াছেন, আর রমাবাই কন্যাকে জীবাজীর চিতায়

সমর্পণ করিয়াছেন। গান্ধারীর উদার সত্যধর্ম ব্যর্থতা বরণ করিয়াছে, কিন্তু রমাবাইয়ের অন্ধ ধর্মনিষ্ঠার অন্তিম জয় হইয়াছে।

কেবল বহির্দ্বন্দ্ব নহে, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়া নাটকের প্রাণশক্তি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাও এই নাটিকাগুলির অনেক চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে। কচের অচঞ্চল কর্তব্যনিষ্ঠ হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গের কর্তব্যবোধ এবং দৈত্যপুরের সুখস্মৃতির দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই চরিত্রটি সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কচ অপেক্ষা অনেক বেশি জীবন্ত হইয়াছে দেবযানী, তাহার বেদনাহত হৃদয়ের পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর তাড়নার মধ্য দিয়া। কখনও সে তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে অবিচলিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই বৃক্ষসংলগ্ন লতার ন্যায় তাহার বেদনাবিদ্ধ অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া কচকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে। বিগত দিনের মধুময় স্মৃতিগুলির মোহিনী মায়ায় সে কচকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, আবার কচের স্বর্গগামী মনকে ফিরাইতে ব্যর্থ হইয়া তাহার মর্ম বিদারী দুঃখকে অভিশাপের আগুনে জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। সেই আগুন কি শুধু কচকে দগ্ধ করিল? তাহার ব্যর্থ নারীসত্তা যে চিরকাল তাহাতেই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল। কর্ণের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বই তো তাঁহার অজেয় চরিত্রকে এক মহাশূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল। একদিকে মাতৃস্নেহের স্বর্গবঞ্চিত সন্তানের মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বীরের ধর্মে চিরবিশ্বস্ত থাকিবার দুর্বার সঙ্কল্প। অবশেষে সঙ্কল্প আকাঙ্ক্ষাকে জয় করিল, কিন্তু, এই জয় আশাহীন, সুখহীন এক শূন্য পরিণামের দিকেই তাঁহার জীবনকে অলঙ্ঘ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিল। গান্ধারীর মধ্যে আমরা সত্যধর্মের জয় দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি যদি শুধু সত্যধর্মসাধিকা হইতেন তাহা হইলে তিনি মহীয়সী হইতেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হইতেন না। 'মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?'—এই কথাগুলির মধ্য দিয়াই গান্ধারীর অন্তর্বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে রাজধর্মের অস্তিত্ব একেবারে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রাজধর্মের সঙ্গে পিতৃধর্মের যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি তাহাতেই চরিত্রটি কারুণ্যরসসিক্ত নাটকীয়তা লাভ করিয়াছে। পিতা-ধৃতরাষ্ট্রের নিরুপায় সন্তান-বাৎসল্যের কাছে রাজা-ধৃতরাষ্ট্রের যুক্তি ও বিচার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; এখানেই তো চরিত্রটির যথার্থ ট্র্যাজেডি।

নাট্যঘটনার মধ্যে suspense অথবা উৎকণ্ঠা জাগাইতে পারিলেই দর্শকের

চিত্ত ঘটনার দিকে বিশেষভাবে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া উঠে। এই নাটিকাগুলির মধ্যে ঘটনার উত্থাপন ও বৈচিত্র্য তেমন নাই, সেজন্য এই নাট্যোৎকণ্ঠা খুব তীব্র ও ঘনীভূত আকারে ইহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। তবে জায়গায় জায়গায় নাট্যকার সুকৌশলে সংলাপ প্রয়োগ করিয়া দর্শকের চিত্তে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা জমাইয়া তুলিয়াছেন। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনে কর্ণের প্রকৃত পরিচয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই নাট্যোৎকণ্ঠা তিনি চমৎকারভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। 'বিদায়-অভিশাপ'-এ কচ যখন দেবযানীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছে, তখন কচের বিদায়-প্রার্থনার উত্তরে দেবযানীকে নাটিকার সূচনায় যে রকম অচঞ্চল ও সূক্ষ্ম শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখা যায় তাহাতে দর্শকচিত্ত দেবযানীর প্রকৃত হৃদয়ভাব ঠিক যেন ধরিতে না পারিয়া বিশেষ কৌতূহলচঞ্চল হইতে থাকে, তারপর—'হাসি? হায় সখা, এতো স্বর্গপুরী নয়',—দেবযানীর এই উক্তি হইতেই দর্শক তাহার যথার্থ পরিচয় লাভ করে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে দর্শকচিত্তের এই যে সংশয় ও অনিশ্চয়তাবোধ—ইহাতেই নাটক জমিয়া উঠে।

নাটকের ঘটনাধারা যদি একইভাবে প্রবাহিত হয়, যদি তাহার মধ্যে আবর্ত ও আকস্মিক তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা না যায় তাহা হইলে তাহার গতি তীব্র ও উত্তেজনাজনক হয় না। নাটিকাগুলির মধ্যে একমাত্র 'সতী' ব্যতীত ঘটনার এই তরঙ্গিত গতি, আকস্মিকতা ও দ্রুত অবস্থা-পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু চরিত্রগুলি শুধুমাত্র যদি কথা বলিত, যদি তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন না হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে কখনও নাটকীয় চরিত্র বলা যাইত না। 'বিদায়-অভিশাপ'-এ দেবযানীর শ্লেষনিপুণা রূপ কিছুক্ষণের মধ্যেই করুণ বিলাপে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তারপর কচকে ভুলাইবার জন্য অতীতের বহু সুখ-স্মৃতির উল্লেখ—কচকে যেন দেবযানী জয় করিতে সক্ষম হইল—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।...

কিন্তু, তবুও কচ বশীভূত হইল না, দেবযানী তাহাদের উভয়ের বহু আনন্দস্মৃতির সূত্রে রচিত জাল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কচ তাহাদের ভালোবাসার স্বীকৃতি জানাইয়াও নিজেকে মুক্ত রাখিল। দেবযানীর প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত নারীত্ব অবশেষে পদদলিতা ফণিনীর মতই যেন দংশন করিয়া বসিল। দেবযানী-চরিত্রের

এই বিচিত্র অবস্থাপরিবর্তনের মধ্য দিয়াই নাটকীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। কচের মানস-ভাবের মধ্যে এই বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন নাই, সেজন্য চরিত্রটি বিশেষ নাটকীয় হইতে পারে নাই। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ ন্যায়নিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানস্নেহের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে চরিত্রটির নাটকীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে। গান্ধারীর চরিত্রের মধ্যেও বিভিন্ন রূপপরিবর্তন দেখা গিয়াছে। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তিনি অনুনয়ে নম্রা, ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের উদাসীনতা ও চিত্তদৌর্বল্যের ফলে গান্ধারীর উত্তেজনা ও ক্রোধের বৃদ্ধি এবং লাঞ্ছিত নারীত্বের সমর্থনে তাঁহার অগ্নিময় অভিযোগ, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার আবেদন অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার অপমানিত মর্যাদার আর্তনাদ,—নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া চরিত্রটির নাটকীয়তা দেখা গিয়াছে। গান্ধারীর অপমান ও বেদনার আরও কিছু বাকী ছিল। পুত্রবধূ ভানুমতীকে সজ্জা ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে ও আনন্দ-উৎসব হইতে বিরত থাকিতে বলাসত্ত্বেও গর্বিণী পুত্রবধূ হেলাভরে তাঁহার সমস্ত উপদেশ ও নিষেধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজমহিষী গান্ধারী সকলের পরিত্যক্তা ও প্রত্যাখ্যাতা, নিতান্তই নিঃসঙ্গিনী। কিন্তু তাঁহার এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাঁহার মহিমা পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিল।

'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ দেখিতে পাই, কুন্তী তাঁহার গোপন জননীহৃদয় সন্তানের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাঁহাকে যেন জয় করিয়া লইলেন। মাতৃস্নেহসুধালালায়িত কর্ণ মাতার স্নেহক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে উন্মুখ ও উদ্যত—

মিথ্যা মনে হয়
রণাহংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

'পুত্র মোর' বলিয়া যখন কুন্তী তাঁহার ব্যগ্র মাতৃবাহু বাড়াইয়া দিলেন, তখনই বুঝি নাটক শেষ হইয়া গেল। কিন্তু না, কর্ণ মাতৃবাহুতে ধরা দিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে ?

এখানেই ঘটনা ঘুরিয়া গেল, ঘটনার এই আকস্মিক দিক পরিবর্তনেই নাটকীয়তা দেখা দিল। মাতৃক্রোড়প্রত্যাশী কর্ণের মুখ হইতে মাতার প্রতি তীক্ষ্ণ অভিমানবাণী

নিঃসৃত হইতে লাগিল। কুন্তীর দৌত্য নিষ্ফল হইতে চলিল। কুন্তীর স্নেহের জন্য যিনি কিছুক্ষণ পূর্বে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনিই এখন বলিলেন—

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা—
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।

কুন্তী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কর্ণ অবিচল। তিনি মাতৃস্নেহস্বর্গ হইতে চিরবিদায় লইয়া বীরের কঠিন ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তিনি জানেন, যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, পাণ্ডবদের জয়ের কামনা তাঁহার অন্তর হইতে উৎসারিত হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার কঠিন কর্তব্য কৌরবদের জন্যই সমর্পণ করিলেন—

জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে

কর্ণ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যরসাত্মক চরিত্র, এবং রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যেও এতখানি নাটকীয়তা অন্য কোনো চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় নাই। তবে ঘটনার তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত বোধ হয় 'সতী' নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিস্ফুট হইয়াছে। অমাবাই ও বিনায়কের কথোপকথন যতক্ষণ চলিতেছিল ততক্ষণ স্বধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে পতিপরায়ণতার সংঘাত দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যগতির তীব্রতা দেখা যায় নাই। কিন্তু রমাবাইয়ের প্রবেশের পর নাট্যগতি শ্বাসরোধকারী তীব্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্মের জ্বলন্ত পাবক হইতে বহ্নিময়ী রূপ ধারণ করিয়া যেন তিনি আবির্ভূত হইলেন। শতশিখায় প্রজ্বলিত সেই বহ্নির আক্রমণ হইতে কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং পিতা বিপন্ন কন্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমাবাইয়ে তীক্ষ্ণ সূচীসম বাক্যের কাছে অমাবাইয়ের আত্মসমর্থন তখন যুক্তির তীব্রতা হারাইয়া আবেদনের কারুণ্যে সিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শেষদিকে ধর্মমদে উন্মাদিনী রমাবাই যখন নিজের স্বামীকে বন্দী করিয়া, সৈন্যদের মনে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া কন্যাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিলেন তখন নাটকীয় ঘটনা চূড়ান্ত বেগ লাভ করিল। এই সুতীব্র নাটকীয়তা সৃষ্টি করিবার জন্য নাট্যকার নাটিকার শেষ অংশে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলি এক একটি শাণিত শরের মতই যেন লক্ষ্যস্থানের দিকে তীব্র বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে নাট্যত্ব কোথায় এবং কিভাবে স্থান পাইয়াছে তাহা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম। কিন্তু উহাদের মধ্যে কাব্যত্ব কতখানি

এবং কিভাবে তাহা নাট্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহা আমরা এবার আলোচনা করিব। নাটকে কবিত্ব ও নাটকীয়তা পরস্পরের সহায়ক হইতে পারে, আবার স্থানবিশেষে ও মাত্রার তারতম্যের ফলে পরস্পরের বিরোধীও হইতে পারে। নাটকের গভীরতা, আবেগের মহত্ত্ব ও জীবনসত্যের চিরন্তনত্ব কাব্যরীতির মধ্য দিয়াই অধিকতর সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কাব্য ঊর্ধ্বচারী ও অতিশয়িত কল্পনাশ্রিত হয়, ভাব যেখানে স্থূল রূপ হারাইয়া অন্তর্মুখী ও গুহাহিত হইয়া পড়ে, কাব্যের স্খলিত অঙ্গনে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত যখন কোমল ও অদৃশ্য হইয়া যায় তখনই কাব্য নাটকের স্বাধীন গতিকে ব্যাহত করিয়া বসে। নাট্যকাব্যগুলিব মধ্যে ঘটনার স্থূল ও বাহ্য রূপ প্রায় অদৃশ্য। আকস্মিক ঘটনাস্রোতের আঘাতে নাটকীয় ঘটনা কোথাও তেমন চঞ্চল লইয়া উঠিতে পারে নাই। ঘটনার বাহ্য রূপের পরিবর্তনশীলতা ও অগ্রগতি ইহাদের মধ্যে তেমন কোথাও দেখা যায় নাই। চরিত্রগুলির বাহ্যক্রিয়া এবং আচরণের সক্রিয়তা ও বৈচিত্র্য খুব কমই দেখা গিয়াছে। তাহারা যতখানি ভাবচাবী, ততখানি ক্রিয়াশীল নহে। তাহারা আবেগ-অনুভূতিহীন নহে; কিন্তু সেই আবেগ-অনুভূতির স্থূল, বাহ্য ও প্রবল রূপ তেমন প্রকটিত হয় নাই। মুহুর্মুহুঃ আবেগের গভীরতা পরিবর্তনের মধ্যে যে নাট্যরস জমিয়া উঠে তাহা এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে দেখা যায় নাই। আবেগ ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে পক্ষবিস্তার করিয়া উঠিয়াছে, পরস্পরবিরোধী ভাবের নখ ও চঞ্চুর আঘাতের মধ্য দিয়া যে রক্তসিক্ত আবেগ নিঃসৃত হয় তাহা ইহাদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। যে গীতিধর্মী সংলাপ নাটকের বাস্তব মৃত্তিকাচারী রূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহা ইহাদের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়। দেবযানী ও কচ যখন অতীতের রোমান্টিক প্রেমের স্মৃতিতে বিভোর তখন নাট্যকাব্যটি নাটকের বস্তুজগৎ হারাইয়া কাব্যের ইন্দ্রধনুরঞ্জিত আকাশেই উড়িয়া চলিয়াছে। গান্ধারী যেখানে বিদায়প্রার্থী পাণ্ডবদের শেষ আশীর্বাদ জানাইতেছেন সেখানেও নাটকের ক্রিয়াশীল গতি কাব্যের তত্ত্বময়তা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যকাব্যগুলির নাটকীয়তা ক্ষুণ্ন হইবার আর একটি কারণ, সংলাপের আত্যন্তিক দীর্ঘতা ও অনাটকীয়তা। দীর্ঘ সংলাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। দর্শকরা বহুক্ষণ ধরিয়া সংলাপের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করিতে পারে না। তাহারা চায় রঙ্গমঞ্চে কিছু ঘটুক, কিছু বৈচিত্র্য ও ক্রিয়ার চমক আসুক। দীর্ঘ সংলাপে তাহাদের সেই আশা পরিপূর্ণ হয় না। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র, কিংবা

কচ ও দেবযানীর দীর্ঘ সংলাপ নাটকের গতিকে অত্যন্ত বিঘ্নিত করিয়াছে। সংলাপ একভাবে বলিয়া গেলে তাহার মধ্যে নাটকীয় আবেগ সঞ্চারিত হইতে পারে না, সেজন্য অসমাপ্ত বাক্য, আপাত-অসংলগ্ন উক্তি, বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের পৌনঃপুনিকতা, পরস্পরবিরোধী শব্দ অথবা বাক্যাংশের প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নাট্যরস সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু স্পষ্টতই নাট্যকার এই ধরনের সংলাপ প্রয়োগ করেন নাই। সর্বাপেক্ষা অনাটকীয় হইয়াছে 'নরকবাস'-এর সংলাপ। সেখানে সংলাপ সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক হইয়াছে। সৌমিক ও ঋত্বিকের সংলাপ পরস্পরের প্রতিরোধী ও সংঘাতমূলক হয় নাই, পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কাহিনীকে বিবৃত করিয়াছে মাত্র। নাট্যকাব্যটিকে সংলাপাশ্রিত বর্ণনামূলক কাব্য বলাই বোধ হয় সঙ্গত। নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে যেসব অলঙ্কার প্রয়োগ করা হইয়াছে সেগুলি ঘটনাকে কল্পনামুখী করিয়া তুলিয়াছে, ঘটনাকে গতিশীল করে নাই। সমাসবদ্ধ ও দীর্ঘায়িত শব্দপ্রয়োগ এবং শিথিল ও বিসর্পিত বাক্যপ্রয়োগের ফলে নাট্য কাব্যগুলির মধ্যে দ্রুত লয় ও ক্ষিপ্র আবেগের দ্যুতি দেখা যায় নাই।

এই নাট্যকাব্যগুলির নাট্যরীতি বিচার করিলে ইহাদিগকে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। হারমন আউল্ড Theatre and Stage নামক গ্রন্থে একাঙ্ক নাটকের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে নাট্যকাব্যের একটি বিশেষ শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। ইয়েটস্, ড্রিঙ্কওয়াটার, মেসফিল্ড প্রভৃতি কবিগণ এই ধরনের একাঙ্ক নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির সহিত উঁহাদের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। আধুনিক কালে বহুতর একাঙ্ক নাটক রচিত হইতেছে, কিন্তু 'হাস্যকৌতুক'-এর কয়েকটি নাটিকা এবং এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্য দিয়া তিনিই একাঙ্ক নাটকের নব-আবিষ্কৃত রূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিলেন। টমসন সাহেব এই নাট্যকাব্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াছেন।[১] সংস্কৃত সাহিত্যের দশরূপকের মধ্যে ব্যায়োগ, অঙ্ক, ভাণ, বীথী, প্রভৃতি একাঙ্ক নাটক। ইহাদের মধ্যে ভাণকে আত্মলাপী নাটক (Dramatic Monologue) বলা যাইতে পারে। 'কাহিনী' কাব্যের 'পতিতা' কবিতাটি ও 'হাস্যকৌতুক'-এর 'বিনি পয়সার ভোজ' রচনাটিকে আমরা এই ভাণের শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিভিন্ন রীতি নিয়া কত

১। 'But it is in the short plays that Rabindranath showed his highest power as a dramatist'. *Rabindranath Tagore : Poet & Dramatist* p. 296

পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন ধরনের নাটক বিশদ্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো যাইতে পারে।

নাট্যকাব্যগুলির অধিকাংশই মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। একমাত্র 'সতী' মারাঠী ইতিহাসের কাহিনী লইয়া লিখিত। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতেব মূল কাহিনীকে কোথাও গুরুতররূপে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করেন নাই। স্থূল ঘটনা ও চরিত্ররূপ প্রায় অবিকৃতই রাখিয়াছেন। মাত্র ঘটনার নাট্যরূপের প্রয়োজনে যতটুকু পরিবর্তন ও নূতনত্ব আনা অনিবার্য ততটুকুই আনিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা তো বাহ্য উপায় মাত্র, এই ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি এক একটি ভাবধর্মই রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। এই ভাবধর্ম নাট্যকারের অন্তরের গভীর প্রদেশ হইতে উৎসারিত। জীবনের জটিল রূপ তিনি দেখাইয়াছেন, সত্যের আংশিক ও সাময়িক রূপ তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সকল জটিলতা ও খণ্ডতার মধ্যে এক অখণ্ড সত্যধর্ম ও চিরন্তন মানবধর্মের উজ্জ্বল মহিমাই প্রদীপ্ত সূর্যালোকের মত ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

(ঙ) প্রহসন

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেকে প্রহসন লিখিয়াছেন, যথাস্থানে আমরা তাঁহাদের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রহসন পূর্ববর্তী লেখকদের প্রহসন হইতে স্বতন্ত্র। তিনি অল্পসংখ্যক প্রহসন লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাসত্ত্বেও প্রহসন-রচয়িতারূপে তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে পাবেন, এমন লেখক বাংলা সাহিত্যে দুই একজনেব বেশি নাই। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহাবা আসিয়াছেন তাঁহাবা জানেন কবির চিত্ত সতত কি রকম সবস পবিহাসে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার সঙ্গী, সেবাকাবী এমন কি ভৃত্য পযন্ত যথেষ্ট রসজ্ঞ না হইলে তিনি তাঁহাদের পছন্দ করিতেন না।[১] তাঁহার এই হাস্যকৌতুকময় চিত্তের পরিচয় বহুতব কবিতা, গল্প ও উপন্যাসেব মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন কবি হাস্যরস সৃজন করিতে যাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। সেইজন্য তাঁহার হাস্যরসের মধ্যে একটা সুসংযত পরিমিতিবোধ, একটা সযত্ন-চেষ্টালব্ধ সুপরিপাটি শব্দ-বিন্যাস, এবং অন্তঃশায়ী সুগূঢ় রসের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। যাহাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় মাত্র হাস্যরস উপভোগের উপায় তাহারা রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস

১। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী লিখিত 'নির্বাণ' এবং শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী রচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করিতে পারিবে না। বৈদগ্ধ্যসেবিত মনকে উন্নত রাখিতে পারিলে তবেই এই রস উপলব্ধি হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রধান গুণ—ইহার সুতীক্ষ্ণ সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ। ইহা অপরূপ আলো-অন্ধকারময়, শত ঝঙ্কার-মুখরিত অভিনয়-আসরের ন্যায় আমাদিগকে আবিষ্ট, বিভ্রান্ত করিয়া রাখে, ক্ষণে ক্ষণে অচিন্তনীয় অভাবনীয় শব্দের অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ চমৎকৃত করিয়া তোলে, কিন্তু এই অভিনয়ে বেরসিক ও অর্বাচীনের প্রবেশাধিকার নাই।

॥ বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩)॥ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্বল্পায়তন প্রহসন, মাত্র তিন দৃশ্যে ইহা সমাপ্ত। বৈকুণ্ঠের খাতা যাহা তাঁহার নিজের কাছে এত প্রিয়, তাহাই আবার অপরের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে। কোনো ব্যক্তির কথা এবং আচরণ যদি অন্য সকলের অপেক্ষা বিভিন্ন হয় তবেই তাহা হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়ে।[১] বৈকুণ্ঠের খাতার মধ্যে হয়তো মূল্যবান অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু অন্য লোকের তাহাতে আগ্রহ নাই, অথচ বৈকুণ্ঠ সকলকে তাহা শুনাইবেনই। কৌতুকরস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যদি একই রকম অথবা বিপরীত ধরনের দুইটি চরিত্রকে একত্রে সমাবেশ করা হয়। মলিয়েরের প্রহসনে জোড়া চরিত্রের কথায় সঙ্গতি অথবা অসঙ্গতি দেখাইয়া অনেক স্থলে সরস কৌতুকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে যখন অবিনাশকেও নিজের লেখা শুনাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত .হইয়া উঠিতে দেখি, তখন আমাদের হাস্য দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। লেখক ইহাই দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে সকলেই পাগলাটে এবং বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে, সুতরাং অন্য কেহ সরল এবং নির্বোধ, ইহা মনে করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া লাভ নাই, অতি সহজেই স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিচারশক্তি লুপ্ত হইতে পারে। কেদার ও তিনকড়ির জোড়া চরিত্রও কৌতুকরসকে প্রবল করিবার জন্য একসঙ্গে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের জীবনের ধরন এবং উদ্দেশ্য এক রকম হইলেও ইহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। কেদার সুবিধাবাদী, আত্মসুখান্বেষী এবং প্রবঞ্চক। সে বাহিরে সাধু সাজিয়া কার্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টায় থাকে; কিন্তু তিনকড়ি আত্মসুখপ্রয়াসী, পরনির্ভরশীল হইলেও নিতান্ত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ, ধরা পড়িবার ভয় তাহার নাই। তিনকড়ির এক ক[illegible]তেই কেদার এবং তাহার চরিত্র

১। William Congreve তাহার Humour in Comedy প্রবন্ধে হাস্যরসের (Humour) সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন -'A singular and unavoidable manner of doing or saying anything, peculiar and natural to one man only, by which his speech and actions are distinguished from those of other men'.
European Theories of Drama by Clerk, p. 214

উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—'বরাবর দেখে আসছি কেদার-দা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি—আমার আর ভাবনা থাকে না।' উদার, আত্মভোলা বৈকুণ্ঠ আমাদের হাস্যরস উদ্রেক করিলেও হাস্যরসের তরঙ্গাঘাতে যেন আমাদের চিত্ত-তটে স্নেহ এবং সহানুভূতির পলিমাটি জমা হইতে থাকে। সেই বৈকুণ্ঠকে শেষের দিকে সকলের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাদের অন্তর করুণরসে পরিপূরিত হইয়া উঠে। বৈকুণ্ঠ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বইখানা পরিপূর্ণ বিষাদান্তক হইয়া পড়িত, কিন্তু লেখক সামলাইয়া লইয়া আবার সুখকর পুনর্মিলনের মধ্যে স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিলেন, পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রহিল।

॥ চিরকুমার সভা (১৩৩২) ॥ 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন রৌদ্রালোকিত বৃষ্টিধারার ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত রুচির হাস্যরসের চিত্তাভিরাম লীলা সমস্ত গ্রন্থখানাকে অশেষ প্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। বিদগ্ধজনপ্রিয় বাক্যাবলীর চমৎকারী প্রয়োগে, উপমা রূপকের ঘটায়, যমক অনুপ্রাস-শ্লেষের ছটায় নাটকীয় কথাগুলি বিদ্যুৎ আভায় ঝলমল করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে যেন ইহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া, আমাদের অন্তর ঝাঁঝিয়া দিতেছে। 'চিরকুমার সভা'র সর্বপ্রধান গুণ ইহার অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ, কিন্তু সংলাপের চমৎকারিত্বসত্ত্বেও ইহার কাহিনীর দুর্বলতা বিশেষ লক্ষণীয়। ইহাতে কোনো মধুর ষড়যন্ত্রময় ঘটনা আমাদের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যকে সজোর আক্রমণে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে কোনো সরস ভ্রান্তি এবং কৌতুকাবহ অসঙ্গতি নাটকীয় কৌতূহলের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় কৃত্রিম বাধা ও অস্থায়ী দ্বন্দ্বের সঞ্চার করিয়া কৌতুকরসকে জমাট করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনে কোনো সমস্যার দ্বন্দ্ব এবং তাহার অতি তৃপ্তিজনক সমাধান দেখানো হয় নাই। চিরকুমার সভার কৌমার্যব্রত এবং ইহার বিরুদ্ধে বিবাহের ষড়যন্ত্র, এই দুই ভাবের প্রতিকূলতা বেশ স্পষ্টভাবে প্রহসনের মধ্যে দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু তাহা মোটেই ভালোভাবে ফুটিত হয় নাই। চিরকুমার সভার সভ্যগুলি যেন কৌমার্য ভঙ্গিবার জন্য পা বাড়াইয়াই আছে। পূর্ণর তো কথাই নাই, সে নিজের ক্ষেত্র সুবিধাজনক করিয়া লইবার জন্যই সভ্য হইয়াছিল। শ্রীশ এবং বিপিনেরও মনে কৌমার্যরক্ষার জন্য কোনো দৃঢ় সঙ্কল্প নাই, কোনো বলিষ্ঠ প্রয়াস নাই। ভ্রান্ত এবং বাতিকগ্রস্ত লোকের পরাজয়ে তখনি আমাদের কৌতুকানন্দ উদ্রিক্ত হয়, যখন সেই ভ্রান্তি এবং বাতিকের পিছনে সবল ইচ্ছা এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকে ; দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত

লোকের পরিবর্তনে অথবা পরাজয়ে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে না।[১]

স্বয়ং চন্দ্রবাবু পর্যন্ত—যিনি কৌমার্যনীতির ধারক, কুমারসভার নায়ক, এবং কুমারগণের চালক, তিনিও যেন অতি সহজেই বিবাহপ্রথাকে মানিয়া লইলেন। সুতরাং মনে হয় চিরকুমার সভা কয়েকজন দুর্বল ব্যক্তির সংশয়ী চিত্তের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা তো বরাবর ভাঙ্গিয়াই ছিল, সুতরাং ইহাকে আর ফলাও করিয়া ভাঙ্গিয়া লাভ কি? প্রহসনের কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে প্রধানত অক্ষয় এবং রসিকের দ্বারা। ইহারা সুস্থ স্বাভাবিক, বুদ্ধিমান চরিত্র; অন্যান্য চরিত্রের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি লইয়া ইহারা হাস্য-পরিহাস উদ্রেক করিয়াছে। বাঙালী সমাজে ঠাকুরদা-নাতনী, এবং শালী-ভগ্নীপতি সম্পর্ক বিশেষ সুবিধাজনক এবং রসাল, রসিক ও অক্ষয় এই সম্পর্কের সুযোগে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করিতে পারিয়াছে। রসিকের সুমধুর সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি, অক্ষয়ের সুস্বর সঙ্গীতলহরী, নৃপ-নীরবালার সুস্নিগ্ধ চাঞ্চল্যবিলাস এমন এক কৌমুদীস্নাত মঞ্জুকুঞ্জ-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে, যেখান হইতে অবিরত মধু ও সৌন্দর্য ক্ষরিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসধর্মকে কোনো দিন শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই বহুবার তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে চান। কবির জীবনীকার প্রভাতবাবু বলিয়াছেন, 'তিনি সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পরিহাস করিয়াই প্রহসনখানা রচনা করিয়াছেন।[২] 'চিরকুমার সভা' যখন তিনি লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মানস--সত্তা 'চিত্রা'-'চৈতালি' পর্ব সাঙ্গ করিয়া 'ক্ষণিকা'তে পরিক্রমণ করিতেছে। ধরণীর বিচিত্র রূপ, রস, সৌন্দর্য তাঁহাকে এখনো প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

১। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় 'চিরকুমার সভা'র একটু কঠোর সমালোচনা করিয়াই একস্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য—'যে চিরকুমারের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।' 'রবীন্দ্রনাথ'—পৃঃ ২৩৪

২। 'আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনে রত। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে চিরকুমার থাকিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হইবার জন্য একটি প্রেরণা আসিয়াছিল। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটকখান লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মনের মধ্যে তরুণ বাংলার এই নূতন সাধনার রূপ জাগিতেছিল। তাঁহার মতের বিরোধ—এই চিরকৌমার্যকে তিনি প্রহসনের বিদ্রূপবাণে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।' 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড)—পৃঃ ৩৪৪

ভোগবিমুখ বৈরাগ্য এখন তাঁহার কাছে মূল্যহীন, হাস্যকর। মনের এই অবস্থায় তিনি প্রহসনখানি রচনা করেন।

॥ শেষরক্ষা (১৩৩৫)॥ রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' প্রহসনখানি 'গোড়ায় গলদ'-এর সংস্কৃত এবং মার্জিত রূপ। 'চিরকুমার সভা'র অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম হাস্যরস ইহাতে নাই বটে, কিন্তু ইহার ঘটনার বুননি অধিকতর কৌশলপূর্ণ। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় প্রহসনখানার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'এই প্রহসনের মূল উপজীব্য চরিত্র-সৃষ্টি নহে; আর্টের কাজ চরিত্রসৃষ্টি, মানব হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান। ঘটনার সন্নিবেশ সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানের উপায়মাত্র। ইহাই যদি মুখ্য হইয়া পড়ে, তবে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।' উপরি-উক্ত মন্তব্যের মধ্যে ডঃ সেনগুপ্ত প্রহসনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। প্রহসনের (Farce) হাস্যরস জটিল ঘটনার কুশলী সমাবেশের উপর নির্ভর করে না।[১] চরিত্রসৃষ্টি ইহাতে মুখ্য নাও হইতে পারে। সুতরাং চরিত্রসৃষ্টি 'শেষরক্ষা'য় উল্লেখযোগ্য না হইলেও নিপুণ ঘটনাবলীর সরস সংস্থাপনে ইহা শ্রেষ্ঠ প্রহসনরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। প্রহসনের মধ্যে তিন জোড়া পাত্রপাত্রী তিন রকম স্বতন্ত্র ঘটনারস সৃষ্টি করিয়াও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়াছে। চন্দ্র এবং ক্ষান্তর অম্লমধুর দাম্পত্য-প্রেম, বিনোদ-কমলের অর্থসমস্যা-পীড়িত বিচ্ছেদ-মিলনময় সম্বন্ধ এবং গদাই ও ইন্দুর ভ্রান্তি-মধুর অনুরাগ—এই তিন প্রকার আখ্যান প্রহসনের মধ্যে রহিয়াছে। এক জায়গায় মাত্র ঘটনা-সংস্থান জটিল এবং অবিশ্বাস্য হইয়াছে। কমলের হঠাৎ বিপুল অর্থপ্রাপ্তি এবং বিনোদের সহিত কথোপকথনের মধ্যেও যে তাহার ছদ্ম ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িল না ইহা অসম্ভব মনে হয়। মনে হয় অর্থসঙ্কটের মধ্যে যে সমস্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল তাহাই যেন নাট্যকার অকস্মাৎ সমাধান করিয়া দিলেন। প্রহসনের পরিশেষে সকলেরই শেষরক্ষা হওয়ায় সর্বজনীন প্রসন্নতা-জাত কৌতুকরস আমাদের মনে স্নিগ্ধ তৃপ্তির সঞ্চার করে।

(চ) সাঙ্কেতিক নাটক

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হইল সেইগুলি প্রচলিত নাট্যধারার অনুসারী। কিন্তু এখন আমরা তাঁহার যে নাটকসমূহ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব সেইগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক সম্পূর্ণ

১। …'its main characteristics are dependence in it of character and of dialogue upon mere situation.' *The Theory of Drama* by Nicoll.

অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সঙ্কেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না, এবং তাঁহার পরেও এই নাটক আর লেখা হয় নাই। এই নাট্যরীতি তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।[১] অবশ্য তাঁহার নাটকের ভাব এবং সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব—এসব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। যে বিশেষ মানস-অনুভূতির পরিচয় তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকে রহিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য সাঙ্কেতিক নাট্যের কোনো যোগ নাই।

মানুষের ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার অনন্ত পারাবার প্রবাহিত। সেই পারাবারের বিচিত্র-গভীর তরঙ্গ-লীলা চিরকাল মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে। মানুষের মনের সেই বিস্ময়-কৌতূহল প্রকাশ করিবার অবিরাম চেষ্টা তাহার জীবনধারায় লক্ষ্য করা গিয়াছে। সে ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সেই ভাষা দ্বারা সে মনের অনির্বচনীয় ভাবরহস্যের অপূর্ণ ও আংশিক প্রকাশ করিতে পারে মাত্র। সেই প্রকাশভঙ্গির আরও সুষ্ঠুতর, আরও পূর্ণতর রূপ দিবার জন্য সে ব্যবহার করে সঙ্কেত অথবা প্রতীক। অবশ্য তাহার ভাষাও এই সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই নহে। ভাষা হইল অর্থবহ ধ্বনির সমষ্টি, এবং সেই সব ধ্বনিও বিশেষ বিশেষ প্রাণী ও বস্তুর সঙ্কেত মাত্র। মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বনির বিচিত্রতা ও সেই কারণে ভাষারও জটিলতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই ভাষা-সঙ্কেত ছাড়া আরও বহু প্রকার সঙ্কেত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তাহার রহিয়া গেল। মানুষ অপূর্ণ, তাহার ভাষাও অপূর্ণ; সেইজন্য সেই ভাষা দ্বারা কোনো পূর্ণতার ভাব ও আদর্শ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু সেই পূর্ণতার দ্যোতনা আসে সঙ্কেত হইতে।[২] নারী-সৌন্দর্যকে বুঝাইবার জন্য যখন একটি গোলাপ ফুলকে সঙ্কেতরূপে ব্যবহার করা হয় তখন নারী-সৌন্দর্যের পূর্ণ আদর্শই আমাদের মনে আভাসিত হইয়া উঠে। হিন্দুগণ ভগবানকে সাধনা করিবার জন্য নানা দেবমূর্তির প্রতীক নির্মাণ করিয়া থাকেন। প্রতীক মাটি অথবা পাথরের হইতে পারে,

১। 'This development of his drama brings his prose plays into line with the most modern drama of the world. It has been an independent development, in the main, but he is well aware of what is happening outside India, and to his mind a hint is more than a full exposition is to most poets.' *Rabindranath*—by Thompson

২। 'Symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection.' *Ideas of Good and Evil*—by W. B. Yeats, P. 160

কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া ভক্ত সাধক ভগবানের পূর্ণ মহিমাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রাজা দোষত্রুটিপূর্ণ মানব হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হস্তধৃত রাজদণ্ড পরিপূর্ণ রাজসত্তারই প্রতীক। কেবল নির্জীব জড় পদার্থ যে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, সজীব মানুষও কোনো কোনো ভাব বা আদর্শের প্রতীক হইতে পারে। রামচন্দ্র বিশেষ ব্যক্তি মাত্র নহেন, তিনি চিরকালীন আদর্শ মানুষের প্রতীক; তেমনি রাবণও মানুষের দুর্দান্ত প্রবৃত্তিরই চিরন্তন প্রতীক হইয়া রহিয়াছে। রূপকথার প্রবাল-পালঙ্কে শয়ান ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা আমরা পড়িয়াছি, সেই রাজকন্যার মানুষী সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের অন্তরের শাশ্বত সৌন্দর্য-সত্তারূপে সে চিরকাল বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই সব প্রতীক বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষের ভাবরহস্য ব্যাখ্যা করিতে সেই সব ব্যক্তি বা বস্তুই প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে বহুকালপোষিত ধারণা ও সংস্কার আছে। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র স্বভাব-ধর্ম কি তাহা আমরা জানি বলিয়াই উহাদের সঙ্কেত আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অনুমান করিতে পারি এবং নিশ্চয় অনুভব করিতেও পারি।

সাহিত্যে চিরকাল সঙ্কেতের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আর্থার সাইমন্স বলিয়াছেন, সাঙ্কেতিকতা ছাড়া কোনো সাহিত্য হইতে পারে না।[১] ইয়েটস্‌ও বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র গল্পকথন অথবা নিছক চিত্রাঙ্কন ছাড়া সব শিল্পকলাই সাঙ্কেতিক।[২] শিল্পী তাঁহার শিল্পকলার মধ্যে রঙ ও রেখা, সুর ও ছন্দের যে সুমিল সমাবেশ করেন তাহার ফলে আমাদের মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় ভাব-ব্যঞ্জনার সঞ্চার হয়। এখানে শিল্পকলার উপাদানগুলি গূঢ় ভাবপ্রকাশের সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই নহে। ইয়েটস্ এই ভাবসঙ্কেতকেই **emotional symbol** নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিবাদীরাও ব্যক্ত ধ্বনির মধ্যে এক গূঢ় অর্থের সঙ্কেত লইয়া বিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের এই মৌলিক সঙ্কেতধর্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার অন্তর্নিহিত চরিত্র ও ঘটনাগত সাঙ্কেতিকতা আমরা প্রায় সব বড় সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাই। যেখানে সাঙ্কেতিকতা সেখানেই একটি রহস্যদ্যোতনা, একটি আশা-আশঙ্কিত ঘটনার সম্ভাবনা আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে। আমাদের জানা ও

১। 'Without symbolism there can be no literature,' *Symbolist Movement in Literature*—by A. Symons (Constable & Co., Ltd. 1911), p. 1.

২। 'All art that is not mere story-telling or mere portraiture is symbolic,' *Ideas of Good and Evil*—p. 160

চেনা জগতের অন্তরালে যে একটি অদৃশ্য, অনির্দেশ্য ঘটনা-জাল বিস্তৃত হইতেছে তাহারই অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এই সাঙ্কেতিকতার মধ্যে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথমেই যে বজ্র-বিদ্যুতের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হইতেই কি সমগ্র নাটকের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই? ইবসেনের 'Hedda Gabler' নাটকে Hedda তাহার আকাঙ্ক্ষিত নায়ক Lovborg-কে বার বার vine leaves-এর সহিত যুক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছে। Vine leaves-এর মধ্যে একটি আরণ্যক উদ্দামতার ভাব নিহিত রহিয়াছে। Hedda-র মধ্যে বেপরোয়া সমাজ-সংস্কারহীন চিত্তের মাঝে তাহার ঈপ্সিত প্রণয়ী সম্বন্ধে কিরূপ দুর্দম কামনা বিরাজমান তাহারই সঙ্কেত বহন করিতেছে ঐ vine leaves। 'I can see him already—with vine leaves in his hair—flushed and fearless'—এই কথাগুলির গভীর সৌন্দর্যের সহিত মিলিয়াছে গূঢ় সঙ্কেত। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যে দুযোগ-মুহূর্তে রোহিণীকে বাঁচাইতে গোবিন্দলাল রোহিণীর গাত্র স্পর্শ করিল, তখনই অন্যত্র ভ্রমর একটি বিড়ালকে মারিতে গেলে লাঠি তাহার কপালেই ফিরিয়া আঘাত করিল। এইখানেও সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার হইয়াছে। রোহিণীকে মরিতে ভ্রমর উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু সেই রোহিণীই কি এখন হইতে ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল না?

সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা শুধু বস্তু ও ঘটনাশ্রয়ী নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। মেঘদূতের যক্ষ একটি বিশেষ কাব্যের নায়ক মাত্র নহে, সে বিশ্বের চিরন্তন বিরহ-বেদনার প্রতীক। নীলপাখীর জন্য Tyltyl ও Mytyl যে অভিযানে বাহির হইয়াছিল তাহা জগতের গুহাহিত আনন্দ ও সত্যকে জানিবার জন্য মানুষের শাশ্বত চেষ্টার সঙ্কেত বহন করে না কি? মানুষের উচ্চাশার অন্ত নাই, দুঃসাধ্যকে সাধন করিবার তাহার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস, কিন্তু প্রতিকূল নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার আশা ও প্রয়াস ধূলায় লুটাইয়া যায়। মানুষের জীবনের এই নিষ্ফল বেদনার দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে হাউপ্‌টম্যানের 'The Sunken Bell' নামক নাটকের Heinrich চরিত্রে। Heinrich পর্বত চূড়া ঘণ্টা ঝুলাইতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ঘণ্টা পড়িয়া গেল কর্দমাক্ত জলাশয়ে। দুঃখে হতাশায় Heinrich বলিল, ''Twas for the valley, not the mountain top!'

এই ভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁহার চরিত্রকে শুধু কেবল ক্রিয়া ও পরিবেশের মধ্যে সঙ্কীর্ণ

করিয়া রাখেন না, সেই চরিত্রের মধ্য দিয়া মানুষের চিরন্তন কোনো আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্র কায়িক সীমা ছাড়াইয়া এক অমূর্ত ভাবের অনন্ত প্রতীক হইয়া উঠে।

এ-পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের সাধারণ সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এবার আমরা বিশেষ সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা স্থরু করিব। অবশ্য পূর্বোক্ত 'Blue Bird', 'The Sunken Bell' প্রভৃতি এই সাঙ্কেতিক সাহিত্যেরই শ্রেণীভুক্ত, সাঙ্কেতিকতার সাধারণ লক্ষণ বুঝাইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সাঙ্কেতিক সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহার উৎপত্তি ও পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছিল ফরাসী দেশে। উনবিংশ শতাব্দীতে জড়বাদী বস্তুবিজ্ঞানের প্রভাবে ফরাসী দেশের সাহিত্যে বেপরোয়া বস্তুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। বস্তুবাদী সাহিত্যিকগণ নির্বিকার লিপ্সা লইয়া দৃশ্যজগতের সর্বপ্রকার আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন, বস্তুই বস্তুর পরিণাম ভাবিয়া এই বস্তুসম্ভোগে তাঁহাদের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এই বহিঃসর্বস্ব কামনা-পঙ্কিল দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মত্ততা শিথিল হইয়া আসিল এবং ইহার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া-স্বরূপেই একটা বিরুদ্ধ, নবায়িত আদর্শ ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিল। লেখক বুঝিলেন, পাঠকও বুঝিলেন যে, বস্তুপুঞ্জই বোধহয় সব নহে, এই বস্তুপুঞ্জের তীক্ষ্ণ জ্ঞানই বোধ হয় যথেষ্ট নহে। বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে যে অমূর্ত অধ্যাত্ম-জগৎ বিরাজিত তাহাই জানিতে ও জানাইতে হইবে। তখন হইতে সাঙ্কেতিক সাহিত্যের সূচনা—ইন্দ্রিয়ের সুরা হইতে অতীন্দ্রিয়ের সুধার সন্ধান। এই সাহিত্য এক আনন্দিত মুক্তির আহ্বান আনিল—এই মুক্তি অন্তরের, এই মুক্তি আত্মার, এই মুক্তি পরমাত্মার। সাহিত্যে তখন হইতে আসিল ঘটনার স্থলে রহস্য, আর বর্ণনার স্থলে ব্যঞ্জনা।[১]

ফরাসী সাঙ্কেতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় Gerard De Nerval-এর। Gerard De Nerval-ই প্রথম দেখান যে কবিতা সৌন্দর্যের বর্ণনা নহে, ইহা রহস্য-বিস্ময়ের বাহন মাত্র, মানুষের গহন চেতনা ইহার মধ্য দিয়া মূর্ত হইতে চাহে। Gerard De Nerval-এর পর আসেন Villiers De Lisle Adam। Villiers তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক 'Axel'-এ বিভিন্ন মানুষী

১। 'It is all an attempt to spiritualise literature to evade the old bondage of rhetoric, the old bondage of exteriority.'

Symbolist Movement in Literature—by A. Symons, p. 8.

আদর্শের রূপ অঙ্কন করিয়াছেন। Villiers-এর বিশ্ব বস্তুবিশ্ব নহে, ইহার অতীত সূক্ষ্মবিশ্ব—এই সূক্ষ্মবিশ্বের সৌন্দর্যই তাঁহার চোখে একমাত্র সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের অঞ্জন যাহার চোখে লাগিয়াছে সে এ বস্তুবিশ্বের মায়ায় ভুলিবে কেন? Villiers-এর পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক Paul Verlaine সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুঃখ-সমস্যা-পীড়িত মানবাত্মার আধ্যাত্মিক শান্তি ও সান্ত্বনালাভের আকূতি ফুটিয়াছে Paul Verlaine-এর কবিতায়। তাঁহার 'Sagesse'তে মানবাত্মা ও পরমাত্মার গভীর সম্বন্ধটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সন্ধান পাই আমরা Stephane Mallarme-এর সাহিত্যেও। Mallarme-এর দৃষ্টিতে এই জগৎ এক নূতন চেতনা লাভ করিল, অদৃশ্য জগতের সহিত দৃশ্য জগৎ এক গূঢ় সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া উঠিল। বিশ্বের অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান আমরা পাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাট্যকার মেটারলিঙ্কের নাটকে। মেটারলিঙ্ক দেখাইলেন, আমাদের এই আলোকিত জীব-রাজ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে অপার ও অনধিগম্য অন্ধকার-রাজ্য। মাঝে মাঝে মেটারলিঙ্কের রহস্যময়তা ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সহিত মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও সর্বত্রই একটা সুষম সুন্দর রূপের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বাক্য আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে? বাক্যের অতীত যে ধ্যানমৌন নীরবতার জগতে এই বিশ্বসৃষ্টির সারসত্য নিহিত রহিয়াছে তাহার পরিচয় মেটারলিঙ্ক পাইয়াছিলেন এবং সেজন্যই তিনি এতবড় মরমী সত্যদ্রষ্টা।

সাঙ্কেতিক সাহিত্যের বিকাশ ফরাসী দেশে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইলেও অন্যান্য দেশেও ইহার সাধনা বড় কম হয় নাই। ইংরাজি সাহিত্যে উইলিয়াম ব্লেকই সর্বপ্রথম সাঙ্কেতিকতার অপরিহার্যতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনিই সকলের আগে সাঙ্কেতিক ও রূপকের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। আইরিশ নাট্যকারদের নাটকে, এ. ই.-র কবিতায় এই সাঙ্কেতিকতা অতি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজি সাহিত্যে সাঙ্কেতিক আন্দোলনের নেতা হইলেন ইয়েটস্। ইয়েটসের নাটকে গীতিধর্মিতার আতিশয্য ও বাহ্য ক্রিয়ার স্বল্পতা থাকিলেও তাঁহার নাটক আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[১] ইউরোপের

১। 'All of Mr. Yeats' dramas suffer from too great lyrical fervour, and from a lack of action ; yet they are unquestionably among the finest poetic plays of our time'.

British Drama—A. Nicoll (George G. Harrap, 3d. Ed.) p. 410

নাট্যকারদের মধ্যে ইবসেন, হাউপ্টম্যান, স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকে সাঙ্কেতিকতার লক্ষণ বিদ্যমান। এই সাঙ্কেতিকতা কোথাও আংশিক, আবার কোথাও বা সামগ্রিক। পরিশেষে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাহিত্যে মানুষের অবচেতন মনের দিকে, আত্মার অচিন্তনীয় রহস্যের দিকে একটি প্রবণতা দেখা যায় এবং সীমায়িত বাক্য ও বর্ণনার দ্বারা এসব বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব নহে বলিয়া সাহিত্যিকগণ ইঙ্গিত ও সঙ্কেত অবলম্বন করিলেন, বর্ণনীয় জগতের অন্তরালস্থিত অবর্ণনীয় জগৎকে আভাসিত করিয়া তুলিলেন।

উপরি-উক্ত সাঙ্কেতিক সাহিত্যের আলোচনা হইতে সাঙ্কেতিকতার লক্ষণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হইতে পারে। সাঙ্কেতিকতা আমাদের কাছে এক নূতন জগতের সংবাদ বহন করিয়া আনে—আমাদের বুদ্ধিবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই দৃশ্য-জগতের অতীত যে অদৃশ্য শব্দবর্ণহীন অতীন্দ্রিয় জগৎ বিরাজমান তাহার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয়। দৃশ্য মানেই সত্য নহে, আর অদৃশ্য হইলেই মিথ্যা হয় না, ইহাই আমরা সাঙ্কেতিক সাহিত্য হইতে শিক্ষা লাভ করি।[১] মানুষের এই স্থূল বস্তুজগৎ তো নিত্যক্ষয়িষ্ণু ও নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইহার মধ্যে আমাদের যে চিত্ত নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে তাহা অহরহ আঘাত-বেদনায় জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে কিন্তু যখন অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য আমরা জানিতে পারি তখন আমাদের পরম সত্যের উপলব্ধি হয়, আমাদের আত্মা পায় চিরন্তন মুক্তি। মানুষের বস্তুচেতন সত্তার গভীরে যে অজর, অমর, নিত্য-শাশ্বত আত্মা রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাইলেন সাঙ্কেতবাদিগণ।[২] মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird' ও Huysmans-এর 'La Cathedral' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা জড়পদার্থ বলিয়া বোধ হয় তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য আত্মা বিরাজমান। এই সর্বব্যাপী ও নিত্যকালীন আত্মিক চেতনার সাক্ষ্য পরিস্ফুট হইয়াছে সাঙ্কেতিক সাহিত্যে। মানুষ অপূর্ণ, তাহার প্রেমও অপূর্ণ, কিন্তু সে যখন তাহার প্রেম ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে পারে তখন সে পায় পূর্ণতার আস্বাদ, তাহার প্রেমও হয় পরিপূর্ণ

১। ····'a literature in which the visible world is no longer a reality, and the unseen world no longer a dream'.

The Symbolist Movement in Literature—by A. Symons, p. 4.

২। 'What is Symbolism if not an establishing of the links which hold the world together, the affirmation of an eternal, minute, intricate, almost invisible life, which runs through the whole universe ?' —Ibid, p. 145.

সার্থক।[১] মানুষ ও ভগবানের এই প্রেম-সম্বন্ধই তো স্থাপিত হইয়াছে Paul Verlaine-এবং রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক সাহিত্যে।

সাঙ্কেতিক সাহিত্যের এই যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার স্বরূপ আমরা আলোচনা করিলাম, ইহার প্রকাশভঙ্গি কিরূপ সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসিতে পারে। সাঙ্কেতিকতার মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ের ভাষা নাই, কেবল আভাস আছে। সাধারণ বাক্যরীতি ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা গূঢ়াতিগূঢ় ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সেজন্য সাঙ্কেতিক সাহিত্যের বাক্যে ও বর্ণনায় একটা জটিল কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যজাল বিস্তৃত হইয়া আছে।[২] যাহা অদৃশ্য, অমেয় ও অতীন্দ্রিয় তাহা কিভাবে স্পষ্ট রঙ ও রেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে? তাহা বর্ণনা করা যায় না, তাহা কেবল সঞ্চার করা যায়। যাহা নামহীন তাহাকে নাম দিলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহার রূপ দেওয়া যায় কেবল ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া। সাইমনসের কথা উল্লেখ করা যায়—'to name is to destroy, to suggest is to create'। সাঙ্কেতিকতার এই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সঙ্কেতবাদী সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহারা আদিম ও চিরন্তন মানবপ্রবৃত্তির লীলা অনেক সময়েই দেখান বটে, কিন্তু সেই সব প্রবৃত্তি লীলার সক্রিয় বাস্তব রূপ অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় ভাব রূপই অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

নাট্যশিল্পই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বস্তু, সেই শিল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। নাটকের পক্ষে তীব্র গতিবেগ ও সক্রিয় বস্তুসংঘাত অপরিহার্য। সঙ্কেতবাদী নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই নাটকের এই চিরাচরিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে এক অবাস্তব কল্পলোকে লইয়া গিয়াছেন। নাটকের এই সব নীতির সর্বাপেক্ষা বড় নায়ক বোধ হয় প্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার ইয়েটস্। ইয়েটসের নাটকীয় পরিবেশ যেমন এক স্বপ্নালু মায়াময় রহস্যমেঘে আচ্ছন্ন, তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিও

১। 'To love God is to love the absolute, so far as the mind of man can conceive the absolute, and thus, in a sense to love God is to possess the absolute, for the love has already possessed that which it apprehends.

—Ibid, p. 96.

২। ... for although you can expound an opinion, or describe a thing when your words are not quite well chosen you cannot give a body to something that moves beyond the sense unless your words are as subtle, as complex, as full of mysterious life, as the body of a flower or of a woman.'

– *Ideas of Good and Evil*, p. 177.

তেমনি নিস্পন্দ, নিশ্চেতন, নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব দ্বারাই রূপায়িত হইয়াছে। ইয়েটস্ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চের উপযোগী স্থূল নাট্যক্রিয়া মোটেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু ইয়েটসের এই সব কায়াহীন, রূপহীন নাটকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা চলে কিনা, সে সন্দেহ অনেকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।[১] এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, নাটকে ভাব ও তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকৃতি যদি একটি বস্তু-রূপ গ্রহণ না করে তবে বাস্তব দর্শকের কাছে কিছুতেই তাহার মূল্য থাকিতে পারে না। এদিক দিয়া বিচার করিলে হাউপ্টম্যান ও রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাট্যমূল্য সহজেই চোখে পড়িবে।[২] সঙ্কেতবাদী নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে সুদূর অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস আনিবার জন্য আর একটি বিষয়ের শরণ লইয়াছেন এবং তাহা হইল কবিত্ব। হাউপ্টম্যান এবং আইরিশ নাট্যকারগণ যে নাটকের ভাষারূপে গদ্যের স্থলে পদ্যকে গ্রহণ করিলেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। গদ্যের মধ্যে আছে একটা নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা ও ব্যবহারিক স্থূলতা, কিন্তু পদ্যের সুর ও ছন্দের মধ্যে আছে একটা সুদূর অজানার অস্পষ্ট চেতনা। জগতের চিরঞ্জয়ী নিত্যতার সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র কবিতায়, সেই জন্যই নিত্যতাসন্ধানী নাট্যকারগণ কবিতাকেই বাছিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক পদ্যে লিখিত না হইলেও ইহার গদ্য যে পদ্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রয়োজন এখন সহজেই অনুমান করা যাইবে।

সাঙ্কেতিকতার আলোচনায় আর একটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন ও উপায়কে স্পষ্ট করিয়া, অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া কোনো গূঢ় ভাবতত্ত্বের আভাস দেওয়া যায় দুই প্রকারে— সাঙ্কেতিক অথবা রূপক রচনার মাধ্যমে। এই সাঙ্কেতিক ও রূপকের পার্থক্য কি? সাধারণত কথা দুইটি একটু শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য প্রায়ই আমরা সাঙ্কেতিককে রূপক ও রূপককে সাঙ্কেতিক বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। কিন্তু দুইটি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমেই ইয়েটসের সেই

১। এ-প্রসঙ্গে Elizabeth Drew-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'But to the average lover of the theatre, the plays of Yeats seem too remote and esoteric to be called dramatic at all. Apart from their lack of character or anything more than the most rudimentary action, they are full of direct symbolism which makes them meaningless to the uninitiated' —*Discovering Drama*, p. 219.

২। 'রবীন্দ্রনাথ এবং হাউপ্টম্যানের নাটকের সাধারণ আখ্যানভাগের দিকটাও অসুন্দর একঘেয়ে নয়। গভীর অর্থের দিকটাই প্রধান কিন্তু কাব্যার্থের দিকটাও মনকে টানে এবং হেলায় অগ্রাহ্য করিবার মত নয়।' রবীন্দ্রনাথ—অশোক সেন, পৃঃ ১০৬

প্রসিদ্ধ উক্তি উল্লেখ করা যাক—'A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle and belongs to fancy and not to imagination : the one is a revelation, the other an amusement'[১] ইয়েটস্ অতি সুন্দরভাবে পার্থক্যটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায়, কিন্তু রূপকে রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়। প্রথমটিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নৈতিক উদ্দেশ্যের সৌন্দর্যময় ছদ্মবেশ। অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ তো বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে—যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু মানুষের নৈতিক জগতের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা সহজ। সেজন্য সাঙ্কেতিক রীতিতে যাহা অপ্রকাশ্য শেষ পর্যন্ত তাহা অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায় ; কিন্তু, রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র।[২]

ওমর খৈয়ামের কাব্য, টেনিসনের 'Princess', অথবা রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' যখন পড়ি তখন বুঝিতে পারি যে ব্যক্ত রূপ-রস সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করাই কবিদের উদ্দেশ্য। সেইসব তত্ত্ব যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিনিবার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাইলে তাহাদের পরিচয় আর অস্পষ্ট থাকিবে না। একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে—উদ্দিষ্ট তত্ত্ব ও সত্যকে যবনিকার অন্তরালে রাখিবার প্রয়োজন কি, সোজাসুজিই তো তাহাদিগকে সম্মুখে আনা যাইত! না, তাহা হইলে তত্ত্ব ও সত্যের বিবৃতি হইত, কিন্তু সাহিত্য হইত না। সাহিত্যের মধ্যে সুন্দরের ছলনা একটু থাকা দরকার। এই ছলনাটুকুর জন্যই সাহিত্যের সহিত দর্শন ও

১। *Ideas of Good and Evil*—p. 123.

২। গ্যেটে রূপক ও সাঙ্কেতিকের পার্থক্য বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিলে এ সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে—'Allegory transforms the phenomenon into a concept, the concept into an image, but in such a way that in the image the concept may even be preserved, circumscribed and complete at hand and expressible'.

'Symbolism transforms the phenomenon into an idea, the idea into an image, in such a way that in the image the idea still remains unattainable and for ever effective and, though it be expressed in all languages, yet remains inexpressible.'

নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য। 'Faerie Queene','Divine Comedy' ও 'Pilgrim's Progress' তত্ত্বগর্ভ রূপক রচনা হইলেও সাহিত্য এ-কথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। এখানে মানুষের মনোজগতের কোনো তত্ত্ব নহে, সেই মনোজগতের অতীত সীমাহীন অনির্বচনীয় জগৎকেই আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার একটা লোকায়ত্ত চেষ্টা হয় মাত্র। এখানে ব্যাখ্যা নহে, বিস্ময়; শিল্পচেতনা নহে, অধ্যাত্ম-সাধনাই মুখ্য কথা।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনা সুরু করিব। রবীন্দ্রনাথের নাটককে আমরা রূপক বা সাঙ্কেতিক কোন পর্যায়ে ফেলিব? শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী এই নাটকগুলিকে তত্ত্বনাট্য বলিয়াছেন। ইহাতে সরাসরি সমস্যাটির সম্মুখীন হইতে হয় না বটে, কিন্তু মুশকিল বাধে তখন যখন একটা বিশেষ নাটকীয় অভিধা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনাকালে রূপক ও সাঙ্কেতিক এই কথা দুইটি একটু শিথিল ও অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাথমিক সমালোচকেরা রূপক কথাটিই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কেহ কেহ সাঙ্কেতিক কথাটি প্রয়োগ করিলেও রূপকের সহিত ইহাকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তই সম্ভবত সর্বপ্রথম রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সাঙ্কেতিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] রূপক ও সাঙ্কেতিক—এই দুইটি বিষয়সম্বন্ধে বিজ্ঞ সমালোচকদের মধ্যেই যে কতখানি মতভেদ রহিয়াছে একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত 'ডাকঘর' ও 'রাজা'—এই নাটক দুইখানিকে শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়াছেন, অথচ শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর মতে ঐ দুইখানি রূপক নাটক। আবার অন্যপক্ষে বিশী মহাশয় 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'অচলায়তন'কে অবিমিশ্র সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়াছেন, কিন্তু ডঃ সেনগুপ্তের মতে ঐগুলি সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটকের মিশ্রিত রূপ। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেই এতখানি মতবিরোধ দেখা গেলে সাধারণ পাঠক রূপক-সাঙ্কেতিকের মীমাংসা করিবে কি প্রকারে? সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে এপর্যন্ত

১। 'রবীন্দ্রনাথের নাটক সাঙ্কেতিক। তাহার মধ্যে রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু অরূপ, অসীমের সন্ধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য।' —রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, পৃঃ ২২০

যে আলোচনা করিয়াছি তাহার সূত্র ধরিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাঙ্কেতিক না বলিয়া উপায় নাই। অবশ্য কবি তাঁহার কোনো কোনো নাটকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সে সব স্থলে তাঁহার বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া এক একটা সুস্পষ্ট ভাবতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব এবং সে-কারণেই সেই সব নাটক রূপক-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন', 'রথের রশি', নাটকগুলির মধ্যে রূপকার্থ আবিষ্কার করা কঠিন নহে ; কিন্তু, তবুও এগুলিকে পুরাপুরি রূপক বলা চলে না। কারণ, প্রথমত নাটকগুলিতে বহু সাঙ্কেতিক বস্তু বা প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত অরূপ, অসীম রহস্যের দ্যোতনা ইহাদের প্রায় প্রত্যেকখানির মধ্যেই পাওয়া যায়। রঞ্জনের দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টতায়, নন্দিনীর অলৌকিক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনায়, অভিজিতের দুঃসাধ্য অভিযানে, পঞ্চকের প্রাণের ঘূর্ণিছন্দে, বিশু-পাগলের দুঃখসাধনায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী ও দাদাঠাকুরের অতীন্দ্রিয় আনন্দবাদে কি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন রহস্যলীলার সঙ্কেতই ফুটিয়া উঠে নাই? 'রাজা' ও 'ডাকঘর'-এর তো কথাই নাই, কারণ ঐ দুইখানি বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটক। উহাদের বাদ দিলেও 'শারদোৎসব', ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটককেও তো সাঙ্কেতিক না বলিয়া উপায় নাই। অরূপের রূপের লীলাই ঐ সব নাটকে প্রকাশিত, তাহাতে আলো, রঙ ও সুরের পরশ থাকিলেও তাহা যে শব্দ-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শহীন জগৎ হইতেই অদ্ভুত! রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে আর কোন্ কবি কবে পারিয়াছেন? ইউরোপের সাহিত্যিকগণ যে আত্মার সন্ধান, যে অতীন্দ্রিয় লীলার পরিচয় পাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা ভারতের ধূলায় ও বাতাসে, আকাশ ও অন্তরীক্ষে চিরকাল জাগ্রত সত্য হইয়া রহিয়াছে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়' বলিয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহারা পারমার্থিক মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী ইউরোপের পক্ষে পরমার্থতত্ত্ব মানুষের মুক্তির নূতন সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু এই সত্য ভারতের কাছে কিছু নূতন নহে। অধ্যাত্মবাদী ভারতের চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নব সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং 'খেয়া' পর্বে কবির অধ্যাত্ম-চেতনার পূর্ণতম প্রকাশ হইয়াছিল। সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন নাটকের মধ্যেও এই চেতনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নাটকের সর্বত্রই অরূপকে রূপ দিবার আকাঙ্ক্ষা, অসীমকে পাইবার আকুতি, অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরিবার আয়োজন ; সেই নাটককে সাঙ্কেতিক নাম না দিয়া আর কি নাম দিব?

রবীন্দ্রনাথ কবি, চিরসুন্দরের মবমীয়া পূজারী ; তাঁহার নিজের কথায়, 'আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস' ; কিন্তু তবুও একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, তিনি জীবনের সুন্দর রূপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তত্ত্বরূপও দেখিয়াছেন। সৃষ্টির গভীর লীলারহস্য, মানুষী সম্বন্ধেব আবর্ত-জটিল তরঙ্গ-বিক্ষোভ তাঁহার চেতনাকে নিরন্তর বিচলিত করিয়াছে। 'খেয়া'-পর্বের পূর্ব পর্যন্ত জীবন ও জগতের রসাবেগ এত প্রবল হইয়া রহিয়াছে যে সব চিন্তা ও তত্ত্ব তাহার মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'খেয়া'-পর্বে আসিয়া সেই উচ্ছ্রিত ও উদ্বেল ধারা শান্ত হইল এবং সেই অচপল, রহস্য-গহন ধারার মাঝে এক একটি তত্ত্বরূপ শতদলের মত শোভা পাইতে লাগিল। শতদল বলিলাম এজন্য যে, কবির হাতে নিছক একটি তত্ত্বও অপূর্ব সুন্দর মূর্তি লাভ করিয়া আমাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে 'খেয়া'-পর্বের কবিতাগুলি অপেক্ষা নাটকগুলির মূল্য বেশি। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বই প্রধান, কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের পবিপূর্ণ মিলন। সৌন্দর্যের কথা পবে আলোচনা কবা যাইবে, তবে তত্ত্বেব কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, ইহা কবির অন্তরে অনুভূত এক নবায়িত সত্যরূপ, কবির সত্তা-নিরপেক্ষ কোনো নৈর্ব্যক্তিক বস্তুময়তা ইহাতে নাই। বিশ্বের চিন্তা ও প্রবণতা, সমাজ-ব্যবস্থাব বন্ধন ও অবিচার, রাষ্ট্রিক স্বার্থেব কদর্য-কুৎসিত রূপ কবির মানস-অনুভূতিতে যে বেদনার্ত প্রতিবাদ জাগ্রত ক রয়াছে তাহাবই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার তত্ত্বনাটকে। এই নাটকের তত্ত্ব সর্বজনীন চিন্তার সঙ্গে অনেক স্থলে যুক্ত হইলেও ইহা কবির মানস-অনুভূতির একটি বিশেষ রূপ, সেজন্য কোনো সাবিক ism বা মতবাদের মধ্যে ইহাকে ফেলা চলে না। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী তত্ত্বনাটকগুলির বিষয় তিনটি মূল সমস্যায় বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক, (২) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক, (৩) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক।[১] রবীন্দ্রসাহিত্যে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই তিনটি সম্পর্কই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কগুলিকে পৃথক্‌ভাবে বিভাগ করা কি সম্ভব? কবির মানস-চেতনায় সম্পর্কগুলি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সাহিত্যেও মানুষ, প্রকৃতি ও ভগবান এক অখণ্ড রসরূপ লাভ করিয়াছে। 'রাজা'র মধ্যে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্ক প্রধান হইলেও বসন্ত প্রকৃতি কি এই নাটকের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ

১ রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬

নহে ? 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা'য় মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক প্রধান হইলেও ঐ নাটক দুইখানিতে দাদাঠাকুর ও ধনঞ্জয় বৈরাগী তো ভগবানেরই দূত! তেমনি 'রক্তকরবী'তেও মানুষী সংঘাতের মধ্যে পৌষালি প্রকৃতিও এক অবিচ্ছিন্ন সরসতা সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যজীবন বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন চেতনা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে—যেমন আদি পর্বে প্রকৃতি, মধ্য পর্বে ভগবান ও অন্ত্য পর্বে মানুষ। কিন্তু এরূপ বিভাগসত্ত্বেও একথা কখনই বলা চলে না যে, ইহাদের মধ্যে একটি যখন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন অপরগুলি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, বিশেষত মানুষ ও প্রকৃতিকে তো কখনই না। ইহা যেন তাঁহার সমগ্র সাহিত্যজীবন সম্পর্কে সত্য, তেমনি সত্য তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকগুলি সম্পর্কে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের তত্ত্ববস্তু ও নাট্য-সংঘাতের মূলে রহিয়াছে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সহিত জড়ধর্মের। এই দ্বন্দ্বটি প্রায় সব নাটকেই বর্তমান এবং আমার মনে হয়, কবির সাঙ্কেতিক নাটকের মূলবস্তু ইহাই। এই বিষয়টি লইয়া একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাই। যে প্রাণ ধর্মের কথা বলিলাম, তাহার প্রকাশ হইয়াছে প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকের নায়ক চরিত্রের মধ্যে—যেমন অমল, পঞ্চক, অভিজিৎ, নন্দিনী ইত্যাদি। ইহারা কবিহৃদয়েরই শাশ্বত-মানসমূর্তি, মুক্তির বাণীবাহক—যে মুক্তির স্বপ্নে কবির জীবন আজন্ম বিভোর হইয়াছিল। মুক্তির মধ্যেই জীবন, মুক্তির মধ্যেই আনন্দ, তখন 'বাধা নাই, কোনো বাধা নাই'। এই অবাধ মুক্তির প্রকাশ যখন, তখনই মানুষের অবারিত প্রাণের প্রতিষ্ঠা। তখন মানুষে মানুষে বাধা নাই, মানুষ ও প্রকৃতির কোনো ব্যবধান নাই, এমন কি মানুষ ও ভগবানেরও কোনো দূরত্ব নাই। তখন মানুষ বিশ্বমানুষ হইয়া উঠে, বিশ্বমানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলিত হয় এবং বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্বদেবতার লীলাস্থল হইয়া যায়।

কিন্তু এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা নির্বাধ নহে, নিষ্প্রাণ জড়শক্তির নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলিয়াছে ইহার সহিত। এই জড়শক্তি বিভিন্ন আকার ও প্রকারে দেখা দিতে পারে, কিন্তু ইহার ধর্ম এক, উদ্দেশ্যও এক। ইহার নৃশংস লৌহবাহু মুক্ত প্রাণের সানন্দ বিকাশকে সতত পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত। এই জড়শক্তি 'অচলায়তন'-এ অন্ধ সংস্কার, 'ডাকঘর'-এ গৃহবদ্ধ শাসন, 'রাজা'য় সকাম দেহতন্ত্র, 'রক্তকরবী'তে আকর্ষণজীবী ধনতন্ত্র এবং 'মুক্তধারা'য় সাম্রাজ্যবাদী লৌহযন্ত্রের রূপ ধারণ

করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত প্রাণের এই সব বাধার বিরুদ্ধে চিরকাল তাঁহার সুতীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে এই প্রতিবাদ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবি নিজস্ব মত ও আদর্শ এই সব নাটকে কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই, নিঃসন্দিগ্ধ দৃঢ়তার সহিত সেগুলিকে সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার উক্তি কোথাও কোথাও একটু আধটু কটু ও তিক্ত রসাশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। 'তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে—পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে'।—এই হাসি সাঙ্কেতিক নাটকগুলির বহু স্থানেই উপচিত হইয়াছে। একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কবির ব্যঙ্গ মূল বিরোধী শক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট নহে; কারণ প্রাণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহারও একটা নীতি আছে এবং তাহার শক্তি নিন্দনীয় হইলেও অশ্রদ্ধেয় নহে। সেজন্য কবি তরল হাসির আঘাতে তাহাদিগকে লঘু করিতে চাহেন নাই—কাঞ্চীরাজ, মহাপঞ্চক, বিভূতি ও জালেঘেরা রাজা—কাহাকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু, কবির হাসির আঘাত ক্ষমা করে নাই স্তাবক, স্বার্থপর, নীচাশয় চবিত্রগুলিকে। উপাধ্যায়, উপাচার্য, মোড়ল, অধ্যাপক, গুরুমহাশয় প্রভৃতি চবিত্রেব প্রতিই তিনি ব্যঙ্গের বাণগুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন, যাহাদেব নীতির বালাই নাই, নিষ্ঠার পরোয়া নাই, মান অপমানেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু এই নাটকগুলিতে শুধু কবির ব্যঙ্গ নহে, বেদনাও প্রকাশ পাইয়াছে। কবি শেলি একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'I grow weary to see the strong and the selfish still tyrannise without reproach or check'- সেই দুঃখ রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও বাসা বাঁধিয়াছে। এই দুঃখ অবরুদ্ধ প্রাণের দুঃখ, অপমানিত মনুষ্যত্বের দুঃখ। সমাজব্যবস্থার আসল গলদ কোথায়, রাষ্ট্রশাসনের যথার্থ রূপ কিভাবে প্রবর্তন করা যায়, ধনতন্ত্রী অত্যাচারের মূল কোথায় নিহিত রহিয়াছে—এসব বিষয়ে কবি সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন নাই। তবে তিনি দেখিয়াছেন, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন সব নীতি ও নিয়ম রহিয়াছে যাহাদের ফলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ পদে পদে খণ্ডিত হয়। উপনন্দ, পঞ্চক, সুভদ্র, অমল, অভিজিৎ, বিশু, ধনঞ্জয় বৈরাগী—ইহারা মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষের জীবন-কাব্য দুঃখের অশ্রুলেখায় রচিত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে এই দুঃখভোগী মানুষের সংগ্রামের কথাই সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখ তো দুঃখ নয়, দুঃখের কাঁটা যে তাঁহার হৃদয়ের

স্নিগ্ধ পরশে আনন্দের কমল হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য কবি যদিও দুঃখভোগী মানুষের দুঃখ দেখাইয়াছেন, তথাপি সেই দুঃখের অশ্রুকালিমা আনন্দের আলোক-বন্যায় ধুইয়া গিয়াছে। দুঃখ তো মানুষের পরম গৌরব, তাহার চিরকালের অভীপ্সিত সম্পদ। ইহার মধ্য দিয়াই তো দুর্লভ মনুষ্যত্বের কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। এই দুঃখের চরম আঘাত যদি আসে, যদি মৃত্যুই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা' অপেক্ষা তাহা যে অনেক মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর! অমল, অভিজিৎ, রঞ্জন—ইহারা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের যে পরমতম গৌরব লাভ করিল তাহা কোন্ জীবিত মানুষের পক্ষে সুলভ? রবীন্দ্রনাথের নাটকে এজন্য দুঃখই দুঃখের পরিণাম নহে, মৃত্যুই জীবনের সর্বশেষ নহে। দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া কবির অদম্য আনন্দ ও আশাবাদ সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে। জড় ও জীবনের সংগ্রামে জড়ের আংশিক ও প্রাথমিক জয় হইতে পারে, কিন্তু অন্তিম ও সামগ্রিক জয় জীবনের, ইহা রবীন্দ্রনাথের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। সেজন্য অচলায়তনের প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়াছে, যক্ষপুরীর জাল ছিঁড়িয়াছে ও মুক্তধারার বাঁধ ভাসিয়া গিয়াছে। সেজন্য পঞ্চকের প্রাণমাতানো গান মেঘ-মেদুর আকাশকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, পথচারী অভিজিৎ তাহার পথের সন্ধান পাইয়াছে আর নন্দিনীর আনন্দ-লীলায় মৃত পাষাণপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের ছন্দ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের এই অন্তর্নিহিত আনন্দরসের মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের একাত্ম যোগ। তাঁহার নাটক যে শুধু মাত্র তত্ত্বসর্বস্ব হইয়া যায় নাই, রূপে রসে ইহা যে এক অনিন্দ্য সৌন্দর্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, ইহাতে মানবপ্রকৃতির প্রাণ ও প্রেরণা আসিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির উদার উন্মুক্তি ও অপার জীবন-রহস্য হইতে। রবীন্দ্রনাথ যে কবি, সুন্দরের পরশে যে তাঁহার অঙ্গ পুণ্য ও অন্তর ধন্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তো আমরা কখনও ভুলিতে পারি না! এই সুন্দরের স্বর্ণকমল ফুটিয়া উঠে বিশ্বপ্রকৃতির আলো-গন্ধ সুর ও ছন্দে ভরা আসনে। কবি রহস্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে এই স্বর্ণকমলের সন্ধান করিয়াছেন, সাঙ্কেতিক নাটকেও ইহার কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই। মানুষের গৃহবদ্ধ জীবন সঙ্কীর্ণ ও খণ্ডিত, এ জীবন ভূমার পরশ ও প্রভাব তখনই লাভ করে যখন ইহা বিশ্বপ্রকৃতির অবারিত আনন্দ-মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সেজন্য ঘরের মানুষ বাহিরের জন্য পাগল—'আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে' তাহারা লুট করিতে চায়।

নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়িয়া অনিশ্চিত পথকেই তাহারা অবলম্বন করে। উদয়াদিত্য, অভিজিৎ, বাউল, ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা—সকলে তো এই পথের খেলাতেই পাগল। ঘরের মধ্যে নিরাপদ আরাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সত্যসন্ধানী মানুষ তাহাদের জন্য 'ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল', বিঘ্ন-বিপদজড়িত চল-চঞ্চল পথের ইশারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করে; রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্রগুলি সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলনে যখন বাধা দেখা দেয় তখন হয় অশান্তি, তখনই আসে কবিহৃদয়ের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে প্রত্যেকটি নাটকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থান লাভ করিয়াছে তাহা নিশ্চল জড় প্রকৃতি নহে, তাহা সচল জীবিত প্রকৃতি। সেজন্যই তো তাহার এত বৈচিত্র্য, রূপ ও রঙের এত পরিবর্তন! এই বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে ঋতুরঙ্গের নিত্য লীলা-পরিক্রমা। রবীন্দ্রনাথের এক একটি নাটকে এক একটি ঋতুর লীলাময় রূপ আমরা দেখিয়াছি।[১] বর্ষার সজল-মেদুর রূপ ফুটিয়াছে 'অচলায়তন'-এ, শরতের স্নিগ্ধ-শুভ্র লীলা প্রাণলাভ করিয়াছে 'শারদোৎসব'-এ, শীতের সোনালী ধানের মায়া জাগিয়া উঠিয়াছে 'রক্তকরবী'তে ও বসন্তের আনন্দ-লীলার আসন পাতা রহিয়াছে 'ফাল্গুনী' ও 'রাজা' নাটকে। ঋতুর এই বিচিত্রতার মধ্যেও কিন্তু একস্থলে অনন্য ঐক্য দেখা গিয়াছে, এবং তাহাও হইল আনন্দরসের অভিব্যক্তিতে। প্রকৃতির যে রূপই কবি দেখান না, তাহা সর্বত্রই আনন্দরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শীত ও বর্ষা পর্যন্ত কবির চিত্তে কেবল আনন্দই বহন করিয়া আনিয়াছে। এই আনন্দময়ী প্রকৃতি তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, পঞ্চকের চোখে তাই শ্যামল মেঘের উতলা আহ্বান, সুদর্শনার অন্তরে শিরীষ কুসুমের মত্ততা, আর নন্দিনীর গানে পৌষালি ফসলের প্রাচুর্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই প্রকৃতিপ্রাণতার সহিত আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন—তাহা হইল গীতিধর্মিতা। এই গীতিধর্মিতা তাঁহার সাহিত্যের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যের সর্ববিভাগ, যথা—গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে ইহা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। অবশ্য ইহাতে তাঁহার সাহিত্যের উপকার ও অপকার দুই-ই ঘটিয়াছে। মানুষের সাধারণ অর্থময় ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দ্বারা সীমাতীত ও গুহাহিতকে প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁহার 'রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহে' (১ম খণ্ড) ঋতুলীলা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

সঙ্গীতের সুর ও ছন্দ তাহার আভাস দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির মর্মবস্তু এই মতের পরিপোষকরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া যে বিপুল ভাবরাজ্যকে উদ্ঘাটিত করা যায় এক ঝুড়ি কথা দিয়া তাহার প্রান্ত দেশেও পৌছান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকখানি নাটকে এমন এক একটি সঙ্গীত আছে যাহার মধ্য দিয়া নাটকের সমগ্র ভাবটি ব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠে। পঞ্চকের মুখে যখন শুনি—'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে, তারে আজ থামায় কে রে'—তখন আমরা অনুভব করি আকাশের ঘন মেঘে মুক্তির ডাক আর নব বৃষ্টিধারায় তাপদগ্ধ তৃষিত মানুষের সঞ্জীবনী সুধা। 'ফাল্গুনী'র যুবকরা যখন মাতিয়া উঠে—'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে', তখন সেই ফাগুনের পরশ সকলের অন্তর রোমাঞ্চিত করিয়া তোলে। 'মুক্তধারা'র ভৈরবপন্থীরা কিছুকাল পরে পরেই রুদ্রগম্ভীর স্বরে যে গান গাহিয়া চলিয়াছে—'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর' তাহার অন্তর্নিহিত ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিভূতির অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রটি যে শিহরিত হইয়া উঠে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক দুর্বোধ তত্ত্বময়তা-সত্ত্বেও যে এত সরস ও সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে এই সঙ্গীতগুলির প্রভাব কম নহে। স্রোতস্বিনীর সরস ধারা যেমন অদৃশ্য মৃত্তিকাপথে সঞ্চারিত হইয়া দূরবর্তী অনুর্বর ভূমিকেও সুজলা সুফলা করিয়া তোলে, এই গানগুলিও তেমন নীরস তত্ত্বভূমির অন্তরে রসধারা সিঞ্চন করিয়া ইহাকে সুদৃশ্য ও সুরম্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গানগুলির দ্বারা নাটকের যেমন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তেমনি আবার স্থানে স্থানে অপকর্ষও ঘটিয়াছে। কবি যেখানে সঙ্গীতপ্রবণতাব ফলে সঙ্গীতের অকারণ আতিশয্য আনিয়া ফেলিয়াছেন সেখানেই এই অপকর্ষ দেখা গিয়াছে। অনেক স্থলে শুধুমাত্র কয়েকখানি গান যোজনা করিবার জন্যই যেন কবি কোনো কোনো চরিত্রকে অনাবশ্যক কারণে গতিশীল ঘটনার মাঝে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 'ফাল্গুনী'র বাউল, 'রাজা'র ঠাকুরদা, 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববাহক হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের নাচগান অনেক স্থলে নাটকের গতিপথে অপ্রাসঙ্গিক বাধা হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকে জীবনের মর্যাদা ও আকর্ষণ যে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা এতক্ষণের আলোচনার মধ্য দিয়া সকলেরই বোধগম্য হইবে। কিন্তু যাহারা জীবনের জয়গান করিয়াছে তাহারা জীবিত হইতে পারিয়াছে কি?

অবশ্য একথা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল যে, সাঙ্কেতিক নাটকে ইন্দ্রিয়-চালিত জীবনের বর্ণাঢ্য বস্তুরূপ আমরা আশা করিতে পারি না। জীবন সেখানে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত, রহস্য কুহেলি-ছায়ায় আবৃত। তবুও একথা সত্য যে, অভিনেয় নাটকের মধ্যে জীবনের একটা বহিরাশ্রিত মানবীয় রূপ থাকা দরকার। প্রমথ বিশী বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে একটিও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য হৃদয়গ্রাহী সজীব চরিত্র চোখে পড়ে না।' একথা কি সর্বাংশে সত্য? রঘুপতি, ক্ষেমঙ্কর, বিক্রমদেব, শঙ্কর, রেবতী, নয়নরামের মত সজীব ও সচল চরিত্র সাঙ্কেতিক নাটকে , কিন্তু মহাপঞ্চক, কাঞ্চীরাজ, বিভূতি, লক্ষেশ্বর, রণজিৎ, অভিজিৎ, সুদর্শনা, নন্দিনীরাও তো একেবারে নির্জীব, নিশ্চল চরিত্র নহে, তত্ত্ববান হইয়াও তো ইহারা প্রাণবান হইতে পারিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকে তত্ত্বের কণ্টকগুল্মে মানুষের হৃদয়ের আনন্দবেদনার কত শতদল ফুটিয়াছে। অম্বার আর্তনাদ, সুভদ্রের বেদনা, কিশোরের আত্মদান, বিভাব প্রায়শ্চিত্ত—এই গৌণ ঘটনার মধ্য দিয়াও কবি তাঁহাব নাটককে মানব-রসাত্মক কবিয়া তুলিযাছেন। তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকে তত্ত্ব নিছক তত্ত্ব নয়, জীবন অহেতুক জীবন নয় , এখানে তত্ত্ব জীবনকে অবলম্বন করে ও জীবন তত্ত্বকে আশ্রয় কবে।

সাঙ্কেতিক নাটকে নাটকীয় রসেব আবেদন প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক নয় বটে, কিন্তু তবুও এই আবেদন জাগাইযা তুলিতে হইবে। কল্পনাকে অতি মাত্রায় উন্মুখ এবং প্রখর বাখিয়া দর্শক বাহ্যক্রিয়ার অভাব পূরণ করিযা লয়। সেই কল্পনারূঢ় দৃষ্টির সাহায্যে ভাবজগতের ক্রিয়া এবং দ্বন্দ্ব সে দর্শন করিয়া বসাপ্লুত হইয়া উঠিতে পাবে। নাটকে সূক্ষ্ম ভাব বাহ্য ঘটনাব স্থান গ্রহণ কবিতে পারে, কিন্তু সেই ভাব যথেষ্ট সত্য ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, মানুষের মনে ইহার সর্বজনীন সহজ আবেদন থাকা দরকার, তাহা না হইলে নাটকের কোনো মূল্য নাই। [১]

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের আলোচনাকালে idea-ব সঙ্গে সঙ্গে নাটকত্ব আমরা বিচার করিব। নাটকীয় গুণগুলি ভাল করিয়া দেখাইতে না পারিলে idea-র চমৎকারিত্বসত্ত্বেও তাঁহার নাটকগুলিকে আমরা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত

১। A. E. Morgan তাঁহার Tendencies of Modern English Drama গ্রন্থে নাট্যকার Yeats-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন—'Real art is a lamp that time can only nourish Symbolism may be its flame, a subtle light illuminating true and beautiful ideas but unless the ideas are true and beautiful, unless they are essentially real, it is but a will o' the wisp leading only to bottomless quags',—p. 247.

করিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, এই নাটকগুলি তাঁহার কাছে খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তব। অবশ্য তাঁহার দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম, এত গভীর তলাশ্রয়ী যে তাঁহার কাছে ভাবজগৎ বাহ্যজগতের মতই জীবন্ত এবং ক্রিয়াময়; কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটক কিভাবে প্রতিভাত হয় তাহাই আমাদের আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার কোনো বিশিষ্ট মতবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহার কবিতা, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে যে মত ও ধারণার সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহারই প্রতিধ্বনি দেখি নাটকে, সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের কাছে তাঁহার নাটকের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত নহে। তাঁহার নাটক সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, নাটকের অন্তর্নিহিত রূপক অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে যাহার স্থান, স্পর্ধা করিয়া কাছারী-ঘরে আসিয়া সে বাহিরের লোকজনকে বিব্রত করে নাই। কবি নিজেও রূপক অর্থ লইয়া অনর্থক মাথা ঘামানো পছন্দ করিতেন না, বক্তব্য অংশের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার কথা বলিতেন। 'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনায় তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় তিনি বলিয়াছেন—'আমার নিবেদন যেটা গূঢ়, তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়, হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁহার নাটকের সাঙ্কেতিক অর্থ না বুঝিলেও নাটকের দৃশ্যগত রস গ্রহণ করিতে তেমন ব্যাঘাত হয় না। 'রাজা', ডাকঘর', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্যস্থ পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্র-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে জমাট নাটকীয় রস আছে তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা সুদূর, অস্পষ্ট, অতীন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে দৃশ্য-জগতের রূপ ও রস সঞ্চার করিয়া আমাদের প্রত্যক্ষের গোচরীভূত করিয়া তোলাই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্দেশ্য। ইহাতে নাটকত্ব অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রহিয়াছে। নাটকের কাজ আমাদের মনের মধ্যে একটা আবেগময় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া রাখা, এবং রবীন্দ্রনাথের সব সাঙ্কেতিক নাটকে এমন একটা চরিত্রের সম্ভাবনা গড়িয়া তোলা হইয়াছে যাহার জন্য আমাদের মনপ্রাণ উদগ্র আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। প্রায়ই কোনো অদৃশ্য রাজা এই ধরনের চরিত্র হইয়াছে। অপরাপর চরিত্রগুলিও নেহাত বাস্তব-সম্পর্কহীন ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহাদের মধ্যে সরস-স্বাভাবিকতা এবং সাধারণ মানবত্ব পুরাপুরি বিদ্যমান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলিকে যথার্থ নাটক বলিতে আমাদের বাধা নাই।

॥ শারদোৎসব (১৩১৫)॥ 'শারদোৎসব' ঋতু-প্রশস্তি পর্যায়ের নাটিকা-রূপে[১] বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়। কিন্তু শরৎ-ঋতুর বাহ্য আনন্দোৎসব বর্ণনাই এই নাটিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ইহার মধ্যে গুহাহিত তত্ত্বের সমাবেশও রহিয়াছে; বিশেষত, উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যে রহস্যঘন সাঙ্কেতিকতার স্পর্শ আছে। সেজন্য সাঙ্কেতিক নাটকের শ্রেণীতে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের আলোকপাতে ঋতু-প্রশস্তি নাটিকা অথবা সাঙ্কেতিক নাটিকা কোনো রূপেই ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে না। প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণে কবি সাড়া দিতে চাহিয়াছেন তাহা সত্য,[২] কিন্তু প্রকৃতির সহিত একময়তা আমরা এই নাটিকায় যথার্থরূপে দেখিতে পাইয়াছি কি? শরৎপ্রকৃতির আবেগোদ্বেল বর্ণনা মাঝে মাঝে আমরা সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ইহা কোথাও অবিচ্ছেদ্য প্রভাবরূপে কোনো চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া যায় নাই। উপনন্দের সহিত প্রকৃতির যোগ তো একেবারেই নাই। অভিজিৎ কিংবা পঞ্চক হৃদয়েব প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রকৃতির যে দুর্দম আনন্দ-নৃত্য অনুভব করিয়াছে উপনন্দ তাহার কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই নাটিকার ঠাকুরদা চরিত্রের সহিতও প্রকৃতিব কোনো গভীর আনন্দ-সম্পর্ক নাই। রাজসন্ন্যাসীর একাধিপত্যে ঠাকুরদা এখানে নিতান্তই উপেক্ষিত মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং তিনি ও তাঁহার ছেলের দল ছুটির আনন্দ যতখানি ব্যক্ত করিয়াছেন প্রকৃতির আনন্দ ততখানি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এই নাটিকায় সাঙ্কেতিক রহস্যের কোনো সুষ্ঠু রূপাঙ্কন আমরা দেখিতে পাই না। উপনন্দের ঋণশোধের ব্যাপারটির উপর কবি স্বয়ং অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কারণ কবি যেখানেই এই নাটিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেখানে এই বিষয়টিই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[৩] এই নাটিকার বিষয়বস্তু অবলম্বন

১। বিশ্বভারতী কর্তৃক ঋতু উৎসব পর্যাযের পাঁচটি নাটিকাব নাম—'শেষবর্ষণ', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত', 'সুন্দর', 'ফাল্গুনী'।

২। কবিব নিজের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'মানুষেব সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হয়ে ওঠে।'

৩। 'কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলা ছেড়ে সে তার প্রচুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে ব'সে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম।' —'আমার ধর্ম'

করিয়া পরবর্তী কালে যে নাটিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহার নামও তিনি 'ঋণশোধ' রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঋণশোধের বিষয়টি নাটিকার মধ্যে কতখানি অংশ লাভ করিয়াছে?—নিতান্তই সামান্য সন্দেহ নাই। নাটিকার মূল ধারার মধ্যে উপনন্দের বৃত্তান্তটি প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া-পড়িয়াছে মাত্র। আর একটি বিষয় বিচার্য। উপনন্দ ঋণশোধ করিবার জন্য যে কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে তাহাতে কর্তব্যবোধ যতখানি আছে আনন্দবোধও কি ততখানি আছে? সম্ভবত নাই।[১] যদি থাকিত তাহা হইলে লক্ষেশ্বরের অপমানে সে নিজেকে ঋণমুক্ত ভাবিতে পারিত কি? রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যাখ্যায় ও নাটকীয় চরিত্রের কথায় উপনন্দের ঋণশোধের একটি গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যের আভাস দিয়াছেন সন্ন্যাসীর কথায়—'আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করবে। বড সহজে করবে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করবে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেচে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ।' এইভাবে উপনন্দের ব্যক্তিগত সত্যবোধ একটি সর্বময় জগৎসত্যে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু নাটিকার এই মর্মবাণী ইহার ঘটনা ও চরিত্রায়ণে মোটেই পরিস্ফুট হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে নাটিকাটির মূল চরিত্র হইল রাজসন্ন্যাসী এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার রহস্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। বিজয়াদিত্যের ছদ্মবেশ এবং তাঁহার ছদ্মবেশ মোচনই একমাত্র কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা। অবশ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কবি বোধহয় রাজচরিত্রের একটি আদর্শ রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'—এই সত্য কবি সন্ন্যাসী-চরিত্রটির মধ্য দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। তবুও একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে সন্ন্যাসী-রূপ রাজার ছদ্ম রূপ। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজাই হইয়া উঠিলেন। সেজন্য সন্ন্যাসীরূপে তিনি মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির যে আনন্দদ্যোতনা অনুভব করিয়াছেন তাহা তাঁহার রাজসত্তার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সে সন্দেহ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।[২] এই রাজসন্ন্যাসী চরিত্রটির সহিত সর্বাপেক্ষা গভীর

১। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এ সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—'কিন্তু উপনন্দ নিজে তাহার ঋণশোধের কর্মের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল কি? অন্তত তাহার ভাবণ ও কর্মের মধ্যে সে পরিচয় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, বরং কর্তব্য তাহার কাছে কতকটা বেদনার ভার, যদিও সে ভার সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে'। —রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (২য় খণ্ড)—পৃঃ ১২৯।

২। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের মত গ্রহণযোগ্য—'বরং ইহাই মনে হয় যে, সন্ন্যাসীর বেশের মত ইহাও তাঁহার একটা বিশেষ ভঙ্গীমাত্র, মজা দেখিবার জন্য যে কোন সময়েই তিনি বাহির হইতে পারেন, শরতের ঐশ্বর্য উপলক্ষ্য মাত্র।' —রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—পৃঃ ২৩৩।

সংযোগ ও সংঘাত ঘটিয়াছে লক্ষেশ্বর চরিত্রের। লক্ষেশ্বর আদর্শ নভোচারী মানুষ নহে, সে স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর বাস্তব মানুষ। সে নিন্দনীয় হইলেও যথার্থ। সে কুবেরের পূজারী, লক্ষ্মীর পদ্মটির সন্ধান সে পায় নাই। মাটির তলায় অন্ধকারের গর্ভে রহিয়াছে গজমোতি আর মাটির উপরে সারা বিশ্ব জুড়িয়া লক্ষ্মীর পদ্মের পাপড়িগুলি পাতা। লক্ষেশ্বর মাটির তলায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মাটির উপরের পদ্মের সন্ধান পায় নাই। না পাক্, কিন্তু যে নিদারুণ অস্বস্তি ও বেদনা তাহাকে অহরহ বিচলিত করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্রে নিঃসন্দেহে একটি সজীব কারুণ্যের স্পর্শ আসিয়া গিয়াছে।

॥ প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) ॥ 'প্রায়শ্চিত্ত' ঐতিহাসিক নাটকরূপে অভিহিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' হইতে ইহার বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। নাটকের মূল ঘটনা ও চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে, সেজন্য ঐতিহাসিক নাটক-রূপে পরিচিত হইবার যুক্তি হয় তো ইহার আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশ ও রসসৃষ্টি কিছুই ইহাতে নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার বহির্বিপ্লব ও শক্তিসংঘাত অপেক্ষা পারিবারিক অন্তর্বিপ্লব ও সূক্ষ্ম মানসসংঘাত ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দৃশ্যগুলির আত্যন্তিক সংক্ষিপ্ততা ও সংলাপের নিত্যব্যবহার্য সাধারণত্ব[১] অতীত জগতের রহস্যঘন কুহেলী ছিন্ন করিয়া ইহার মধ্যে আধুনিক বাস্তব-জগতের ভাবরস সঞ্চার করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচিত হইয়াছিল এমন এক সময় যখন কবির চিত্ত স্থূল ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যসন্ধানে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে কবিচিত্তের এই ভাবানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকও যে তৎকালীন কবিমানসের সাক্ষ্য কিছুটা বহন করিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাহার কথায় ও গানে ঈর্ষা দ্বন্দ্বভরা জগতের অতীত এক সুখশান্তিময় বিশ্বদেবতার রাজ্যের সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাঙ্কেতিক নাটকে পথের যে সর্বময় আকর্ষণ দেখান হয় এই নাটকেও তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। উদয়াদিত্য, বিভা, ধনঞ্জয়—সকলেই শেষ পর্যন্ত পথে নামিয়া পড়িল। হিংসাপীড়িত রাত্রির অন্ধকার পথ দিয়া নব মুক্তিপথে

১। টমসন সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য— There are many scenes, usually extremely brief—statuesque dialogue by which the action seems never to get forward.'

— *Rabindranath*—p. 208.

তাহাদের যাত্রা, জীবনে চরম রিক্ত হইয়াছে বলিয়াই তো পরম দুর্লভের সাধনা তাহাদের সার্থক। কিন্তু এই সব কিঞ্চিৎকর সাঙ্কেতিকতাসত্ত্বেও নাটকখানিকে খাঁটি সাঙ্কেতিক নাটকের শ্রেণীতে কখনই ফেলা যায় না। কবির অন্যান্য সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যেরূপ অবিচ্ছিন্ন যোগ, যেরূপ কবিত্বময় বাণীর ঝঙ্কার, যেরূপ গূঢ় ভাবরহস্যের পরিমণ্ডল লক্ষ্য করা যায়—এই নাটকে সেরূপ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকখানি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক, অথবা সাঙ্কেতিক নাটক—কোনোটাই হয় নাই। ঐ দুইপ্রকার নাটকের মধ্যে একটি অসমঞ্জস সন্ধি করিতে চাহিয়াছে মাত্র। ইহার ঐতিহাসিকতার মূলে রহিয়াছে তাহার বিষয়বস্তু এবং কবির মানস উৎস হইতে আসিয়াছে ইহার সাঙ্কেতিকতার প্রেরণা। পরবর্তী কালে এই নাটকের অনুপ্রেরণা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক 'মুক্তধারা'। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। চরিত্রের দিক দিয়াও এই মিল সুস্পষ্ট—ধনঞ্জয় তো উভয় নাটকে একই চরিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য যথাক্রমে রণজিৎ, বিশ্বজিৎ ও অভিজিৎ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই নাটকের নাম 'প্রায়শ্চিত্ত' হইল কেন? স্পষ্টতই বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ সহজ সাধারণ অর্থে নামটি ব্যবহার করেন নাই। প্রায়শ্চিত্ত সত্য সত্যই যাহাদের করা উচিত ছিল সেই প্রতাপাদিত্য অথবা রামচন্দ্রের কোনো প্রায়শ্চিত্ত আমরা দেখি নাই। যাহারা পুণ্যাত্মা ও সত্যসন্ধ তাহারাই আঘাত-বেদনা বরণ করিয়া লইয়া নির্বোধ ও নিষ্ঠুর মানুষের জন্য বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করিল—উদয়াদিত্য তাহার পিতার এবং বিভা তাহার স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব নিজেদের জীবনে বরণ করিয়া লইল। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্যের ন্যায় পুত্রকে এবং রামচন্দ্র বিভার ন্যায় স্ত্রীকে হারাইল, ইহাই তো তাহাদের জীবনের করুণতম প্রায়শ্চিত্ত!

নিষ্ঠুর পশুশক্তির সহিত মানুষের অহিংস আত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব হইতেই আলোচ্য নাটকের প্রাণবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতাপাদিত্য হৃদয়হীন পশু, স্নেহ-মমতা, কর্তব্য-কৃতজ্ঞতা—সব মানুষী বৃত্তিগুলিই তাহার হিংস্র জিঘাংসার আঘাতে শতচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য, বিভা,' সরমা, বসন্তরায় প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানাইয়াছে তাহা নীরব ও নিরস্ত্র। হয়তো তাহাদের পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি হইল, কিন্তু তবুও কি তাহারা একটি অপার্থিব

মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরব লাভ করিল না? বন্ধুবর্জিত, স্বজন-পরিত্যক্ত প্রতাপের জীবনে ম্যাকবেথের ন্যায় কি ভয়াবহ একাকিত্ব নামিয়া আসিল! এ পরাজয়ের কাছে তো মোগলদের কাছে পরাজয় তাহার পক্ষে তুচ্ছ! পশুশক্তি যখন রাজার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে তখন দেখা দেয় অরাজকতা। এই অরাজকতার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম দেখা গিয়াছে এবং এই সংগ্রামের নায়ক ধনঞ্জয় বৈরাগী। স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির সহিত উপদ্রুত প্রজাশক্তির যে সংঘাত নাটকের মধ্যে দেখান হইয়াছে তাহাতে বর্তমান যুগবিপ্লবের ইঙ্গিত কি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই?

॥ রাজা (১৩১৭) ॥ 'গীতাঞ্জলি'-'গী'তিমাল্য'-গীতালি' পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথের মন অরূপ-সাধনায় নিমগ্ন তখন তিনি অরূপ-তত্ত্ববিষয়ক নাটক 'রাজা' ('অরূপ রতন') রচনা করেন। রাণী সুদর্শনা বাহ্য রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দরাতীত অরূপকে খুঁজিয়াছিল, ইহা তাহার মোহ। কারণ যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, 'যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়' তাঁহাকে রূপের খাঁচায় দেখিবার চেষ্টা করা ভুল, এই ভুল এবং মোহের ফলে সে তাহার চতুর্দিকে তীব্র জ্বালাময় অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিল। এই দাহে তাহার মিথ্যা অভিমান এবং ভ্রান্ত মোহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, এবং ভিতরের সত্যোপলব্ধি উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সে তখন বুঝিল যে সৌন্দর্যের প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ রূপটি— 'ননীর মত কোমল, শিরীষ ফুলের মত সুকুমার, প্রজাপতির মত সুন্দর' নয়, তাহা 'ঝড়ের মেঘের মত কালো'—'কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।' এই রূপাতীত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায় আপনার চিত্তকে দুঃখতাপে পরিশুদ্ধ করিবার পর। বিপদ ও দুর্যোগের মধ্যেই সুদর্শনা অন্ধকারে ঘরের রাজার সন্ধান পাইল, এই ভাবটি 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতার মধ্যে কবি ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা,
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,

ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

'রাজা'র মধ্যে দুইটি তত্ত্ব—প্রথমত, অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত, এবং দ্বিতীয়ত, দুর্গম দুঃখাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই সত্যশিবকে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী বলিয়াছেন যে, সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ রাজাকে যথাক্রমে দাসী, বন্ধু, মধুর ও শত্রুভাবে ভজনা করিয়াছে। এই মত বিশেষ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদার সহিত রাজার সম্পর্ক সিদ্ধ হইয়াছে, সেজন্য তাঁহাদের মুখে রাজার রূপ ও মহিমার বর্ণনা। কিন্তু দুইজনের মধ্যে প্রভেদ এইখানে যে, সুরঙ্গমা দেখিয়াছে রাজার ভিতরের দিক আর ঠাকুরদা দেখিয়াছেন রাজার বাহিরের রূপ। উভয়েব দেখাই অসম্পূর্ণ, সেজন্য রাজা সুরঙ্গমাকে বাহিরে আনিয়াছেন, আর ঠাকুরদাকে ভিতরে আহ্বান জানাইয়াছেন। সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজের সহিত রাজার পূর্বপরিচয় নাই,দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিচিত্র-জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই রাজার সহিত এই পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে এবং নাটকের আখ্যানবস্তুও ইহাই। সেজন্য সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা রাজা ও স্বয়ং নাট্যকারের মুখপাত্র হইলেও নাটকের মধ্যে নিঃসংশয়িত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ-চরিত্র।

বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে গেলে আর একটি কথা আসিয়া পড়ে। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা ও সুদর্শনার সহিত রাজার যে সম্পর্ক তাহা রাগাশ্রিত। দাসী, সখা ও কান্তারূপে ভজনার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের কোনো দূরবর্তিতা নাই, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহতের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য প্রেমের নিত্যকালীন বন্ধন। বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে এই প্রেমলীলা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।[১] এবং রবীন্দ্রনাথও খুব সম্ভবত ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি কবিতা ও গানে বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি-সাধনার প্রভাব আবিষ্কার করা সহজ। 'বালিকা বধূ,' 'গোধূলি-লগ্ন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমলীলার কথা

১। চৈতন্য চরিতামৃতের ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য—
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।।

বর্ণিত হইয়াছে। খৃস্টান মিস্টিক ও সুফী মতবাদের চিন্তায় হয়তো এরূপ লীলার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বৈষ্ণবদের মত এমন একাত্ম তন্ময়তার সহিত এই লীলা আর কেহই পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। 'রাজা' নাটকে ভক্ত-ভগবানের যে লীলা-সম্পর্ক দেখান হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদে পার্থক্যও আছে। বৈষ্ণবের ভগবান স্বরূপ - কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান অরূপ, দেহের খাঁচার মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবেব ভগবান মাধুর্যময়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সমন্বয়। বৈষ্ণবের ভগবান ভক্তকে বাহিরে আহ্বান করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান ভক্তকে বাহিরেও আহ্বান করেন এবং ভিতরেও আকর্ষণ করেন—বৈষ্ণবসাধনায় স্বকীয়া হইতে পরকীয়ায় মুক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রসাধনায় পরকীয়া হইতে স্বকীয়ায় স্থিতি।

'রাজা' নাটকে দুইটি পরিবেশ চোখে পড়ে, একটি হইল অন্ধকার ঘর, অপরটি বসন্তপ্রকৃতি। এই দুই পরিবেশে কতই না পার্থক্য। একদিকে অন্ধকার ঘরের ভয়ঙ্করতা, অন্যদিকে আলোক-মধুর প্রকৃতির রমণীয়তা। রাজার অধিষ্ঠান অন্ধকার ঘরে, তাহা হইলে বাহিরের এই উৎসবমুখর প্রকৃতির সহিত তাঁহার কি কোনো যোগ নাই? নিশ্চয়ই আছে। বাহিরের মাঝে তিনি বিচিত্র এবং অন্তরের মাঝে তিনি একক, তিনি অরূপ হইলেও রূপের লীলায় প্রকাশিত—'অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'। তিনি রুদ্র হইলেও প্রসন্ন মুখ দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। রাজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ-অনুভূতির এই পরিপূর্ণ সমন্বয় দেখা গিয়াছে। যিনি ভগবানের এই পরিপূর্ণ রূপ অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহার সাধনা খণ্ডিত কিংবা ব্যর্থ। সেজন্য ঠাকুরদা ও সুরঙ্গমার সাধনাও যে খণ্ডিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুদর্শনা অরূপকে বাদ দিয়া শুধু রূপকে পাইতে চাহিয়াছিল, সেখানেই তাহার ভুল। সুদর্শনার দ্বিতীয় ভুল এই যে, রাজাকে সে নিয়ত-সক্রিয় প্রবল পুরুষরূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।[১] এই দুই ভুলের সুযোগ

১। সুদর্শনার দুঃখ এইখানে যে রাজা তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখেন না, রাজার ঔদাসীন্যে তাহার নিদারুণ অস্বস্তি। রাজাকে সে এক জায়গায় বলিতেছে—'তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, কিন্তু রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না—আমি চল্লুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।'

লইয়া সুদর্শনার ভাগ্যাকাশে দুই দুষ্টগ্রহের উদ্ভব—সুবর্ণ ও কাঞ্চীরাজ। সুদর্শনাকে সুবর্ণ চায় গান্ধর্ব মতে, আর কাঞ্চীরাজ চায় রাক্ষস মতে। কিন্তু ভক্তের চরমতম দুর্দিনে ভগবানের অপ্রত্যাশিত করুণা নামিয়া আসে, সুদর্শনার বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যাঁহাকে পাইবার জন্য তাহার এত কামনা, যাঁহাকে না পাইয়া তাহার এত বেদনা, তিনি আপনা হইতেই আসিয়া তাহাকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন সেই ভয়াল-সুন্দর, কান্ত-কঠোর প্রিয়তমের পদতলে সুদর্শনা সব অভিমান ও অপরাধ সমর্পণ করিয়া দিল, এতদিন পরে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল।

এই পর্যন্ত তো গেল তত্ত্বের কথা। এই তত্ত্ব 'রাজা'র মধ্যে প্রধান এবং স্পষ্ট তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ইহার নাটকীয় গুণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এবং এই গুণ না থাকিলে নাটক হিসাবে ইহার কোনো মূল্য থাকিত না। নাটকের চরিত্রগুলি একটা সূক্ষ্ম আইডিয়ার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিলেও সেই দ্বন্দ্ব ক্ষণে ক্ষণে বাস্তব দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। সুদর্শনার মানস-দ্বন্দ্বের তত্ত্বময় ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের বাহ্যরূপটি এত তীব্র গতিবেগ-চঞ্চল যে তাহাকে আশ্রয় করিয়া নাটকীয় রস তত্ত্বমার্গ ত্যাগ করিয়া মানব-হৃদয় অভিমুখে অতি দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ একটি দুর্বার দ্বন্দ্বময় নারীচরিত্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্য-সাহিত্যে খুব কমই আছে। ক্লিওপাট্রা অথবা মিডিয়ার ন্যায় তাহার দুরন্ত ভোগলিপ্সা সর্বপ্রকার সংযম ও সংস্কারকে বিদ্রূপ করিয়া এক অলঙ্ঘ্য সর্বনাশের পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজার নিষ্ক্রিয়, নিষ্কাম আশ্রয় হইতে এই সর্বনাশের ঘূর্ণিনৃত্য তাহাব কাছে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। সেজন্য রাজাকে সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজাকে ত্যাগ করিলেও রাজার কামনা সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। স্বয়ম্বর সভায় যাইবার পূর্বে তাহার অসহায় অন্তর বিদীর্ণ করিয়া অন্তরতম বাণী নির্গত হইয়াছে—'রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেচ, উচিত বিচারই করেচ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সভার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি, বুক চিরে সেটা কি আজ তোমাকে জানিয়ে যেতে পারব না?' বিশ্বরাজার রাণী যে, সে আজ পিতৃগৃহে কলঙ্কিতা দাসী, সে এক কামনালোলুপ সংগ্রামের কলুষিত পাত্রী—তাহার এই অপমান ও বেদনা কঠিনতম চিত্তকেও বিগলিত করে।

আলোচ্য নাটকের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হইল কাঞ্চীরাজ। সুদর্শনার বিভ্রম ও পতনের মূলে কাঞ্চীরাজ—সুবর্ণ তাহার উদ্দেশ্যলাভের একটি অস্থায়ী উপায় মাত্র। সে মদমত্ত রাবণ, সীতাকে হরণ করিবার উদগ্র লালসায় সে অন্ধ। সে জানে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'; সেজন্য স্বয়ম্বর সভায় সে পৌরুষের অভিমানে আভরণকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও বিরোধী শক্তিকে হেয় করেন নাই, কাঞ্চীরাজের চরিত্র সে কারণে অতি জীবন্ত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রাজারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু সে একাই রণক্ষেত্রে রাজার বিরোধিতা করিতে গেল। কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইয়াছে ইহাই তো যথেষ্ট, ইহার পর দীনবেশে তাহাকে রাস্তায় ঘুরাইয়া এবং সুদর্শনাকে মাতৃসম্বোধন করাইয়া এই চরিত্রের এমন কি উৎকর্ষ দেখান গেল? বরং ইহাতে যেন চরিত্রটি একটি অতি সুলভ নীতি-প্রদর্শিত পরিণতিই লাভ করিয়া বসিল।

যে অদৃশ্য রাজার কথা নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি কেবল আধ্যাত্মিক লোকবিহারী সাধনালভ্য ভগবান নহেন, তিনি দীন পতিতের ভগবান, 'লক্ষ মাটির ঢেলা' তাঁহার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, পার্থিব মানুষের সহিত তাঁহার যোগ নিবিড়। 'রাজা' নাটকের তত্ত্বময়তা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক হইত যদি না ইহার গীতিকাব্যময় অংশ আমাদের মনকে আত্যন্ত মধুর রসে পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিত। টমসন সাহেব ঠাকুরদার প্রতি বিরক্ত হইলেও একথা সত্য যে ঠাকুরদা যদি তাঁহার সরস কথা এবং আনন্দময় গানগুলি লইয়া বিরাজমান না থাকিতেন, তবে নাটকখানি নিশ্চয়ই নীরস এবং একঘেয়ে মনে হইত।[১] অজিত চক্রবর্তী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য—"রাজা" নাট্যে বসন্ত উৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুরদার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিক ভাগ এবং বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।'

॥ অচলায়তন (১৩১৮)॥ রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অর্থহীন সংস্কার এবং যুক্তিহীন আচার ও প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। বহুদিনার্জিত অন্ধ এবং বিকৃত সংস্কার ও অনুশাসনগুলি সমাজকে কিভাবে নাগপাশের সহস্র বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাই নাট্যকার 'অচলায়তন' নাটকে দেখাইলেন। মহাপঞ্চক এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ সমাজের তথাকথিত নীচ এবং অস্পৃশ্য জনসাধারণের সীমা

১। টমসনের উক্তি—'As it is, Thakurda with much assistance, able though superfluous spoils everything.'

হইতে নিজেদের সতর্কভাবে পৃথকীভূত করিয়া একান্ত পীড়াদায়ক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা অভিশপ্ত গণ্ডির মধ্যে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছিল। আচার্যের ন্যায় ক্ষমাবান এবং পঞ্চকের ন্যায় প্রাণবান পুরুষের স্থান ইহার মধ্যে হয় নাই। পরিশেষে সত্যবোধের আঘাতে অচলায়তনের প্রাচীর খসিয়া পড়িল, ইহার অধিবাসিদের সঙ্গে বাহিরের উন্মুক্ত আকাশতলবিহারী সর্বসাধারণের সচল যোগ ঘটিয়া গেল।

অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও প্রাণশক্তির সহিত জড়শক্তির সংগ্রাম দেখা গিয়াছে। জড়ের শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, প্রাণের কাছে তাহার শেষ পর্যন্ত পরাজয় হইবেই। এই নাটকও পঞ্চকের জয় ও মহাপঞ্চকের পরাজয়ে সমাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অদম্য আশাবাদী, তিনি অন্য কোনোরূপ পরিণতি দেখাইতে পারেন না। তবে জড়ের এই শক্তি উপেক্ষণীয় নহে, মানুষ ইহাকে আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যত্বের কাজে লাগাইতে পারে। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের মত তখন সে নীরব আজ্ঞাবাহী হইয়া অসাধ্য সাধন করে। গুরু ইহা জানিতেন বলিয়াই মহাপঞ্চককে পরাজিত করিয়াই আবার তাঁহার কাজে নিযুক্ত করিলেন। অচলায়তনের দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব থাকিলেও সেই দ্বন্দ্ব কোথাও তেমন তীব্র উত্তেজনা জাগ্রত করিতে পারে নাই, ইহার দীপ্তি ও দাহ কোনোটাই নাই। মহাপঞ্চকের মধ্যে যেমন সুদৃঢ় শক্তির পরিচয় আছে পঞ্চকের মধ্যে তাহার কোনো সক্রিয় প্রকাশ নাই। তাহাকে মনে হয় যেন শুধু বাঁশির একটি সুর, নির্ঝরের একটি কাকলী। জয়েব গৌরব তাহার নাই, কারণ গুরু যদি না আসিতেন তবে সে কোনোদিন মহাপঞ্চকের বন্ধন ছাড়াইতে পারিত কিনা সন্দেহ। দুর্যোধনের পরাজয় হইয়াছিল, কিন্তু অর্জুনের দিকে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তাহা মনে রাখিতে হইবে। মহাপঞ্চকেরও পরাজয় হইল বটে, কিন্তু এ দৈবশক্তির কাছে পরাজয়। এই শক্তির বিরুদ্ধে সে সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে। সকলে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু একা সে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নির্ভীক চিত্তে তাহার শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে। তাহার পরাজয় হইলেও সেই পরাজয়ে অগৌরব নাই, তাহাতে ট্র্যাজিক মর্যাদা আসিয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে মহাপঞ্চক নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র।

'অচলায়তন'-এ সর্বশক্তির উৎস যে গুরু, তিনি কে? 'খেয়া'র কবিতাগুলিতে এবং অন্যান্য রূপক নাটকে যে রাজার কথা বলা হইয়াছে,. 'অচলায়তন'-এ তাঁহার স্থানে গুরু আসিয়াছেন। এই গুরু অন্ধকার গৃহের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে এই নাটকে গুরুর রূপ এক নহে, ত্রিবিধ।

অচলায়তনে তিনি গুরু, শোণপাংশুদের কাছে তিনি দাদাঠাকুর, এবং দর্ভকদের কাছে তিনি গোসাঁই। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান না হইলেও ভগবানের মহিমা তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্

জ্ঞানবাদী মহাপঞ্চক, কর্মবাদী শোণপাংশু ও ভক্তিবাদী দর্ভকের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত।[১] নাটকের গোড়া হইতেই এই গুরুর আগমন সম্বন্ধে একটি উৎকণ্ঠিত কৌতুহল জাগ্রত করিয়া রাখা হইয়াছে, সকলের মাথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার আগমন সব সময় সম্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বাধার প্রাচীর, সেখানেই গুরুর আবির্ভাব সেই প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য।[২] মহাপঞ্চক অচলায়তন গড়িয়া না তুলিলে গুরুর যোদ্ধবেশে আগমনের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু এই যোদ্ধবেশই তাঁহার সমগ্র পরিচয় নহে। মহাপঞ্চকের কাছে তাঁহার শক্তি পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সহজভাবে ধরা দিয়াছিলেন শঙ্খবাদক ও মালীর কাছে। অচলায়তনের আশ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র শঙ্খবাদক ও মালী তাঁহাকে চিনিতে পারিল, ইহার কারণ কি? অচলায়তনের আর সকলেই যখন শুষ্ক আচারের বালুপথে জীবনের ধারাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল তখন সম্ভবত শঙ্খবাদক ও মালীই জীবনের সুর ও সৌন্দর্য সাধনা করিয়া চলিয়াছিল তাহাদের শঙ্খ ও ফুলের ভিতর দিয়া। সেজন্য বোধ হয় একমাত্র তাহারাই চিনিতে পারিল গুরুকে, মুক্ত জীবনকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব। গুরু যে মূর্তিতে অচলায়তন ধ্বংস করিলেন তাহা তাঁহার ছদ্মমূর্তি মাত্র। যিনি স্নেহ করেন, তিনি শাসন করিতেও পারেন। গুরুর স্নেহ সঙ্কীর্ণতা গ্রাহ্য করে না, মহাপঞ্চককেও তিনি স্নেহ করেন বলিয়া আঘাত করিয়া তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিয়া লইলেন, ত্যাগ করিলেন না। অচলায়তনের

১। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ—'কবির মতে দাদাঠাকুর, গোঁসাই, গুরু—এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে বাদ দিলেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা হইল। কবি বলিতে চান—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা।'

২। 'ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন—আমাদেরও গুরু আসিতেছেন—দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন—তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব, তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত।' —'গ্রন্থ পরিচয়'

প্রাচীর যখন ভাঙ্গিয়া গেল তখন গুরুর সহিত মহাপঞ্চকের আর কোনো ব্যবধানই রহিল না। শত্রু হইয়াও মহাপঞ্চক গুরুর অন্তিম ক্ষমা লাভ করিল, কিন্তু মিত্র হইয়াও শোণপাংশুগণ তাঁহার পরিপূর্ণ প্রশ্রয় পাইল না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, গুরুর পথ নিরপেক্ষ সত্যের পথ, নিঃসন্দিগ্ধ সামঞ্জস্যের পথ। অহং শুধু মহাপঞ্চকের নহে, শোণপাংশুদের মধ্যেও যে বিদ্যমান! সেজন্য তাহারা গুরুর খুব কাছে থাকিয়াও তাঁহাকে পুরাপুরি পায় নাই।[১] গুরু মহাপঞ্চককেই শাসন করিলেন—শুধু তাহাই নহে, তিনি শোণপাংশুদেরও সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু দর্ভকরা কি গুরুকে ঠিকভাবে পাইয়াছিল? একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, দর্ভকদের প্রতি কবি তেমন দরদ দেন নাই।[২] কিন্তু নাটকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়িয়া আমাদের ঠিক বিপরীত ধারণা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গুরু গোঁসাইরূপে দর্ভকদের কাছেই পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়াছিলেন। তাহারা মূর্খ নির্ধন ব্রাত্যজাতি, কিন্তু জীবনের মর্মবাণীটি বোধ হয় তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; অচলায়তনের স্ফীতকায় জ্ঞানগরিমার সহিত তাহাদের লেশমাত্র পরিচয় নাই, তাহারা হাল্কা প্রাণের খুশির ফুৎকারে জীবনের সব ভার ও বোঝা উড়াইয়া দিয়া নাচে-গানে মাতাল হইয়া ওঠে। আবার শোণপাংশুদের মত অবিরাম কর্মের পাকে ঘুরিতেও তাহারা চাহে না, সরল ভক্তিবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কবির মনে যাহাই থাকুক, নাটকের মধ্যে কিন্তু এই ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই দর্ভকরা তাহাদের অন্তরের ভক্তিধারা অবিরল অশ্রুপথে বহাইয়া দিয়াছে, আর সেই অশ্রু-আকূতিকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া 'দীন পতিতের ভগবান' প্রসন্ন চিত্তে তাহাদের মাঝে নামিয়া আসিয়াছেন। দাদাঠাকুর শুধু একা নহেন সকলকে লইয়া দর্ভকদের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইহাদের প্রতি সকলের সাগ্রহ স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইলেন।[৩]

১। দাদাঠাকুর। ছুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়? কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না। —'অচলায়তন' পৃঃ ৫৫

২। 'আমার মনে হয়, এই নাটকের মধ্যে দর্ভকগণ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ কতক পরিমাণে যেন সমস্যা পূরণের জন্যই আনীত হইয়াছে, অন্য দুটির প্রতি কবির যেমন দরদ, ইহার প্রতি দরদ তেমন গভীর নয়।' —'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ'—শ্রীপ্রমথ বিশী, পৃঃ ৭৬

৩। দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

'অচলায়তন'-এর তাত্ত্বিক ও কাব্যিক রূপ বাদ দিলেও ইহার একটি বাস্তব সমাজ-রূপ আছে, সেই সমাজ-রূপের মধ্য দিয়া কবির সমাজ-দৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দৃষ্টি সুচিন্তিত সমন্বয় ও সুব্যবস্থিত সামঞ্জস্যের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সেজন্য তাঁহার এক চোখ ভবিষ্যতে প্রসারিত অন্য চোখ অতীতে নিবদ্ধ; তাঁহার এক পদ অগ্রসর হয়, আর এক পদ আঁকড়াইয়া থাকে; তাঁহার এক হাত রুদ্রের ত্রিশূল দিয়া ধ্বংস করে, অপর হাত বিষ্ণুর সুদর্শনদ্বারা রক্ষা করে। অচলায়তন তিনি শুধু ভাঙেন নাই, তিনি তাহা গড়িয়াও তুলিয়াছেন। মহাপঞ্চক বাঁধন জড়ায় ও পঞ্চক বাঁধন কাটে, কিন্তু তবুও তাহারা দুই ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনই তো কবির আকাঙ্ক্ষিত। বিদ্যাবুদ্ধি, মানমর্যাদার আত্মস্ফীত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যখন আমরা এক সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের বদ্ধ করিয়া রাখি, তখন আলো ও রসের অভাবে আমাদের জীবন জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু অগণিত প্রাণের চাপে যেদিন সেই মোহলালিত বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেদিন হয় নব আয়তনের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তখন আর অচল আয়তন নহে, সচল আয়তন। সেই আয়তনে 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে' মানুষের প্রাণের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা। কবি সেই প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা রহিয়াছে দূরে, কবির স্বপ্নভরা ভবিষ্যতের মর্মস্থলে।

॥ ডাকঘর (১৩১৮) ॥ রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'ডাকঘর' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। একটি সৌন্দর্যপিয়াসী, সুদূরবিলাসী চিত্তের আর্তি ও বেদনা নাটকখানির মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। অমল যেন রুদ্ধগৃহবাসী বালক রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। সৌন্দর্যময়, রহস্যময় বাহির শত লক্ষ বাহু প্রসার করিয়া আকুল আহ্বান জানাইতেছে, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া অমল যেন বলিতেছে—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী,
দিন চ'লে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।

কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় জীবন ও জগতের রহস্যরসে মন মাতিয়া থাকে, পরিচিত দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অদ্ভুত ও রহস্যময় বিষয়ের সন্ধানে মন

ঘুরিতে থাকে।[১] অমলের কাছেও সেইরূপ সাধারণ ও সচরাচর-দৃষ্ট ব্যাপারগুলি পরম রহস্যদ্যোতক, এবং অজানা অচেনা অনন্তর পথের সূচক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা সৃষ্টির এইরূপ রহস্য জানা যায় না, বহু পুঁথিপড়া কবিরাজ ইহার কোনো সন্ধান পায় নাই, কিন্তু অমল পাইয়াছে। শিশুকালে সংসারের সহিত সম্পর্ক শিথিল এবং ভগবানের সহিত যোগ গভীর থাকে, সেইজন্য শিশু যে সত্যবোধ লাভ করে বয়স্ক লোক তাহা পারে না। রাজার চিঠি অমলের কাছেই আসে, মোড়লের মত সাংসারিক লোক তাহা না বুঝিয়া পরিহাস করে। স্থূল বিষয়লিপ্ত মাধব দত্ত রাজার কাছে পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করিতে চায়, কিন্তু অমল চায় ডাকহরকরার কাজ লইয়া নব নব রূপ-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে। যে দেহ-খাঁচার মধ্যে অমল আবদ্ধ ছিল, অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার সৌন্দযপিপাসু চিত্ত অখণ্ড, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধান পাইল, মৃত্যুর পরে সব রহস্যের তলে এতদিনে সে পৌঁছিতে পারিল।

অমলের আকৃতি ও ব্যাকুলতা একটা গভীর তত্ত্বব্যঞ্জক হইলেও শিশু-চরিত্রের কৌতূহলী রহস্যপ্রিয়তা তাহার ভূমিকাকে বিশেষ সরস করিয়া তুলিয়াছে। সে একদিকে মাধব, মোড়ল, কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা এবং অন্যদিকে ঠাকুরদা ও সুধার দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছে। এই সব চরিত্রের দ্বন্দ্বে নাটিকাখানি রূপকতত্ত্ব সত্ত্বেও যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়াছে।[২] শেষের দিকে রাজদূত, রাজকবিরাজ, সুধা প্রভৃতির আগমনে আমাদের মন কৌতূহলে কম্পমান হইয়া থাকে।

॥ ফাল্গুনী (১৩৩২)॥ 'পূরবী'-'বলাকা' যুগের নাটক 'ফাল্গুনী'। বাংলার কবি নোবেল প্রাইজ পাইয়া বিশ্বকবি হইয়া উঠিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাময় পথ অতিক্রম করিয়া তিনি পাশ্চাত্ত্যের বস্তুবাদ ও গতিবাদের পথে

১। 'ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহা দেখা যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।' 'জীবন-স্মৃতি,' পৃঃ ২০-২১

২। 'কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল, কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূল ভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফটিকব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস।' 'কাব্যপরিক্রমা'—শ্রীঅজিত চক্রবর্তী, পৃঃ ৫০

পরিক্রমণ করিতেছেন। স্থবিরের শাসন-নাশী বিদ্রোহী যৌবনের জয়গানে তাঁহার অন্তর-বাহির মুখরিত। এই সময়ে তিনি 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে বসন্তের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়া চির নবীনকে বন্দনা করা হইয়াছে। এই নবীন বারবার মৃত্যুর মধ্যে অবগাহন করিয়া পুনর্জীবন লাভ করে। 'যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়া আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত তাহলে জরাই অমর হতো—তাহলে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হ'য়ে যেত। সেই শুকনো পাতার সরসর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত, কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিব নবীনতা প্রকাশ করে—এই তো বসন্তেব উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না, তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।'

'ফাল্গুনী'র ভূমিকারূপে একটা নাট্যদৃশ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘ প্রস্তাবনার মূল্য ও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।[১] ইহার মধ্যে যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ আছে তাহাও অকারণ ও অর্থহীন। 'ফাল্গুনী'র মধ্যে বিচিত্র সৌন্দযময় বসন্ত-প্রকৃতি এরূপ সুমধুর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহার নাটকীয় অংশ ভালো ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। নাটকখানি আমাদের সম্মুখে যেন এক পরম রমণীয় নন্দন কানন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সে-কাননে অসংখ্য তরুলতা নবীন শ্যামলিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বাশি রাশি পুষ্প স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদেব মধ্যে স্তরে স্তরে মধু সঞ্চিত আছে, আকাশে পরাগ উড়িতেছে, মধুকরের পরিতৃপ্ত গুঞ্জনে সব দিক ভরপুর—এইখানে একদল বাঁধন-ছেঁড়া প্রকৃতি-পাগল ছেলে-বুড়োর দল আসিয়া নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে কে আসিল, কে গেল, কাহার সহিত কাহার ঠোকাঠুকি লাগিল তাহা ভ্রূক্ষেপ করিয়া দেখিবার সময় নাই। সুতরাং ইহাদের দ্বারা নাটক জমিতে পারে না, এবং জমেও নাই। ইহার ভাবরাশি ভাসমান শৈবালদামের ন্যায় তরল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোনো জটিল আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হয় নাই। বসন্তের সমীরণের ন্যায় সমস্ত চরিত্রের গতি একদিকেই

১। 'But if the main plot must be judged adversely, far more decided must be the opinion pronounced against the long prologue This is of the very quintessence of thinness, a gossamer which no fairies have woven but the spiders of a very dusty room'. —*Rabindranath* by Thompson. p. 251.

ছুটিয়াছে। দাদার ন্যায় অবসিতপ্রায় দুর্বল শীতের হাওয়া তাহার কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

॥ মুক্তধারা (১৩২৯)॥ 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতা এবং হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বাহন যান্ত্রিকতাকে কোনো দিন সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মানুষ এই যান্ত্রিকতার পূজক হইয়া পরস্পরের মধ্যস্থ আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, পাশ্চাত্ত্যের দিকে তাকাইলে ইহা ভালোভাবেই বুঝা যাইবে।[১] এই যান্ত্রিকতার আশ্রয় লইয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ক্রমাগত শক্তি এবং সম্পদ লাভ করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিতেছে কবি তাঁহার 'Nationalism,' গ্রন্থে এই বিকৃত জাতীয়তাবাদের চাকচিক্যময় খোলসটি অনাবৃত করিয়া ইহার কদর্য রূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।[২] উত্তরকূটের লোকদের মধ্যে এই জাতীয়তাই বাসা বাঁধিয়াছে। যান্ত্রিক উপায়ে শিবতরাই-এর লোকদিগকে বঞ্চিত এবং নিঃস্ব করিয়া ইহারা অপরিমিত লিপ্সাকে অবারিত প্রশ্রয় দিয়াছে।

'মুক্তধারা'র মধ্যে মানব-সমাজের তিনটি স্তর-বিভাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ স্তর-বিভাগ সম্বন্ধে কবির কোনো সজ্ঞান মানস-চেতনা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু নাটকের তত্ত্ব-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া ইহার আলোচনা অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রণজিৎ, বিভূতি ও অভিজিৎ—এই তিনটি চরিত্র সম্ভবত তিনটি স্তরের প্রতীক। রণজিৎ রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিনিধি। কিন্তু যন্ত্র ও শিল্পতন্ত্রের আধিপত্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিভূতির সর্বময় ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব—সমাজ ও রাষ্ট্র তাহার দ্বারা শাসিত, রাজা তো তাহার হাতের

১। 'যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব-সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা আটা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকে ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই-সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হোতে থাকে।' 'শিক্ষার মিলন।'

২। জাতীয়তাবাদী পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি 'Nationalism' গ্রন্থে বলিয়াছেন—'It is the continual and stupendous deadpressure of this inhuman upon the living human under which the modern world is groaning. Not merely the subject races, but you who live under the delusion that you are free, are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetich of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of world-wide suspicion and greed and panic'. *Nationalism*, P. 26.

নিরুপায় সাক্ষী মাত্র। রণজিতের যুগ গিয়াছে, বিভূতির যুগ চলিতেছে, কিন্তু এই মদমত্ত নিষ্প্রাণ যন্ত্রশক্তির পদতলেই কি চিরতরে মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব বিলাইয়া দিবে? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। এই প্রাণঘাতী দুঃশাসন-শক্তিরও পরাজয় ও পরিবর্তন ঘটিবে। তখন যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত মানবাত্মা মুক্তির মন্ত্রে জাগরিত হইয়া উঠিবে, সুখ ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে ধরণীতে। অভিজিৎ তো সেই অনাগত সমাজের অগ্রদূত। অভিজিৎ প্রাণদান করিয়াছে, কত শত অভিজিৎকে এইভাবে প্রাণদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া উদয়ের পথে জ্যোতির্ময় আশার বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে মুক্তধারার উতরোল কলরব শোনা যাইতেছে, পথে-প্রান্তরে আজ অম্বা ও বটুর দল ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিভূতির পতনের আর বিলম্ব কত?

যন্ত্র যে মানুষকে কতখানি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহার প্রমাণ উত্তরকূটের অধিবাসীরা। তাহারা দেবতার পদে যন্ত্রকে বসাইয়াছে, কিন্তু এ যে দেবতা নহে অপদেবতা, সে শুভবুদ্ধি এখন আর তাহাদের নাই। 'মানুষের দেবতারে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে'—তাহাকেই আজ তাহারা ত্রাতা ও ভাগ্যবিধাতারূপে বরণ করিয়াছে। এই অপদেবতা তাহাদিগকে দিয়াছে কলুষিত সাম্রাজ্যবাদ—জীবনকে বাঁধিবার উপায় আর মানুষকে মারিবার অস্ত্র। এই সাম্রাজ্যবাদই তো আজ যন্ত্রবাদী পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে থাকিয়া বিশ্বের চতুর্দিকে তাহার অশুভ বাহু বিস্তার করিতেছে। শিবতরাইয়ের লোকেরা পরাধীন শোষণক্লিষ্ট মানুষের প্রতিনিধি। তাহাদের সহিত ভারতবাসীদের তুলনা করিলে অসঙ্গত হইবে না। ভারতের অধিবাসীরাও কি শিবতরাইয়ের লোকদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অনুকম্পার উপর নির্ভর করে নাই? তাহাদের জীবনধারাও কি যন্ত্রবাদী শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই? উত্তরকূটের বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের যে সংগ্রাম তাহার সহিতও ভারতের অহিংস সংগ্রামের সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে। শিবতরাইয়ের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীও যে মহাত্মা গান্ধীর অবিকল অনুকৃতি তাহাও কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য নাটকে যে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা অহিংস সত্যাগ্রহের বিশদ ব্যাখ্যা হইলেও নাটকের কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। নাটকের মূল সংগ্রাম বিভূতি ও অভিজিতের মধ্যে, তাহার মাঝখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী আসিয়া পড়াতে মূল গতিবেগ যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তেমনি অভিজিতের চরিত্রও অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অভিজিতের সংগ্রামও শিবতরাইয়ের লোকদের লইয়া, সুতরাং ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম-উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? ধনঞ্জয়ের গানগুলিও যেমন অগণ্য তেমনি অনাবশ্যক। অনেক সময় মনে হয়, কবি তাঁহার গানকে নাটকীয় ক্রিয়ার অনুগামী না করিয়া নাটকীয় ক্রিয়াকেই গানের অনুগামী করিয়া ফেলিয়াছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী আদর্শ মহামানুষ, কিন্তু তবুও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁহার অংশ নাটকের মধ্যে দুর্বল এবং বোধ হয় ইহাই নাটকের মধ্যে একমাত্র দুর্বল অংশ।

যন্ত্র ও জীবনের সংঘাতই 'মুক্তধারা' নাটকের মুখ্য প্রাণবস্তু। এই দুই শক্তির রূপায়ণ হইয়াছে বিভূতি ও অভিজিৎ চরিত্রে। বিভূতির শক্তির প্রকাশ তাহার অহংকৃত স্পর্ধায় আর অভিজিতের শক্তির প্রকাশ তাহার হিতার্থী আত্মত্যাগে—বিভূতির উল্লাস জীবনের বন্ধনে আর অভিজিতের গৌরব জীবনের মুক্তিতে। বিভূতি বাঁচিয়াও পরাজয়ের মৃত্যু লাভ করিল, কিন্তু অভিজিৎ মরিয়াও চিরকালের জন্য বাঁচিয়া রহিল। অভিজিৎ মুক্তধারার সন্তান, এই মুক্তধারার কাছে সে পাইয়াছিল জীবনের আবেগ ও আদর্শ—'Both law and impulse'।[১] সেজন্য সে মুক্তিপথের চিরযাত্রী। সে নিজেই বলিয়াছে, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটাবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।' নন্দিসঙ্কটের পথ কাটা হইতে অভিজিতের সংগ্রাম সুরু হইল এবং এই সংগ্রামের পরিপূর্ণ সিদ্ধি সে লাভ করিল মুক্তধারার রুদ্ধ পথকে মুক্ত করিয়া দিয়া। ইহাতে কি তাহার মৃত্যু হইল? ইহা তো মৃত্যু নয়, ইহা যে মায়ের কোলে সন্তানের প্রত্যাবর্তন! সন্তানের এত বড় মুক্তি-সাধনার প[রিশ্র]ম তাহাকে আর দূরে রাখিতে পারিল না, নিজের স্নেহশীতল বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

এই নাটকে আর একটি শক্তি আছে, তাহা দেবশক্তি। যন্ত্র মানুষকে করিয়াছে অবহেলা, আর দেবতাকে করিয়াছে অপমান। আজ তাহার স্পর্ধিত আস্ফালন মন্দিরের চূড়াকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মোহভ্রান্ত মানুষ আজ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছে। সে ভাবিতে ভুলিয়াছে যে—দেবতা সৃষ্টি করেন, আর যন্ত্র করে সংহার, দেবতা জল দেন, আর যন্ত্র সেই জল বাঁধে। দেবতা প্রথমে নীরব থাকিয়া যন্ত্রের স্বৈরলীলা সহিয়া যান, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জাগিবার পালা। তখন ভৈরবের জটাজুট কাঁপিয়া উঠে, তাঁহার

১। অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে।

ঘূর্ণিত লোচন হইতে প্রলয়বহ্নি নির্গত হয় এবং তাঁহার হস্তধৃত ত্রিশূল শূন্যে আস্ফালিত হইতে থাকে। ভৈরবপন্থীদের স্তবের মধ্যে যে ব্যথাতুর অসহায় মানুষের আবাহন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে সেই আবাহন কি বৃথায় যাইবে? কখনই নহে। সে আবাহনে শঙ্কর রুদ্র হইয়া সাড়া দিবেন। তখন মুক্তধারার জল-কল্লোলে প্রলয়-পয়োধি জলের মত্ততা ফুটিয়া উঠিবে আর যন্ত্রের অহংকৃত চূড়াটি খসিয়া সেই জলের তলায় আশ্রয় লইবে।

যন্ত্রের নির্মিতি যতই জোরালো ও মজবুত হউক না কেন, তাহার মধ্যে ছিদ্র কিন্তু রহিয়া গিয়াছে। বিভূতি এই ছিদ্রের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। যে ভয়ঙ্কর তাহারও ভয় আছে, কারণ এই ছিদ্র যত সামান্য হউক ইহার ভিতর দিয়া যে তাহার রুষ্ট অদৃষ্টের অভিশাপ পথ করিয়া লইবে। অম্বার বুকফাটা কান্না ও বটুর নিষ্ফল আক্রোশ এই ছিদ্রপথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভূতির অনুবর্তীদের সন্দেহ ও বিদ্রোহ এই পথে প্রশ্রয় পাইয়াছে। বিভূতির আঘাত আসিল তাহার নিজের লোকদের কাছ হইতে, ইহা অপেক্ষা যন্ত্ররাজের শোচনীয় পরাজয় আর কি হইতে পারে?

'মুক্তধারা'র মধ্যে তত্ত্ব থাকিলেও তাহা নিশ্চল তত্ত্ব হইয়া পড়ে নাই। সচল ক্রিয়াবেগের মধ্য দিয়া তাহা প্রাণবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব ও নাট্যের যেরূপ পরিপূর্ণ মিলন এই নাটকে ঘটিয়াছে তাহা 'রাজা' ছাড়া অন্য কোনো সাঙ্কেতিক নাটকে দেখা যায় নাই।[১] 'মুক্তধারা'র মধ্যে কোনো অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ নাই। অথচ কবি সুকৌশলে বিভিন্ন চরিত্রকে পর পর আনিয়া একটি অবিরাম ঘটনার ক্রমিক বিন্যাস দেখাইয়াছেন। নাটকের সব দৃশ্যই পথে ঘটিয়াছে এবং পথের মধ্যে রহিয়াছে চলার ইঙ্গিত, গতির নেশা। সেখানে পথচারীর মিলন ও সংঘাত নিত্যই ঘটিতেছে।[২] এই মিলন-সংঘাতের দ্বন্দ্ব-জটিল ক্রিয়াবেগে নাট্যধারার মধ্যে উঠিয়াছে আবর্ত ও কল্লোল। একদিকে বিভূতি ও উত্তরকূটের লোকেরা আর অন্যদিকে অভিজিৎ ধনঞ্জয় ও শিবতরাইয়ের প্রজারা। এই সংঘাত ভাবের আকাশে বাষ্প হইয়া যায় নাই, বাস্তব মাটিতে কায়িক রূপ লাভ করিয়াছে। মানুষের যে দুঃখ নাটকের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহারও একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মানবরসাশ্রিত রূপ আছে। মানুষের যে কান্না ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে

১। টমসন সাহেব এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'It is the greatest of his symbolical plays'.

২। কবি এই নাটকের নাম প্রথমে 'পথ' রাখিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়।

যথার্থ কান্নাই আছে. কান্নার বিলাস নাই। নাটকের মধ্যে অভিজিতের মৃত্যু সত্য সত্যই ঘটিয়াছে, এখানেও কোনো ফাঁক বা ফাঁকি নাই। রণজিতের মানসবেদনাও খুব বাস্তব ও জীবন্ত। একদিকে বিভূতির প্রতি নিরুপায় পক্ষপাতিত্ব, অন্যদিকে অভিজিতের প্রতি একটি গভীরতর গোপন আকর্ষণ—এই দ্বিমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্বে তাহার চরিত্র সজীব কারুণ্য লাভ করিয়াছে।

'মুক্তধারা'র রসদ্যোতনার অনবদ্য কুশলতার পিছনে রহিয়াছে পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি বিভিন্ন প্রতীক ও ধ্বনির দ্বারা দর্শকের মনের মধ্যে অবিরাম এক রহস্যরসের দোলা দিয়া গিয়াছেন। প্রথমেই দেখা যায়, অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা ও ভৈরবের মন্দিরচূড়ার ত্রিশূল। এই দুইটি প্রতীক নাটকের অজানিত তত্ত্বকে এক মুহূর্তেই আমাদের মনের রহস্য-দ্বারে সম্ভাবিত করিয়া তোলে। তারপর মুক্তধারার জলকল্লোল, অম্বার বুকফাটা আহ্বান—'সুমন সুমন' এবং সর্বোপরি ভৈরবপন্থীদের উদাত্ত-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ—ইহাদের মধ্য দিয়া যে আশা ও আশঙ্কায় উদ্বেলিত রহস্য পরিবেশ গড়িয়া উঠে তাহা আমাদের চিত্তাকাশে এক অবিচ্ছিন্ন প্রভাব-জাল বিস্তার করিয়া রাখে।

॥ রক্তকরবী (১৩৩১) ॥ 'রক্তকরবী' নাটকখানি রূপক নয়, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন ; অথচ তিনি নিজেই রামায়ণের কাহিনীর সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া ইহার রূপক তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় কবি বলিয়াছেন—'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে।' 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের ন্যায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহ্বরের মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পতঙ্গ যেমন বহ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষিও তেমনি আপাতলোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী যন্ত্র-দানবের কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে।[১]

আধুনিক জড়বাদী বিশ্বসভ্যতার দুই অঙ্গ—যন্ত্র ও ধনতন্ত্র। এই দুই অঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক এবং ইহাদের মিলিত রূপ অর্থাৎ যান্ত্রিক ধনতন্ত্র হইতে যে

১। কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে ; নইলে গ্রামের পঞ্চ-বটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন ?' প্রস্তাবনা—'রক্তকরবী'

বস্তুশক্তির উদ্ভব তাহা জড়বাদী বিশ্বের উপর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে। এই বস্তুশক্তি মাটিকে পাষাণ আর মানুষকে পুতুল করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার দানবীয় বাহু যখন প্রসারিত হয় রাজনৈতিক জগতের দিকে, তখন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম সুরু হয় আর ধরাতলে নামিয়া আসে রক্তস্রাবী সর্বনাশের বীভৎস মারীলীলা। বিগত দুইটি যুদ্ধে আমরা তো এই লীলাই দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই মদমত্ত বস্তুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এ-প্রতিবাদ মানুষের—মানুষের প্রেম ও প্রাণের। 'মুক্তধারা'র মধ্যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর 'রক্তকরবী'র মধ্যে প্রতিবাদ রহিয়াছে পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে। এই ধনের আকর্ষণে মানুষ ধানের কথা ভুলিয়াছে, লক্ষ্মীর শাসন ফেলিয়া কুবেরের আগারের দিকে ছুটিতেছে। এই আকর্ষণ অশুভ হইলেও সত্য ; কারণ ইতিহাসের অনিবার্য কারণ-পরম্পরা হইতে ইহার উদ্ভব। পশুচারণ-যুগ হইতে কৃষিযুগ এবং কৃষিযুগ হইতে শিল্পযুগ—এগুলি সভ্যতার ক্রমিক ঐতিহাসিক স্তর। শিল্পবিপ্লবের পর হইতে সমগ্র বিশ্বজগতে যন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হইতেছে বলিয়া মৃত্তিকাপ্রাণ মানুষ ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক সত্তার দ্বারা অধিগত হইতেছে, ব্যক্তি-মানুষ শ্রেণী-মানুষে পরিণত হইতেছে। বর্তমানে যাঁহারা মানুষের মুক্তি চান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মানুষের অর্থনৈতিক সত্তাকে পুরাপুরি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অর্থের উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন আনিতে চাহেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক চেতনা হইতে মানুষের প্রাণকে মুক্ত করিতে চান—সোনার খনি হইতে দূরে, ধূম্রশ্বসিত কারখানার বাহিরে যেখানে মাটির 'পরে সোনার আসন পাতা, কারখানার ধোঁয়া যেখানকার আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘে পরিণত, সেখানে মানুষকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এই পথ হয়ত কাহারও নিকট পশ্চাদপসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু তবুও কবির পথ যে ইহাই তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে এ সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ অর্থবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অর্থকে কেবল অনর্থ বলিয়াও ভাবেন নাই। মানুষের প্রয়োজনে অর্থ, অর্থের প্রয়োজনে মানুষ নহে—ইহাই কবির মত। সোনার থলি যতক্ষণ মানুষের হাতে থাকে ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ, কিন্তু সেই থলি যখন বোঝা হইয়া মানুষের ঘাড়ে চাপে তখন হইতে সুরু হয় মানুষের দুর্গতি। এই দুর্গতি যক্ষপুরীর, এই দুর্গতি যক্ষপুরীর রাজার। যখন যক্ষপুরীর

বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া পড়িল আর রাজা বাহির হইয়া আসিলেন মুক্তিপথে, তখনই হইল এই দুর্গতির অবসান। তখন যক্ষপুরীর সোনা ছড়াইয়া পড়িল পৌষালি ধানের ক্ষেতে আর শিশির-ভেজা রোদের আঁচলে। তখন রাজার দানব-সত্তাব মৃত্যু হইল আর নির্জিত মানব-সত্তা পুনর্জন্ম লাভ করিল। ধনতন্ত্রী অভিশাপ হইতে মানুষ বাঁচিল বটে, কিন্তু বাঁচার জন্য আবার মরিতে হইল মানুষকে। যুগে যুগে এভাবে মানুষকে বাঁচাইতে মানুষ মরিয়াছে। যন্ত্রের হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইতে অভিজিৎ মরিল আর স্বর্ণের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে রঞ্জন ও নন্দিনী প্রাণ দিল।

'মুক্তধারা'র যন্ত্ররাজের সহিত 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের এইখানে পার্থক্য যে- যন্ত্ররাজ নির্দ্বন্দ্ব, নির্মানুষ জড়শক্তি মাত্র, কিন্তু যক্ষরাজ্যের মধ্যে জড ও জীবনের দ্বৈতলীলা। সেজন্য যন্ত্ররাজের সংগ্রাম মানুষের সহিত, কিন্তু যক্ষরাজের সংগ্রাম নিজের সহিত।[১] যক্ষপুরীর রাজা জালের আবরণেব অন্তরালে অবস্থিত। এই জাল বহির্জগৎ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাখিয়াছে. প্রাণের লীলাভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আলো ও জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই অন্ধকাব বন্দীশালায় তাহার মানুষী সত্তার বিলোপ হইয়াছে এবং তাহাব স্থলে এক অমানুষী দৈত্য যখের ধন আগলাইয়া বসিয়া আছে। এমন সময় জালের আবরণ ভেদ করিয়া এক ঝলক জীবনের আলোক সেই বন্দীশালায় প্রবেশ কবিল। সেই আলোকেব সঞ্জীবনী স্পর্শে মৃত মানুষটি আবার বাঁচিয়া উঠিল এবং তখন আবম্ভ হইল মানুষ ও দৈত্যের এক নিদারুণ লড়াই। অবশেষে মানুষটিরই জয় হইল, তবে সেজন্য আর একটি মানুষকে মরিতে হইল, সে হইল রঞ্জন। মানুষ ভাঙ্গিয়া ফেলিল দৈত্যের ধ্বজা। 'যার অজেয় শল্যের একদিব পৃথিবীকে, অন্যদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে।' রুদ্ধ কারাগৃহের জাল ছিঁড়িয়া মানুষ বাহিরে আসিল, কিন্তু তখন সে দেখিল, রাজা গিয়াছে, তাহার বাজত্ব এখনও যায় নাই, সৈন্য ও সর্দার এখনও মোতায়েন। মানুষরূপী রাজার শেষ সংগ্রাম শুরু হইল তাহারই শক্তির বিরুদ্ধে। যন্ত্রী যদি যন্ত্রকে অপরিমিত প্রশ্রয় দেয় তাহা হইলে এমন এক সময় আসে যখন যন্ত্রই যন্ত্রীকে চালিত করে। এই ট্রাজেডি দেখা গিয়াছে যক্ষপুরীর বাজার মধ্যে। রাজার নিজের কথাতেই তাহা ব্যক্ত—'ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা।

১। 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ: সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।' প্রস্তাবনা—'রক্তকরবী।'

সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।' অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তিকে মিলাইয়া দিয়া সর্দারদিগকেই প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির মৌলিক বিরোধ নাই, 'আসল বিরোধ সর্দার সরকারের সঙ্গে।' এই মত যুক্তিসহ, তবে এ-প্রসঙ্গে ইহাই বলা যায় যে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিরোধ নাই তখনই যখন উভয়ের মধ্যে মানুষী সত্তার বিকাশ। রাজা মানুষ হইয়াই প্রজার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন, যতক্ষণ রাজা ছিলেন ততক্ষণ পারেন নাই। আর সর্দারের সহিত রাজার অন্তিম বিরোধ ঘটিলেও মূলত সর্দার রাজারই শক্তি। রাজা মানুষ বলিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহার মনুষ্যত্বের মুক্তি, কিন্তু সর্দার তো যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রের মুক্তি নাই, সে অন্তর্নিহিত দুর্বার শক্তির তাড়নায় অন্ধবেগে ছুটিয়া চলে, সে তখন তাহার চালককেও আর গ্রাহ্য করে না। এইজন্য নিজের শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে যাইয়া রাজাকেও বোধ হয় মরিতে হইল

এই রাজাকে যে মানুষ করিল, অবরুদ্ধ যক্ষপুরীর মধ্যে যে আলোকের ঝরণাধারা বহিয়া আনিল, যাহার কথায় ও গানে নিষ্প্রাণ মানুষের মধ্যে প্রাণের পরশ জাগিয়া উঠিল, সে কে? কোথা হইতে সে আসিল, কেন আসিল তাহা ঠিক কবি বলেন নাই। কিন্তু তাহার আগমনে নিয়মে-বাঁধা যক্ষপুরীর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। মৃতের অন্তরে জীবনের কান্না মর্মরিয়া উঠিল। নন্দিনীর অপর কোনো পরিচয় নাই। সে কেবল নারী, চিরন্তনী নারী—'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' সে পুরুষের চিত্তে প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের বাণী পৌঁছাইয়া দিল—'এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কি করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তা বর্ণিত আছে।' নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবী। এই রক্তকরবী কিসের প্রতীক? পুষ্প প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক এবং রক্তবর্ণ ক্ষত ও বেদনার প্রতীক।[১] রক্তকরবী বলিতে সাধারণ-ভাবে প্রেম, সৌন্দর্য, আনন্দ সব কিছু বুঝাইলেও আলোচ্য নাটকে রক্তকরবীর মধ্য দিয়া কবি বেদনারক্তিম প্রেমের

১। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীকে লিখিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের পত্র দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—শ্রীপ্রমথ বিশী, পৃঃ ১৮৩

কথাই বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রেমের কোনো ইঙ্গিত যেখানে রহিয়াছে সেখানেই রক্তকরবীর অবতারণা। প্রথম কিশোর নন্দিনীকে ভালোবাসিত বলিয়াই তাহাকে সে রক্তকরবী ফুলটি দিয়াছিল। পরে নন্দিনীর প্রতি রাজার আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ঐ রক্তকরবীর লোভের মধ্য দিয়া, অধ্যাপক এমন কি, সর্দারের আসক্তিও ঐ রক্তকরবীর উপর। কিন্তু নন্দিনী এই রক্তকরবীর মঞ্জরী দিয়াছিল শুধু রঞ্জনকে। কিন্তু রঞ্জন তো একা সম্পূর্ণ নহে, বিশুকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ. সেজন্য রঞ্জনের মৃত্যুর পর এই মঞ্জরী যখন ধূলায় লুটাইতেছিল তখনই বিশু তাহা তুলিয়া লইল, নন্দিনীর প্রেমও সার্থকতা লাভ করিল।

রঞ্জন কে, সে আলোচনা করা যাক। নন্দিনীর নামের মধ্যে যেমন তাহার স্বরূপ প্রকাশিত, রঞ্জনেরও তাহাই—মানুষের চিত্ত নন্দিনীর দ্বারা নন্দিত হয় আর রঞ্জনের দ্বারা হয় রঞ্জিত—কিন্তু অর্থ একই। তবে নারীর নন্দিনীরূপের প্রকাশ প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে, আর পুরুষের রঞ্জনরূপের প্রকাশ যৌবন ও শক্তির মধ্যে। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী বলিয়াছেন, 'রঞ্জন হইতেছে মানুষের বিশুদ্ধ রূপ।' কিন্তু এই ব্যাখ্যা বোধ হয় আরও সূক্ষ্মতর ও পূর্ণতর হওয়া প্রয়োজন। রঞ্জন মানুষের পুরুষ-রূপ আর নন্দিনী তাহার নারী-রূপ। এই পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ যেমন নিত্য ও সনাতন[১] তেমনি উভয়ের মিলনেই মানুষের পরিপূর্ণ সত্য ও সার্থকতা। রাজা ও রঞ্জনের কোনো মৌলিক প্রভেদ নাই (রাজা ও রঞ্জনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এক; রাজা—রঞ্জ+অন, ও রঞ্জন—রঞ্জ—ণিচ+অন), কিন্তু রাজার উপর যে দৈত্যটি ভর করিয়া আছে তাহার সহিত রঞ্জনের বিরোধ। দৈত্যটি মানুষকে মারিল বটে, তবে নিজেও সে মরিয়া গেল। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকে জয় করিয়া হইল মৃত্যুঞ্জয়।

কিন্তু একা রঞ্জনও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রঞ্জন ও বিশু জীবনের দুই দিক—এক দিকে আলো ও আনন্দ, অন্যদিকে দুঃখ ও রহস্য।[২]

১। নন্দিনী রঞ্জনের চূড়ায় নীলকণ্ঠ পাখীর পালক পরাইয়া দিয়াছিল। নীল রঙ অসীম ও অনন্তের দ্যোতনা বহিয়া আনে। কবির সঙ্কেত এই যে, প্রেম মরিতে পারে না, মরিতে পারে না রঞ্জন ও নন্দিনীর প্রেম। কবি কি এখানে মেটারলিঙ্কের নীল পাখীর কথা ভাবিয়াছেন? Tyltyl যে নীল পাখীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, রঞ্জনও কি তাহাই—'The great secret of things and happiness চাহিয়াছিল?' নন্দিনী কি তাহার মৃত্যুর পর সেই আশা পূর্ণ করিল?

২। 'বিশুর ভিতর দিয়া জীবনের অন্ধকারের দিক অর্থাৎ দুঃখের রহস্যের দিকটাই প্রতিভাত—যেমন রঞ্জনের ভিতর দিয়া জীবনের আনন্দের এবং আলোর দিক রূপায়িত।'

রবীন্দ্রনাথ (২য় পর্ব)—অশোক সেন, পৃঃ ২০১

বিশু নিজে বলিয়াছে—'আমি রঞ্জনের ও-পিঠ যে পিঠে আলো পড়ে না,—আমি অমাবস্যা।' রঞ্জন ও বিশুকে লইয়া পুরুষের পূর্ণাঙ্গ রূপকে বরণ করিয়াই নন্দিনীর প্রেম সার্থক।

'মুক্তধারা'র ন্যায় 'রক্তকরবী'ও অঙ্ক ও দৃশ্য-বিবহিত নাটক। কিন্তু 'মুক্তধারা'র মধ্যে নাট্যকার যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র পর পর আনিয়া ক্রিয়া ও রসের • বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন 'রক্তকরবী'তে সেরূপ কোনো বৈচিত্র্য দেখা যায় না। 'মুক্তধারা'য় উন্মুক্ত পথের উপরে চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট গতিবান করিয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু 'রক্তকরবী'তে সে সুযোগেরও অভাব। একটি বদ্ধ পুরীর জালাবরণের বহির্ভাগে এই নাটকের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই নির্দিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ স্থানে সমগ্র ঘটনার অবতারণার জন্য স্বভাবতই নাটকের গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই নাটকে নাট্যকার চরিত্রগুলির কথার সৌন্দর্যের দিকে যত দৃষ্টি দিয়াছেন গতির দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। সেই কথায় তারকার জ্যোতি আছে বটে, কিন্তু প্রদীপের দাহ নাই। রূপক-শ্লেষ-বিরোধ প্রভৃতি অলঙ্কারসৌন্দর্যে চিত্র ও সঙ্গীতের সরসতায় নাটকখানি একটি অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

এই কাব্যরসের অত্যধিক আতিশয্যের আর একটি কারণ, নাটকের সমস্ত লক্ষ্য নন্দিনীর দিকে। নন্দিনী তো একটি রক্তমাংসের জীব নহে, সে যেন আকাশ হইতে খসিয়া-পড়া একটি আলোর প্রস্রবন, কোনো অপার্থিব সঙ্গীতের একটি মূর্তিমতী ছন্দ। তাহার রূপে অন্ধকার পুরী আলোয় ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার কথায় চারিদিকে খুশির বাতাস বহিতে থাকে, তাহার গানে মরা যক্ষপুরীর ইট-কাঠ-পাথরে নৃত্যের দোলা লাগিয়া যায়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ যদিও ধনতান্ত্রিক অত্যাচারের বীভৎস ও কুৎসিত রূপটি দেখাইতে চাহিলেও নাটকের কোথাও সেই রূপ নাই। যক্ষপুরীর তলায় সোনা এবং ইহার উপরেও নন্দিনীর পরশমণি সব সোনা করিয়া দিয়াছে। বস্তুত অনুপ-উপমন্যু-শকলু-কঙ্কুর দৃশ্য ব্যতীত 'রক্তকরবী'র কোথাও যক্ষপুরীর প্রকৃত চেহারা দেখা যায় না। চরিত্রগুলির কেহই যথার্থরূপে যক্ষপুরীর প্রতিনিধি নহে, সকলেই যেন নন্দিনী-বাই-গ্রস্ত। রাজাকে আমরা গোড়া হইতেই রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নন্দিনীর অনুগ্রহ পাইতে লালায়িত দেখিতে পাই। অধ্যাপক-মোড়লের তো কথাই নাই, এমন কি সর্দার পর্যন্ত রসিকতার দ্বারা নন্দিনীর মনোরঞ্জন করিতে ব্যগ্র। এইরূপ একমুখী প্রবণতার ফলে নাটকের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত কোথাও তেমন বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মহাপঞ্চক, বিভূতি ও কাঞ্চীরাজের ন্যায় সবল ও মতনিষ্ঠ চরিত্র 'রক্তকরবী'তে নাই,

সেজন্য নাট্যাংশে ইহা খুবই দুর্বল। 'রক্তকরবী'র নাট্যাবেগ দেখা গিয়াছে কেবল দুইটি বিষয়ে—রাজার চরিত্রদ্বন্দ্বে ও রঞ্জনের আগমন-প্রত্যাশায়। রাজাকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার আবেগকম্পিত কথায় আমরা একটি দুর্দান্ত চরিত্রের দুষ্প্রতিরোধ্য হৃদয়-সংঘাত অনুভব করিতে পারি। বাস্তবিক, বর্তমান ধনতন্ত্রী মানুষ বিশ্বের সব ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য হাতের মুঠায় পাইয়াও আসলে কত একাকী, কত অসহায়! তাহার অন্তরাত্মা আজ বস্তুর পুঞ্জ হইতে মুক্তি চায়, নিয়মের নিগড় হইতে মুক্তি চায়! রাজার আত্মধিক্কারে ও নবজাত মোহ-কামনায় ইহাই কি পরিস্ফুট হয় নাই? রাজাকে আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই না বলিয়াই তাহার প্রতি আমাদের কৌতূহল আরও তীব্র ও আমাদের সমবেদনা আরও গভীর হইয়া উঠে। রাজার মত রঞ্জনও আমাদের চোখের সম্মুখে কখনও দৃশ্য হয় নাই, অথচ নন্দিনীর প্রতিটি কথাতেই রঞ্জনের সহিত মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত। এজন্য রঞ্জন সম্বন্ধে দর্শকের মনের মধ্যে একটি সদাজাগ্রত দিদৃক্ষা বিরাজ করিতে থাকে। একটি চরিত্রকে কখনও রঙ্গমঞ্চে না আনিয়া এবং তাহার মুখের একটি কথাও না শুনাইয়া তাহার সম্বন্ধে সকলের মনে একটি অবারিত আবেগ-কৌতূহল সৃষ্টি করা যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রটিকে শেষ পর্যন্তও নাট্যকার উদ্ঘাটন করিলেন না, ইহার চতুর্দিকে একটি চিরন্তন রহস্যজাল রচনা করিয়া রাখিলেন।

॥ কালের যাত্রা (১৩৩৯) ॥ 'কালের যাত্রা' বইখানার মধ্যে দুইখানি নাটক আছে—'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা'। 'কবির দীক্ষায়' নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-সমাবেশ কিছুই নাই, সুতরাং ইহার আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। 'রথের রশি'র মধ্যে 'ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান'-এর লীলা দেখানো হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মন্ত্রবল, স্ত্রীলোকদিগের পূজা ও নৈবেদ্য, সৈনিকদের দৃপ্ত বাহুবল, এবং শ্রেষ্ঠী ধনপতির ধন-ঐশ্বর্যের ক্ষমতা যে রথ টলাইতে পারিল না, শূদ্রদের স্পর্শমাত্রই তাহা সচল হইয়া উঠিল। সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে মহাকালনাথ আজ নামিয়া আসিয়া শূদ্রশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা আর কেহ বুঝিতে পারে নাই—কেবল বুঝিয়াছেন কবি, যিনি নিরন্তর বিশ্বের তাল ও ছন্দ রক্ষা করিয়া চলেন। 'রথের রশি'র ভাষা গদ্য হইলেও কবিতার ন্যায় মধুর ও ছন্দোময়।

॥ তাসের দেশ (১৩৪০) ॥ রূপকথার রাজপুত্র গিয়াছিলেন পাশাবতীর পুরে এবং আলোচ্য নাটকের রাজপুত্র চলিয়াছেন তাসবতীর দেশে। আবার রূপকথার

সঙ্গে এই নাটকের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলা যায় যে, রূপকথার অপর এক রাজকুমার অচিন দেশের ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠির পরশে জাগাইয়াছিলেন এবং আলোচ্য নাটকের রাজপুত্রও তাসের দেশের নির্জীব নিয়মবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে নবীনা প্রাণ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকে বাঁচাইতেই আসিয়াছে। রূপকথার রাজপুত্রমাত্রই অসাধ্য সাধনে ব্রতী, রাজপুরীর আরাম ও আদর উপেক্ষা করিয়াই দুর্গম বিঘ্নসঙ্কুল পথের অভিযাত্রী। 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্রও তো লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল—কারণ সে জানে, 'ভীরু করেছে ঐ লক্ষ্মী। সাহস আছে লক্ষ্মীছাড়ার। যার বিপদ নেই তার ভরসা নেই।'

কবি তাসের দেশের রূপক কেন গ্রহণ করিলেন? লাল-কাল উদিপরা তাসগুলি নিয়মের আবর্তে ঘুরিতেছে, কিন্তু প্রাণের ছন্দে চলিতেছে না। তাহাদের চাল আছে কিন্তু চলন নাই। তাহারা চ্যাপ্টা, ভিতরে হাওয়া নাই বলিয়া তাহারা আগাইতে পারে না। তাহারা অতিমাত্রায় গম্ভীর এবং ব্রহ্মার হাই হইতে উৎপন্ন বলিয়া মাটির সহিত সম্পর্ক তাহাদের খুবই কম। রূপক অত্যন্ত স্পষ্ট। গৃহবদ্ধ ও গম্ভীর লোকেদের প্রতি কবির মনোভাব কি তাহা আমরা বার বার জানিয়াছি। এই নাটকেও সেই মনোভাব রূপকের ছদ্মবেশে ও বিদ্রূপের ভূষণে প্রকাশিত হইয়াছে। নামগুলি তাসের হইলেও লোকগুলি যে আমাদের দেশেরই তাহা বুঝাও কষ্টকর নহে।[১] বস্তুত নাটকের পাত্র-পাত্রীদের তাসের নাম দেখিয়া তাহাদিগকে যে অদ্ভুত জগতের জীব মনে হয়, তাহাদের স্বভাব ও আচরণের মধ্যে সেই অদ্ভুতত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বিশেষত, গানগুলির দ্বারা নাটকের জগৎ আমাদেরই পরিচিত রূপ-রস-সৌন্দর্যের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও আশার আলোকিত পথে প্রাণের জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ তাসের দেশের আকাশে একদিন নীল মেঘ জমিয়া উঠিল, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে নিয়মের রাজত্বে ময়ূরের নাচ ও ভ্রমরের গুঞ্জনে অনিয়ম দেখা দিল—সেই অনিয়মের প্রবল বন্যায় কুষ্টির বেড়া, সম্পাদকীয় স্তম্ভ আর আইনের জবরদস্তি সব ভাসিয়া গেল। তাসের দেশের রাণী তো আগেই পথিক রাজপুত্রের বশীভূত হইয়াছিলেন, শেষকালে রাজাও হইলেন। রাজপুত্রের জয় পূর্ণ হইল, জীবনের জয় সিদ্ধ হইল।

১। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য—'এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।'

—রবিরশ্মি (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩০

(ছ) সামাজিক নাটক

॥ শোধবোধ (১৩৩৩)॥ 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ শোধবোধ'। ইহাতে নকল সাহেবীয়ানাকে তীব্র ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, এবং খাঁটি প্রেম যে কেতাদুরস্ত আচার এবং চোস্ত চালচলনের সাপেক্ষ নয় তাহাই বলা হইয়াছে। শেষের দিকে মাসীর আশ্রয়প্রাপ্ত সতীশের জীবনে একটি জটিল সমস্যার উদ্ভাবন করা হইয়াছে। তবে মাসীর অন্যায়সত্ত্বেও সতীশের ব্যবহারেও একটা উদ্ধত অকৃতজ্ঞতার ভাব দেখা গিয়াছে। শেষ দৃশ্য অতি মাত্রায় তরল উত্তেজনাকর হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাতে এক জটিল সমস্যার যেন খুব আকস্মিক ও সুলভ সমাধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

॥ বাঁশরী (১৩৪০) ॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্যায়ের লক্ষণগুলি 'বাঁশরী'তে সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ, এই নাটকে কবির আত্মলীন মানস-স্তর হইতে পরিবেশ স্থানান্তরিত হইল বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-স্তরে, হৃদয়ের সরসতা অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল মননের প্রখরতা, অনুভূতির ধারা শুকাইয়া আসিল বিতর্কের মরুপথে। নাটকে কথার প্রয়োজন চরিত্রসৃষ্টির জন্য, কিন্তু এই নাটকে কথার কারুকার্যের দিকে কবি যত দৃষ্টি দিয়াছেন, চরিত্রের সজীবতার দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। সেজন্য বাক্যের বোমায় চরিত্রের সম্ভাবনা উড়িয়া গিয়াছে। বাঁশরী সোমশঙ্করকে ভালোবাসে এবং সোমশঙ্করের হৃদয়েও বাঁশরীর নিঃসপত্ন অধিকার। কিন্তু কোন্ অনিবার্য অবস্থা বিপর্যয়ে সোমশঙ্কর সুষমাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিল তাহা বোধগম্য নহে। পুরন্দর সুষমার প্রেম হইতে শক্তি পাইবার জন্য সুষমা ও সোমশঙ্করকে মিলিত করিয়া দিলেন। সুষমা ভালোবাসে পুরন্দরকে আর সোমশঙ্কর ভালোবাসে বাঁশরীকে, কিন্তু পুরন্দরের প্রয়োজনে তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইল। কিন্তু এই আত্মহত্যার দ্বারা কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল ? পুরন্দর বলেন, প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন। এই প্রেম পুরন্দর ও সুষমার মধ্যে থাকিতে পারে, সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর মধ্যেও থাকিতে পারে, কিন্তু সোমশঙ্কর ও সুষমার মধ্যে এই প্রেম কোথায় ? সোমশঙ্করের মুখ দিয়া কবি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও যুক্তিসহ নহে, 'এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো উর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারি 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।' কিন্তু একটি নারীর চিত্তাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবার ভার সোমশঙ্কর নিল, ইহাতে তাহার প্রেম ও পুরুষত্ব কোনোটাই প্রকাশ পাইল না।

বাঁশরীর কথা সমর্থন করিয়া বলা যায়, পুরন্দর সোমশঙ্করের 'বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা।' কিন্তু, এই সন্ন্যাসী-পুরুষটিকে নাটকের মধ্যে এতখানি অসাধারণ করিয়া তোলা হইয়াছে কেন, তাঁহার ব্রতসাধনার উদ্দেশ্যই বা কি—নাটকের মধ্য হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।[১]

সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর প্রেম লইয়াই নাটকের মূল সমস্যা, কিন্তু নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে ক্ষিতীশ, সোমশঙ্কর নহে। অথচ ক্ষিতীশের অন্তর আমাদের কাছে একেবারে অপ্রকাশিত হইয়াই রহিল, এমন কি বাঁশরীর অকৃতার্থ জীবনের নিত্যকার প্রয়োজনেও তাহার ডাক পড়িল না।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রের নির্জীব শীতলতার মধ্যে বাঁশরী একমাত্র সজীবতার অগ্নিশিখা। সে নিছক 'আইডিয়া'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে নাই। সকায়, সকাম জীবনের সহিতই সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। তাহার অভিমানের ইস্পাতের তলায় রহিয়াছে মর্মবেদনার মৃত্তিকা। তাহার শাণিত বৈদগ্ধ্য ও আক্ষেপহীন বিদ্রূপ ছদ্মবেশ মাত্র। সেই ছদ্মবেশে ঢাকা রহিয়াছে প্রেম ও বেদনায় গড়া একটি নারীমূর্তি। সেই নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল সোমশঙ্করের সহিত শেষ সাক্ষাৎকারের সময়। বিবাহ তাহার হইল না বটে, কিন্তু বিবাহের চেয়ে অনেক বড় যে প্রেম, সেই প্রেমের অমর স্বাক্ষর সে অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইল।

(জ) নৃত্যনাট্য

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল গীতিনাট্য রচনায় এবং তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল নৃত্যনাট্য প্রণয়নে। সংগীতকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নাটকের আত্মপ্রকাশ এবং নৃত্যকে অবলম্বন করিয়াই তাহার পরিপূর্ণতা। তাঁহার গীতিনাট্য রচনার মধ্যে তৎকালীন সর্বাত্মক সংগীতময় পরিবেশের সঙ্গে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার নৃত্যনাট্য রচনার মধ্যেও তেমনি তাঁহার শেষজীবনের নৃত্যপ্রবণতার সহিত তাঁহার নাট্যসৃষ্টির গভীর সংযোগস্থাপনের প্রয়াসই পরিস্ফুট হইয়াছে। নৃত্যের আবেগকে নাটকে ফুটাইয়া তুলিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই নৃত্যনাট্যগুলি

১। 'পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশি, এত বেশি রহস্যময় যে এই ধরনের বস্তু-ঘনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এতটা চমক এতটা রহস্য বস্তু-প্রত্যয়কে শিথিল করিয়া দেয়।'

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীনীহার রায়—পৃঃ ১৬৮।

রচিত হইয়াছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্র-সংগীত' নামক উপাদেয় গ্রন্থখানিতে একাধিক বার এ-কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'এই নাটকগুলি সব সময়েই নাচের তাগিদে লেখা।'[১] এই নাচের তাগিদ রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেন ও কিভাবে আসিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে যে নৃত্য সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহলী ও উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা শুধুমাত্র নৃত্যের কলাসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগের ফলে নহে, নৃত্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁহার তৎকালীন জীবনধর্মের একটি প্রবল সাদৃশ্যের ফলেই সম্ভবত তিনি তাঁহার সাহিত্যের বিষয় ও শিল্পরূপের মধ্যে নৃত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। নৃত্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল চলার আবেগকে ছন্দিত করিয়া তোলা। 'বলাকা' পর্ব হইতে কবি বিশ্বের যে গতিকে জীবনের পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য বার বার তিনি নৃত্যরূপকে তাঁহার সাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন। বিশ্বের অন্তর-বাহিরে অবিরাম যে চলার রাগিণী বাজিয়া চলিয়াছে তাহাতে শুধু সত্যই নহে, ছন্দ ও সৌন্দর্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সত্যের সঙ্গে যেখানে ছন্দ ও সৌন্দর্যের প্রকাশ সেখানেই তো নৃত্যের রূপ পরিস্ফুট। নৃত্যের মধ্য দিয়াই আসে জীবনের মুক্তি এবং তাহারই মধ্য দিয়া ঘটে জীবনের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই মুক্তি ও আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য শেষ দিকে বহুস্থানে নৃত্যরূপের কল্পনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার জীবনের প্রথম দিকেও যে এই নৃত্যরূপের চিত্র নাই তাহা নহে। 'সোনার তরী'-র বিশ্বনৃত্য কবিতায় জগতের নৃত্যপরায়ণ রূপ তিনি দেখাইয়াছেন। 'কল্পনা'র বর্ষশেষ কবিতাতেও উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য'-এর মধ্য দিয়া তিনি নূতনের আগমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তবে 'বলাকা' কাব্য হইতেই তিনি সচেতন ভাবে গতিসত্য প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে নৃত্যচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চঞ্চলা কবিতার মধ্যে তিনি বিশ্বের গতিধারাকে নৃত্যনিপুণা নটীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় মহাকালের নৃত্য-ছন্দে আবর্তিত হইতেছে—এই সত্য তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। 'নটরাজ' পালার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।' এই মহাকালের নৃত্যছন্দের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তিনি উদ্বোধন নামক কবিতায়। 'পূরবী'র তপোভঙ্গ কবিতায় তিনি মহাকালের

১। রবীন্দ্র-সংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২৫০।

তাণ্ডবের জয়গান করিয়াছেন। 'তপতী' নাটকের বিপাশার গানে গানে এই সুপ্তিভাঙ্গা দেবতারই স্তব রচিত হইয়াছে। জগতের এই নৃত্যছন্দে কবির চিত্ত অনুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই তিনি নৃত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং নৃত্যশিল্পের মধ্য দিয়া নাট্যঘটনাকে রূপায়িত করিতে প্রয়াসী হইয়া উঠিলেন।

নৃত্য সম্বন্ধে কবির অন্তরপ্রেরণা লইয়া উপরে আলোচনা করা হইল। এবার বহির্জগতের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে তিনি নৃত্যের কিরূপ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা যাক। 'নটীর পূজা' ও 'নটরাজ' লিখিবার পূর্বে তিনি কয়েকবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া আসেন। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ নটরাজ সম্বন্ধে যে বিরাট কল্পনাকে সাহিত্যে রূপ দিলেন, তাহার প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মূর্তি ও দক্ষিণী নটদের নৃত্য দেখিয়া বহু পরিমাণে উদ্বোধিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।'[১] ভারতের বাহিরে চীন, জাপান ও জাভায় বিভিন্ন প্রকার নৃত্য দেখিয়া তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। জাভা ও বালির নৃত্য সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার 'জাভাযাত্রীর পত্র'-তে।[২] জাভা ও বালির নৃত্যনাট্য রচনায় যে অনেকখানি প্রেরণা দিয়াছিল সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। ১৯৩০ সালে কবি তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূসহ যখন ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারা ব্যালে নাচ দেখিবার ও অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবির নিজস্ব সাধনা-কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে বাস করিবার সময় বীরভূমের বাউলগান ও নাচের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই বাউলের সংগীত ও নৃত্যপরায়ণ রূপই তো ফুটিয়াছে তাঁহার ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর, বাউল ইত্যাদি নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে।

নৃত্য সম্বন্ধে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও শান্তিনিকেতনে যে নৃত্যকলার চর্চা হইয়াছিল তাহার ধারাবাহিক পরিচয় জানা না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে।[৩] ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সেই ব্যবস্থা প্রথমে

১। রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৩য় খণ্ড), পৃঃ ২০৫।

২। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে কবি বালিদ্বীপের নৃত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়েপুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।'

৩। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্র-সংগীতে' বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন (রবীন্দ্র-সংগীত—তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৩-২৫০ দ্রষ্টব্য)।

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে কাথিয়াবাড ও গুজরাতের লোকনৃত্যের প্রবর্তন হয়। ১৯২৬ সালে নবকুমার নামে একজন মণিপুরী নর্তক নৃত্যশিক্ষা দিতে আসেন। জাভা ও বালি ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলে একজন দক্ষিণী ছাত্র দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন কবেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে দুইজন মণিপুরী নর্তক শান্তিনিকেতনে আসিযা নৃত্যশিক্ষা দান করেন। কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী কথাকলি নৃত্য শিখিবাব জন্য বাহিব হন। মাঝে মাঝে বিদেশী নৃত্যশিল্পীরাও শান্তিনিকেতনে আসিযা বিদেশী লোকনৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইসব নৃত্যশিক্ষা ও অনুশীলন কবির অন্তবে নৃত্যচেতনা জাগ্রত করিতেছিল। তাঁহার নৃত্যনাট্যেব মধ্যে মণিপুরী কথাকলি ও কথক, বাংলার বাউল ও বিদেশী লোকনৃত্যেব আংশিক রূপ পবিস্ফুট হইযাছিল।

ভদ্রঘবের ছেলেমেয়েদের দ্বারা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যাভিনয় প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করিলেন। এই নৃত্যাভিনয়েব প্রবর্তন দ্বারা তিনি যেমন অন্ত্যজ নৃত্যকলাকে পবিপূর্ণ মযাদাব আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনি নারীর শিল্পচর্চার মধ্য দিয়া নিজের মূল্য ঘোষণা করিবার অধিকার সহসিকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।[১] ইহার পূর্বে বাই, খেমটা নাচ প্রভৃতি বিকৃতরুচি ধনী লোকেদের আসরে অশ্লীল আনন্দরস পরিবেশন কবিয়া আসিতেছিল। থিয়েটাবে যে নৃত্যের প্রচলন ছিল তাহাও নর্তকীদের কুৎসিত হাবভাবে নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ ছিল। নৃত্য শুধু উত্তেজক আনন্দেব উপায় নহে, ইহা জীবনের গভীব সত্যপ্রকাশের বাহন এবং উন্নত সৌন্দর্যসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যম, ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্যাভিনয়েব মধ্য দিয়া আমরা জানিতে পারিলাম।

মানুষ নিজেব হৃদয়েব ভাব ও অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চার করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কণ্ঠেব ক্রিয়া দ্বারা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া হইল দৃশ্য ও কণ্ঠেব ক্রিয়া হইল শ্রাব্য। দৃশ্য-শিল্প হইল নৃত্য এবং শ্রাব্য-শিল্প হইল সংগীত। এই নৃত্য ও সংগীত-শিল্পই হইল মানুষেব আদিতম শিল্প এবং এই দুইয়েব সম্মিলনেই নাট্যশিল্পের উদ্ভব। কালক্রমে নাট্যশিল্প জটিল ও সংঘাতমূলক কাহিনীকে আশ্রয় করে। নাটকের প্রকাশরীতিও সংগীত হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হইয়া আবৃত্তিমূলক পদ্যসংলাপ ও পরে

১। 'নটীর পূজা'য মেয়েদেব অংশগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, 'আজ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায আর্টেব নামে সমাজজীবনে নৃত্যকলা মযাদা লাভ কবিল। নারী আত্মপ্রকাশের নূতন পথ পাইল।' রবীন্দ্রজীবনী (৩য সংস্করণ)—পৃঃ ২০৪।

বাস্তব কথাশ্রিত গদ্যসংলাপে পরিণত হইল এবং নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত আন্দোলন হইতে ভাবপ্রকাশের রীতিটিও সূক্ষ্ম ও সুনিয়ন্ত্রিত বাস্তবানুগ অঙ্গসঞ্চালনে পরিণত হইল। কিন্তু নৃত্য ও সংগীতের সমন্বয়ে ভাবপ্রকাশের রীতিটি কোনোদিনই বিলুপ্ত হইল না। সেজন্য বর্তমান বাস্তবধর্মী নাটকের পাশেও নৃত্য ও সংগীতের মিলিত রূপ নৃত্যনাট্য সব সভ্যদেশেই প্রচলিত আছে। নৃত্যাভিনয়ের পক্ষে সংগীত অপরিহার্য, সংগীতাভিনয়ের পক্ষে নৃত্য অপরিহার্য না হইলেও সংগীতের মধ্য দিয়া ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিবার সময় গায়ক ও শ্রোতার অঙ্গে নৃত্যের স্পন্দন ও কম্পন অনুভূত হয়। আমাদের পাঁচালী, কবিগান, গাজন ও গম্ভীরা গান, বৈষ্ণব ও বাউল গানের সময় গায়ক স্থির হইয়া বসিয়া কি দাঁড়াইয়া কখনও গাহিতে পারেন না। সংগীতের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ছন্দে তাহার দেহ দোলায়িত হইতে থাকে। আমাদের যাত্রা ও গীতাভিনয়ে নৃত্য একটি অনিবার্য অঙ্গ বটে, কিন্তু সেই নৃত্যের সঙ্গে সমগ্র নাটকের কোন যোগ নাই, কেবল আমোদ পরিবেশনই যেন তাহার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অনেক নাটকে নৃত্য থাকিত বটে, কিন্তু সেই নৃত্যের সঙ্গেও নাটকের অনিবার্য যোগ দেখা যাইত না। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে দেবতা ও রাজাবাদশাদের মনোরঞ্জনের জন্যই যেন নৃত্যের আয়োজন করা হইত। সেই নৃত্য কখনও এককভাবে, আবার কখনও বা সম্মিলিত ভাবে কোথাও অপ্সরাদের দ্বারা, কোথাও বা সখীদল অথবা পেশাদার নর্তকী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। গীতিনাট্য নামে যে ধরনের জনপ্রিয় নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত ছিল তাহা রূপকথা অথবা আরব্য উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে সংগীত ও নৃত্য সহযোগে উপস্থাপিত হইত। যে সংগীতের সহিত নৃত্য পরিবেশিত হইত তাহা সাধারণত সর্বত্রই তরল প্রেমমূলক কথাকেই আশ্রয় করিত এবং শৃঙ্গাররস ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার রস উদ্রেকের উদ্দেশ্য সেই নৃত্যের ছিল না। নৃত্যের বিচিত্র তাল, ছন্দ ও লয়ের মধ্য দিয়া যে বিচিত্র ভাব ও বিভিন্ন রস সৃষ্টি করা সম্ভব তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমরা জানিতে পারি নাই।

নৃত্যনাট্যে নৃত্যের মাধ্যমে নাটককে রূপায়িত করা হয়, সেজন্য নৃত্যনাট্যের দুইটি অংশ—নৃত্য ও নাট্য। আবার সংগীত ভিন্ন নৃত্য পরিবেশিত হইতে পারে না, সেজন্য প্রকৃতপক্ষে ইহার অংশ তিনটি। নৃত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়া একটা বিচ্ছিন্ন ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই নৃত্য ও সংগীত একটি মূল নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া তাহাদের দ্বারা পরিস্ফুট ভাব একটি

সমগ্র ভাবধারারই অনিবার্য অঙ্গরূপে বিকশিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৃত্যনাট্য রচনা ও প্রযোজনার সময় মূল নাটকের ভাবপ্রকাশের দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন, নৃত্য সেই ভাবপ্রকাশের অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইত মাত্র।[১] রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নৃত্য কণ্ঠসংগীতের উপরেই নির্ভরশীল। এখানেই এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ব্যালে ও জাভা-বলিদ্বীপের নৃত্যাভিনয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। ব্যালেতে যন্ত্রসংগীতসহ যুক্তনৃত্যের মধ্য দিয়াই ভাব প্রকাশ করা হয়, কথা সেখানে অনুচ্চারিত।[২] জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যাভিনয়েও জটিল ঘটনাবহুল কাহিনী ও বিভিন্ন রসের স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু সেই অভিনয়ও যন্ত্রসংগীতের উপর নির্ভরশীল।[৩] সংগীতের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। নৃত্য ও যন্ত্রসংগীতের সংযোগ যেখানে, সেখানে কথা ব্যঞ্জিত হয় মাত্র, ব্যক্ত হয় না। সেজন্য সেখানে দর্শকের চিন্তা, কল্পনাশক্তি ও রসবোধের উপর ভাবপ্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে গানের মিলন যেখানে, ভাব সেখানে কথার মাধ্যমে সকলের চিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু গানের উপর নির্ভরশীলতার ফলে নৃত্যনাট্যের অসুবিধাও যে হয় না তাহা নহে। নৃত্যনাট্যে নৃত্যেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগীতনির্ভর নৃত্যনাট্যে নৃত্য অপেক্ষা গানেরই প্রাধান্য দেখা গিয়াছে। সংগীতের কথা ও সুর নৃত্যের আবেদন ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শ্রোতাদের মনোযোগ সংগীতের মাধুর্য ও ভাবপ্রকাশক ভাষার উপর বিশেষ নিবদ্ধ থাকে বলিয়া নৃত্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও গভীর ব্যঞ্জনা অনেক সময়েই তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের নাটকীয় আবেদনের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বলিয়া নাটকের সংলাপপ্রয়োগে, ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রের প্রবল আবেগসংঘাতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য

১। 'তার কাছে লিখিত নাটকই হ'ল আসল। এক্ষেত্রে সর্বত্রই তার নাটকের ভাবকে নাচে প্রকাশ করাই হ'ল মূল লক্ষ্য।' রবীন্দ্র-সংগীত (৩য় সং)—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫৩।

২। 'Now the ballet convention is that people express themselves in movements, not in word and that expression in movement is governed entirely in tempo and duration by certain music that is being played, music that may possibly express something of the action,......'

Theatre and Stage (Vol. 1), p. 184

৩। 'সেদেশে নৃত্যনাট্য গড়ে উঠেছে গল্প, গান ও যন্ত্রসংগীতের একত্র সম্মিলনে। এখানে নাচ গড়ে উঠল কেবলমাত্র গানের উপর।' রবীন্দ্র-সংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৬২।

নাটকে ঘটনার যে শিথিলতা ও চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রান্তির যে খেয়ালী অসংলগ্নতা দেখা যায় নৃত্যনাট্যে সে-সব কিছুই নাই। ঘটনা এখানে সংক্ষিপ্ত, কেবল তীব্র আবেগময় অংশগুলি উপস্থাপিত। চরিত্রের বাহুল্য ইহাতে একেবারেই নাই এবং চরিত্রের সংঘাততাড়িত, আবেগকম্পিত মুহূর্তগুলি অনুভূতিচঞ্চল ভাষায় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর কোনো নূতনত্ব দেখা যায় না। স্পষ্টতই বুঝা যায়, কবি কোনো নূতন চিন্তা ও জীবনাদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া এই নাটকগুলি রচনা করেন নাই। প্রকাশরূপ ও প্রয়োগরীতির নূতনত্বই শুধু ইহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি নাটকগুলি পূর্ববর্তী কোনো না কোনো গল্প, কবিতা অথবা নাটকের নৃত্যনাট্যরূপ। ইহাদের মধ্যে 'নটীর পূজা' ও 'তাসের দেশ' আংশিকভাবে নৃত্যনাট্যরীতি অবলম্বন করিয়া এবং শেষ তিনখানি নাটক পুরাপুরি নৃত্যনাট্য-রূপে রচিত।

॥ নটীর পূজা (১৩৩৩)॥ 'নটীর পূজা' পূজারিণী নামক কবিতাটি অবলম্বনে রচিত। এই নাটকেই সর্বপ্রথমে নৃত্যরূপকে আশ্রয় করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নৃত্যরূপ সমগ্র নাট্য-ঘটনার মধ্যে দেখা যায় নাই। শুধুমাত্র নটী শ্রীমতীর অংশই স্থানে স্থানে নৃত্যে রূপায়িত হইয়াছে। এই নাটক রচনার পূর্বেই শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং শ্রীমতীর নৃত্য এই মণিপুরী ঢঙেই পরিবেশিত হয়। কিন্তু এই নাটকে নৃত্য বিশেষ আকর্ষণীয় হইলেও মুখ্য নহে, নৃত্য এখানে চমৎকারভাবে তীব্র নাটকীয়তার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নাটকটির সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বৌদ্ধশক্তি ও বৌদ্ধবিরোধী শক্তির যে প্রবল সংঘাত দেখানো হইয়াছে তাহাতে দর্শকচিত্ত ঘন ঘন আলোড়িত হইতে থাকে। পরিশেষে শ্রীমতী যখন নাচের তালে তালে এক এক করিয়া তাহার নটীর বেশ ও অলঙ্কার দূরে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্রে প্রকাশিত হইল, তখন দর্শকের চমৎকৃত চিত্ত বিস্ময়ের আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেল এবং রক্ষিণীদের পুনঃপুনঃ সাবধানবাণী-সত্ত্বেও শ্রীমতী যখন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নাম করিতে করিতে তাহাদের উদ্যত খড়্গের তলায় মাথা পাতিয়া দিল, তখন বেদনার একটি বক্ষবিদারী আর্তনাদ যেন নিরুপায় হাহাকরে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 'নটীর পূজা'র মত এমন নিটোল, নিরবচ্ছিন্ন, রসঘন নাটক রবীন্দ্রনাথ খুব কমই লিখিয়াছেন এবং বুদ্ধপ্রচারিত ক্ষমা ও অহিংসার বাণীও এত সার্থকভাবে স্বল্প পরিসরেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই নাটকের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় চরিত্র হইল লোকেশ্বরী। লোকেশ্বরীর ভিতরে আছে এক ভক্তিমতী উপাসিকা এবং বাহিরে রহিয়াছে নিষ্ঠুরা রাজকুলবধূ। এই দুই সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বে তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ভিতরের উপসিকা ভক্তিতে বিগলিত হইয়া স্তব করিতে থাকে 'ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে', আবার পরক্ষণেই বাহিরের অহংকৃত রাজমহিষী হুঙ্কার দিয়া উঠে—'নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ—'। লোকেশ্বরীর মহিমোন্নত ব্যক্তিত্ব, তাহার অগ্নিময়ী বাণী, তাহার জ্বলন্ত তেজ ও প্রস্তরকঠিন সঙ্কল্প যেমন বিস্ময়ে সম্ভ্রমে আমাদের হৃদয়কে অবনম্র করে, তেমনি এই 'স্বামীসত্ত্বে বিধবা ও পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা' নারীটির অপরিমেয় বেদনা ও অসহায় একাকিত্ব, সমবেদনায় আমাদের চিত্তকে আপ্লুত করিয়া তোলে।

॥ চিত্রাঙ্গদা (১৩৪২) ॥ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি প্রধানত মণিপুরী নৃত্য পদ্ধতির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; অবশ্য অন্যান্য নৃত্যপদ্ধতির মিশ্রণও ইহার প্রয়োগে দেখা গিয়াছে। ১৯১৯ সালের পর অর্জুনের নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে কথাকলি নৃত্য-রীতির প্রয়োগ পরিস্ফুট হইয়াছিল। কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষা নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' আকারে অনেক ছোট এবং সেজন্য ইহাতে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার আবেশ রঞ্জিত রসঘন মুহূর্তগুলিই শুধু স্থান পাইয়াছে। কাব্য-নাট্যের অলঙ্করণ, চিত্র-সৌন্দর্য, অতিবিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য হইতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। কাব্যনাট্যের আলস্যমদির ভোগানশ্চল পরিবেশে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মিলনের বিলসিত বর্ণনা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নৃত্যনাট্যের চঞ্চল ও গতিশীল পরিবেশে তাহাদের সম্পর্কটি সম্ভোগাশিথিল মত্ততা হারাইয়া অকুণ্ঠ ও ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত হইয়া দেখা দিয়াছে।

॥ চণ্ডালিকা (১৩৪৪) ॥ মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্যরীতির উপর ভিত্তি করিয়া 'চণ্ডালিকা' রচিত হইয়াছিল। আলোচ্য নাটকটিতে নাটকীয় ঘটনাগতি ও অবস্থাপরিবর্তন খুব কমই দেখা গিয়াছে। ইহাতে গীতিকাব্যধর্মী অন্তর্মুখী ভাবের প্রকাশই প্রাধান্য পাইয়াছে। প্রথম দৃশ্যটির মধ্যে ভিক্ষু চরিত্রের আগমনে ও সর্বঘৃণিতা চণ্ডালিকার হাতে বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের জলপানের ঘটনার মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনী গতিশীল হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে প্রকৃতি ও তাহার মাতার কথোপকথনই শুধু রহিয়াছে এবং ঐ দুইটি দৃশ্যে বাহিরের ঘটনা-গতি প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আনন্দের জন্য প্রকৃতির মর্মছেঁড়া আকুতি এবং তাহার আশানিরাশার দ্বন্দ্বই দৃশ্য দুইটিতে প্রাধান্য পাইয়াছে।

প্রকৃতির মাতার নানা উদ্ভট প্রক্রিয়ার দ্বারা মায়াজালবিস্তারের যে বর্ণনা নাটকের মধ্যে রহিয়াছে তাহা নাটকীয় পরিবেশকে বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক ও উত্তেজক করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মঞ্চ-আঙ্গিক প্রয়োগে দর্শকচিত্তকে রোমাঞ্চিত ও উত্তেজিত করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

॥ শ্যামা (১৩৪৬) ॥ 'শ্যামা'র বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন নৃত্যরীতির রূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল।[১] নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'শ্যামা'র আবেদন ও জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায়। তাহার কারণ, ঘটনার চমৎকারিত্ব ও গতিশীলতা যেমন এই নাটকে সর্বাপেক্ষা বেশি, তেমনি হৃদয়াবেগের তীব্রতা, প্রণয়ের আকুতি ও মর্মান্তিক ব্যর্থতা ইহাতেই প্রবলতম রূপ লাভ করিয়াছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবল প্রণয়বৃত্তির প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা আত্মোৎসর্গ, নিষ্ঠা ও ন্যায়বোধ দেখিয়াছি, যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের অন্তর সহানুভূতি ও অনুকম্পায় ভরিয়া উঠে। কিশোর উত্তীয় তাহার প্রণয়িনীর জন্য হাস্যমুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদের অন্তরের মধ্যে এক চিরন্তনী কান্নার মত বাঁচিয়া রহিল। বিদেশী বণিক বজ্রসেনের মধ্যে প্রেমের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠার যে সুতীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও সমবেদনায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর হতভাগী শ্যামা তো তাহার দুর্দমনীয় প্রণয়াবেগের ফলে সব কিছুই হারাইল। সে উত্তীয়কে হারাইল, আবার বজ্রসেনকেও ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিষ্ঠুর প্রণয়ের দেবতা তাহার অন্তরে প্রণয় ঢালিয়া দিয়াছিলেন শুধু অকৃতার্থতার বেদনায় নিষ্ফল হাহাকার করিবার জন্য। বজ্রসেন শ্যামাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার ফলে ন্যায়-ধর্মের আদর্শ রক্ষিত হইল, কিন্তু তবুও কি জানি কেন, এই অন্যায়কারিণী অভাগিনী নটীর দিকেই আমাদের ক্রন্দনাতুর হৃদয় কেবলই যেন ধাবিত হইতে থাকে।

১। 'বজ্রসেনের চরিত্র অভিনীত হয়েছিল ভারতনাটাম্ ও কথাকলি পদ্ধতিতে। উত্তরীয় হয়েছিল নিখুঁত কথকের আদর্শে, শ্যামার অভিনয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মণিপুরী ভঙ্গীতে, আর প্রহরীর নাচ খাঁটি কথাকলির আঙ্গিকে।'

রবীন্দ্র-সংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫১

চতুর্থ অঙ্ক

রবীন্দ্রোত্তর নাট্য-সাহিত্য

(ক) ভূমিকা

বাংলা নাটকের চূড়ান্ত উন্নতি আমরা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যেব সর্বময় সমৃদ্ধি তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে মাত্র একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে একেবারে পরিব্যাপ্ত, সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় তিনি এই সাহিত্যক্ষেত্রের সর্বত্র আচ্ছাদন করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবে বিবাজ করিযাছেন। তাঁহার সময়ে যে সমস্ত পাদপ এই ক্ষেত্রে জন্মলাভ কবিয়াছে তাহাবা এই বনস্পতির বীজ হইতে জাত, তাহারই ছায়াতে লালিত এবং মূলবসে পরিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলে তাঁহার সমসাময়িক কালে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। কেবল উপন্যাস-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভাব পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই। বোধ করি, সেইজন্যই উপন্যাস-জগতে অন্যতর যুগন্ধর প্রতিভা শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহাদের দ্বারা উপন্যাস-সাহিত্য অশেষভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বি স্ত কাব্যজগতে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পারেন নাই, অদূর ভবিষ্যতেও পারিবেন কিনা সন্দেহ! নাট্যক্ষেত্রেও তাঁহার পরে বিশেষ শক্তিশালী লেখকেব উদ্ভব হয নাই। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথের পরে ভালো নাট্যকার মোটেই জন্মান নাই। আধুনিক কালেও দুই তিন জন প্রকৃত প্রতিভাবান নাট্যকার আছেন বটে, তবুও একথা সত্য যে, বাংলা নাটকের পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। কি কারণে এরূপ হইল, ইহার জন্য বর্তমান নাট্যশালা ও দর্শকদের মানসিক চাহিদা কতখানি দায়ী,·এবং বাংলা নাটকের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব কিনা—এসব বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। আমরা শুধু বিষণ্ণ নেত্রে লক্ষ্য করিতেছি যে, বর্তমান কালে এমন কোনো নাট্যকার নাই

যিনি সমগ্র নাট্য জগৎকে অন্তত কিছুকালের জন্যও তন্মুখী এবং তদাশ্রয়ী করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কেহই তাঁহার বিশিষ্ট ভাব, মত ও রীতির দ্বারা নাট্যজগতে কোনো যুগান্তকারী বিপ্লব আনয়ন করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকে অনেক দোষত্রুটি আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যেমন সমসাময়িক কালে নাটকীয় আন্দোলন এবং মত্ততা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যেমন একখানির পর একখানি নাটকের দ্বারা রঙ্গজগৎকে নিত্য নূতন রসে চঞ্চল ও পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আধুনিক কালে তেমনটি দেখা যায় না। যে মুষ্টিমেয় নাট্যকারবৃন্দ বর্তমানে নাটক লিখিতেছেন তাহাদের নাটকসমূহ সংখ্যায় বেশি নয়, এবং রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের দুই একখানা নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও নাটকের মধ্য দিয়া নাট্যকার দর্শকবৃন্দের সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আধুনিক এমন অনেক নাটক আছে, যেগুলির উপর প্রীতি ও প্রশংসা বর্ষিত হইলেও ইহাদের স্রষ্টার সহিত দর্শকদের মানস পরিচয় নাই, এমন কি স্রষ্টার নাম পর্যন্তও তাঁহারা অবগত নহেন।

আধুনিক নাটকের দোষ ও দৈন্য থাকিলেও একটা বিষয়ে ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাহা হইতেছে যে, এই নাট্যসাহিত্য বর্তমান বিশ্বনাট্য-ধারার সহিত সম্পৃক্ত ও সাদৃশ্যযুক্ত। ইউরোপে যুগপ্রবর্তক নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের পর হইতে নাটকের কলা ও রীতির আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সময় হইতে প্রাচীন কঠোর বিধিবদ্ধ নাট্যকলা বর্জিত হইয়া ইবসেনীয় রীতি বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যে ইউরোপীয় এবং রবীন্দ্র-রীতিই প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। যেসব বিশিষ্ট ভঙ্গী ও পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রথম দেখা গিয়াছে বর্তমান নাট্যকারগণ সেইগুলি নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংলাপের চমৎকারিত্বের কারণ যে ইহার সংক্ষিপ্ততা, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার পরবর্তী নাটকেও সংলাপ খুব সংক্ষিপ্ত। ঐসব নাটকে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপ বেশ দ্রুত হইয়াছে বলিয়াই দর্শকের মন সমস্ত চরিত্রের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে, আর চরিত্রগুলিও যুগপৎ ক্রিয়াময় থাকিতে পারে। একজনের সুদীর্ঘ বক্তৃতার সময় অপর আর একজনের হাই তুলিতে ও নখ খুঁটিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সম্বন্ধে

যে চরম স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায় আধুনিক নাটকেও তাহা পরিস্ফুট। এমন অনেক নাটকই লেখা হইতেছে যেগুলির মধ্যে পাঁচ অঙ্ক তো নাই-ই, এমন কি অঙ্ক ও দৃশ্যের সুস্পষ্ট বিভাগও নাই। এমন অনেক নাটক আছে যাহাতে কোনো দৃশ্যই নাই, যেমন শচীন্দ্রনাথের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকখানি। ইহাতে কেবল চারটি অঙ্ক আছে, কোনো দৃশ্য নাই। আবার অন্যপক্ষে অয়স্কান্ত বক্সির 'ডক্টর মিস্ কুমুদ'-এর মত নাটকও আছে যাহাতে কোনো অঙ্কই নাই, শুধু কয়েকটি দৃশ্য রহিয়াছে। এখনকার নাট্যকারগণ কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের নাটক-সমূহ রচনা করিয়া থাকেন। অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়া, একই অঙ্ক অথবা দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাবাত্মক পাত্রপাত্রীকে সুকৌশলে প্রবেশ করাইয়া আধুনিক নাটকে ক্রিয়ার অবিরাম গতি অব্যাহত করা হইয়া থাকে।

বর্তমান নাট্য-সাহিত্যের আর একটি লক্ষণ ইহার অন্তর্দ্বন্দ্বময়তা। অবশ্য এখনও যে কোনো কোনো নাটকে সস্তা এবং স্থূল দৃশ্যের অবতারণা নাই তাহা নহে, কিন্তু তবুও আধুনিক নাট্যকারদের লক্ষ্য এবং প্রয়াস হইতেছে সূক্ষ্ম আবেশময় অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তোলা। অবশ্য এই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করা শক্ত কাজ, এবং খুব কম নাট্যকারই তাহাতে যথার্থ সক্ষম হইয়াছেন। নাট্যকারদের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিষয় আমরা বিচার করিব।

আজকালকার নাটকের আর একটি সর্বত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহাতে অতি বিস্তৃতভাবে মঞ্চনির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই মঞ্চনির্দেশ দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে বাংলা নাটকে চলিয়া আসিতেছে। এই মঞ্চনির্দেশের মধ্য দিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট করিতে পারেন, এবং ইহার ফলে নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যে সহযোগিতাও বৃদ্ধি পায়। বর্তমান কালের অনেক নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের অভিনয়-ভঙ্গী ও মানস-প্রবণতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। নাটক লিখিবার সময় তাঁহারা বিশেষ বিশেষ অভিনেতার উপযোগী বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কোনো বিশেষ ধরনের ভূমিকায় কোনো অভিনেতা অভিনয় করিয়া যদি খুব খ্যাতি অর্জন করেন, তবে পরবর্তী কালে বহু লেখক তাঁহাদের নাটকে সেই ধরনের ভূমিকা সন্নিবেশ করেন। এইভাবে বর্তমান নাট্যরচনা রঙ্গমঞ্চের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়েই নাটক-রচয়িতাগণ রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও পরিচালকের নির্দেশে তাঁহাদের নাটকে অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকেন, সেই পরিবর্তন মঞ্চ-সাফল্যের দিক দিয়া বিশেষ কার্যকর হইলেও সর্বত্র নাট্যকলার পোষক হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের বহু অপরিচিত ও অপরীক্ষিত পথ খুলিয়া দিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, তাহাও সত্য; কিন্তু তথাপি ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও তৎসংশ্লিষ্ট নাট্যজগতের সহিত রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ কোনকালেই ছিল না। তাঁহার দু'একখানি কাব্যনাট্য পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল, এবং কয়েকখানি প্রহসন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে তিনি কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ তিনটি। প্রথমত, তিনি তৎকালীন দর্শকদের রুচিকর বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাটক রচনা করেন নাই—তখনকার দর্শকগণ সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর প্রচলিত ধারাই পছন্দ করিত। দ্বিতীয়ত, তাঁহার নাটক এত সূক্ষ্ম ভাবধর্মী, সাধারণবোধ্য স্থূল ও সংঘাতমূলক ক্রিয়া তাহাতে এত কম যে, রঙ্গমঞ্চের দর্শকের কাছে তাঁহার নাটকের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন ছিল না। তৃতীয়ত, নাটকের পরিবেশরচনা ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগরীতির কথা চিন্তা করেন নাই। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কালের সূক্ষ্ম রসবোদ্ধা দর্শকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দর্শকসমাজ তাঁহার নাটকের প্রতি সুবিচার করিতে না পারিলেও আজ দর্শকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তাঁহার নাটক কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার নিজস্ব নাট্যসাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারগণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক রচনা করিয়া জনসম্বর্ধনা লাভ করিতেছিলেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের তিরোধানের পর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ শুরু হইল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। শিশিরযুগে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিশালী অভিনেতার আবির্ভাবে বাংলা নাট্যশালা ধন্য হইল। প্রথম মহাযুদ্ধ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই শিশির-অহীন্দ্রযুগ স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সময়ে সাধারণ নাট্যশালার জন্য প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেক নাটক রচনা করেন এবং শেষ দিকে ইঁহাদেরই নাট্যধারা কিছুটা অনুসরণ করিয়া এবং নবযুগের চিন্তাধারা ও মঞ্চরীতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নাট্যকারদের আবির্ভাব হইল। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক

ও সামাজিক—এই তিন শ্রেণীর নাটকই তাঁহাদের দ্বারা রচিত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে যে নব-নাট্য আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার প্রভাবে নাটকের বিষয়, আদর্শ ও আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। সেই ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করিব। নব-নাট্য আন্দোলনের পূর্ববর্তী নাট্যধারাই এখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

(খ) পৌরাণিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের সময়ে পৌরাণিক নাটকের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, এ বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের পুনরভ্যুত্থান আর সম্ভব হয় নাই। যে ধর্মোদ্দীপনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গিয়াছিল তাহা বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিল। বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবের স্পর্শ আমাদের দেশও লাভ করিল, সর্বশক্তিময় বিজ্ঞানের অদ্ভুত লীলার পরিচয় আমরাও পাইলাম। দেশের লোকের মন ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মবিমুখ ইহসর্বস্ব হইয়া উঠিল। নানা রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জটিলতা আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করিতে লাগিল, ধর্মসম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল কমিয়া আসিল। অলৌকিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া ধর্মভাব উদ্রেক করাই পৌরাণিক নাটকের যে প্রধান লক্ষ্য তাহা আর আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সেইজন্য পৌরাণিক নাটকের প্রচারও শেষ হইয়া আসিল। কলিকাতার যে রঙ্গমঞ্চগুলি এককালে পৌরাণিক নাটকের দ্বারা পরিপোষিত হইত এখন সে সব স্থানে ঐ নাটকের অস্তিত্ব নাই।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে দুই একজন লেখক পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাটকের সহিত পূর্বতন পৌরাণিক নাটকের কোনোই যোগ নাই। বস্তুত তাহাদের নাটককে খাঁটি পৌরাণিক নাটক বলা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। কারণ পুরাণের কোন বিশেষ ঘটনা কি কাহিনী ব্যতীত পৌরাণিক ভাব, আদর্শ, নীতি কিছুই প্রদর্শন করা বর্তমান নাট্যকারদের উদ্দেশ্য নহে। চিরপালিত ধর্মাদর্শ এবং ভক্তিভাব আধুনিক নাটকে তো নাই-ই, বরং গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব ইহাতে রহিয়াছে। বর্তমান সংস্কারবিরোধী, ধর্মবিদ্রোহী চিত্ত ভগবানকে ছাড়িয়া শয়তানের জয়গানে মুখরিত, The devil is not as black as he is painted'—ইহা আধুনিক ভাববিপ্লুত মানুষের অন্তরের প্রতিধ্বনি। পুরাণ এবং

ধর্মগ্রন্থে এতদিন যাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাদের চরিত্রই নূতন ধরনের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়া আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় অনেক পুরাণান্তর্গত চরিত্রকে মনুষ্যত্ববোধের মানদণ্ড দ্বারা নূতনভাবে বিচার করিয়াছেন, আধুনিক নাটকেও সেই রকম অনেক স্থলে নূতন বিচারশক্তির প্রয়োগ, অভিনব মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ লক্ষ্য করা যায়।

ভক্তিভাব এবং ধর্মাদর্শের অভাববশতঃ এবং অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা না থাকাতে অধুনাতন পৌরাণিক নাটকে সুতীব্র ভাবাবেগ ও ঘাত-প্রতিঘাত অনেক জায়গাতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাতে এই নাটক দর্শনে দর্শক ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোনো গতানুগতিক শিক্ষা লাভ করে না বটে, কিন্তু যথার্থ নাটকীয় রস উপভোগে তাহার চিত্ত চরিতার্থতা লাভ করে। নাটকত্বের দিক দিয়া আধুনিক পৌরাণিক নাটকের গুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

(১) মন্মথ রায়

পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে, সর্বপ্রকার নাটক আলোচনার কালে ইহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস দর্শকসমক্ষে পরিবেশন করিলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পরদা ইনি অতি সুনিপুণ হস্তে উন্মোচিত করিয়াছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই অবিরাম সংঘাতে ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটকের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে। ইহার নাটক দর্শনকালে চরম উত্তেজনায় মন উদ্বেলিত হইতে থাকে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।

মন্মথবাবুর ভাষা অলংকৃত এবং কবিত্ব-সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব ইহার নাটকে পড়িয়াছে একথা বলিলে অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ইহার ভাষাতেও প্রকৃতির অবগুণ্ঠন অপসৃত হইয়াছে ও তাহার নয়নাভিরাম রূপ ও সৌন্দর্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্মথবাবুর সুনির্বাচিত অলংকৃত বাক্য এক একটা তীব্র গতিশীল সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় মর্মস্থলে আসিয়া বিঁধিতে থাকে।

আমাদের আলোচ্য নাট্যকার আধুনিক বিদ্রোহী ভাবধারায় পুষ্ট ও অনুপ্রাণিত, চিরাচরিত ধারণায় যাহারা পাপাত্মা এবং ঘৃণ্য তাহাদের চরিত্রের মধ্যে তিনি বিচিত্র ভালোমন্দের সংমিশ্রণ করিয়াছেন, গায়ের জোরে মন্দকে ভালো বলিয়া চালাইতে চান নাই। অনুকূল ঘটনাসৃষ্টি এবং অকাট্য যুক্তি দ্বারা তিনি আমাদের বহুকালপোষিত সংস্কার ও ধারণাকে বিচলিত করিয়াছেন। তিনি নাটকের অনেক স্থলেই প্রচলিত নীতি ও সমাজ-আদর্শকে ব্যঙ্গ করিয়া নিন্দিত এবং গর্হিত বিষয়কে সাহসের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবল মানসিক ভাব ও কামনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার কাজই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সংস্কার ও আদর্শ লইয়া মাথা ঘামানো তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মন্মথবাবু নাট্যসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা নাট্যসাহিত্যেব রূপ ও রীতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সমাজেব অনেক রূপান্তর দেখা গিয়াছে এবং মঞ্চশিল্পেরও অনেক অগ্রগতি হইয়াছে। এ সবের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ বাখিযাই তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে তাঁহার লেখনী চালনা কবিয়া চলিয়াছেন। ফলে তাঁহাব সুবিস্তৃত নাট্যধারায় বিষয় ও আঙ্গিকের বহু বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে ইহা বিশেষ জোরেব সঙ্গে বলা যায় যে, তিনি কখনও তাঁহার কাল হইতে পিছাইয়া পড়েন নাই, এবং যুগের স্বীকৃতি জানাইয়া অনববত সম্মুখের দিকে অগ্রসব হইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা, আদর্শ ও শিল্পজ্ঞানের পরিবর্তন হইলেও তাঁহার আসল সত্তাটি তো একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। সেজন্য চল্লিশ বৎসর আগে যে নির্ভীক সত্যসন্ধানী, মানবদরদী ও উদারচেতা মন্মথ রায়কে দেখিয়াছি, চল্লিশ বৎসর পরেও সেই ব্যক্তিকে আমরা হারাইয়া ফেলি নাই। তবে যৌবনদীপ্ত নাট্যকারের লেখায় যে শাসন মু- তারুণ্যের দুর্দমনীয় জোয়ার দেখিয়াছি, হৃদয়াবেগের সুতীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের অবতারণা লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার পরিণত বয়সের রচনায় সেগুলি ঠিক তেমন ভাবে দেখি না। এখনকার লেখার মধ্যে হৃদয়-বৃত্তির সংযমশাসিত রূপই দেখি এবং আবেগ অনুভূতির প্রাবল্যের স্থানে একটু লঘু পরিহাসতরলতা ও ঈষৎ ধায়িত বিদ্রূপপ্রিয়তা লক্ষ্য করিতেছি। অবশ্য বর্তমানে মন্মথবাবুর অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বিস্তৃত হইয়াছে, সেজন্য তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তুরও বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে।

মন্মথবাবু যখন নাট্যজগতে প্রবেশ কবেন তখন প্রচলিত নাট্যধারা অনুসরণ করিয়াই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা সুরু করেন। কিন্তু তখন নবীন

সাহিত্যিকেরা যে নূতন জীবন জিজ্ঞাসা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন মন্মথ রায়ের সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে সাহিত্যে তখন কল্লোল-যুগ চলিতেছে। মন্মথবাবু স্বয়ং কল্লোল পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। কল্লোল-যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই তিনি প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক স্থানে বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দিত জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু অবশ্য প্রাচীন পুরাণ হইতে গৃহীত, কিন্তু চরিত্রচিত্রণ ও ভাবাদর্শ রূপায়ণের দিক দিয়া তিনি তাঁহার সমসাময়িক যুগের মানবতাবাদী বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টি দ্বারাই চালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর অনেকগুলি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজে নানা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরবর্তী যুগেও মন্মথবাবু যুগচেতনার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সমাজসমস্যামূলক, বাস্তবধর্মী নাটক লিখিয়া চলিয়াছেন। সেই সব নাটক সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

॥ কারাগার (১৯৩০)॥ মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'কারাগার' শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া মুক্তিকামী জনগণের চিত্তে প্রবল উদ্দীপনা জাগাইয়া আসিয়াছে। বাহ্যত নাটকটি পৌরাণিক নাটকের দাবী যথাযথ ভাবে পূরণ করিয়াছে। ভাগবতে কংস-বসুদেব-দেবকীর কাহিনী যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে এই নাটকেও মোটামুটি তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। ভাগবতের কাহিনীতে জানা যায় (নবম স্কন্ধের শেষাংশ এবং দশম স্কন্ধের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য) মথুরা যদুবংশের অধিকারেই ছিল। যদুবংশীয় শূরসেন ছিলেন বসুদেবের পিতা। শূরসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভোজবংশীয় উগ্রসেন মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া তাঁহার দুরাত্মা পুত্র কংস মথুরার রাজা হয়। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা হইলেন দেবকী। বসুদেব দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়া যখন স্বগৃহে গমনের জন্য রথে আরোহণ করিলেন তখন সেই রথ চালনার ভার গ্রহণ করিল স্বয়ং কংস। পথিমধ্যে দৈববাণী হইল, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে নিধন করিবে। দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাহাকে

নিরস্ত করিলেন এই বলিয়া যে, তিনি দেবকীর প্রতিটি সন্তান কংসের কাছে আনিয়া দিবেন। কিন্তু ইহার পর নারদ আসিয়া যখন কংসকে বলিলেন যে, নারায়ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মলাভ করিয়া কংসেব প্রাণসংহাব করিবেন, তখন কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিল। এই কারাবন্দী বসুদেব ও দেবকীকে লইয়াই নাটকের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর এক একটি সন্তান হইয়াছে এবং কংসের হাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। অষ্টম গর্ভজাত কৃষ্ণের জন্ম এবং কংসনিধনের আসন্ন সম্ভাবনায় নাটকের শেষ। কংসভয়ত্রস্ত দুর্বল ও ভীরু যাদবগণের যে চিত্র নাট্যকার দিয়াছেন তাহাও ভাগবতের অনুরূপ।[১] নাট্যকার নাটকের পার্শ্বচরিত্রগুলির নাম ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্য তাহাদের স্বভাব ও আচরণ বর্ণনায় তিনি মৌলিকতা দেখাইয়াছেন,—যথা, কঙ্কণ, কঙ্কা (ভাগবতে কঙ্ক ও কঙ্কা উগ্রসেনের পুত্র ও কন্যা), বিদূরথ (ভাগবতে বিদূরথ ভজমানের পুত্র এবং বিদূরথের পুত্রের নাম শূর)। বিদূরথের অস্বাভাবিক প্রভুভক্তি, কঙ্কণ ও কঙ্কার বলিষ্ঠ মুক্তিসংগ্রাম, চন্দনাবৃত্তান্ত প্রভৃতির মধ্যে নাট্যকারেব নিজস্ব কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে চবিত্রচিত্রণেব কুশলতাব মধ্য দিয়া তিনি ঘনীভূত নাট্যরসসৃষ্টিতে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন মূল চবিত্র দুইটিতে অর্থাৎ তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় কংস এবং নির্যাতিত যদুবংশের সংগ্রামী নেতা বসুদেব চরিত্রে।

পৌরাণিক নাটকের ধর্মীয় পরিবেশ এবং ভক্তিরস সৃষ্টির দিকেও নাট্যকার উপেক্ষা করেন নাই। পৌরাণিক নাটকে সাধারণত দেবশক্তির সঙ্গে কোন বিরোধী মানব অথবা দানবশক্তিব সংগ্রাম এবং পরিশেষে বিরোধী শক্তির পরাজয় ও দেবশক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠাই দেখান হয়। আলোচ্য নাটকেও নারায়ণের সঙ্গে কংসের বিরোধ এবং অবশেষে কংসেব পরাজয়ে নারায়ণের মহিমাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাদবগণ নারায়ণের ভক্ত এবং তাহারই আশ্রিত, দেবদ্রোহী কংসের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া তাহার নীরব ভগবানকে জাগাইবার জন্য আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছে, 'ভগবন জাগৃহি!' অনাগত ভগবানকে স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছে, 'অনাগত দেবতা স্বাগতম'। বসুদেব, উগ্রসেন, কঙ্কণ, কঙ্কা,

---

১। 'বলশালী কংসরাজ, অন্যান্য অসুররাজ ও নগরবাসীদিগের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যদুকুল ধ্বংস কবিতে উদ্যত হইলে পর, যদুগণ কংসেব ভয়ে পলায়নপরায়ণ হইয়া দেশান্তরে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা স্বদেশে থাকিয়া কংসের সেবায় নিযুক্ত হইল।'—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ (হিতবাদী সংস্করণ)।

বিদূরথের স্ত্রী অঞ্জনা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দেবতার প্রতি ভক্তি তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছে, তাঁহার প্রতি আনুগত্য তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। অত্যাচারে জর্জরিত ধরিত্রী আকুলভাবে ভগবানকে আবাহন করিয়াছে। অবশেষে মানুষ ও ধরিত্রীর সমবেত প্রার্থনায় ভগবান মর্তে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই অন্তিম কালে ভগবানের আবির্ভাব পৌরাণিক নাটকের প্রত্যাশিত ভক্তিরসাত্মক পরিণাম ঘটাইয়াছে। কংসকেও শেষ পর্যন্ত শত্রুরূপে সাধকের ভূমিকাতেই যেন দেখি। সে-ই অত্যাচারে ভগবানকে জর্জরিত করিয়া স্বর্গ হইতে মর্তে তাঁহাকে নামাইয়াছে নিজের ও জগতের মুক্তির জন্য।

কিন্তু পৌরাণিক নাটকের দাবী পরিপূরণ করিয়াও এই নাটকটির মধ্যে পরাধীন ভারতের যে পটভূমির আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং শৃঙ্খলিত জাতির যে মুক্তি-আবেগ ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতেই নাটকটির অধিকতর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নাটকটির পৌরাণিক পরিবেশটি আমাদের বর্তমান বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এত সাদৃশ্যযুক্ত, চরিত্রগুলির আবেগ এত জোরালো ও জীবন্ত, সংলাপ এত আবেগদীপ্ত এবং জাতীয় ভাবোচ্ছ্বসিত যে, সমসাময়িক স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই ধারণা প্রত্যেকটি উদ্দীপিত দর্শকচিত্তেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সে মনে করে যে, নাটকটি বাহ্যত পৌরাণিক নাটক বটে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই হইল আসল বস্তু। তখন সমগ্র নাটকটির রূপক অর্থ ব্যাখ্যার দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কংসের কারাগার তো পরাধীন ভারতভূমি, সেই ভারতভূমির শৃঙ্খলিত সন্তানরাই হইল বসুদেব, দেবকী, কঙ্কণ, কঙ্কা ইত্যাদি। কৃষ্ণ তো এই ভারতেরই ভাগ্য-বিধাতা, ভারতবাসী যাঁহাকে জাগাইবার জন্য সাধনা করিতেছে। কংস বুঝি দুর্ধর্ষ অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তিরই প্রতিনিধি। বসুদেব সংগ্রামী জনগণের নায়ক, কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম। মহাত্মা গান্ধীর ছাপ বড় স্পষ্ট। কঙ্কণ ও কঙ্কা সংগ্রামী যুবশক্তির প্রতীক। বিদূরথ প্রভুভক্ত রাজকর্মচারী, তাহার মত লোকেরাই বিদেশী শাসন: কায়েম রাখিতেছে। যদুবংশীয় লোকেরা স্পষ্টতই পরাধীন ভারতের অধিবাসিবৃন্দ। তাহাদের মধ্যে বসুদেব, কঙ্কণ ও কঙ্কার মত দৃঢ়চেতা সংগ্রামী নরনারী থাকিলেও তাহারা অধিকাংশই মূঢ়, কাপুরুষ, হীনচেতা ও পলাতক। কংসের নির্মম অত্যাচারের সম্মুখে তাহারা ভয়ত্রস্ত ও ভূলুণ্ঠিত। অত্যাচারীর হাত হইতে নিজেদের

নারীকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের নাই, কিন্তু তাহাকে বর্জন করিবার নীচ বিক্রম তাহাদের রহিয়াছে। এই মনুষ্যত্বহীন নীচাশয়তার প্রতি প্রবল ধিক্কারই নাটকে জাগান হইয়াছে। কিন্তু নাটকের পরিণতিতে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সুরই ধ্বনিত হইতেছে। যে জাতির মধ্যে বসুদেবের মত নেতা আছে তাহার ভয় কি? যে জাতির মধ্যে কঙ্কণ ও কঙ্কা আছে তাহাকে কে কারাগারে শৃঙ্খলিত রাখিতে পারে? যে জাতির মধ্যে দেবকী, অঞ্জনা ও চন্দনা রহিয়াছে তাহার মুক্তির পথ কে রোধ করিতে পারে? অহিংসার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বসুদেব অত্যাচারী শাসক শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—অবিচল, অকুতোভয় ও অপরাজিত। কঙ্কণ ও কঙ্কা কারাগারে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, কিন্তু মাথা নত করে নাই। দেবকী নিজের সন্তানগুলিকে এক এক করিয়া মৃত্যুর হাতে সমর্পণ কবিয়াছেন, অঞ্জনা বক্ষের অমৃতধারা দিয়ে মৃত্যুজয়ী বীর সন্তানকে বাঁচাইয়াছেন। চন্দনা নিজের নারীত্ব বিসর্জন দিয়া মূঢ় ও নিশ্চেতন জাতিকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাদের সংগ্রাম, দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইবার নহে। পরিশেষে মুক্তিদাতা ভাগ্যবিধাতার আবির্ভাব এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারী শক্তির পরাজয়ই দেখান হইয়াছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কে নাট্যঘটনার সূচনা। অত্যাচারিত যাদবগণের অহিংস সংগ্রামী নায়ক হইলেন বসুদেব। দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিয়া কঙ্কণ যাদবদের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করিল। এই অঙ্কে যাদবদের সংঘাত কংসের প্রতিনিধি বিদূরথের সঙ্গে। তাহারা শিলাময় ভগবানকে জাগাইবার জন্য সমবেত ভাবে আকুল প্রার্থনা জানাইল। ভগবান বুঝি জাগিলেন। বিদূরথের হাত হইতে উদ্যত অসি খসিয়া গেল। নারায়ণ-শক্তি ও তাঁহার আশ্রিত ভক্তকুলের জয়। দ্বিতীয় অঙ্কে কংসের আবির্ভাব। চন্দনাবৃত্তান্ত ও যাদবদের হীনতা ও কাপুরুষতাই এখানে প্রাধান্য পাইয়াছে। এক অঙ্কে কংসের সাময়িক জয়—চন্দনাকে সে লাভ করিল, যাদবদের উপরেও তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তৃতীয় অঙ্কে কংসের অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা, দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তাঁহার প্রাণপণ সংগ্রাম। একদিকে তাহার চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা—দেবকী পুত্র কীর্তিমান ও বিদূরথের স্ত্রী ও পুত্রের হত্যাসাধন, অন্যদিকে স্বপ্নবিভীষিকা দর্শনে তাহার আতঙ্কিত আর্তনাদ। চতুর্থ অঙ্কে কংসের নারায়ণ-বিদ্বেষ মাঝে মাঝে গোপন নারায়ণ-ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে কঙ্কণ ও কঙ্কা মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া কংস-নিসূদন নারায়ণের আবির্ভাবকেই ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণের আবির্ভাব। কংস

তাহার অনিবার্য পরিণাম বুঝিতে পারিয়া আশঙ্কায়, অনুশোচনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার প্রচ্ছন্ন ভগ্নী-স্নেহ যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তেমনি তাহার কৃষ্ণবিদ্বেষও কৃষ্ণানুরাগে রূপান্তরিত হইল। কংসের শেষ পরিণতি দেখিয়া মনে হয়, সে বুঝি বা এতদিন শত্রুরূপেই ভগবানকে ভজনা করিয়াছিল, অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁহাকে জাগাইয়া তাঁহারই হাতে মুক্তি চাহিয়াছিল।

কারাগার নাটকে নাট্যকার প্রধানত পুরাতন নাট্যরীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ এই নাটকের মধ্যেও পঞ্চাঙ্কবিভাগ, অঙ্কগত দৃশ্যবিভাগ, সঙ্গীত ও নৃত্যের বহুল প্রয়োগ, অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা প্রভৃতি রহিয়াছে। নাটকের গানগুলি নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু গানগুলি নাট্যক্রিয়ার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধরিত্রীর গানগুলি ঠিক নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নহে, সেজন্য সেগুলি এক একটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ঐ গানগুলির মধ্যে কংস পীড়িত ধরিত্রীর কাতর ক্রন্দন এবং ভগবানকে জাগাইবার জন্য আকুল কামনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যাদবদের মুখে উদ্দীপক সঙ্গীত শুনা গিয়াছে। চন্দনার গানগুলি আত্মমগ্ন, বিষাদময় রোমান্টিক সঙ্গীত। নর্তকীদের গানগুলির মধ্যে নিছক প্রমোদরসের উপাদান রহিয়াছে। রসবৈচিত্র্যের জন্য নাট্যকার কতকগুলি ছড়ার গানও সংযোজন করিয়াছেন। পৌরাণিক ভক্তি-রসাত্মক নাটকের রীতি অনুসরণে তিনি মাঝে মাঝে অলৌকিকতার অবতারণাও করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের স্বপ্নদৃশ্যটি 'নর-নারায়ণ' নাটকের অনুরূপ দৃশ্য মনে করাইয়া দেয়। কংসের অবদমিত মনের স্তরটি পরিস্ফুট করার জন্য ঐ দৃশ্যটি নাট্যকার দেখাইয়াছেন। নাট্যরীতি প্রয়োগে তিনি অনেকাংশে পূর্বতন রীতি অনুসরণ করিলেও নাট্য-পরিস্থিতি ও চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব বুঝাইবার জন্য তিনি আধুনিক নাটকের বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক ঔপন্যাসিক রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতি অভিনয় ও নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে, তেমনি পাঠ্য নাটকরূপে ইহার আকর্ষণও বৃদ্ধি করে।

'কারাগার' তীব্র নাট্যবেগ সম্পন্ন নাটক। পরস্পরবিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতিগত আকস্মিক বৈপরীত্য ও ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা, সংলাপের আবেগকম্প্র ধাবমান গতি প্রভৃতির ফলে নাটকের মধ্যে তীব্র নাট্যবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। নাটকের দুই বিরোধী শক্তির একদিকে আছে কংস, বিদূরথ, নরক প্রভৃতি, অন্যদিকে রহিয়াছেন বসুদেব, কঙ্কণ, কঙ্কা

প্রভৃতি। একদিকে নৃশংস অত্যাচার, অন্যদিকে সেই অত্যাচার প্রতিরোধে দুর্জয় সঙ্কল্পবদ্ধ সংগ্রাম। পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত এই দুই বিরোধী পক্ষের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকটি উত্তেজনায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। কংস-চরিত্রের অভ্যন্তরে দানব ও মানবসত্তার সুতীব্র দ্বন্দ্ব, বিদূরথের প্রভুভক্তি ও পুত্রবাৎসল্যের করুণ বিরোধ প্রভৃতির ফলে নাটকের মধ্যে অধিকতর উত্তাপ ও বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এক একটি উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজনাচঞ্চল পরিস্থিতি রচনা করিয়া নাট্যকার ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি নাট্যরসঘন পরিস্থিতির উল্লেখ করা যায়। প্রথম অঙ্কের শেষে যাদবগণ নারায়ণ-শিলাকে রক্ষা করিবার জন্য সমবেতভাবে দণ্ডায়মান। তাহারা নির্ভীক কিন্তু নিরস্ত্র। বিদূরথ শালগ্রামশিলাকে আঘাতে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াই মূর্তিমান নারায়ণকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া অস্ত্র ফেলিয়া দিল। বিদূরথের অনায়াসলভ্য জয় যেন মুহূর্তের মধ্যে সভয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নীচ উৎপীডনকারী যাদবগণ কংসের ভয়ে নিমেষের মধ্যেই যেন চন্দনার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। যাদবগণকে বাঁচাইতে চন্দনা কংসের কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মাহুতি দিল; কংসের রুদ্ররোষ সঙ্গে সঙ্গেই উল্লসিত আত্মতৃপ্তিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল। অতি অল্প সময়ে পরিস্থিতি নানা বিপরীত অবস্থার মধ্য দিয়া চমকপ্রদ পরিণতি লাভ করিল। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কংস, কঙ্কণ ও কঙ্কার উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহারা বশ্যতা স্বীকার কবিতেছে না। মত্ত হাতির বলে কঙ্কণ কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কঙ্কা হাতের আঙ্গুলগুলি অক্লেশে কাটিয়া কংসকে দিল। তাহারা আবার শেষ সম্মিলিত মুক্তির আশায় লৌহ-শৃঙ্খল তুলিয়া লইল। কংসের নির্বিকার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, কঙ্কণ ও কঙ্কার ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তার যে সংঘাত বাধিয়াছে তাহা নাটকের চমক ও উত্তেজনা অনেকখানি বর্ধিত করিয়াছে।

'কারাগার' নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল ইহার সংলাপ। এই সংলাপ যেন ধাবমান অগ্নিপ্রবাহের মত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, এবং পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডল যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট বাক্যাংশগুলি বর্ষাফলকের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝলসাইতে থাকে, আবেগের ক্ষত মুখে যেন রক্তের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। শব্দের পুনরুক্তি, অসমাপ্ত বাক্য, পরস্পরবিরোধী শব্দ ও বাক্যের পাশাপাশি সন্নিবেশ, উত্তেজনার চূড়ান্ত স্তরে উঠিয়া আবার মুহূর্তের মধ্যে অসহায় দুর্বলতায় ভাঙ্গিয়া

পড়া ইত্যাদির ফলে সংলাপ এত বেশী গতিশীল ও উত্তেজনাময় হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন জায়গায় সংলাপ কাব্যের সৌন্দর্য বিকিরণ করিয়া ছন্দিত বেগে অগ্রসর হইয়াছে, যেমন—

চন্দনা।···কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে আকাশ হ'ল মাতাল, বাতাস হ'ল পাগল? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে··· চরণ-পদ্মের পরশ নিল···ধন্য হ'য়ে ফণা ধরল·· ফণা ধরে তার জয়যাত্রার জয়চ্ছত্র হ'ল? আমি দেখে এলাম···আমি দেখে এলাম! ·রূপ নয় রূপের আগুন কোটি কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে—আমিও আমিও—

এই সংলাপ গদ্য নয়, গদ্যকবিতা।

এই নাটকের নায়ক কে? নাটকে বর্ণিত তত্ত্ব ও পৌরাণিক ভক্তিরসের চরিতার্থতার দিক দিয়া বিচার করিলে বসুদেবকেই নাটকের নায়ক বলিতে হয়। বসুদেব নারায়ণের আশ্রিত এবং নারায়ণের মহিমা তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি পরাধীন নিপীড়িত জাতির মুক্তি সংগ্রামের নায়ক তিনিই, এক একটি সন্তান তিনি এই সংগ্রামে আহুতি দিয়াছেন, কিন্তু হার মানেন নাই। অবশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছে। বসুদেব যদি এ নাটকের নায়ক হন, তাহা হইলে প্রতিনায়ক নিশ্চয়ই কংস। কংসকে প্রতিনায়করূপে ধরিলেও এ-নাটকে নায়ক অপেক্ষা যে প্রতিনায়কের চরিত্রই অধিকতর ক্রিয়াশীল, ব্যক্তিত্ববান ও নাট্যরসোদ্দীপক তাহা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্য বাদ দিয়া শুধু কেবল ব্যক্তিচরিত্র বিচার করিলে কংসকেই নায়ক বলিতে হয়। সে-ক্ষেত্রে নাটকটিকে একটি বিষাদান্তক ট্র্যাজেডি ব'লিতে হয়। কংস-চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের গুণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। যে যদি অবিমিশ্র শয়তান চরিত্র হইত তাহা হইলে ট্র্যাজিক চরিত্রের মহিমা কখনই লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু নাট্যকার পুরাণের শয়তান চরিত্রকে একটি মহৎ ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন। সেজন্য তাহার মধ্যে ভালো ও মন্দ এভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, দানবিকতা ও মানবিকতার নিষ্ঠুর সংগ্রামে সে হইয়া পড়িয়াছে ক্লান্ত, কাতর ও বিপর্যস্ত। এই অপরাজেয় শক্তি ও অপরিসীম দুর্বলতার একত্রিত সমাবেশেই তাহার চরিত্র আমাদের মনে মহা বিস্ময় ও সভয় সমবেদনা উদ্রেক করে।

দানব-পিতার ঔরসে ও মানবী মাতার গর্ভে কংসের জন্ম, সেজন্য তাহার মধ্যে অহরহ চলিয়াছে পিতামাতার অন্তহীন লড়াই। সে যখন জাগিয়া থাকে

তখন সে পিতার অধীন, আর যখন সে ঘুমাইয়া পড়ে তখন মাতা তাহাকে বশ করেন। 'কংস দুর্জয়, দুর্ধর্ষ ও দুর্নিবার। মানুষের ক্রন্দন তাহাকে উল্লসিত করে, মানুষের কাতরতা তাহাকে অধিকতর নৃশংস করিয়া তোলে। তাহার কথায়, 'আর সেই বিশ্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার রক্ত-আলোকে আলোকিত হ'য়ে আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখি···আমার ক্ষুধার্ত·· পিপাসার্ত দানবাত্মা তৃপ্ত হোক··· তৃপ্ত হ'য়ে নৃত্য করুক···থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ!' কংসের অত্যাচারের আর একটি রূপ আছে। মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে পাই খুব শান্ত, সংযত ও অবিচলিত। শুধু কেবল বিদ্রূপে তাহার ঠোঁট একটু বাঁকিয়া যায়, ধারাল ছুরির মত একটু হাসি ঝিলিক দিয়া ওঠে, হয়তো চোখ ও ভ্রূমণ্ডলে কয়েকটি কুটিল রেখা দেখা যায়। ভয়ত্রস্ত মানুষের অসহায়তা দেখিয়া সে ভারী মজা পায়, কখনও বা অতি ভদ্র ও নিরীহের মত নিজেকে দেখাইয়া নিষ্ঠুরতম অত্যাচার চালাইতে থাকে। কঙ্কণকে মারিবার আগে সে বলিতেছে, 'নরক, কঙ্কণ হ'ল আমার বিদূরথের পুত্র···। ওর কোন কামনা কি অপূর্ণ রাখা উচিত?' নেহাত কঙ্কণের ইচ্ছা ঠেলিতে না পারিয়া শুধুমাত্র তার প্রাণটা যেন নিল, 'তোমার ইচ্ছ ই পূর্ণ হোক, কঙ্কণ।'

কংসের আন্তর দিকটি ধরা পড়ে তাহার শিথিল মানসিক মুহূর্তে এবং নিদ্রামগ্ন অবস্থায়, কংসের প্রচণ্ডতম সংগ্রাম তাহার এই দুর্বল আন্তর সত্তার সঙ্গে। যতই সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছে, 'মিথ্যা-মিথ্যা—অথবা তোমরা ভুল দেখেছ, ভুল বুঝেছ।···আমি দুর্বল? মিথ্যা কথা? মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকুও দুর্বল নই। আমি নির্মম আমি নিষ্ঠুর···আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার শয়তান।'—ততই মনে হইয়াছে সে শুধু নিজের ভিতরকার মমতা ও অনুতাপ অস্বীকার করিবার জন্যই অস্বাভাবিকভাবে হিংস্র শয়তান সত্তাকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। মদিরার পাত্রের পর পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া সে নিজের সচেতন বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিতে চাহিয়াছে, আর অত্যাচারের পর অত্যাচার চালাইয়া সে সেই অত্যাচারের তাণ্ডবলীলায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন সে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহার শয়তান-সত্তার বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া যায়, তখন তার বিবেকবান সত্তার কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া সে আর্তনাদ করিতে 'থাকে,—'একি, চারিদিকে হাহাকার!···চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস! আকাশে বাতাসে উঃ কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল! ও-হো-হো—! (কাঁদিতে কাঁদিতে) একি! একি! (সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত

হইল) কেন এই ক্রন্দন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস—এই হাহাকার?…কার এই অত্যাচার? আমি তাকে—আমি তাকে—সে যে আমি—সে যে আমি—আমি নিজে—আমি নিজে।'

কংস দুর্দান্ত অত্যাচারী হইলেও নারীর প্রতি তাহার এক আশ্চর্য দুর্বলতা দেখা যায়। যে নারী প্রিয়া, যে নারী ভগিনী তাহার ক্ষতি যেন সে কিছুতেই করিতে পারে না, হউক না সে শত্রুপক্ষের কন্যা, হউক না সে তাহার হত্যাকারীর জননী। কংস অপরিমিত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ, তাহাকে সকলে ভয় করে, কিন্তু কেহই ভালোবাসে না। ধূ ধূ করা উষর মরুভূমিতে সে এক বিন্দু ভালোবাসা চায় এক বিন্দু অমৃত স্পর্শ! জোর সে সকলের উপরে করিতে পারে, কিন্তু করিতে পারে না শুধু নারীর উপরে—'যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধ'রে রাখিনে।' চন্দনার কাছে বারে বারে সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বারে বারে দীন কাঙ্গালের মত তাহার প্রণয় কণা ভিক্ষা করিয়াছে। দেবকীর প্রতি কংসের অত্যধিক স্নেহ দুর্বলতা দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়। দেবকীর এক একটি সন্তানকে সে দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুরতা লইয়া হত্যা করিয়াছে, কিন্তু দেবকীর সম্মুখে আসিয়া তাহার সকল নিষ্ঠুরতা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একই সঙ্গে তাহার এই নিষ্ঠুর ও স্নেহার্ত মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের মৃত্যু রোধ করিবার জন্য সে ভাগিনেয়দের হত্যা করিয়াছে, আবার ভগিনীকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সেই মৃত্যুকেই সম্ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। এই রহস্যজনক পরস্পর বিরোধিতাতেই কংস চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কংস বাহ্যত কৃষ্ণদ্বেষী। এই কৃষ্ণদ্বেষের ফলেই সে যত অমানুষক অত্যাচার চালাইয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার অবদমিত অন্তরপ্রদেশে কোথায় যেন কৃষ্ণের প্রতি কৌতূহল ও বশ্যতাবোধ রহিয়াছে। পিতা উগ্রসেনের পূজিত শালগ্রাম-শিলা সে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নাই, পলাইয়া যেন বাঁচিয়াছে—এ-পলায়ন যেন তাহার বিশ্বাসী সত্তার কাছ হইতে তাহার নাস্তিক সত্তার পলায়ন। কংস যে শত্রুরূপে কৃষ্ণের ভজনা করিতে চাহিয়াছে তাহা যেন শেষ দৃশ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়াছে—'আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত ক'রে তাঁর স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই তাঁকে টনে এনেছি।' যে মৃত্যুকে সে রোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, সেই মৃত্যুই যেন শেষ পর্যন্ত তাহার কাছে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার প্রবলতম শত্রুই তাহার কাছে যেন পরমতম ভ্রাতারূপে দেখা দিয়াছেন। .

কংসের শেষ পরিণতি সুগভীর ট্র্যাজিক রস উদ্রেক করিয়াছে। কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং নিরাপদে বৃন্দাবন-গমনের মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতের মধ্যে কংসের শেষ পরিণাম যেন ঘনাইয়া আসিল, চারিদিকেই তাহার পলায়নের পথ রুদ্ধ, মহাপরাক্রমশালী সম্রাট যেন মহাভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অনুচরগণ আশ্বাস দিল—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান পুত্র নহে, কন্যা। স্বস্তি লাভ করিয়া উৎসবের আয়োজন করিতেই চন্দনা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে আত্মাহুতি দিল। কংসের উৎসবের আলো নিভিয়া গেল। একাকী সর্বরিক্ত কংস নিতান্ত সাধারণ নাগরিকের মত কারাগারে গেল ভগিনীর একটু স্নেহস্পর্শ লাভ করিবার জন্য। অনুতাপে, মর্মবেদনায় সে কাতর। কারাগারের লৌহদ্বার খুলিবার সাধ্য তাহার নাই, সে এতই শক্তিহীন। যোগমায়াকে দেখিয়া আবার সে হঠাৎ মৃত্যুজয়ের বাসনায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে দৈবের হাতে পরাস্ত হইল। পরাজিত, ভগ্নোদ্যম ও জীবনে বীতস্পৃহ কংস অবশেষে অনিবার্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিল। দৈবশক্তির কাছে প্রবল পুরুষকারের পরাজয় ঘটিল, আকাশভেদী পর্বতের চূড়া খসিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

॥ দেবাসুর ॥ 'দেবাসুর' পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। লেখক বলিয়াছেন—'ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুব ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইবাছে।' শচী এবং সুযা এই দুইটি চরিত্র লইযা নাট্যকাহিনী ঘনীভূত হইয়াছে। সূর্যাব জন্য বৃত্রাসুবের ভাই বলাসুর আত্মত্যাগ করিয়াছে। কালো হইয়া আলোর রাজ্যের মেয়ের জন্য তাহার সুব্যাকুল আকূতির মধ্যে করুণ ট্র্যাজেডি বিদ্যমান। বৃত্রাসুর ও অশেষ বলদৃপ্ত ও ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও শচীর জন্য তাহার দুর্বলতাকে সে কিছুতেই জয় করিতে পাবে নাই। নাটকের ভাষা কবিত্বময়, সংঘাতপূর্ণ এবং আবেগগর্ভ।

॥ সাবিত্রী ॥ সাবিত্রীর মত সর্বজনজ্ঞাত এবং বহু-আলোচিত পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাট্যকার 'সাবিত্রী' নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে নাটকত্ব খুব কম, সেইজন্য নাটকত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নাট্যকাব অভিনবরূপে চরিত্র সমাবেশ করিয়াছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র অশ্বপতি। অশ্বপতির হৃদয়দ্বন্দ্ব, তাহার মানসিক সন্তাপ আমাদের মন অভিভূত করিয়া রাখে।

॥ চাঁদসদাগর ॥ 'মনসামঙ্গল'-এর সুপ্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করিয়া লেখক

'চাঁদসদাগর' রচনা করেন। মাঝে মাঝে নাট্যরস জমাইবার জন্য তিনি আকস্মিকভাবে চরিত্র সমাবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোনো স্থলেই প্রচলিত কাহিনীর গুরুতর পরিবর্তন করেন নাই। লেখকের অন্যান্য নাটকে যেমন উচ্ছ্বসিত আবেগের প্রাবল্য বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝলকাইতে থাকে এই নাটকে তেমন নাই। ইহাতে ক্রম-অগ্রসরমান গল্প বিপরীত ঘটনার দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। মনসাকে মঙ্গলকাব্যে যে রকম নীচ, অনিষ্টান্বেষীরূপে দেখিতে পাই এখানে তেমন নহে। অকারণ নীচতা ও উদ্দেশ্যহীন জঘন্যতা তাহার চরিত্রকে হেয় করিতে পারে নাই। বজ্রকঠোর, অমিতবীর্য, অনমনীয় চরিত্র চাঁদসদাগর আমাদের চিত্তকে আবেগোদ্বেল এবং উদ্বেগাতুর করিয়া রাখে।

॥ সীতা (১৩৩১) ॥ আধুনিক সময়ের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকখানি দর্শকের মনে অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে। 'সীতা' নাটকের ঘটনা বহির্মুখী নয়, হৃদয়-দ্বন্দ্ব অন্তর্মুখী ঘটনা-প্রবাহই ইহার প্রাণরসের মূলে রহিয়াছে। রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন-ইচ্ছা এবং শাস্ত্র-সংস্কারের দ্বারা তাঁহার হৃদয়বত্তাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সহিত তাঁহার নিরভিযোগ, মৌন অন্তঃসত্তার সংগ্রাম গূঢ় নাটকীয় রসে মন পূর্ণ করিয়া তোলে। বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনের সময় রামচন্দ্র তাঁহার অবরুদ্ধ হৃদয়ধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সহসা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। লোকাচার এবং শাস্ত্র-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। শম্বুকের তেজোদ্দীপ্ত অকাট্য যুক্তির মধ্যে একটা ধাবমান গতি সঞ্চারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক আছে। সেইগুলি ভক্তিভাবযুক্ত ও ধর্মরসাত্মক। ষ্টার থিয়েটারে সেইগুলি অভিনয় হইয়াছে।

(গ) ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে দেখিয়াছি। তাঁহার পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বকাল পর্যন্ত কিছু কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সব নাটকের অধিকাংশই দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ভারতীয় ইতিহাসের স্বদেশীভাবরঞ্জিত কোনো বৃত্তান্ত কি ঘটনা লইয়াই সাধারণত আধুনিক নাটকসমূহ রচিত হইয়াছে, এবং কাহিনীর মধ্যে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যই লেখকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় যখন জাতীয় চেতনা ও গৌরববোধ প্রতিদিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তখন এই নাটকগুলি জনগণের চিত্তে গভীর আবেদন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই আবেদনময়তার জন্য অনেক নাটক কলা ও রীতির দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইলেও রঙ্গালয়ে সমাদর লাভ করিতেছে। অনেক নাটকেই অকারণ ভাবাবেগ এবং অকারণ উচ্ছ্বাস সঞ্চার করিয়া লেখকগণ দর্শকদের স্বদেশী-ভাবানুপ্রাণিত চিত্তকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রোত্তর যুগে শচীন্দ্রনাথ সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার, রঙ্গালয়ে নাটকের অভিনেয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত। আধুনিক রঙ্গালয়ের সূক্ষ্ম টেকনিকে তাঁহার নাটক পরিপূর্ণ। সংলাপ-প্রখরতা এবং আবেগ-সংঘাত পরিস্ফুট কবিতেও তিনি অনেক স্থলে খুব সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার নাটকের অনেক জায়গাতেই ডি, এল, রায়ের প্রভাব বিদ্যমান, শক্তিশালী চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি এই প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আধুনিক নাটকের রীতি অনুসারে তাঁহার নাটকেও চরিত্রগুলি বিরুদ্ধ ভাবময় ও জটিল।

॥ গৈরিক পতাকা (১৯৩০)॥ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর গৌরবময় উত্থানের বিষয় লইয়া 'গৈরিক পতাকা' রচিত। নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ন্যায় জাতীয়-ভাববোধক। একটি জাতির আশা ও স্বপ্নকে কিভাবে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও উদার বীরত্বের মধ্য দিয়া সফল করিয়া তোলা যায় তাহার অতি উজ্জ্বল চিত্র নাটকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। শিবাজী চরিত্রের দৃঢ়তা ও কোমলতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি নাটকের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। নাটকখানি বিশেষ ঘটনাবহুল এবং আবেগময়, তবে জায়গায় জায়গায় অতিনাটকীয় ভাব রহিয়াছে,—যেমন, রণরাও হঠাৎ আদিল সাহের দুর্গে প্রবেশ করিয়া বীরাবাই এর কাছে গেল, এবং রণরাও ও বীরাবাই যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় মিলিত হইয়া আবার স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া উঠিল এবং পুনরায় প্রেমের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ইহাতে বীরাবাই-এর ভৈরব যুদ্ধ নিতান্ত অকারণ এবং অনর্থক হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের গানগুলি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা, উহাদের উপব দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব রহিয়াছে। একটু আধটু অসঙ্গতি থাকিলেও ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে গ্রন্থখানি খুবই সার্থক।

॥ সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮) ॥ শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা'র জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। সিরাজদ্দৌলা বাংলার স্বাধীনতা-সূর্যের শেষ গৌরবোজ্জ্বল অস্তরাগ, সেইজন্য তাঁহার কাহিনী বাঙালীর আগ্রহসিক্ত স্বতস্ফূর্ত বেদন-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে। শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা-রক্ষাব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং উদার। কিন্তু নাটকে তাঁহার শক্তিমান দৃঢ়চেতা রূপ অপেক্ষা করুণ, দুঃখময় আবেদনশীল দিকটা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ার অভিনয়ের মধ্যেও এই নিষ্ফল, নিরুপায় দিকটাই বেশী করিয়া দর্শকের চোখে পড়িত।

॥ রাষ্ট্রবিপ্লব ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'কে সামান্য অদল বদল করিয়া শচীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রণয়ন করেন। নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, দারার সর্বধর্মসমন্বয় এবং ঔরঙ্গজীবের ইসলাম ধর্মোন্মত্ততা—এই দুই আদর্শের সংঘাত তিনি দেখাইয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রধান চরিত্র দারা। ঔরঙ্গজীবকে প্রখর বুদ্ধিশালী, ব্যক্তিত্বময় চরিত্ররূপে এখানে দেখি না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে ঘটনার জটিলতা ও দৃশ্যসংস্থাপনের নৈপুণ্য আছে আলোচ্য নাটকে তাহার অভাব। রৌশনআরা চরিত্রটি অর্থহীন, কেবল ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও খরকথার পটুতা তাহার আছে। তাহার প্রখরতা ও দীপ্তির কাছে জাহান আবাকে অহেতুক বার বার দুর্বল ও মূক করা হইয়াছে। শেষ দৃশ্য অর্থহীন, এবং একেবারে অনুপযোগী, ইহা কেবল নাট্যকারের মত বহন করিয়াছে মাত্র।

॥ ধাত্রীপান্না (১৯৪৪) ॥ 'ধাত্রীপান্না' দুই অঙ্কে বিভক্ত। নাটকীয়তার দিক দিয়া ইহা শচীন্দ্রবাবুর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের কাহিনী অতি দ্রুতবেগে তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আকস্মিক নাটকীয় ঘটনার মুহুর্মুহুঃ অভিঘাতে দর্শকের মন আবেগ-দোলায় দুলিতে থাকে। বিপরীত ভাবের সঘন সংঘর্ষে নাট্যরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনো স্থলেও আবেগোচ্ছ্বাস ও অন্তরচাঞ্চল্য একটু শিথিল হইবার অবকাশ পায় নাই। বনবীর নির্মম ও নৃশংস, কিন্তু চম্পার কাছে সে দুর্বল, এবং পান্নার মহান আত্মত্যাগ তাহার ঊষর হৃদয়মরু সিক্ত করিয়াছে। পান্নার প্রতিশোধ গ্রহণও অতি চমকপ্রদ ও মনোরম। দুই হিংস্র ব্যাঘ্রীর ন্যায় নখ-দন্তের আঘাত হানিয়া পান্না এবং শীতলসেনী পরস্পরের সহিত যুঝিয়াছে। বনবীরের সর্বপ্রকার পাষণ্ডতা সত্ত্বেও তাহার মাতৃভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) মন্মথ রায়

॥ খনা (১৯৩২) ॥ 'খনা' বহু অভিনীত প্রশংসাধন্য নাটক। বরাহ নিজের পুত্র মিহিরের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে ভুল জ্যোতিষগণনা করিয়া তাঁহাকে জলে ভাসাইয়া দেন এবং পুনরায় বহু বিচিত্র ঘটনার পর যৌবনপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতিষী পুত্রের সহিত মিলিত হন। এই কাহিনীটি যথেষ্ট নাট্য-কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্ত তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা লইয়া দ্রুত গতিশীল নাট্যকাহিনী দর্শকগণ অনুসরণ করিয়া চলে। দ্বিতীয় অঙ্কের পর পিতা ও পুত্রের রহস্য-উদ্ঘাটনেব পরবর্তী নাট্যকাহিনী স্বভাবতই একটু শিথিল-গতি ও উত্তেজনাহীন হইয়া প'ড়িয়াছে। কিন্তু দেশমান্য জ্যোতিষী বরাহের খ্যাতি তাঁহার পুত্রবধূ খনার নবলব্ধ প্রবল খ্যাতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার ফলে নিকটতম স্নেহসম্বন্ধের মধ্যে ঈর্ষা, ক্ষোভ ও গ্লানির কলুষস্পর্শ কিভাবে লাগিল এবং তাহারই পরিণতিতে খনার জিহ্বাকর্তনেব মধ্য দিয়া আত্মহত্যার যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিল তাহাতে নাটকটি শেষের দিকে নূতন সমস্যা দ্বারা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ সত্য এবং যশের আকাঙ্ক্ষাও সত্য। এই দুই সত্যের মধ্যে বিবোধ বাধিবার ফলে মানুষের জীবনে যে কি করুণ ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া আসিতে পারে এই নাটকে তাহাব পরিচয় আমবা পাইলাম।

॥ অশোক (১৯৩৩) ॥ চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হইবার সুবিদিত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। ঐতিহাসিক নাটকরূপে বইখানি অত্যন্ত সার্থকতা লাভ কবিযাছে, ইহা অকুণ্ঠ ভাবেই উল্লেখ করা চলে। ঐতিহাসিক নাটকের বীরত্বরঞ্জিত প্রতিবেশরচনা, ঘটনার প্রবলতা ও তীব্র ঘাতপ্রতিঘাত চরিত্রগুলির সুমহান, শক্তিদীপ্ত রূপ,—সমস্তই নাটকের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপরিবেশে লোকদের যথাযথ নাম ও পদবীর উল্লেখ, তাহাদের ক্রিয়া, স্বভাব ও আচরণের ইতিহাসসম্মত রূপ প্রভৃতি নাট্যকার সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। অশোকের কামনা ও দুর্বলতা, তাঁহার সুতীব্র মর্মদাহ, তাঁহার নৃশংস চণ্ড রূপ এবং বুদ্ধচরণাশ্রিত শান্ত রূপ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী দিকগুলি নাট্যকার সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কলিঙ্গ জয়ের বীভৎস নারকীয়তা যেমন নাটকের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি বৌদ্ধধর্মের অপার করুণা ও ক্ষমাও নির্মল সূর্যজ্যোতির মত ইহাতে বিকীর্ণ হইয়াছে।

॥ মীরকাশিম (১৯৩৮) ॥ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য

লইয়াই নাটকটি রচিত। মীরকাশিম সংক্রান্ত নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া ইতিহাসের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রক্ষা করিয়াই নাট্যকার ইহা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'এ-নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।' কিন্তু নাট্যকারের আত্যন্তিক ইতিহাসসচেতনতার জন্যই বহির্জগতের ঘটনাকোলাহল ও বিচিত্র চরিত্র সমাবেশের মধ্যে অন্তর্জগতের মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ যেন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার বাংলার সায়াহ্ন-ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ইতিহাসের একটি বাস্তব রূপ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, কিন্তু ইতিহাসের সেই অস্ত্রঝঙ্কৃত, ও বহু কণ্ঠনিনাদিত জগতের অন্তরালে মানুষের যে শাশ্বত হৃদয়লীলার ধারা আনন্দবেদনার নানা তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার পরিচয় এই নাটকে মিলিল না। নাটকের ঘটনা অতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, ইহাতে মুহুর্মুহুঃ আকস্মিকতার তাব্র বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাতের ক্রুদ্ধ ঝটিকাবেগ ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করা গিয়াছে। তবে মীরকাশিমের পরিণতি-দৃশ্য অতর্কিত ও অতি-নাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে। বহু চরিত্রের ভিড়ে মীরকাশিমের চরিত্র-বিকাশ একটু ব্যাহত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জ্বালাময়, অপ্রকৃতিস্থ উক্তিগুলিতে পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ একটি জাতির শেষ মুক্তিস্বপ্ন এবং ক্রন্দিত হৃদয়ের করুণ হতাশাই ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) মহেন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত কয়েকখানা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, সেইগুলি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবুর নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিকতাই প্রধান, ঐতিহাসিকতার তলদেশশায়ী ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বময়তার এবং সূক্ষ্ম ভাবাবেগের ক্রিয়াচাঞ্চল্য তাঁহার নাটকে তেমন অভিব্যক্ত নহে। তাঁহাব নাটকগুলির মধ্যে 'রাণী ভবানী', 'রাণী দুর্গাবতী', 'মহারাজা নন্দকুমার', টিপু সুলতান', 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ টিপু সুলতান ॥ 'টিপু সুলতানে'র মধ্যে স্বাধীনচেতা, স্বদেশ-হিতব্রতী, উন্নত-চরিত্র হায়দার আলির যোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের কাহিনী উপনিবদ্ধ হইয়াছে নাটকের মধ্যে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এবং জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসের মহৎ আদর্শের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র একচেটিয়া

আধিপত্য লাভ করিয়াছে। বিশ্রান্ত অবসরে গুঞ্জায়মান কোন কোমল বৃত্তির স্ফুরণ ইহাতে নাই। কোনো স্ত্রী-চরিত্রই পরিস্ফুট নহে।

॥ পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ॥ 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' চার অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। শিখ নায়ক রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লইয়া নাটকখানি বিরচিত। রণজিৎ সিংহের কঠোর বিচার ও কর্তব্যপ্রাণতা অতি বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের রসের স্ফূর্তি একান্তভাবে তাহার উপর নির্ভর করে নাই। উচ্চ আদর্শ ও স্বদেশ প্রাণতা নাটকের মধ্যে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। রণজিতের মাতা রাজকৌড় এবং পত্নী—খড়্গসিংহের বিমাতা ঝিন্দন বাইএর সীমাহীন মহত্ত্বের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

(৪) নিশিকান্ত বসুরায়

॥ বঙ্গেবর্গী ॥ নিশিকান্ত বসুরায় তিন চারখানা ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'দেবলাদেবী' এবং 'বঙ্গেবর্গী' সমধিক প্রসিদ্ধ। 'বঙ্গেবর্গী' বহু-অভিনীত ও খ্যাতিসম্পন্ন নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে ধরা যায়। ইহার সংলাপ দীর্ঘ এবং উচ্ছ্বাসময়, আধুনিক নাটকের সূক্ষ্ম টেকনিক ইহাতে নাই। চাঞ্চল্যকর হত্যা ও বাহ্য স্থূল ঘটনার প্রাবল্য ইহাতে অধিক। সেইজন্য হয়তো ইহার জনপ্রিয়তা এত বেশী হইয়াছে। সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কোনো চরিত্রের রসময় অভিব্যক্তি নাটকে নাই। আলিবর্দি স্নেহপরায়ণ, মিলনপ্রয়াসী এবং ধর্মিষ্ঠ কিন্তু তাঁহার শাক্ত-সক্রিয় প্রভাব অদৃষ্ট। সর্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মবান অথচ দারুদৃঢ় এবং কুলিশকঠোর। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার নিরুপায় এবং দুঃখতাপদগ্ধ চিত্তের বিষাদঘনতা অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী।

(৫) অন্যান্য নাট্যকার

॥ কেদার রায় ॥ রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকখানি বহুল প্রচারিত এবং উচ্চ-প্রশংসিত। 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদরায় এবং কার্ভালো যথাক্রমে বিক্রমাদিত্য এবং রডার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে নিগৃহীতা রমণীর সামাজিক সমস্যাটি দৃষ্টি ও মন অধিকার করিয়া বসে। কেদার রায়ের মহিমামূলক নাটকের মধ্যে ঈশাখাঁ-সোনা ঘটিত পার্শ্বকাহিনী মূল ভাব-প্রবাহকে খণ্ডিত করিয়াছে।

ঈশাখাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উদারতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় সংস্থান। নাটকের সর্বপ্রকার দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পিছনে রহিয়াছে শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের পাগলামীর মধ্যে গুরুতর অনিষ্টকারিতা বিদ্যমান, সুতরাং পাগল বলিয়া সে ক্ষমাশীল উপেক্ষার পাত্র নহে। বীর প্রভুভক্ত কার্ভালোর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাণবান। খ্যাতনামা নট শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের অভিনয়-নৈপুণ্য এই ভূমিকাটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

॥ পলাশী ॥ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'পলাশী' নামক একখানা ত্র্যঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন। নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠ নাট্যকলার পরিচয় আছে। ঘটনার বিন্যাস জমাটভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিথিল গ্রন্থির দুর্বলতা চোখে পড়ে না। প্রধান চরিত্র মোহনলাল—তাহার ব্যক্তিত্ব, স্বদেশপ্রেম এবং বীরত্বই নাটকের প্রধান বর্ণিতব্য সম্পদ। ঘসেটি বেগম এবং সেলিনা বেগ স্বল্প পরিসরের মধ্যে অশেষ প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় আবেগ ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলার চরিত্র এস্থলে গৌণ।

॥ দিগ্বিজয়ী (১৯২৮)॥ নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী 'নিবেদনে' বলিয়াছে, 'দিগ্বিজয়ী' নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন ; সেইজন্য ইহার কোন ঐতিহাসিক নাম (অর্থাৎ নাদির শাহ এই নাম) দিলাম না। অবশ্য ঐতিহাসিক নাম থাকিলেই যে নাটকের মধ্যে কোনো মূলভাব থাকিতে পারে না, তাহা নহে। ইতিহাসে থাকে শুধু মাত্র ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনা যখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয় তখন সাহিত্যিককে সেই প্রাণহীন ঘটনার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবাদর্শ সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে যদি মানুষী রাজ্যের কোন চিরন্তন আশা ও বেদনার পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই। নাট্যকার কথিত 'চিরন্তন মূল ভাবটি' লইয়া এখন আলোচনা করা যাক। নাদিরের চরিত্রে কোন মূলভাব আবিষ্কার করা সত্যই কঠিন। কারণ জীবনে আগাগোড়া একটা অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন খেয়ালের রাজত্ব চলিয়াছে। যিনি আত্যন্তিক খেয়ালের বশীভূত হইয়া, এক মুহূর্তের কাজ পরমুহূর্তে ওলটপালট করিয়া দিতেছেন তাহার মধ্য হইতে কিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট মূলভাব নির্ণয় করা যায়? 'কন্তু তবুও এই খেয়ালী স্বভাবের কথা বাদ দিলে বোধ হয় একটি মূলভাব আবিষ্কার করা চলে। তাহা নাটকের একমাত্র পদ্যছন্দে বর্ণিত সংলাপে ব্যক্ত হইয়াছে—

দয়া নহে প্রকৃতি নিয়ম—
শক্তি মাত্র আশ্রয় জগতে।
শক্তি যার যতটুকু
অধিকার ততটুকু তার
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—
মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা

এই শক্তিদর্প ও তাহার শোকাবহ পরাজয়কেই নাটকের মূলভাব বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সেই হিসাবে 'দিগ্বিজয়ী' নামটির মধ্যেই একটা বড় রকমের শ্লেষাত্মক সঙ্কেত আছে। যিনি অমানুষী শক্তিবলে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন, তিনি কি অসহায়ভাবে পারিবারিক অন্তর্বিরোধের কাছে পরাজয় স্বীকার করিলেন! যিনি প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের দোহাই দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের বিধানেই মৃত্যুবরণ করিতে হইল! প্রতিকূল ঘটনা-গত শক্তি, নিয়তি, ঈশ্বর—যে কোন শক্তিই হউক তাহার কাছে বারে বারে অতিমানবদের শক্তি এভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে।

নাদিবের চরিত্র সম্বন্ধে নাট্যকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক হাতে গড়িয়াছেন আবাব এক হাতে ভাঙ্গিয়াছেন। এই কথার সার্থকতা পাওয়া যায় বাহিরের জগতে। তিনি যে রাজ্যগুলি গডিয়াছেন সেগুলি আবার তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন। সাফাভী বংশের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া ইরানকে তিনি নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, আবার তিনিই ইরানের উপর দিয়া অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষকে সহস্র-রাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে তিনি আসিয়াছিলেন, অবশেষে তিনিই নৃশংস উৎপীডন ও নরহত্যার দ্বারা ভারতবর্ষের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ ভাঙ্গাগড়া তো বাহিরের ব্যাপার। আসল ভাঙ্গাগড়া তাঁহার নিজেকে লইয়া। তিনিই নিজেকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইয়া সেখান হইতে নির্মমভাবে ভূপাতীত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার যথার্থ ট্র্যাজেডি এইখানে। তিনি অনেকের সঙ্গে অনেক শত্রুতা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা কঠিন শত্রুতা নিজের সঙ্গে। এই শত্রুতার ফলেই তাঁহার পতন হইয়াছে—হিন্দু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নাদিরের অনেক কাজই নিছক খেয়ালের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে, কোন অন্তর্নিহিত ভাববৃত্তির সুস্পষ্ট প্রেরণায় হয় নাই, সেজন্য ট্র্যাজেডির নিরুপায় অনিবার্যতা অনেক স্থলেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সিরাজীর প্রতি অকারণ অপমান তাঁহার নিষ্ঠুর খেয়ালের অন্যতম অন্যায় কর্ম। সিতারার প্রতি সন্দেহ ও তাহার বহিষ্কার এবং আপন সন্তানের চক্ষু উৎপাটন প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতজনিত কোন সুচির-পোষিত দুর্দমনীয় হৃদয়ভাবের পরিণতি নহে। সেগুলি যেন কোন আকস্মিক নিষ্ঠুর খেয়ালী প্রবৃত্তিরই পরিণতি। হিন্দু রমণী অভিশাপ দিয়াছিল—'স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে', কিন্তু আসলে সিরাজী ছাড়া তাঁহার পরিবারের আর কেহ বিষাক্ত হয় নাই। নাদিরের অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষাই সকলকে বিষাক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল। নাদিরের পারিবারিক জীবনের অশান্তি ও পরাজয়ের মূলে একটি চরিত্র রহিয়াছে, সে হইল সিরাজী। দিল্লীর সৈন্যবিদ্রোহ ও ইরানের অভিজাত-বিদ্রোহের মূলে সিরাজীর ন্যায় একটি নারী-চরিত্রের এতখানি প্রভাব ছিল কি না ইতিহাস তাহার বিচার করিবে। কিন্তু নাটকের মধ্যে সিরাজী ও তার ভ্রাতা আলি আকবরকেই নাদিরের ভিতর ও বাহিরের মূল বিরোধী শক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। অথচ সিরাজীকে একেবারে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেওয়াও চলে না। কারণ তাহার প্রতিহিংসার পশ্চাতে একটি অপমানিতা, প্রেমবঞ্চিতা নারীর তীব্র বেদনা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু যখন সে নিজের কাজের ভয়াবহ অমঙ্গলজনক রূপ দেখিতে পাইল, তখন ভয়ে আশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া সেই তাহার প্রিয় স্বামীর কাছে যাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার দোষ স্বীকার করিল।

নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি।' ইবসেনের বাস্তবতা ও সমাজদ্বন্দ্বের সহিত এই নাটকের কোন মিল নাই, তবে ইবসেন দৃশ্যসংস্থাপনার মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী যে সব রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন সেগুলির কিছু কিছু প্রভাব আলোচ্য নাটকে দেখা যায়। ইবসেনীয় নাটকের ন্যায় এই নাটকেও দৃশ্য-বিভাগ নাই, শুধুমাত্র অঙ্ক-বিভাগ রহিয়াছে। ইহাতে যেমন সময়সংক্ষেপের ব্যবস্থা হইয়াছে তেমনি অকারণ দৃশ্যবাহুল্য হইতে নাটকখানি মুক্তিলাভ করিয়াছে। একই অঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র পর পর সন্নিবেশিত করিয়া নাটকের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিবেগ আনিবার চেষ্টা হইয়াছে।

(ঘ) সামাজিক নাটক

বর্তমান সময়ে সামাজিক নাটকের বহুল ব্যাপ্তি এবং সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ, জীবনধারণ-প্রণালীর জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমে ক্রমে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আগেকার জীবন ছিল নিতান্ত সহজ ও সরল, জীবিকা অর্জন তখন কষ্টসাধ্য ছিল না, এবং তখন লোকে সুনির্দেশিত নীতি ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী নিজেদের জীবন চালিত করিত, সেইজন্য নানা প্রশ্ন—সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব তখন হইত না। কিন্তু এখন আর্থিক সংকট ও কৃচ্ছ্রতার জন্য যেমন মানুষের মন অসন্তুষ্ট ও সন্দেহগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি নানা অভিনব মতবাদ ইহাকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। মানুষের জীবনের শান্তিপূর্ণ সুখ এবং নিশ্চিত আরাম বুঝি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-বিক্ষোভের ঘূর্ণিবাত্যায় ইহা যেন অনির্দিষ্টভাবে কেবল ঘূর্নিত হইয়াই চলিয়াছে। বার্ণার্ড শ, গলস্‌ওয়ার্দি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারের নাটকে এই সমস্যাসংক্ষুব্ধ সমাজ-জীবনের পরিচয়ই আমরা পাই। পরিবার-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, ধনী-দরিদ্র সমস্যা প্রভৃতি ইহাদের নাটকে নানাভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। নাটকের ধর্ম বিষয়সর্বস্বতা, নাট্যকার সাধারণত তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য। কিন্তু বর্তমান নাট্যকার এত সমাজসচেতন হইয়া উঠিতেছেন যে তিনি নিজেকে নাটকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, নাট্যকারের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা মত এখন নিতান্তই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।[১] আধুনিক নাটক-রচয়িতাদের মুখপাত্র বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন—'I do not write a single line except for teaching somthing.' নানা প্রশ্নতর্কের অবতারণা করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা কোন মত প্রতিপাদন করাই আধুনিক নাট্যকারের উদ্দেশ্য। অবশ্য সাময়িক এবং স্থানিক সমস্যা অতিক্রম করিয়া শাশ্বত, বিশ্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা না হইলে সাহিত্য চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিক অনেক সাহিত্যিক স্বল্পতোয়া নদীবক্ষে বিক্ষোভময় আবর্ত সৃষ্টি করিতেছেন বটে, কিন্তু অনন্তস্রোত-পারাবারে তাঁহারা পৌঁছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

১। 'Another tendency of the serious modern dramatist is to over-emphasize the interpretative side of his art. It is a noble fact that a large mass of the best modern drama is obtrusively didactic.'

Tendencies of Modern English Drama by A. E. Morgan. P. 5

বর্তমান সাহিত্যে খুব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অবতারণা হইয়া থাকে ইহা আমরা দেখিতেছি। অনেক সময়েই এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয় যে, পাঠকের পক্ষে যোগসূত্র অনুসরণ করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাই দুরূহ হইয়া পড়ে। উপন্যাসে আলোচনা এবং বিশ্লেষণের সুযোগ বেশি, নাটকে অভিনয়ের উপযোগিতার উপর লক্ষ্য থাকে বলিয়াই অত বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবুও ইহাতে অনেক স্থলেই মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত ও আপাতদুর্বোধ্য বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ সন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, বর্তমান জগতেব যুগান্তকারী মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুগামিগণের প্রভাবের ফলেই এইরূপ হইতেছে। ফ্রয়েড মানুষের মনোরাজ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্যরাজি আবিষ্কার করিবার পর বর্তমান চিন্তাজগতে তাঁহার গভীর প্রভাব পতিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকেব সাহিত্যেও সেইজন্য সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসিক স্তরের বৈষম্য, সংস্কার-বিরোধী বাসনা-কামনার অস্তিত্ব প্রভৃতি দেখানো হইয়াছে।

বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য বর্তমানে বিশেষ সমৃদ্ধ ও প৹িপুষ্ট, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার যোগ গভীর এবং নিবিড়। শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপর অভ্রান্ত আলোকপাত করা হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ ব স্তবতা এবং বলিষ্ঠ মতবাদের ফলে তাঁহাদের সাহিত্য বাঙালীর মন ও মতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা নাটকে এইরূপ সমাজচেতনা এবং বাস্তব সমস্যালোচনা দেখা যায় না। বর্তমান কালের অধিকাংশ নাটকে দর্শকের রুচি ও চাহিদার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া হয়তো কোথাও বা কোনো সমস্যা সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করিয়া পবিশেষে একটা নিতান্ত সস্তা ও সুলভ মিলনান্তক পরিণতির মধ্যে নাটকের শেষ করা হইয়া থাকে। প্রশ্ন-সমস্যা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি হইলেও শেষে মিলন একটা করিতেই হইবে, তাহা না হইলে বাঙালী দর্শক যে সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের দর্শকবৃন্দ নাটক দেখিতে চান না, নাচ-গান, স্থূল রোমাঞ্চকর দৃশ্য এলং তরল ভাবোচ্ছ্বাসই তাঁহারা চান, সেইজন্য গুরুতর সমস্যার আঘাতে পীড়াগ্রস্ত মন লইয়া রঙ্গালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্যকারবৃন্দ খাঁটি সমস্যামূলক নাটক লেখেন না। যে দুই একখানা সমস্যামূলক নাটক লিখিত হইতেছে, সেইগুলিও নাটকীয় রসোত্তীর্ণ হয় না বলিয়া তেমন মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেছে না।

(১) বিধায়ক ভট্টাচার্য

বিধায়কবাবু আধুনিক সামাজিক নাট্যপ্রণেতাদের মধ্যে অগ্রণী, সেইজন্য প্রথমে তাঁহার নাটকের আলোচনা করা হইতেছে। বিধায়কবাবুর নাটকে গভীর সমাজচেতনার সহিত সুনিপুণ নাট্যকলার নিখুঁত সংমিশ্রণ হইয়াছে। আধুনিক বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমস্যা দ্বারা বিচলিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব চিত্র তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। সমস্যাকে তিনি কেবল স্পর্শ করিয়া যান নাই, সমস্যার অন্তস্থলে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিরসে সমস্ত সমস্যা অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সমাজসমস্যার অবতারণা থাকিলেই কোনো নাটক শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত হয় না, যদি না ইহা শ্রেষ্ঠ নাট্যকলার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। বিধায়কবাবুর নাটকে সেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকলা বিদ্যমান। এমন সুকৌশলে তিনি ঘটনা-সংস্থাপন এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিয়াছেন যে তাঁহার নাটকের ক্রিয়া দ্রুত তালে জমাট পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ঘটিয়া যায়। এক কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি দ্বারা তিনি দৃঢভাবে সমস্ত চরিত্রগুলি বাঁধিয়া দেন, সেই শক্তির প্রভাবে এতটুকু শিথিলতা, এতটুকু বিক্ষিপ্ততা তাঁহার নাটকে নাই। অবিরাম ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নাটকের সমস্যা অব্যর্থভাবে দর্শকের হৃদয়ে আঘাত হানিয়া রসে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে।

॥ মাটির ঘর ॥ বিধায়কবাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক 'মাটির ঘর'। ইহা আধুনিক সমস্ত নাটকের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ একথা বলিলে অতিরঞ্জন হয় না। বাংলা নাটকের গতানুগতিকতা ইহাতে নাই, বাঙালী দর্শকের রুচির অধীনও ইহাকে করা হয় নাই। ইহার মধ্যস্থ সমস্যা বাংলা নাটকের ন্যায় দপ করিয়া জ্বলিয়া ফস করিয়া নিভিয়া যায় নাই। শমীবৃক্ষের অন্তরস্থ আগুনের ন্যায় ইহা অনির্বাণভাবে জ্বলিয়া সব নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। নাটকের কাহিনী এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কাহিনীর মধ্যে কোনো উদ্ভট অভিনবত্ব নাই, কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও নাই; কিন্তু এইরূপ সচরাচরদৃষ্ট পরিবার ও চরিত্রের মধ্যে বর্তমানে যে-সব সমস্যা দেখা দিতেছে, নাট্যকার সুগভীর দরদ ও সীমাহীন সহানুভূতির দ্বারা তাহা উপস্থাপন করিয়াছেন। নাট্যকার ভ্রান্ত স্খলিত জীবনের কঠোর সমালোচক নহেন, আঘাতে শাস্তিতে তাঁহার উল্লাস নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি দ্বারা সব অন্যায়-অপরাধ ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অলকের গুরুতর অপরাধ সেই কারণেই মার্জিত হইয়াছে। নাটকখানির দৃশ্যসংস্থাপনে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছয়টি মাত্র দৃশ্যে নাটকের শেষ, অথচ এই অল্প কয়টি দৃশ্যের মধ্যে একটা অতি জটিল, বিভিন্নমুখী কাহিনীকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। নাটকের ক্রিয়ার একটুও ফাঁক নাই, একটুও বিরাম নাই। তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দা ইহাদের তিনটি স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত এমন সুনিপুণভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মনে হয় তাহারা একই অবিচ্ছিন্ন কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। তিন ভগ্নীর মধ্যে শুধু যে নামের সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, তাহাদের দুঃখময়, করুণ জীবনেরও সঙ্গতি আছে। তন্দ্রার ট্র্যাজেডি সর্বাপেক্ষা করুণ, তাহার সমস্যা মৌলিক এবং চিরন্তন। টমাস হার্ডির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'তে, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' যে সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, ইহা সেই সমস্যা। উদার, ক্ষমাশীল স্বামী এবং আবেগময়, প্রেমপাগল প্রণয়ীর মধ্যে তাহার দ্বিধাবিভক্ত চিত্ত নিরুপায়, নিঃসহায়ভাবে দুলিয়াছে। নন্দার ট্র্যাজেড নির্যাতিত, ভাগ্যলাঞ্ছিত, হতভাগিনী বাঙালী ললনার ট্র্যাজেডি, জীবনপাতের মধ্য দিয়া সে আমাদের সমাজব্যবস্থার প্রতি যে নির্বাক অভিযোগ জানাইয়া গেল তাহা আমাদিগকে চাবুক মারিতে থাকে। কনিষ্ঠা ভগ্নী ছন্দার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যে কারুণ্যের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিন ভগ্নীই ব্যক্তিত্বশালিনী, স্বাতন্ত্র্যময়ী—অথচ তিনজনেই প্রতিকূল অবস্থার চক্রান্তে নিরুপায় দুঃখ লাভ করিয়াছে,—ইহা দেখিয়াই আমাদের চিত্ত সমবেদনায় আপ্লুত হইয়া উঠে। তিন কন্যার পিতা সত্যপ্রসন্নের ট্র্যাজেডি শুধু শোচনীয় নয়, ইহা অসহনীয়। এক একটি কন্যার জীবনের ব্যর্থতার সহিত তাঁহার বক্ষের এক একখানি হাড় খসিয়া যাইতেছে, অথচ তাঁহার শূন্য বক্ষপঞ্জরের মধ্যে তাঁহার প্রাণটা তবুও ধুক ধুক করিতেছে; ইহার যেন মুক্তি নাই, নিষ্কৃতি নাই, ঐখানে বাঁচিয়া থাকিয়া যেন তাহাকে লক্ষ কোটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বাংলা নাটকে সাধারণত পরিণতি মিলনান্তক করিয়া যেমন সমস্যার গুরু মেঘ ফস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, এই নাটকে তেমন হয় নাই। এখানে জমাট কান্না বুকে চাপিয়া রঙ্গালয় হইতে বিদায় লইতে হয়। যথার্থ ট্র্যাজেডির গৌরব ইহাতে আছে। নাট্যকারকে অভিনন্দন না জানাইয়া পারা যায় না।

॥ মেঘমুক্তি ॥ 'মেঘমুক্তি' নাটকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহের সঞ্চার এবং অবশেষে সেই সন্দেহের নিরসন দেখানো হইয়াছে। প্রদ্যোত এক মৃত অধ্যাপকের কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে, এবং প্রদ্যোতের বন্ধু স্বপন তাহাদের পরিবারে প্রবেশ করিয়া প্রদ্যোতের স্ত্রী অণিমাকে তাহার কামকুটিল

পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করে। গীতা প্রদ্যোতের বাড়িতে আসিবার পর মেঘমুক্তি হয় এবং প্রদ্যোত ও অণিমার মধ্যে পুনর্মিলন হয়। পারিবারিক জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বিষয় লইয়া নাটকখানি রচিত। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত ইহাতে ভালোভাবে বিশ্লেষিত হইযাছে। তবে সমস্যার সমাধান যেন লঘু ও অতর্কিতভাবে করা হইয়াছে। দাদু অতুল ঘোষেব ভূমিকা অপ্রয়োজনীয়, নাটকখানির বাঁধনি বিশেষ উৎকৃষ্ট।

॥ তাই তো ॥ 'তাই তো' হাস্যরসবহুল কমেডি। নাট্যকার তাঁহার বক্তব্যে বলিয়াছেন—'যদি এই সঙ্কটসঙ্কুল জীবনে কয়েকটি মুহূর্তেও কিছুমাত্র আনন্দের আদান-প্রদান কবতে পারেন, ত৷ হ'লে কৃতার্থ হব'। জীবনময়ের দুই কন্যা মল্লিকা এবং বল্লিকা সাহসিকা, আধুনিকা তরুণী। সমর হঠাৎ বড লোক হইযা বিধবা বিবাহ কবিবাব চেষ্টা কবে, কিন্তু সে বিষযে হতাশ হয। মল্লিকা উপযাচিকা হইযা সমবকে বিবাহ কবিতে চায়, এবং উভয়েব বিবাহ হয়। বিধাযকবাবুব নাট্যকলার চমৎকাবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে সংলাপের মধ্যে, সেই সংলাপ বসস্নিগ্ধ, কৌতুকোজ্জ্বল এবং প্রাণময়।

॥ বিশ বছব আগে (১৩৪৬)॥ বিশ বছব আগে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিযাছে তাহাই বিশ বছব পরে নায়কেব পুনবায ঘটনাস্থলে আগমন উপলক্ষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকেব সমস্যাও মূলত সেই চিবন্তন ত্রিকোণাকার সমস্যা, অর্থাৎ এক নায়িকাকে লইয়া দুই নায়কেব দ্বন্দ্ব। দুই নায়ক আবার এখানে দুই বন্ধু, সেজন্য সংঘাত বাধিয়াছে প্রণয় ও বন্ধুত্বেব মধ্যে। কিন্তু এই সংঘাতটি নাটকেব গোডাতে যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং বিশ বছর পবে নায়কেব অনুতপ্ত চিত্তে যেমন উজ্জ্বল কবিয়া তোলা হইয়াছে, নাটকেব ঘটনা পবিণতিব মধ্যে অনিবায শক্তিরূপে তেমন দেখান হয় নাই। প্রদীপের চবিত্রেব যেমন বন্ধুব প্রতি একটা অকাবণ নিষ্ঠুরতা দেখা গিয়াছে, দীপকের চবিত্রেও তেমনি একটা উদাসীন অবজ্ঞা এবং অস্তম প্রতিহিংসা স্থান লাভ করিযাছে। অর্থাৎ ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাব মধ্যে উভয়ের প্রীতির সম্পর্কটি একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নাটকের বিচিত্র উত্তেজনাজনক সংলাপ ও পরিস্থিতি এবং ক্ষিপ্র গতিবেগ ইহাব নাট্যরস জমাইয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনার সম্ভাব্যতা ও চরিত্রবিকাশের স্বাভাবিকতা অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সেজন্য নাটকীয় উত্তেজনা অনেকাংশেই চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ভাবের সহিত যুক্ত না হইয়া 'স্টাণ্ট'-সর্বস্ব রোমাঞ্চতায় পরিণত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যের গোলা-গুলির ব্যাপারে

ইহা বিশেষভাবে চোখে পড়ে যে তন্বীহরণ লইয়া নাটকের এমন অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিণতি ঘটিল তাহার পিছনে যেন কোনো অনিবার্য কারণ নাই। প্রদীপের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যদি সে তমসাকে প্রতারণা করিয়া থাকে, তবে দীপকও তো সেই প্রতারণার অপরাধে অপরাধী। তাহা হইলে প্রদীপ এরূপ ঘৃণ্য-চরিত্র আর দীপক 'A Tale of Two Cities' এর সিডনি কার্টনের ন্যায় প্রেমের আত্মোৎসর্গে মহৎ হইয়া উঠিল কিভাবে? প্রদীপের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা তাহারই বিরুদ্ধে রিভলভার দিয়া সাহায্য করা, তন্বীর আকস্মিক আত্মহত্যা, প্রদীপের আকস্মিক হত্যা প্রভৃতি উত্তেজনাজনক অসঙ্গতি নাটকের শিল্পায়নে ত্রুটি ঘটাইয়াছে।

(২) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি কয়েকখানা উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকও লিখিয়াছেন। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'স্বামী-স্ত্রী,' 'তটিনীর বিচার,' 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'প্রলয়,' 'নার্সিং হোম,' 'জননী,' 'মাটির মায়া,' 'ঝড়ের রাতে' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের নাটকে খুব জটিল, চিত্তচাঞ্চল্যকর সমস্যার প্রাধান্য নাই। কোনো কোনো নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা থাকিলেও তাহাতে সমস্যার উগ্রতা শান্ত ও গৌণ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সংলাপ প্রখর এবং প্রাণবন্ত, এবং তাঁহার নাটক আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে।

॥ স্বামী-স্ত্রী ॥ 'স্বামী-স্ত্রী' রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কোনো দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া কেবলমাত্র অঙ্কের মধ্য দিয়া একখানা বড় নাটকের action সৃষ্টি করা কৃতিত্বের বিষয় সন্দেহ নাই। ললিত ও লিলির মধ্যে যে বিরোধ তাহা কোনো গূঢ় সমস্যাজাত নহে, বাপ মায়ের উপর আকর্ষণের জন্য স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিতে পারিতেছে না, ইহা খুব জোরালো সমস্যা নহে। নাট্যকার লিখিয়াছেন যে, পরিচালক দুর্গাদাসের দাবি অনুসারে তিনি শেষ অঙ্কটী রচনা করিয়াছেন। অবশ্য অভিনয়ের সময় সু-অভিনয় এবং দৃশ্যপটের সমবায়ে দৃশ্যটি জমে ভালো, কিন্তু নাটকের দিক দিয়া উহা মূল্যহীন।

॥ তটিনীর বিচার ॥ 'তটিনীর বিচার'ও রঙ্গালয়ে দর্শকদের মধ্যে অশেষ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। নাটকের ডাঃ ভোসের ভূমিকাটি অভিনব। এই ভূমিকায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

॥ মাটির মায়া ॥ 'মাটির মায়া'তে লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'মাটিও চাই, মেশিনও চাই। জাতি যদি মাটির মায়া একেবারে কাটিয়ে মেশিন নিয়ে মত্ত হয়, তা হ'লেও যেমন এ জাতির কল্যাণ হবে না—তেমন মেশিনের জন্যে খানিকটা মাটি যদি আজ ছেড়ে দিতে না পারে তা হ'লেও কল্যাণের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না।' নাটকের মধ্যে জীবন্ত পল্লী-প্রকৃতির সরস প্রাণবানতা উচ্ছল নৃত্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার রোমান্টিক সুর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে মাধব মোড়ল যন্ত্রের উপাসক অরবিন্দের সহকারী হইয়াছিল, শেষ মুহূর্তে মাটির জন্য তাহারই এরূপ মমত্বপূর্ণ ব্যাকুলতা সামঞ্জস্যহীন।

(৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি' প্রভৃতি উপন্যাসের তুলনা নাই। উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাটকও লিখিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের প্রতিভা নাটকে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। নাটকের জগৎ স্বতন্ত্র ইহার ধরন, রীতি, ভাষা ভিন্ন; শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক চেষ্টা করিলেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারেন না, তারাশঙ্করও পারেন নাই। উপন্যাসে তিনি জীবন্ত গ্রাম্য প্রকৃতিব পটভূমিকায় যে সরস, বাস্তব, প্রাণবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, নাটকে তাহার সুযোগ নাই। তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়, সংলাপে নয়, অথচ এই সংলাপই নাটকের প্রাণ। নাটকীয় গতি সঞ্চার করিতে তিনি অনেক সময়েই অকারণ দ্রুততা এবং অনাবশ্যক উত্তেজনাময় দৃশ্যের আমদানী কবিয়াছেন। নাটকের উৎকর্ষ যে আরও সূক্ষ্ম, আরও কৌশলপূর্ণ টেকনিকের উপর নির্ভর করে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

॥ দুই পুরুষ ॥ তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকখানি উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় উৎকর্ষ নাই ইহা সত্যের খাতিরে বলিতে হয়। পিতা ও পুত্রের মধ্যে মন ও মতের সংঘাত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। শিবনারায়ণের চরিত্র অপরিপূর্ণ ও অপরিস্ফুট। সুশোভন চরিত্রটি বিশেষ দরদের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, এবং দর্শকের সহানুভূতি ও আগ্রহ সর্বক্ষণ ইহার উপর নিবদ্ধ থাকে। নাটকের সংলাপ সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন।

॥ কালিন্দী ॥ 'কালিন্দী' নাটক ঐ নামীয় উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহদায়তন উপন্যাসের রস নাটকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেমানান

ও খাপছাড়া হইয়াছে। রামেশ্বর ইন্দ্ররায়ের ভগ্নীপতি, সে নিজের পুত্র ও স্ত্রীকে হত্যা করে। যেভাবে সে হত্যা করিয়াছে তাহাতে তাহাকে নৃশংস পাপী বলিয়াই মনে হয়। তাহার মুখে রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কবিতার প্রসন্ন আবৃত্তি শোভা পায় না। মহীনের গুলি করিয়া হত্যা করার ব্যাপারটা অত্যন্ত cheap হইয়াছে। নাট্যকার অহীনকে নাটকের মধ্যে বড়ো বেশি আদর্শায়িত করিয়া ফেলিয়াছেন।

॥ পথের ডাক ॥ 'পথের ডাকে' আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মহান আদর্শবাদ ও সুগভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত হইযাছে। ডাঃ চ্যাটার্জী আমাদের দেশের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির বাহক, নিখিলেশ বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে দীক্ষিত ব্রতধারী যুবক। রমা নিখিলেশের সহকর্মিণী এবং সুনন্দাও মনে মনে নিখিলেশের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবতী, অপরদিকে রায় বাহাদুর ও অতুল আধুনিক শিল্পযুগের লক্ষ্মীমন্ত, কর্মিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী মানব। নাটকের ক্রিযা সঞ্চার করিতে যাইয়া নাট্যকার শেষের দিকে কতকগুলি অকারণ ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। ডাঃ চ্যাটার্জী ও সুনন্দার মৃত্যু নাটকের ঘটনার দিক দিয়া অপরিহার্য নহে। নিখিলেশের প্রতি রমার আকর্ষণ বরাবর চাপাই রহিয়াছে। এবং সুনন্দার দুর্বলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

(৪) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ বন্ধু ॥ শরদিন্দু শক্তিমান সাহিত্যিক, তাঁহার নাটকেও এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকে কোনো ঘোরালো সমস্যা নাই, স্নিগ্ধ কৌতুক, এবং রোমাঞ্চরসপূর্ণ ঘটনায় তাঁহার নাটক প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'বন্ধু' নাটকখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিযাছে। ইহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নাই। ইহার দুই একটি চরিত্র একটু অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে। সে সম্বন্ধে লেখকের কৈফিয়ৎ উল্লেখযোগ্য—'আর্টের ক্ষেত্রে সত্যকে ধরিতে হইলে সম্ভবকে কতদূর অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহার সীমা এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষেত্রে চার্লস ডিকেন্স ও চার্লি চ্যাপলিন আমার নজির।' আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাঞ্জন, ফ্রয়েড-শিষ্য প্রেমকুমার, জুয়ার আড্ডার কেবলরাম এবং গজানন, ইহাদের প্রত্যেকের চরিত্র অশেষ কৌতুকময় ও চমকপ্রদ। প্রণয়ী-যুগল হেমন্ত ও অশনির সহিত প্রণয়িনীদ্বয় উর্মিলা এবং মন্দার

কৌতুকপূর্ণ ভুলভ্রান্তি এবং প্রণয়ের আদান-প্রদান উপভোগ্য ; অশনির প্রতি গুণ্ডার আক্রমণের অংশটুকু দুর্বল ও ইহার পরবর্তী ব্যাপার—উর্মিলার উদ্বেগ এবং সেবাও বৈচিত্র্যহীন ভাবতারল্যপূর্ণ।

॥ ডিটেকটিভ ॥ 'ডিটেকটিভ' নাটকখানির ঘটনার মধ্যেও নূতনত্ব আছে। তরুণ জমিদার অনন্ত চৌধুরীর ডিটেকটিভ হওয়ার ভারি সখ। পিতৃবন্ধু জগদীশের নিরুদ্দিষ্ট মহামায়ার সন্ধান করিতে সে কলিকাতায় আসে, এবং কেয়া ওরফে মহামায়ার সহিত পরিচিত এবং প্রেমে পড়ে। কেয়ার বন্ধু নলিনীকে সে মহামায়া বলিয়া ভুল করাতে সামান্য জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেয়া এবং অনন্তের রোমান্টিক প্রেমই কাহিনীর মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। নলিনীর প্রণয়ী তোৎলা সমরেশ বিশেষ সরস ও হাস্যকর চরিত্র।

(৫) অয়স্কান্ত বক্সী

॥ ভোলা মাষ্টার ॥ শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইলেও নাটক হিসাবে ইহার তেমন কোনো গুণ ও মূল্য নাই। ভোলা মাস্টার একজন গ্রাম্য স্কুলমাস্টার—আদর্শ শিক্ষক। তাঁহার একমাত্র আশা ছেলেকে হাকিম করিবেন, একদিন স্কুল ফণ্ডের আট হাজার টাকা তাঁহার হাতে পড়িল। সেই টাকা লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন, এবং পাঁচ হাজার টাকা পুত্রের শিক্ষার জন্য আত্মসাৎ করিলেন। গ্রামের লোক জানিল ভোলা মাস্টার আততায়ীর হস্তে হত হইয়াছেন। কালক্রমে তাঁহার পুত্র সমরেন্দ্র জিলা জজ হইল, একদিন স্কুলের উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করার জন্য তাহার নিমন্ত্রণ হইল। ভোলা মাস্টার ভিখারী মৃত্যুঞ্জয়ে ছদ্মবেশে পুত্রের গৌরব দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। স্ত্রীর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ছেলের কাছে ধরা দিলেন না। ভোলা মাস্টারকে খুব আদর্শ শিক্ষক বলা হইয়াছে, কিন্তু পুত্রকে হাকিম করার স্বপ্ন শিক্ষকের আদর্শের সহিত সঙ্গতিহীন। তাঁহার ছদ্মবেশের বেদনাও কোনো আদর্শজনিত নহে। সুতরাং এই আত্মত্যাগ তেমন কোনো মাহাত্ম্যপ্রকাশক নহে। হেড মাস্টারের বড় বড় বক্তৃতাও নাটকের মূল কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ও অনর্থক আদর্শবাদ। নাটকের সংলাপ দুর্বল ও বৈশিষ্ট্যহীন।

॥ ডক্টর মিস কুমুদ ॥ 'ডক্টর মিস কুমুদ' আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথম দিক দিয়া ঘটনার বৈচিত্র্যে নাটকখানি জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শেষে একঘেয়ে হইয়া

গিয়াছে। ঘটনাসংস্থাপনের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের অভাবেই একঘেয়েমি আসিয়াছে। সমীরণ এবং মিস কুমুদের কথাগুলি বেশ ঝলসানো এবং চমকপ্রদ। কাণাকড়ি গাঁটকাটার ছোট ভূমিকাটিও বিশেষ সরস ও কৌতুকাবহ। নাটকের সংলাপ witty এবং ধারালো।'

(৬) প্রমথনাথ বিশী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সর্বতোমুখী সাহিত্য-প্রতিভাব পূর্ণ অধিকার লইয়া বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। তিনি সংখ্যায় খুব বেশি নাটক লেখেন নাই, কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্য বাদ দিলে নাটকের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার সার্থকতম রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। হাস্যরসাত্মক রোমান্টিক কমেডি রচনা করিয়াই তিনি নাট্যক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি একটু তির্যক ও শ্লেষাত্মক দৃষ্টি লইয়াই জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার হাসিতে হয়তো একটু আধটু অসহিষ্ণু তীব্রতা, হয়তো বা ঝলকিত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁহার এমন এক মৌলিক চাতুর্য ও সুনিপুণ ক্ষমতার পবিচয় পাওয়া যায় যে, হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত প্রবল হাস্যকৌতুকের আঘাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের সব আঘাত ও জ্বালা যেন মুহূর্তের মধ্যেই অপসারিত হইয়া যায়। তাঁহার হাস্যবসের মূলে রহিয়াছে উদ্ভট ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার জটিলতা ও হঠাৎ-ব্যবহৃত বেখাপ্পা ও বিপর্যয়কর শব্দ ও বাক্যপ্রয়োগের কুশলতা।[১]

প্রমথনাথের নাটকের উপভোগ্যতার কারণ, ইহাতে হাস্যকৌতুকের উজ্জ্বলতার সহিত রোমান্টিক প্রণয়ের স্নিগ্ধতার অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। প্রণয়েব বহু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি তিনি শ্লেষের খোঁচাতে বিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও প্রণয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতি অন্তিম বিশ্বাস তিনি হারান নাই। প্রমথনাথ সমাজের অনেক বৃত্তি ও মতবাদ লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে বাঁধিয়া ফেলেন নাই। অর্থাৎ, তাঁহার দৃষ্টি তাত্ত্বিকের দৃষ্টি নহে, রসিকের দৃষ্টি।

॥ ঋণং কৃত্বা ॥ 'ঋণং কৃত্বা' নাটকের মধ্যে একটা ভারি কৌতুকময় ব্যাপারের সমাবেশ করা হইয়াছে। সনৎকুমার ঋণশোধের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, সে নিজে

১। বর্তমান লেখকের 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা' নামক গ্রন্থে প্রমথনাথের হাস্যরস সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

এবং তাহার ছাত্রগণ মহাজনদের ঠকাইবার নানা নীতি ও পন্থা শিখিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সরস, অভিনব ব্যাপারটি নাটকের মধ্যে অকস্মাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর পরবর্তী ঘটনাস্রোতের মধ্যে ইহার কোনো স্থান নাই। ইহা নাটকখানির একটি ত্রুটি। সনৎ-মঞ্জরী এবং ললিত-মণিকার প্রেমঘটিত কৌতুকময় জটিলতা ও তাহার সমাধানের মধ্যে মলিয়ের প্রভৃতি নাট্যকারদের অনেক নাটকের কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। মলিয়েরের মত যুগল চরিত্রের ক্রিয়া এবং কথার যুগপৎ সমাবেশের দ্বারা নাট্যকার বিচিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ডাক্তার উকিল প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ অমৃতলালের 'খাসদখল' প্রভৃতি নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়।

॥ ঘৃতং পিবেৎ ॥ সর্বেশ্বর সিংহ নগেন্দ্রনাথের সহায়তায় প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়াছে। ধনী এবং সংস্কৃতিবান বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সে নানারকম ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে, এবং কন্যা প্রমীরাকেও সেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে ত্রিদিবনারায়ণ তাঁহার আত্মীয় বিজয়নারায়ণের সহযোগে অনুরূপভাবে রাজা বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়াছে। নাটকের আর একটি রহস্যঘন উপকাহিনী আছে। নীরজা এবং মালবিকা, ইহারা স্বামী-স্ত্রী হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং নানা রহস্যমধুর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পুনরায় নিজেদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। নাটকের মধ্যে তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফলাগুলি ঝলসাইতে থাকিলেও ইহার পরিণাম রসাল কৌতুকের কোমল রসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কৃত্রিম বিষাদের বাষ্প দিয়া নাটকের সর্বব্যাপী সরস প্রসন্নতার দীপ্তি মাঝে মাঝে ঢাকিয়া আমাদের অমূলক উদ্বেগ লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। নাটকখানির মধ্যে মলিয়েরের 'The Cit Turned Gentleman' নাটকের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মলিয়েরের অনুরূপ প্রমথবাবুও নাটকের মধ্যে দুই ঘটনার সাদৃশ্য (Parallelism) এবং বৈপরীত্য (Contrast) দেখাইয়াছে। ডাক্তার, কমরেড প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ সুস্পষ্ট।

॥ মৌচাকে ঢিল ॥ 'মৌচাকে ঢিলে'র মধ্যে উদ্ভট (Grotesque) বিষয়ের অবতারণা খুব বেশী। এই নাটকেও তিনি নিজেকে ছাড়া আর সকলকে লইয়াই উপহাস করিয়াছেন। তবে অনেক সময়েই মনে হয় যে তাঁহার উপহাসের মধ্যে যেন অনিবার্যতা নাই। এই উপহাস আমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলে।

॥ পরিহাস বিজল্পিতম্ (দ্বি-স—১৩৫৩) ॥ আমাদের বর্তমান সমাজের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি প্রমথবাবুর বক্র ও শাণিত দৃষ্টিতে যেমন ধরা পড়িয়াছে

এমন আর কাহারও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। সেজন্য তাঁহার নাটকে হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মননের খরদীপ্তি অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আলোচ্য নাটকেও তিনি শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালী সমাজের কোনো শ্রেণীকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই। সেই বিদ্রূপে জ্বালা আছে, কিন্তু তাহাতে না হাসিয়াও পারা যায় না। কারণ লেখকের গোঁড়ামি নাই, আর নাই কোনো পক্ষপাতিত্ব। অবশ্য তর্ক-বিতর্ক. মত ও মন্তব্যের সংঘর্ষের অন্তরালে মিনি ও মিনির প্রণয়ীর সঙ্কোচ-ভীরু প্রণয়ের হাস্যমধুর দৃশ্য এক অনিবার্য আকর্ষণে আমাদের রসায়িত চিত্তকে কৌতূহলী করিয়া রাখে। নাটকটি শুধু অভিনেতব্য নহে, পঠিব্যও বটে। কারণ লেখক ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনা দিবার সময় এমন সব মন্তব্য করিয়াছেন যেগু'লি নাটকের অন্যতম রসসম্পদ।

॥ ভূতপূর্ব স্বামী ॥ প্রমথনাথের অন্যান্য নাটকের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ঘটনার আত্যন্তিক উদ্ভটত্ব, কৌতুকরসের ও প্রণয়রসের যুগপৎ অবতারণা, একাধিক প্রণয়িযুগলের সদৃশ ক্রিয়া ও আচরণের মধ্য দিয়া নাটকের সরস কৌতূহল উদ্দীপন প্রভৃতি এই নাটকেও রহিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের পরিবেশের মধ্যে একটু নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের ফলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আদর্শগত ও আচরণগত যে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা গিয়াছে তাহার আভাসই নাটকের কৌতুকরসাত্মক ঘটনাপ্রবাহের স্থানে স্থানে আমাদের প্রসন্ন চিত্তকে যেন চিন্তাকুল করিয়া তোলে। যুদ্ধপরবর্তী সমাজে নারীপুরুষের সম্বন্ধকে নব মূল্যায়নের যে চেষ্টা করা হইতেছে তাহার পরিচয় এই নাটকের অনেক কথোপকথনের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। চন্দ্রভানু ও পূর্ণিমার নিরুদ্বেগ জীবনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণিমার ভূতপূর্ব স্বামী পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হইল তাহা পুরুষোত্তম ও চন্দ্রভানুর ডুয়েল এবং পূর্ণিমার পুকুরে ঝাঁপ দিবার ঘটনায় চরম উত্তেজনাজনক পরিণতি লাভ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে প্যারাসুট সৈনিকের অতর্কিত আবির্ভাব ও মিস গুপ্তের প্রসঙ্গ অবতারণার ফলে নাটকে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। মিস্ গুপ্তের প্রতি পুরুষোত্তম ও চন্দ্রভানুর আকর্ষণের ফলে নাটকীয় ঘটনার আকস্মিক গতিপরিবর্তন ঘটিল এবং অবশেষে পুরুষোত্তমের সঙ্গে পূর্ণিমার মিলন এবং চন্দ্রভানু ও মিস্ গুপ্তের নিষ্ক্রান্তিক ফলে সব সঙ্কটের নিরসন ঘটিল।

(৭) মনোজ বসু

আধুনিক কথা-সাহিত্যকে যাঁহারা উত্তুঙ্গ গৌরবশিখরে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছেন মনোজ বসু সেই অগ্রণী কথাশিল্পীদের অন্যতম। বাংলার চরে বিলে প্রান্তরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যিনি গল্প ও উপন্যাসের জীবনরস সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন, পরিণত বয়সে তিনিই মাঝে মাঝে মঞ্চপ্রদীপের সম্মুখে আসিয়া নাট্য-ভারতীর বন্দনায় নিরত হইয়াছেন। কিন্তু শিল্পের শ্রেণী বদলাইলেও শিল্পী-মানস তো বদলাইতে পারে না। সেজন্য তাঁহার নাটকে আমরা তাঁহাকেই পাইয়াছি—সেই দরদী স্বপ্ন-বিলাসী, বিদ্রোহবহ্নিবাহী একই সাহিত্যিককে। বাংলার দক্ষিণী প্রত্যন্ত প্রদেশের খরসলিলা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মনোজবাবুর কল্প-মানস বিচরণ করিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল ভৈরবের বিচিত্র প্রকৃতির সহিত হাতীপোতা আর গলাকাটার চরের কত রহস্যজটিল ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে আজ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কালের ভ্রূকুটি কৌতুকে প্রকৃতির দৃশ্যপট অতি দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, প্লাবনের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে পুরাতন জীবন তলাইয়া যাইতেছে আর নূতন জীবন ভাসিয়া উঠিতেছে। লেখক যুগসন্ধিক্ষণে ভাঙ্গাগড়ার এই বিচিত্র অভিনয় করুণ অথচ আশাবাদী দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন জীবনের প্রতি একটু দুর্বল মমতা থাকিলেও নবজীবনের প্রাণময় বৈতালিকই তাঁহার কণ্ঠে প্রধানত ধ্বনিত হইয়াছে। সেই জীবন এখনও হয়তো আসে নাই, কিন্তু তাহা সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে জায়মান, তাহার অরুণ-লিখন আকাশের পূর্ব প্রান্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নসন্ধানী লেখকের আদর্শ দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ—তাঁহার রোমাঞ্চিত বক্ষ ভেদ করিয়া উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ উদ্গত হইয়া আসিতেছে। যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন মুক্তি-পাগল দেশের হৃদয়কে তীব্রভাবে বিচলিত করিয়াছে লেখক তাহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখিয়াছেন। মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকদের আত্মত্যাগ যেমন তাঁহার লেখনীর মুখে অনন্য গৌরব লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার বিশ্বাসঘাতক, সমাজদ্রোহী স্বার্থপরের চরিত্র তাঁহার কাছে পাইয়াছে অতি সুকঠিন আঘাত। কিন্তু ক্বচিৎ শ্লেষ ও বিদ্রূপের শাসন থাকিলেও স্নেহ ও করুণার আসন কখনো তাঁহার টলে নাই। নীলাম্বর ও হিরণ্ময়ের মত চরিত্র সমাজের অবজ্ঞা কুড়াইলেও লেখকের সহৃদয় সহানুভূতিতে তাহারা অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের মূল্যবোধ ও ন্যায়ের ধারণা যে কত অসার ও মিথ্যা লেখক তাহা বহুস্থলেই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

নাটকের মধ্যে মনোজবাবুর যে জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা উপরে আলোচিত হইল। তাঁহার নাটক নাটকত্বের ঊর্ধ্বে একটি বিশেষ জীবনবাণী বহন করিতেছে। সুতরাং সেই নাটক আলোচনায় শিল্প অপেক্ষা বাণীর প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য নাট্য-রচনায় তিনি আধুনিক নাট্যশিল্পের সক্ষম অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা কমাইয়া একই সেটে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে সুকৌশলে আনিয়া তিনি নাটকের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মঞ্চ-নির্দেশ দিয়া স্রষ্টার সীমানা হইতে বহুদূর আগাইয়া যাইয়া প্রয়োগকর্তার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। তবে নাট্য-জগতে প্রবেশ করিলেও তাঁহার স্থান যে যবনিকার অন্তরালে ইহা তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নাটকে নাট্যকারের বস্তুনিষ্ঠার স্থলে কথাকারের আত্মবিলাস বহু জায়গাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

॥ প্লাবন (১৩৪৮) ॥ মনোজবাবুর প্রথম নাটক। এক প্লাবনে নাটকের সূচনা এবং আর এক প্লাবনে ইহার সমাপ্তি। প্লাবন যে খেত-খামার ডুবাইয়া ঘর-বাড়ি ভাসাইয়া দেয় তাহা নহে, ইহা মানুষের স্বচ্ছন্দ গৃহজীবন ছিন্ন করিয়া আনিয়া নূতন অজানা দ্বীপে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই ভাবেই নিশারাণীর জীবন স্বামীর কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শেখরের জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া গেল। নিশারাণী পুনরায় স্বামীকে পাইল, কিন্তু তখন তাহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া আসিয়াছে। নূতন জীবন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রকৃতির এই অমোঘ, অনিবার্য নিয়ম মানিয়া লইয়াই তাহারা প্রলয়পয়োধি জলে নিজেদের নিমজ্জিত করিয়া দিল। কিন্তু একটি খটকা থাকিয়া যায়। যে শেখরের প্রতি সে দুর্বলতা বোধ করিয়াছে[১], পনেরো বৎসর ধরিয়া যাহার স্মৃতি সে হৃদয়ে বহন করিয়া তাহার কন্যাকে নিজের কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছে স্বামীকে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া সে কি তাহাকে একেবারেই হৃদয় হইতে নিঃশেষে নির্মূল করিতে পারিল? সামান্য কোনো দ্বন্দ্ব, ক্ষণিকের কোনো দুর্বলতা কি তাহার চিত্তকে বিচলিত করিল না? শেখরের আশ্রয়ে আসিবার পর সে দীর্ঘকাল তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইয়াছে সেই সত্য কি তাহার হঠাৎ-দেখা স্বামীর প্রভাবে একেবারেই গুঁড়াইয়া গেল? নাটকের মধ্যে শেখরের দুর্বার, সুকরুণ প্রেমাবেগ বোধ হয় পাঠক ও দর্শকের মনে সর্বাপেক্ষা বেশি করুণা ও চাঞ্চল্য

১। নিশারাণী। আমার মন দুর্বল। আর বলবেন না—বলবেন না আমায়। পৃঃ ১৩

উদ্রেক করে। এই উদার, মহাপ্রাণ যুবক প্রেমের পাষাণ-বেদীতে মাথা ঠুকিতে যাইয়া নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইল—এই দুঃখময় স্মৃতি কখনো ভুলিবার নহে। কমলেশ ও নীলাম্বরের সহিত নিশারাণীর যে সংঘাত বাধিয়াছে তাহার কারণ খুব স্পষ্ট ও জোরালো নহে। তাহারা দুইজন দুঃখী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে কিন্তু নিশারাণীও তো অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক জমিদার নহে। সে সম্বলহীন, সহায়হীন নারী মাত্র; তাহাকে ভয় দেখাইয়া কৌশলে চার হাজার টাকা হস্তগত করা কমলেশের পক্ষে এমন কি পৌরুষের কার্য হইয়াছে? নিশারাণীর অসহায়তার সুযোগ লইয়া সদ্যপ্রাপ্ত অধিকারের ফলে তাহারই বাড়ি হইতে তাহাকে তাড়াইবার আয়োজনের মধ্যেই বা ন্যায়ধর্মের পরিচয় কোথায়? সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক হইতেছে সবিতার আচরণ। নীলাম্বরের প্রতি আকস্মিক সহানুভূতির ফলে সে মাতার এত দীর্ঘকালের স্নেহঋণ মুহূর্তের মধ্যেই বিসর্জন দিয়া তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইল? ইহা এক হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞতার চরম দৃষ্টান্ত। নাট্যকারের লক্ষ্য ও সহানুভূতি নিশ্চয়ই কমলেশ এবং নীলাম্বরের উপর, কিন্তু আসলে নিশারাণীই প্রকৃত অনুকম্পা ও সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে চমকপ্রদ দ্রুত গতিবেগ সঞ্চার করা হইয়াছে, সেজন্য রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

॥ নূতন প্রভাত (১৩৫০)॥ নূতন প্রভাতের আলোকচ্ছটা কবে পূর্ব দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ভাগ্যহত সর্বহারা মানুষ সেদিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পূর্বে দুঃখনিশার দুর্গম পথে তাহাকে চলিতে হয়। সেই পথের বাঁকে বাঁকে রহিয়াছে 'কণ্টকের অভ্যর্থনা' ও 'গুপ্তসর্পের গূঢ় ফণা', 'পণ্ডিতের মূঢ়তা, ধনীর দৈন্যের অত্যাচার আর সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপ'। সেই ক্লেশাকীর্ণ পথের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে দরদী লেখকের করুণাসিক্ত লেখনীর মুখে। যুগ যুগ ধরিয়া মহেশ্বরের বজ্রমুষ্টি কান্তরাম ও রহিমের ক্ষীণ, বুভুক্ষু উদরগুলিকে পিষিয়া ধরিয়াছে, পুরুষানুক্রমে রায়সাহেবের দল চিত্তের বিনিময়ে বিত্তের পাহাড় করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু একদিন আসে যেদিন তাহাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। সেদিন তাহাদের পুত্রকন্যা পর্যন্তও তাহাদের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়, ইহাই অলঙ্ঘ্য নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক নিয়ম। পুরাতনতন্ত্র তাহার উদ্ধত শির লইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে আর এক নবতন্ত্র তাহার স্বপ্নমণ্ডিত চূড়া ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। ইহার জন্য শশাঙ্কের ন্যায় কত নির্ভীক তরুণ প্রাণের নিবেদন প্রয়োজন হয় কে তাহার হিসাব রাখিবে?

নাট্যকার তাঁহার শ্লেষশাণিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন সমাজের বিভিন্ন আনাচে কানাচে—হলধরের ন্যায় পদলেহী পিশাচ আর আমিনুলের ন্যায় বিভেদ-কারী সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক—কেহই তাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। গোর্কির 'মা' চরিত্রের প্রভাবে এই নাটকের মা অঙ্কিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু এই রকম মা যেদিন দেশের ঘরে ঘরে আবির্ভূতা হন সেদিন আর তাহার মুক্তির বিলম্ব থাকে না।

॥ বিপর্যয় (১৩৫৫) ॥ সংসারে আমরা ভুল করি, ভুল বুঝি, সেই ভুলের নেশায় দিশাহারা হইয়া আমরা যে শুধু পরের অপকার করি তাহাই নহে, আমরা নিজেদের জীবনেও চরম ক্ষতি টানিয়া আনি। তারপর একদিন ভুল ধরা পড়ে, তখন অপচিত জীবনের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা যে বহু দূরে, নাগালের বাহিরে। সমাজজীবনে এই ট্র্যাজেডি বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলোচ্য নাটকেও এই ট্র্যাজেডির একটি করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নলিনী তাহার স্বামী হিরণ্ময়ের মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যে বিচ্ছেদ সামান্য বোঝাপড়ায় মিটিয়া যাইত তাহাই তাহাদের জীবনে চিরন্তন হইয়া রহিল। হিরণ্ময় নলিনীকে ছাড়া জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসে নাই, নলিনীও কপালের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিলেও পাতিব্রত্যের অক্ষয় সিঁদুরে তাহার হৃদয় চিরদিন রাঙাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তবুও তো তাহারা পরস্পরকে আর পাইল না, তাহাদের ভুলের জাল বাহিরের চক্রান্তে আরো জটিল হইয়া তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিল, উদ্ধারের আর কোনোই উপায় রহিল না। এক নৌকায় তাহারা জীবন ভাসাইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ একটি নিষ্ঠুর ঝড় আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরবর্তী দুইটি দ্বীপে ফেলিয়া দিল। চতুর্দিকে অথৈ জল, মিলিবার আর কোনো উপায় নাই। লেখক যদি পরিশেষে তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দিতেন তাহা হইলে উহা রঙ্গমঞ্চের দিক দিয়া জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্তু তিনি কখনো জীবনের সমস্যাটিকে এভাবে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন না। হিরণ্ময় ও নলিনীর জীবনের মাঝে আর একটি শুভ্র জীবন সুন্দর এক পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া ঝরিয়া গেল। ইহা আরো করুণ, আরো দুঃখময়। নলিনী তো হিরণ্ময়ের ভালোবাসা ষোল আনাই পাইয়াছিল, বিধাতা তাহার মাতৃহৃদয়ের অভাবও পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মলয়া কি পাইল? গৌরীর তপস্যা অবশেষে সফল হইয়াছিল, কিন্তু মলয়ার তপস্যা তো শেষ পর্যন্ত তপস্যাই রহিয়া গেল। নিজের জীবনটিকে প্রদীপের

নলিতার ন্যায় জ্বালাইয়া রাখিয়া সে তাহার প্রাণের দেবতার নীরব আরতি করিয়াছে। কিন্তু যেদিন সে আবিষ্কার করিল দেবতা সত্যই পাষাণ, তাহার হৃদয়ে এতটুকু দাগ পড়ে নাই, সেদিন তাহার জীবনের দীপ্তিও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অন্যায় বিচার ও হৃদয়হীন শাস্তি লইয়া যে সমাজের বেসাতি সেই সমাজের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। সমাজ অভিশাপের টিকা আঁকিয়া দেয় হিরণ্ময় ও নলিনীর জীবনে, কিন্তু অরুণকিশোরের ন্যায় ভণ্ড চরিত্রহীনের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। ধনীপদলেহী স্তাবক সমাজের ইহাই এক বাস্তব রূপ। নাটকের ঘটনাবিন্যাসের কৌশল প্রশংসনীয়। একই দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের পর পর আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটাইয়া নাট্যকার নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছেন ও আমাদের নাট্যকৌতূহল উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছেন। নাটকের সংলাপ বুদ্ধি-মার্জিত ও ব্যঞ্জনাময় এবং অনেক স্থলেই গূঢ় সাঙ্কেতিকতায় রহস্যময়। নাটকের ঘটনার অন্তরালে যে রহস্য-যবনিকা আছে দর্শকদের কাছে তাহা প্রকাশিত নয় বলিয়া অনেক সময় সাঙ্কেতিকতাপূর্ণ আলাপ ও মন্তব্য তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। অরুণকিশোরের চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের গোড়া হইতে ধারণা থাকে না বলিয়া হিরণ্ময়ের ব্যঙ্গোক্তি এবং তাহার আচরিত ভণ্ডামির রস গ্রহণ করিবার পথে ব্যাঘাত ঘটে।

॥ রাখিবন্ধন (১৩৫৬)॥ 'রাখিবন্ধন' হৃদয়দ্বন্দ্বজটিল নাটক নয়, ইহা আমাদের দেশের রাজনৈতিক চক্র-পরিক্রমার আংশিক ইতিহাস। ইহার দুইটি অঙ্কে বাংলায় মুক্তি-সংগ্রাম ও তাহার পরিণতির দুইটি অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে যে সব তরুণ যুবক মুক্তির স্বপ্নে মাতাল হইয়া 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাহিয়া গেল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহারাই পরিণত বয়সে স্বাধীন রাষ্ট্রক্ষেত্রে খণ্ডিত বাংলার অভিশপ্ত আশ্রয়প্রার্থীরূপে সকলের অবজ্ঞা ও করুণা কুড়াইবার জন্য বাঁচিয়া রহিল। জাতির স্বপ্ন ও সাধনার কি শোচনীয় পরিণতি! স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি বটে কিন্তু ইহার জন্য যে মূল্য আমরা দিয়াছি তাহা প্রতিনিয়ত আমাদের এই বিকলাঙ্গ স্বাধীনসত্তাকে কঠোর পরিহাসে জর্জরিত করিতেছে। লেখক এই তথাকথিত স্বাধীন জাতির লজ্জাকর মর্মবেদনা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, সেই অনুভূতির রূপ দিতে যাইয়া তিনি অনেক সময় তাঁহার উচ্ছ্বাস-প্রবাহে আর্টের প্রয়োজন ভাসাইয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলেই নাট্যরস রাজনীতির বালুচরে হারাইয়া গিয়াছে। তিনি অদম্য আশাবাদী সেজন্য খণ্ডিত বাংলার মধ্যে রক্তরাঙা রাখিবন্ধনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যদিও এ স্বপ্ন বোধ হয় চিরদিন স্বপ্নই

থাকিয়া যাইবে। নাটকের মধ্যে রাজনীতির সমষ্টিগত বহির্মুখী রূপই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম অন্তরসংঘাত ইহাতে তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে আমাদের রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিশেষ বিশেষ চরিত্র কি রকম বিচিত্র মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছে নাট্যকার পর্যবেক্ষণশীল লেখনীর মুখে তাহার সার্থক রূপ দান করিয়াছেন।

॥ শেষলগ্ন (১৯৫৬) ॥ মনোজবাবু 'নূতন প্রভাত', 'রাখিবন্ধন' প্রভৃতি নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বাস্তব চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সব নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে গৃহীত হয় নাই। সেজন্য তিনি সাম্প্রতিক কালে যে-সব নাটক লিখিতেছেন তাহাদের মধ্যে সমাজসমস্যার কোনো বিক্ষুব্ধ রূপ এবং সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো বিতর্কিত মতবাদের অবতারণা পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। পরিহাসোজ্জ্বল, প্রণয়মধুর রোমান্টিক কমেডি রচনাতেই তিনি এখন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আলোচ্য নাটকখানি রঙমহলের দর্শকদের কাছে অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিল। গল্প ও উপন্যাসে মনোজবাবু পল্লীজীবনের চিত্র দরদী দৃষ্টির সঙ্গে অঙ্কন করিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাটকেও এই পল্লীপরিবেশের প্রাধান্য দেখিয়াছি। আলোচ্য নাটকেও পল্লীজীবনের রূপই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীর পথঘাট, নদী ও বনের চিত্র যেমন ইহাতে ফুটিয়াছে, তেমনি পল্লীর মানুষের করুণ সমস্যা ও বেদনা, তাহাদের নীচতা, ষড়যন্ত্র এবং অসঙ্গতিপূর্ণ, কৌতুকময় দিকগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। নাট্যকার বলিয়াছেন, নাটকখানি প্রথমে বিয়োগান্ত ছিল তারপর পরিচালকের অনুরোধে ইহাকে মিলনান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, গৌরীর বিবাহ—এই একটি মাত্র ঘটনাকেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র নাটকের মধ্যে যেরূপ নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই বিবাহের আয়োজন ও প্রস্তুতিতে যে সঙ্কট ও বেদনার আবর্ত রচনা করা হইয়াছে তাহাতে এই নাটকের পরিণতি মিলনান্ত হওয়াই স্বাভাবিক ও নাট্যশিল্পসম্মত হইয়াছে।

(৮) যোগেশ চৌধুরী

স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর নাটকে আধুনিক ভাব ও লক্ষণ পরিস্ফুট নহে। বর্তমান কালের নাটকে যেমন জটিল মনস্তত্ত্বের সংঘাত, নূতন সমস্যা ও ভাবের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার নাটকে সেগুলি তেমন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর জমিদারপ্রধান সমাজ লইয়া তাঁহার নাটক রচিত। পুরাতন

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আদর্শের প্রতি নাট্যকারের মোহ এবং আনুগত্যও খুব স্পষ্ট। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ন্যায় তাঁহার নাটকেও দৃশ্যের সমাবেশ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রকে আদর্শ করিয়াই যে তিনি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝা যায়।

'পরিণীতা'র মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রীপতি এবং তাঁহার প্রতিবেশী বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী রমানাথের ভিতব শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিবার উপক্রম হইলেও এই দুই প্রবল শক্তির সংঘর্ষ সারদেশ্বরী দ্বারা কুৎসা প্রচারের চেষ্টায় হঠাৎ উবিয়া গেল। কোথাও নাটকের দ্বন্দ্ব তীব্র ও আবেগবান হয় নাই। শ্রীপতি একজন imbecile জমিদার, কোনো জায়গাতেই তাঁহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। ললিতার বংশের কলঙ্কের জন্য যে ঈর্ষা ও সন্দেহের ধূম সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল তাহাব দূরীকরণও হইয়া গেল বিনা কারণে। রমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন একমাত্র প্রাণবান চরিত্র। নাটকের সংলাপ দুর্বল ও নিরাবেগ।

সত্য অথবা মিথ্যা খুনখারাপিজনিত জটিলতা যাহা আমাদের অধিকাংশ সামাজিক নাটকে পরিস্ফুট তাহা 'পতিব্রতা' নাটকেও বিদ্যমান। রণেনের জন্মরহস্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, অথচ তাহা লইয়া কোনো সমস্যার সৃষ্টি করা হয় নাই। কালীনাথ চরিত্রটি জীবন্ত।

(৯) জলধর চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ক.. খানা নাটক রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের অসামান্য প্রশংসা ও সমাদর অর্জন করিলেও তাঁহার নাটকের মধ্যে কোনো লক্ষণীয় উৎকর্ষ নাই। দুই একটি অভিনব ভূমিকার জন্যই সাধারণত তাঁহার নাটক জনপ্রিয় হইয়াছে। তাঁহার নাটক প্রাচীন ধারার অনুসারী, কোনো সংস্কারমূলক চিন্তা অথবা বিপ্লবী মতবাদ তাঁহার মধ্যে নাই। বর্তমান সমাজ সমস্যার কোনো আলোচনাও তিনি করেন নাই। সূক্ষ্ম কলাকৌশল, অথবা আধুনিক নাটকের সুসংহত টেকনিকও তাঁহার নাটকে দেখা যায় না।

॥ রীতিমত নাটক ॥ 'রীতিমত নাটক' রঙ্গালয়ে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। শান্তা ও সান্ত্বনা—এই দুই পত্নী লইয়া বসন্তের যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সেই সমস্যা-বিব্রত নাট্যকার স্থূল রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেইজন্য সান্ত্বনাকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করা হইয়াছে। অথচ তাহার পূর্বে এমন উত্তেজনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব

হয় নাই যাহাতে এই রিভলবারের গুলি অবশ্যম্ভাবী মনে হইতে পারে। খুন করিয়া পলায়ন, পরিশেষে পুনরাগমন এবং মিলন—ইহা বাংলা নাটকের সনাতন ব্যাপার, ইহাতে নূতনত্ব নাই। নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশ প্রফেসার দিগম্বর মজুমদারের অসংলগ্ন অথচ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তিসমূহ। নাট্যচার্য শিশিরকুমারের চিত্তচমৎকারী অভিনয় এবং আবৃত্তি এই ভূমিকাকে অমর করিয়া দিয়াছে। Fountain Pen এবং Hypodermic Syringe দ্বয়কে লইয়া তাঁহার সরস ব্যঙ্গ-পরিহাস দর্শকের হৃদয় আমোদিত করিয়া রাখে।

॥ পি-W-ডি ॥ অতি সাধারণ স্তরের নাটক অভিনয় দক্ষতায় কি রকম অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে 'পি-W-ডি' নাটক তাহার উদাহরণ। ইহাতে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনা সংস্থাপন অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একান্ত অভাব। অসংলগ্ন ক্রিয়ার ফলে চরিত্রগুলির বিশেষত্ব স্পষ্ট রেখাপাত করে না। সৌমেন এবং সনৎ সম্বন্ধে নাট্যকারের ধারণা অস্ফুট এবং অস্পষ্ট। অভিনয়েব সময় সেন সাহেবের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্র এবং রঙ্গজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দুর্গাদাস এই ভূমিকাকে চিবস্মবণীয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও একথা বলিতে হয় যে নাটকে এই ভূমিকা অকাবণ এবং অপ্রয়োজনীয়। রিভলবারের মুখে সৌমেনের মুখ দিয়া শ্যামলীর নির্দোষিতা আদায় করিবার ব্যাপাব অতি-নাটকীয় এবং হাস্যকব। স্ত্রী চরিত্রগুলির পক্ষে অতিমাত্রায় প্রণয়নিষ্ঠা এবং আত্মসমর্পণের ভাব হীনতামূলক ও বিরক্তিকব।

(১০) বনফুল

সৃষ্টির বহুমুখী বৈচিত্র্যে বনফুলের সঙ্গে তুলনা চলে এমন লেখকের সংখ্যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নাই। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক—সাহিত্যের সব বিভাগেই তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্বের পবিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি—তাঁহার ছোটগল্পগুলি পাঠক সমাজে সর্বপেক্ষা বেশি সমাদৃত। তাঁহার উপন্যাসগুলিও বহুপঠিত ও উচ্চ-প্রশংসিত। কিন্তু তাঁহার কবিতা ও নাটক যথাযোগ্য সম্মান এখনও লাভ করে নাই। বনফুলের প্রতিভা লঘু ও গুরু উভয় প্রকার রসেই সমান প্রবণতা ও পটুতা দেখাইয়াছে। তাঁহার মৃদু শ্লেষ ও স্নিগ্ধ পরিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় ছোটগল্প ও রোমান্টিক সামাজিক নাটকগুলিতে এবং কোনো কোনো একাঙ্ক নাটকে; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে

কবিতার মধ্যে ; এবং গম্ভীর ট্র্যাজিক রসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে উপন্যাস, জীবনী-নাটক ও কয়েকটি একাঙ্ক নাটকে।

বনফুলের নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাঁহার জীবনী-নাটক দুইখানি। 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' এই নাটক দুইখানি আধুনিক জীবনী-নাটকের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, আধুনিক সমাজের কীর্তিমান মহাপুরুষের চরিত্র অবলম্বনে কিরূপ সার্থক নাটক লেখা যায় তাহা বনফুল দেখাইয়াছেন। চরিত্রের বাস্তব জীবন-কাহিনী বিকৃত না করিয়া তাঁহার মানস প্রবৃত্তি, কথা ও আচরণের মধ্য হইতে কি ভাবে নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতি ও সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া নাট্যরস জমাইয়া তোলা যায় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা এই জীবনী-নাটক দুইখানিতে পাইয়াছি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর এই দুইজন অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ সাহিত্য ও সমাজের চিরস্থায়ী কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন নানা দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং সুগভীর বেদনা ও হতাশায় পরিপূর্ণ ছিল। অমৃতের ভাণ্ড তাঁহারা দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু নিজেরা শুধু তীব্র হলাহলের জ্বালাই ভোগ করিয়া গিয়াছেন। মহৎ জীবনের ট্র্যাজেডি হয়তো অনিবার্য। এই অনিবার্য জীবন-ট্র্যাজেডিই বনফুলের নাটকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'মন্ত্রমুগ্ধ', 'মধ্যবিত্ত', 'বন্ধনমোচন', 'কঞ্চি' প্রভৃতি নাটকগুলিকে হাস্যপরিহাসোজ্জ্বল রোমান্টিক কমেডি বলা যায়। নাটকগুলির মধ্যে ঘটনার কৌতুকজনক জটিলতা অতি নিপুণভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অনেক স্থানে ঘটনা একটু উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাট্যকার ঘটনার সুষ্ঠ পরিণতি দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সামাজিক সমস্যার গুরুত্ব কোথাও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে নাই।

'কঞ্চি' নাটকখানির কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। নাটকখানির মধ্যে আধুনিক সমাজের একটি বাস্তব সমস্যারই অবতারণা করা হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী সমাজে অসবর্ণ বিবাহ যে সম্পূর্ণ সুস্থ, সঙ্গত ও অনিবার্য ঘটনা নাট্যকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। আজ যুগসন্ধিক্ষণে প্রাচীন রক্ষণশীল শক্তির সঙ্গে পরিবর্তনকারী নবীন শক্তির দ্বন্দ্ব চলিয়াছে এবং এই দ্বন্দ্বে প্রাচীন শক্তির পরাজয়ই যে অবশ্যম্ভাবী নাট্যকার তাহাও দেখাইয়াছেন। 'কঞ্চি' নামটির মধ্যেও বোধ হয় একটু তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। সুলতা আধুনিক কালের শিক্ষিতা, সংস্কারমুক্তা নারীরই প্রতিনিধি। সে কঞ্চির

মতই ঋজু ও উদ্ধত। প্রাচীন বংশদণ্ড নত হয় কিন্তু কঞ্চি কখনও নত হয় না। নাট্যকার নামের মধ্য দিয়া বোধ হয় সেই ইঙ্গিতই করিতে চাহিয়াছেন। নাট্যকারের মত যে সম্পূর্ণ নবীন ও বিপ্লবী শক্তির প্রতি অনুকূল তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় গোবর্ধন ও পুরন্দর চরিত্র রূপায়ণে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি পিতৃচরিত্র অতি মাত্রায় নিষ্ঠুর ও নৃশংসরূপেই চিত্রিত হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী কন্যাকে তালাবদ্ধ ঘরে আটক করিয়া রাখা এবং কুৎসিত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া নিজের ছেলেকে চোর প্রতিপন্ন করিয়া জেলে পাঠাবার চেষ্টা, এই দুইটি ঘটনাই আত্যন্তিক হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। কোনো পিতা নিজের সন্তান সম্বন্ধে এরূপ হীন ও নির্মম আচরণ করিতে পারেন কি না সে সন্দেহও আমাদের মনে জাগে। নাটকের সমস্যা ও সংঘাত লইয়া বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডি রচনা করা যাইত। কিন্তু নাট্যকার শেষ পর্যন্ত সামলাইয়া লইয়াছেন। নাটকের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রীতিকর পারণতির মধ্য দিয়া তিনি বিরোধক্ষুব্ধ কুজ্ঝটিকাজাল দূর করিয়া দিয়াছেন। গোবর্ধন কি ভাবে পরাজয়কে গ্রহণ করিলেন তাহা অবশ্য আমরা জানিতে পারিলাম না, কিন্তু পুরন্দর উদার খোলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়া এই পরাজয় বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার কথাতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—'হেরে গেলাম কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না (সহসা সোল্লাসে) বাই জোভ, আই অ্যাম গ্ল্যাড।'

॥ শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯)॥ জীবন ও নাটক একরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহারা এক নহে। জীবন বিধাতার অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল আর নাটক শিল্পীর সজ্ঞান সৃষ্টি। জীবন মাঝে মাঝে নাটকীয় হইলেও পুরাপুরি নাটক হয় না। তেমনি নাটক জীবনকে অবলম্বন করিলেও জীবনকে ছাড়াইয়া যাওয়াই তাহার লক্ষ্য। এক কথায় বলা চলে, নাটক জীবনের অনুকৃতি নহে, প্রতিকৃতি। জীবন-নাট্য রচনায় নাট্যকারের শিল্পমুক্তি প্রতি পদে জীবনের সীমার দ্বারা ব্যাহত, সেই সীমা লঙ্ঘন করা সহজ নহে, কারণ তাহা হইলে সত্যের অপলাপ ঘটে। সেজন্য জীবন-নাট্যে সাধারণত জীবনই আমরা দেখি, কিন্তু নাট্য দেখি না। লেখক বলিয়াছেন, 'ইহা ইতিহাস অথবা জীবন-চরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক।' কিন্তু কাল্পনিক হইলেও মধুসূদন ও অন্যান্য চরিত্রগুলির কথোপকথনে অনেক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ উক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং দৃশ্যগুলিও বাস্তব জীবন হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছে। বস্তুত নাট্যকার মধুসূদনের জীবন-চরিতের প্রতি এতখানি সত্যনিষ্ঠ যে, কোনো

স্থলেই তিনি অসত্য ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেন নাই। অবশ্য এত নিকটবর্তী অতীতের জীবনকাহিনীতে শিল্পের অনুরোধেও সত্যের অপলাপ অথবা বিকৃতি কখনই পাঠক ও দর্শক বরদাস্ত করিতে পারেন না। কিন্তু জীবন-কাহিনীর প্রকৃত ঘটনাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত নিষ্ঠার ফলেই আলোচ্য নাটকখানি বিচ্ছিন্ন ঘটনার গ্রন্থন হইয়াছে, অবিচ্ছিন্ন রসচেতনার সুষ্ঠু শিল্পায়ন হইতে পারে নাই। জীবন-নাট্য রচনার একটা প্রধান অন্তরায় এই যে—দীর্ঘ-বিস্তৃত জীবনের রূপায়ণে সময় ও স্থানের কোনো শিল্পসম্মত ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আলোচ্য নাটকেও মধুসূদনের মাদ্রাজ ও ইউরোপ প্রবাসের দৃশ্যও বিক্ষিপ্ত ও মূল-বিচ্ছিন্ন মনে হয়। নাটকের মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু দৃশ্যগুলি অদূরবিস্তৃত ও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত না থাকিলে আমাদের রস-সম্ভোগে ব্যাঘাত ঘটে। সময়ের ব্যবধান এরূপভাবে দেখান দরকার যে একটি সময়ের ভাব ও সংঘাত অনিবার্যভাবে যেন পরবর্তী সময়ের মধ্যে পরিণত রূপ লাভ করে।

কাল্পনিক অথবা কল্পনাশ্রিত নাট্যকাহিনীর মধ্যে নাট্যকার একটা মূলভাবের পরিকল্পনা করিয়া অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্র-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তাহার শিল্পরূপ দান করেন। কিন্তু সত্য জীবনকাহিনীর মধ্যে এরূপ কোনো মূলভাবের রূপায়ণ সহজ নহে, কারণ জীবনের ঘটনাগুলি অনেকটা এলোমেলো ছন্দহীনভাবে ঘটিয়া থাকে। তবে 'শ্রীমধুসূদন'-নাটকে একটি মূলভাব যে আবিষ্কার করা যায় না তাহা নহে। মধুসূদনের জীবন একটা ট্র্যাজেডি এবং যথার্থই মর্মবিদারী ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সর্বতোভাবে সার্থক। কীর্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান রাবণ যেমন অদৃশ্য দৈবের নিষ্ঠুর তাড়নায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছেন মধুসূদনও তেমনি বোধ হয় এক অলক্ষ্য বিধাতার নির্মম খেয়ালে মানুষের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ লাভ করিয়াও সর্বহারা, পরিণামে আত্ম-বিসর্জন করিলেন। বোধ হয় তাঁহারও শূন্য বক্ষ ভেদ করিয়া ক্লেশার্ত অনুযোগ উৎসারিত হইয়াছে।

কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

কিন্তু দৈবপীড়ন সত্ত্বেও রাবণের দুঃখময় পরিণতি তো তাঁহারই অন্যায় ও অপরিণামদর্শিতার জন্য ঘটিয়াছিল। মধুসূদনের পরিণতিও যতই ক্লেশকর হউক তাহার মূলেও কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধান। অসংযম, অমিতাচার, সমাজ ও ধর্মদ্রোহিতা প্রভৃতি স্বকৃত ভ্রান্তি ও অন্যায়ের জন্যই তো তাঁহাকে এরূপ শোচনীয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হইল। এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার উন্নতি ও পতনের একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায়, এবং তাহা হইল তাঁহার অদম্য উচ্চাশা। ম্যাকবেথের কথায়—

'Vaulting ambition which o'er leaps itself
And falls on the other'—

যাঁহাদের আশা অনন্ত, দৃষ্টি যাঁহাদের সুদূর দিগন্তনীলিমায় নিবদ্ধ তাঁহারা পারিপার্শ্বিক জগতের নিয়ম ও প্রয়োজন লঙ্ঘন করিয়া চলেন। ছোট সুখ ও ছোট আশার মধ্যে তাঁহারা ধরা দেন না বলিয়া তাঁহাদের জীবন অশান্ত ও আলোড়িত। তাঁহারা অগ্নি-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্ধ্বে অনন্তপথে ধাবিত হইতে হইতে হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া যান। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে অলব্ধ, কিন্তু নীল আকাশের বুকে তাঁহারা অম্লান আলোর লেখা রাখিয়া যান। ম্যাথ্যু আর্নল্ড শেলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়ে—'Ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain'. কবি শেলির সহিত কবি মধুসূদনের জীবনের অনেক দিক দিয়াই মিল দেখিতে পাওয়া যায়। শেলি হ্যারিয়েটকে লইয়া সুখী হইতে না পারিয়া পরে মেরি গডউইনকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনি রেবেকার পর হেনরিয়েটার মধ্যে তাঁহার যোগ্য সহধর্মিণীকে লাভ করিয়াছিলেন। শুধু কেবল এই দিক দিয়া নহে, পাঠ্যাবস্থা হইতেই উভয়ের স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ, পিতৃবিরোধ, স্বপ্নচারিতা ও দুঃখময়তার দিক দিয়া উভয় কবির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শেলি ও মধুসূদনের ন্যায় যাঁহারা পুরাতন অন্ধকার পথ ত্যাগ করিয়া নূতন আলোকের পথে যাত্রা করেন তাঁহারা দুঃখের কঠিনতম আঘাত লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দুঃখক্ষত জীবনের উপর অনশ্বর আলোকের প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে।

বনফুল প্রথম দৃশ্যেই মধুসূদন চরিত্রের মূল শক্তি এই উচ্চাশার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—'I cannot rest half way—I must soar up and up and up till I am tired and even then I shall soar'. এই উচ্চাশার

ফলেই তিনি পিতার ইচ্ছা মানিয়া লইতে পারিলেন না, এবং পারিবারিক জীবনের সংঘাত এখান হইতেই আরম্ভ হইল। যে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিবার ফলে পিতা ও পরিবারের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল তাহার মূলেও একটি উচ্চাশার অস্তিত্ব রহিয়াছে; মধুস্থদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরদাস লিখিয়াছেন—'He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream—a visit to England.' একদিকে এই উচ্চাশা, অন্যদিকে পিতামাতা, বিশেষভাবে মাতার প্রতি সুগভীর আকর্ষণ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব মধুস্থদনের চরিত্রে খুব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মধুস্থদনের পিতা রাজনারায়ণের মধ্যেও স্থকঠোর বংশমর্যাদা ও আত্মাভিমানের সহিত পুত্রস্নেহের ফল্গুস্রোতের একত্রিত সমাবেশ হওয়াতে চরিত্রটি বিশেষ নাটকীয় ও রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আর অভিমানী পিতা ও অভিমানী পুত্রের মাঝে জাহ্নবী দেবীর নীরব, নিরুপায় অশ্রুসিক্ত মূর্তি তর্কবিতর্ক, জ্বালা ও উত্তাপের উপর এক সকরুণ, ক্ষমাশীতল প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।* প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পিতা ও পুত্রের মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধিগত আদর্শ লইয়া স্নেহ ও অভিমান-ভরা যে সংঘাত চলিয়াছে তাহাতে জীবন-নাট্য নাট্যজীবনের শিল্পসম্মত পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু তারপর আলোচ্য নাটকে জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বটে কিন্তু নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ চরিত্রগত সংঘাত এবং দ্বিধাবিভক্ত সত্তার বিক্ষেপ ও বেদনা একমাত্র বিংশ দৃশ্য ছাড়া আর কোথাও জমিয়া উঠে নাই। বনফুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার প্রাণবন্ত সংলাপে। মধুস্থদনের সংলাপে তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের শুধু যে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই নহে, সেই সংলাপ বাক্যপ্রয়োগ-কৌশলে অত্যন্ত সরস ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। মধুস্থদনের জীবনীতে কবি কীর্তিমান মধুস্থদনকে জানিয়াছি আর 'শ্রীমধুস্থদন' নাটকে আমরা মানুষ মধুস্থদনকে চোখের সম্মুখে দেখিলাম।

॥ বিদ্যাসাগর (১৯৪৫) ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর মহত্তম বাঙালী বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া নাট্যকার আলোচ্য নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'আমি তাঁহার জীবনের একটি কার্যকে মূলসূত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।' এই কার্যটি হইল তাঁহার জীবনের প্রধানতম কার্য—বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। জীবনী নাটকে জীবনের সমগ্র রূপ ফুটাইয়া তোলা হইলে সম্পূর্ণ জীবন-পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু

তাহাতে নাটকের হানি ঘটে। কারণ, অতি-বিস্তৃত ও বিচিত্রমুখী ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে নাটকের সংগতি ও কেন্দ্রবদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। নাট্যকার সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াই বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কীর্তিসমৃদ্ধ জীবনের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকেই তাঁহার নাটকের মূল ঘটনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকের বীজ, সংঘাত ও পরিণতিতে বিধবাবিবাহকেই কেন্দ্র করিয়া নাট্যঘটনার বিবর্তন হইয়াছে। বিধবাদের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিন্তা, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য প্রতিকূল শক্তির সহিত তাঁহার প্রবল সংঘাত, এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পরে তাঁহার অন্তিম জীবনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বই নাটকের উপসংহারে দেখানো হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের পরস্পরবিরোধী গুণগুলি সার্থকভাবে নাট্যকার নাটকীয় পরিস্থিতি ও সংলাপের মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বজ্রকঠোর সঙ্কল্প ও স্নেহবিগলিত অনুভূতি, অনমনীয় সংগ্রাম ও করুণাসিক্ত ভালোবাসা, অবিচল কর্মনিষ্ঠা ও অদম্য স্বপ্নবিলাস—সবই এই নাটকের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বহু লোকের চরিত্রও তাঁহাদের বিশিষ্ট সংলাপেব মধ্য দিয়া যথাযথরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্য দিয়া তখনকার সমাজের বিভিন্নমুখী মত ও পথের চিত্র বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি মহৎ সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের জয় এই নাটকের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সেই সংগ্রামের বেদনা ও কারুণ্যই নাটকীয় রসের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। জীবনের কোনো বড় মুক্তির জন্য যিনি সংগ্রাম করেন তিনি চিরকালই বড় একা। পরবর্তী কালের জন্য হয়তো তিনি অমৃতের উৎস উন্মুক্ত করিয়া যান, কিন্তু নিজে তিনি কেবল তিক্ত হলাহলই পান করিতে থাকেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া পিতা, গুরু, ভ্রাতা, স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও উপকৃত জনের কাছে পাইয়াছিলেন উপেক্ষা, অসহযোগিতা, বিরোধিতা ও কৃতঘ্নতা। একাই তিনি সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলেন আবার সংগ্রাম জয়ের পরেও তিনি নিজেকে দেখিলেন সম্পূর্ণ একা। 'দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে' দুই একটি 'সবুজ শিষ' হয়তো তিনি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মরুভূমির তুলনায় সেই শিষ কতটুকুই বা! বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা দেখিলাম, একটি বৃহৎ বনস্পতি চারিদিকের নিষ্ঠুর খরদাহে আস্তে আস্তে কিভাবে দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সেই দগ্ধ বনস্পতি বোধ হয় একটি জলন্ত অগ্নিশিখার মতই চিরকাল সমাজের বুকে জাগিয়া রহিল।

বিবিধ নাটক

॥ পথের শেষে ॥ নিশিকান্ত বসুরায়ের সামাজিক নাটক 'পথের শেষে' এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই নাটকখানিও পুরাতন ধারার অনুবর্তী। জমিদার-প্রধান সমাজ লইয়া ইহার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। 'নীলদর্পণ' এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত করুণ রসের অত্যধিক আতিশয্য ইহার মধ্যে পরিস্ফুট।

॥ মানময়ী গার্লস স্কুল ॥ রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের 'মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল' বিশুদ্ধ হাস্যরসোজ্জ্বল রহস্যস্নিগ্ধ কমেডি। মানস এবং নীহারিকা দুইজন গ্র্যাজুয়েট, স্বামীস্ত্রী রূপে পরিচয় দিয়া তাহারা মাস্টারী গ্রহণ কবে। দামোদর চৌধুরী এবং অন্যান্য সকলের কাছে তাহাবা কিভাবে অভিনয় করিয়াছে তাহাই দর্শকের কাছে পরম উপভোগ্য ব্যাপার হইয়াছে। নীহারিকা দায়ে ঠেকিয়া প্রথমত বিরক্তির সহিত যে অবস্থা স্বীকার করিয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে সে কি রকম গোপনভাবে বরণ করিয়া লইল তাহার বর্ণনা যথেষ্ট কলাকৌশলপূর্ণ ও প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম-পাগল রাজেন্দ্র বাডরীর ঐকান্তিক প্রেম সাধনাও অশেষ কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের গ্লানি নাই, রহস্যঘন রোমান্সের রসে ইহা ভরপুর।

যুদ্ধোত্তর নাট্যসাহিত্য

নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় বটে, কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আর একটা বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ আছে বস্তুশক্তির নিয়ত-প্রবল সংঘাত ও বিপর্যয় সেই জীবন-রঙ্গমঞ্চে ঘটিতে থাকে। তাহার প্রেরণা বাহিত হয় শিল্পীর মানসলোকে এবং সেই মানসলোক হইতে পুনরায় পাদপ্রদীপের সম্মুখে তাহার শৈল্পিক প্রকাশ। সুতরাং নাট্যকারের কল্পনা ও নাট্যশিল্পীর অভিনয়ে জীবনের যে শৈল্পিক রূপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে তাহার মূলে রহিয়াছে বৃহত্তর বস্তুজীবনের অকাট্য অস্তিত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে পৃথিবীর মানসজীবনে অনেক ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আমাদের জীবনও সুস্থ ও নিরাপদ থাকিতে পারে নাই। বস্তুত ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত একদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবে ও অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিদারুণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নাট্যজীবনের আলোচনা করিবার পূর্বে বাস্তব জীবনের পটভূমি সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার।

যে যুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র অভিনয় করিয়াছিলাম তাহা

আমাদের সুস্থিত জীবনধারাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল কেন? ইহার উত্তরে হয়তো বলা হইবে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসিতা, শাসকজাতির ভাগ্যের সহিত শাসিত জাতির বাধ্যতামূলক সহযোগিতা। তবুও বলিব যে, একটি নিরীহ, নিরপেক্ষ জাতির পক্ষে ইহা একটা অতি নিষ্ঠুর দুর্দৈব। তাহা না হইলে এই যুদ্ধজনিত মন্বন্তরের কবলে আমাদের ত্রিশ লক্ষ দেশবাসীকে অসহায়ভাবে যাইতে হইত না। দেশের সর্বত্র অশান্তি ও অসন্তোষ—মানুষের জান্তব পরিণতি ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয়। জৈব অভাবের তাড়নায় ক্রমে ক্রমে চিরপোষিত নীতি ও সংস্কার জীবন হইতে খসিয়া পড়িল, অন্তরে-বাহিরে জুড়িয়া রহিল এক বিকৃত ক্ষুধার লোলায়িত জ্বালা। বিপর্যস্ত জীবনের বিক্ষুব্ধ অন্তর্দেশ হইতে রাষ্ট্রিক বিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিল। বিপ্লবের জ্বলদর্চিরেখায় ভাস্বর হইয়া উঠিল দুইটি অগ্নিবাণী—'ভারত ছাড়'। এই অন্তর্বিপ্লবের সহিত আর একটি বহির্বিপ্লব' যুক্ত হইল, সেই বিপ্লবের নেতা এক বজ্রসন্তান—তাঁহার অকম্পিত আঙ্গুলী প্রসারিত দিল্লীর দিকে—'চলো দিল্লী'। ভিতরে বাহিরে এই যুগপৎ আক্রমণে শাসকশক্তি বিব্রত হইয়া পড়িল। শাসন ও অত্যাচার নিষ্ফল বুঝিয়া সে আপস রফার ছক খুলিয়া বসিল। রাজনীতির সতরঞ্চখেলা বেশ কিছুকাল চলিল, ইহাতে কে হারিল কে জিতিল জানি না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা যে ঘনাইয়া আসিল তাহাতে কোনো সন্দেহ রহিল না। অতঃপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্ব। ইন্দ্রপ্রস্থ ও হাস্তিনাপুর অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান আলাদা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। ইহার পর—মহাপ্রস্থানের পথে? হ্যাঁ, তবে কয়েকজন পাণ্ডবের নহে, লক্ষ লক্ষ লোকের সেই পথে যাত্রা। জন্মজন্মান্তরের মাটির কোল ছাড়িয়া আসিল নিরুপায়, নিঃসহায়, ভাগ্যহীন, ভবিষ্যৎহীন অগণিত ছিন্নমূল নরনারী—তাহাদের নবজীবনের স্বপ্ন অন্ধকারের বুকে আর্তনাদ করিয়া মরিল।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আকস্মিক বিপর্যয় আনিয়া দিল। আমাদের শান্ত, মৃত্তিকালগ্ন জীবন এক ক্রুদ্ধ ঘূর্ণিবায়ুর আচমকা আঘাতে যেন ছিন্নমূল তৃণের মতই অসহায়ভাবে নিরালম্ব শূন্যতার মধ্যে হাহাকার করিতে লাগিল। নিরুদ্বিগ্ন আকাশে মৃত্যুর হুঙ্কার, নিশ্চিন্ত মাটিতে বিদেশী সৈনিকের উদ্ধত আস্ফালন, চারিদিকে আলকাতরা লেপা রাতের কুৎসিত বিভীষিকা। সেই অশুভ প্রেতপুরীর অন্ধকারে লোভী মানুষের কালোবাজারে পণ্যের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, সব নীতি ও ধর্ম অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। কত দুঃশাসন-কবলিত দ্রৌপদীর কাতর

বিলাপ প্রতিকারহীন পাণ্ডবদের অক্ষম নীরবতাকে সেদিন তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করিল। সাধারণ মানুষ যখন দুর্ভাগ্যের চরম সোপানে নামিয়া আসিল তখন দেখা গেল, দালাল, ঠিকাদার ও অসাধু ব্যবসায়ী পরমানন্দে সমাজের অবশিষ্ট রক্তটুকু শোষণ করিয়া লইতেছে। এক হাতা ফেনের জন্য বুভুক্ষিতের দল যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে তখন মজুতদার ও মুনাফাখোরেরা পরম নিশ্চিন্ত মনে মানুষের ভাগ্য লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া চলিয়াছে!

দেশবিভাগের ফলে আমাদের সমাজে যে অভাবিত দুর্যোগ নামিয়া আসিল তাহা আমাদের অভ্যস্ত ও শান্তিমগ্ন জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ, খোলা রাস্তা, স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ও বদ্ধ তাঁবুর মধ্যে অগণিত শরণার্থীর জান্তব জীবনযাত্রা, সমাজের দৃঢ় ভিত্তিভূমিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। পারিবারিক জীবনের লজ্জা, শালীনতা ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। বিকৃত লালসা ও অশুভ অর্থলিপ্সা ফাঁদ পাতিল সর্বত্র। অভাবের সুড়ঙ্গপথে মনুষ্যত্ব আত্মহত্যা করিয়া বসিল।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিল তাহা নহে। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেও আমূল বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। যুদ্ধ, মন্বন্তর ও বাস্তুত্যাগের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি একেবারেই ধ্বসিয়া গেল। জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী বহু লোক গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া নানা নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল। স্বাধীন ভারতে দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটিতে লাগিল এবং সাম্যবাদী নীতিও সমাজের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিল এবং পুঁজিবাদী সমাজের পত্তন হইতে লাগিল।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেও নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া চলিল। ভূমিজীবী সমাজের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের মূল ছিন্ন হইয়া গেল। শহরের হরেকরকম বৃত্তি অবলম্বনের ফলে বংশমর্যাদা ও বর্ণমর্যাদা নষ্ট হইয়া গেল এবং কাঞ্চনমর্যাদাই একমাত্র মর্যাদা হইয়া রহিল। অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পারিবারিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের নারী স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য বাহিরের বহুপ্রকার চাকরী গ্রহণ করিল। পুরুষের সঙ্গে শিক্ষা, চাকরী ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে সহবর্তিতার ফলে নারীজীবনের গৃহলালিত লজ্জাকোমল, আত্মবিলোপী আদর্শগুলি

জীর্ণপত্রের মতই খসিয়া গেল। বিবাহ-বিচ্ছেদের মত নানা বৈপ্লবিক আইন প্রবর্তনের ফলে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা আর বজায় রহিল না। সামাজিক নীতি সম্বন্ধে একটা ভ্রূক্ষেপহীন, বেপরোয়া ভাব সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু উদ্বাস্তু সম্মানযোগ্য বৃত্তির অভাবে নানা শ্রমসাধ্য বৃত্তিতে যোগ দিতে বাধ্য হইল। ফেরীওয়ালা, স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী এবং কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। শান্ত ও নির্বিরোধ ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা তাহাদের নহে। কঠোর শ্রমদানের দ্বারা তাহারা সমাজের অগ্রগতির চাকা দ্রুতবেগে ঘুরাইয়া চলিল। কিন্তু বেদনা ও বঞ্চনার সঙ্গে তাহাদের নিত্যকার পরিচয়। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির মহিমা তাহারা বুঝিল, নিজেদের অধিকার আদায় করিবার জন্য তাহারা সংগ্রামের পথটি খুঁজিয়া পাইল। সমাজের মধ্যে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবনপ্রবাহ অবসিত হইয়া আসিল ; শ্রেণীদ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় জীবন অতিমাত্রায় জর্জরিত হইয়া উঠিল।

সাম্প্রতিক কালের সমাজ-ইতিহাসের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনধারাটি না বুঝিতে পারিলে আধুনিক নাটকের পরিবর্তিত পটভূমিটি ঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। আজকের নাটকে শান্ত ও আনন্দময় পল্লীজীবনের রূপ প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সংঘাতক্ষুব্ধ নাগরিক জীবনপথে অথবা শ্রীহীন শহরতলীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট বস্তিতে এখন নাটকের ঘটনা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিবেশের রুক্ষতায়, দ্বন্দ্বমুখর মানুষের দৈনন্দিন কলহকোলাহলে, লোভ ও লালসার কুৎসিত পদক্ষেপে জীবন যেখানে অশান্ত ও বিপর্যস্ত সেখানেই আজিকার বাস্তববাদী নাট্যকার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সাম্প্রতিক নাটকে জীবনের রূঢ় ও অসুন্দর দিক নির্বিকার বাস্তবনিষ্ঠার সহিত উদ্‌ঘটিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মনে হয়, নিশ্চয়ই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আরও প্রয়োজনীয়তা আছে জীবনের সুন্দর ও কোমল দিকের। পৃথিবীতে কেবল নগ্ন অন্ধকার, ক্রুদ্ধ ঝটিকা ও রক্তচক্ষু মেঘই যে আছে তাহা নহে, আছে প্রসন্ন আলো, পরিচ্ছন্ন আকাশ আর সুনির্মল জ্যোৎস্নার হাসি। এগুলি হয়তো জীবনের রোমান্টিক স্বপ্ন বলিয়া বর্তমানে উপহসিত হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল এই রোমান্টিক স্বপ্নই মানুষকে আদর্শলাভের পথে, মৃত্যুজয়ী সংগ্রামের পথে, আত্মত্যাগী সত্যসাধনার পথে লইয়া গিয়াছে।

মানুষের নীতি, সংস্কার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন বারে বারে ঘটিতেছে।

সমাজের অগ্রগতির পথে যে নীতি বাধা দেয় তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। কিন্তু এমন কতকগুলি মানবনীতি আছে যেগুলি ত্যাগের উপর, মঙ্গলের উপর, চিরসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলির প্রতি অবজ্ঞা সুস্থ সমাজপ্রগতির লক্ষণ নহে। চোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ঘাতক প্রভৃতি যে অবস্থা হইতে এবং যাহাদের উপেক্ষা ও নিষ্ঠুরতার ফলে জন্মলাভ করিয়াছে, সেই অবস্থা এবং সেই সব নির্মম অমানুষের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ জানাইতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানানো দরকার যে চোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ঘাতক প্রভৃতি সত্য নহে। সত্য হইল সাধু সজ্জন, প্রেমিক ও পরহিতব্রতী। অথচ আজিকার নাটকে ইহাদের স্থান নাই। বর্তমান বাস্তববাদী নাট্যকারদের মধ্যে জীবনের চিরন্তন সুন্দর ও শুভ নীতির প্রতি যেমন উপেক্ষা দেখা যাইতেছে, তেমনি আবার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে প্রকৃত শিল্পীর ক্ষমাসুন্দর উদারতা ও অকৃপণ সহানুভূতির প্রতি। সাহিত্যিক যখন এই উদারতা ও সহানুভূতির মধ্য দিয়া জীবনকে দেখেন তখন ভ্রান্ত, অপরাধী ও অন্যায়কারীও সাহিত্যক্ষেত্রে এক দুর্লভ মূল্য ও মর্যাদা লাভ করে। সাম্প্রতিক কালের অনেক প্রচারধর্মী নাট্যকার তাঁহাদের মতবাদ পরিপোষণের জন্য নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহাদের চরিত্রগুলি ছকবাঁধা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ টাইপে পরিণত হয় মাত্র। তাহাদের মধ্যে অজস্র বৈচিত্র্যধর্মিতা ও দুজ্ঞেয় সম্ভাবনাময় জটিলতা ফুটিয়া উঠিতে পাবে না।

অনেক নাট্যকারের হয়তো এক স্পষ্ট বক্তব্য আছে, কিন্তু নাটকের রূপ ও রীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান এত স্বল্প এবং ঘটনার সুষ্ঠু সংস্থাপনা ও পরিণতি দানে তাঁহাদের ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ যে, তাঁহাদের বক্তব্য অনেক সময়েই অস্পষ্ট ও আবেদনহীন হইয়া পড়ে। অনেক নাট্যকার একটি বিশেষ সমস্যার সার্থক অবতারণা হয়তো করেন, জটিল ঘটনার জালও হয়তো বিস্তার করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি দানে তাঁহারা প্রায়ই ব্যর্থতার পরিচয় দেন। আধুনিক নাটকের তেমন কোন জোরালো আবেদন যে দেখা যায় না তাহার কারণ, অনিবার্য ও গতিশীল ঘটনাসৃষ্টি, উৎকণ্ঠিত কৌতূহল ও সুতীব্র সংঘাতের অবতারণা এবং বলিষ্ঠ আবেগদ্বন্দ্বময় চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারদের অক্ষমতা।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের উপর গুরুত্ব না দিয়া আঙ্গিকের নূতনত্ব ও মঞ্চ-প্রয়োগশিল্পের উপর নির্ভরতা

দেখাইতেছেন। বর্তমানে নাট্যপ্রয়োগ করিবার সময় মঞ্চ-আঙ্গিকের বিসদৃশ বাহুল্যের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয় বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার জন্য যাঁহারা মঞ্চ-আঙ্গিক প্রয়োগ করেন শুধু তাঁহাদের দোষ দিলে চলিবে না। নাট্যকারদের নাটকে কাহিনী ও চরিত্রের এমন প্রবল শক্তি থাকে না যাহাতে দর্শক তাহাদের প্রতি এক অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করিবে। সেজন্য তাহাকে ভুলাইবার জন্যই মঞ্চ-আঙ্গিকের বহু প্রকার ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া হয়, নাট্যকারগণও তাঁহাদের নাটকের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন বলিয়াই মঞ্চ-আঙ্গিক প্রয়োগকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ও পরবর্তী নাট্যসাহিত্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙালীর জীবনে একটি কালো অভিশাপের মতই নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মন্বন্তরের বেদনা ও বিক্ষোভ নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের দিগন্ত-বিস্তারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। মন্বন্তরের পরিবেশে রচিত হইল কয়েকখানি স্মরণীয় নাটক—'নবান্ন', 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি। দেশবিভাগের ফলে জাতীয় জীবনে যে দুঃখ ও সঙ্কট ঘনাইয়া আসিল তাহা রূপ পাইল সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' ইত্যাদিতে। সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে, শ্রেণীর রূপান্তর হইয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্তন ও রূপান্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি', তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি নাটকে। মধ্যবিত্ত সমাজ এখন উপেক্ষিত, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবারভুক্ত জীবন, তাহার সমস্যা ও সংগ্রাম চিত্রিত হইয়াছে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' ও 'চোরাবালি', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন', সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাষ্টার' ইত্যাদিতে। রাজনৈতিক সমস্যা ও মতবাদের আবর্ত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, যথা, তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এই স্বাধীনতা', ও 'আর্তনাদ-জয়নাদ', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আর হবে না দেরী' ইত্যাদি। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বঞ্চিত, দুঃখময় জীবন রূপায়িত হইল মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক', সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'সমান্তরাল', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' প্রভৃতি নাটকে। সমাজের ঘৃণিত হতভাগ্য মানুষগুলির কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে ছবি

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' ও 'স্ট্রীটবেগারে', জোছন দস্তিদারের 'দুই মহলে' এবং আরও অনেক নাটকে। মালিক-শ্রমিকের বিরোধ অনেক নাটকেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট', উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' ও 'ঘুম নেই' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া দারিদ্রক্লিষ্ট ও অত্যাচারিত মানুষের পরিচয় পাইলাম সলিল সেনের 'মৌচোর' নাটকে। সমস্যাবহুল নাটকই বর্তমানে বেশি লেখা হইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু সমস্যামুক্ত কৌতুকপ্রসন্ন নাটক যে একেবারেই লিখিত হইতেছে না তাহা নহে। অবিমিশ্র কৌতুকরসের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' ও 'বারোভূতে' প্রহসনে। অন্যান্য হাস্যরসাত্মক নাটকের মধ্যে উমানাথ ভট্টাচার্যের 'শেষ সংবাদ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মৌন মুখর', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'কান্না হাসির পালা', কিরণ মৈত্রের 'যা হচ্ছে তাই', মন্মথ রায়ের 'মরা হাতী লাখ টাকা' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশে একাঙ্ক নাটক, নাট্যকাব্য, অনূদিত নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ ইত্যাদি স্থান পাইতেছে, যথাস্থানে তাহাদের আলোচনা করা হইবে। নিম্নে বিভিন্ন নাট্যকারের নাট্যধর্ম ও নাট্যপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

বিজন ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনে যাঁহাদের দান সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। অভিনয়, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্যরচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুগভীর সমাজচেতনা এবং নাট্যের মাধ্যমে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা প্রসারের প্রচেষ্টাই তাঁহার সব নাটকে লক্ষ্য করা যায়। তিনি খুব বেশি নাটক লেখেন নাই, কিন্তু যখনই লিখিয়াছেন তখনই তাঁহার অকৃত্রিম ও সহানুভূতিপূর্ণ সমাজবোধের প্রেরণা হইতেই লিখিয়াছেন। তাঁহার নাট্যজীবনের সূচনায় 'জবানবন্দী', ও 'নবান্ন' নাটকে যে মননশীল সমাজবাস্তবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম, দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে 'গোত্রান্তর' নাটকে পরিবর্তিত সমাজের চিত্রণে সেই সমাজবাস্তবতারই পরিচয় পাইয়াছি।

॥ নবান্ন (১৯৪৪) ॥ নবনাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে 'নবান্ন' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের মধ্য দিয়া নাট্য-আন্দোলন দেশের বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয় এবং ইহাতেই সর্বপ্রথম মঞ্চ-আঙ্গিকের প্রচলিত

সংস্কার বর্জন করিয়া আলোকসম্পাত ও শব্দক্ষেপণের নানা কলাকৌশল অবলম্বনে দৃশ্য-পরিবেশ ও ভাবপরিবেশ গঠনের চেষ্টা দেখা গিয়াছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকজীবনের পরিচয় বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটিকা 'জবানবন্দী'তে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্যার গভীরতর রূপের সার্থকতর চিত্র পাইলাম আলোচ্য নাটকে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক যেমন নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে রচিত হইয়াছিল, 'নবান্ন'ও তেমনি নাট্যকারের একান্ত বাস্তব জীবনসংযোগের পরিচয় বহন করে। দীনবন্ধুর মত বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতি যুক্ত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির মিলনের ফলেই 'নীলদর্পণে'র মতই 'নবান্ন' সমসাময়িক সমাজের দর্শকদের মনের মধ্যে এতখানি সাড়া জাগাইতে পারিয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের নিদারুণ বিভীষিকা,—সমাজজীবনের শোচনীয় বিপর্যয়, প্রচলিত জীবনমূল্য বোধের পরিবর্তন, পুরাতন জীবনের ভাঙ্গন ও নব জীবনের স্বপ্ন নাটকটির মধ্যে বাস্তব সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে. অভাবের সর্বগ্রাসী দাহ ও রক্তক্ষয়ী শোষণ, প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে কিভাবে মাটির স্নেহময় কোল হইতে শহরের পাষাণপথে জান্তবজীবনযাত্রার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল এবং আমিনপুরের হতভাগ্য কৃষকদিগকে কিভাবে দিশাহারা সর্বনাশের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া দিল, নাট্যকার তাহা সুনিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মন্বন্তরকবলিত জনগণের কাতর অশ্রুধারায় যখন দেশের মাটি ভাসিতেছে তখন কিন্তু জোতদার হারু দত্ত মানুষের সম্বল ও সান্ত্বনাস্মিত হাসির সহিত আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছে এবং কালীধন ধাড়ার চা'লের গুদাম প্রসন্ন প্রাচুর্যে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু 'নবান্ন' নাটক সমসাময়িক সমাজ ও নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিলেও শিল্পগত ত্রুটি দুর্বলতার ফলে ইহা কালাতিশায়ী শক্তিলাভ করিতে পারে নাই। এখানেই 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা ইহার স্থান অনেক নিম্নে। নাটকের ঘটনা সমসাময়িক অবস্থার তথ্যচিত্র হইয়াছে, শাশ্বত রসবস্তুতে পরিণত হইতে পারে নাই। বিভিন্ন দৃশ্যে এক একটি চিত্র যেন বিচ্ছিন্নভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রগুলি খুবই বাস্তব এবং নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ, কিন্তু সব চিত্রের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের ফলে যে সামগ্রিক ও ঘনীভূত আবেদন দর্শকচিত্তকে তীব্রভাবে অভিভূত করে, নাটকের মধ্যে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর সাক্ষাৎ, উভয়ের গ্রামে ফিরিয়া আসা, কুঞ্জ ও রাধিকারও হঠাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন,

নবান্নের উৎসবে প্রধানের আকস্মিক আবির্ভাব—এই সব ঘটনা এত অতর্কিত ও অবিশ্বাস্যভাবে ঘটিয়াছে যে দর্শকচিত্তে ইহারা কোনো সাড়া জাগাইতে পারে না। নাটকের ঘটনা একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালিত হইয়া কোনো চরম সংঘাত ও উত্তেজনার স্থলে উপনীত হইতে পারে নাই। আত্যন্তিক দুঃখময় কাহিনী কিভাবে কোন্ সঙ্কটজয়ের ফলে সর্বজনীন আনন্দে পরিণত হইল তাহা নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

॥ গোত্রান্তর (১৯৬০)॥ একজন উদ্বাস্তু স্কুল-শিক্ষক সপরিবারে কিভাবে ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া বস্তিবাসী শ্রমিকজীবনের সহিত একাত্ম হইয়া পড়িলেন তাহারই কাহিনী নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'নীতিবাদের প্রশ্ন নয়—জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল—নাটকে তার অপলাপ করা কোনো নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না।' নাটকের মধ্যে এই গোত্রান্তর কিভাবে ঘটিল তাহা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভাল বাসিল এবং অবশেষে উহাদের বিবাহ হইল—ইহাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা ও শ্রেণী-আভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর। নাটকের সূচনা অথবা exposition-এ হরেন্দ্রের যে শিক্ষকজীবন দেখিলাম তাহার সমস্যাবিক্ষুব্ধ কোন বিকাশ ও পরিণতি নাটকের মধ্যে পাইলাম না। শিক্ষকজীবনের কোন স্বপ্ন ও আদর্শ. পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাঁহার সংঘাত এবং তাহারই ফলে কোন দুঃখজনক পরিণতি অথবা কোন নবালোকিত পথে পরিত্রাণের ইঙ্গিত নাটকে দেখানো হয় নাই। নাটকের শেষে গৌরী ও কানাইয়ের অসমগোত্রীয় মিলনই প্রাধান্য পাইয়াছে, অথচ গৌরী ও কানাইয়ের পারস্পরিক প্রেমের আভাস তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের আগে আমরা পাই নাই। সুতরাং নাট্যকার যে সমস্যাটির সমাধানে নাটকের সমাপ্তি টানিয়াছেন তাহা নাটকের মধ্যে নিতান্তই আংশিক ও আকস্মিক। নাটকের কয়েকটি চরিত্র, যথা, —বাড়ীওয়ালা, ছোটবাবু, সরকার, দারোয়ান প্রভৃতি চির-পরিচিত বৈচিত্র্যহীন অমানুষ শ্রেণীর লোক। শৈলী চরিত্রটি গোর্কির মা চরিত্রটিকেই মনে করাইয়া দেয়। নাটকের মধ্যে একই দৃশ্যে সময়ের অতিক্রান্তি বুঝাইবার জন্য বারবার

আলোক-পরিবর্তন-রীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। একই দৃশ্যে দীর্ঘবিস্তারী সময়ের টুকরা টুকরা ঘটনার অবতারণা অবিচ্ছিন্ন নাট্যধারায় পক্ষে বিঘ্নজনক।

তুলসী লাহিড়ী

স্বর্গত তুলসী লাহিড়ী বহুকাল ধরিয়া বাংলাদেশের নাটক, নাট্যমঞ্চ ও চিত্রজগতের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। চিত্রজগতে যিনি কৌতুক-রসাত্মক অভিনয় দ্বারা দর্শকদের প্রাণে যথেষ্ট আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিলেন তিনিই পরিণত বয়সে নাটক ও নাট্যমঞ্চের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে সমাজের উপেক্ষিত ও উপদ্রুত মানুষের সব বঞ্চনা ও বেদনা বাস্তব সত্যের স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, তাহাদের বিশিষ্ট পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কার তিনি গভীর আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিযাছেন। তিনি সমাজব্যবস্থার গলদ সন্ধান করিয়াছেন, ইহার প্রতিকারেরও ইঙ্গিত মাঝে মাঝে দিয়াছেন, কিন্তু লোকের প্রয়োজনের কাছে তাঁহার সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন বড হইয়া উঠে নাই। সেজন্য তাঁহার নাটকে আমরা নাট্য-জীবনই দেখিতে পাই, তত্ত্বজীবন নহে।

॥ পথিক (১৩৫৮)॥ কালের যাত্রা চলিতেছে অব্যাহত বেগে সেই যাত্রাপথের পরিবর্তন হয়, পথিকেরও পরিবর্তন হয়। আজিকার সংশয় ও সংঘাতজড়িত পথে যে নূতন পথিকের চলা সুরু হইয়াছে তাহার পদে পদে বাধার উপলখণ্ড, বাঁকে বাঁকে অনিবার্য সংগ্রামের অশান্ত বিক্ষোভ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে আর মিলিত শান্তি নাই, এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর নিদারুণ দ্বন্দ্ব-কোলাহলে নিশ্চিন্ত শান্তির পরিবেশ আজ নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত। বর্তমান জীবনের এই তিক্ত অথচ একান্ত সত্য দিকটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই নাটকটিতে। কিন্তু ঘটনাসংস্থাপনা ও চরিত্রাঙ্কনের দুর্বলতার জন্য নাটকের উদ্দেশ্য জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাট্যকার সাহসের সঙ্গে একই 'সেটে' সমগ্র নাটকের কাহিনীটি স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দৃশ্য সংস্থাপনের বাহুল্য কমিয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনার গতি ক্রিয়ার মধ্যে দেখাইবার অনেক সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। কোলিয়ারীর অংশটুকু কেবল মৌখিক বিবৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া নাটকত্বের দিক দিয়া মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের সর্বাপেক্ষা দুর্বল চরিত্রটি হইল স্বয়ং নায়ক অসীম। সে যে কিভাবে 'দুদিনের সহযাত্রীদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের পথের দিশারী হ'য়ে সার্থক হ'ল' তাহা

নাটকের মধ্যে একেবারেই অপরিস্ফুট। তাহার চারিদিকের পরিবেশের সহিত তাহার ধীর ললিত নায়কোচিত ভাব একেবারেই বেমানান ও অসহ্য। তাহার মৃত্যুও অসংলগ্ন রোমাঞ্চকর উপাদানের অংশীভূত হইয়াছে,—এই মৃত্যু ঘটনা ও চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে। খুনী ডাকাত সিংড়া সিঙের মুখে কৈফিয়তসূচক বড় বড় কথাও অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিরক্তিকর।

॥ ছেঁড়া তার ॥ বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনীত 'ছেঁড়া তার' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সম্বর্ধিত হইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রংপুর জেলার গ্রাম্য কৃষকসমাজকে লইয়াই নাটকখানি রচিত। এই সমাজের একটি বিশেষ পরিবারের দুঃখ-বেদনার কাহিনীই নাটকের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। নায়ক রহিমুদ্দী তাহার স্ত্রী ফুলজানকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া তালাক দিয়াছে। মন্বন্তর যে সাধারণ লোকের সুখী জীবনের মধ্যে কি ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল এই ব্যাপারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফুলজানের সহিত রহিমুদ্দীর পুনর্মিলনে মন্বন্তরের বাধা নাই, অন্য কোন সাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যাবও বাধা নাই, সেখানে বাধা 'হদিসের'। নাটকের শেষভাগে মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও করুণ আত্মদানের চিত্র রহিয়াছে সেখানে প্রেমার্ত হৃদয়ের প্রতিহিংসা ফুটিয়া উঠিয়াছে ধর্মবিধানের বিরুদ্ধে। নাটকের ভাষা সম্বন্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে। নাট্যকার যদিও মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের নজির দিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে টাইপ চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। একটি প্রত্যক্ষ অঞ্চলের দুর্বোধ্য ভাষা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কোন নাটকে ব্যবহাব করিলে তাহা সর্বসাধারণের মনে কোনো সামগ্রিক রস সঞ্চার কবিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আ ছ। আবার এই ভাষা ব্যবহার না করিলেও চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক হইয়া যায়। সমস্যা বটে!

॥ দুঃখীর ইমান (১৩৫৪)॥ ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের পটভূমিতে তুলসী লাহিড়ী আলোচ্য নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। নাট্যকারের 'নিবেদনে' বলা হইয়াছে—'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি'। বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের দুরন্ত ক্ষুধার আক্রমণে আমাদের দেশের খাদ্য গেল, জীবনধারণের সামান্যতম দ্রব্যও নিমেষের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল, সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রহীন প্রেতের মত পথে প্রান্তরে ঘুরিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, মানুষের চিরপোষিত নীতি, ধর্মসংস্কার দুর্যোগের ঝড়ে জীর্ণ পত্রের মত

খসিয়া পড়িল। সমাজের এই অসহনীয় বাস্তব অবস্থা নাটকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু নিকষকালো মেঘের প্রান্তেও শুভ্র রজতরেখার চকিত স্ফুরণ। মানুষের মৃত্যু-শ্মশানেও তাই মনুষ্যত্বের জয়ের আসন পাতা। সেজন্য ধর্মদাস ও বিলাতির ভালোবাসা অন্ধকারের বুকে তারার মত ফুটিয়া উঠে, জামালের শোচনীয় দুর্ভাগ্যও পিতৃস্নেহের আলোকে গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। ধর্মদাস চুরি করিল, কিন্তু এ চুরি চোরকে মহৎ করিল এবং তথাকথিত সাধু-লোকদের অন্তরও পরিবর্তন করিয়া দিল। মনুষ্যধর্ম যেখানে আপন মর্যাদায় আসীন সেখানে মানুষের নীতিনিময়, সংস্কার ও শাসন তাহাদের সব হাঁকডাক থামাইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে যে বাধ্য। আলোচ্য নাটকেও মানুষী নীতির পরাজয় হইল বটে, কিন্তু জয় হইল মানুষের, মানুষী হৃদয়ের।

॥ লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ॥ দারিদ্র ও বঞ্চনা মানুষের জীবনকে যে কি শোচনীয় স্তবে টানিয়া আনে তাহার এক মর্মান্তিক চিত্র এই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংসারের কর্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নানা বেদনা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সংসারটি স্নেহমমতাব সযত্ন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। প্রথম দৃশ্যে তাহাব মৃত্যু হইবাব পর লক্ষ্মী-প্রিয়ার সংসারের লক্ষ্মী চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল শুধু সংসারটি, অলক্ষ্মীর দৌরাত্ম্য সেখানে নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। সংসারেব কর্তা ইন্দ্রনাথ মদের পাঁকে ডুবিয়া থাকে ; সংসারের প্রতি, ছেলেদেব প্রতি এবং নিজের প্রতি তাহার নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। বড়ছেলে বিশু ও ছোটছেলে ছোট্‌কা মায়ের মৃত্যুর জন্য বাপকেই দায়ী করে। পিতা ও পুত্রদের সম্বন্ধ হইল শুধু পারস্পরিক ঘৃণা ও অভিযোগের। বিশু ও ছোট্‌কা ঘর হইতে বাহির হইয়া গুণ্ডাদলে যোগ দেয়। ছোট্‌কা গুলিতে প্রাণ দিল আর বিশু খুন করিয়া ঘরে আসিয়া শেষে ধরা পড়িল। হতভাগ্য ইন্দ্রনাথও অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া তাহাব অভিশপ্ত জীবনের সব জ্বালা জুড়াইল। পরপর এই মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি সুস্থ মনের উপব যেন নৃশংস আঘাত হানিতে থাকে। সংসারের স্বাভাবিক স্নেহসম্পর্কের সব মাধুর্য ও আদর্শ ধূলিলুণ্ঠিত দেখিয়া মনুষ্যত্ববোধ যেন মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করে। কিন্তু নাট্যকার এই সর্বব্যাপী কলুষিত অন্ধকারের মধ্যে যে স্নিগ্ধ আশার প্রদীপটি জ্বালেন নাই তাহা নহে। হরিসাধন ও বাণীর মধ্যে আমরা সেই ঝটিকাবেষ্টিত প্রদীপের অকম্পিত শিখা দেখিতে পাইয়াছি। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'বাণী ও হরিসাধন এযুগের তপস্বী, তাদের তপস্যা সার্থক হবে এ বিশ্বাস রাখি।'

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে যাঁহারা বাংলা নাটককে ভাববিলাসহীন বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন তাঁদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী। যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্ত-বিপ্লব দেখা দিয়াছে সেইগুলিই তাঁহার নাটকের পটভূমিতে বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। সেজন্য আর্থিক সংকট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিবার্যরূপেই তাঁহার নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়া তিনি সমস্যাগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে মতভেদ ও আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বচ্ছ ও অকুণ্ঠ মতবাদ, অকৃত্রিম বস্তুনিষ্ঠা ও অপরিসীম দরদী দৃষ্টি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে। নাটক রচনা তাঁহার পক্ষে আর্টের ললিতবিলাস নহে, তাহা দুঃখব্রত সত্যসন্ধিৎসা। পরিবেশরচনা, বাস্তবানুগ সংলাপ-প্রয়োগ, আবেগদ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্রগতি ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

॥ অন্তরাল (১৯৪৫) ॥ মানুষের প্রচলিত নীতি ও বিধিব্যবস্থার অন্তরালে অবাঞ্ছিত সন্তানের যে অন্তরিত জিজ্ঞাসা প্রাচীনতম কাল হইতে জাগিয়া রহিয়াছে লেখক সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কানীন পুত্রের সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে নীতিঘটিত প্রশ্নটির মূলে হয়তো অর্থনীতি রহিয়াছে, কিন্তু আলোচ্য নাটকে মিলের মালিক ও শ্রমিকদ্বন্দ্বের সহিত মাধবী ও ঝরণার সমস্যাটির অনিবার্য যোগ নাই। কিন্তু নাট্যকার সুবিনয়ের জন্য ঝরণার সুগভীর অনুতাপ, মাধবীর চিরতৃষিত মাতৃত্ব ও ভবতোষের দুর্নিবার আত্মদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমস্যাটিকে হৃদয়ের বেদনারক্তিম রসে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ তরঙ্গ (১৯৪৬) ॥ জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ-সংঘাতের বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে আলোচ্য নাটকে। নাট্যকার ক্রমবিবর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের দুইটি স্তর এখানে দেখাইতে চাহিয়াছেন, প্রথমত কংগ্রেসী অহিংস সত্যাগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত সাম্যবাদী সহিংস সংগ্রাম। নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে তোলাবদ্ধ আন্দোলনের নায়ক আদর্শবাদী দেশসেবক শশী এবং শেষ দুই অঙ্কে প্রধানত পুলিশের সহিত সংগ্রামের নায়ক তাঁহার পুত্র অমর। শশী ও অমরের পথ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্যসন্ধ, ত্যাগব্রতী শশীর অকৃত্রিম দেশানুরাগ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। এই শশীর প্রতি অমর ও গোপাল

প্রভৃতি যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞার পরিচায়ক। শশী চরিত্রটি শেষদিকে নাট্যকারের কাছে কোন মূল্য ও মর্যাদাই পায় নাই। নাটকের পরিবেশ ও সংলাপের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের জীবন্ত স্পর্শ রহিয়াছে। তীব্রগতি ঘনাবেগ ও প্রতিরোধী শক্তিসমূহের প্রবল সংঘাতে নাটকখানি যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

॥ বাস্তুভিটা (১৯৪৭) ॥ দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুদের কি বিষম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা একটি গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া দেখানো হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ধর্মের ভিত্তিতেই যখন দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল তখন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে নিশ্চিন্ত সুখ শান্তির আশা লইয়া বাস করা সত্যই সুকঠিন। কফিলদ্দি ও আমীন মুন্সী মিলনের পথ দেখাইযাছে বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্তার সময় তাহাদের প্রভাব যে নগণ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করিবেন। বাস্তুভিটা ত্যাগ করা মর্মচ্ছেদের মতই ক্লেশকর। কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিযা আসিয়াছেন ও আসিতেছেন তাঁহারা শুধু হুজুগ কিংবা মিথ্যা আতঙ্কে মাতিয়া আসিতেছেন না, নিরুদ্বেগ শান্তি লইয়া সমাজগঠনের আশা নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন।

॥ মোকাবিলা (১৯৪৯) ॥ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি রচিত। অভাব-অনটন এবং বাহিরের রাজনৈতিক সংঘাত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সুখ ও শান্তি বিপর্যস্ত করিয়া কিভাবে পরিবারের লোকগুলিকে সর্বরিক্ত বিপ্লবের পথে টানিয়া আনে তাহারই বাস্তব আলেখ্য ফুটিয়াছে নাটকের মধ্যে। তবে নাটকের মধ্যে দুই বিরোধী সংঘাত স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয় নাই। সমস্ত মত ও পথের দ্বন্দ্বের উপরে একটি চরিত্র ব্যাকুল ও অসহায়ভাবে পরিবারের সকলকে তাঁহার স্নেহ ও মমতার পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি হইলেন গৃহকর্ত্রী সুভদ্রা।

॥ মশাল (১৯৫৪) ॥ সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া নাটকখানি রচিত। কিন্তু নাট্যকার এই সমস্যার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কেবল পুঁজিবাদী মালিকদেরই সৃষ্টি ইহা বিশ্বাস করিতে গেলে বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করিতে হয়। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জিলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব

ঘটিয়া গেল তাহার পিছনে কি কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিলমালিকদের প্ররোচনা ছিল, না যুগ যুগ সঞ্চিত ঘোর সাম্প্রদায়িক ঘৃণারই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল ? লেখক শুধু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার অপর দিকটি অবর্ণিত হইয়া রহিল এবং তাঁহার নাটকও আংশিকতা ও পক্ষপাত-দোষযুক্ত হইয়া পড়িল। মতির বোন ললিতার মানসদ্বন্দ্ব নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত অংশ।

॥ জীবনস্রোত (১৯৬০)॥ নাট্যকার এই নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমাদের দেশেও আজ দুটো জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাত্মবাদনির্ভর ভাববাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ আজ মুখোমুখী। হারজিত ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু আমাদের জীবন বিবর্তিত হচ্ছে এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই।' এই সংঘাত অবলম্বনেই নাটকের কাহিনী রচনা করা হইয়াছে এবং এই সংঘাতের রূপ পরিস্ফুটনে নাট্যকার প্রশংসনীয় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সেজন্য যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী জিতেন্দ্রের চরিত্র যেমন তিনি আগ্রহের সহিত অঙ্কন করিয়াছেন তেমনি উদারচেতা অধ্যাত্মবাদী তেজসানন্দের চরিত্রও গভীর শ্রদ্ধার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। আবার ধর্মধ্বজী, দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ অঘোরানন্দ ও অসহিষ্ণু অভিজ্ঞতাহীন, বস্তুবাদী তাপস উভয়েই তাঁহার কাছে সমান অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে সামঞ্জস্য সম্ভব। তেমন একটা সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবনস্রোতের উপসংহার'—এই সামঞ্জস্যের রূপই পাওয়া গেল গীতা ও জিতেন্দ্রের পরিণয়ের মধ্যে।

কিন্তু নাট্যকারের পরিকল্পিত অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সংঘাত-পরিবেশ হইতে সর্বত্র অনিবার্যভাবে উৎসারিত হয় নাই। তেজসানন্দ ও গীতার আধ্যাত্মবাদ কিভাবে তাঁহাদের আশ্রমপরিবেশ ও ধর্মাচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম। কিন্তু তাপস, এমন কি জিতেন্দ্রের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ জীবনের কোন্ পরিবেশ ও কিরূপ অভিজ্ঞতা হইতে জন্ম লাভ করিল তাহার পরিচয় তো পাইলাম-না। তাঁহাদের মতবাদও তো বস্তুসম্পর্কহীন এক প্রকার ভাববিলাস ছাড়া আর কিছুই নহে। যে জিতেন্দ্রকে নাটকের প্রথম দিকে সহিষ্ণু উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ দেখিয়াছি, তাহাকে যখন শুধুমাত্র ঠাকুর-দেবতা সামনে রাখিয়া বিবাহ করা সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি করিতে দেখি, তখন তাহার চরিত্রের এক আকস্মিক গোঁড়ামি আমাদিগকে বিস্মিত করে। শুধু বিবাহের রীতি সম্বন্ধে সে ভিন্ন মত পোষণ করে বলিয়া যখন সে গীতার অনুরক্ত হৃদয়ের

কাতর আত্মনিবেদন নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল তখন সে আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি যেন হারাইয়া বসিল। পক্ষান্তরে আমরা গীতার মত বিশ্বাস করি বা না কবি তাহার ভালবাসা, ধর্মনিষ্ঠা, নীরব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুঃখব্রতী কর্তব্যসাধনা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ বত্রিশ বৎসর ধরিয়া নাট্যসাহিত্যেব সাধনা করিয়া মাত্র কিছু ·কাল পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাব এই সুদীর্ঘকালের নাট্যসাধনার মধ্যে আমরা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নানা স্তর দেখিতে পাই। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তিব পব বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইযা পড়েন। নানা আলোচনা, উপদেশ, গঠনমূলক কাজ এবং নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজকদের মধ্যে সংঘশক্তি উদ্বোধনের মধ্য দিয়া তিনি আধুনিক নাট্য আন্দোলনকে অশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার চিন্তাশীল তাত্ত্বিক দিকটিই বড হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সরস সৃষ্টিশক্তির অব্যাহত গতি খানিকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সমাজ ও রাজনীতির বহু অনাচার ও অবিচার, ভ্রষ্টতা ও বিপথ গামিতা তাঁহার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয় জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের সব সমাধানের পথ তিনি নিজেও বোধ হয় ভাবিয়া উঠিতে পাবেন নাই। কিন্তু সব রকম জটিলতা ও বিভিন্নতার মধ্যে তিনি একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, সেই পথ হইল প্রীতির পথ, মৈত্রীর পথ। সেট পথে জমাট অন্ধকার, কিন্তু সেই পথেই আবার আলোর সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন।

॥ এই স্বাধীনতা (১৯৪৯) ॥ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর অনেকের মনেই এই প্রশ্ন আসিয়াছিল, যে স্বাধীনতার ফলে আমার পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুগণকে তাহাদের দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম, যে স্বাধীনতার গৌরব ও অধিকারের ছিন্নমূল শরণার্থী নর-নারীর কোনই অংশ রহিল না তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় কিনা। এই প্রশ্ন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের মনকেও বিচলিত করিয়াছিল। দীপক প্রমথ-কাতিক-অবনী-প্রভাবতী-রাইমণি ইহাদের জীবনে সুখ-সম্পদ, আশা-স্বপ্ন সবই ছিল, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে আজ তাহারা আশ্রয়হীন,

অন্নহীন ভিক্ষুক মাত্র। অবশ্য ইহাদের দুর্ভাগ্য আবার ইহারা নিজেরাই বাড়াইয়াছে লোভ-লালসা ও নীচ স্বার্থপরতার মধ্য দিয়া। নাট্যকারের মুখপাত্রী নিশ্চয়ই সাধনা। সাধনার মাধ্যমে নাট্যকার তাঁহার আশাবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যকার নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'জাতির সাধনা অবিরাম শোনায়—স্বাধীনতা সত্য, স্বরাষ্ট্র মিথ্যা নয়। অভাব মানব অভ্যুদয়। সে আঘাত পায়, আহত হয়, কিন্তু হত হয় না। জাতির সাধনার শেষ নাই, কখনো তা শেষ হয় না, মানব অভ্যুদয়ই চরম লক্ষ্য।' নাটকের নায়িকা সাধনার মধ্য দিয়া নাট্যকার এ-সব কথা বলিতে চাহিয়াছেন। সেজন্য চরিত্রটিতে ঘাতপ্রতিঘাতময় ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা নির্জীব তত্ত্বসর্বস্বতাই আসিয়া পড়িয়াছে। কাতিকের লাঠির আঘাতে তাহার আহত হইয়া পড়া নিতান্তই একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, ইহা লইয়া যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা একেবারেই অকারণ ও অতিশয়িত মনে হইয়াছে। নাটকের সমগ্র কাহিনীটি একই দৃশ্যপটে প্রায় অবিরাল ঘটিয়া গিয়াছে, মাঝে শুধু একবার যবনিকাপাতের দ্বারা সময়ের বিরতি বুঝান হইয়াছে।

॥ সবার উপরে মানুষ সত্য (১৯৫৬)॥ নাটকখানির কাহিনী অভিনব এবং ইহার চরিত্রগুলির আগমন ও কথাবার্তাও চমকপ্রদ। মিশরের উপর যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স আক্রমণ চালাইয়াছিল তখনকার মিশরী পরিবেশ অবলম্বনে ইহা রচিত। নায়ক সদানন্দ ও নায়িকা সুপ্রভা স্ফিন্‌ক্সের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন সুদূর অতীতে স্বপ্নযাত্রা করিল, তখন ইতিহাসের কয়েকজন প্রসিদ্ধ নায়কের ছায়ামূর্তির সঙ্গে তাহাদের দেখা ও নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল। পরিশেষে ইতিহাসের বহু ভাঙ্গাগড়া ও বর্তমান বিশ্বরাজনীতির হিংসাত্মক লীলার আলোচনার মধ্য দিয়া 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মানবনীতিই নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। সীজার, হানিবল, কনস্তান্তিন, সেন্ট পল, কার্ল মার্কস, ক্লিওপেত্রা ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি চরিত্রের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে লেখক যেন শ্রীচৈতন্যের মানবপ্রীতির পথকেই মুক্তির পথরূপে গ্রহণ করিলেন। চরিত্রগুলির মুখে ইতিহাস ও রাজনীতির খুঁটিনাটি ও অতিবিস্তৃত আলোচনা নাটকখানিকে বেশিমাত্রায় ভারাক্রান্ত করিয়াছে। বিশেষত সুপ্রভা-চরিত্রের সবজান্তা তার্কিক রূপটি অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হইয়াছে। যে-সব চরিত্রের সহিত মিশরের ইতিহাসের যোগ আছে তাহাদের আগমন ও কথোপকথন স্বাভাবিক ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। সীজার ও ক্লিওপেত্রার কথোপকথনের অংশ সেজন্য সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছে।

কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে মিশরের ইতিহাসের কোনো যোগ নাই, যেমন কার্ল মার্কস, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি—তাঁহাদিগকে শুধুমাত্র তত্ত্ব-প্রতিপাদনের জন্য আনয়ন করা, নাটকের পরিবেশের সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়াই মনে হইয়াছে।

॥ আর্তনাদ ও জয়নাদ ॥ নাট্যকার এই নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'দুটি ঘটনা থেকে যে মানসিক বেদনা আমি পাই, তাই আমাকে এই রচনার প্রেরণা যোগায়।' তার একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ও তার পরিণতি, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসমীয়াদের 'বঙ্গাল খেদার উদ্দামতা'। এই দুইটি ঘটনা মালিনী ও নলিনী এই দুই বোনের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। প্রথম ঘটনাটির প্রকাশ মালিনী চরিত্রে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটির বর্ণনা হইয়াছে নলিনী চরিত্র অবলম্বনে। অবশ্য ধর্মঘট ও তাহার পরিণতি মালিনী চরিত্রের নাট্যরূপায়ণে তেমন কোনো সুদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং দর্শকচিত্তেও কোনো গভীর আবেগ জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। নাটকের সব কিছু উৎকণ্ঠিত আবেগ ও মর্মভেদী বেদনা নলিনী চরিত্রকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। নলিনী চরিত্রের লাঞ্ছনার সহিত পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের হাতে তাহার মাতার অনুরূপ লাঞ্ছনার বর্ণনা পাশাপাশি করিয়া নাট্যকার ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকের একমাত্র নির্জীব ও অপরিস্ফুট চরিত্র হইল অপূর্ব। আলোচ্য নাটকখানিকে নিখুঁত একাঙ্ক নাটকরূপে গ্রহণ করা যায়। দৃশ্যপটের অনন্যতায়, চরিত্রের স্বল্পতায়, ঘটনার হ্রস্ববিস্তৃতিতে ও ঘনীভূত রসের আবেদনে ইহা সার্থক একাঙ্ক নাটক-পদবাচ্য হইয়াছে।

মন্মথ রায়

রবীন্দ্রোত্তর যুগে পৌরাণিক ও একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বর্তমান কালেও তাঁহার লেখনীকে অবিশ্রান্তভাবে চালনা করিয়া চলিয়াছেন। মঞ্চনাট্য, চিত্রনাট্য, বেতারনাট্য ও রেকর্ডনাট্য—সর্বপ্রকার নাট্যরচনাতেই তিনি তাঁহার নাট্যপ্রতিভাকে নিয়োগ করিয়াছেন। বাংলা নাট্যজগতের অবিসংবাদিত নেতার আসনে বর্তমানে তিনিই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মিক যোগ রাখিয়া তিনি তাঁহার নাটকে প্রগতিমূলক চিন্তা ও আদর্শের পরিচয় রাখিয়া চলিয়াছেন। কৃষক, শ্রমিক, অবজ্ঞাত উপজাতীয় লোক প্রভৃতি তাঁহার বহু নাটকে এখন প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। বর্তমান সমাজের বিষময় ব্যাধিগুলি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। মহাজন, জমিদার, মিলমালিক,

অসাধু ব্যবসায়ী প্রভৃতির অমানুষী শোষণ ও নির্মম প্রবঞ্চনা প্রকাশ করিবার সময় তাঁহার তিক্ততা ও বিতৃষ্ণা তিনি গোপন রাখেন নাই। অবশ্য কেবলমাত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভই যে তিনি জানাইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার গঠনমূলক, সমাজ কল্যাণময় দৃষ্টি অনেক নাটকের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। তিনি কখনও আঘাতে কঠোর, কখনও বা ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক—সমাজের পরিপূর্ণ মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

॥ জীবনটাই নাটক (১৯৫২) ॥ শিল্পী জীবনের আনন্দকে রূপে রসে অনবদ্য করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, আমরা সেই আনন্দলাভ করিয়া মুগ্ধ হই, ক্ষণকালের জন্য শিল্পীকে বাহবা দিয়া আমাদের কর্তব্য শেষ করি। শুধু তাহাই নহে, আনন্দের মত্তভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাবী ও চাহিদাও অনন্তমাত্রায় বাড়িয়া যায়, নিত্যনূতন পানপাত্রে নূতন নূতন পানীয় না হইলে আমাদের ক্ষোভ ও নালিশের আর অন্ত থাকে না। অথচ আমাদের করতালি সম্বর্ধিত রঙ্গভূমির অন্তরালে আমাদের লুব্ধ কামনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দুঃসহ বেদনা সহিয়া শিল্পীকে যে প্রাণান্তকর সাধনা করিয়া যাইতে হয় তাহার খবর কে রাখে? অথচ তাহারাও মানুষ। মানুষের কামনা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ তাহাদের জীবনেও আছে। মঞ্চশিল্পীর সেই নেপথ্যবর্তী জীবনের হাস্য-করুণ দিকটি আলোচ্য নাটকের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চের অন্তরালে শিল্পীদের যে দারিদ্র্য ও মালিন্যপীড়িত বাস্তব জীবন-লীলা চলিতে থাকে তাহাই সহানুভূতির রসে আলোচ্য নাটকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। মঞ্চের প্রয়োজনে তাহাদিগকে যে কতখানি সাংসারিক ক্ষতি ও বিপর্যয় সহ্য করিতে হয় তাহারও পরিচয় নাটকখানির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। নাটকের মধ্যে শিল্পীদের অভিনেতৃজীবন ও বাস্তব জীবনের দুই রূপ পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কিন্তু অভিনেতৃজীবনের পৌরাণিক অংশটুকু অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করাতে একটা স্বতন্ত্র নাট্যরসের সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে দর্শকের চিত্তও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পৌরাণিক অংশটিকে যদি আধার কিংবা পটভূমি করিয়া তাহার মধ্য দিয়া শিল্পীর আসল জীবনের ইঙ্গিতগুলি প্রধান করিয়া তোলা হইত তাহা হইলে নাটকখানি বোধ হয় আরও সার্থক হইত।

॥ মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২) ॥ নাটকখানির প্রথম অঙ্কে যে কৌতুক-রসঘন ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে তাহার রসপরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে কুটিল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারে ও মহাপ্রাণ চরিত্র দীনদয়ালের

দুঃখভোগে নাটকের ঘটনা অতিমাত্রায় গ্লানিজনক ও করুণরসাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। জয়ন্তের পক্ষে বন্ধুদের সহযোগে সরল ও উদারচেতা পিতাকে প্রতারণা করা অন্যায় হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনেত্রী জয়াকে স্ত্রী সাজাইয়া পিতার সম্মুখে তাহারা যে অভিনয় করিয়াছে, তাহার তরল হাস্যরসে নাটকখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মদনপুরে ভুজংগের নিষ্ঠুর চক্রান্ত ও দীনদয়ালের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম মস্তিষ্কবিকৃতির মধ্য দিয়া ঘটনার যে জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নাটকের উপস্থাপনা অংশের সহিত সঙ্গতিহীন ও অতিরঞ্জিত মনে হইয়াছে। মমতাময়ী হাসপাতালের সর্বময় কর্তা দীনদয়াল ভুজংগের স্বার্থান্ধ ও বিষময় ক্রিয়াকলাপের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন, ইহা যেন একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। তাজমহল লইয়া দীনদয়ালের অতখানি ক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসও অকারণ ও অতিনাটকীয় বলিয়াই মনে হয়।

॥ পথে-বিপথে (১৯৫২)॥ আলোচ্য নাটকে নাট্যকার বর্তমান সমাজের এক নারকীয় রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। সমাজের জালজুয়াচুরি, নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা ও বীভৎস নরহত্যার ভয়াবহ চিত্র তিনি দুঃসহ বাস্তবতার মধ্য দিয়া উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আনন্দম ক্লাবের নামকরণের মধ্যেই তাঁহার কি মর্মান্তিক শ্লেষই না ব্যক্ত হইয়াছে! মানুষের সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে হরণ করিয়া লওয়াই তো এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দের একমাত্র ব্রত। অথচ বাহিরে আমোদ-প্রমোদ, সৌজন্য ও শিষ্টতার এক একটি প্রতিমূর্তি প্রত্যেকটি সভ্য। লেখক বর্তমান সমাজের ইমারতটি যথার্থভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন—বাহিরে চুনকামের পালশকরা আবরণটি একটু খসাইলেই ভিতরের কুৎসিত বীভৎসতার হিংস্র দাঁতগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। এই নাটকে রমা ও ছবি এই দুইটি নারীচরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্রই সুস্থ ও শুভ নহে। আনন্দমের সভ্যগণের তো কথাই নাই, তাহারা ছাড়াও আছে ভেজালের অসাধু কারবারী মহিম, জুয়াচোর ঘটককুলচূড়ামণি প্রজাপতি সাত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নৃশংস পাষণ্ড বোধ হয় নায়ক স্বয়ং। সে রেষ্টুরেণ্টের মালিককে ঠকাইয়াছে, প্রজাপতির জামাকাপড় চুরি করিয়াছে, বিরাট ধাপ্পা দিয়া মহিমের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, স্ত্রীর সহিত অমানুষী প্রবঞ্চনা করিয়াছে, জঘন্য নিষ্ঠুরতার সহিত নিজের অসহায় স্ত্রীর মৃত্যু ঘটাইয়াছে, এবং দুইটি পতিপরায়ণা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হইয়াও পুনরায় তৃতীয় এক নারীর প্রতি নির্লজ্জ অনুরাগ দেখাইয়াছে। এই সর্বময় অমানুষিকতার মধ্যে রমা ও ছবি আমাদের অশ্রুসিক্ত সমবেদনা অধিকার

করিয়া বসে। রমা তাহার নীরব সহিষ্ণুতা ও দারিদ্র্যভোগের দ্বারা এবং নিরীহ বোবা মেয়ে ছবি তাহার নির্বাক প্রেমের নিষ্ঠা দ্বারা আমাদের অন্তরে সতত বিরাজমান থাকে। ইহারাই যখন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের সুতীক্ষ্ণ দংশনের নিতান্ত অসহায়-ভাবে মৃত্যু বরণ করিল তখন একরূপ বেদনার আঘাতে আমাদের অন্তর স্তব্ধ হইয়া যায়। নাটকের মধ্যে ঘটনার একটু বাহুল্য থাকিলেও ইহার ঘনীভূত রহস্য এবং চরিত্রগুলির বিচিত্র ও ভয়াবহ কার্যকলাপ দর্শকদের চিত্তে এক শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা জাগাইয়া রাখে।

॥ ধর্মঘট (১৯৫৩)॥ মালিক ও শ্রমিকের সংঘাত অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। শ্রমিকদের সংঘশক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য মালিকরা কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধাইয়া দেন তাহাই নাট্যকাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য পরিশেষে মালিকদের চক্রান্ত সব ধরা পড়িয়া গেল এবং ধর্মঘটের দাবীতে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধ শুধু মালিকদেরই সৃষ্টি, এ-মতবাদ বোধ হয় সর্বত্র বাস্তব ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ঘটনাসৃষ্টিতে নাট্যকার চমৎকারভাবে নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

॥ চাষীর প্রেম (১৯৫৩)॥ বাংলার পল্লীবাসী কৃষকজীবনের চিত্র এই নাটকের মধ্যে অতি সার্থকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষকজীবনের বিভিন্ন সমস্যা—জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ, নিত্যকার অভাবের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম এই নাটকে সমবেদনাসিক্ত লেখনীর মুখে অভ্রান্তভাবে ধরা প'ড়য়াছে। অবশ্য কৃষক নরনারীর অন্ধকারভরা জীবনের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার ঝিলিক দেখা যায় তাহার পরিচয়ও নাটকে পাওয়া গেল। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে আনন্দের চঞ্চলতা জাগে যখন বহু-আকাঙ্ক্ষিত মেলা আসিয়া উপস্থিত হয়, আমোদ প্রমোদ, নাচগান খুব একচোট চলিতে থাকে। কৃষক নরনারীর জীবন বহু অপমানে ও আঘাতে লাঞ্ছিত হইলেও স্নেহপ্রেমের সম্পদে তাহারা যে কাহারও অপেক্ষা দরিদ্র নহে নাট্যকার তাহাই বলিয়াছেন। নাটকের মধ্যে একমাত্র দুর্বল অংশ হইল অর্জুন ও রতনবাঈয়ের বৃত্তান্ত। উভয়ের সম্বন্ধ—প্রণয়-অভিমান-ঈর্ষা-বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই বলিয়া রতনবাঈয়ের সামান্য একটু অপমানজনক কথাতেই অর্জুনের পক্ষে তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা অস্বাভাবিক ও অতিনাটকীয় হইয়াছে।

॥ বন্দিতা (১৯৫৩)॥ সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা দেখাইবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আলোচ্য নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য যেন নাটকের মধ্যে

আরোপিত হইয়াছে, ইহার ফলে নাটকের কোনো অনিবার্য সংঘাত ও সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। নাটকের মূল রস নীরব লাঞ্ছনাভোগী বন্দিতার জীবনরহস্যকে কেন্দ্র করিয়াই জমিয়া উঠিয়াছে। এক বঞ্চিতা নারী কিভাবে নিজের মাতৃত্বের অধিকার বিসর্জন দিয়া নিজের কন্যাকে লালন করিয়াছে, সেই কন্যারই অকারণ ঈর্ষা ও সন্দেহের মর্মান্তিক আঘাত সে কিরূপ নিরুপায়ভাবে সহ্য করিয়াছে তাহারই বর্ণনার মধ্যে'এই নাটকের সব বেদনা, সব রস সঞ্চিত হইয়া আছে।

॥ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮)॥ সাম্প্রতিককালে মন্মথ রায় দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, যথা, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'অমৃত অতীত'। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জাতীয় ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকের ধারা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন যে দুই একখানা ঐতিহাসিক নাটক লেখা হইতেছে তাহাতে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের অভ্যুত্থানের রূপ প্রধান হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় আবেগ অপেক্ষা শ্রেণীচেতনাই এই ধরনের ঐতিহাসিক নাটকে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিতেছে। বুঝিতে পারা যায়, বর্তমান যুগের গণবিদ্রোহের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকও সংযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মন্মথ রায়ের ঐতিহাসিক নাটকেও এই গণবিদ্রোহের সুরই প্রাধান্য পাইয়াছে।

১৮৫৪ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ অবলম্বনে আলোচ্য নাটকখানি রচিত হইয়াছে। মহাজন, ঠিকাদার, জমিদার প্রভৃতির অমানুষিক অত্যাচার দরিদ্র ও অসহায় সাঁওতালদিগকে কিভাবে বিদ্রোহী ও সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিল তাহার নিখুঁত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে নাটকের মধ্যে। বিদ্রোহের আয়োজন, বহুবিস্তৃত বিদ্রোহের প্রবল সংগ্রামশীল রূপ, মুক্তিলাভের জন্য সাহসী সাঁওতালদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ প্রভৃতির অতিবাস্তব চিত্র নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকের ঘটনা প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে দর্শকচিত্তে তীব্র আবেগ ও উৎকণ্ঠা সঞ্চার করিয়াছে। মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে নাটকের কাহিনী সীমাবদ্ধ হইবার ফলে দৃশ্যগুলির দীর্ঘবিস্তৃত পরিসরে নাট্যরস অবিচ্ছিন্ন ও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি চরিত্র শুধু একটু অস্পষ্ট ও অস্ফুট মনে হয়। সাঁওতালদের সম্বন্ধে মাণিকের দরদ কতখানি গভীর ও অকৃত্রিম সে সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে একটা সংশয় থাকিয়া যায়। ভৈরব সম্বন্ধে রাধার প্রকৃত হৃদয়ভাব কিরূপ ছিল তাহাও স্পষ্ট নহে। সে ভৈরবকে যথার্থই ভালবাসিত, না মাণিকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভালবাসার অভিনয় করিয়াছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

॥ অমৃত অতীত (১৯৬০)॥ অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায় হইতে বাংলা-

দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অত্যাচারপীড়িত প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে গৌড় বঙ্গের রাজারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেই আলোচ্য নাটকখানি রচিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহাকে ঐতিহাসিক নাটকরূপে স্বীকৃতি জানাইতে গিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'যে উপন্যাস বা নাটক কোন সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং যাহার মধ্যে এমন কোনো কাল্পনিক দৃশ্য নাই যাহা প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য।' এই মন্তব্য অনুসারে বিচার করিলে নাটকের মধ্যে উল্লিখিত কতকগুলি বিষয় অষ্টম শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতিহান বলিয়াই মনে হইবে। ধর্মঘট, সহ-অবস্থান নীতি, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল প্রভৃতি আধুনিক প্রসঙ্গ এই নাটকে থাকায় গুরুতর কালানৌচিত্যদোষ ঘটিয়াছে। তরল, বিদ্রূপাত্মক সংলাপও ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে। নাটকের প্রকৃত নাম বোধ হয় অ-মৃত অতীত—যে অতীত মরে নাই, যাহার মাৎস্যন্যায় বর্তমান সমাজের মধ্যেও সর্বব্যাপী আকারে দেখা গিয়াছে। কিন্তু হায়রে, আজিকার গোপালদেব কোথায়!

॥ বন্যা ॥ দামোদরের মহাপ্লাবী বন্যা যখন আসে, তখন মানুষের ঘরবাড়ি সংসার সব খড়কুটার মত ভাসিয়া যায়, মাটির সব চিহ্ন সর্বগ্রাসী জলের তলে বিলুপ্ত হয়। এই রকম একটি বন্যার পরিবেশে নাটকের ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি। বন্যার দিগন্তবিস্তারী জলরাশির মধ্যে দ্বীপের মত জাগিয়া রহিয়াছে একটি স্কুলবাড়ি। সেই স্কুলবাড়িতে কয়েকজন বন্যার্ত নরনারী আশ্রয় লাভ করে। সমাজের বিচিত্র অংশ হইতে তাহারা আসিয়াছে, তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতি, ব্যবহার-আচরণ বহু ও বিভিন্ন, কিন্তু বন্যার আক্রমণে তাহারা আজ সকলে একই স্থানে একই ভাগ্যের সূত্রে আবদ্ধ। চারপাশের ক্ষুধিত জলরাশি শত লক্ষ বাহু বেষ্টন করিয়া জীবনস্পন্দিত মৃত্তিকার শেষে চিহ্নটুকু ছিনাইয়া লইতে ব্যগ্র, কিন্তু তখনও স্কুলবাড়ির নবাগত মানুষগুলি জীবনের নিতান্ত ছোটখাট বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে স্নেহ ও বিদ্বেষের বাষ্প ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। নাট্যকার জীবনের পুণ্য ও পাপ, আলো ও অন্ধকারের অদ্ভুত সহাবস্থানের চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। একদিকে যেমন দারোগা ও ডাকাতের মত নীচ ও ভয়ঙ্কর চরিত্র রহিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে পরহিতব্রতী হেডমাস্টার ও করুণাময়ী মা-লক্ষ্মী রহিয়াছেন। আরো আছে এমন সব চরিত্র যাহারা একটু অদ্ভুত,

জটিল ও রহস্যাবৃত, যথা জজসাহেব, মহাজন, গায়েন, গায়েন-বৌ ইত্যাদি। তবে নাটকটিতে ছোট ছোট ঘটনার আবর্ত রহিয়াছে, কিন্তু একটি মূল ধারার তীব্র বেগময় গতি ও তাহার অনিবার্য পরিণতি আমরা দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য নাটকের সংলাপের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই। সংলাপ অনুচিতভাবে হাল্কা ও তরল হইয়া পড়িয়াছে।

সলিল সেন

সলিল সেন আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকারদের অন্যতম। অল্প বয়সেই জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের দুর্লভ সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। সেইসব অভিজ্ঞতা উপন্যাসের মত অলীক ও নাটকের মতই চমকপ্রদ মনে হয়। তিনি সুস্থিত পরিবেশের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনযাত্রা চির অশান্ত ও অনিশ্চিত—বাধা ও বিপত্তির কণ্টকিত পথে তাহা নিত্য প্রসারিত। মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন বাহিরের মানুষকে—তাহার স্বভাব, আচরণ ও কথার মধ্য দিয়া, আবার দেখিয়াছেন ভিতরের মানুষকে—তাহার আশা ও স্বপ্ন, বেদনা ও কাতরতাকে। পূর্ববঙ্গের স্নেহকোমলা মাটিতে, সুন্দরবনের অরণ্যঘেরা অঞ্চলে ও মুর্শিদাবাদের দুঃখপীড়িত গ্রামে কত বিভিন্ন স্থানেই না তাঁহার নাটক পরিক্রমণ করিয়াছে। রাজনীতির মত ও পথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু কোন মত ও পথই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি চিরকাল জীবনেরই সহযাত্রী যে জীবন সত্য, প্রত্যক্ষ, ঘটনায় সরস ও ঘাতপ্রতিঘাতে প্রাণবন্ত। কাহিনীগঠন ও বিন্যাসের অপূর্ব কৌশল তাঁহার আয়ত্ত। সেজন্য তাঁহার নাটক দেখিবার সময় মনোযোগ ও আকর্ষণ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। কাহিনীর আকর্ষণীয়তা ও ঘনীভূত জীবনরসের জন্য তাঁহার নাটকগুলি পেশাদার ও অপেশাদার মঞ্চে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

॥ নতুন ইহুদী (১৯৫৩)॥ রাজনীতির উপরতলায় দেনাপাওনার দরকষাকষি চলে, কালির আঁচড়ে চুক্তির সাক্ষ্য থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই কালির আঁচড় যে নীচেকার লোকগুলির হৃদয়ে রক্তের রেখা হইয়া উঠে তাহা প্রতিমুহূর্তেই তাহারা বিক্ষত জীবনের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকে। স্বাধীনতার রথ আসিল বটে; কিন্তু তাহা দেশের মাটিকে দুইভাগ করিয়া আমাদের মিলিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুঁড়াইয়া দিয়া এক অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের

দিকে আমাদের সুস্থিত সংসারগুলিকে নিক্ষেপ করিল। ছিন্নমূল নর-নারীরা মাটির মায়া ত্যাগ করিল কিন্তু পুনরায় স্বাধীন মাটির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিল না। তাহাদের সংসার ছিন্ন হইল, মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইল, জীবনের সর্বপ্রকার আশা-ভরসা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই ভাগ্যহীন উদ্বাস্তু জীবনের এক নিদারুণ বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে আলোচ্য নাটকটিতে। একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার এবং তাহারই সহিত স্নেহ-সম্পর্কিত একটি নমঃশূদ্র কৃষক পরিবারের কাহিনী নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই সুখে-শান্তিতে অবস্থিত একটি গ্রাম্য নীড় হিংস্র কুটিল ঝটিকার মুখে পড়িয়া কিভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল তাহারই মর্মান্তিক বর্ণনা রহিয়াছে নাটকটির মধ্যে। ইহাতে একদিকে শাণিত ও মার্জিত নাগরিক সমাজের কুশ্রী ও কদর্য রূপ যেমন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কি ভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে পারে তাহার অতি ক্লেশকর পরিচয় দেখান হইয়াছে। পণ্ডিতের পরিবার ধ্বংস হইল—দুইখ্যা মরিল, পরী গৃহত্যাগিনী হইল, স্বয়ং পণ্ডিত মরিল, পণ্ডিতের স্ত্রী বাঁচিয়াও মরিয়া রহিল। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্য দিয়া একটি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ হাহাকার করিয়া উঠে—এই প্রতিবাদ নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, এই প্রতিবাদ হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

॥ মৌচোর (১৯৫৭) ॥ সলিল সেনের সুপ্রশংসিত নাটক 'মৌচোর' সুন্দরবন হইতে মধুসংগ্রহের একটি অভিনব কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সংসারে মধুর বড় প্রয়োজন। সেই মধু আনিতে যায় রতন, ধর্মদাস ও গোরাচাঁদ; বংশী বাউলীর মত কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরার্থব্রতী নেতা চিরকাল সেই মধুসংগ্রহের পথ দেখাইয়াছে কিন্তু সেই মধু চুরি করিয়া লইবার জন্য আছে অর্থপিশাচ মহাজন, নীচ লোভী সরকারী কর্মচারী। তাহারা মধুর পরিবর্তে সংসারে শুধু বিষই ঢালিয়া চলে। কিন্তু তবুও সংসারে মধু ফুরায় না, মধুব্রতী মানুষেরও পরাজয় হয় না। রতন পদ্মমধু আনে ময়নার জন্য, ধর্মদাস থালা কিনিতে পারে একখানা বৌয়ের জন্য, আর গোরাচাঁদও হয়তো ছেলের জন্য একটা বাঁশি কিনিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এই মধুসংগ্রহের জন্য বংশী বাউলীকে কঠিন মূল্য দিতে হয়, কিন্তু যুগে যুগে এই বংশী বাউলীরাই তো সংসারের সব বিষ গলাধঃকরণ করিয়া ইহাকে মধুময় করিয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সেখানকার ভয় ও রহস্যমিশ্রিত

আরণ্য জীবন, সমাজের বহুতর অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার, মানুষের লোভ ও নীচতা, মধুসংগ্রহের জন্য রোমাঞ্চকর অভিযান প্রভৃতি নাটকের মধ্যে অতি নিখুঁতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নাটকের কাহিনীটি ইহার সমস্যাজটিল কৌতূহলোদ্দীপকতা ও অভিনব চমৎকারিত্বের জন্য দর্শকের চিত্তকে এক অনিবার্য আকর্ষণে ধরিয়া রাখে। নাটকের দৃশ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হওয়াতে প্রত্যেকটি দৃশ্য আবর্ত ও সংঘাতে যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনার আকস্মিকতা, তীব্র দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি রচনা, এবং সুগভীর করুণ রসের সহিত প্রচ্ছন্ন কৌতুকরসের কুশলী প্রয়োগের ফলে দর্শকচিত্ত এক অবিচ্ছিন্ন আগ্রহ ও উত্তেজনা লইয়া নাটকের রসে মগ্ন হইয়া থাকে। অবশ্য জায়গায় জায়গায় যে ইহার দুর্বলতা নাই তাহা নহে। অতি-নাটকীয়তা ও আবেগোচ্ছ্বাসের আতিশয্য ইহার সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক আবেদন কোন কোন স্থানে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বংশী বাউলীর হাত হইতে সনাতনের টাকা ছিনাইযা লওয়ার পরিস্থিতি একটু অবিশ্বাস্য মনে হয়। সনাতনকে খুন করিয়া রক্তাক্ত দেহে বংশী বাউলীর আগমন অতিমাত্রায় রোমাঞ্চকর হইয়াছে, রতন ও ময়নার উচ্ছ্বসিত উক্তিগুলিব মধ্যেও রোমান্টিকতার আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। সংলাপের বাস্তবতা, অকৃত্রিম সংঘাত, সঙ্কট ও প্রবল হৃদয়বৃত্তির মধ্য দিয়া চরিত্রগুলি অতিশয় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইল বংশী বাউলী। মাঝে মাঝে সে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এবং অত্যাচারীর শাস্তি দিবার জন্য আরণ্যক ভীষণতা দেখায় বটে, কিন্তু তাহার মত বিশ্বস্ত, স্নেহশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ লোক সভ্য সমাজের মধ্যে আমরা কয়জনকে দেখিয়াছি?

॥ ডাউন ট্রেন (১৯৫৯) ॥ ডাউন ট্রেন গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কৃত এবং পেশাদার ও অপেশাদার রঙ্গমঞ্চে বহু-সম্বর্ধিত নাটক। কঠোর কর্তব্যবোধ আর অভাবগ্রস্ত পরিবারের অপরিহার্য দাবী - এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে একজন স্টেশনমাস্টারের জীবন কি শোচনীয় পরিণতি বরণ করিয়া লইল তাহারই কাহিনী আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হইযাছে। আজকাল মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও অসাধুতা যখন সমাজের নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সত্যভূষণের মত সৎ, সুজন ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্টেশনমাস্টার আমাদের সবিস্ময় শ্রদ্ধা উদ্রেক করে; সেই স্টেশনমাস্টার যখন কুড়ি হাজার টাকা আত্মসাৎ করিতে প্রলুব্ধ হইয়া নিজের পুত্রকেই হত্যা

করিয়া বসিল তখন গভীর সমবেদনায় আমাদের অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া যায়। যে দারিদ্র্য ও পারিবারিক সঙ্কটের ফলে এমন একজন মহৎ লোকের এরূপ অমানুষী অধঃপতন হইতে পারে তাহা আমাদের মনে নানা প্রশ্ন ও প্রতিবাদ জাগ্রত করে।

নাটকের ঘটনা নিঃসন্দেহে অতিশয় শোকাবহ, কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে কারণপরম্পরায় শৃঙ্খলা ও অনিবার্যতা কতখানি আছে তাহা একটু বিচার করা যাইতে পারে। সত্যভূষণ যদি শুধু এক আকস্মিক ভুলের ফলেই পুত্রকে হত্যা করিয়া ফেলিত তাহা হইলে ঘটনাটি ট্র্যাজিক হইত না, কিন্তু তাহার ভুলের পিছনে অন্যকে হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল এবং অদৃশ্য নিয়তির চক্রান্তে সেই ইচ্ছা যখন অজ্ঞাতসারে নিজের প্রিয়তম পুত্রের উপরেই প্রযুক্ত হইল তখনই তাহার ভুল ট্র্যাজিক দুঃখের গুরুত্ব লাভ করিল। আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—সত্যভূষণের মত ধর্মনিষ্ঠ লোক যে কুড়ি হাজার টাকা গ্রাস করিতে চাহিবে তাহার পিছনে প্রবল অনিবার্য কারণ ছিল কি? অবশ্য স্ত্রী, নরেন পাল, এবং সর্বশেষে নিজের পুত্রের সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া সে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে টাকার দাবী সর্বাপেক্ষা বড় এবং সাধুতার মূল্য খুব বেশি নহে। কিন্তু তবুও বলিব, এই রকম একজন লোকের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য সময়ের যে বিস্তৃতি এবং বহির্ঘটনার যে উপর্যুপরি আঘাত নাটকের মধ্যে দেখানো প্রয়োজন সেগুলি দেখানো হয় নাই। আরও একটি সন্দেহ মনের মধ্যে আসে—নরেন পালকে খুন করিবার পক্ষে কি অনিবার্য কারণ থাকিতে পারে? সত্যভূষণের পক্ষে টাকাটারই প্রয়োজন ছিল এবং তাহার কাছে গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিয়া সে সব অস্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু খুন করিবার নারকীয় ইচ্ছা তাহার মত লোকের মনে আসা একান্ত অস্বাভাবিক। খুন করিয়া সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহার সুপরিকল্পিত ও সুচারুভাবে সম্পন্ন কাজগুলিও তাহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন। আর সত্যভূষণ নিজের ছেলেকে গলা টিপিয়া মারিল, চটে মুড়িয়া লাস পুঁতিয়া আসিল অথচ নিজের ছেলে বলিয়া চিনিতেই পারিল না, ইহাও অবিশ্বাস্য মনে হয়।

॥ দিশারী (১৯৫৯)॥ সমাজকল্যাণমূলক আদর্শ লইয়া আলোচ্য নাটকখানি রচিত। বেহিসাবী সাংসারিক লোক অবশেষে কিরূপ সঙ্কটের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে ইহার মধ্যে। কিন্তু নাটকে শুধু সঙ্কট নহে, সঙ্কটত্রাণের পথও দেখানো হইয়াছে। ভুয়া মর্যাদাবোধের মোহ হইতে মুক্তিলাভ

করিলে স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ের মধ্য দিয়াও কিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় তাহার ইঙ্গিতও ইহাতে রহিয়াছে। নাটকের প্রচারিত আদর্শ খুবই ভালো, কিন্তু তবুও ইহা বলিতে হয় যে, এই আদর্শমূলকতার জন্য নাটকের স্বাধীন সত্তা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন অভাব ও ধান্দাজড়িত জীবনের যে চিত্র ইহাতে ফুটিয়াছে তাহা একেবারে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

॥ দর্পণ (১৯৬০)॥ নাট্যকার এই নাটকের পূর্বাভাসে বলিয়াছেন, 'মিছিলনগরী কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু মিছিল, বহু গণ-বিক্ষোভের ইতিহাস।...কিছুতেই মন থেকে বিদূরিত হচ্ছিল না শহীদ শিশিব মণ্ডল আর নাম-না-জানা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গ্রাম্য তরুণটি যে অজ্ঞাত শহীদের সনাক্তকরণ তখনও হয়নি। সেই সাময়িককালে মনের মধ্যে ভেসে উঠতো আরও একটা পরিচিত দৃশ্যপট—মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গণ্ডগ্রাম।'

কলিকাতার অজ্ঞাত পরিচয় তরুণটির আত্মত্যাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলাব গণ্ডগ্রামের ঘটনা, এই দুই ঘটনাকে মিলিত করিয়া নাট্যকাব তাঁহাব কাহিনী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতার পথে তরুণটিব আত্মত্যাগের ঘটনা নাটকেব মধ্যে কোনও দৃশ্যরূপ পায় নাই, ইহা বিবৃত হইযাছে মাত্র। এই ঘটনাটিকে খুব অনিবার্য ও নাটকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যও মনে হয না। তবে গ্রামের ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হইযাছে। গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামের লোকদের সহিত নাট্যকারের পবিচয় কত ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিকতাপূর্ণ তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পুনরায় এই নাটকেব মধ্যে পাওযা গেল। রেশান-লাইসেন্স-পারমিটের হাঙ্গামা, সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাব আতঙ্ক, সবকাবী লাইনেব নিষ্ঠুব নাগপাশ—এ-সবের দ্বারা গ্রামেব অতি সাধাবণ দুর্দশাকবলিত জনগণ কিরূপ বিপর্যয়েব সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাব চিত্র সহানুভূতির বসে সিক্ত হইয়া নাটকেব মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সব মানুষেব বাঁচা ও মরা কখনও সংবাদ হইয়া উঠে না, রাজনীতিব দাবাখেলায় মত্ত ক্ষমতাশালী লোকেরা যাহাদের প্রতি চিরকাল অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া চলে, তাহাদের কথা—সেই দোকানদার, চাষী, শিক্ষক ও ডাকহরকরার কথাই আমরা এই নাটকে শুনিতে পাইলাম।

॥ স্বীকৃতি (১৩৭১)॥ স্নেহপ্রীতিভবা একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের কাহিনী এখনও যে দর্শকসমাজকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, 'স্বীকৃতি' নাটকের জনপ্রিয়তা হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নাটকের পারিবারিক রূপটি অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের মত। এখানেও তিন ভাই ও দুই বৌ এবং

এই নাটকের শান্তি চরিত্রটিও প্রফুল্ল চরিত্রের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। এই নাটকের প্রথমাংশে স্নেহপ্রীতি ও মধুর মান-অভিমানের যে চিত্র রহিয়াছে তাহা খুবই স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু নাটকের জটিলতা ও পারস্পরিক বিরোধের অবতারণা যেখান হইতে শুরু হইয়াছে সেখান হইতে নাটকটি দুর্বল ও কষ্টকল্পিত হইয়া পড়িয়াছে। যে শান্তির নিকট হইতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সত্যেন হাজার হাজার টাকা লইয়াছে, তাহাকেই অপমান করিয়া তাহার করুণ মিনতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অমর্যাদাজনক কাজ করিতে সে বাহির হইয়া গেল, ইহা চরম নৃশংসতা ছাড়া আর কিছুই নহে। শান্তির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং স্টেশনে আকস্মিকভাবে সমরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়া সব কিছুই অতি-নাটকীয় মনে হয়। সমরেন্দ্র চরিত্রও সুস্পষ্ট ও সুবিকশিত নহে। তিনি বিরাট শিল্পপতি, প্রচুর ধনদৌলতের মালিক কিন্তু অজিতের সব ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়াও তিনি তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম কেন? তাঁহার মত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকের পক্ষে নিতান্ত অন্যায়ভাবে অজিতের পক্ষ সমর্থন করিয়া সুভাষ প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করা যেমন অদ্ভুত মনে হয়, তেমনি অদ্ভুত মনে হয় যখন দেখি, অজিতের ঘোর অপরাধের কোন প্রতিবিধান না করিয়া ক্লীবের মত তিনি নিজের বাড়িঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছেন। নাটকের এ-সব অসঙ্গতিসত্ত্বেও ভালো লাগে—যখন দেখি, আমাদের পারিবারিক জীবনের মাধুর্য একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজকের দিনে স্নেহপ্রীতি, কর্তব্য ও আত্মত্যাগের আদর্শ যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে, তখন সুভাষের মত বলিষ্ঠ ভ্রাতা, শান্তির মত পতিব্রতা বধূ এবং সতীর মত স্নেহশীলা গৃহিণীকে দেখিলে জীবন সম্বন্ধে পুনরায় আশা ও উৎসাহ জাগ্রত হয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

॥ ক্ষুধা (১৯৫৭) ॥ সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক মঞ্চসফল নাটক হইল 'ক্ষুধা'। নাটকখানি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে একটানা অভিনয়ের সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা, নিত্যকার সংগ্রামের ফলে তিল তিল করিয়া তাহার অবলুপ্তি—এই বিষয়গুলি যথাযথরূপে নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইবার ফলে দর্শকদের হৃদয়ে ইহার আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত। হাসিকান্নার মিশ্রিত জীবনরূপ এই নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। কান্নার স্রোতের উপর হাসির আলোর ঝলকানির ফলে বিষাদময় জীবনের যে উপভোগ্যতা বাড়িয়া যায় তাহার পরিচয় এখানে পাওয়া গিয়াছে। বাঙালী-হৃদয় নিঃসৃত মাধুর্য—স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতি—যেগুলি আমাদের শতপ্রকার দুঃখবিড়ম্বনার মরুদাহের মধ্যে স্নিগ্ধশীতল

জীবনরসের আশ্বাস দিতেছে, সেগুলি এই নাটকের ঘটনাপ্রবাহকেও দর্শকদের কাছে পরম আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। জগৎ চৌধুরীর পরিবারকে লইয়া একটি ধারা এবং সদা-গজা-রমা এই তিন বন্ধুকে লইয়া আর একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম কাহিনীর ধারার মধ্যে বর্তমান অভাবপীড়িত পারিবারিক জীবনের একটি সত্য চিত্র পাওয়া যায়। জগৎ, প্রভা, মানবী প্রভৃতি চরিত্রের জীবনক্ষয়ী সংগ্রাম এবং নীরব দুঃখভোগ গভীর ও অকৃত্রিম করুণরসে অভিষিক্ত হইয়াছে। কিন্তু সদা-গজা-রমা এই তিনটি ভবঘুরে, বাক্‌সর্বস্ব চরিত্রের দুঃখ অনেক স্থানেই কৃত্রিম ও কারণহীন আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুঃখের যথার্থ ভিত্তি অপেক্ষা দুঃখের বাহ্য বিলাসই বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তরল ও কৌতুকজনক কথা ও আচরণ দর্শকদের যথেষ্ট হাসাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই ধরনের কথা ও আচরণের ফলেই তাহাদের চরিত্রে কখনও কোনো গভীর গুরুত্ব ও দুঃখময় গাম্ভীর্য আসে নাই। নাটকের প্রথমার্ধে কৌতুকরসের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়ার্ধে করুণ রসের। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের কাহিনীর মধ্যে অনেক স্থলেই দুর্বল গ্রন্থি দেখা যায়। রমার হঠাৎ একেবারে উচ্চতম ক্ষমতাপ্রাপ্তিকে যেমন নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে হয়, তেমনি নিতান্ত সামান্য কারণে তাহার ক্ষমতাচ্যুতিও কষ্টকল্পিত বলিয়া দর্শকের ধারণা হয়। শ্যামলাল কি তবে রমার সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাহাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন? রমা গৃহত্যাগের পর মানবীকে ভোলে নাই, তাহার চরিত্রেরও কোন আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয় নাই, অথচ সে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার পুরাতন স্নেহসম্পর্কিত লোকদের কাছে আসিল না, তাহাদের কোন সাহায্য করিল না, এমন কি তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারিল না, ইহাও অবিশ্বাস্য মনে হয়। রমার বহু-আকাঙ্ক্ষিত পত্র মানবী না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিল, রমার কোন কথা না শুনিয়াই সে রমার প্রতি অভিমানবশত এতখানি অবিচার করিয়া বসিল, ইহাও মানবীচরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক হইয়াছে। অথচ পত্রখানা পড়িলে নাটক সেখানেই শেষ হইয়া যাইত, পরবর্তী দুঃখময় জটিলতার আর অবকাশ থাকিত না। সব ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের পর বহু দুঃখভোগের অবসানে রমা ও মানবীর মিলনই নাটকের অনিবার্য পরিণতি ছিল। তাহাতে নাটকখানি প্রহসন হইত না, কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবেই করুণরসাত্মক।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ রাজকন্যার ঝাঁপি (১৯৪৫) ॥ রূপকথার পরিবেশের সহিত বাস্তব পরিবেশ যুক্ত করিয়া এই নাটকের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একদিকে আছে মেঘে ঢাকা রাঙা দেউলের চূড়া, তাহার মধ্যে এক রাজকন্যা—মাথায় তাহার মুকুট, খোঁপায় ফুলের মালা, নিরালা বাতায়ন হইতে সে নদীর এপারের মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। আর একদিকে আছে দুঃখ-অভাব-ক্ষুধা-ঈর্ষামথিত বাস্তব ধূলি-মলিন জীবনযাত্রা। নদীর এপারে পায়ে চলা গ্রামপথে, রাতের বাদলভরা নদী-স্রোতে আর ছাউনীহীন ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে সাধারণ মানুষগুলি নিত্যকার বেদনা ও বঞ্চনার মধ্যে দিন কাটায়, আর নদীর ওপারে রামধনু-আঁকা আকাশে স্বপ্নরঙীন মণিকুট্টিমে সৌন্দর্যের তিলোত্তমা রাজকন্যা। সন্ধ্যার মালতী ফুলটি চাহিয়া থাকে দূর আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে, আবার আকাশের সন্ধ্যাতারাটিও মাটির মালতী ফুলটির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে। তেমনি এই কাহিনীর বাস্তব মাটির চরিত্রগুলি রাঙা দেউলের রাজকন্যার প্রতি তাকাইয়া থাকে, আবার রাজকন্যাও নামিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে চাহে। অবশেষে রাজকন্যা সত্য সত্যই তাহার স্বপ্নঘেরা মায়াময় জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মাটিতে নামিয়া আসে, মানুষের দুঃখবেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সহিত নিজের জীবনকে যুক্ত করিয়া তোলে।

নাটকের মধ্যে রূপকথাময় জীবনের আনন্দ ও দুঃখরিক্ত জীবনের বেদনা উভয় প্রকার রসই পরিবেশিত হইয়াছে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া নাটকের কাহিনী অনুধাবন করিলে ইহার একটি সাঙ্কেতিক তাৎপর্য আবিষ্কার করা কঠিন নহে। রাজকন্যাকে আমরা স্বর্গবাসিনী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবতা লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিতে পারি। লক্ষ্মী তো স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে নিশ্চল হইয়া থাকিতে ভালোবাসেন না। তিনি যে তাঁহার সকল ধন ও কল্যাণের ধারা মানুষের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিতে চাহেন! কিন্তু যাহারা জোর করিয়া তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতে চেষ্টা করে তাহারা তাঁহাকে পায় না। প্রয়োজনের বহুস্ফীত দাবীর মধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। কিন্তু একলা যে মানুষ হৃদয়ের সমস্ত গোপন নিষ্ঠা লইয়া দুঃখের সাধনা করিয়া চলে তিনি তাহারই মধ্যে আসেন। যেখানে প্রেম, যেখানে মনুষ্যত্ব সেখানেই তাঁহার আবির্ভাব। পরোপকারী বীর মেহের, প্রেমের নীরব পূজারিণী হাসনু, হতভাগ্য বঞ্চিত প্রেমিক জুহু প্রভৃতির দানেই তাঁহার ঝাঁপি পূর্ণ হইয়া উঠে।

॥ দিনান্তের আগুন (১৯৪৯) ॥ দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্তন ও গুরুতর বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহা লইয়া যে কয়েকখানি নাটক লেখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই নাটকখানিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন পাশাপাশি অবস্থিত মানুষের জীবনের মধ্যে হঠাৎ কি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফাটল ধরাইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি নাট্যকার অভ্রান্ত সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। কোন থিওরি লইয়া নহে, কোন পক্ষপাতী অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়াও নহে, সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধ দৃষ্টি লইয়াই তিনি সমস্যাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতিপত্তিশালী জমিদার হঠাৎ কিভাবে তাহার সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসন হইতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, কিভাবে পাকিস্তানে এক শ্রেণীর মুসলমান লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, শ্রেণীবিপর্যয়ের মুখে নির্যাতিত তপসিলী সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও কিরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দিল এবং কিভাবে কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী আত্মসর্বস্ব লোক সেই ডামাডোল ও লুটপাটের সুযোগে নিজেদের নীচ স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইল। সুখে সম্প্রীতিতে ভরা, পালপার্বণ-গান ও জীবনের আনন্দে উজ্জ্বল ছাতিমপুর গ্রাম অবশেষে সর্বনাশা আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এ-আগুন শুধু যে ছাতিমপুর গ্রামে লাগিয়াছে তাহা নহে গোটা বাংলাদেশকে ইহা পোড়াইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে।

পল্লীজীবনের বর্ণনাতে লেখক যে বাস্তবতাবোধ ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গি যেমন নাট্য-সংলাপকে বাস্তবরসাশ্রিত করিয়াছে, তেমনি নানা পালপার্বণের বর্ণনা এবং কতকগুলি সরস পল্লীসংগীত, পল্লীজীবনের স্বাভাবিক মাধুর্য ও অনাবিল রসধারায় কাহিনীকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া তুলিয়াছে। মাটির প্রাণ ও সৌন্দর্য এত মনোহর ও জীবন্ত হইয়াছে বলিয়া সেই মাটির সহিত বিচ্ছেদের বেদনাও এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। দিনারম্ভের প্রসন্ন আশ্বাস এবং দিনান্তের ব্যর্থ জ্বালা দুইটি রূপই এই নাটকে আমরা দেখিয়াছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প ও উপন্যাসের একনিষ্ঠ সাধনা হইতে মাঝে মাঝে নাট্যজগতের প্রতি তাঁহার সাগ্রহ শিল্পীদৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন। প্রগতিমূলক নাট্য-আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি আধুনিক নাটক ও নাট্যমঞ্চের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নাটকেব ক্ষেত্রে তিনি খেয়ালী পথচারী,—সেজন্য জীবনীনাট্য, কৌতুকনাট্য, শিশুনাট্য, গুরুরসাত্মক নাটক, একাঙ্ক নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার নাটক রচনাতেই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইস্পাতের শাণিত ফলার মত ঝকঝকে সংলাপ, হঠাৎ-উত্থাপিত কোন বিশিষ্ট প্রসঙ্গ অথবা দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি, জটিল কৌতুকজনক পরিস্থিতি রচনা প্রভৃতি তাঁহার নাটকের বৈশিষ্ট্য।

॥ রামমোহন (১৩৫৯)॥ নবজাগ্রত বাঙালী জাতির অগ্রদূত রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা ও প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাট্যকার এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। প্রাণময় সংলাপ ও নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টি করিয়া তিনি আলোচ্য নাটকে ঘনীভূত নাট্যরসের ধারা সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। নাটকে চির সংগ্রামশীল রামমোহনের এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী রূপ দেখিলাম। এই সংগ্রামের আরম্ভ তাঁহার পরিবারে এবং সর্বব্যাপী বিস্তার সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে। সেজন্য নাটকের মধ্যে মোটামুটি ভাবগত ঐক্য বজায় রহিয়াছে, যদিও বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনুধাবন করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে। তবে রামমোহন বিলাত যাইবার পূর্বেই লেখক নাটকের উপসংহার টানিয়াছেন বলিয়া মোটামুটি স্থানগত কোন দূরবিস্তৃত অনৈক্য রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই। রামমোহন অনেকের সহিতই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে নিজের গর্ভধারিণী মাতার সহিত। মাতা ও পুত্রের এই সংগ্রামের মধ্যে কঠোর আদর্শবতী, স্বধর্মপরায়ণা জননী তারিণীর যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা কখনও মন হইতে মুছিবার নহে। প্রকৃতপক্ষে এক অজ্ঞান, অসহায় নারীর দৃঢ় নিষ্ঠার কাছে মহাজ্ঞানী, মহাবল রামমোহনের নিষ্ঠাও যেন ম্লান হইয়া যায়। মাতার সহিত রামমোহনের আচরণের মধ্যে তাঁহার কঠিন আদর্শ জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু স্নেহশীল সন্তানের দুর্বলতা বাঁচিতে পারিল না। আলোচ্য নাটকে রামমোহনের বাহিরের অতিমানবটিকে যতখানি পাইয়াছি, ভিতরের হৃদয়বান মানবটিকে ততখানি পাই নাই।

॥ ভাড়াটে চাই (১৯৫৭) ॥ 'ভাড়াটে চাই' বহু অভিনীত জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক। ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়া এক বাড়িওয়ালা কি বিপত্তি ও দুর্গতির মধ্যে পড়িয়াছিল তাহারই অতি কৌতুকাবহ ঘটনা লইয়া প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। কৌতুকরসাত্মক প্রহসনে মানুষের সামান্য দোষত্রুটি শোধনের যে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকে তাহা আলোচ্য প্রহসনেও বর্তমান। বাডিওয়ালা ভূপেশ লাইব্রেরী স্থাপনের ন্যায় সৎকার্যে সম্মত না হইয়া ঘর ভাড়া দিয়া টাকা রোজগারের লোভে পডিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে একটু জব্দ হইতে হইল। অবশ্য এই জব্দ হইবার ঘটনাগুলিতে কৌতুকের মাত্রাই প্রধান হইয়া প্রহসনের সুর সর্বত্র বজায় রাখিয়াছে। আমাদের সমাজের যত রকম টাইপ চরিত্র আছে তাহাদের প্রায় সকলকেই এই নাটকে আনিয়া হাজিব করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ভাষা ও ভঙ্গির বিশিষ্টতা এবং স্থানে স্থানে আবার গান নাচ অভিনয় প্রভৃতিও দেখা গিয়াছে। চরিত্রের উদ্ভটত্ব এবং সংলাপের তীক্ষ্ণধার দীপ্তি হইতেই প্রধানত কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে। তবে শান্তিপ্রয়াসী কৃষ্ণদাস ও বিশাখার অশান্তি সৃষ্টিতে এবং ছিদাম চৌধুরীর শোকসভার বর্ণনায় কৌতুকরস জটিল পরিস্থিতি হইতেও উদ্ভূত হইয়াছে।

॥ বারো ভূতে (১৯৫৯) ॥ 'ভাডাটে চাই'য়ের মত 'বারো ভূতে'ও কৌতুক-রসোচ্ছ্বসিত একাঙ্ক প্রহসন। কৌতুকের প্রাবল্য প্রথম প্রহসনখানি অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রহসনে আরও বেশী। প্রথম প্রহসনে বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি চরিত্রগত ঘটনা হইতেই কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রহসনে চরিত্রগুলির পারস্পরিক যোগ কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা হইতে কৌতুকরসের উৎপত্তি হইয়াছে। সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি, সভার বিশদ বিবরণ এবং অবশেষে বন্যাত্রাণের জন্য সুকৌশলে অর্থ আদায় প্রভৃতি ঘটনা দর্শকদের কৌতূহল ও আগ্রহ অবিচ্ছিন্নভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখে। অনঙ্গ ও জয়গুরুর তবলার ডুয়েল, রবীন্দ্রনাথের মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ, গৌরহরির সঙ্গীতলহরি, উদীয়মান নাট্যকার শ্যামলালের বিস্ময়কর অবদান 'ফুটপাথের কান্না'র বিগলিত ধারা, জাতীয় সংস্কৃতির অকৃত্রিম ধারক জলদবরণের বীররসাত্মক যাত্রালীলা, রামদাস ও তাঁহার নাতনী ঝুণ্টুর অনবদ্য ডুয়েট এবং পরিশেষে সভ্যবৃন্দের যাত্রা-থিয়েটার-নাচ-গান-বাজনার প্রাণঘাতী ঐকতান দর্শকদের চিত্তকে উদ্দাম হাসির আঘাতে আঘাতে একেবারে নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

কিরণ মৈত্র

কিরণ মৈত্র সাম্প্রতিক কালের নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অভিনেতা ও নাট্যকার, উভয় রূপেই তিনি প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সমস্যা ও দুর্গতি প্রধানত তাঁহাকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। করুণরসের আতিশয্য ও রোমাঞ্চকর সহানুভূতির দ্বারা তিনি দর্শকচিত্তে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিরণবাবু কয়েকখানি কৌতুকনাট্যও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে করুণরসে, কৌতুকরসে নহে।

॥ বারো ঘণ্টা (১৯৫৮) ॥ 'বারো ঘণ্টা' সাম্প্রতিক কালের একখানি বহু-অভিনীত নাটক। একান্নবর্তী মধ্যবিত্তের পরিবারজীবন আজ প্রায় বিলুপ্তির মুখে, তবুও এই জীবনের মাধুর্য ও বেদনা এখনও মধ্যবিত্ত বাঙালী দর্শকের কাছে সুগভীর আবেদন জানায়। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সেই দৈনন্দিন ও সর্বজনীন সমস্যাগুলি—টাকার অভাব, কন্যাদায়, মারাত্মক ব্যাধি প্রভৃতি সবই এই নাটকে রহিয়াছে। রাজেশ্বর বিকৃতমস্তিষ্ক হইলেও তাহার কথাগুলি আমাদের সকলের কাছে মর্মান্তিক সত্য বলিয়াই মনে হইবে—'সারা বাংলার মানুষগুলোর কান্না? শুনতে পাস্ না? কি তুই! মানুষগুলো মরছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর মরছে।' করুণরসাত্মক ঘটনার প্রাবল্য এই নাটকের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ। বাবা পাগল, ভাই পরীক্ষায় ফেল করিল, আর এক ভাই চুরি করিয়া ধরা পড়িল, বোনের বিবাহ দিবার আশা ব্যর্থ হইল এবং স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে। বারো ঘণ্টা আগে একটি আশ্বাসভরা প্রভাতে অমিয় তাহার অন্ধকার ঢাকা ঘর হইতে একমুঠো আলোর স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু বারো ঘণ্টা পরেই সেই আলোটুকুর সামনে একটি কালো পর্দা নামিয়া আসিল। অমিয় শুধু তাহার নিজের পরিবারের ব্যর্থ নায়ক নহে, সে যেন বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামের এক ভগ্নমনোরথ প্রতিনিধি।

নাটকখানিতে যেমন নাট্যকারের আন্তরিকতা ও রসসৃষ্টির কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি ইহার কয়েকটি দোষত্রুটিও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নাটকের ঘটনাকাল মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবার ফলে চরিত্রগুলির আসা যাওয়া এবং তাহাদের বিকাশ ও পরিণতি অনেকখানি অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য মনে হইয়াছে। বারো ঘণ্টার মধ্যে দ্বারিকবাবু তিনবার আসিয়াছেন এবং সমর আসিয়াছে চার বার। সমর অমিয়ের বাড়িতে প্রথম আসিল, অথচ সেই প্রথম

দিনেই চারবার আসা এবং সন্ধ্যার প্রতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটু অনুরক্ত ভাব দেখানো অসঙ্গত বোধ হয়। অলকের দুর্ঘটনা কাহিনীর পক্ষে মোটেই অনিবার্য নহে এবং অনিলের টাকা চুরি করিয়া ধরা পড়ার ঘটনাটিও সুলভ রোমাঞ্চকর উপাদান জোগাইয়াছে মাত্র।

॥ চোরাবালি ॥ 'বারো ঘণ্টা'র মত 'চোরাবালি' ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বারো ঘণ্টা'র কাহিনী ও চরিত্রগুলির সঙ্গেও এই নাটকের কাহিনী ও চরিত্রগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাজেশ্বর, অমিয়, অনিল, সন্ধ্যা, সমর প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে যথাক্রমে রমানাথ, অশোক, অসীম, গীতা ও সুজিতের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটে মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরা কি ভাবে নিম্ন ও চিরপ্রচলিত আদর্শবিরোধী বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, লেখক তাহা আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অশোক চাকরী হারাইয়া হকারীর কাজ নিতে বাধ্য হয়, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় অসীম জুয়ার আড্ডায় যোগ দেয়, স্বয়ং সোমনাথ জুতার দোকানে বিক্রেতার কাজ গ্রহণ করে এবং গীতা সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অভিনেত্রী জীবন শুরু করে। অবশ্য যে-সংসারের মঙ্গলের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছিল তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কি অনিবার্য কারণ গীতার পক্ষে ছিল তাহা বুঝা যায় না। গীতাই সংসারের জন্য চিন্তা-ভাবনা, আঘাত ও বেদনা সর্বাপেক্ষা বেশি সহ্য করিয়াছে, অথচ সে এই সহায়হীন সংসারের কথা চিন্তা না করিয়া অভিনেত্রী জীবন গ্রহণ করিল, বিবাহ করিয়া নিজের সুখের পথ বাছিয়া লইল। গীতার এই আচরণ তাহার পূর্ববিকশিত চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

॥ নাটক নয় (১৯৫৮)॥ ইহা পাঁচটি দৃশ্যসম্বলিত বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। নাট্যকার অনিমেষ স্বপ্নে বাংলা সমাজের বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি চরিত্র দেখিয়া বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাহাদের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা লইয়াই প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। কিন্তু অনিমেষের নিদ্রা অথবা স্বপ্নের কোন আভাস নাটকের গোড়াতে নাই বলিয়া শেষকালে হঠাৎ তাহার স্বপ্নের ব্যাপারটি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বলিয়া বোধ হয়। ডাইরেক্টার ডুনডুভি ভাট, সম্পাদক দাড়িম্বর ধাড়া, রাজনীতিক থরহরি দাস, ব্যবসায়ী ধনুষ্টঙ্কার ধার্মিক এবং স্বয়ং বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া দৃশ্যগুলির ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। দৃশ্যগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত নহে, কিংবা কাহিনীর কোন বিবর্তন ও পরিণতিও উহাদের মধ্য দিয়া ঘটে নাই। উহারা বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি চরিত্রের দোষ ও অন্যায়

উদ্‌ঘাটন করিয়াছে মাত্র। নাট্যকার সব দৃশ্যের মধ্যেই আছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রধানত দ্রষ্টা, নাট্যক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী নহেন। হাস্যরস পরিস্থিতিগত নহে, চরিত্রগত এবং তাহাতে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল উচ্ছ্বাস নাই, তাহা লেখকের সচেতন উদ্দেশ্যসঞ্জাত ব্যঙ্গবিদ্রূপের খর আবর্তে পরিপূর্ণ।

॥ যা হচ্ছে তাই ॥ আলোচ্য বইখানিতে 'যা হচ্ছে তাই' ও 'যা হলো তাই' এই দুইখানি প্রহসন রহিয়াছে। দুইখানি প্রহসনই সুসংহত কাহিনীহীন নক্সা-জাতীয় রচনা—বিচ্ছিন্ন গ্রন্থিহীন ঘটনা এবং বিরক্তিকর ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। প্রথম প্রহসনে মিউনিসিপ্যালিটির একজন চেয়ারম্যানকে ভাঁড়ের মত আঁকা হইয়াছে। মানসীকে লুকাইয়া রাখিয়া উমাপ্রসাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের ব্যাপারটি যেমন অবিশ্বাস্য হইয়াছে, তেমনি মানসীর পক্ষে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিবাহ করা এবং তাহারই জন্য পিতার সম্মুখে আসিয়া তারস্বরে প্রচার করা চরম নির্লজ্জতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইয়াছে। 'যা হলো তাই'-তে একলোচনের নিজের বয়স নির্ণয় করিতে যাইয়া চূড়ান্ত বিভ্রাট বাধাইয়া বসাও অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে।

॥ তৃষ্ণা (১৩৭১) ॥ বিশ্বরূপায় অভিনীত মঞ্চসফল নাটক 'সেতু' আলোচ্য নাটকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। নারীর চিরন্তন ও প্রবলতম জৈব প্রবৃত্তি সন্তানকামনার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা লিখিত। যে অলব্ধ সন্তানের জন্য নাটকের নায়িকার অন্তরে এক করুণ তৃষ্ণা বিদ্যমান সেই সন্তান পিতামাতার কতখানি আনন্দ ও বেদনার কারণ হইতে পারে নাট্যকার তাহা কয়েকটি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইয়াছেন। কমলা মাতৃত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত, কিন্তু তাহার ভগ্নী অমলা সেই গৌরবের অধিকারিণী। সন্তান লাভ করিবার কামনায় একটি দম্পতি মর্মপীড়িত, আবার আর একটি দম্পতি দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া নিজেদের সন্তান অপরকে বিলাইয়া দিতে ব্যগ্র। সন্তানকে হারাইয়া এক বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধ তাহাকে অবিরাম খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আবার আর এক সন্তানের মা বাহিরে পুত্রের প্রশংসা করিয়া আত্মতুষ্টি পাইবার চেষ্টা করিলেও সেই উচ্ছৃঙ্খল, অপরাধী পুত্রের জন্য মর্মে মর্মে দুঃসহ লজ্জা ও গ্লানি ভোগ করিতেছে। নাট্যকার এমনি ভাবে পাশাপাশি কয়েকটি চিত্র তুলিয়া ধরিয়া সন্তানের জন্য মানুষের কামনা এবং সেই সন্তান হইতে আনন্দ ও বেদনা-প্রাপ্তির বিচিত্র সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। নাট্যকারের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বোধ হয় ফুটিয়া উঠিয়াছে অমূল্য চরিত্রটির ভিতর দিয়া। অমূল্য সন্তানের পিতা,

নিজের পুত্রের অন্নপ্রাশনে সে অতখানি ঘটা করিয়াছে। কিন্তু সেই আবার জাল বেবিফুড বাজারে ছাড়িয়া হাজার হাজার সন্তানের প্রাণহানির আয়োজন করিয়াছে।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কালে প্রগতিবাদী ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন নাট্যকার-রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি সমাজের বহু উপেক্ষিত ও ঘৃণিত স্তরের সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তিনি প্রকৃত শিল্পীজনোচিত দরদ ও সহানুভূতির অধিকারী। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়াছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। সেজন্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া তিনি পারেন নাই। কিন্তু, তিনি জীবনকে ঠিক জীবনরূপেই দেখিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও মতবাদের দৃষ্টি দিয়া জীবনকে দেখেন নাই। তিনি একটি নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমি নিজে কোনও রাজনীতিদলীয় লোক নই।' এই দলনিরপেক্ষতার জন্যই তিনি তাঁহার দৃষ্টিকে মুক্ত ও স্বচ্ছ রাখিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার উদার সহানুভূতি সর্বত্র সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশ্য জায়গায় জায়গায় ঘটনার অতর্কিত ও অভাবিত সমাবেশ, অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাসময়তা তাঁহার নাটকে রহিয়াছে।

॥ কেরাণীর জীবন (১৯৫২)॥ মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত শ্রেণীর বাস্তব জীবনরূপ এই নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্তমান সমাজের অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে উপর-তলাকার মানুষ শোষণের মধ্য দিয়া স্ফীত হইতেছে এবং একেবারে নীচের তলার মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়া দাবী আদায় করিয়া লইতেছে। কিন্তু মধ্যে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের শোষণের ক্ষমতা নাই, সংগ্রামেরও শক্তি নাই। সমাজে বহু দাবী তাহাদের মিটাইতে হয়, অথচ নিজেদের কোন দাবী জানাইবার উপায় তাহাদের নাই। বাহিরের ভদ্রবেশধারী আকৃতির তলায় তাহাদের প্রকৃত সত্তা তিল তিল করিয়া অবক্ষয় বরণ করিয়া যাইতেছে। এই ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের কেরাণী-জীবনের চিত্রই অকপট সহানুভূতির সঙ্গে এই নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। কেরাণী-জীবনের অফিস ও বাড়ি এই উভয় পরিবেশই নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে নিত্যকার কাজকর্ম—অন্যান্য কেরাণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সাহেবের রূঢ় আচরণ ও পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি রহিয়াছে। অবশ্য অফিসের

কাজে যেমন অপমান ও তিক্ততা আছে, তেমনি স্বীকৃতি ও পুরস্কৃতিও আছে—সেখানে যেমন রূঢ়ভাষী হৃদয়হীন মিঃ গুহ আছেন, তেমনি আবার মিষ্টালাপী উদারচেতা নন্দী সাহেবও রহিয়াছেন। অন্যদিকে কেরাণীর গৃহজীবনেও আছে অভাব, লাঞ্ছনা, শোক ও মৃত্যুর শতরকম আঘাত। তাহার সংসারে স্বামী ও পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রী গায়ের সব গহনা বিসর্জন দেয়, পুত্রের প্রতিভা শোচনীয় মৃত্যুতে নিঃশেষ হইয়া যায়, মেয়ে লজ্জা ও শালীনতা বর্জন করিয়া অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয়। এই সংসার বিধুভূষণের, এই সংসার বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন কেরাণীর। আঘাতজর্জরিত বিধুভূষণের মৃত্যুতে তাহার সংসারে যে হাহাকার উঠিল তাহা আজ বাংলার সমাজজীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহা বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক।

॥ চোর (১৯৫৮)॥ নাট্যকার এই নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমার চোর নাটকেও আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরের চুরিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।' তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে হয়তো রামলালই চোর এবং সেজন্য সে তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইয়াছে, কিন্তু যে আইনজীবী ভগ্নীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, যে ডাক্তার প্রসূতির কোল হইতে সন্তান ছিনাইয়া লইয়া ডাস্টবিনে ফেলিয়া দেয়, যে ধর্মসাধক এক অসহায় স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহারা কি চোর নহে? অথচ তাহারা সমাজের শীর্ষ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কে চোর আর কে চোর নহে? এ প্রশ্ন করিয়াছেন ভিক্টর হিউগো, গল্সওয়াদি ও The Bishop's Candlesticks-এর লেখক এবং আমাদের নাট্যকারও একই প্রশ্ন করিতেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের চৌর্যবৃত্তি দেখাইতে যাইয়া নাট্যকার বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিড় বড় বেশী আনিয়া ফেলিয়াছেন। নাট্যকারও এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সচেতন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'নাটকের স্থান কম, গতি অনেক।' নাটকের গতি যদি একটি বিশেষ কাহিনীর আরম্ভ, বিবর্তন ও পরিণতি আশ্রয় না করে তবে তাহা অসঙ্গত ও অর্থহীন। এখানে চোর রামলাল ও চোর বাবুয়ার চৌর্যবৃত্তি ও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে যাইয়া নাট্যকার কাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাবুয়ার চুরি করিতে যাওয়া যেমন আকস্মিক, তাহার চুরির বিচারদৃশ্যও তেমনি অহেতুক আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়।

॥ স্ট্রীট বেগার (১৯৫৯)॥ রাস্তায় যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, একটানা উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বোঝা যাহারা অবিরাম বহিয়া চলে, আকাশের আলো ও মাটির

ধূলাই যাহাদের একমাত্র বন্ধু—সেইসব হতভাগ্য ভিক্ষুকের অজানা জীবনরহস্য লইয়াই এই নাটক রচিত হইয়াছে। এই সব নিষিদ্ধ মানুষের মধ্যে অনেকেই পকেটমার, চোর, লম্পট ও খুনী। সমাজ ইহাদের বিচার করে, শাস্তি দেয়। কিন্তু সমাজের কোন্ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ও হৃদয়হীন বঞ্চনা যে তাহাদিগকে অনিবার্যভাবে এই পাপ ও দুঃখের পথে ঠেলিয়া দেয় তাহা কেহ সন্ধান করে না। নাট্যকার তাহাই সন্ধান করিতে চাহিয়াছেন এই নাটকে। নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই হইল ভিখারী অথবা গুণ্ডা। ঐ সব চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার প্রশংসনীয় বাস্তবচেতনা ও সংলাপরচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে দুইটি নারীচরিত্র—নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের অপ্রকৃতিস্থা মাতা সবিতা ও লালসার অনিবার্য আগুনে দগ্ধ আসমানী। নারীর এই দুই রূপই তো চিরকাল সত্য, সে কামিনী, সে জননী। নাটকের সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক চরিত্র নাট্যকারের মুখপাত্র শুকলাল। এই বিলাতফেরত ব্যক্তিটি রাস্তার ডাস্টবিনের কাছে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহার গতি সর্বত্র অবারিত, উপদেশ দিতে, তিরস্কার করিতে সে কাহাকেও ছাড়ে না। শেষ দৃশ্যে তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ অনুযোগমূলক বক্তৃতা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

ধনঞ্জয় বৈরাগীর দান আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয়, প্রযোজনা ও নাট্যরচনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার মৌলিক শক্তির পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন। সাধারণত মধ্যবিত্ত পরিবারজীবনের পরিবেশ অবলম্বনেই তিনি তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন। দৃশ্যসংস্থাপনায় তিনি অধিকাংশ নাটকে ইবসেনীয় রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সংলাপ প্রধানত হ্রস্ব ও ক্ষিপ্র গতিশীল। প্রাগাধুনিক নাটকের অপরূপ রোমান্টিক ভাবাবেগপ্রবণতা তাঁহার অনেক নাটকেই সুলভ।

॥ রুপোলি চাঁদ (১৯৫৮)॥ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা মিথ্যা সম্মানের অভিমানে সামান্য চাকরীর পিছনে ঘুরিয়া নিদারুণ অভাব ও অস্বাস্থ্য বরণ করিয়া লয়, অথচ শ্রমসাধ্য যন্ত্রপাতির কাজ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত করিতে তাহারা নিতান্তই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু আজ পরিবর্তিত সমাজে বৃত্তিগত ও বংশগত সমস্ত আভিজাত্যবোধ বর্জন করিয়া

ছোটখাট ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইবে, তবেই মধ্যবিত্ত পরিবার বাঁচিতে পারে, ইহা ছাড়া তাহাদের বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। নাট্যকার ইহাই এই নাটকে বলিতে চাহিয়াছেন। নাটকের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা অসংগত মনে হয়। যে মা-বাবা ও পরিবারের মর্যাদার জন্য অজিতের সঙ্গে সরযূর পিত্রালয়ের বিরোধ, হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িবার পর তাহাদের সহিত অজিতের আর কোন সম্বন্ধই রহিল না, এমন কি অজিতের জন্য আর একটি নূতন বাড়িও ঠিক হইয়া গেল। নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়ার বাধা তাহার পক্ষে কোথায়? সতু ও সাবিত্রীর সম্বন্ধটিও অকারণ ভাবাবেগে ও ভিত্তিহীন দুঃখভোগে জটিল হইয়াছে। সাবিত্রী অত সতীলক্ষ্মী হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত অকারণেই স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গেল, অপরের কাছে গভীর স্বামীভক্তি জানাইয়া ফল দিয়া চলিয়া গেল, অথচ স্বামীর ঘরে আসিল না। এ-সব নিছক তরল ভাবাবেগপূর্ণ অসঙ্গতি; সাবিত্রী যতদিন ছিল ততদিন সতু ছিল ঘোর মাতাল, আর সাবিত্রী চলিয়া যাইবার পরই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইযা উঠিল। সাবিত্রীর জন্য কোন বেদনা নাই, তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কোন চেষ্টা সে করিল না ইহাও বড় অবিশ্বাস্য মনে হয়। রাজেন মল্লিক, মদন ড্রাইভার ও সতীনের ষড়যন্ত্রের ফলে সতুর পুলিশের হাতে ধৃত হইবার ঘটনাটিও একটু অকারণ বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা ষড়যন্ত্রের ফলে যে ধৃত হইল তাহার দুঃখ কোন আচরণ কিংবা কোন মানসপ্রবৃত্তির পরিণাম নহে। সেই দুঃখের গভীরতা ও মূল্য কোথায়; ইবসেনীয় রীতিতে লেখা এই নাটকে মাত্র তিনটি অঙ্ক রহিয়াছে। দীর্ঘস্থায়ী অঙ্কের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও জটিলতার মধ্য দিয়া নাটক জমিয়া উঠিতে পারিয়াছে। সংলাপের হ্রস্বতার ফলে নাটকের মধ্যে আবেগের আকস্মিক তীব্রতা ও ঘটনার ক্ষিপ্র গতিশীলতা আসিয়াছে।

॥ এক পেয়ালা কফি (১৯৬০)॥ রহস্যপ্রধান অপরাধমূলক নাটক। প্রথম অঙ্কে চিত্র-পরিচালক অরুণ গুপ্ত তাঁহার নির্মীয়মাণ চিত্রের শিল্পীদের পরিচয় এবং অরুণ গুপ্তের রহস্যজনক হত্যার বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে সেই হত্যার অনুসন্ধানকার্য এবং অবশেষে প্রকৃত হত্যাকারীর আবিষ্কার বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে একই ঘটনাধারা প্রবহমান, সেজন্য অঙ্কবিভাগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট নহে। ব্রজেন রায়কে হত্যাকারীরূপে দেখানো রহস্য নাটকের পক্ষেও একটু অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য হইয়াছে। নাটকের মধ্যে তাহার

আচরণ হইতে চিত্রাকে ভালবাসা ও সম্পত্তির উপর লোভ করায় কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার কঠোর মূর্তির উল্লেখও আকস্মিক ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে। পারুলের বৃত্তান্তটি নাটকের কাহিনীর সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।

॥ রজনীগন্ধা (১৯৬০)॥ একটি বিড়ম্বিতা নারীর করুণ অবলুপ্তির কাহিনী অবলম্বনেই নাটকটি রচিত। নারীজীবনের সব সম্পদই হয়তো আশা চৌধুরীর ছিল—রূপ-গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি কোনো কিছুরই অভাব তাহার ছিল না। কিন্তু সব থাকা সত্বেও কয়েকটি বছরের মধ্যেই সে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিল, পুত্রকে সে কাছে রাখিতে পারিল না, বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে নিতান্ত অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। জীবনের সব অবলম্বন হারাইয়া বেপরোয়াভাবে নিজেকে ধ্বংসের পথে ছুটাইয়া দিল। সিনেমায় অভিনয়, রবি দত্তের ঐশ্বর্যলালিত জীবন, খ্যাতির তরল মদিরা সব পাইয়াও সে তাহার নিঃস্বতা ঘুচাইতে পারিল না। সে মরিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। আবার সে মৃত্যুর পথে অভিসারে চলিল, কিন্তু এবার কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। তবে মরিবার পুর্বে ভালোবাসার আস্বাদ সে পাইল। মৃত্যুর স্পর্শে যখন তাহার চোখ নিমীলিত হইয়া আসিল তখন সেই চোখে বোধ হয় তাহার সেই প্রথম ও শেষ ভালোবাসার মধুস্বপ্ন জড়াইয়া ছিল। কিন্তু যখন সে জীবনের এক নূতন কূলে পা দিয়াছে, যখন দেবব্রত ও তাহার ব্যর্থ জীবন দুইটি নূতন জীবনের আলোর স্পর্শে বাঁচিবার আশায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে তখনই আশা আত্মহত্যা করিয়া বসিল কেন? এ-প্রশ্ন কিন্তু মনে আসা স্বাভাবিক। বোধ হয় আশা ভিতরে ভিতরে এতই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, নূতন জীবনের আশা ও স্বপ্ন তাহার মনকে রাঙাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাকে অবলুপ্তি হইতে বাঁচাইতে পারিল না।

॥ আর হবে না দেরী ॥ নাটকের কাহিনীটি যথাযথভাবে গ্রহণ করিলে ইহার বাস্তব পরিবেশ অস্পষ্ট ও অসঙ্গত মনে হইবে এবং চরিত্রগুলির কথা ও আচরণও কোন সুনির্দিষ্ট কার্যকারণসূত্রের মধ্যে ধরা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কাহিনীটিকে রূপক বলিয়াই মনে করিতে হইবে এবং এই রূপক ব্যাখ্যা করিলেই ঘটনা ও চরিত্রের সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। সাহুজী ভারতের কর্ণধার পণ্ডিতজী ছাড়া আর কেহ নহেন। শ্রীপতি হইলেন ভারতের বর্তমান পুঁজিবাদী শক্তি। দিলদার প্রবুদ্ধ দৃষ্টির প্রতীক। কানাই সামন্ত হইলেন জাগ্রত জনতাশক্তির প্রতিনিধি। রাজকুমারী নকল আভিজাত্য এবং দীপ্তি সংগ্রামশীল

নারীশক্তিকেই প্রকাশ করিতেছে। পোড়ো বাড়িটি হইল ভারতের জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ সমাজরূপ। এই সমাজ যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন শুধু দুর্বল ও দুঃস্থ লোকগুলিই চাপা পড়ে না, যাহারা সমাজের এই শোচনীয় রূপের জন্য দায়ী তাহারাও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার একদিন সাধারণ নির্যাতিত মানুষের পক্ষেই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তিনি পুঁজিবাদী শক্তির হাতে নিষ্ক্রিয় পুতুল মাত্র। তাহার দ্বিধা ও দুর্বলতার সুযোগে পুঁজিবাদী শক্তি আজ সাধারণ দুর্বল মানুষের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু এমন একদিন আসিবে—সেদিন অসহায় জনশক্তি রুখিয়া দাঁড়াইবে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রবল আঘাত হানিবে। শাসনদণ্ড সেদিন অত্যাচারীর হাত হইতে বিপ্লবী জনশক্তির হাতেই যাইবে। নাটকের মধ্য দিয়া ইহাই নাট্যকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

উৎপল দত্ত

বর্তমান কালের নাট্যাভিনয় ও নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে শ্রীউৎপল দত্তের স্থান প্রথম শ্রেণীতে এ বিষয়ে সম্ভবত বিশেষ মতভেদ হইবে না। মাত্র কয়েক বৎসর হইল তিনি নাট্যরচনায় হাত দিয়াছেন। পরিশেষেব পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা এবং চবিত্রের রুক্ষ ও রূঢ় রূপের যথাযথ বর্ণনায় তাঁহার নাট্যবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাব নাটকেব সংলাপ অতি তীক্ষ্ণ ও অনাবৃত এবং পরিবেশ ও চরিত্ররূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। উৎপলবাবু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অত্যন্ত উগ্রভাবে বিশ্বাসী এবং নাটকেব মধ্যে তিনি অতি স্পষ্টভাবেই নিজেব মত প্রচার করিতে আগ্রহী। জীবনের কোমল, সুন্দর ও প্রীতিস্নিগ্ধ রূপের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। মাঝে মাঝে বাস্তবতাব অজুহাতে তিনি সংলাপের মধ্যে এমন সব অশ্লীল উক্তি ও অশালীন মন্তব্যেব অবতাবণা করেন যেগুলি সম্মিলিত দর্শকদের কাছে সত্যই অশ্রাব্য হইয়া পড়ে। তবে উৎপলবাবুর 'ফেরারী ফৌজে' যথার্থ শিল্পীর সমদর্শী ও সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি দেখা যায়। এই নাটকে সর্বপ্রথম মানবীয় হৃদয়বৃত্তির মূল্য এবং দ্বন্দ্বজটিল জীবনের রস তাঁহার কাছে স্বীকৃতি লাভ করিল।

॥ ছায়ানট (১৯৫৮)॥ চিত্রতারকাদের উত্থান ও পতনের চমকপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য নাটকখানি রচিত হইয়াছে। এ-কাহিনীর মধ্য দিয়া চিত্রজগতের নেপথ্যলোকে যাইয়া আমরা উপস্থিত হই। সেখানে টুকরা টুকরা

বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের মধ্য দিয়া একটি চিত্রের সামগ্রিক রূপ কিভাবে গড়িয়া উঠে তাহার পরিচয় যেমন পাই, তেমনি সেই চিত্রের নির্মাণে যাহারা অংশ গ্রহণ করে তাহাদের স্বভাব, আচরণ ও ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশার নানা দ্বন্দ্বের রূপও আমরা জানিতে পারি। এই নেপথ্যলোকে মূর্খ ও অর্থপিশাচ প্রযোজক, চুরিবিদ্যায় পটু চিত্রনাট্যকার ও সঙ্গীতকার, ঈর্ষাপরায়ণ অভিনেতা, রোমাঞ্চকর সংবাদ-সন্ধানী পত্রিকা-সম্পাদক প্রভৃতি যেমন যথেষ্ট রঙ্গব্যঙ্গের উপাদান জোগাইয়া থাকে, তেমনি আবার অভিনেতৃজীবনের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা, জনপ্রিয়তার উচ্চ চূড়া হইতে তাহার পতন প্রভৃতির মধ্য দিয়া সুগভীর করুণ রসেরও সৃষ্টি হয়। নাটকের মধ্যে মোটামুটি কৌতুক ও ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য, কিন্তু ইহার পরিণতি করুণরসাত্মক। তবে এই পরিণতি অতি দ্রুত ও অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত মনোজকুমারকে আমরা সাফল্য ও জনপ্রিয়তার শীর্ষ-স্তরেই অবস্থিত দেখি, চতুর্থ অঙ্কে হঠাৎ তাহাকে সর্বজনউপেক্ষিত এক বিগতগৌরব নায়করূপে দেখানো হইল। তাহার এই পতনের পুর্বে উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাত ও চমকপ্রদ কোন পরাজয়ের ঘটনা বর্ণিত না হওয়াতে পরিণতি আকস্মিক হইয়া পড়িয়াছে। চিত্রজগতের নেপথ্যলোকের কাহিনী বলিয়াই চিত্রনির্মাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং কিঞ্চিৎ ক্লান্তিকর যান্ত্রিক কলাকৌশলের কথাগুলি নাটকের মধ্যে বড় বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। মনোজকুমার ও সন্দীপকুমারের কর্মবিকাশের স্তরগুলি সিনেমার কৌশলে দেখানোও মঞ্চের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে।

॥ অঙ্গার (১৯৫৯) ॥ অঙ্গার মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইবার সময় নাট্যজগতে বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছিল। অঙ্গারের বিষয়বস্তু, চরিত্র পরিকল্পনা ও প্রয়োগরীতির মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের Expressionistic অথবা প্রকাশবাদী নাটকের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। শিল্পপরিবেশ, দৃশ্যসজ্জার বিরাটত্ব আলোক-সম্পাতের চাতুর্য, সম্মিলিত জনতার বলিষ্ঠ ভাবাভিব্যক্তি—প্রকাশবাদী নাটক ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। Gas, Man and the Masses, The Adding Machine, R. U. R. প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকাশবাদী নাটকের সঙ্গে আমরা 'অঙ্গার' নাটকের তুলনা করিতে পারি। নাটকখানির সঙ্গে, বিশেষত ইহার শেষ দৃশ্যের সঙ্গে, জো কোরির Hewers of Coal নামক একাঙ্ক নাটকেরও আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। 'অঙ্গারে'র মধ্যে বহুবিচিত্র চরিত্র ও কয়লাখনির টেকনিক্যাল কথাবার্তা ও যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ এত বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে যে, ইহাতে একটি সুসংবদ্ধ ও ক্রমবিবর্তমান রসকাহিনী জমিয়া উঠে নাই। সেজন্য

এই নাটকের চমক যত তীব্র, আবেদন তত গভীর নহে। মাঝে মাঝে দুর্ভাষী শটফায়ারার দীননাথের প্রচ্ছন্ন স্নেহশীতলতা, ভূতপূর্ব লোক সনাতনের মৃত্যু-অভিজ্ঞতা, কঠোরচিত্ত বিশ্বস্ত সেপাই গফুরের দুঃসহ আত্মগ্লানি, খনিতে হারাইয়া-যাওয়া সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতার নিষ্ফল প্রত্যাশা, জয়মুল্লের বৃদ্ধা মাতার মর্মবিদারী বিলাপ—এইসব টুকরা টুকরা ঘটনা আমাদের চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য সমবেদনায় ও কারুণ্যে সিক্ত করে বটে, কিন্তু বহু লোকের কোলাহলে ও যন্ত্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে চিত্তের সেই অনুভূতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যান্ত্রিক পরিবেশের চমকপ্রদ ও দ্রুত-আবর্তিত ঘটনা এখানে এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে, নিভৃত জীবনের অনুভূতিময় রূপ অস্পষ্ট ও অবিশ্লেষিত হইয়া রহিয়াছে। বিনুর সহিত তাহার মা, বোন ও রূপা কাহারও সম্বন্ধ বিচিত্র আবেগ-অনুভূতির মধ্য দিয়া বর্ণিত হয় নাই। সেজন্য বিনুব মায়েব শোক ও বিনুর অন্তিম বিলাপ গভীরভাবে দর্শকচিত্তকে অভিভূত করিতে পারে না। বিনুর সংসারের দুঃসহ দারিদ্র্যের কোন চিত্র আমরা পাই নাই, সেজন্য কোন্ অনিবার্য অবস্থার তাডনায় বিনুর মা তাহাকে বিপজ্জনক খনির গর্ভে যাইবার জন্য জেদ করিল তাহা বুঝা যায় না। আর যে মা টাকার জন্য ছেলেকে বিপদের মুখে জোব করিয়া ঠেলিয়া দেয় তাহার প্রতি কি করিয়া সহানুভূতি বজায় থাকিবে? নাটকের শেষে মৃত্যুকবলিত বিনুর মুখ দিয়া যে অন্তিম কামনা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু 'রক্তকবরী' নাটকের ন্যায় যন্ত্রজীবন হইতে দূরে প্রকৃতির আনন্দময় জীবনে যাইবার স্বপ্নই যেন ব্যক্ত হইয়াছে। 'শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একখানা বাড়ি—মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল,—পাকা নয়, তুলসী গাছ থাকবে, তুমি প্রদীপ দেবে, তুমি শাঁখ বাজাবে।'

॥ ঘুম নেই ॥ 'ঘুম নেই' একখানি নিখুঁত একাঙ্ক নাটকরূপেই বিচার্য। একটি বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন লবিড্রাইভারের চলমান জীবনযাত্রার উগ্র বাস্তব রূপই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিপজ্জনক সেতুর উপর দিয়া লরি পার করিয়া লইয়া যাওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নাটকের শেষভাগে চরিত্রসংঘাত ও চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইয়াছে। নাট্যরচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁহার যে রুচিবোধ ও জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক। লরিড্রাইভারদের জীবনে বহু সমস্যা, বহু দুঃখকষ্ট আছে সত্য এবং সেগুলি সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, কিন্তু সাধারণ পথচারী মানুষের জীবনের প্রতি

তাহারা যে কত নৃশংসভাবে উদাসীন, তাহা তো প্রতিদিন আমরা কলিকাতা এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের লরির তলায় চাপা পড়িবার বহু শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতে জানিতে পারিতেছি। এই নাটকের প্রধান লরিড্রাইভারও একটি প্রাইভেট গাড়ীর দুর্ঘটনা ঘটাইয়া দিয়া বীরদর্পে ইয়ারদের কাছে আসিয়া নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রসাল গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য দুর্ঘটনায় পতিত মোটরের আহত যাত্রীদিগকে সে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পৌছাইয়া দিয়াছিল—অনেকখানি মহত্ব সন্দেহ নাই! এই সব লরিড্রাইভার নিজেদের স্ত্রীদের সতীত্ব লইয়া শুধু যে কুৎসিত পরিহাস কবিযাছে তাহা নহে, অশ্লীল বিশেষণে ভূষিত কবিতে দাদা, মামা, পিসে এমন কি বাবাকে পর্যন্ত ছাড়ে নাই। এই বীরপুঙ্গব ড্রাইভারদের সঙ্ঘবদ্ধ বীরত্ব দেখাইবার জন্য নাট্যকার তাহাদের হাতে লরিমালিক, দারোগা প্রভৃতির যথেষ্ট শাস্তিব ব্যবস্থা কবিয়াছেন এবং যে লোকটি যথার্থই উচিত কথা বলিতেছিল তাহাকেও যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়া ভণ্ড প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে সর্বপ্রকাবেব শোভন ও সঙ্গত জীবননীতিকে ধূলিলুণ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রেণীহিংসা, ব্যক্তিহিংসা প্রভৃতি সকল প্রকাব হিংসা উগ্র সমর্থন লাভ করিয়াছে। বাস্তবধর্মী নাটকেব আদর্শ যদি ইহা হয়, তবে তাহার জন্য শঙ্কিত হইবার কাবণ আছে, সন্দেহ নাই।

॥ ফেরারী ফৌজ ॥ 'ফেরারী ফৌজ' বোধ হয় উৎপল দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক। এ-নাটকে উগ্র মতবাদেব তীব্র দাহ নাই, আছে গভীর জীবনবোধের স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখানে দলীয় গণ্ডি হইতে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে উদার মানবিকতার ক্ষেত্রে। বিপ্লবী নাট্যকার উৎপলবাবু এ-নাটকেও বাংলাব বৈপ্লবিক আন্দোলনেব একটি অধ্যায় তুলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানে বৈপ্লবিক চরিত্রগুলি বিপ্লবের এক একটি তাত্বিক অথবা যান্ত্রিক টাইপে পরিণত হয় নাই, তাহারা বিপ্লবের আহ্বান ও জীবনের আকর্ষণের মধ্যে দোলায়িত। তাহারা বিপ্লবী বটে, কিন্তু তাহারা মানুষ, মানুষের মতই তাহারা দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত, ভ্রান্ত ও অনুতপ্ত, মানুষের প্রাণ লইতে যাইয়াও তাহারা জীবনের জয়গান করে—নিষ্ঠুর কর্তব্যপালনই জীবন নহে, জীবন সুন্দর—'লাইফ ইজ বিউটিফুল'। ত্রিশ দশকের সন্ত্রাসবাদী যুবশক্তির অভ্যুত্থান লইয়াই এ-নাটক রচিত। অগ্নি-দীক্ষিত যুবকবৃন্দ সন্ত্রাসবাদের পথে ভারতের মুক্তি আনিবার বজ্রকঠিন সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের পথ হয়তো ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু তাহাদের মত অমিত তেজ ও অদম্য মুক্তিতৃষ্ণা লইয়া এভাবে মৃত্যুবরণ করিতে আর আমাদের

ক'জন দেশবাসী পারিয়াছে? যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার তাহারা সহ্য করিয়াছে তাহা অমানুষিক। নাটকে অত্যাচারের যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখান হইয়াছে তাহা অসহনীয়, কিন্তু তাহা অসত্য নহে। নাটকে সূর্য সেনের এক দোসর পাইলাম, সে হইল শান্তি রায়। শান্তি রায় সংগ্রামে প্রাণ দেয়, কিন্তু সে অমর হইয়া উঠে বিপ্লবী মানুষের আত্মায়। অশোক, জ্যোতির্ময়, কুমুদ, বিপিন, সিরাজুল, রাধারাণী প্রভৃতি সকলে ফেরারী ফৌজ, তাহাদের মধ্যে কেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেহ সরিয়া আসে, কেহ বা বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু বিপ্লবের পথে ইহাই তো স্বাভাবিক। ইহারা হয়তো নিজেদের আগুনে নিজেরাই পুড়িয়া মরিল। কিন্তু সে আগুন নিভিল না, তাহার অদৃশ্য শিখা পরবর্তী মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে চিরপ্রজ্জলিত রাহিয়াছে। প্রথম দৃশ্যটিকে নাটকের প্রস্তাবনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশটি চিত্রিত হইয়াছে এবং অশোক কর্তৃক উইলমট হত্যা এই দৃশ্যেই ঘটিয়াছে। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে এই হত্যার পরিণামই দেখান হইয়াছে। অবশ্য নূতন করিয়া হত্যার আয়োজন এবং হত্যা, ইহার পরে ঘটিয়াছে, কিন্তু উহাদের সহিত অশোকের যোগ নাই। হত্যাকারী অশোকের জীবনতৃষ্ণা, তাহার দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এবং অবশেষে তাহার চরিত্র-হনন প্রভৃতি যেমন গভীর করুণ রস উদ্রেক করে, তেমনি দুঃখ জাগায় অশোকের পরিবারের সকলের সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সীমাহীন দুঃখবরণ। এ-নাটকে জটিল জীবনরহস্য উপস্থাপিত এবং জীবনের রস এখানে গাঢ় ও করুণ। সেজন্য এ-নাটকের আবেদন সর্বজনীন ও চিরন্তন।

॥ কল্লোল ॥ লিটল থিয়েটারের বহু-বিতর্কিত নাটক 'কল্লোল' মঞ্চজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, প্রয়োগ-রীতির অসাধারণ নৈপুণ্যে এবং দ্রুত গতিশীল ও বলিষ্ঠ অভিনয়-কুশলতায় কল্লোল, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাটকরূপে জনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে নৌ-বিদ্রোহ অবলম্বনে নাটকটি রচিত। ভারতে স্বাধীনতালাভের মূলে ভারত ছাড় আন্দোলন, আজাদহিন্দ ফৌজ আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে নৌ-বিদ্রোহেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। নাট্যকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই নৌ-বিদ্রোহের বাস্তব ও অগ্নিময় রূপটি তথ্যনিষ্ঠ ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার প্রকাশ ও পরিণাম সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে ঘোরতর বিতর্ক উঠিতে পারে। এই বিদ্রোহকে সর্বাত্মক জাতীয় সংগ্রামের অঙ্গীভূত না

করিয়া ইহাকে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের রূপ দিয়াছেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নৌ-বাহিনীর ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই নৌ-বিদ্রোহকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় অনেকেই মানিতে পারিবে না। নাট্যকারের রাজনৈতিক তাত্ত্বিকতা যাহাই হউক না কেন, বিদ্রোহের ক্রুদ্ধ ও জ্বলন্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়া নাট্যরস সৃষ্টিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। নাটকের ঘটনা ঘটিয়াছে তিনটি স্থানে, যথা—জাহাজে, ওয়াটারফ্রণ্ট বস্তিতে ও র‍্যাট্‌ট্রের ডাক বাংলোয়। জাহাজী নাবিক ও ব'স্তর বাসিন্দারা একযোগে, র‍্যাট্‌ট্রে ও তাঁহার সহযোগী নৌ-নায়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। বিদ্রোহের নেতা শার্দুল সিং রূঢ়, নির্মম, অনমীয়। সে চিরউদ্ধত ও আমরণ সংগ্রামী। নাট্যকার চরিত্রটির মধ্যে ট্র্যাজিক মর্যাদা আরোপ করিয়াছেন। ঘর থাকিতেও সে ঘরছাড়া, সহযোগীরা তাহাকে সমর্থন করে নাই, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছে। সে শুধু দিয়াছে, কিছু পায় নাই, সে মরিয়াছে, যাহাতে অপর সকলে বাঁচিতে পারে। এ-নাটকে আর একটি জীবন্ত চরিত্র হইল কৃষ্ণাবাঈ। গোর্কির মা চরিত্রের মতই সে কোমল ও কঠিন ধাতুতে গড়া—স্নেহের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা তাহার হৃদয় হইতে উৎসারিত, কিন্তু অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে সে জ্বলন্ত আগুনের ক্ষমাহীন শিখা। এ নাটকে নাট্যকার ব্রেখটীয় রীতির অনুসরণে একটি ভাষ্যকার-চরিত্র আনিয়াছেন। নাট্যকারের মুখপাত্র, ঘটনার ধারা বর্ণনা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যাই হইল তাহার কাজ। ব্রেখটের মতই বোধ হয় নাট্যকার মাঝে মাঝে নাট্যঘটনার সঙ্গে আমাদের হৃদয়াবেগের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বুদ্ধি ও বিচারবোধকে দীপ্ত রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রথম দৃশ্যের প্রারম্ভ ছাড়া আর সর্বত্রই সূত্রধারের বক্তব্য অহেতুক বকবকানি মনে হইয়াছে। সূত্রধারের প্রারম্ভিক বক্তব্যে আমরা জানিলাম নাট্যকার অহিংস বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং সহিংস বিপ্লবের সারবত্তা বুঝাইতে চাহেন। কিন্তু সূত্রধারের পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে শুধু ঘটনার বর্ণনা, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা—বিশেষ কিছুই নাই। আগন্তুক চরিত্রের মুখে এই ঘটনার বর্ণনা অকারণ মনে হয়, কারণ চরিত্রগুলির সংলাপ হইতে ঘটনার ধারা অনুসরণ করিতে দর্শকদের মোটেই অসুবিধা হয় না।

॥ মানুষের অধিকারে ॥ আমেরিকার প্রতি তীব্র ঘৃণা উদ্রেককারী দুইখানি নাটক উৎপল দত্ত লিখিয়াছেন। একখানি হইল 'অজেয় ভিয়েৎনাম' এবং অপরখানি হইল 'মানুষের অধিকারে'। 'অজেয় ভিয়েৎনামের' মধ্যে ভিয়েৎনামে আমেরিকার অমানুষিক অত্যাচার এবং ভিয়েৎকংদের বলিষ্ঠ প্রত্যাঘাত ও জয়

দেখান হইয়াছে। 'মানুষের অধিকারে' আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এ-নাটকেও অত্যাচারিত নিগ্রোদের প্রত্যাঘাত দেখান হইয়াছে। কিন্তু এ-প্রত্যাঘাত মার্টিন লুথার কিং ও তাঁহার অনুবর্তীদের অহিংস প্রতিবাদের রূপ গ্রহণ করে নাই, ইহা সহিংস শাস্তিবিধানেই প্রকাশ পাইয়াছে। নাট্যকার আমেরিকার নিগ্রো, ভিয়েৎকং এবং দুনিয়ার শোষিত শ্রমিকদের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকে বিশ্বের অত্যাচারী মানুষের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। নাটকের ঘটনাকাল আগষ্ট মাস, যখন আমেরিকার সাদা ও কালো মানুষের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং কালো মানুষই সাদা মানুষকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছে। গ্রানভিল নামে ভিয়েৎনাম-ফেরত একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক একটি নিগ্রো বালিকাকে ধর্ষণ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত, অভিযোগকারী ও বিচারক হইল কয়েকজন বিদ্রোহী নিগ্রো যুবক। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অভিযুক্ত সৈনিকের প্রতি অনুকম্পা দেখাইল, দলনেতা স্টিভ তখন ছাব্বিশ বছর আগেকার একটি বিচারকাহিনীর দৃশ্য তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। সেই বিচারও ছিল একটি ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে। তবে সেখানে অভিযোগ ছিল দুইটি শ্বেতাঙ্গিনীকে ধর্ষণ করা সম্পর্কে এবং অভিযুক্ত ছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো যুবক। সেদিন মিথ্যা অপরাধে সেই নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। পশ্চাৎ আলোকপাতে ধৃত সেই বিচারকাহিনী হইতেই নাটকের মূল রস উৎসারিত হইয়াছে। অন্তর্বর্তী বিচারকাহিনীটি আবার তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত (নাট্যকার তারিখ নির্দেশ দ্বারা দৃশ্যবিভাগ বুঝাইয়াছেন)। প্রথম দৃশ্যে প্যাটারসনের গ্রেপ্তার হওয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে আদালত-কক্ষে তাহার বিচার। নিগ্রোবিদ্বেষী আদালতে বিচারের নামে যে শুধু বিচারের প্রহসন হইত তাহাই দেখান হইয়াছে। চমকপ্রদ ঘটনা ও প্রবল ভাবাবেগের ঘাতপ্রতিঘাতে এ-নাটকের আসল রস পাওয়া যাইবে না, তাহা পাওয়া যাইবে আইনের সূক্ষ্ম, বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক-বিতর্কে, লিবোভিটসের জেরা ও সওয়ালের কুশলী মারপ্যাঁচে এবং জটিল গ্রন্থিমোচনের অদ্ভুত নৈপুণ্যে। ধর্ষণ-সংক্রান্ত মোকদ্দমা বলিয়া অশ্লীল প্রসঙ্গ কিছু কিছু আসা স্বাভাবিক। কিন্তু উৎপলবাবু শৈল্পিক সংযম ও শালীনতা সম্পর্কে একেবারেই বেপরোয়া বলিয়া এ-নাটকে এমন বীভৎস অশ্লীল সংলাপ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা প্রেক্ষাগৃহে অন্যান্য দর্শকদের সঙ্গে বসিয়া হজম করা দারুণ অস্বস্তিকর। পরিশিষ্ট দৃশ্যে আবার প্রারম্ভিক ঘটনায় প্রত্যাবর্তন হইয়াছে। গ্রানভিলকে ক্ষমাহীন রাইফেলের

গুলিতে শাস্তি পাইতে হইল। একবার গুলি করাই বোধ হয় যথেষ্ট নহে, ব্র্যানের কথায়, 'মেরে যাও। দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে মেরে যাও। থামবে শুধু রাইফেল বেশী গরম হয়ে গেলে'। ক্ষমার মহৎ আদর্শ নহে, মানবিকতার উদার ক্ষেত্রে উত্তরণ নহে, এ-নাটকে ব্যক্ত নীতি হইল হিংসার প্রতিরোধ হিংসা, হত্যার বদলে হত্যা।

॥ টিনের তলোয়ার ॥ নাটকের গোড়ায় নাট্যকার তাঁহার পূর্বসূরী রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া লিখিয়াছেন, 'যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র। যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী।' নাটকে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের কাহিনীই প্রধান আলোচ্য বস্তু। এই সব শিল্পীর পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ, সামাজিক অখ্যাতি ও লাঞ্ছনাবরণ, নাট্যশালার প্রতি অকৃত্রিম দরদ, অভিনয়ের মাধ্যমে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের আদর্শপ্রচার ইত্যাদি বিষয় আলোচ্য নাটকে দেখান হইয়াছে। বীরকৃষ্ণ দাঁর রক্ষিতা হইতে ময়নার রাজি হওয়ার মধ্যে থিয়েটারের স্বার্থে তাহার যে আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিনোদিনীর আত্মত্যাগের কথা মনে করাইয়া দেয়। গ্রেট বেঙ্গল অপেরা ও তাহার শিল্পীবৃন্দ সবই কাল্পনিক বটে, কিন্তু ঐ নাট্যশালার পরিচালন-ব্যবস্থা ও শিল্পীদের জীবন ও আচরণ তৎকালীন সাধারণ নাট্যশালা ও নাট্যশিল্পীদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। নাটকের ঘটনাকাল ১৮৭৬ সাল এবং সমসাময়িক কালের অনেক নাট্যঘটনা ও নাট্যাভিনয়ের কথা নাটকে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছু কিছু তথ্যগত ভুল চোখে পড়ে; যথা, ময়নার মুখে এক স্থানে রিজিয়া নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু রিজিয়া নাটকের প্রথম অভিনয় হয় অনেক পরে—১৯০৩ সালে। দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার 'ভানুমতী চিত্ত বিলাস' ও 'রামাভিষেকে'র পোস্টার দেখান হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭৬ সালে ঐ নাটক দুইটির অভিনয় দর্শকরুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে, বিশেষ করিয়া 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র (১৮৫২) অভিনয় বহুপূর্বেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। গ্রেট বেঙ্গল অপেরার স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁর সঙ্গে বেনীমাধব ও অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক। ইহা সত্য যে, তখনকার অনেক ধনী ও প্রমোদবিলাসী ব্যক্তি কেবল বিশেষ বিশেষ অভিনেত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই থিয়েটারের দিকে ঝুঁকিতেন, কিন্তু যাঁহার টাকায় থিয়েটার চালিত তাঁহারই বেতনভোগী শিল্পীবৃন্দ তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিবে তাহা সত্যই

অভাবনীয় ব্যাপার। নাটকের মধ্যে একটি মেথরকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার সহিত নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে যে সব কথোপকথনের উপস্থাপনা করা হইয়াছে তাহা যেমন বিরক্তিকর তেমনই হাস্যকর। চতুর্থ দৃশ্যে হঠাৎ দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিখারীদের উপর পুলিশের অত্যাচার-দৃশ্যও নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং সমসাময়িক কালের পটভূমিতে কিছুটা খাপছাড়া। নাট্যকার গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অভিনীত তিনটি নাটকের অংশবিশেষ শিল্পীদের অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যথা—ময়ূরবাহন, সধবার একাদশী ও তিতুমির। এই তিনটি নাটকের অভিনয়ের মধ্যে শেকস্‌পীয়রীয় প্রভাবে রচিত উপহসিত ময়ূরবাহন নাটকের অভিনয়ই দর্শকচিত্তে সর্বাপেক্ষা বেশি ভাবাবেগ উদ্রেক করে। অবশ্য সধবার একাদশীর অভিনয় করিতে করিতে আকস্মিক জাতীয় আবেগে উদ্দীপিত হইয়া তিতুমির নাটকের অভিনয় শুরু করার মধ্যে চমকপ্রদ নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। রবীন্দ্রসদনের বিস্তীর্ণ মঞ্চের সুযোগ লইয়া একই সঙ্গে মঞ্চে ও নেপথ্যে এই নাটকের অভিনয় চালান হইয়াছিল। নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে এই উপস্থাপনারীতি বিশেষ চমকপ্রদ হইয়াছিল।

বীরু মুখোপাধ্যায়

বীরু মুখোপাধ্যায় নাট্যকার ও অভিনেতারূপে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নাটকে যুগচিন্তার সহিত গভীর অনুভূতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ সংক্রান্তি (১৯৫৯) ॥ 'সংক্রান্তি' সাম্প্রতিক কালের একখানি জনসম্বর্ধিত নাটক। নাটকের ঘটনাকাল পঁচিশ বৎসর^ াপী। ইহার তিনটি অঙ্কে তিনটি যুগের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত। আর্নল্ড বেনেট ও এডোয়ার্ড নবলকের Milestones নামক নাটকের সহিত ইহার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহার প্রথম অঙ্কে জমিদারতান্ত্রিক সমাজের রূপ, দ্বিতীয় অঙ্কে যন্ত্রশিল্পনিয়ন্ত্রিত সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ—শিল্পতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের বিরোধ এবং তৃতীয় অঙ্কে পুঁজিবাদী মালিক ও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের বিরোধ এবং শ্রমিকশক্তির আসন্ন জয়লাভের আভাস বর্ণিত হইয়াছে। মোটামুটি বিভিন্ন যুগের চিত্র, সমাজশক্তির পরিবর্তন এবং মানুষের বৃত্তি ও স্বভাবের রূপান্তর নাট্যকার ভালোভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে যুগসংঘাত ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব অপেক্ষা রতনের ব্যক্তিজীবনের কাহিনীটিই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। ছেলের অদলবদল

এবং তাহার ফলে রতনের পারিবারিক জীবনে প্রতিক্রিয়া এবং অবশেষে রহস্যের উদ্‌ঘাটন—এই কাহিনীই নাটকে জটিলতা আনিয়াছে এবং নাট্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পাশে শঙ্করনারায়ণের শ্রমশিল্পপ্রসারের ব্যাপক পরিকল্পনা, মালিক-শ্রমিক সংঘাত সব কিছুই অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। রতনের ছেলেবদল করিবার ঘটনাটি—যাহা নাটকের সব জটিলতার মূলে, সে-সম্বন্ধেও কিন্তু একটা খটকা থাকিয়া যায়। রতন হর্ষনারায়ণের ছেলের সঙ্গে নিজের ছেলের অদলবদল করিতে চাহিয়াছিল আসলে কেন? নিশ্চয়ই তাহার ছেলে সম্পদ-সৌভাগ্য লাভ করিবে সেই আশায়। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হইতেছে কিনা, তাহার ছেলে কিভাবে গড়িয়া উঠিতেছে সে-চিন্তা ও কৌতূহল তো তাহার মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই। অপরের ছেলের প্রতি তাহার নিঃসংশয় অনুরাগ এবং সেই ছেলের বিকলাঙ্গতার জন্য তাহার মর্মবেদনাও যেন অকারণ ও আতিশয্যপূর্ণ মনে হয়। রতনেব মৃত্যুও অহেতুক ও অতর্কিত, কেবলমাত্র করুণরসাত্মক চমৎকারিত্ব আনিবার জন্যই এই মৃত্যু দেখানো হইয়াছে।

॥ সাহিত্যিক (১৯৬০)॥ বঞ্চিত সাহিত্যিকজীবনের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে এই নাটকে। সাহিত্যিকেব মত এতখানি সম্পদ সমাজকে আব কেহই দেন না এবং তাঁহাব মত এতখানি বঞ্চনাও বোধ হয় সমাজ হইতে আর কেহ পান না। তাঁহার কাহিনী ও চরিত্র লইয়া থিয়েটার, সিনেমা, সাময়িক পত্র ও বইয়ের ব্যবসা সব কিছুই ফাঁপিয়া উঠে, অথচ ঐ সব ব্যবসায়েব পুঁজিপতি মালিকগণ সাহিত্যিককে তাঁহাব প্রাপ্য অংশের কিছুমাত্র দিতেও রাজী নহেন। ইঁহাদের সঙ্গে আবাব আছেন স্বার্থবাদী দেশনেতা আর হুজুগপ্রিয়, আন্তরিকতাহীন অনুবাগীর দল, তাঁহারা সাহিত্যিককে নিয়া সভা জমাইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামাইতে বাজি নহেন। এই সব শোষক হিতাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তের দলই আবাব সাহিত্যিককে মৃত ভাবিয়া তাঁহার জন্য শোকোচ্ছ্বাসে ও বদান্যতার বন্যায় সভাক্ষেত্র ভাসাইয়া দেয়। লেখকের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ, তাহাতে হাসির আলোকচ্ছটা নাই, তাহাতে বেদনার অশ্রুবিন্দুগুলি জমিয়া আছে।

॥ দাদা জন্মালেন ॥ আয়তন ও প্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে আলোচ্য নাটকটিকে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীতে ফেলা যায়। দুইটি পর্বে নাট্যঘটনা বিভক্ত হইয়াছে বটে, তবে এরূপ পর্ববিভাগ না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ একই পরিস্থিতিতে এবং একই সময়ে নাটকের ঘটনা ঘটিয়াছে। নাটকের

প্রত্যেকটি চরিত্রই বর্তমান সমাজের এক একটি টাইপ এবং নাট্যকারের বিদ্রূপ-বাণ প্রত্যেকটি চরিত্রের উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তবে তীক্ষ্ণতম বাণে বিদ্ধ হইয়াছে কেন্দ্রীয় চরিত্র হাবলাদা। সমাজবিরোধী গুণ্ডাদলের সর্দার হইয়া ইনি মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং ইঁহারই জন্মদিন পালনের আয়োজন চলিতেছে। তবে নাটকের একটি ত্রুটি এই যে, ইহাতে জোরালো ক্লাইম্যাক্স নাই। যে জন্মদিন পালনের আয়োজনে নাটকের সূচনা তাহার কোন পরিণতি দেখান হয় নাই। হাবলাদার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা অবলম্বনে নাটকের 'দাদা জন্মালেন' এই নামকরণও অর্থহীন।

সুনীল দত্ত

শ্রীসুনীল দত্ত নাটকরচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক সরস ও বিরস বিভিন্ন রীতি ও রসের নাটক তিনি লিখিয়াছেন। হৃদয়দ্বন্দ্বমূলক রস-কাহিনী সৃষ্টি অপেক্ষা তথ্যমূলক ঘটনার বিবৃতির দিকেই তাঁহার প্রবণতা বেশি। নাটকের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ অতি উগ্রভাবেই প্রকাশিত।

॥ হরিপদ মাষ্টার (দ্বি-সং ১৯৫৮)॥ চিরবঞ্চিত শিক্ষকজীবনকে অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দেশের মানুষ গড়িবার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহারা দুঃসহ দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে অবশেষে যে চরম প্রতিবাদের পথটি বাছিয়া লইতে বাধ্য হইলেন তাহাই নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষকজীবনের পরিবেশ নাট্যকার বাস্তব নিষ্ঠার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেজন্য ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ শিক্ষকদের পারস্পারিক ঈর্ষাবিদ্বেষ, স্কুল কমিটির সম্পাদকের অসাধুতা এবং শিক্ষকদের স্বাধীন মতের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি নাটকের মধ্যে সুন্দর ভাবে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মূল চরিত্র হরিপদ মাস্টার আমাদের মনে কোন গভীর শ্রদ্ধা ও মর্মস্পর্শী বেদনা উদ্রেক করিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন বড় আদর্শবাদ ও প্রীতিসিক্ত ব্যবহারের পরিচয় পাই নাই। বরং তাঁহাকে একজন কড়ামেজাজী, রুক্ষভাষী ও নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য লোভান্বিত শিক্ষকরূপেই দেখিতে পাই। শিক্ষক ধর্মঘটের সহিত তাঁহার কোন যোগই দেখা যায় নাই এবং তাঁহার চরিত্রের কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তনের রূপও নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই।

॥ জতুগৃহ (১৯৫৬) ॥ একটি ঈর্ষাপীড়িত হতভাগ্য লোকের বন্ধুহত্যায় এই নাটকের আরম্ভ এবং তাহার আত্মহত্যায় ইহার সমাপ্তি। হয়তো পুরুষত্বহীন অভয় শিখার জৈব কামনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই, কিন্তু শিখার প্রতি তাহার দুর্দমনীয় প্রেমের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সেজন্য অভয়ের প্রতি শিখার নিষ্ঠুর বিতৃষ্ণা এবং রবির জন্য তাহার অনাবৃত লালসা দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। নাটকের মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রমিককে আনিয়া যে শ্রম আন্দোলনের রূপ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহার সহিত অভয়-শিখা-রবির কামনা-ঈর্ষা-বিদ্বেষঘটিত কাহিনীর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। অমরকে হত্যা করিবার কারণও জোরালো নহে। শিখা যে জতুগৃহের মধ্যে ছটফট করিতেছিল অভয়ের আত্মহত্যার পরে বোধ হয় রবির হাত ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার বাহিরে আসিতে সক্ষম হইয়াছিল।

॥ বর্ণপরিচয় ॥ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং সমাজকল্যাণসাধনে তাঁহার অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টার চিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত এই নাটকে অঙ্কিত করা হইয়াছে। নাট্যকার সুগভীর আগ্রহের সহিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং বিশ্বস্ততার সহিত সুপরিজ্ঞাত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করিয়াই তিনি এই জীবনীনাট্য রচনা করিয়াছেন। নাটকের কাহিনীকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্যই তিনি বিদ্যাসাগরের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার কীর্তিময় জীবনের সূর্যকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নকালের একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই নাট্যকাহিনীকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। নাট্যকার নাটকের নাম বর্ণপরিচয় দিলেন কেন? বর্ণপরিচয় প্রণয়ন করিয়া তিনি শিশুদের বাংলা শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, হয়তো সেজন্য এই নামকরণ। কিন্তু নাটকের মধ্যে এই বর্ণপরিচয় প্রণয়নের উদ্দেশ্য প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যই নাট্যকাহিনীর মধ্যে অতঃপর কোন প্রধান স্থান লাভ করে নাই। ব্যাপক অর্থে এই নামকরণের মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের গৌরবজনক অংশের কথা হয়তো বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু নাটকের মধ্যে এই শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের রূপই অনন্য প্রাধান্য পায় নাই। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য হইতে শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতা বিদ্যাসাগরই বড় হইয়া উঠিয়াছেন। নাটকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপের জন্য যেমন নামকরণ অনেকখানি ব্যর্থ হইয়া

গিয়াছে, তেমনি নাটকের ভাবগত ঐক্যও একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অবশ্য বিদ্যাসাগরের বাস্তব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে তাঁহার এই দুই রূপের মধ্যে কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না। নাটকের শেষ দৃশ্যে অতিপ্রাকৃত নাট্যনীতি অবলম্বন করা এবং রবীন্দ্রনাথকে আমদানী করা অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ হইয়াছে।

॥ খরনদীর স্রোতে (১৩৭০)॥ নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'এমনি স্রোত আসে মাঝে মাঝে সমাজের ক্ষেত্রে। এক একটা স্রোতের টানে এক-একটা সমাজের রীতিনীতি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়, ওলট পালট হয়ে যায় সমাজের চেহারা।' আধুনিক যুগবিপ্লবের স্রোত সমাজের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন আনিয়াছে নাট্যকার তাহাই নাটকের মধ্যে দেখাইতে চাহিয়াছেন। জমিদার প্রতাপ রায় চৌধুরীর ধন-সম্পত্তি সব গিয়াছে, রহিয়াছে কেবল আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদাবোধটুকু। সেজন্য তিনি 'ছোটলোক' সাগরের উচ্চশিক্ষালাভ এবং শিক্ষা প্রচারে তাহার প্রচেষ্টা সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার অহমিকা ও বিদ্বেষ অবশেষে তাঁহারই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। যে মেয়ের বিবাহ দিতে যাইয়া তিনি তাহার অন্তরের দিকে তাকাইলেন না, নিজের জেদ ও অহমিকা আঁকড়াইয়া রহিলেন, সেই তাঁহার সকল আয়োজন তুচ্ছ করিয়া খরনদীর স্রোতেই ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাট্যকারের ব্যক্ত উদ্দেশ্য কিন্তু সার্থক নাট্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই। শান্ত, নিরীহ ও কোমলস্বভাব সাগরের প্রতি যে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করা হইয়াছে তাহা অকারণ, অনাবশ্যক এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে হয়। ঘটনা'ও অনেক সময় সঙ্গত ও অনিবার্য হইয়া উঠে নাই। কাঞ্চন তো পিতার আয়োজিত বিবাহ এক প্রকার মানিয়াই লইয়াছিল, তবে সে নদীর স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কেন? সাগরের প্রতি কাঞ্চনের হৃদয়ভাবও বরাবর অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কাঞ্চনের হঠাৎ কলিকাতায় যাওয়া যেমন অপ্রত্যাশিত, সাগরের সম্বন্ধে সকলের সম্মুখে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করাও তেমনি দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ চৌধুরী সাগরের উচ্চশিক্ষালাভ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক উক্তি করিয়া আবার তাহার শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? সাগর কোন অপমান না করা সত্ত্বেও জগৎতারণ হঠাৎ অপমানিত বোধ করিয়া তাহার উপর থামকা চটিয়া গেলেন কেন? উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি না করিয়া ও সংলাপের মধ্য দিয়া ভাবপরিবেশ রচনা না করিয়া নাট্যকার চট করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি দেখাইয়াছেন

বলিয়াই নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের অনেক স্থলই অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য মনে হয়।

॥ দোলা (১৩৭৩) ॥ বর্তমান সমাজের এক অশুভ প্রবণতা আরোর দিকে—আরো সম্মান, আরো সম্পদ, আরো সম্ভোগ। এই আরোর নেশায় মত্ত হইয়া মানুষ নৈতিক মূল্য বিসর্জন দেয়, দৈহিক ও মানসিক শুচিতা বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিসম্পর্কের দাবী বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। এই নেশা আলোচ্য নাটকের নায়ক অসীমকেও পাইয়া বসিয়াছিল। সে তাহার চাকরীতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, সে চাহিল বড়লোক হইতে। বিলাস-ঐশ্বর্যের মায়ামৃগ তাহাকে ভুলাইল। কারখানার মালিক মিঃ মিত্রকে খুশি করিতে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা ও নারীত্ব বিলাইয়া দিতেও তাহার বাধিল না। কিন্তু এ-নাটকের আসল দ্বন্দ্ব নায়িকা দোলার মনে। স্বামীর ইচ্ছা পূরণ অথবা নিজের পবিত্রতা রক্ষা—কোন্‌টি সে করিবে? অবশেষে স্বামীর তাড়নায় সে আত্মবলিদানে বাধ্য হইল। নাটকের রস জমিয়াছে শেষ অঙ্কে—যেখানে রহিয়াছে অনুতপ্ত অসীমের কাতর মিনতি এবং সর্বরিক্তা দোলার মর্মভেদী তিরস্কার। নাটকে মাঝে মাঝে মালিক ও শ্রমিকের কথা শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ও সংগ্রামের রূপটি ইহাতে ফুটে নাই এবং মিঃ মিত্রকেও লালসামত্ত পশু ছাড়া আর কোন রূপে দেখা যায় নাই। ব্যক্তি সম্পর্কের বিকৃতি ও ভ্রষ্টতাই এখানে প্রাধান্য পাইয়াছে, অর্থনৈতিক পটভূমি এখানে অস্পষ্ট।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী নাট্যরচনা ও নাট্যকারদের সংগঠনে সুগভীর নিষ্ঠা ও উদ্যম লইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিদগ্ধ ও মননশীল নাট্যকার—অভিনব বিষয় ও আঙ্গিকের পথে দুঃসাহসিক সন্ধানী। সেই সন্ধান এখনও অতৃপ্ত সেজন্য তাঁহার প্রতিভার পূর্ণতম স্বাক্ষর আজও আমরা পাই নাই। তবে ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি তাহাতে পরিস্ফুট।

॥ সমান্তরাল (১৯৬০) ॥ নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'সমান্তরাল ভাবের নাটক, ঘটনার নয়'। অবশ্য ভাবের নাটক, অর্থাৎ আইডিয়াধর্মী নাটকে ঘটনার বাহ্যরূপ তেমন প্রধান নয় বটে, কিন্তু চরিত্রের অন্তর্গত রূপের বিবর্তনে ঘটনার গতি একেবারে অনুপস্থিত নহে। এই নাটকেও সেই ঘটনার গতি দেখা গিয়াছে শুক্লার নব আত্মচেতনার উপলব্ধিতে—গোষ্ঠ, ঘনশ্যাম ও তরঙ্গের শুক্লায়

রূপান্তরিত জীবনের স্বীকৃতিতে। বিনায়ক ও শুক্লা সমাজের ভদ্রতা ও পঙ্কিলতার দুই রূপ। এই দুই রূপ এখনও সমান্তরাল ধারায় চলিয়াছে, কিন্তু যেদিন ইহারা পরস্পরের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হইতে পারিবে সেদিনেই ঘটিবে সমাজের প্রকৃত মুক্তি। সেজন্য ভদ্রতাকে চিরাচরিত ঘৃণার দৃষ্টি পরিহার করিয়া পঙ্কিলতাকে বুঝিতে হইবে, ভালোবাসিতে হইবে। আর পঙ্কিলতাকেও আত্মপ্রবুদ্ধি ও কঠিন প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া পরিশুদ্ধ হইতে হইবে। নাট্যকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি দেখাইলেন, শুক্লার মত একটি মেয়ে, পিতামাতার কলুষিত সংস্পর্শে যাহার জীবন ছিল চিরবিড়ম্বিত, সেই প্রেমের পাবনী প্রবাহে স্নান করিয়া এক নূতন জীবন লাভ করিল, পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিয়া সে হইল বিজয়িনী। রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয়ের দ্বারা দর্শকচিত্তে বিমল আনন্দ দান করে সাজঘরে তাহাদের জীবন কিরূপ নিরানন্দ ও কুৎসিত, নাট্যকার তাহা নির্বিকার ও বাস্তব নিষ্ঠার সহিত দেখাইয়াছেন। তবে নাট্যকারের মুখপাত্র বিনায়কের জীবন একটু বেশি আদর্শবাদী বলিয়াই বর্ণহীন ও নিরুত্তাপ। ঝর্না চরিত্রটিরও কোন জীবনরস নাই। থিয়েটারের মালিকের প্রতি অভিনেতাদের অতিমাত্রায় উদ্ধত ও অপমানজনক আচরণও কেমন একটু বিসদৃশ মনে হইয়াছে।

॥ ছারপোকা ॥ নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'একজন শিক্ষিত, ভবিষ্যতের আশায় ভরপুর সাধারণ ছেলের জীবনের ক্রম পরিবর্তন দেখান হয়েছে। কিভাবে পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে তার সমস্ত মানসকল্পনা, সমস্ত ভাববাদ ভেঙ্গে গেল, সে নিজেও ক্রমে চক্রবদ্ধ হয়ে চাকার তালে তালে ঘুরতে লাগল।' কিন্তু নাটকের নায়ক অলকের মধ্যে কোন আশাবাদী ও ভাববাদী রূপ লক্ষ্য করা যায় না। পারিপার্শ্বিকতার অনিবার্য চাপও নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। প্রথম ভাগে অলককে দেখিয়া দর্শকের মনে কোন সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগে কিনা সন্দেহ। বরং তাহাকে এক ফাঁকিবাজ তরলমতি, মেয়ে-হ্যাংলা ছেলে বলিয়াই মনে হয়। তাহার চাকুরী গেল এক নির্বোধ খেয়ালী মনিবের আকস্মিক খেয়ালের ফলে। তারপর সে যে শয়তানী বৃত্তি গ্রহণ করিল তাহার কৈফিয়ত আছে কি না সন্দেহ। নিজের স্ত্রীকে খুন করিয়া অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া তাহাকে যে আদালতের দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য করে, তাহাকে ছারপোকা না বলিয়া বিষধর ভুজঙ্গ বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত।

নাট্যকার নাটকটিকে anti-illusionist এবং openstage technique-এর

নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ঘটনাস্থলে অবিরাম পরিবর্তনের কোন দৃশ্যরূপ দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না, সেজন্য ঘটনার প্রকৃতি ও অবস্থান-ক্ষেত্র বুঝিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয়। নাটকে একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা অবিরাম ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের যে যথার্থ ব্যবধান রহিয়াছে তাহা নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাতেও ঘটনার ধারা অনুসরণে দর্শককে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

রমেন লাহিড়ী

তরুণ নাট্যকার রমেন লাহিডী অদম্য নিষ্ঠা ও উদ্যম লইয়া নাট্যসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্গ উভয় প্রকার নাটক রচনাতেই তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন। সমাজের বাস্তব সমস্যা যেমন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, নরনারীর আবেগধর্মী জীবনও তেমনি তাঁহার সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

॥ অপরাজিত (১৯৫৮)॥ বর্তমান জীবন সমাজের বঞ্চনা, আঘাত ও কুৎসিত নোংরামির সঙ্গে যে সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে তাহারই চিত্র ফুটিয়াছে এই নাটকে। আশাবাদী নাট্যকার শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী জীবনকে অপরাজিত রাখিয়া ইহার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এই নাটকের নাম অপরাজিত না বলিয়া অপরাজিতা বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হইত, কারণ প্রধানত একটি নারীচরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের সংগ্রামের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষককন্যা জয়ন্তী পিতা বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত সংসারের দায়িত্ব নিজেই বহন করিতেছিল, পিতার মৃত্যুর পর সেই সংসার তাহার পক্ষে দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। প্রণয়ী বিশ্বাসঘাতকতা করিল, ভাই নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, একটি কর্মহীন পুরুষের বোঝা আসিয়া পড়িল তাহার উপরে। তাহার সুখ গেল, শালীনতা নষ্ট হইল, নারীত্ব হইল ধূলিলুণ্ঠিত। এই সংগ্রামই নাটকের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বস্তু। জয়ন্তী ছাড়া কোন পুরুষচরিত্রই জীবন্ত নহে। নাটকের অনেক ঘটনাই অসঙ্গত, অসমঞ্জস ও অপরিস্ফুট। জয়ন্তীর অনুরাগী সুনীলের মানসিক পরিবর্তন আকস্মিক এবং চরিত্রটির কোন পরিণতিই দেখানো হয় নাই। সুনীল, শচীন ও মাণিক ইহাদের কাহার প্রতি জয়ন্তীর অনুরাগ কতখানি তাহাও সুচিত্রিত হয় নাই। অবশেষে ভিত্তিহীন একটি অভিযোগে মাণিক ও জয়ন্তীর হঠাৎ জড়াইয়া পড়া এবং ইহাকেই অবলম্বন

করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় সংগ্রামী আবেগকে ব্যক্ত করাও অসঙ্গত ও অতিনাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

॥ শততম রজনীর অভিনয় ॥ গিরিশ নাটক-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাটকের মধ্যে নাট্যকারের নাট্যরচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এই নাটকে নাট্যকার ঘটনা সংস্থাপনায় যে আঙ্গিকের অবতারণা করিয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। একটি নাটকের শততম রজনীর অভিনয়ের সূচনা হইতে নাটকের কাহিনীর আরম্ভ এবং অভিনয় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাহিনীরও সমাপ্তি। শেকসপীয়র বলিয়াছেন—

All the world's a stage
And all the men and women merely players.

এই উক্তি যে কত সত্য তাহা এই নাটকে আব একবার প্রমাণিত হইল। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ও বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের সংঘাতজড়িত ধারা, এই দুইয়ের মধ্যে যে কত গভীর যোগ থাকিতে পারে তাহা এখানে আমরা দেখিলাম। নাটকের ছয়টি দৃশ্যের তিনটি দৃশ্য সাজঘরের এবং তিনটি দৃশ্য রঙ্গমঞ্চের। হৈমন্তীকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ ও শুভেন্দুব যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দেখানো হইয়াছে তাহা অদৃষ্টের পরিহাসে তাহাদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেম ও ঈর্ষামিশ্রিত এই দুইটি ধারা সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইতেছিল কিন্তু শেষ অভিনয়ের দৃশ্যে ধাবা দুইটি মিলিত হইল। অভিনয় তখন আর অভিনয বহিল না, অভিনযের সুযোগে অভিনেতার আসল সত্তাটির অবদামত ঈর্ষান্ধ ইচ্ছাই হঠাৎ চবিতার্থ হইল। নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যে ঘটনাস্রোত যে জটিল আবর্ত বচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল তাহার পরিণতি চরম নাটকীয় উত্তেজনা ও ঘনীভূত বিষাদময়তার মধ্যেই এই ভাবে ঘটিল।

॥ পরোয়ানা ॥ নাটকটির আরম্ভ হইয়াছে সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে, কিন্তু ইহার শেষ হইয়াছে বীভৎস অপরাধমূলক ঘটনায়। পরিবারের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অপরাধের পথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে সমাজের একটি বাস্তব সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্ব তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে শঙ্করের নীতিভ্রষ্ট অসামাজিক উদ্দেশ্য ও তাহার পিতা নরেশের দৃঢ় নীতি ও ধর্মের আদর্শের প্রবল বিরোধের মধ্যে। অভাব-অনটনের দুঃসহ আঘাত সহ্য করিয়াও নরেশ যেভাবে সত্যের পথে নিজেকে অবিচলিত রাখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে। কিন্তু নাট্যকার এই চমৎকার

নাট্যদ্বন্দ্বটির পরিণতি না দেখাইয়া মামুলি গুণ্ডার আড্ডায় নাটকের ঘটনাটি লইয়া গেলেন। শঙ্করের লাস লইয়া শেষ দৃশ্যে যে অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো হইয়াছে তাহা নাট্যঘটনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিশয় পীড়াদায়ক। মৃত শঙ্করের ছায়ামূর্তির আভাস মাঝে মাঝে নাটকের মধ্যে আনিয়া নাট্যকার অতিপ্রাকৃতের রহস্য-স্পর্শ আনিয়াছেন।

॥ পান্থশালা ॥ একটি অতিশয় উপভোগ্য কমেডি। নাম ও পরিচয়ের ভুলের ফলে কি ধরনের প্রবল কৌতুকরসাত্মক কমেডির সৃষ্টি হয় তাহা শেকসপীয়র, মলিয়ের, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখকগণ দেখাইয়াছেন। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'গোল্ডস্মিথের একটি নাটকের প্রেরণায় তিনি এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন'। অ-সচরাচরদৃষ্ট ঘটনাসৃষ্টি এবং নারী চরিত্রগুলির প্রগল্‌ভ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে বিদেশী নাটকের প্রভাব অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। তবুও নাট্যকার যেভাবে শেষ পর্যন্ত নাটকের ঘনীভূত সাসপেন্স বজায় রাখিয়াছেন এবং বহুবিচিত্র জটিলতা সৃষ্টি করিয়াও সেই সব জটিলতার সঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য সমাধান ঘটাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংলাপ ও নাট্যপরিস্থিতি শেষ দিকে উদ্দাম কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। সর্বজনীন প্রসন্নতার সুরে অবশেষে নাটকের একান্ত উপভোগ্য পরিণতি ঘটিয়াছে।

॥ ঢেউ ॥ নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'মানবমনের যতেক রহস্য সম্পর্কে অনেক কিছু ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের পরও অধিকতর কিছু রয়ে গেছে অজানা, অপরিচিত।' কিন্তু এই অজানা, অপরিচিত রহস্য আলোচ্য নাটকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন কোন এক নির্জন দ্বীপে একদল লোক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কিভাবে একটি রাত্রি কাটাইয়াছে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে নাটকটিতে। কেবল পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ছাড়া ইহাতে কোনো তীব্র নাট্যদ্বন্দ্ব অথবা গভীর জীবনসত্যের অবতারণা নাই। বুনো চরিত্রটিও শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

॥ বেনজু ॥ যুদ্ধবিরোধী নাটক। যুদ্ধ মানবসভ্যতার নির্মমতম অভিশাপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যুদ্ধের বিলুপ্তি এবং সর্বমানবের পারস্পরিক প্রেমেই যে সভ্যতার পরমতম মুক্তি সে-সম্বন্ধেও বিশ্বের সকল মানবপ্রেমিক সাহিত্যিক ও দার্শনিক একমত। কিন্তু যতদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা পৃথিবী হইতে নির্মূল করা না যাইতেছে, ততদিন দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা অনিবার্য। মাতৃভূমির অখণ্ড পবিত্রতা যদি আমরা রক্ষা

করিতে চাই, তবে সেই মাতৃভূমি রক্ষায় যাহারা সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় নিরত, তাহারা দেশের পক্ষে যে মহত্তর দায়িত্ব পালন করে সে সম্বন্ধে কে প্রশ্ন করিতে পারে? নিষ্ঠুর আঘাতের নিষ্ঠুরতর প্রত্যাঘাত যদি তাহারা না করিতে পারে তাহা হইলে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা পাইবে কিভাবে? তাহারা মৃত্যু বরণ করে—যাহাতে আমাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহারা যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে—যাহাতে আমাদের জীবন সুন্দর হইয়া উঠে। বেনজুর মত তাহাদের সকলেরই মায়ামমতা ঘেরা পারিবারিক জীবন রহিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত মৃত্যুব মুখে অবস্থানের সময় পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনের করুণ কাতর মুখচ্ছবি তাহাদিগকে নিশ্চযই আকর্ষণ করে, কিন্তু তবুও তাহাবা মৃত্যুর দি:কেই আগাইয়া যায়। এমনিভাবে দেশের জন্য নিজেকে ভুলিতে হয়, সকলের জন্য স্বজনকে ছাড়িতে হয। তবেই তাহাবা মৃত্যুঞ্জয় গৌরবের অধিকারী হয়। বেনজুর মত যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র·হইতে পলাইয়া আসে তাহারা ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপব, পলাতক, তাহাবা সৈন্যবাহিনীর কলঙ্ক, দেশের দুরপনেয় লজ্জা। বেনজু নিশ্চয়ই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিযাছিল। (নাট্যকার লিখিয়াছেন, সে বিভ্রান্ত মুহূর্তেব আবেগবশে সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখাইয়াছিল। দেশরক্ষার পবিত্র ব্রত লইযা যাহাবা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় তাহাদের সম্পর্কে 'বিভ্রান্ত মুহূর্তের আবেগ' বলা কি সঙ্গত?)। ভারতীয় বাহিনী তো কোনদিন আগ্রাসী নীতি অনুসবণ কবে নাই, চিবকালই তো শুধু আত্মবক্ষাই করিয়া আসিয়াছে। বেনজুব যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা আগ্রাসী সৈন্যবাহিনীর কোন সৈনিকেব পক্ষে সঙ্গত ও মানবিকতার দিক দিয়া সমর্থনীয়, কিন্তু দেশরক্ষায় নিরত কোন সৈনিকের পক্ষে ঐরূপ মানসিকতা অমার্জনীয় অপরাধ এবং অবশ্যই দণ্ডনীয়। কোন সমালোচক বেনজুর মধ্যে 'নিহত মানবাত্মার কান্না'র সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাব মধ্যে এক যুদ্ধভীত স্বার্থপর আত্মার কান্নাই শুধু দেখিতে পাইয়াছি। মাউথ অর্গ্যান আর একটু কম বাজাইয়া যদি সে অধিকতর দৃঢ়তা ও কর্তব্যবোধেব পবিচয় দিত তবে তাহার চরিত্র আরও গৌরবজনক হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। নাট্যকার এই নাটকে zonal lighting অথবা স্থানিক আলোকপাতের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। আথার মিলার প্রভৃতির নাটকে এ-ধরনের আলোকপাতের মধ্য দিয়া দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তন না করিয়া একই সেটে দৃশ্যান্তর দেখান হইয়া থাকে। ইহার ফলে নাটক আর কয়েকটি দৃশ্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উপন্যাসের ন্যায় যখন

তখন যেখানে সেখানে পরিক্রমণ করিতে পারে। এই অবাধ স্বাধীনতার ফলে স্থান কাল অনুযায়ী ঘটনা সংস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আর নাট্যকারের নাই। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সিনেমার আঙ্গিক একটু বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্বে বার বার স্থানিক আলোক পাতের পরিবর্তন করিয়া একবার বেনজু ইন্দুর স্বল্প কথোপকথন এবং আর একবার সুবেদার হাবিলদারের সংক্ষিপ্ত সংলাপ অবতারণা করিয়াছেন। এরূপ আঙ্গিকে ঘটনা সন্নিবেশের ফলে নাটক আর নাটক থাকে না, সিনেমায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

॥ এলেম নতুন দেশে ॥ আংশিকভাবে সাঙ্কেতিক রীতিতে রচিত। স্থান ও পরিবেশের মধ্যে সাঙ্কেতিকতা বহিয়াছে, কিন্তু ঘটনা ও চরিত্র বাস্তবধর্মী। তবে পরিবেশের সাঙ্কেতিকতাও অস্পষ্ট। পাঁচিলের ওপারে আলোকময় জগৎ বোঝা গেল 'সব পেয়েছির দেশ'—নাট্যকারের কল্পিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু এপারে অন্ধকার জগৎটি কি—অজ্ঞতার জগৎ, না পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্কেত? আর হঠাৎ বাস্তব পৃথিবী হইতে কেহ কামানের গোলার আঘাতে, কেহ বা ঝড়ের তাড়নায়, আবার কেহ বা 'ঝক্কা ঝক্কা ঝক্কা ঝক্কা গুম গুম ঝাঁই'-এর দাপটে এই অন্ধকার জগতের ছিটকাইয়া আসিল, ইহারই বা তাৎপর্য কি? তবে কি বাস্তব পৃথিবীতে প্রচণ্ড সংঘাত অথবা বিপর্যয়ের ফলেই তাহারা আলোর দেশের দরজায় গোড়ায় ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল? নাটকের দুইটি অঙ্কের ঘটনাই সব পেয়েছির দেশের বাহিরে ঘটিয়াছে। প্রথম অঙ্কের শেষে পাঁচিলের দরজা দিয়া চরিত্রগুলির সেই আলো-সুখ-শান্তি ভরা দেশে গমন এবং দ্বিতীয় অঙ্কে তাহাদের মুখে সেই দেশের রঙীন বর্ণনা রহিয়াছে। ঘটনা স্থানের ওপারে সেই স্বপ্নের দেশটি বর্তমান বলিয়া 'গেলেম নতুন দেশে' নামটিই বোধ হয় এই নাটকের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত হইত। প্রথম অঙ্কে কথাবার্তার মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির পরিচিতি ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র কথাই রহিয়াছে, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঘটনার গতি নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে অধিকাংশ চরিত্রের মুখে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুখ-শান্তির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'এলেম নতুন দেশে প্রচার নাটক নয়'।

কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকটি ঘটনা ও চরিত্রের রস ও আকর্ষণীয়তা হারাইয়া তরল ভাব-রঞ্জিত প্রচারেই পরিণত হইয়াছে।

শৈলেশ গুহনিয়োগী

শৈলেশ গুহনিয়োগী (পিকলু নিয়োগী) সাম্প্রতিক নাট্যআন্দোলনে একটি পরিচিত ও প্রিয় নাম। বয়সে নিতান্ত তরুণ হইলেও তিনি অভিনয়, নাট্যরচনা ও নাট্যপরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কৌতুক-অভিনয় ও কৌতুক-নাট্য রচনাতেই তাঁহার শক্তি প্রধানত প্রকাশ পাইয়াছে। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার মানসিক সমতা ও নিরপেক্ষ উদারতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন তাত্ত্বিক মতবাদ লইয়া মাথা না ঘামাইয়া জীবনকে সহজ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিয়াছেন। বেশির ভাগ একাঙ্ক নাটক লিখিলেও কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন। পরিবেশের নূতনত্ব এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্য তাঁহার নাটকগুলি দর্শকদের কৌতূহল অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে।

॥ ক্যাম্পথি ॥ আধুনিক কালে কলকারখানা প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব সমস্যা আমাদের জীবনে দেখা যাইতেছে সেগুলির একটি অবলম্বনে এই নাটকটি লেখা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে দূরে সমাজ ও আত্মীয়শূন্য নিরানন্দ পরিবেশে ফ্যাক্টরীর কাজে কয়েকজন তরুণ টেকনিসিয়ানকে আসিতে হইয়াছে। রঙ্গ-রসিকতা ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়া তাহারা তাহাদের একঘেয়ে, বিরস জীবনের মধ্যে একটু আনন্দ ও উত্তেজনা আনিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু প্রবাসজীবনের বিষাদ ও হতাশা সর্বদা তাহাদের মনের মধ্যে চাপিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ পুরাতন দুঃখময় স্মৃতি রোমন্থন করে, কেহ বা দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের চিন্তায় সর্বদা মর্মপীড়িত থাকে, আবার কেহ কদর্য পথে নিজেকে চালিত করিয়া নিজের সর্বনাশ ঘটাইয়া বসে। এক একটি চরিত্র এক একটি টাইপ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাট্যকারের সহানুভূতি হইতে কেহ বঞ্চিত হয় নাই। এই সহানুভূতির স্পর্শ কয়েকটি কারুণ্যসিক্ত চরিত্র রূপায়ণে বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। যথা, সুপারভাইজার দত্ত, ডি. এন. চ্যাটার্জী এবং বিশেষ করিয়া ক্যাডরিক চরিত্রে। বাংলা নাটকে এই বোধ হয় সর্বপ্রথম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চরিত্রের বাস্তব সমস্যা দরদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়া আলোচিত হইল। ক্যাডরিকের শোচনীয় মৃত্যু টেকনিসিয়ানদের ঘরে ফেরার সকল আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়াছে। নাটকের সংলাপ খুবই সরস ও উপভোগ্য। ইংরেজী, হিন্দীও পূর্ববঙ্গীয় ভাষার বিচিত্র প্রয়োগে এবং আবৃত্তি ও কৌতুকগীতের সংমিশ্রণে সংলাপ চমকপ্রদ ও কৌতুকরসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ডাইভোর্স ॥ দুইটি দৃশ্যের প্রহসন। রেজিস্ট্রী বিবাহের পর এক তরুণ দম্পতি কপট ডাইভোর্সের জন্য উদ্‌যোগী হইয়া অবশেষে কিভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল তাহাই এই প্রহসনে দেখানো হইয়াছে। প্রহসনখানি একটু হাল্কা ও শিথিলভাবে রচিত, সেজন্য কোন ঘটনার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। বিবাহের ফলে এমন কোন জটিল সঙ্কটের সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে নাট্যরস জমিয়া উঠিতে পারে। লঘুরসাত্মক নাটকেও একটি কৃত্রিম ও অস্থায়ী বিরোধ আনা দরকার, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাহারও অভাব। তবে নাট্যকারের অন্যান্য নাটকের ন্যায় এ-নাটকের সংলাপও চমকপ্রদ ও কৌতুকদীপ্ত।

॥ পাহাড়ীফুল ॥ একটি নেপালী মেয়ের সঙ্গে সদ্য যক্ষ্মারোগমুক্ত একটি বাঙালী ছেলের রোমান্টিক ভালোবাসা অবলম্বনে নাটকটি রচিত। রমণীয় পার্বত্য পটভূমিতে স্থাপিত হওয়ার জন্য নাট্যঘটনার রোমান্সরহস্য ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তবে নাট্যকার এই রোমান্টিক প্রণয়িযুগলের বিরোধী চরিত্রগুলির চিত্রণে মাত্রাবোধ ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। শঙ্কর প্রথম আসিয়াই আলোককে মারিবার জন্য বিষ রাখিয়া গেল এবং তাহা জানা সত্ত্বেও পরে আবার তাহার সঙ্গে সকলের স্বাভাবিক কথাবার্তা চলিতে থাকিল, ইহা অস্বাভাবিক বোধ হয়। আলোকের পূর্ব প্রণয়িনী নমিতাকেও একেবারে কামনা-লোলুপা শয়তানী করিয়া তোলা হইয়াছে। নাটকের শেষেও অতি-নাটকীয় ঘটনার আতিশয্য আসিয়া পড়িয়াছে। চলচ্চিত্রের লোকগুলি নাটকের মধ্যে কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারা নাটকের ঘটনার মধ্যে অনাবশ্যকভাবে আসিয়াছে।

॥ সেমসাইড ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারীর কাহিনী অবলম্বনে শৈলেশ গুহনিয়োগী দ্বারা নাট্যরূপায়িত। অবিমিশ্র কৌতুকরসের উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে এই নাটকটিতে। প্রধানত জটিল ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় এই কৌতুকরসের উৎস হইলেও কতকগুলি উদ্ভট টাইপ চরিত্র এবং তীক্ষ্ণ, বিষম শব্দযুক্ত চমক লাগান সংলাপও নাটকের সর্বাঙ্গীণ কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনাগত জটিলতা প্রকাশ পাইয়াছে নাটকের শেষ দিকে, যেখানে রায়বাহাদুর, ভুজঙ্গ ও হরি প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া, না জানিয়া একই পাত্র-পাত্রীর বিবাহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার সে-দুইটি পাত্রপাত্রী পরস্পরকে আগেই হৃদয় দান করিয়া বসিয়াছে।

অর্থাৎ, সেমসাইডের খেলোয়াড়দের মধ্যেই অনর্থক ভ্রান্ত লড়ালড়ি চলিয়াছে। এই উপলব্ধিতেই হাসির হুল্লোড় জমিয়া উঠিয়াছে। কৌতুকরসাত্মক নাটকে একটু অতিরঞ্জন আসা স্বাভাবিক এবং এ-নাটকেও তাহা আসিয়াছে, আবার কৌতুক উদ্দাম হইয়া উঠিলে তাহা জায়গায় জায়গায় স্থূল ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়, এ-নাটকেও তাহা হইয়াছে। অনেক জায়গায় চরিত্রগুলি তাহাদের বয়স ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আচরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরিতৃপ্ত দর্শকদের কাছে এ সব ত্রুটি উপেক্ষণীয়।

॥ ক্লান্ত রূপকার ॥ রঙ্গমঞ্চের শিল্পীজীবন অবলম্বনে রচিত। এ-নাটকের কাহিনী দুইটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারায় মঞ্চশিল্পীদের গোষ্ঠীগত জীবনসমস্যা দেখান হইয়াছে। একনায়ক মঞ্চমালিকের স্বেচ্ছাচারী ক্রিয়া-কলাপের ফলে মঞ্চশিল্পীরা কিরূপ অসহায়ভাবে সকল প্রকার অন্যায় অবিচারের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হয় অভিনেতা-নাট্যকার বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা রূঢ় সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু শিল্পীদের লাঞ্ছিত, সহনশীল রূপ দেখাইয়াই নাট্যকার ক্ষান্ত হন নাই, স্বৈরতন্ত্রী মঞ্চমালিকের বিরুদ্ধে তাহাদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে তাহাদের জয়ই শেষ পর্যন্ত দেখান হইয়াছে। এই সংগ্রামের নায়ক হইল রণজিৎ দত্ত—কৌতুকরস পরিবেশনই তাহার কাজ হইলেও কঠোর হইবার পর্যাপ্ত শক্তিও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। এই কৌতুকশিল্পীর ট্র্যাজেডি ফুটিয়া উঠিয়াছে কাহিনীর অপর ধারায়। কমেডিয়ান রণজিৎ দত্তের কাছে দর্শকরা চাহিয়াছে নিত্য নূতন হাস্য-কৌতুক। রণজিৎ তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দর্শকদিগকে হাসাইতে হাসাইতে নিজে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকের ধারণা হাসির রঙীন বুদ্বুদের মতই তাহার জীবনও বোধ হয় ঐরূপ হাল্কা ও রঙীন। তাহারও যে হৃদয় বলিয়া একটি বস্তু থাকিতে পারে এবং সেই হৃদয়ের গভীরে বেদনা ও কান্না জমা হইতে পারে ইহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। নন্দিতার সঙ্গে অভিনয় করিতে করিতে এবং তাহাকে অভিনয় শিখাইতে শিখাইতে কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বোধ হয় সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। সেই নন্দিতা তাহাকে ছাড়িয়া অন্য থিয়েটারে যোগ দিল। যে বন্ধুদের জন্য সে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে তাহারাই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, তাহার পরিবর্তে অন্য কমিক অভিনেতা নামাইবার কথা তাহারা চিন্তা করিতেছে। যে দর্শকদিগকে রাতের পর রাত সে আনন্দ দিয়াছে তাহারা

এখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতেছে। আজ সে রিক্ত, পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ। তাহার ট্র্যাজেডি চার্লি চ্যাপলিনের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র Lime Light-এর কথা মনে করাইয়া দেয়। এ-নাটকে হাসি ও কান্না মেঘ-রৌদ্রের মত পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, কৌতুকের প্রসন্ন দীপ্তি দেখিতে দেখিতে বেদনার বাষ্পে সজল হইয়া উঠিয়াছে।

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনধর্মী নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের নানা উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত স্তরে যাইয়া নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি পূর্বগঠিত কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টি লইয়া জীবন ব্যাখ্যা করেন নাই, জীবনের মধ্যে নামিয়া যাইয়া সেই জীবনকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব মতবাদের পরিপোষণের জন্য জীবনের খণ্ডিত রূপ গ্রহণ করেন নাই, বরং জীবনের পরিপূর্ণ রূপের সঙ্গে তাহার অনুভব যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতার ফলেই তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি এত সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলির রাগরীতি, স্বভাব, আচরণ ও পরিবেশ এত নিখুঁত-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, দর্শকদের রসোদ্বেলিত চিত্তে সেগুলি চিরস্থায়ী হইয়া যায়। নাট্যকার দরদ ও সহানুভূতি লইয়া জীবনের বেদনাময় অংশেই প্রধানত দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে রচিত 'ইস্তাহার' প্রভৃতি নাটকে ক্রুদ্ধ, হিংসাত্মক সমাধানের দিকে তাঁহার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। জ্যোতুবাবুর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হইতেছে কিনা জানি না এবং তাহার ভবিষ্যৎ নাটকের লক্ষ্য কোন্ দিকে তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি নূতন নূতন নাটক লইয়া যে পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাট্যজীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে।

॥ বায়েন ॥ আধুনিক বাংলা নাটকে সংঘাতক্লিষ্ট নাগরিক জীবনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ, রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতা অথবা বিচ্ছিন্নতাবোধ পরিস্ফুট হইতেছে। গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অথবা গ্রামীণ বৃত্তিজীবী মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র বর্তমান বাংলা নাটকে খুব কমই পাওয়া যায়। সেজন্য আলোচ্য নাটকে উপেক্ষিত ঢোল বাজনদারের বাস্তব ও বিশ্বস্ত জীবনচিত্র দেখিয়া আমাদের মন চার পাশের পীড়াদায়ক যান্ত্রিক সঙ্গীত হইতে ক্ষণকালের জন্য পলায়ন করিয়া গ্রামের পূজাপার্বণ ক্ষেত্রে ঢ্যাম কুড়্ কুড়্ ঢোলের বাজনায় আবিষ্ট

হইয়া পড়ে। নাট্যকার বায়েনের জীবন গভীর নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়াছেন। তাহার ঢোলের ভাষা তিনি অবিকল তুলিয়া ধরিয়াছেন। সামাজিক অনাদর ও অর্থনৈতিক অভাব অনটনের ফলে এই বায়েন-শ্রেণীর বড় সাধের শিল্পসাধনা যে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, নাট্যকার তাহাও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। চরিত্রগুলির মুখে অকৃত্রিম ভাষা প্রয়োগ করিয়া এবং তাহাদের প্রকৃতি ও আচরণের মধ্যে অকপট সরলতা ও স্বাভাবিকতা আরোপ করিয়া তিনি গ্রাম্য পরিবেশ ও বিশুদ্ধ গ্রাম্য জীবনরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রামের মানুষগুলির অনাবিল হৃদয়-সম্পর্কের মাধুর্যরসে নাটকটি অভিষিক্ত হইয়া আছে। স্নেহময়ী দিদি সৌরভী, পরম বিশ্বস্ত ভাগিনেয় পাঁচু, অকৃত্রিম বন্ধু বেন্দা, শুভানুধ্যায়ী রসিক এবং সলজ্জ অনুরাগে সুরভিত শিউলি প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে পরম উপভোগ্য রস সঞ্চার করিয়াছে। বায়েনের অবজ্ঞাত শিল্পসাধনা অবশেষে স্বীকৃতি লাভ করিল। সুবলের শিল্পীজীবনের দিক দিয়া বিচার করিলে নাটকের পরিণতি আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক। সুবল ও শিউলির মিলনেও বোধ হয় আর কোন বাধা রহিল না। কিন্তু নাট্যকার সুবল ও তাহার দিদি সৌরভীর স্নেহসম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়া সৌরভীর মৃত্যু ও সুবলের শোকোচ্ছ্বাসে নাটকের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। পরিণতিতে করুণ রসের একটু আতিশয্য ঘটিয়াছে।

॥ গেটম্যান ॥ বর্তমান কালে যখন অধিকারবোধ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া আমরা কর্তব্যবোধের মূল্য নিতান্তই উপেক্ষা করিয়া চলিতেছি, তখন গেটম্যান গুপীচরণ হঠাৎ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, এখনও হয়তো দুই একজন লোক আছে যাহারা জীবনের প্রিয়তম পাত্র অপেক্ষা কর্তব্যকেই বড করিয়া ভাবে। এখনও কোন কোন মানুষ নিজের পুত্রের জীবন অপেক্ষা অনাত্মীয় জীবনসমষ্টিকে রক্ষা করা পবিত্রতর ধর্ম মনে করে। গুপীচরণের মত লোক মানুষের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা পুনরায় আমাদের মনে জাগাইয়া তোলে। দুইটি ঝাণ্ডা, একটা লাল-সবুজ লণ্ঠন ও দুইখানা গেট লইয়াই যাহার কারবার তাহার নিতান্তই সাধারণ ও উপেক্ষিত জীবন কখনও সভ্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কিন্তু তাহার সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের উপর হাজার হাজার লোকের প্রাণ নির্ভর করে। একদিন এই গেটম্যানের জীবনে চরমতম পরীক্ষার মুহূর্ত আসিয়াছিল। সেই পরীক্ষায় মানবতার উচ্চতম সম্মানসহ সে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে কঠিনতম

মূল্য দিতে হইয়াছিল—বাধাদানকারী একমাত্র পুত্রকে খুন করিতে হইয়াছিল। কোন আদালতে শাস্তি না পাইলেও সে অন্তরে যে দারুণতম শাস্তি ভোগ করিয়াছিল তাহার বিনিময়ে কতটুকু পুরস্কারই বা সে লাভ করিয়াছিল? সংসারে চিরকালই এমনি গুপীচরণের মত মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোক মহত্তম মানবিক কল্যাণের জন্য কঠিনতম মানসিক শাস্তিই পাইয়াছে। কিন্তু তবুও তাহারাই চারি দিককার দুনিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে গুপীচরণের মতই সবুজ লণ্ঠন দোলাইয়া মানবতার নিরাপদ পথ নির্দেশ করিতেছে। 'গেটম্যান' একটি সুলিখিত নাটক এবং নাট্যকার এই নাটকে নাটকীয়তার বিভিন্ন উপাদান অতি সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গুপীচরণকে এখানে এক দিকে কর্তব্যনিষ্ঠ গেটম্যান এবং অপরদিকে স্নেহশীল পিতারূপে দেখান হইয়াছে। অন্তিম সঙ্কটমুহূর্তে কর্তব্যবোধ ও স্নেহশীলতার দ্বন্দ্বে কর্তব্যবোধই জয়ী হইয়াছে। কিন্তু স্নেহশীলতার গভীরতার জন্যই গুপীচরণের ট্র্যাজেডি এত মর্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে। হারাধনকে অবলম্বন করিয়া গুপীচরণ যত স্বপ্ন ও পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে ততই নাট্যশ্লেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্কটের অব্যবহিত পূর্বে গুপীচরণের পিতার কর্তব্যনিষ্ঠা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ আনিয়া নাট্যকার ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষ দিয়াছেন। শেষ সঙ্কটের আগে ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টিতেও তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। রেল লাইনের অপসারণ দেখিয়া গুপীচরণের উত্তেজনা, ধাবমান ট্রেন থামাইবার জন্য তাহার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা, হারাধনের বাধাদান এবং উত্তেজিত অবস্থায় পুত্রের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত দান ও তাহার ফলে হারাধনের মৃত্যু, ট্রেন থামাইতে সক্ষম হওয়াতে তাহার সুগভীর স্বস্তি এবং মুহূর্ত পরেই আবার নিজের হাতে পুত্রকে খুন করিয়াছে—ইহা উপলব্ধি করিয়া প্রচণ্ড শোকের আঘাতে তাহার বিমূঢ় হইয়া যাওয়া, প্রভৃতি নানা বিরোধী ভাব ও ঘটনার সংঘাতে নাটকের মধ্যে চরম নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

॥ মুছেও যা মোছে না ॥ নাট্যকার এই নাটকে একটি রূঢ় সমাজসত্য নির্মম বাস্তব দৃষ্টি লইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। দেশ বিভাগের ফলে সাধারণ মানুষ যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কবলে পড়িয়াছে তাহার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে নাটকটিতে। যে নিরপরাধা মেয়েটি নৃশংস দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অধিকারিণী হইল তাহার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তাহাকে নরকের পথে বিতাড়িত করার মধ্যে যে অমানুষিক নীচতা ও কাপুরুষতা

প্রকাশ পায়, নাট্যকার তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। কুন্দ তাহার লাঞ্ছিত নারী-জীবনের সকল লজ্জা ও কলঙ্ক একটি কঠিন ইস্পাত ফলার মত শাণিত করিয়া সমাজের দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। সেই ইস্পাত ফলাটি সমাজের একেবারে মর্মমূলে বিদ্ধ হইয়াছে। পাকিস্তান হইতে যে সব হতভাগ্য ছিন্নমূল সর্বহারা এ-দেশের মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িল তাহারা বোধ হয় সুখ শান্তি ও নিরাপত্তাই চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এ কোন্ মাটি আশ্রয় করিল? এখানে ঝড়ের আঘাতে ডালপালা ভাঙ্গা গাছের মতই শূন্য রিক্ততা লইয়া রামদুলাল আর্তনাদ করিতেছে, মহিম মাস্টার তাহার হারান স্ত্রী ও কন্যাকে নিষ্ফলভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাদল কুণ্ডু তাহার কন্যাদের দেহপণ্যে বাঁচিয়া আছে, নরহরি ঘৃণ্য লালসার ব্যবসায়ে দালালী নিয়াছে, এবং ছেনো একটি সমাজবিরোধী গুণ্ডায় পরিণত হইয়াছে। এ এক শ্বাসরোধকারী বীভৎস পরিবেশ। কিন্তু নাট্যকার এই পরিবেশ হইতে উত্তরণের আলোকদীপ্ত পথও দেখাইয়াছেন। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই, মাণিকের সংগ্রাম অবশেষে একটি বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইল এবং কলঙ্কিত নারীত্বের বেদনা মুছিয়া দিবার জন্য ললিত কুন্দের দিকে তাহার আশ্বাসভরা হাতটি বাড়াইয়া দিল।

বাদল সরকার

বাদল সরকার বর্তমান নাট্যজগতের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাম। নাটকের আসরে তিনি হঠাৎ প্রবেশ করিয়া চমকের পর চমক জাগাইয়া চলিয়াছেন। নাটকের বিষয় ও রীতি সম্পর্কে তাঁহার নূতন নূতন কৌতূহল অনবরত প্রকাশ পাইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ যেদিকেই তিনি গিয়াছেন সেদিকে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কৌতুক নাটক লইয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু হঠাৎ অ্যাবসার্ড নাটকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। কিন্তু সেখানেই তিনি অচল হইয়া রহিলেন না। তারপরে আবার কৌতুক নাটকের হাল্কা আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বাকি ইতিহাস' লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে। নিন্দাও হইয়াছে প্রচুর; কিন্তু কেহই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। বিশ্বের বর্তমান একটি প্রবল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বাংলা নাটককে যুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার নাটকের প্রভাবে সাম্প্রতিক কালে বহু নাটক রচিত হইতেছে।

॥ বড়ো পিসীমা ॥ হাস্যরসোচ্ছল কৌতুক নাটক। এ নাটকে কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে প্রধানত পরিস্থিতি হইতে। নাট্যকার আকস্মিকভাবে এমন জটিল ও সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কৌতুকরস হঠাৎ উদ্গত ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষিপ্র ও দ্যুতিময় সংলাপগুলিও কৌতুকের অগ্নিকণার মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের হাভ-ভাব, ক্রিয়া ও আচরণ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলিও খুব সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলির রস শুধুমাত্র নাটকের পাঠকরাই পাইবেন, দর্শকরা সেই রস হইতে বঞ্চিত হইবেন। নাটকের প্রথম অঙ্ক সর্বাপেক্ষা বেশি কৌতুকজনক ও রসঘন। ঐ অঙ্কে নাটকের মহড়ার সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিশ্রণ ঘটাইয়া এবং পিসীমার আগমন উপলক্ষে আকস্মিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি রচনা করিয়া নাট্যকার উদ্দাম কৌতুকরসের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অন্তকে লইয়া পিসীমার চলিয়া যাওয়ার পর, কিভাবে অন্তকে থিয়েটারে নামান যায় সেই পরিকল্পনাতেই সকলে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রধান নায়ক হইল শম্ভু। নাট্যঘটনার অনেকখানি এই পরিকল্পনা লইয়া আলাপ আলোচনায় পর্যবসিত হইয়াছে। ঘটনা-বিরলতার জন্য এই অংশটি একটু শ্লথগতি ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। বড়ো পিসীমার প্রবল বাধাদান এবং সেই বাধা অপসারণের জন্য শম্ভু ও তাহার বন্ধুদেব সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র যদি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা হইত তবে নাটকের সাসপেন্স অধিকতর ঘনীভূত হইত। কিন্তু কোন্নগর হইতে ফিরিয়া আসার পর পিসীমার থিয়েটার সম্পর্কে বিরোধিতা যেমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি শম্ভুর বৌদির নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নেপথ্যে পিসীমাকে হাত করার চেষ্টার ফলে মূল ষড়যন্ত্রও অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। খোকা-খুকুর মুখ দিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জ্ঞাপনের মধ্যেও নাটকের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

॥ রাম শ্যাম যদু ॥ রাম-শ্যাম-যদু, জুয়াচোর খুনী ও চোর, এই তিন জনই এই নাটকের নায়ক। ইহারা সমাজবিরোধী ঘৃণ্য অপরাধী, কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি পরিবারের দুঃখময় জীবনের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া এবং সেই পরিবারের লোকগুলির বিশ্বাস ও স্নেহের স্পর্শ পাইয়া, সাময়িকভাবে তাহারা কিভাবে অভাবনীয় মনুষ্যত্বের আলোকে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল তাহাই নাটকের মধ্যে দেখান হইয়াছে। নাটকের গোড়ায় একটি প্রস্তাবনা দৃশ্য রহিয়াছে।

মূল ঘটনা ভবানী চৌধুরীর ঘরে ঘটিয়াছে বলিয়া পূর্বাভাষ ও প্রস্তুতিসূচক প্রথম দৃশ্যটিকে নাট্যকার প্রস্তাবনা বলিয়াছেন। তিনটি অঙ্কের ঘটনা এক দিনেই ঘটিয়াছে, শেষ দুইটি অঙ্কের ঘটনা একটি রাত্রের মধ্যেই ঘটিয়াছে। নাটকের ঘটনাধারা ঘনপিনদ্ধ এবং বরাবর উত্তেজনাকর সাসপেন্স বজায় রহিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চলচ্চিত্রে যে ধরনের কমেডি দেখিতে পাওয়া যায়, এই নাটকটিকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই শ্রেণীর কমেডির মধ্যে ভয়াবহতার সঙ্গে কৌতুকরস মিশিয়া থাকে, নিরবচ্ছিন্ন কৌতুকপ্রসন্নতার ধারা ইহাতে পাওয়া যায় না। এই নাটকেও দুইটি ভয়াবহ মৃত্যুর ঘটনা যেন অতি লঘুভাবে দেখান হইয়াছে। মৃত্যুর বীভৎসতা কমেডির প্রসন্ন উপভোগ্যতা অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে অরুর বিবাহের সম্ভাবনাজনক ঘটনা একটু কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

॥ এবং ইন্দ্রজিৎ ॥ বাদল সরকারের বহু-বিতর্কিত নাটকটি আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন নাট্যধারা প্রবর্তন করিল। এই নূতন নাট্যধারা বর্তমান বিশ্বনাট্যে 'অ্যাবসার্ড' নাট্যধারা নামে পরিচিত। Well made play অথবা সুগঠিত নিয়মবদ্ধ নাটক হইতে এই 'অ্যাবসার্ড' অথবা উদ্ভট নাটক, বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতির দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেজন্য প্রচলিত নাটকের মানদণ্ড দিয়া ইহার বিচার করিলে চলিবে না, ইহার বিচার-পদ্ধতি হইবে একেবারেই স্বতন্ত্র। মার্টিন এসলিন Absurd Drama নামক সংকলন নাট্যগ্রন্থের (Penguin plays) ভূমিকায় এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'If the critical touch-stone of traditional drama did not apply to these plays, this must surely have been due to a difference in objective, the use of different artistic means to the fact, in short, that these plays were both creating and applying a different convention of drama.'

পাশ্চাত্ত্য অ্যাবসার্ড নাটকের রূপ ও রীতির দিক দিয়া বিচার করিলে আলোচ্য নাটকটিকে যে ঐ নাটকের পর্যায়ে ফেলিতে হয় তাহা এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব। সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও অর্থময়তার বিরুদ্ধে অ্যাবসার্ড জীবনদর্শন বিদ্রোহ করিয়াছে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়া এই জীবনদর্শনই ব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের কথায় 'এ যাত্রায় তাই উদ্দেশ হারালো আজ, অর্থ কিছু নাই।' অ্যাবসার্ড দর্শনে

শূন্যতাই হইল চরম কথা—রিচার্ড এন কো-র ভাষায় Nothingness that is man, that was man, that will be man hereafter'. (The Meaning of Un-Meaning)। আলোচ্য নাটকেও জীবনশূন্যতার কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে—'এ এক অঙ্ক। আবর্তনের অঙ্ক! পুরো অঙ্কটার উত্তর শূন্য। তাই পুরো অঙ্কটা কেউ নেয় না। ছোট করে নেয়। উত্তর হয় জীবন ' অথবা—

'অনেক দিনের হিসাব শূন্য—সে কথা যায় না মানা,
অল্প দিনের ক্ষুদ্র গণনে তাইতো গণ্ডী টানা।'

অ্যাবসার্ড দর্শনে সময় ও স্থানের কোন নির্দিষ্ট সীমা গণনা করা হয় না। রিচার্ড এন কো-র কথায়, 'What meaning can be difined by time (and nearly all meaning is defined by time) when time itself is reduced to an adsurdity by the cold and meaningless infinity which his beyond ?' আয়োনেস্কোর, *The Killer* নাটকে বেরেঙ্গার ভাবিয়া পায় না তাহার বয়স কত—Sixty years old, seventy, eighty, a hundred and twenty, how do I know ? এ নাটকেও ইন্দ্রজিৎ তাহার বয়স সম্বন্ধে বলিয়াছে, 'একশো, দুশো জানি না কত।' সে লেখকের নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছে, 'কি হবে শেষ ক'রে ? ওর শেষ নেই। ওর গোড়া শেষ সব এক।' অ্যাবসার্ড নাটকে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, অবসাদ, ক্লান্তি ও হতাশাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ; সাত্রে́, কাম্যু, বেকেট ও আয়োনেস্কোর নাটকের মধ্যে এই ধরনের জীবনদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে। আলোচ্য নাটকে জীবন সম্পর্কে চরম ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিয়া লেখক বলিয়াছেন—

আমি ক্লান্ত। বৃথা প্রশ্ন থাক
এখন ঘুমোতে দাও নিভন্ত নির্বাক
ছায়ার গভীরে।

অন্যান্য অনেক নাটকের ন্যায় এ-নাটকেও মৃত্যুকামনা বড় প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। ইন্দ্রজিতের কথায় এক জায়গায় পাই 'আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের। কত লোক মরে সুখে আছে! যতগুলো আগামীকাল আছে, সব কটা গতকালের সঙ্গে ছাঁচ মিলিয়ে পরম সুখে মরে আছে। আমাকেও তো একদিন না একদিন ঐ রকম মরতে হবে। এখনই মরি না কেন ?'

অ্যাবসার্ড নাটকের জীবনদর্শন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে কতখানি পরিস্ফুট

হইয়াছে তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। এবার অ্যাবসার্ড নাটকের শিল্প-রীতির দিক দিয়া আলোচ্য নাটকের বিচার করা যাক। অ্যাবসার্ড নাটকে গতি ও পরিণাম সম্পর্কে অনাস্থা আছে বলিয়াই নাট্যঘটনার গতি ও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ঘটনার আরম্ভ যেখানে, পরিণতিও সেখানে। অ্যাবসার্ড নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়াই আলোচ্য নাটকে স্থান ও কালের কোন সঙ্গতি রক্ষা করা হয় নাই। ইন্দ্রজিৎ, অমল, বিমল, কমল, মানসী, মাসীমা প্রভৃতি একই পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারার মধ্যে বিভিন্ন স্থান, কাল, বয়স ও ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। চরিত্রগুলি কয়েকটি নাম মাত্র, তাহারা শুধু যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা নানা ব্যক্তিত্বই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার যে একটি নাম শুধুমাত্র একটি চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু নাট্যকার দেখাইলেন, একটি নাম বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে। মানসী কেবল একটি নারীরই নাম নয়; ইন্দ্রজিৎ, অমল, বিমল, কমল, লেখক প্রভৃতি বহু লোকের বহু মানসী তাহার মধ্যেই মূর্ত হইয়াছে। চরিত্রটিকে বহু নারীর প্রতিনিধিরূপে দেখিলে আপাত-অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। একটি ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশমান, পরবর্তী মুহূর্তে সেই ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হইয়া যায়। ইহা মনে রাখিলে আমরা চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তিত রূপের সন্ধানী হইব না। লেখকের কথায়—'এক মুহূর্ত। একটি বর্তমান মুহূর্ত। জীবন।' 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর মধ্যে এক একটি পরিস্থিতি, এক একটি চিত্রই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত। সেই পরিস্থিতির কারণও নাই, পরিণামও নাই। এই নাটকের সংলাপ সঙ্গতিপূর্ণ ও অর্থবহ নয়। মানুষের ভাষা বহু ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত, তাহা আভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশে অক্ষম। লেখকের কথায়ঃ

ভাষা তো প্রাচীন, ক্ষতবিক্ষত কথা
আলো দিশাহারা শিথিল তো প্রকাশে
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।

ভাষার এই দৈন্যের জন্যই নাটকে অনেক স্থানে মূকাভিনয়ের অবতারণা হইয়াছে। নীরবতার মধ্য দিয়াই গূঢ় ভাব অধিকতর সার্থকভাবে প্রকাশ করা যায়, নাট্যকার সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মার্টিন 'এসলিন বলিয়াছেন, 'The realism of these plays is a psychological realism ; they explore the human subconscious in depth rather than trying to describe the outward appearance of human existence.' 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মধ্যেও বাহ্য অসঙ্গতি ও অর্থহীনতার গভীরে জীবনের এক সত্য দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ ও মানসী—এমনি ভাবে এক দুই তিন বাড়িয়া চলে অসংখ্য মানুষের সংখ্যায়। তাহারা জন্মায়, বড় হয়, লেখাপড়া শেখে, চাকরী করে এবং অবশেষে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যায়। তাহারা চলে, সংখ্যাতীত আবর্ত রচনা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে। একটি পরমাণুর পর আর একটি পরমাণু—এমনি ভাবে অসংখ্য পরমাণু তালগোল পাকাইয়া আবর্তিত হয়—অনিবার্য বেগে, উদ্দেশ্যহীন কক্ষপথে, শূন্য পরিণামের দিকে। হাসিকান্নাভরা কয়েকটি বর্তমান মুহূর্ত আলোর চুমকির মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের দুস্তর অন্ধকার। পথের আরম্ভ নাই, শেষও নাই, কিন্তু তবুও পথে চলিতে হইবে। কোন শেষ তীর্থে আমরা পৌঁছিতে পারিব না। কিন্তু অনন্ত কাল তীর্থপথ ধরিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে।

॥ বাকি ইতিহাস ॥ 'বাকি ইতিহাস' 'এবং ইন্দ্রজিতে'র ন্যায় নিখুঁত অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক নয়। অবশ্য অ্যাবসার্ড নাটকের জীবনদর্শন এই নাটকেও আছে, তবে ইহাকে মনস্তত্ত্বধর্মী, বিশেষ ভাবে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বধর্মী, নাটক বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। নাটকের শুধু তৃতীয় অঙ্কের মধ্যেই অ্যাবসার্ড বক্তব্য ও শিল্পরীতি অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকারের চরিত্রগুলির সহিত নাট্যকারের কথোপকথন এবং কোন কোন স্থলে চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাট্যঘটনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যথোপযুক্ত আলোকসম্পাতের প্রয়োগ দ্বারা বাস্তব ও মায়াময় চরিত্রগুলির পার্থক্য বুঝান যাইতে পারে। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' নামক নাটকটির ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই রীতিটি বাংলা নাটকে বহু-ব্যবহৃত হইতেছে। খবরের কাগজে একটি আত্মহত্যার কাহিনী অবলম্বনে প্রথম অর্ধে বাসন্তী এবং দ্বিতীয় অর্ধে শরদিন্দু দুইটি নাটক রচনা করিয়াছে। বাসন্তী তাহার নারীসুলভ দৃষ্টি দিয়া আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছে এবং আর্থিক অভাব ও স্বামী-স্ত্রীর ভাবাবেগপূর্ণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যাটির একটি সরলীকৃত রূপ তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু শরদিন্দু উগ্র সত্যভাষণের পুরুষোচিত সাহস লইয়া বিকৃত মনস্তত্ত্বের জগতে আত্মহত্যার

কারণ সন্ধান করিয়াছে। এক আদিম আরণ্য প্রবৃত্তির তাড়নায় নাবালিকা পার্বতীর উপর বলাৎকার করিবার ফলে সীতালাল এক দুষ্প্রতিরোধ্য অপরাধ-বোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিণামে আত্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে সীতানাথের ভূত লেখক শরদিন্দুর ঘাড়েই চাপিয়াছে। অর্থাৎ, সীতানাথ এখানে শরদিন্দুর অবচেতন সত্তাতেই পরিণত হইয়াছে। সীতানাথের সঙ্গে শরদিন্দুর কথোপকথনের মধ্যে শরদিন্দুর চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্বই প্রকাশ পাইয়াছে। অবচেতন সত্তা তাহার সুখী অভ্যস্ত জীবনের সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, বাসন্তীর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে ফাঁকি ও অর্থহীনতা আবিষ্কার করিয়াছে এবং মৃত্যুমিছিলের বাকি ইতিহাসের দিকে অনিবার্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শরদিন্দু হয়তো সীতানাথের মতই আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাসুদেবের আকস্মিক প্রবেশের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না।

'বাকি ইতিহাসে'র মধ্যেও ক্লান্তি, অবসাদ, শূন্যতাবোধ, আত্মহত্যা-প্রবণতা প্রভৃতি অ্যাবসার্ড জীবনদর্শনের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। জীবনের অর্থহীনতা সম্পর্কে সীতানাথের মুখে আমরা শুনিয়াছি, 'এগারো বছর? এগারো শতাব্দী। এগারো হাজার বছর। রাশি রাশি বছরের অর্থহীনতার ইতিহাস। রাশি রাশি মানুষের রাশি কীটের অর্থহীনতার ইতিহাস'। অ্যালবির '*The Zoo Story*' নাটকের জেরী এবং কোপিটের '*Oh Dad, Poor Dad*' নাটকের জোনাথান চরিত্রের মধ্যে যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গিয়াছে তাহা আলোচ্য নাটকের মধ্যেও বিশেষভাবে পরিস্ফুট। সীতানাথ ও শরদিন্দুর কথোপকথন হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে:

শর। তুমি আত্মহত্যা করলে কেন সীতানাথ?

সীতা। তুমি আত্মহত্যা করো নি কেন শরদিন্দু?

শর। (স্তম্ভিত) আমি?? আমি আত্মহত্যা কেন করবো?

সীতা। কেন করবে না? যুক্তি দাও।

শর। যুক্তি? এ তো সহজ যুক্তি। বাঁচতে চাই ব'লে।

সীতা। কেন বাঁচতে চাও?

শর। কেন বাঁচতে চাই? বাঁচতে কে না চায়?

সীতা। অনেকেই চায় না।

শর। কে বললো চায় না?

সীতা। কে বললো চায় ?

শর। যদি না চায় তো বেঁচে আছে কেন ? আত্মহত্যা করছে না কেন—তোমার মতো ?

সীতা। বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করছে। হয়তো আমার মতো নয়।

'বাকি ইতিহাসে' যে যৌন বিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহাও অ্যাবসার্ড নাটকের একটি লক্ষণ। উদাহরণ স্বরূপ অ্যারাব্যালের *'The Two Executioners'*, অ্যালবির *'The Zoo Story'* এবং কোপিটের *'Oh Dad, Poor Dad'* প্রভৃতি নাটকের নাম করা যাইতে পারে। ঐ নাটকগুলিতে স্বাভাবিক সম্পর্কের বিকৃতি এবং অবদমিত বাসনা-কামনার প্রভাব দেখান হইয়াছে।

মনোজ মিত্র

মনোজ মিত্র সাম্প্রতিক কালের একজন কৃতী নাট্যকার। তাঁহার দৃষ্টি নিত্য নব বিষয়সন্ধানী এবং তাঁহার মন বিচিত্র রসে মসগুল। সেজন্য একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি তাঁহার নাটকে নাই এবং কোন সংকীর্ণ তাত্ত্বিকতার সীমানার মধ্যে তিনি আবদ্ধ নহেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে একটু বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ মনে হয়, কিন্তু আবার অন্য সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রজাপতির মত হাল্কা ডানা বিস্তার করিয়া রম্য বস্তুর সন্ধানে উড়িয়া চলে। তাঁহার ক্রুদ্ধ মেজাজ বাস্তবের প্রতিহিংসা ও বীভৎসতার মধ্যে কখনো কখনো এক জ্বালাময় রূপ ধারণ করে, কিন্তু মনে হয় ইহা তাঁহার ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিমাত্র। তাঁহার স্বাভাবিক মেজাজ প্রকাশ পায় প্রসন্ন জীবনের উপলব্ধিতে এবং স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদনায়।

॥ নীলকণ্ঠের বিষ ॥ নীলকণ্ঠের বিষ একটি বহু অভিনীত মঞ্চ-সফল নাটক। রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পাদরী লংম্যান একটি মেয়েকে ভালোবাসিবার অপরাধে একটি পুরাতন জীর্ণ গীর্জার নিঃসঙ্গ পরিবেশে নির্বাসিত হন। আর্ত, রোগাক্রান্ত পথের মানুষকে কুড়াইয়া আনিয়া তিনি গীর্জায় স্থান দেন। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালোবাসা অপরিসীম। কিন্তু মানুষকে বাঁচাইবার সঙ্গতি ও সামর্থ তাঁহার নাই। উপেক্ষিত ও নির্বাসিত পাদরীর জন্য যখন লোকালয়ে প্রবেশের সম্মানিত দ্বার উন্মুক্ত হইল তখন দেখা গেল, কুষ্ঠরোগীর সেবা করিতে যাইয়া তিনি নিজেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। লংম্যান

তাঁহার প্রিয় মানুষের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং যীশুর প্রতি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সেই নিঃসঙ্গ গীর্জার মধ্যেই রহিয়া গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে ভালোবাসেন তাঁহারাই মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত, তাঁহারা চির-নিঃসঙ্গ। পাদরী লংম্যানের জীবনে পুনরায় এই সত্যই আমরা দেখিতে পাইলাম। কর্মজীবনের অদম্য মাদকতা ও সুতীব্র উত্তেজনা যখন এক করুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইল, তখন লংম্যান বোধ হয় পথ খুঁজিয়া পাইলেন এবং এক পরম নির্ভরতায় তাঁহার সকল ব্যর্থতা সফলতা লাভ করিল।

॥ অবসন্ন প্রজাপতি ॥ মনোজ মিত্র কমেডি রচনায় কতখানি সিদ্ধহস্ত তাহার পরিচয় আলোচ্য নাটকে পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থাপনা-কৌশল এবং সংলাপ সব দিক বিচার করিয়া নাটকটিকে একটি নিখুঁত কমেডি বলা যায়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধুমিতা। সে যেমন একদিকে তাহার সকল প্রণয়প্রার্থীর সঙ্গে প্রেমের সুপরিপাটি অভিনয় করিয়া গিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে তাহার পাওনাদারদের সকলকেই বাগ্‌জালে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সুমার্জিত ছলা-কলা, অসাধারণ বাক্‌চাতুর্য, পবিস্থিতি আয়ত্তে আনিবার অসামান্য ক্ষমতা সব কিছুই আমাদের কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহল সদাজাগ্রত করিয়া রাখে। তাহাকে নিন্দনীয় স্বভাবের জানিয়াও সকলে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে এবং অভিযোগী ও অভিযুক্ত প্রত্যেকেই তাহার কাছে বিবাহের আর্জি পেশ করিয়াছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে বিগতযৌবনার ক্লান্ত স্বীকারোক্তির মধ্যে একটু কারুণ্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। তবে শেষ পর্যন্ত ঘটনার আর একটি মোচড়ের ফলে যৌবনের বসন্তরিক্ত শুষ্ক কুঞ্জবনে দুই বিচ্ছিন্ন চিত্ত আসিয়া পুনরায় মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

॥ চাক ভাঙ্গা মধু ॥ 'চাক ভাঙ্গা মধু' সুন্দরবন অঞ্চলের মহাজনের অত্যাচারে পীড়িত এক ওঝা পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। নাট্যকারের বাস্তবতা এখানে নগ্ন, রূঢ় ও নিষ্ঠুর। যে মানুষগুলি হিংস্র সাপকে হিংস্রতর কঠোরতা দ্বারা বশ করে, আরণ্য প্রকৃতির আদিম ভয় ও রহস্য জড়িত পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করে তাহাদের স্বভাবের মধ্যে অরণ্যচারী মানুষের উলঙ্গ, উদ্ধত জান্তবতা তাহার সরল ও ভয়াল রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে। মহাজন শ্রেণীর অমানুষিক শোষণ ও উৎপীড়নে তাহারা সর্বরিক্ত দারিদ্র্যের চরমতম দুর্দশায় পতিত, তাহাদের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত ও ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু

যেদিন তাহারা প্রত্যাঘাতের হিংস্র নেশায় মাতিয়া উঠে সেদিন তাহারা অতি নির্মম ও ক্ষমাহীন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাদামী, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্তান তাহার গর্ভে, দুঃসহ দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে তাহার গর্ভস্থ সন্তানকে লালন করে, অজাত জীবনের স্পন্দন সে রোমাঞ্চিত আনন্দে অনুভব করে। দেহধারণের ক্ষুধা অপেক্ষা তাহার মাতৃত্বের ক্ষুধা প্রচণ্ডতর। সেজন্য কিছুতেই সে তাহার গর্ভস্থ জীবন-কণিকাটুকু নষ্ট করিতে দিবে না। তবে তাহার গর্ভের সন্তান সম্পর্কে সে তাহার বাবার সঙ্গে যেরকম বে-আব্রু কথাবার্তা বলিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তিজনক মনে হইয়াছে। তবে নাট্যকার হয়তো বাস্তবতার খাতিরে অশালীন ও অস্বস্তিজনক কথাবার্তা যথাযথ রাখিতে চাহিয়াছেন। বাদামী তাহার বাবা মাতলা ওঝাকে একরকম জোর করিয়াই তাহাদের ঘৃণ্যতম শত্রু সুদখোর মহাজন অঘোর ঘোষকে সর্পদংশনে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে বাধ্য করিয়াছে। অঘোর ঘোষ বাঁচিয়া উঠিল বটে, কিন্তু প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াই সে তাহার কুৎসিত লালসার বিষাক্ত মূর্তি ধারণ করিল। অবশেষে সে তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইল এবং সেই শাস্তি পাইল তাহারই হাতে যে তাহাকে কিছুক্ষণ আগেই একরকম বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার ক্ষণে ক্ষণে নাটকের মধ্যে শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা উত্তেজনাজনক চমকের দ্বারা আমাদের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আঞ্চলিক ভাষা এবং ঝলসানো শব্দের তীক্ষ্ণ প্রখরতা দ্বারা তিনি নাটকের সংলাপকে মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ কোথায় যাবো ॥ নাট্যকার বলিয়াছেন, 'কোথায় যাবো হাসির নাটক। হুল্লোড়ের উপকরণও প্রচুর।' হাসির নাটক নিশ্চয়ই, কিন্তু এখানে প্রচুর হুল্লোড়ের উপকরণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হুড়াহুড়ি দাপাদাপির মধ্য দিয়া এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয় নাই। সরস পরিস্থিতি রচনা এবং আকস্মিক ঘটনার মোচড়ের মধ্য দিয়া ইহাতে হাস্যরস উদ্রেক করা হইয়াছে। তবে এখানে হাস্যরসের মধ্যে কেবল ঝলসান দীপ্তি নয়, বিষাদের ছায়াও মিশিয়া রহিয়াছে। গৃহচ্যুত গজমাধবের নিরুপায় নিঃসঙ্গতা দর্শকদের চিত্ত বিষণ্ণ করিয়া তোলে। শেষকালে তাহার বিদায় মুহূর্তে বহু পুরাতন এক চিঠির কথাগুলির উচ্চারণের সময় সাইরেন ও এরোপ্লেনের শব্দের মধ্য দিয়া অতীতের এক হারানো স্মৃতির ক্রন্দনময় ভাবানুসঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

রতনকুমার ঘোষ

রতনকুমার ঘোষ সাম্প্রতিক কালের একজন জনপ্রিয় নাট্যকার। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে এক একটি দার্শনিক বক্তব্য থাকে, সেই বক্তব্য অনেকস্থানে সৃষ্টির আদি-অন্ত রহস্য ও মানব জীবনের বিবর্তন-ধারার পটভূমিতে উপস্থাপিত। বর্তমান যুগের যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া তিনি নিত্যকালের কোন সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলির ঘটনা ও চরিত্র অধিকাংশ স্থলেই রূপকধর্মী, তবে প্রাকৃতিক উপাদান কিংবা মানবিক স্বভাবের কোন গুণ যখন নাটকীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয় তখন তাহা খুবই স্থূল মনে হয়। রূপক প্রয়োগের মধ্যে সর্বত্র যে অর্থেব সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় তাহাও নহে। সেজন্য কোন কোন নাটকে বড বড় কথাও চমকপ্রদ উপস্থাপনা কৌশল সত্ত্বেও মূল বক্তব্য অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। তাঁহার নাটকে কোন ভাষ্যকার-জাতীয় চরিত্র, কোরাস, সম্মিলিত আবৃত্তি, মূকাভিনয় প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যগুলি বিচ্ছিন্ন ও আপাত অসংলগ্ন। কিন্তু টুকরা টুকরা দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া একটি মূল বক্তব্য আভাসিত হয়।

॥ অমৃতস্য পুত্রা ॥ নাটকেব ঘটনাস্থল একটি পরিত্যক্ত পার্ক। একটি দিনের সকাল, দ্বিপ্রহর ও রাত্রিতে নাটকের তিনটি দৃশ্যের ঘটনা ঘটিয়াছে। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'যুগ-যুগব্যাপী মানুষের অমৃতলাভের সেই সাধনা, সেই সংগ্রাম—এক প্রবহমান ইতিহাস।' আলোচ্য নাটকে শিল্পী সনাতন অমৃতলাভের সেই সাধনা ও সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে। সজ্জন, রমণীমোহন, তরুণ ও বানওয়াবলাল বিষকণ্টকে তাহার পথ দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই কণ্টকিত দুর্গম পথেই তাহার যাত্রা। সে রিক্ত, সে মুক্ত, তাহার কোন বাসনা নাই, তাহার কোন অভিযোগও নাই। সে গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহার চোখে অনন্ত ক্ষমা আর অফুরান ভালোবাসা। অবশেষে আলোর পথের যাত্রী অন্ধকারের হাতে প্রাণ দিল। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতলোকের দিকেই সে সকলকে আহ্বান জানাইল।

নাটকের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে প্রতীকী ধ্বনি ও সংলাপের ব্যবহার করা হইয়াছে। চরিত্রগুলিও তাহাদের বাস্তব সীমা ক্ষণে ক্ষণে লঙ্ঘন করিয়া যেন প্রতীকী চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের সংলাপ দ্যুতিময় ও কবিত্বরঞ্জিত।

নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে সকালের জন্য, সিঁড়ি, ফেরা, সম্রাট, ভূমিকম্পের পরে, ভূমিকম্পের আগে, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মোহিত চট্টোপাধ্যায় উদ্ভট নাট্যরচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। উদ্ভট নাটকের লক্ষণগুলি তাঁহার নাটকের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যথা, ঘটনার অসঙ্গতি ও পারম্পর্যহীনতা, স্থান-কালের সীমা সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীনতা, একই চরিত্রে নানা: ভূমিকাগ্রহণ, পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের সংযুক্তির অভাব, অবসাদ, ক্লান্তি, মৃত্যুকামনা ইত্যাদি। কিন্তু মোহিতবাবু উদ্ভট নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করিলেও জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীন নহেন। অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে দলবদ্ধ জনশক্তির সংগ্রাম এবং জনশক্তির অন্তিম জয়, শোষণহীন মুক্তিপথের দিকে মানুষের বিজয়ী অভিযান ইত্যাদি তাঁহার নাটকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নাটকের শেষ দিকে তাঁহার মতবাদ ভাবাবেগরঞ্জিত সংলাপের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবি, সেজন্য তাঁহার কবিধর্ম এই ধরনের নাটকে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। মার্টিন এসলিন বলিয়াছেন, 'the Theatre of the Absurd aims at concentration and depth in an essentially lyrical, poetic pattern.'[১] মোহিতবাবুব নাটকে এই চিত্রময় ও ধ্বনিময় কবিত্ব পরিস্ফুট। তাঁহার সংলাপে কবিতার বেগ ও আবেগ দুই দিকই বর্তমান। সংলাপের একরূপতা, পৌনঃপুনিকতা ও পবপর সম আয়তনের বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়া সংলাপে ছন্দের স্পন্দন সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকেব ভাষা শুধু সংলাপনির্ভর নয়। আলো, ধ্বনি প্রভৃতিব মধ্য দিয়া সেই ভাষা শব্দগত অর্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

॥ মৃত্যুসংবাদ ॥ নাট্যকার নাটকটি সম্পর্কে বলিয়াছেন. 'ভারতবর্ষে প্রথম কিমিতি নাটক হিসেবে রচনাটি বিপুল বিতর্কের গুরুত্বও অর্জন করেছিল।' কিমিতি অথবা উদ্ভট নাটকের কিছু কিছু লক্ষণ যে এই নাটকে আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখকের কথায়, 'আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে লস্টনেস, অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতা, ভালোবাসা, আত্মার অভাবগ্রস্ত পিপাসা, বাঁচার উল্লাস ও বেদনা, হত্যা ও আত্মহত্যার কারণ ইত্যাদি বুদ্ধিগত এবং অনুভবপ্রধান জিজ্ঞাসা মৃত্যুসংবাদে তীব্রতা লাভ

১। *The Theatre of the Absurd* by Martin Esslin (Pelican edition), P. 394.

করেছে।[১] উদ্ভট নাটকের জগতে জীবনের এই অস্তিত্ব সম্পর্কে অনীহা, সংশয় ও হতাশাই প্রকাশ পায়। কিন্তু নাটকটিকে পুরাপুরি অ্যাবসার্ড নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ অ্যাবসার্ড নাটকে সব চরিত্রের কথা ও আচরণই এক সামগ্রিক অ্যাবসার্ড অথবা উদ্ভট জগতের মধ্যে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু এ-নাটকে উদ্ভটত্ব প্রকাশ পাইয়াছে প্রধানত লোকটির কথা ও আচরণের মধ্যে এবং কিছুটা তাহার বাবা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মধ্যে। অবশ্য নীরেনকাকুর আত্মহত্যার চেষ্টার মধ্যেও কিছুটা উদ্ভট নাটকের অনুরূপ চরিত্রের আভাস আছে। অন্যান্য চরিত্রগুলি স্বাভাবিক বাস্তব জগতের চরিত্ররূপেই উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা, অর্থাৎ বুলু এবং তাহার ক্লাবের সদস্যরা বাস্তব জগতের অধিবাসী। সেজন্য লোকটি তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিচিত, অথচ তাহার সম্পর্কে তাহাদের কৌতূহল ও সম্ভ্রমের আর অন্ত নাই। লোকটি চারপাশের মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে না, ক্যামুর নায়কের মত সেও একজন 'আউটসাইডার'—বাহিরের লোক। তাহার জন্মের জন্য সে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ—সেজন্য তাহার ক্রোধ ঈশ্বর ও পিতার উপর। সে কল্পনা করে যে সে পিতাকে হত্যা করিয়াছে। আসলে তাহার কাছে ঘটনা অপেক্ষা ভাবনার গুরুত্ব বেশি, সেজন্য সে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে অস্থির অপ্রকৃতিস্থ, অস্বাভাবিক।

॥ ক্যাপ্টেন হুররা ॥ নাটকটির ঘটনা ঘটিয়াছে একটি হোটেলে। সেই হোটেলটিই বার বার জাহাজরূপে কথিত হইয়াছে। জাহাজের চালক ক্যাপ্টেন হুররা এবং তাহার সহকারী গুগুলু। হোটেলের মধ্যে আসে এক নব দম্পতি। কথায় ও আচরণে তাহারাই যেন স্বাভাবিক জগতের লোক। আর সব চরিত্রই রহস্যমণ্ডিত উদ্ভট চরিত্র। সকলেই একটি মানচিত্রের সন্ধান করিতেছে। হুররার কথায় 'একটা নতুন দেশের ম্যাপ, একটা নতুন পথের মানচিত্র আমরা সবাই চেয়েছিলাম।' সুনীল, ইরা, যুবক ও ফান্টুস যখন দলবদ্ধ হইয়া দুর্জয় সাহস ও প্রতিরোধের শক্তিতে জাগিয়া উঠিল তখনই

১। *Theatre of the Absurd* সম্পর্কে মার্টিন এসলিন চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, 'an effort to make man aware of the ultimate realities of his condition, to instil in him again the lost sense of cosmic wonder and primeval anguish, to shock him, out of an existence that has become trite, mechanical, complacent and deprived of the dignity that comes of awareness'—*The Theatre of the Absurd*—Martin Esslin (Penguin.), P. 390.

তাহারা অচল জাহাজটিকে যেন চালাইতে সক্ষম হইল। নূতন পথের সন্ধান তখন তাহারা পাইল। ক্যাপ্টেন হুররা ও তাহার সহকারী গুগুলু আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। নাটকটির ঘটনার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য রহস্যের জাল যেন বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে, চরিত্রগুলির কথা ও আচরণের মধ্যে সঙ্গতি ও পারম্পর্য কিছুই নাই। কিন্তু শেষকালে যেন ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস একটু বেশি প্রকাশ পাইয়াছে, হঠাৎ যেন একটি সরলীকৃত তরল বক্তব্য নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

॥ রাজরক্ত ॥ যে রাজা অপর সকলের রক্ত এতদিন শোষণ করিয়াছে তাহারই রক্তের জন্য মিলিত মানুষের প্রচণ্ড প্রতিঘাত এ নাটকে দেখান হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে দেখিতে পাই, ছেলেটি একক চেষ্টায় রাজাকে আঘাত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং সে আর তাহার সঙ্গিনী কারারুদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তাহারা বুঝিয়াছে, একা একা যুদ্ধ হয় না। সেজন্য তাহারা মিলিয়াছে, সকলে মিলিয়া এক হইয়াছে এবং কোরাসে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা তাজা তাজা প্রাণের অনেক রক্ত নিয়াছে। কিন্তু সেই রক্ত হইতে রক্তবীজের মত অসংখ্য সংগ্রামী প্রাণের পুনর্জন্ম হইয়াছে। তাহাদের বুকেও রক্তের তৃষ্ণা, সে রক্ত রাজরক্ত। হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়া গণমুক্তির আভাস স্পষ্ট। নাটকে ছেলেটি ও মেয়েটির চরিত্ররূপ নিজেদের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় চরিত্রদুইটি নানা ভূমিকার মধ্যে বারবার রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম চরিত্রটি রাজাসাহেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তবে মাঝে মাঝে অত্যাচারী রাজাসাহেবের নানা সহায়ক শক্তির ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় চরিত্র কখনো রাজাসাহেবের পক্ষীয়, আবার কখনো বা রাজাসাহেবের বিপক্ষ শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে মঞ্চে রাখা অন্য বেশ-বাস গ্রহণ করিয়াই তাহারা অন্য ভূমিকার ব্যক্তিত্বে মিশিয়া গিয়াছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং রূপান্তরিত ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় অর্থবহ শব্দ ও আলোকপ্রয়োগের মধ্যে। এ-নাটকে কথার ভাষার চেয়ে আলো ও শব্দের ভাষার গুরুত্ব বেশি। এ-নাটকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে একই সংলাপের পৌনঃপুনিকতা লক্ষণীয়। একই ধরনের ছন্দোবদ্ধ বাক্যপ্রবাহের মধ্য দিয়া সম্মিলিত জনমানসিকতা অথবা ঐক্যবদ্ধ বক্তব্যই যেন উপস্থাপিত হইয়াছে।

বিবিধ নাটক ও নাট্যকার

॥ পরিচয় (১৯৫১) ॥ মানুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করিবার জন্যই সমাজের সৃষ্টি। অথচ সেই সমাজের শৃঙ্খলা যেখানে শৃঙ্খল হইয়া উঠে, সংস্কার যখন শাসনের রূপ ধারণ করে তখনই সুরু হয় সমাজসত্তার সহিত ব্যক্তিসত্তার তীব্র সংঘাত। সেই সংঘাতের রূপ পরিস্ফুট হইতেছে আধুনিক উপন্যাস ও নাটকে। জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' নাটকেও সেই সংঘাতের পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রেমের চেয়ে বিবাহ বড, না বিবাহের চেয়ে প্রেম বড—এই সমস্যা বহুতর নরনারীর জীবনে মৌন বেদনায় আলোড়িত হয়; এই সমস্যা নীরদ, লতা, নবেশ ও নিভার জীবনকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহাই নাটকের একমাত্র সমস্যা নহে। শশাঙ্ক ও আলি এবং নীরদ ও নিবারণকে অবলম্বন করিয়া স্নেহ-অভিমানজড়িত পিতা-পুত্রের সমস্যাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে এবং তার পর নরেশ ও আভাঘটিত একটি কুৎসিত সামাজিক সঙ্কট এবং সেই সঙ্কটের ত্রাণকর্তারূপে আলির ইসলামী উদারতা বইয়ের সমস্যাকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মের কোন অনিবার্য হৃদয়হীনতার দিক অকাট্যরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আলির মুখে নাট্যকার অনেক বড বড কথা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ ও আভাকে লইয়া পলায়নের চেষ্টার মধ্যে কোন মহত্ত্বের লক্ষণই আমরা খুঁজিয়া পাই না। স্বধর্মদ্রোহিতাকে অনেকে উদারতা বলিয়া গর্ব করেন। সেই গর্ব অবশ্য নাট্যকার করিতে পারেন।

॥ এরাও মানুষ (১৯৫৬) ॥ 'এরাও মানুষ' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে পরিতৃপ্ত দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। নিষ্ঠুর অত্যাচারপীড়িত বিকলাঙ্গ লোকের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির দিকে আমাদের কারুণ্যবিগলিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন জগৎবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগো। নাট্যকার সন্তোষ সেনের দৃষ্টিতেও করুণা ও সমবেদনা মেশানো। তিনি বলিয়াছেন, 'বিধাতার অভিশাপ-বিডম্বিত ওদের জীবন,—আমরা আবার নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে অসহনীয় ক'রে তুলি কেন?' আজিকার সংশয়, বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষভরা জগতে এ-দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অবশ্য ভাবাবেগের দিক দিয়াই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া জায়গায় জায়গায় একটু অতিরঞ্জন ও করুণ রসের আতিশয্য আসিয়া গিয়াছে। দাশুর প্রতি একমাত্র বিরূপ চরিত্র অঞ্জলি। সেজন্য চরিত্রটির মধ্যে স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক নৃশংসতা দেখা গিয়াছে। আর

পরিবারের সকলেই, এমন কি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কমল পর্যন্ত অঞ্জলির নিষ্ঠুর আচরণ মানিয়া লইতেছে, ইহাও একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। দাশুর হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম; পঙ্গু ঈর্ষা ও বোবা অভিমান অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। আর আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা সবটুকু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে অমিতা। তাহার প্রীতি, মমতা ও ত্যাগের তুলনা নাই।

॥ দলিল (১৯৫২ ?) ॥ ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' বাস্তুহারাদের সমস্যা অবলম্বনে রচিত একখানি বহু অভিনীত নাটক। এই নাটকে বাস্তুহারাদের শুধু দুঃখবেদনা নহে, প্রবল সঙ্ঘশক্তি ও তীব্র প্রতিরোধের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'ভাঙ্গা বাংলার প্রতিরোধই আমার শেষ বক্তব্য।' নাটকের শেষেও একটি কথা বার বার ধ্বনিত হইয়াছে, 'বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই।' পশ্চিমবাংলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের সম্মিলিত বিদ্রোহের মধ্যে একটা যোগস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। নাট্যকার এই নাটকে অঙ্কের স্থলে 'প্রবাহ' এবং দৃশ্যের স্থলে 'অংশ' কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম প্রবাহে দেশবিভাগ ও বাস্তুত্যাগ, দ্বিতীয় প্রবাহে শিয়ালদহ স্টেশনে জান্তব জীবনযাত্রা এবং তৃতীয় প্রবাহে আবার নূতন ঘরের সন্ধান ও রূপান্তরিত জীবনের সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে। প্রধানত একটি পরিবারের কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইলেও বাহিরের গণ-উত্তেজনা ও সম্মিলিত সংগ্রামের তরঙ্গোচ্ছ্বাস বারে বারে এই পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

॥ শুধু ছায়া (১৯৫৯) ॥ পরেশ ধরের 'শুধু ছায়া' নামক নাটকখানি আঙ্গিকের দিক দিয়া পিরাণ্ডেলোর *Six Characters in Search of an Author*-এর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক। তবে ইতালীয় নাটকখানির ন্যায় এই নাটকের ছায়াচরিত্রও ছয় জন। আধুনিক ছায়াছবির জীবনসম্পর্কহীন অবাস্তব কল্পনাবিলাসী কাহিনীর প্রতি লেখকের শ্লেষ সুস্পষ্ট। সুমঙ্গলের মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনবাদী, সত্যনিষ্ঠ লেখকের দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় ও নির্লোভ মর্যাদাবোধ ব্যক্ত হইয়াছে। স্বপ্নময় ঐশ্বর্যভরা জীবন হয়তো অনেকেরই কাম্য, কিন্তু তাহা তো সত্য নহে, সত্য হইল রুক্ষ পথচলা কর্মকঠিন জীবন। সেই সত্যবোধে ছায়াচরিত্র দীপা দিলীপের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় এবং সেই সত্যবোধেই মালা সুমঙ্গলের প্রতি পরিতৃপ্ত দৃষ্টি লইয়া তাকায়।

॥ দুইমহল (১৯৫৮) ॥ জোছন দস্তিদারের 'দুইমহল' সাম্প্রতিক কালের একখানি জনপ্রিয় নাটক। আজিকার সমাজ-ইমারতের দুই মহল ইহাতে

অভ্রান্ত ও বাস্তব নিষ্ঠার সহিত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বাহিরের মহলে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলে, কিন্তু ভিতরের মহলের কুৎসিত অন্ধকারে বীভৎস অত্যাচার চলিতে থাকে, সেখানে নৃশংস ঘৃণা ও নারকীয় জিঘাংসা চারদিক হইতে ওত পাতিয়া আছে। এই দুই মহলে রঞ্জন সান্যালের দুই রূপ ধরা পড়ে। তবে বাহিরের মহলে তাহার পারিবারিক পিতৃরূপই শুধু প্রকাশিত, তাহার সম্ভ্রান্ত সমাজসেবক রূপের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভিতরের মহলের অমানুষী গুণ্ডা-সর্দারের রূপ অবশ্য ভালভাবে উন্মোচিত হইয়াছে। সেই মহল অর্থাৎ অতীনলালের ডেরার ভয়াবহ বাস্তবতা সহ্য করা সত্যই কঠিন। তবে নাট্যকার এই নরকের মধ্যেও স্নেহ-প্রেমের দুই একটি আলোকরেখা দেখাইয়াছেন। মনুয়া ও ওসমানীর ভালবাসা ও লালুয়ার স্নেহসিক্ত সহানুভূতির মধ্যেই এই আলোকরেখার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। অতর্কিতভাবে অস্পষ্ট ও উত্তেজনাহীন ঘটনার মধ্যে যেন নাটকের পরিণতি ঘটিয়াছে। নিজের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঐভাবে রঞ্জনের পক্ষে লালুযাকে ধরাইয়া দেওয়া অস্বাভাবিক ও কষ্টকল্পিত হইয়া পড়িয়াছে। রঞ্জনের প্রাপ্য শাস্তি অথবা পরিবর্তন কোনটিই যেন নাটকের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না।

॥ মরুঝঞ্ঝা (১৩৬৮)॥ নাটকের কাহিনী কাল্পনিক হইলেও ইহাতে বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনার সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর মিলিটারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামরিক শাসনের স্বৈরাচার ও উৎপীড়নে সমগ্র দেশ সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত। বামপন্থী লেগার্ট ও তাঁহার অনুবর্তী দল এই শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সামরিক নেতাদের অত্যাচারের মাত্রা অমানুষিকতার স্তরে পৌছান-সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে জঙ্গী শাসনের পতন ঘটল। নাট্যকার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নাটকটির বিষয়বস্তু যেমন অভিনব, নাট্যধর্ম তেমনি প্রশংসনীয়। নানা চমকপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়া ইহাতে ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা ও তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দর্শককে ইহার শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। নাটকটির মধ্যে নাট্যকারের কয়েকটি তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ফ্রয়েডের অবদমন ও 'ক্যাথারসিস' তত্ত্বের অসারতা ইহাতে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু মনস্তত্ত্বঘটিত বক্তব্য অপেক্ষা রাজনৈতিক বক্তব্যই এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যে লেগার্টকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে তাঁহার কোন

ক্রিয়া ও প্রভাব নাটকের মধ্যে দেখা গেল না। লেগার্ট ও ডাঃ রসনের সহযোগিতায় যে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল তাহার সহিত নাটকের শেষভাগের গণ-উত্থাপনের কোন যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রসনের যে কি পরিণতি ঘটিল নাট্যকার তাহাও দেখান নাই। নাটকের তিনটি অঙ্কে কেবলমাত্র অমানুষিক অত্যাচারের পীড়াদায়ক ঘটনাই প্রাধান্য পাইয়াছে।

॥ নষ্টচন্দ্র (১৩৭১)॥ জিতেন ঘোষ রচিত এই নাটকটিতে তিনটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পরস্পর-সম্পৃক্ত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। জগদীশ চৌধুরীর পরিবারের ন্যায় বহু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া প্রণবের মত পাষণ্ড যুবক শিবানীর ন্যায় কত দুবল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ তরুণীর সর্বনাশ করিয়া থাকে লেখক তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। নাটকের কাহিনী দ্রুতগতি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত। কিন্তু কাহিনীর ধারা বিভিন্নমুখী হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ঘটনা যথাযোগ্যভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই। ঘটনার বাহুল্য ও আকস্মিকতা দর্শক-চিত্তকে শিথিল ও বিমুখ করিয়া তোলে। প্রণব ও শিবানীর প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যেই তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যে এক চরম পরিণতি দেখা যায়। প্রণবের দ্বারা সর্বনাশগ্রস্ত হইয়া গৃহত্যাগের পর পুনরায় আকস্মিকভাবে প্রণবের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া নিজের পত্নীত্বের দাবী উত্থাপন করা শিবানীর পক্ষে চূড়ান্ত আত্মাবমাননার কাজ হইয়াছে। নাটকের কয়েকটি চরিত্র সু-অঙ্কিত। বিশেষ করিয়া, চতুর্দিকব্যাপী বিপর্যয়ের আঘাতে বিপর্যস্ত জগদীশ চৌধুরীর চরিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। বখাটে অথচ পরোপকারী ধূর্জটি এবং স্নেহশীল তোতলা ভোম্বল—এই চরিত্র দুইটিও কখনো ভোলা যায় না।

॥ সত্য মারা গেছে॥ গঙ্গাপদ বসুর এই নাটকটির নাম 'সত্য মারা গেছে', হইলেও নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয়, 'সত্য মারা যায় নি।' যে সত্য গ্রামের মাটিতে জন্মলাভ করিয়াছিল, নানা প্রকার আঘাত ও অত্যাচারেও যে মরে নাই—তাহাকেই মৃত প্রতিপন্ন করিবার জন্য আধুনিক নাগরিক সমাজের বিষ্টুচরণ, সোম, গড়গড়ি, সুশোভন প্রভৃতি অশুভ শক্তিগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু তবুও সফল হইল না। শেষ পর্যন্ত সত্যই বাঁচিল আর সকল মেকি ও মিথ্যা খসিয়া পড়িল। নাটকের সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা খুঁজিয়া বাহির করা যায় বটে, কিন্তু ইহার পটভূমি ও ঘটনার মধ্যে বাস্তবতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। সত্য জীবন-প্রতীকী চরিত্র অপেক্ষা বাস্তব ব্যক্তিচরিত্ররূপেই নাটকের

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে সেই যে সুয়নারায়ণের হারানো পুত্র তাহা যেরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। নাটকের প্রথম দুইটি দৃশ্য খুবই রঙ্গরসাত্মক এবং উপভোগ্য। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যটি গুরুগম্ভীর ও অপরাধজনক ঘটনায় পূর্ণ। সত্যচরণ যতদিন ক্যাবলা ছিল ততদিন কৌতুক রসের প্রধান উৎস ছিল সেই ই, কিন্তু যখন সে সত্য হইল তখনই তাহার কৌতুকরসাত্মক ভূমিকা ফুরাইয়া আসিল। প্রথম দুই অঙ্কে পরিস্থিতির আকস্মিক উদ্ভটত্ব আত্যন্তিক অসংগতিপূর্ণ সংলাপ হইতে হঠাৎ বাধামুক্ত জলোচ্ছ্বাসের মত উদ্গত হইয়াছে।

॥ সোমপুরা থেকে শোনপুর ॥ নাট্যকার সুধাংশু দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে বস্তুবাদী জীবনদর্শন ব্যাখ্যা এ-নাটকের বক্তব্য।' কালাপাহাড় ও ঔরংজীবের মত মন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি বস্তুবাদী জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। এই মন্দির ভাঙ্গার প্রয়োজন কোন মহত্তর সমাজ কল্যাণের জন্য নহে, নায়ক সুকান্তর কুড়ি হাজার টাকা পাওয়ার আশায়। সুকান্তর বস্তুবাদী জীবনদর্শন ও টাকার প্রয়োজন বেশ মিলিয়া গিয়াছে। সুকান্ত তাহার পিতাকে এক জায়গায় চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিয়াছিল যে অনর্জিত সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার নাই। কিন্তু সুকান্তর পক্ষে সেই সম্পত্তি বিক্রী করিয়া কুড়ি হাজার টাকা লইতে বাধে নাই। নাটকের পরিণতির সঙ্গে মূল ঘটনার কোন যোগ নাই। মন্দির ভাঙ্গার ব্যাপারটি লইয়া যে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল নাট্যকার তাহার কোন পরিণতি না দেখাইয়াই হঠাৎ শীলার জন্মরহস্য উদঘাটনে নাটকের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। নাটকের ঘটনায় মাঝে মাঝে অতিনাটকীয় উপাদান দেখা যায়। সুরেন্দ্র চরিত্রটি পুরাতন ধরনের নাটকের অতিনাটকীয় চরিত্রের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত।

॥ ঘূর্ণি ॥ শম্ভু মিত্রের 'ঘূর্ণি' মিশ্র রীতিতে রচিত নাটক। প্রথম অঙ্কে বাস্তব রীতিতে উপস্থাপিত একটি সমস্যাক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে নাট্যরীতির পরিবর্তন হইয়াছে। ঐ অঙ্ক হইতে নাটকটি ঘটনাপ্রধান না হইয়া ভাবনাপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ও সুগঠিত ঘটনার পরিবর্তে বিকাশের স্মৃতি ও কল্পনার মূর্ত রূপ zonal lighting-এর মধ্য দিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। বিকাশের ভাবনার পরিপোষণের জন্যই টুকরা টুকরা দৃশ্য মঞ্চের মধ্যে আনা হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের উদ্যমী কর্মী বিকাশ দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে হইয়াছে নিরুদ্যম, ভাবনাবিলাসী

দার্শনিক। রাজনৈতিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অসামঞ্জস্য, উদ্দেশ্য আর উপায়ের মধ্যে বিরাট অনৈক্য দেখিয়া তাহার মধ্যে যে দ্বিধা এবং জড়তা আসিয়াছে তাহারই ফলে সে সংশয়ী ও কর্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। অ্যাবসার্ড নাটকের ন্যায় তাহার মধ্যেও এক প্রকার অস্থিরতা, বিতৃষ্ণা, ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা গিয়াছে। নাটকের মধ্যে বিকৃত যৌন প্রবৃত্তির উলঙ্গ রূপ দেখা গিয়াছে। খুকু যেন চির-অতৃপ্ত লালসার এক লকলকে আগুনের শিখা। তাহার কোন পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ নাই, কোনখানেই যেন আগ্রাসী লালসার নিবৃত্তি নাই। মামা ও ভাগ্নীর সম্পর্কের যে আভাস নাটকে দেওয়া হইয়াছে তাহা রীতিমত ভীতিজনক।

॥ ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না ॥ 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না' অগ্নিদূতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। একটি পাগলা গারদ অবলম্বনে নাটকের কাহিনী গ.ড়য়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাগলা গারদটির বাস্তবতা অপেক্ষা প্রতীকধর্মিতাই যেন নাট্যকারের ইপ্সিত। কারণ ঐ পাগলা গারদের পরিবেশ ও চরিত্রগুলিব বাস্তব সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার দিকে দৃষ্টি না দিয়া নাট্যকার একটি ব্যঞ্জিত সামাজিক সমস্যাপূর্ণ জগতের রূপই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। পাগলা গারদে সুস্থ ও স্বাভাবিক অনেক লোককে পাগল বলিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহাদের সকল প্রকার অনুনয় ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে শাসনযন্ত্রের জাঁতায় পেষণ করা হইতেছে। সত্যদ্রষ্টা নাট্যকারের চরিত্রটিও অবশেষে এই জাঁতাকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সমাজের উপেক্ষা, অবিচার ও হৃদয়হীনতা কিভাবে মানুষের জীবন ব্যর্থ করিযা দেয় কয়েকটি চরিত্র অবলম্বনে তাহা দেখান হইয়াছে। জায়গায় জায়গায় উচ্ছ্বাসেব আতিশয্য ও অতিনাটকীয়তার দিকে ঝোঁক থাকিলেও নাট্যকার তাঁহার নাট্যসংলাপের মধ্যে তীব্র নাট্যবেগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

॥ বেহাগ ॥ নিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচিত এই নাটকে সঙ্গীতশিল্পপ্রাণা নায়িকা শ্যামলীর করুণ ট্র্যাজেডি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতসাধনায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পরে স্বামীর আদেশে সেই সঙ্গীতের জগৎ হইতে বিদায় লইয়া সে কিরূপ মানসিক নিযাতনের মধ্যে দিন কাটাইয়াছে নাট্যকার তাহার মর্মস্পর্শী চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিল্পের প্রতি অনুরাগ এবং স্বামীর প্রতি আনুগত্য এই দুইটি গভীর ভাবের আবেগে জর্জরিত হইয়া অবশেষে মেয়েটি কিরূপ শোচনীয় ট্র্যাজেডি বরণ করিয়া নিল, নাটকে তাহাই

পরিস্ফুট হইয়াছে। নাট্যকার দ্বন্দ্বজটিল চরিত্র সৃষ্টি করিয়া আমাদের রসোদ্দীপনা যথেষ্ট বর্ধিত করিয়াছেন।

॥ শেষ থেকে শুরু ॥ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয় নাটকটির কাহিনী অভিনব। শ্মশানের মৃতদেহের ফটো তোলার কাজ হইল নীলমণি ও তাহার সহযোগী ভোলার। সেই উপলক্ষে বিচিত্র ধবনের শ্মশানযাত্রী তাহাদের ষ্টুডিওতে আসে। তাহাদের মধ্য দিয়া টুকরা টুকরা সমাজের ছবি ফুটিয়া উঠে। নাটকের মধ্যে কৌতুক ও কারুণ্য পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। হাসির দীপ্তি দেখিতে দেখিতে বেদনার মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার বেদনার মেঘ মুহূর্তের মধ্যে হাসির আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নীলমণি ও ভোলার সম্পর্কই স্নেহ-অভিমানের মাধুর্য ও নির্ভরতায় নাটকের প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। সব হারাইয়া তাহারা পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির ব্যবধান তাহাদের অন্তিম মিলনকে আরও মধুর ও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

॥ বিদ্রোহী নায়ক ॥ শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচ্য নাটকটি রচনা করিয়া একজন স্মরণীয় নাট্যকার ও নাট্যশালার একজন অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী পরিচালকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। নাট্যকার এই নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'উপেন দাসের চরিত্রকে নিয়ে কেন আমি নাটক রচনা করলাম, এ-সম্পর্কে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন।' এ-প্রশ্ন আমাদেরও বটে। কারণ, উপেন দাসের চরিত্রে এমন কোন মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব নাই যাহা আমাদিগকে উদ্দীপিত ও চমৎকৃত করিতে পারে। নাট্যকার স্বীকার করিয়াছেন, 'উপেন্দ্রনাথের চরিত্রও তেমনি বহু দোষদুষ্ট কাঁটায় ভর্তি ছিল।' তবে নাট্যকার উপেন দাসের গুণাবলীরও উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, 'কিন্তু অন্য দিকে তাঁর স্বদেশচেতনা, সমাজ সংস্কারের অদম্য বাসনা এবং সর্বোপরি তাঁর দুর্জয় সাহস ও মনোবল যা সর্বকালের যুবসমাজের কাছে আদর্শস্থানীয় বলে আমি মনে করি।' নাটকে এই বিদ্রোহী নায়কের বিদ্রোহ কেবল তাহার দৃঢ়চেতা প্রাচীনপন্থী পিতার বিরুদ্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ নাটকে পিতার অন্যায় ও অসঙ্গতি অপেক্ষা পুত্রের অতিরিক্ত পিতৃদ্রোহিতা ও অসহিষ্ণু অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয়ই বেশি পাইয়াছি। বিলাত যাইবার অনুমতি পিতা দেন নাই বলিয়া পিতার বিরুদ্ধে নায়কের বিদ্রোহের সূচনা, অথচ সেই

পিতার টাকাতেই তিনি অবশেষে বিলাত গিয়া দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। আত্মমর্যাদা ঘোষণা করিবার জন্য তিনি পিতার অবাঞ্ছিত কাজ করিয়া পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিলেন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিব্রত হইয়া এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে তিনি পুনরায় সেই পিতৃআশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। তাঁহার বিদ্রোহ মহৎ আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল ও নিঃস্বার্থ দুঃখবরণের মহিমায় পবিত্র হইতে পারে নাই। হৃদয়বৃত্তির মাধুর্য ও গভীরতার দিক দিয়াও উপেন্দ্রনাথের চরিত্রে কোন বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম অঙ্কে প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অতখানি অনুরক্তি দেখা গেল। কিন্তু অঙ্কের শুরু হইতেই দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণের জন্য তাঁহার সমান ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইল। ইহাও কিছুটা বিসদৃশ মনে হইয়াছে। প্রেমের কোন বেদনা কিংবা বৈরাগ্য তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার বহির্জীবনের কতকগুলি ঘটনা এ-নাটকে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অন্তর্জীবনের কোন রহস্য, দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দেখা যায় নাই। তাঁহার বিদ্রোহের যথার্থ প্রকাশ হইয়াছে নাটক ও নাট্যশালায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জ্বলন্ত মশাল বহনের মধ্যে। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার মনে ছিল একটা অশান্ত জ্বালা, সেই জ্বালা যথার্থ রূপ পাইয়াছে তাঁহার রচিত নাটকে এবং পরিচালিত নাট্যাভিনয়ে। এখানেই তিনি প্রকৃত বিদ্রোহী নায়ক।

॥ অজাতক ॥ সন্তোষকুমার ঘোষের অজাতক মঞ্চমায়া বিরোধী (anti-illusionist) নাটক। এখানে চরিত্রগুলির বাস্তব জীবনের ক্রিয়া তাহাদের নাট্য-অন্তর্গত ক্রিয়ার সঙ্গে বারবার মিশিয়া গিয়াছে। নাট্যচরিত্রগুলি সম্পর্কে মনের মধ্যে কোন রসবিভ্রম ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বাস্তব জীবনরূপ উন্মোচিত হইয়া আমাদের সেই রসবিভ্রমের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। নাটকের নায়িকা বন্ধ্যা। তাহার অজাতক সন্তানেরা যেন তাহাকে তাহাদের সম্ভাবিত পিতা, অর্থাৎ নায়িকার প্রণয়ী ব্রতীনকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে। সেই হত্যায় নায়কের কিছুটা সহায়তা ছিল। এই হত্যার ভাবনা একটি কালো ছায়ার মত উভয়ের মধ্যে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। আধুনিক উদ্ভট নাটকের মত এই নাটকের সর্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ, নিঃসঙ্গতা ও জীবন সম্পর্কে অনীহা ছড়াইয়া আছে। নাট্যকার পরিবেশ ও চরিত্রের ভাব ও মানসিকতা সম্পর্কে সাহিত্যরসাত্মক ঔপন্যাসিক বর্ণনারীতির আশ্রয় একটু বেশি পরিমাণে লইয়াছেন। ইহার ফলে মঞ্চে এই নাট্যপ্রয়োগের কিছুটা

সাহায্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনেয়ত্ব অপেক্ষা পাঠ্যত্বের গুণ ইহাতে বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

॥ মারীচ সংবাদ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' সাম্প্রতিক কালের একখানি বহু অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। কিন্তু এ-ধরনের নাটক নানাপ্রকার চমকপ্রদ উপাদান প্রয়োগে অভিনয়ে যতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়, স্থায়ী সাহিত্যগুণের অভাবে পাঠ্য নাটকরূপে ততখানি আকর্ষণীয় হয় না। রামায়ণের মারীচ ও তাহার আত্মত্যাগের কাহিনী রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়া নাট্যকার আধুনিক কালের দুই ভিন্নজাতীয় পরিবেশের দুইটি অনুরূপ কাহিনী নাটকের মধ্যে উপস্থাপনা করিয়াছেন। একটি হইল ঈশ্বরের কাহিনী। সে কিন্তু জমিদারের আদেশে দরিদ্র চাষীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে অসম্মত হইল। সকল প্রজার সঙ্গে যুক্ত হইয়া সে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। নাটকের অপর কাহিনীটি হইল আমেরিকার শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রেগরী। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে সে যাইতে রাজি হইল না, আত্মহত্যা করিয়া সে প্রতিবাদ জানাইল। নাটকের শেষে অকারণে বাল্মীকিকে আমদানী করিয়া বিরক্তিকর ভাঁড়ামির দৃশ্য অবতারণা করা হইয়াছে। ব্রেখটীয় রীতিতে এ-নাটকেও কবিতা, ছড়া, পোস্টার, ভাষ্য, গান প্রভৃতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। একজন যাদুকর ওস্তাদ সব চরিত্র ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। তাহার হিন্দী বাংলা মেশানো বকবকানিও বেশ বিরক্তিকর।

নাট্য-আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক নাট্যকার বর্তমানে নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সব নাটক নাট্যকলার দিক দিয়া খুব উন্নত ও প্রশংসাযোগ্য না হইলেও ইহাদের মধ্যে সমাজের সমস্যাচেতনা ও বৈচিত্র আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। গিরিশ নাটক-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি'র নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই নাটকখানি লিখিত। মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'কর্মখালি'তে শোষণরিক্ত সমাজের রূপ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। নাট্যকার সাংবাদিক সুনীল ভঞ্জের লেখা 'কিন্তু কেন?' প্রশংসিত হইয়াছে। সুনীল ভঞ্জের তিনটি দৃশ্যের কৌতুক নাটিকা 'ফার্স্ট প্রাইজ' উপভোগ্য। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন আঙ্গিকে লেখা 'নচিকেতা' নাটকে নচিকেতার কাহিনী অবলম্বনে অত্যাচারিত মানুষের বলদৃপ্ত আশার বাণীই শুনা গিয়াছে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকখানি নাট্যামোদী

জনগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'নবজন্ম' পল্লীপরিবেশ অবলম্বনে রচিত, কিন্তু তাঁহার অধিকতর জনপ্রিয় নাটক 'গাঙ্গুলী মশাই' শ্রমিক পরিবেশ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'শহরতলী' নাটকে তিনি পঙ্কিল শহরতলী জীবনের বাস্তব রূপ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু 'অম্লমধুর' ও 'প্রজাপতি' কৌতুকরসসিক্ত উপভোগ্য নাটক। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের 'অন্ধ পৃথিবী' ও কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নটী' মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত হইয়া নাট্যামোদী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন পাণ্ডার 'পাণ্ডুলিপি'র নায়ক সমাজের অবজ্ঞাত মানুষের জন্য ঘর ছাড়িয়া চরম দুরবস্থা বরণ করিয়া লইল। 'হলুদ শাড়ী' ঐ নাট্যকারের আর একখানি সামাজিক নাটক। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'বায়েন'-এ বাংলার উপেক্ষিত বাদ্যশিল্পীর জীবন-সমস্যা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। 'নাগমণি' উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটক। আধুনিক জনজীবনের বাস্তব সমস্যা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে মাণিক সরকারের 'উত্তর ফাল্গুনী' ও 'জনগণেশ'। 'ফিঙ্গারপ্রিণ্ট' খ্যাত নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরীর আর একখানি রহস্য-নাটক হইল 'সপিল'। সাম্প্রতিক কালে রচিত আর একখানি রহস্য-নাটক হইল কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'প্যারি দ্য বিউটি'। মননশীল তরুণ নাট্যকার বাণিক রায় নূতন নাট্যপথের সন্ধানী। পাশ্চাত্ত্য 'অ্যাবসার্ড' নাটকের প্রেরণায় তিনি রচনা করিয়াছেন 'কয়েদখানা' ও 'সময়ের ভিড়'।

সাম্প্রতিক কালে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনচরিত অবলম্বনে কয়েকখানি জীবনী-নাটক লেখা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন পাণ্ডার 'ঠাকুর বাড়ী'তে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছুটা অংশ স্থান পাইয়াছে। হিন্দু কলেজের বিপ্লবী অধ্যাপক ডিরোজিয়োর জীবন-কাহিনী লইয়া চিত্তরঞ্জন ঘোষ একখানি ভালো নাটক লিখিয়াছেন। কবিওয়ালা এণ্টনী ফিরিঙ্গীর জীবনী নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে উমানাথ ভট্টাচার্যের 'ফিরিঙ্গী কবি'তে। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পরেশ ধর তিন অঙ্কে 'বিবেকানন্দ' নাটক রচনা করিলেন।

তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে বিমল রায় কয়েকখানি নাটক লিখিয়া নাট্যামোদী দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একাঙ্ক নাটকই বেশি লিখিলেও কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন। 'কাঁচকলা', 'প্ল্যানমাস্টার' প্রভৃতি লঘু কৌতুক-রসাত্মক নাটক। 'শেষের পরে' বিয়োগান্ত

নাটক। ছোটদের সমস্যা লইয়া লেখা বাস্তবধর্মী নাটক হইল 'অকারণ'। আর একজন তরুণ নাট্যকার নবকুমার গড়াইয়ের 'লালবাঁধ' বিষ্ণুপুরের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগড়াইয়ের প্রথম নাটক 'অন্তরালের' মধ্যে থিয়েটারী জীবনের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। 'দি প্রিজনার অব জেন্দার' ছায়া অবলম্বনে 'ঝিন্দের বন্দী' নামে আর একখানি নাটকও তিনি লিখিয়াছেন। বিপ্লবী নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদের' মধ্যে সংগ্রামী মানুষের রক্তঝরা সংগ্রামের কাহিনী লিখিত হইয়াছে। দীপ্তিকুমার শীলের 'উত্তম পুরুষ' দুই অঙ্কে রচিত উপভোগ্য কৌতুক-রসাত্মক নাটক। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' 'এর মধ্যে নাট্যকার লঘু রসের স্পর্শে রেজেস্ট্রী বিবাহের সমস্যাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'অজানা কাহিনী'তে ডকইয়ার্ডের পরিবেশে তিনি কতকগুলি বাস্তব চরিত্রের রূঢ় জীবনযাত্রার চিত্র দিয়াছেন।

সাম্প্রতিক কালের দেশাত্মবোধক নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে দেশাত্মবোধক নাটকের গৌরবময় প্রভাব ও প্রসার আমরা দেখিয়াছি। এই সব নাটকের মধ্যে পরাধীন জাতির অন্তহীন লজ্জা ও বেদনা যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে তেমনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং প্রবল প্রতিরোধ-শক্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রচণ্ড জাতীয় আবেগ শান্ত হইয়া আসিল এবং সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্ভব দেখা যায় নাই। কিন্তু ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বাসঘাতক চীন যখন তাহার বিপুল বাহিনী লইয়া অপ্রস্তুত ও শান্তিবাদী ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল তখন ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন ভারতের জাতীয়তাবাদের চরম পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতের উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় জাতীয়তাবাদী শক্তি অকস্মাৎ এক অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল, আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধের সঙ্কল্প বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিল।

বাংলা নাট্যসাহিত্য এই নবজাগ্রত জাতীয় আবেগ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিল না। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দেশাত্মবোধের উজ্জ্বলতর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। পুরাতন দেশাত্মবোধক নাটকগুলি পুনরুজ্জীবিত হইল, কিন্তু দেশের নবতম সঙ্কটের রূপ প্রতিফলিত করিয়া নূতন নাটক লেখা ও অভিনয়

কবার চাহিদা দেখা দিল। বাংলা দেশের সকল নাট্যকার ও নাট্যপ্রয়োগকর্তা সেই চাহিদা মিটাইতে আগাইয়া আসিলেন। নাট্যকারগণ পবিত্র কর্তব্য মনে করিয়াই দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন। অপেশাদার ও পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পরিচালকগণ ঐ দেশাত্মবোধক নাটকগুলি মঞ্চস্থ করিয়া জনসাধারণের মনের মধ্যে দীপ্ত আবেগের উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া চলিলেন। কেবল নির্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চে নহে, রাস্তায়-ঘাটে, পার্কে-ময়দানে এই দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় দ্বারা প্রবল জাতীয় ভাব বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া জনগণের চিত্ত প্লাবিত করিয়া দিল। চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে যাহাদের মন দ্বিধা ও সংশয়ে আচ্ছন্ন ছিল এবং যাহারা গোপনে গোপনে বিদেশী শত্রুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও সহায়ক ছিল তাহারা সকলেই এই প্রবল বন্যার মুখে খড়কুটার মত ভাসিয়া গেল।

কিন্তু সাময়িক আবেগের দ্বারা হঠাৎ উদ্দীপিত হইয়া নাট্যকারগণ নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অধিকাংশ নাটকে সাময়িকতা ও দ্রুতলিখনের ত্রুটি অতিমাত্রায় প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে, স্থায়ী নাট্যগুণের নিদর্শন খুব কম নাটকেই আমরা দেখিয়াছি। অধিকাংশ নাটকেই প্রচারধর্মিতা এত স্পষ্ট ও তরলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে ঐ সব নাটকে নাটকত্বে কোন উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নাটকগুলি আকারে এত সংক্ষিপ্ত যে, সেগুলির মধ্যে কোন ঘটনার জটিলতা ও নাট্যসংঘাত স্থান পায় নাই। নাট্যকারগণ বহু স্থলে নাটকের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় আবেগের ভাবোচ্ছ্বসিত রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ঐসব নাটক দর্শকদের কৌতূহল ও রসতৃষ্ণা উদ্রেক করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় আবেগকেও খুব বেশি উদ্দীপিত করিতে পারে নাই।

অধিকাংশ দেশাত্মবোধক নাটকের মধ্যেই নাট্যকারদের অমনোযোগ, শৈথিল্য ও অযত্ন লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় তাঁহারা যেন কেবল সাময়িক কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্যই নাটক রচনা করিয়াছেন, স্থায়ী আবেগ ও নাট্যপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বুঝি নাটক লেখায় প্রবৃত্ত হন নাই। অধিকাংশ নাটকেই সস্তা ভাবোচ্ছ্বাস আছে মাত্র, সূক্ষ্ম মননধর্মের উজ্জ্বলতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তাত্ত্বিকতা স্থান পায় নাই। চীন ও ভারতের সংঘাতের মধ্যে, আগ্রাসী ও উগ্র মতবাদী চীনের মতবাদের মধ্যে ভ্রান্তি ও অনিষ্টকারিতা কোথায়, ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বই বা কোথায় সে-সব আলোচনা আমরা খুব কম নাটকেই লক্ষ্য করিয়াছি। ভারত ও চীনের সীমান্তবিরোধে ভারতের পক্ষে যুক্তি ও ন্যায় কিরূপ বলিষ্ঠ ও সন্দেহাতীত

এবং চীনের সীমানা সম্প্রসারণ-নীতির মধ্যে তাহার নয়া সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইলে দেশাত্মবোধের আবেগ আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। কোন কোন নাটকের মধ্যে জাতীয় আবেগের পরিপন্থী শক্তিকে দেখানো হইয়াছে, কিন্তু সেই বিরুদ্ধ শক্তির নিঃসংশয়িত পরাজয় দেখানো হয় নাই। জাতীয় শক্তির জয় বাহ্যত দেখানো হইলেও কোন কোন স্থলে তাহার বিরুদ্ধ শক্তিকে তীক্ষ্ণ ও জোরালো অস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে।

নাটকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে লিখিত হইয়াছে। সেজন্য যুদ্ধের উত্তেজনা ও উন্মাদনা, তাহার অপরিসীম দুঃখকষ্ট ও ভয়াবহ নৃশংসতা ইহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। নাট্যকারদের যুদ্ধসম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সেজন্য যুদ্ধের আবেগ ও রস সৃষ্টি করিতে তাহারা পারেন নাই। তাঁহারা শুধুমাত্র নিরস্ত্র ও যুদ্ধে অনভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে প্রতিরক্ষার মানসিক প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ নাটকের ঘটনাস্থান কোন ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত, সেজন্য নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব রূপ ও দেশরক্ষায় ব্রতী সৈনিকদের বীরত্ব ও প্রাণদানের চিত্র কোন নাটকে আমরা দেখিলাম না। সংবাদপত্রে আমাদের বীর জওয়ানদের অসামান্য বীরত্বের অনেক অবিস্মরণীয় কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব কাহিনীর যে-কোন একটি অবলম্বনে অতি সার্থক দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করা যাইত। বমডিলা, সেলা, চুশুল প্রভৃতি রণক্ষেত্রে ভারতীয় জওয়ানগণের যে অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মদানের কাহিনী সংবাদপত্রে পড়িয়া আমরা রোমাঞ্চিত ও উত্তেজিত হইয়াছি তাহাদের বিবরণ আমাদের দেশাত্মবোধক নাটকের মধ্যে অলিখিত রহিয়া গেল। নেফা ও লাদকের রণক্ষেত্রের পরিবেশে দুই একটি নাটক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে-সব নাটকের ঘটনা ঘটিয়াছে রেস্তোরাঁয় অথবা হাসপাতালে, প্রত্যক্ষ যুদ্ধপরিবেশ কোন নাটকের মধ্যে দেখা যায় নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ভাবনা ও উত্তেজনা, শত্রুর সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের পূর্বে তাহার মানসিক কঠিন সঙ্কল্পবদ্ধ প্রস্তুতি, শত্রুর সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রভৃতি অবলম্বনে চমৎকার নাটক লেখা যাইত। কিন্তু সেই নাটক আমরা কোন নাট্যকারের নিকট হইতে পাই নাই।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক নাটকগুলি আলোচনা করা হইতেছে :

॥ মহাপ্রেম ॥ নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত এই নাটকটি চীনা আক্রমণের প্রতিরোধে লিখিত দেশাত্মবোধক নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নাটকটি যতবার

অভিনীত হইয়াছে ততবার আর কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই। চীনা আক্রমণের ঠিক তিন বছর আগে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে নাটকটি রচিত হয়। তখন সীমানা লইয়া ভারত ও চীনের মধ্যে সামান্য বিরোধ চলিতেছিল। সেই বিরোধ যে অদূর ভবিষ্যতে একটি ব্যাপক ও ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হইবে তখন কেহই বোধ হয় তাহা কল্পনা করেন নাই। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাট্যনেতা মন্মথ রায় আশ্চর্য দূরদৃষ্টি দিয়া এই যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রামের সম্মিলিত প্রতিরোধের একটি চিত্র এই নাটকে অঙ্কন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও হিন্দী-চীনী ভাই ভাই-এর স্বপ্নে দেশবাসী মশগুল, সেইজন্য নাট্যকারের এই প্রতিরোধচিত্র অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া সকলে নাটকটির প্রতি যতদূর সম্ভব উদার-উপেক্ষা দেখাইয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন। নাট্যকার সরকারী ও বেসরকারী নানা সংস্থা এবং আকাশবাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া শুধু ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিন বছর পরে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুটি যখন আমাদের পিঠে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ছোরা বসাইয়া দিল তখন চীনা আফিঙের মাদকতার প্রভাত হইতে আমরা রূঢ় আঘাতে জাগ্রত হইলাম এবং তখন তিন বছর আগে লিখিত এই নাটকটি ধূলামাটির উপেক্ষিত স্থান হইতে মাথায় তুলিয়া লইলাম। এই অনাদৃত নাটকটি হঠাৎ এত আদর লাভ করিল যে তাহা অবর্ণনীয়।

নাটকের ঘটনাস্থান ভারতের সীমান্তে অবস্থিত অরণ্যবেষ্টিত একটি গ্রাম। বিদেশী শত্রু চোরের মত সন্তর্পণে এই গ্রামের বহির্ভাগে আসিয়াছে, গ্রামের বিশ্বাসঘাতক কোন কোন লোককে গোপনে হাত করিয়াছে এবং তাহাদের অভিযানের আয়োজনে নিরত রহিয়াছে। কিন্তু গ্রামের প্রতিরোধশক্তি অতি দ্রুত জাগিয়াছে। গ্রামবাসীদের কোন অস্ত্র নাই, কোন সামরিক শক্তি নাই। প্রবল দেশপ্রেম এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অবলম্বন করিয়া তাহারা শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহারা পোড়ামাটির নীতি আশ্রয় করিয়াছে। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শক্তিমত্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিরোধের এই প্রচেষ্টা নিতান্ত দুর্বল, এমন কি হাস্যকর মনে হইতে পারে। কিন্তু সহায়-সম্বলহীন, নিরস্ত্র ও অরক্ষিত গ্রামবাসিগণ হঠাৎ আক্রান্ত হইলে অন্য আর কি উপায়েই বা নিজেদের রক্ষা করিতে পারে? তবে একটি খট্‌কা থাকিয়া যায়। ভারতশাসনের অধীন কোন গ্রামে সামরিক বাহিনীর আসিতে হয়তো বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু গ্রামবাসীদের রক্ষায় পুলিশ আসিল না কেন? দিনের পর দিন

যাহারা আত্মরক্ষার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত পুলিশ-বাহিনীর সাহায্য নিলনা কেন? তবে এ-কথা ঠিক যে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সীমাবদ্ধ শক্তি লইয়া প্রতিবোধ ও প্রতিঘাতের যে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা সামরিক বাহিনীর সুপরিকল্পিত যুদ্ধকৌশলের অনুরূপ।

নাটকের ঘটনা অতি দ্রুতগতিতে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কানাই ও ময়নার বিবাহের মধুর আয়োজনে নাটকের সূচনা, কিন্তু অকস্মাৎ একটি অশুভ ও ভয়ঙ্কর হাত কালো অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। জীবন মিলাইতে যাহারা উদ্যত ছিল, জীবন দিতেও তাহারা প্রস্তুত হইল। নাটকের সমস্ত প্রকার বীরত্বপূর্ণ আয়োজন ও প্রচেষ্টার মধ্যে দুইটি মিলনপ্রয়াসী হৃদয়েব অপরিপূর্ণ মিলনে বেদনাকরুণ সুরে যেন গুঞ্জন করিয়া ফিরিয়াছে। প্রবল জাতীয় আবেগের পুণ্য স্পর্শে কত ছন্নমতি লোকেরও জীবন ধন্য হইয়া যায়। হরিদাসী তাহার পতিতাজীবনের অন্ধকারে নূতন আলোকেব সন্ধান পাইল। ভুবনেশ্বরী তাহার সমাজবিরোধী, দেশদ্রোহী স্বামীব জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিল। নাটকের মধ্যে জায়গায় জায়গায় একটু অতিনাটকীয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছে। গ্রাম হইতে নির্বাসিত রাজেন্দ্র দত্ত হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধায় অধীর হইয়া সকলেব মধ্যে আসিয়া বন্দুক লইয়া সকলকে শাসাইয়া একেবারে কেঁচো বানাইয়া দিল, ইহা সস্তা উত্তেজনাকব ঘটনা বলিয়াই মনে হয়।

॥ স্বর্ণকীট ॥ নাট্যকার মন্মথ রায় এই একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে পার্থিব সকল স্নেহ-সম্পর্কের উপরে দেশাত্মবোধের জয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে ঘৃণ্য লোকটি সোনার নেশায় অন্ধ হইয়া দেশের গোপন তথ্য শত্রুর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল সে স্বামী নহে, পিতা নহে, সে সংসারের কেহ নহে, দেশের কেহ নহে, সে সকলের শত্রু, সকলেব সম্মিলিত ঘৃণা ও ধিক্কার তাহার একমাত্র পুরস্কার। কীট যেমন অলক্ষিত থাকিয়া মানুষের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে, নাটকের স্বর্ণকীট অবিন্দমও তেমনি নিজের পবিচয় গোপন রাখিয়া দেশের অপকারে লিপ্ত হইয়াছে। যে লোকটি সংসারের সুখের জন্য ঘোরতর অন্যায় কাজ করিয়াছিল সংসারের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সে হঠাৎ আত্মহত্যা করিল কেন এ-প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়, অরিন্দমের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে নাট্যকার দেশাত্মবোধে এমন প্রবলভাবে উদ্দীপিত দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের কাছে ধরা পড়িবার উপক্রম হওয়াতে তাহার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আর্থার মিলারের *'All My Sons'* নাটকের স্বার্থপর যুদ্ধমুনাফালোভী পিতা

পুত্রের দ্বারা পুলিশের কাছে প্রেরিত হইবার ভয়ে যেমন আত্মহত্যা করিয়াছিল, আলোচ্য নাটকের অরিন্দমও তেমনি পুত্রের হাতে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় নিজেকে খুন করিয়া বসিল। অরিন্দম তাহার পুত্রকন্যার কাছে অপরিচিত রহিয়া গেল, সেজন্য তাহাদের মনে কোন দ্বন্দ্ব আসিতে পারে না, কিন্তু দুর্গা তো তাহার স্বামীকে চিনিতে পারিল। দেশপ্রেমিকা দুর্গা দেশদ্রোহীর আত্মহত্যায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৃত্যুর পরেও তাহাকে ধিক্কার দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী দুর্গা স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াও তাহাকে চিরতরে হারাইল ইহার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখও কি তাহার হইল না? দুর্গার দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব থাকিলে বোধ হয় নাটকটি আরও অধিক নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিত।

॥ জওয়ান ॥ মন্মথ রায় এই নাটকে দেখাইয়াছেন যে, পরশমণির পরশে লোহাও যেমন সোনা হইয়া যায়, তেমন দেশাত্মবোধের আবেগ অন্তরে আসিলে ছন্নছাড়া সমাজবিরোধী লোকও বীর সৈনিকে পরিণত হইতে পারে। পল্টন ও লণ্ঠন ঘৃণ্য চোর ও পকেটমাররূপেই সমাজের কাছে পরিচিত ছিল, কিন্তু একদিন রাত্রে তাহারা জীবনে প্রথম বোধ হয় অভাবনীয় স্নেহ ও আদর লাভ করিয়া হঠাৎ পুনর্জন্ম লাভ করিল। '*Bishop's Candlesticks*' নাটকে বিশপের অযাচিত করুণায় যেমন চোরের স্বভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল এই নাটকেও তেমনি মহানন্দের পরিবারে সকলের কাছে সীমাহীন যত্ন ও উৎসাহ লাভ করিয়া পল্টন ও লণ্ঠনের জীবনও আমূল বদলাইয়া গেল। নকল দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে তাহারা সত্যকার দেশপ্রেমিকে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু নাটকের উদার ও সংস্কারমূলক সুর প্রশংসা করিয়াও ইহা বলিতে হয় যে, নাটকের ঘটনা একটু অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য। দুইজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি যুদ্ধে যোগদান করিতে যাইতেছে শুনিয়াই একটি পরিবারের সকল লোকই তাহাদিগকে এতখানি জামাই-আদর করিবে, ঘড়ি, পেন এমন কি দুইশত টাকা পর্যন্ত তাহাদিগকে উপহার দিয়া বসিবে তাহা বিশ্বাস করিতে সত্যই কষ্ট হয়। পল্টন ও লণ্ঠন অতি সহজেই যে সকলকে এমন বোকা বানাইয়া ফেলিবে তাহা অদ্ভুত মনে হয়। নাটকের গোড়ার দিকে যেমন হাল্কা কৌতুকরসের আতিশয্য রহিয়াছে তেমনি শেষের দিকে আবার তরল দেশপ্রেমের অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস স্থান পাইয়াছে।

॥ সৈনিক ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী-রচিত এই বহু-অভিনীত নাটকটিতে পারিবারিক স্নেহসম্পর্কের উপর দেশপ্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকথিত সাম্যবাদী চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে জনগণের সম্মিলিত প্রবল দেশাত্মবোধ

এবং মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী চীনপন্থী লোকেদের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ দেখা গিয়াছিল তাহার আভাস এই নাটকেও পাওয়া যায়। তবে নাট্যকার এই বিরোধকে বিতর্কমূলক মননস্তরে লইয়া যাইতে পারেন নাই। সেজন্য প্রবীর-অরবিন্দ-শোভনার ভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বিকৃত পথ স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে দেখানো হয় নাই। মেজরের পক্ষে একান্ত স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন পুত্রকে সহসা দেশদ্রোহীরূপে বঝিতে পারা ও গুলি করা অত্যন্ত দ্রুত, আকস্মিক ও অতি-নাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে। পুত্রসম্বন্ধে তাহার সুনিশ্চিত ধারণায় আসা এবং তাহাকে শাস্তিবিধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করার জন্য সময় ও ঘটনাবিস্তারের প্রয়োজন ছিল। বিকৃত মতবাদী তিনটি চরিত্রের মধ্যে অরবিন্দের মতের পরিবর্তন হইয়াছিল এবং সেজন্য ক্ষমাহীন পার্টির হাতে সে শাস্তিও লাভ করিল। প্রবীরের মধ্যেও বরাবর একটি দ্বিধা ও দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র শোভনাই দৃঢ়ভাবে তাহার মত ও পথ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। চীনা আক্রমণের নৃশংস বিভীষিকা প্রতিভার ভয়ার্ত ও অসংবদ্ধ কথাগুলির মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহশীল ও প্রাণখোলা, অথচ দৃঢ় ও কঠোর আদর্শনিষ্ঠ মেজরের চরিত্রটি সু-অঙ্কিত। নাটকের কৌতুকরস জোগাইয়াছেন হালদারদম্পতি।

॥ সীমান্তের ডাক ॥ সীমান্তের ডাক যখন আসিল, তখন সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়া আমরা অনেকেই বিচিত্র রকমের পারিবারিক সংঘাতের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। একদিকে সেই ডাক যেমন আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে প্রবলভাবে জাগ্রত করিয়া দিল, অন্যদিকে বাধাও আসিল কম নয়। সেই বাধা স্নেহের বাধা, স্বার্থের বাধা। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য নাটিকাটিতে সেই সমস্যাই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবনাথের হৃদয় জাগিয়া উঠিল, সমীর যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু বাধা আসিল প্রভার নিকট হইতে। প্রভাকে আমরা সংসারহিতপ্রাণা বধূরূপে দেখিলাম, স্নেহকোমলা মাতারূপে দেখিলাম, কিন্তু স্বদেশ-অনুরাগিণী নারীরূপে দেখিতে পাইলাম না। দেশ-রক্ষার আর একটি বাধা হইল স্বার্থের বাধা। সেই বাধা আসিয়াছে ক্ষুদ্রচেতা, স্বার্থসর্বস্ব সর্বেশ্বরের নিকট হইতে। কিন্তু স্ত্রী রাধারাণীর প্রবল জাতীয় আবেগের কাছে অবশেষে সর্বেশ্বরকে পরাজিত হইতে হইল। নাটকের মধ্যে বাউল চরিত্রটি অসংলগ্ন এবং দেশরক্ষার জন্য তাহার অর্থ ও সোনা সংগ্রহ করাও বেমানান ও সঙ্গতিহীন মনে হয়।

॥ অমর ॥ দেশের জন্য প্রাণ দিয়া যাহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদের একজনকেই কেন্দ্র করিয়া রমেন লাহিড়ীর আলোচ্য একাঙ্কটি রচিত হইয়াছে। হিমালয়ের শুভ্র তুষারক্ষেত্র এই বীর সৈনিকের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, মাতা রত্নার অশ্রুধারা হারানো পুত্রের জন্য নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, পিতার দুঃখ ও অনুতাপও কোন সান্ত্বনা পায় নাই। কিন্তু, তবুও এই মাতাপিতার ন্যায় চির-অম্লান গৌরবের অধিকারী কয়জন হইয়াছেন? আহত অমরকে দেখিতে যাইবার জন্য পিতা মৈত্রের যাত্রার আয়োজনে নাটকের আরম্ভ এবং ইহার সমাপ্তি অমরের মৃত্যুর আকস্মিক সংবাদে। গোড়া হইতে অমর সম্বন্ধে যে আশা ও আনন্দ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেন একটি রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। নাটকের মধ্যে একটু বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে পন্টু। তাহার জ্যাঠামির আতিশয্য বিরক্তিকর বোধ হয়।

॥ রক্তপদ্ম ॥ প্রীতি রায় রচিত এই নাটিকাটিতে শান্তিকামী, নির্বিরোধ ভারতের উপর বিশ্বাসহন্তা চীনের নৃশংস আক্রমণের ঘটনাটি রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নাটিকায় উল্লিখিত ভরতপুর ও নচীপুর যথাক্রমে ভারত ও চীনের রূপক। লালবিহারী চীনপন্থী দেশদ্রোহী ভারত-সন্তান ছাড়া আর কেহ নহে। ভরতপুর যখন বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের উদার হস্তটি প্রসারিত করিয়া দেশরক্ষার ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, ক্রূর পররাজ্যলোলুপ নচীপুর তখন ভরতপুরেব সীমান্তে নিজেদেব ঘাঁটি মজবুত করিতেছিল। তারপর একদিন বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত ভরতপুরকে সচকিত ও আলোড়িত কবিয়া তুলিল। নাটকের সমাপ্তি ভবতপুবের সুদৃঢ় প্রতিরোধ অভিযানে। নাটকটি ছোট ছোট দৃশ্যে বিভক্ত। সেজন্য নাট্যরস ঘনীভূত আবেগে জমিয়া উঠিতে পারে নাই।

॥ এগিয়ে চলার ছন্দ ॥ দেশের প্রতিরক্ষায় যথাসাধ্য সাহায্য করার উদ্দীপনা জাগাইবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত এই নাটিকাটিব রচনা করিয়াছেন। একটি আবেগ নাটিকার সব চরিত্রগুলিকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ঘটনার জটিলতা ও নাট্যদ্বন্দ্ব সেজন্য ইহাতে ভালোভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। দেশের চরম সঙ্কটে যখন আমাদের সকলের কাছে আত্মত্যাগের ডাক আসিল তখন ফেলারামের স্ত্রী নিজের গহনা দেশের জন্য বিলাইয়া দিতে কার্পণ্য করিল না। জয়ন্ত ও এষা বিবাহিত জীবনের আনন্দের আশা বিসর্জন দিয়া সীমান্তের সংগ্রামে যোগদান করিতে চলিল। তাহাদের

পিতামাতা এই বিপদসঙ্কুল আত্মাহুতির পথে যাইবার প্রাক্কালে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ জানাইলেন? জয়ন্ত ও এষা যেদিন জয়যুক্ত হইয়া ফিরিবে সেদিন হয়তো তাহাদের মিলনবাসরে পরিপূর্ণ আনন্দের শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইবে।

॥ লগ্ন ॥ সাম্রাজ্যবাদী চীনের দ্বারা যখন ভারত আক্রান্ত হইল তখন ভারতের জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধশক্তিকে দুর্বল করিবার জন্য দেশের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক সক্রিয় ছিল। চীনপন্থী দেশদ্রোহী একটি শ্রেণী তখন চীনকে আক্রমণকারীরূপে অভিযুক্ত না করিয়া ভারত ও চীনের বিরোধের জন্য উভয় পক্ষকে সমভাবে দায়ী করিল ও আর এক দল সমাজবিরোধী অসাধু ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার যুদ্ধের সুযোগে প্রচুর কালোবাজারী টাকা রোজগার করিতে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয় নাটকটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহশত্রুর সহিত দেশপ্রেমিক মানুষের সংঘাত এবং দেশপ্রেমের অন্তিম জয় দেখানো হইয়াছে। জগন্নাথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অসৎ উপায়ে প্রভূত অর্থ হস্তগত করিয়াছিলেন, চীনের সহিত যখন যুদ্ধ বাধিল তখন তাঁহার কালোবাজারী নেশা পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার পুত্রের চরিত্র ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া, পিতার অসাধু প্রস্তাবে তিনি রাজি হইতে পারিলেন না। সেজন্য পিতাপুত্রে অনিবার্য সংঘাত বাধিল। কিন্তু স্বার্থোন্মত্ত, কঠিনচিত্ত জগন্নাথ দেখিলেন, পুত্রকে নিঃস্ব করা যায়, কিন্তু তাহার দেশপ্রেমকে পরাজিত করা যায় না। তিনি তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম অনুভব করিলেন যে, তাঁহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ এমন কি শেষ অবলম্বন নাতি পর্যন্ত এক ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। উদ্দীপিত দেশপ্রেমের প্রবল বন্যায় আত্মসর্বস্বতার বাধা ভাসিয়া গেল। নাটকের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত স্পষ্ট ও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে এবং নাটকের সংলাপেও তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতার স্পর্শ রহিয়াছে। তবে প্রধানত পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে যে নাটকের মূল দ্বন্দ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ঘটনাসংস্থাপনা পার্কে না হইয়া ঘরেই হওয়া উচিত ছিল। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলি ও তাহাদের কথাবার্তা আলোচ্য নাটকের মূল ঘটনাধারায় অপ্রয়োজনীয়।

॥ স্ফুলিঙ্গ ॥ দেশের সঙ্কটে ব্যক্তিগত জীবনের সাধ ও আনন্দ বিসজন দিয়া অবিচলিত চিত্তে কঠিন কর্তব্য পালনের কথাই সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য নাটকে বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্টেশনের অখ্যাত স্টেশন মাস্টারটি যুদ্ধযাত্রী পুত্রেক একবার দেখিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া ট্রেন চালু রাখিল। যুদ্ধ প্রচেষ্টায়

এই মহৎ কর্তব্যপালনের ঘটনাটিও কম উল্লেখযোগ্য নহে। গোকুল ও মনিয়ার মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে এবং ধাবমান ট্রেনের শব্দ'ও গতির যে উদ্দীপনা নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার ফলে যথেষ্ট নাট্য-উত্তেজনা জমিয়া উঠিয়াছে।

॥ বেড নাম্বার থারটিন ॥ জাতীয় সঙ্কটে ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির দাবী বিসর্জন দিয়া জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করাই সকলের ব্রত হওয়া উচিত। এই নীতিই অভিজিৎ-লিখিত এই নাটকটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লাদক সীমান্তে যুদ্ধ-হাসপাতালে নাটকের ঘটনা স্থাপিত হইলেও ঘটনাটি কষ্টকল্পিত মনে হয়। হাসপাতালের নার্সের প্রতি একদিন প্রেমের ব্যাপারে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল সেই আবার আহত সৈনিক হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইবে এবং নার্সটি নিজের জীবনের ব্রত ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইবে এবং মেজরের কথায় আবার মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মনের পরিবর্তন হইয়া যাইবে এ-সব কিছুই অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর মনে হয়।

॥ মেঘ ॥ দেশাত্মবোধের আবেগে মানুষের মন যখন উদ্দীপিত হইয়া উঠে তখন সে দেশের জন্য নিজের প্রিয়জনকে অবিচলিত চিত্তে উৎসর্গ করিতে পারে। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটিকাটিতে সেই আবেগই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণভয়ে সৈনিক স্বামীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকে লতা ধিক্কার দিয়াছে এবং সেই ধিক্কারেই সৌমেন পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। নাটিকাটি এত সংক্ষিপ্ত যে ঘটনার আকস্মিকতার জন্য তাহা অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। সৌমেনের আগমন ও নির্গমন এত অতর্কিত ও দ্রুত ঘটিয়া গেল যে দর্শকচিত্তে তাহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

॥ বেঙা ডাক্তারের চোখ ॥ নাট্যকার গিরিশঙ্কর। প্রতিরক্ষা-প্রচেষ্টায় লোকেদের আগ্রহ উদ্দীপিত করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়াই এই নাটিকাটি রচিত। উল্টাডাঙ্গার বস্তিতে জীর্ণ মলিন ডাক্তারখানায় বসিয়া বেঙা ডাক্তার তাহার নীল চশমার ভিতর দিয়া করুণ দৃষ্টি মেলিয়া রোগীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রোগী আসে না, বেঙা ডাক্তারের হতাশা তীব্র ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সে নিজের নিঃস্ব অবস্থা সকলের কাছে, এমন কি নিজের বোনের কাছেও গোপন রাখিয়াছে। সকলে জানে, তাহার মত কৃপণ বুঝি ভূ-ভারতে আর কেহ নাই। দেশরক্ষায় চাঁদা দিতে যখন সকলে ব্যগ্র তখন সে চাঁদা দেওয়ার বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে এই বহুনিন্দিত লোকটিই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া তাহার

চোখজোড়াটি দেশরক্ষার কাজে দিয়া গেল। 'কাল থেকে বেঙা ডাক্তারের চোখ হিমালয়ের সীমান্তে প্রহরী নিযুক্ত হল'—এই আশা নিয়াই সে প্রাণ ত্যাগ করিল। জোরালো নাট্যপরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে গিরিশঙ্কর যে কত নিপুণ তাহার নিদর্শন এই নাটিকাটির মধ্যেও পরিস্ফুট। বেঙা ডাক্তার নিঃস্ব, দেশরক্ষায় সে পনের হাজার টাকা দান করিয়াছে, আবার প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কিছুই নাই এবং অবশেষে তাহার আকস্মিক আত্মদান— পরস্পরবিরোধী এ-সব ঘটনার সমাবেশে নাট্যরস ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের সংলাপ তীক্ষ্ণ, জোরালো ও বাস্তবধর্মী।

॥ মৃত্যুর স্বাদ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে যে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্মৃতি অন্তরে বহন করিয়া নাটিকার নায়িকা গৌরবময় বেদনায় আত্মহারা হইয়াছিল সেই স্বামীই যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল তখন আনন্দের পরিবর্তে চরম লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটিকাটিতে নিরুপদ্রব গৃহশান্তি অপেক্ষা বিপদসঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রের সংগ্রামকেই অধিকতর উজ্জ্বল ও মহৎরূপে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু নাটকের ঘটনা একটু কষ্টকল্পিত ও অবিশ্বাস্য আকস্মিকতায় পূর্ণ মনে হয়। যে বীর সৈনিকটি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, সে নিরাপদে তেজপুরে পৌঁছিয়া পলাইবে কেন? আবার গৃহে পৌঁছিয়া স্ত্রীর দুই একটি তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়াই সে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহাও অবিশ্বাস্য বোধ হয়। নাটকের আরম্ভে মাইকে পূর্ব ঘটনার বিবরণ দেওয়া নাটকের দুর্বল অংশ।

॥ উল্কা কেবিন ॥ অভি[illegible] লিখিত এই একাঙ্ক নাটকটির ঘটনা নেফা অঞ্চলে স্থাপিত। দেশের শত্রু কিভাবে আক্রমণকারী বিদেশী শত্রুর গুপ্তচরের কাছে গোপন সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয় তাহাই নাটকের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। পরিবেশের বাস্তবতার ফলে নাটকটির আবেদন সত্য ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে। তবে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য নাট্যঘটনা ঘনীভূত রসাশ্রিত হইতে পারে নাই এবং পরিণতিও অতি দ্রুত ও অতর্কিতভাবে ঘটিয়াছে। উল্কা, চীনা গুপ্তচর ও শুভ্রা প্রভৃতি চরিত্রের বিস্তার ও বিশ্লেষণ নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল।

॥ মৃত্যুর গর্জন ॥ দেশাত্মবোধক নাটকের মূল উদ্দেশ্য হইল আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও প্রতিঘাত সঙ্কল্পকে জাগ্রত করা। সেই উদ্দেশ্য কিরণ মৈত্র রচিত আলোচ্য নাটিকাটির মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই নাটিকাটিতে যুদ্ধের উপর শান্তির জয়ই ঘোষিত হইয়াছে। শান্তি বিশ্বের সার ও শেষ নীতি এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আক্রান্ত ও বিপন্ন

দেশবাসী এই শান্তিনীতিকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধার পায় নাই। নাটকের প্রচারিত শান্তিনীতি সেজন্য চীনের পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও আত্মরক্ষায় নিয়ত ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য ছিল না। নাট্যকার প্রাচীন নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়া সূক্ষ্ম মানবীয় ভাব ও প্রবৃত্তিগুলিকে স্থূল ব্যক্তিরূপ দান করিয়াছেন। তাহাদের কথাগুলি নিতান্তই স্পষ্ট, সহজ ও সাধারণ, গূঢ় ইঙ্গিত ও প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনাধর্মিতা তাহাদের কোথাও দেখা যায় নাই। নাটকের শেষে শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরাজের যুদ্ধ-অভিযান আকস্মিক ও অসঙ্গত। যুদ্ধরাজকে বরাবর শান্তির পক্ষে ওকালতি করিতে দেখিয়াছি, অকস্মাৎ এমন কি ঘটনা ঘটিল যে যুদ্ধরাজ শান্তির বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত হইয়া পড়িল, তাহা বুঝা গেল না।

॥ সীমান্ত-প্রহরী ॥ সুনীল দত্ত রচিত এই নাটিকাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। নেফা অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্র নাটিকাটির ঘটনাস্থল। বাঙালী বীর সৈনিক মৃত্যুঞ্জয়ের গৌরবজনক আত্মত্যাগের কাহিনীই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; তবে কাহিনীর কোন রহস্যঘন, গতিশীল রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের দুঃসহ কষ্টকর পরিবেশে কয়েকজন স্বদেশহিতব্রতী বীর সৈনিকের তরল দেশাত্মবোধের প্রবল উচ্ছ্বাসই এই নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব অপেক্ষা দেশপ্রেমিকের ভাবপ্রবণতাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সৈনিকের আত্মত্যাগের কারুণ্য আরও গভীর করিয়া তুলিবার জন্য নাট্যকার নায়কচরিত্রের সহিত একটি নারীর প্রেমসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আবছা নারীমূর্তির আবির্ভাব এবং নায়কের সহিত তাহার কথোপকথন স্থূল ও বিসদৃশ হইয়াছে।

॥ সিপাহী ॥ প্রকৃত-যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনীঅবলম্বনে লিখিত মানিক সরকারের এই নাটকটি যুদ্ধের উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, কষ্ট ও বিপদ সব বাস্তবরূপে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নাট্যকার নাটকে দেখাইয়াছেন, সেজন্য যুদ্ধের পরিবেশ ইহাতে অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে যেন একটি শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলের অতন্দ্র প্রহরীরা কিরূপ দুঃসহ কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যেও নিজেদের অদম্য প্রতিরোধশক্তি ও প্রবল স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় এ-নাটকে পাওয়া যায়। যুদ্ধের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অবসরে বিপত্নীক ক্যাপ্টেন ও সমাজনিন্দিতা নার্সের ব্যক্তিজীবনের বেদনা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুৎলেখার মতই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণ

সৈনিক রায়ের নির্ভীক মৃত্যুবরণ একই সঙ্গে অপরিসীম কারুণ্য এবং অপরিমেয় গৌরবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোলে। রায়ের মত বীর সন্তান যে জাতির আছে তাহার ভয় কোথায় ?

নাট্যকাব্য

কাব্য ও নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া সমালোচকরা অনেক কথা বলিয়াছেন। ঊর্ধ্ব আকাশের নীলিমায় কাব্যের অভিসার আর কঠিন মাটির উপলপথে নাটকের অভিযান। শ্লথ-বিশ্রান্ত জীবনসম্ভোগে কাব্যের পরিতৃপ্তি, কিন্তু দ্রুত ও অশ্রান্ত জীবনদ্বন্দ্বে নাটকের উল্লাস। তবুও এ-দুইয়ের মধ্যে কোথাও মিল আছে। উচ্চতম কবিকল্পনায় জীবনের গভীরতম সত্য প্রকাশ পায়। নাটকের ভাষা গদ্য হউক কিংবা পদ্য হউক, নাট্যকারকে কবির কল্পনা-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি আয়ত্ত করিতেই হইবে, তবেই তিনি বড় নাট্যকার হইতে পারেন। নাটকে বাস্তব জীবনের কথাই লিখিত হয়, কিন্তু সেই বাস্তব জীবনের কথা যখন কবিকর্তৃক চিত্র ও সংগীতের মধ্যে সমাপত হয় তখনই তাহা অমরত্ব লাভ করে।

জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ—গ্রীক নাটক ও শেক্‌সপীয়রীয় নাটক—পদ্যছন্দে লেখা। সেজন্যই ঐ নাটকগুলি কালজয়ী চিরন্তনত্ব লাভ করিয়াছে। নাটকে বাস্তবতার আমদানী হইবার পর হইতেই পদ্যসংলাপের স্থলে গদ্যসংলাপের প্রবর্তন হইল, কিন্তু পদ্যসংলাপ একেবারে বর্জিত হইল না। উনিশ ও বিশ শতকের অনেক সাঙ্কেতিক নাটকে পদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হইত। বর্তমান শতকের ধর্মমূলক নাটকে পদ্যসংলাপ আবার নূতন মর্যাদা পাইল। ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নাট্যকাব্য বর্তমানে আবার নূতন করিয়া লেখা সুরু হইল। ইংলণ্ডে এলিয়ট, অডেন ও ইসারউড, লুই ম্যাকনিস, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতি কবিগণ নাট্যকাব্য রচনার নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন।

বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের রোমান্টিক নাটকগুলি পদ্যছন্দে লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তারপর তিনি গদ্যসংলাপই মোটামুটি ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার শেষ দিকের অনেক নাটক, যথা—'ফাল্গুনী', 'রথের রশি', প্রভৃতির সংলাপ কাব্যময় হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক কালেও কেহ কেহ পদ্যছন্দে নাটক লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু খুব সার্থক নাট্যকাব্য আজও তেমন চোখে পড়ে নাই।

॥ সার্কাস (দ্বি-স° ১৯৫৫) ॥ সার্কাসের মতই এই নাট্যকাব্যে হরেক রকম লোক যেন তাহাদের বিচিত্র ও উদ্ভট জীবনের তালে তালে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লেখক চলমান বহির্জীবনের অজস্র ধারাকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহারা আঁকিয়া বাঁকিয়া কৌতুক-আবর্ত রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নাট্যকাব্যের ছন্দ হ্রস্বপদে, দ্রুতলয়ে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া ইহাতে যেন কৌতুকপূর্ণ নাচের ঝঙ্কার লাগিয়াছে। বাবা, মা, ছেলে, টাইপিস্ট ও দাসীকে লইয়া যে ঘটনার ধারা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতেও কৌতুকের সুরই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

॥ দুই আর দুই ॥ দিলীপ রায়ের দ্বিতীয় নাট্যকাব্য 'দুই আর দুই'। এই নাট্যকাব্যের নায়ক যুবক চরিত্রটি পিতার দারিদ্র্য ও হীনতায় সমস্ত নীতি ও ধর্মে বিশ্বাস হারাইয়া ঘোর নেতিবাদী হইয়া পড়িল। চুরিতে সে নির্বিকার, সুস্থ জীবনযাপনে আস্থাহীন। অবশেষে সে মৃত্যু বরণ করিল যাহাতে তাহার মৃত্যু সমাজের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে পারে—

স্বেচ্ছামৃত্যু এ নয়,
এ হত্যা, সামাজিক অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে
এ বলি।

॥ নীলকণ্ঠ (১৯৫৭) ॥ রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ' নাট্যকাব্যখানি বিদগ্ধ মহলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। নূতন করিয়া ঘর বাঁধার নেশায় অধীর দুইটি তরুণ-তরুণীর সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ইহার নাটকীয়তা সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। অরুণা তাহার পূর্ব স্বামীকে ত্যাগ করিয়া শেখরের সঙ্গে তাহার বহু স্মৃতিজড়ানো গ্রামের জীর্ণ বাড়ীতে নূতন সংসার করিতে আসে। সংসারের বহু টুকিটাকি ব্যবস্থায় যখন তাহারা মগ্ন, তখনই হঠাৎ অতীতের স্মৃতি ও অন্যায়বোধ বিষাক্ত সাপের মতই দংশন করিয়া বসে। এই দংশনজ্বালা শেখরের মধ্যেই তীব্রতর হইয়া উঠে। জয়মালা বলিয়া সে যাহা গলায় তুলিয়া লইয়াছে তাহাই এক দুঃসহ দাহে তাহার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই অন্তর্জ্বালা আমরা অরুণার মধ্যে দেখিতে পাই নাই। সে তাহার নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়কে শেখরের প্রতি উন্মুখ রাখিয়া যেন অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে নূতন জীবনযাত্রায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত শেখরকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াও সে মুক্তি দিতে পারিল না। অরুণার দুর্বশ হৃদয়ের কাছে তাহার সকল সঙ্কল্প পরাজয় বরণ করিয়া লইল। বোধ হয় এই জন্যই সে শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ হইতে পারিল, কারণ শেখরের

বিক্ষুব্ধ মন অবশেষে নির্বাক স্নেহে তাহার কাছে ধরা দিল। আলোচ্য নাট্য-কাব্যের মধ্যে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত ও গতিশীলতার সঙ্গে কাব্যের চিত্রকল্প-প্রয়োগ ও প্রতীক ব্যবহারের চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

॥ একলব্য (১৯৫৯) ॥ বনের মধ্যে দীর্ঘকাল একলব্য গুরুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অবশেষে গুরু দ্রোণ আসেন। দ্রোণ তাঁহাকে হস্তিনায় অর্জুনের সারথিরূপে নিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু একলব্য নিজের রাজত্ব ছাড়িয়া অর্জুনের প্রভুত্বের ছায়ায় নিজের স্বাধীনতাকে আচ্ছন্ন রাখিতে সম্মত হন না। তাঁহার মুখে বলিষ্ঠ প্রতিরোধের বাণী শুনিয়া দ্রোণ গুরুদক্ষিণারূপে তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাবী করেন। অনুতপ্ত দ্রোণের আত্মগ্লানিতে নাট্যকাব্যটির সমাপ্তি। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত আলোচ্য নাট্যকাব্যটির মধ্যে কবিত্বই আছে, নাটকীয়তা একেবারেই ক্ষীণ। ঘটনার মধ্যে কোন নাট্যসংঘাত কিংবা দ্রোণ ও একলব্য চরিত্রের মধ্যে কোন তীব্র দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয় নাই। সংলাপের মধ্যেও নাটকীয় ঋজুতা ও আবেগধর্মিতা নাই। চিত্রগুলি অনেক স্থলেই জটিল ও অস্পষ্ট। গ্রীক কোরাসের মত নাট্যকাব্যটির গোড়ায় ও শেষে সম্মিলিত বনবাসীদের নাট্য ঘটনা ও চরিত্রের উপর মন্তব্যসূচক ভাষণ রহিয়াছে।

॥ সমুদ্র দ্রুপদী (১৯৫৯) ॥ নাট্যকার শ্রীগিরিশঙ্করের নাট্যকাব্য রচনার প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে তাঁহার 'সমুদ্র দ্রুপদী' নামক বইয়ের দুইটি নাটিকায়। নাট্যকার বলিয়াছেন, 'বহু দিন আগে, প্রায় বছর ষোল সতের, একদা কাব্যচর্চার প্রয়াস পেয়েছিলাম—তাকেই মূলধন ক'রে লেগে পড়লাম'। লেখকের মূলধন যে ভালোই এবং তাহাকে যে তিনি খুব সার্থকভাবেই কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন তাহার পরিচয় আলোচ্য নাটিকা দুইটির মধ্যে যথেষ্টই পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র গদ্যকবিতাগুলির মত এই নাটিকা দুইটির গদ্যকাব্যময় সংলাপের বাক্যগুলি পঙ্‌ক্তির মত সাজানো হয় নাই। কিন্তু কবিতার চরণের মতই বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত, আবেগ-গর্ভ ও স্পন্দমান একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—'মানস আসবে, আর দেরী নেই। কতদিন, কতদিন পর আবার দেখব তাকে। আবার দেখব সেই সুন্দর, সুঠাম, অগ্নিপ্রভ পৌরুষকে।' এই অংশে বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, শব্দের পুনরাবৃত্তি এবং বাক্যের গোড়াতেই ক্রিয়াপদ প্রয়োগের দ্বারা কবিতার স্পন্দন ও গতি সঞ্চারিত হইয়াছে। কবিতার ধর্ম প্রকাশ পায় বাক্যের অলঙ্করণে—বক্তব্য বিষয়কে নানা চিত্রকল্পের দ্বারা দৃঢ়ীকরণে। লেখকের শক্তি এখানে সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, যথা—

'হে বাজনদার! তুমি কুৎসিত অন্ধকার মৃত্যুর মুখে জীবনের বিদ্রূপ ছুঁড়ে মেরেছ। হে মানুষ! তোমার সর্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন মৃত্যুবিজয় ঘোষণা করছে। হে জীবন! সর্বাঙ্গে মৃত্যুর প্রহারকে অলঙ্কার ক'রে তুমি সর্বজয়ী খৃষ্টের মতন।'

কাব্যের বিচার হইতে এবার নাটকের বিচারে আসা যাক। প্রথম নাটিকাটির নাম 'শর্বরী : মানসী : সবিতা'। তিনটি চরিত্রের নামেই নাটিকার নাম। ন্যাটিকাটির মধ্যে নাট্যকার আঙ্গিকের অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। শরীরী চরিত্রগুলির সঙ্গে তাহাদের ছায়ামূর্তিগুলিও কথা বলিয়াছে। আবার নামহীন ও নামযুক্ত বিভিন্ন কণ্ঠও নাটকীয় চরিত্রের মত সংলাপ উচ্চারণ করিয়াছে স্থতরাং নাটকের মূল চরিত্র তিনটি হইলেও দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রায় নয় দশটি চরিত্র সংলাপে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একটি একাঙ্কিকার স্বল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলি চরিত্র অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, নাটকের গতি ও সংহতি এই বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টির দ্বারা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। ছায়াচরিত্রগুলির সঙ্গে কায়াচরিত্রগুলির বক্তব্য ও বক্তব্যভঙ্গির কোন পার্থক্যই চোখে পড়িল না। ছায়াচরিত্রগুলির সংলাপে যদি কোন অস্পষ্টতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতার পরিচয় থাকিত তবে হয়তো তাহাদের সৃষ্টি স্বীকার করা যাইত। বিভিন্ন কণ্ঠের যে সংলাপ শুনা যায় নাটকের মধ্যে, তাহাদের যে কোন বিশিষ্টতা ও নাটকীয় উপযোগিতা আছে তাহাও বুঝা গেল না। শরীরী চরিত্রগুলির সঙ্গে তাহাদের কণ্ঠের যদি কোন ভাবগত ব্যবধান থাকে তবে তাহা এত সূক্ষ্ম যে কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কায়া-চরিত্রগুলির সঙ্গে তাহাদের ছায়ামূর্তির কথোপকথনের মধ্যে একই সত্তার দুই বিভিন্ন রূপের পরিচয় হয়তো আবিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্বৈত রূপের পার্থক্য কোথাও স্পষ্ট ও জোরালো হইয়া ধরা পড়ে নাই। মানসকে শর্বরী ও সবিতা উভয়েই ভালোবাসে, কিন্তু একই পুরুষকে দুইটি নারীর ভালোবাসার ফলে যে নাটকীয় জটিলতা ও আবেগ-দ্বন্দ্ব দেখাইবার সুযোগ ছিল নাটিকার মধ্যে তাহার কোন আভাস পাইলাম না। মনে হয়, শর্বরী ও সবিতা দুইজনেই পরস্পরের কাছে মানসের প্রতি তাহাদের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করিয়া পরম সান্ত্বনা ও তৃপ্তি বোধ করিয়াছে—মানসের বৃন্তে দুই জনেই যেন পাশাপাশি দুইটি ফুল হইয়া সৌরভ বিকিরণ করিতেছে। লেখকের স্নিগ্ধ ও সামঞ্জস্যকামী কবিসত্তা বোধ হয় এখানে তাঁহার দ্বন্দ্বপ্রধান নাট্যকার সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে।

'সাইরেন' নাটিকাটির মধ্যে পূর্বোক্ত কোন ত্রুটি নাই। 'সাইরেন' একটি নিখুঁত একাঙ্ক নাট্যকাব্য। একটি ট্রেঞ্চের মধ্যে আলোহীন অন্ধকারের বুকে

কয়েকটি ভাগ্যহীন জীব তাহাদের দুর্বিষহ অস্তিত্বের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলে। আলো তাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আলোর নেশা তাহাদের চোখে। সুর তাহাদের হারাইয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও ভাঙ্গা বেহালায় সুর তোলার জন্য তাহাদের কি মর্মান্তিক প্রয়াস! নাটিকাটির মধ্যে বর্তমানের কুৎসিত বীভৎসতা যতখানি ফুটিয়াছে, সোনালী ভবিষ্যতের মায়া ঠিক ততখানিই আভাসিত হইয়াছে। জীবন ব্যথায় পীড়িত, লোভ ও হিংসায় কলুষিত, কিন্তু তবুও যে জীবন বড় সত্য, বড় সুন্দর, সেই জীবনেব জন্যই তো মানুষ মরে, আবার মানুষ বাঁচে। মরার মধ্যে আবাব বাঁচিয়া উঠার সেই ইঙ্গিত-ই নাট্যকার দিয়াছেন।

॥ চেরাগবিবির হাট ॥ পাঁচটি একাঙ্ক কাব্যনাট্যের সংকলন গ্রন্থ। পবিবেশের বিচিত্রতা, সূক্ষ্ম অন্তর্মুখীনতা এবং কাব্য ও নাট্যের সমগুরুত্ব প্রত্যেকটি নাটকেব মধ্যেই লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে প্রথম কাব্যনাটকটি সংকলনের শ্রেষ্ঠ কাব্যনাটকও বটে। চেরাগবিবির হাটের হাটুরিয়া চরিত্রগুলির সংলাপ যেন কাব্যের এক একটি পঙ্‌ক্তি। সব পঙ্‌ক্তিগুলি মিলিয়া যেন একটি অখণ্ড কাব্যের দ্যোতনা। এক পঙ্‌ক্তির হ্রস্ব সংলাপ নাট্যক্ষিপ্রতা সঞ্চার করিয়াছে। চেরাগবিবি সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছে, কিন্তু রিক্ত ও অনাসক্ত নবীনের আঁকা চিত্রেব মধ্য দিযা যে ভালোবাসার নীরব নিবেদন আভাসিত হইয়াছে তাহা চেরাগকে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে অদূরবর্তী সমুদ্রের মত্ত হাহাকার, তীরবর্তী কম্পমান বৃক্ষশ্রেণীর আকুলিবিকুলি, চেনার সীমা থেকে অচেনা নিরুদ্দেশের পথে অভিযান প্রভৃতি এক অন্তহীন রহস্যের অনুভূতিতে আমাদের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 'এ-মুহূর্ত বিস্মৃত গহ্বব' নাটকে কতকগুলি পরিচয়হীন চবিত্রের টুকরা টুকরা কথা কালপ্রবাহের মধ্যে বুদ্‌বুদের মত ক্ষণকের জন্য দেখা দিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'সঙ্কটের ছায়া'য় বড ভাইয়ের স্ত্রী মাধবী অনন্ত চন্দ ও স্বামীর মধ্যে ভালোবাসার যন্ত্রণায় দোলায়িত হইয়াছে। তাহার প্রণয়ী অনন্ত শুধু কেবল স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই নহে, গোটা সংসারটার মধ্যে যেন একটি সঙ্কটের ছায়াপাত করিযাছে। সেই ছায়াটি মাধবী সরাইতে চাহে, কিন্তু পাবে না, মনের মর্মমূলে সে যেন বাসা বাঁধিয়াছে। 'ভালুক বিবর্ণ স্মৃতি'র মধ্যেও স্বামী ও প্রণয়ীর দ্বৈত ভালোবাসার মধ্যে নায়িকা নমিতার হৃদয় আবর্তিত। অবশ্য এখানে নমিতা তাঁহার অতীতের বিবর্ণ স্মৃতি যেন মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। সংকলনের প্রথম নাটকটি সামুদ্রিক পটভূমিতে রচিত এবং শেষ নাটকটি তুষারাবৃত পর্বত-চূড়ার সর্বগ্রাসী হিমপ্রবাহের

ভয়াল পটভূমিতে উপস্থাপিত। দুর্গম পর্বতশীর্ষ জয়ে মানুষের অদম্য আগ্রহ। মহাশূন্যতার মধ্যে ভয়াল ও সুন্দরের সম্মিলিত অবস্থান, মৃত্যুর শীতল গহ্বরে অদৃশ্য মানুষের জন্য ব্যর্থ সন্ধান। তুষারধসের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আতঙ্কিত মানুষের ত্রস্ত পলায়ন এবং পরিত্যক্ত ব্রতীশের তুহিন বাহুপাশে বিলুপ্ত হইবার মুহূর্তে একটু আগুনের জন্য আকুল আর্তি—এ সব কিছু নাটকটিকে এক ভয়স্তব্ধ উত্তেজনায় আক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

॥ কক্ষপথে ওরা ॥ শান্তিকুমার ঘোষ আধুনিক কবিদের অন্যতম। তিনি কবিতাকে দর্শকমণ্ডলীর কাছে আনিবার উদ্দেশ্যে কাব্যনাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যনাটক যেন কাব্যের শ্রব্য স্তরের কাছাকাছি রহিয়াছে। চরিত্রগুলি বাহিরের পরিস্থিতির মধ্যে ততখানি গতিশীল নহে যতখানি আবর্তিত অন্তর্মুখীন ভাবনার অস্ফুট সংঘাতে। 'কক্ষপথে ওরা' আটটি দৃশ্যের কাব্যনাটক। দৃশ্যগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। দুই একটি বস্তুগত কথাবার্তার পরেই চরিত্রগুলি নিজস্ব মানসিক বৃত্তে আবর্তিত। 'রূপান্তর' কাব্যনাটকটিতে নারীদেহের মধ্যে পুরুষ মনের অবস্থিতিজনিত আত্মদ্বন্দ্বের রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বেষ্টন' বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কঠোর দুঃখব্রত সংগ্রাম অবলম্বনে রচিত। নাটকটির মধ্যে সংগ্রামী জীবনের গতি ও উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছে। 'অপার্থিব এ প্রহরে' নাটকের মধ্যে নকশাল আন্দোলনের ভ্রান্ত নৃশংসতা এবং পুলিশী নিষ্ঠুরতার একটি ছবি তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পাঁচটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যের মধ্যে সমাজের একটি ক্ষণস্থায়ী বিভীষিকার পূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে লিখিত কৃষ্ণ ধরের 'এক রাত্রির জন্য' আর একখানি সুলিখিত নাট্যকাব্য।

অনূদিত নাটক

অনুবাদ-সাহিত্যের উৎপত্তি হয় দুইটি কারণে। বিভিন্ন সাহিত্যের কাহিনী ও রসের দ্বারা নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ইচ্ছা অনেক লেখকেরই থাকে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই দেশের জাতীয় ও সামাজিক প্রকৃতি, নৈসর্গিক পরিবেশ, বিশিষ্ট চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সাহিত্যের বস্তু ও ভাবজগৎ একটু পরিচিত গতানুগতিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ না হইয়া পারে না। সেজন্য ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্য লেখক ও পাঠক ভিন্ন দেশের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কেবল বস্তু ও ভাবের দিক দিয়া নহে,

আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর দিক দিয়াও লেখকগণ নিজেদের সাহিত্যে নানা নূতনত্বের প্রবর্তন করিতে পারেন। এ ধরনের অনুবাদ প্রত্যেক সাহিত্যেরই কাম্য এবং এই অনুবাদের মধ্য দিয়া ইংরেজী সাহিত্যের মত অনেক সমৃদ্ধ সাহিত্য আরও বহুগুণে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিশক্তির দৈন্য এবং পাঠকের নিজের সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হইতে যখন লেখকের অনুবাদের প্রেরণা আসে, তখন সেই অনুবাদ পরবশ্যতার নামান্তর মাত্র। সেই অনুবাদ সাহিত্যকে গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল না করিয়া অক্ষম হীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে।

এ-কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাংলা নাট্য সাহিত্যে অনুবাদের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে তাহার অনিশ্চয়তা ও অবসাদের মুহূর্তে। সেজন্য এ-অনুবাদ আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছে যতখানি আশঙ্কিত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশি। বাংলা নাটকের সূচনায় অনুবাদের যে প্রাধান্য দেখিয়াছিলাম তাহার পরিণতিতে আবার সেই অনুবাদেরই প্রাধান্য দেখিতেছি। যে অনুবাদের বশ্যতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাংলা নাটক তাহার স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল, আবার সেই অনুবাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সে কি তাহার স্বাধীন চলার পথ হারাইয়া ফেলিবে? এই সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সমস্যাটি লইয়া আলোচনা করিবার আগে অনূদিত নাটকগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

আধুনিক কালের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী নাটকের অনুবাদের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। উমানাথ ভট্টাচার্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের সু-অনুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি গোর্কির *The Lower Depths*-এর অনুবাদ করিয়াছেন 'নীচের মহল' নাম দিয়া। অনুবাদ প্রায় আক্ষরিকই বলা যাইতে পারে, অথচ ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যে এই অনুবাদকে অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। গলস্‌ওয়ার্দির *Strife* ও সেবাস্তিয়ানের *Stop News* নাটক দুইখানি উমানাথ যথাক্রমে 'ঘূর্ণী' ও 'শেষ সংবাদ' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানত অনুবাদের মধ্য দিয়াই নাট্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। জে বি. প্রিস্টলির *An Inspector Calls*, ইবসেনের *Hedda Gabler*, শেকভের *The Sea Gull* প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক তিনি যথাক্রমে 'থানা থেকে আসছি', 'শকুন্তলা রায়', 'আকাশ বিহঙ্গী' নামে অনুবাদ করেন।

অনুবাদে সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীও সিদ্ধহস্ত। সার্ত্রের *Men Without Shadows*

নাটকখানি তিনি 'ছায়াবিহীন' নাম দিয়া অনুবাদ করেন। সার্ত্রের নাটকের বীভৎস রস বাংলা নাটকেও অতি সার্থকভাবে নাট্যকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আয়োনেস্কোর *Rhinoce* 'গণ্ডার' নামে তাঁহার দ্বারা অনূদিত ও অভিনীত হয়। শেকভের *Three Sisters* শিবেশ মুখোপাধ্যায় 'তিন চম্পা' নামে অনুবাদ করিয়াছেন। দুই একখানা প্রাচীন ক্লাসিক নাটকেরও অনুবাদ হইয়াছে। সফোক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' নাটকের প্রশংসনীয় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন সাধনকুমার ভট্টাচার্য। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পিরানডেলোর *Six Characters in Search of an Author*-এর অনুবাদ করিলেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' এই নামে। উৎপল দত্ত বার্ণার্ড শ এর *Mrs. Warren's Profession* অবলম্বনে লিখিলেন 'মধুচক্র'। তিনটি বিদেশী নাটক অবলম্বনে অশোক সেন রচনা করিলেন 'আবর্তন'। 'শের আফগান' সম্পর্কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলিয়াছেন, 'নাটকটির ফর্ম মারাত্মক ভালো। অসম্ভব মৌলিক।' পিরান্দেলোর চতুর্থ হেনরী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হইয়াছে 'শের আফগান'। তবে পিরান্দেলোর চরিত্রবৈশিষ্ট্য অজিতেশের রূপান্তরে বজায় রহিয়াছে এবং ঐ চরিত্রে তাঁহার অভিনয়ও হইয়াছে চমৎকার। অ্যালবির *The Zoo Story* শৌভনিক কর্তৃক 'চিড়িয়াখানা' নামে রূপান্তরিত ও অভিনীত হয়। বেকেটের *Waiting for Godot* অশোক সেনের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। সার্ত্রের *Respectable Prostitute* একাধিক সংস্থা দ্বারা রূপান্তরিত (বরণীয়া বারনারী) ও অভিনীত হইয়াছে। নিগ্রোর জায়গায় কোন ঘৃণিত সম্প্রদায়ভুক্ত চরিত্র অবতারণা করা হইয়াছে। আর্থার মিলারের *Death of a Salesman* নাটক 'জনৈকের মৃত্যু' নামে রূপান্তরিত হইয়া চতুর্মুখ সম্প্রদায় কর্তৃক মঞ্চস্থ হইয়াছে। নাটকটির কাহিনীর সঙ্গে বাঙালী মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের সাদৃশ্য থাকার ফলে রূপান্তরিত নাটকটি মৌলিক নাটক বলিয়াই মনে হয়। ব্রেখট্ তাঁহার সাম্যবাদী মতবাদ ও অভিনব শিল্প-আঙ্গিকের জন্য বর্তমানে বাংলার জনপ্রিয়তম নাট্যকার। ব্রেখটের *Three Penny Opera*' 'তিন পয়সার পালা' নামে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছে। নামগুলিরও পরিবর্তন হইয়াছে—যথা, ম্যাকহিল হইয়াছে মহীন্দ্র, পিচাম হইয়াছে যতীন্দ্রনাথ। তবে ঘটনাধারা মূল নাটকের প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ত। চেতনা প্রযোজিত 'ভালো মানুষের পালা' এবং নান্দীকার প্রযোজিত 'ভালো মানুষ' *The Good Soul of Setzuan* নাটক হইতে রূপান্তরিত। ভালোমানুষে বেশ্যা

Shen Te রূপান্তরে হইয়াছে শান্তা। অন্য কোন ব্যক্তিনামের সঙ্গে মূল নাটকের ব্যক্তিনামের কোন ধ্বনিগত মিল নাই। *Mr. Puntila and his Hired man, Matti* অবলম্বনে শেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রূপান্তরিত ও প্রযোজিত নাটক হইল 'পন্ত লাহা'।

অনেক নাট্যসংস্থা নিজেদের অভিনয়ের প্রয়োজনে বহু বিদেশী নাটকের অনুবাদ করাইয়া থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় না বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। লিট্‌ল থিয়েটার, গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী, শৌভনিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থা এ-ধরনের বহু অনূদিত নাটকের অভিনয়ের দ্বারা নাট্যমোদী জনগণের চিত্ত গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছেন। শেকস্‌পীয়রের নূতন নূতন অনুবাদ এখনও হইতেছে। শেকস্‌পীয়র ছাড়া অন্য যে-সব নাট্যকারের নাটক অনূদিত হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, পিরাণ্ডেলো, বার্ণার্ড শ, গলসওয়ার্দ্রি, গোর্কি, শেকভ. সার্ত্রে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে অনূদিত নাটকগুলির কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ বিদেশী নাম ও পরিবেশ পরিবর্তন করিয়া দেশী নাম ও পরিবেশের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো ভাবেন যে, দেশী নাম ও পরিবেশ বাঙালী দর্শকদের কাছে অধিকতর রুচিকর ও প্রীতিপ্রদ হইবে। কিন্তু এ-ধরনের অনুবাদে অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়, কারণ অনুবাদ মানেই ভাষান্তর, ভাবান্তর অর্থাৎ রসান্তর নহে। বিদেশী নাম ও পরিবেশ বজায় রাখিলে আমাদের কল্পনার সে উদার স্ফূর্তি ও বিচিত্র দৃশ্যজগতের অভিজ্ঞতা-জনিত যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহা দেশী নাম ও পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং দেশী নামধারী কোন চরিত্রের বিজাতীয় আচরণ ও আমাদের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে কোন অপরিচিত ঘটনার সমাবেশ হইলে একটা উৎকট অসঙ্গতিই আমাদের চোখে ধরা পড়িবে। কোন কোন নাট্যকার বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে নাটক রচনা করেন। ইহাদের অনুবাদ করিবার সাহস নাই, আবার সৃষ্টি করিবারও ক্ষমতা নাই। এই ধরনের নাট্যরচনাকে কখনও প্রশংসা করিতে পারিব না। আবার কোন কোন অক্ষম ও ভীরু নাট্যকার বিদেশী নাটকের ভাব লইয়া নিজের বলিয়া চালাইতে চাহেন। বলা বাহুল্য, ইহা সাহিত্যিক পরস্বাপহরণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোন্ শ্রেণীর অনুবাদ দর্শকচিত্তে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা কয়েকটি

প্রসিদ্ধ নাট্যাভিনয়ের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে। ইবসেনের কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ সাম্প্রতিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। বহুরূপী নাট্য-সম্প্রদায় ইবসেনের একাধিক নাটক অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার *A Doll's House* নাটকখানিকে 'পুতুলখেলা' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয় প্রশংসনীয়, কিন্তু অভিনয় দেখিবার সময় কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে, এ-চরিত্রগুলি আমাদের সমাজের কখনকার কোন্ স্তর হইতে গৃহীত হইয়াছে? ইহাদের নাম বাঙালীর, কিন্তু প্রকৃতি ও আচরণ তো ঠিক বাঙালীর নহে। ইহাদের নাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ নরওয়ের পরিবেশে আমাদের কল্পনাকে ধাবিত হইতে দিল না, আবার ইহাদের বিসদৃশ মানস-সংস্কার বাঙালী দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা-সম্পর্ক গড়িয়া উঠার পথেও বাধা দিল। এই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের আর একটি সুখ্যাত নাট্যসংস্থাকর্তৃক ইবসেনের *Ghosts* নাটকের অভিনয় তুলনা করা যাইতে পারে। শৌভনিক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি। শৌভনিক সম্প্রদায় *Ghosts* নাটকের ভাষারই শুধু পরিবর্তন করিয়াছেন, আর কোন প্রকার পরিবর্তন তাহারা করেন নাই। সেজন্য চরিত্রগুলির নাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ মূল নাটকের জগৎকেই আমাদের কাছে অত্যন্ত বাস্তবভাবে উদ্‌ঘাটন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজে যে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা দেখা গিয়াছিল তাহারই যথাযথ রূপ ও জীবনরস আমরা এই অভিনয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করি। সময় ও পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় থাকে না। অথচ আমাদের কল্পনাশক্তিকে সক্রিয় রাখিয়া নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে একটি রসসম্পর্কও স্থাপন করিতে পারি। লিট্‌ল্ থিয়েটারের দুইটি স্মরণীয় নাট্যাভিনয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের 'ওথেলো' ও 'নীচের মহল' দুইটি নাটকের অভিনয়ই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়ে শুধু ভাষারই পরিবর্তন দেখা গেল। কিন্তু আর সব দিকে মূল নাটকের সঙ্গে কোন প্রভেদই দেখা গেল না। সেজন্য এই অভিনয়ে শেকস্‌পীয়রের রস আস্বাদন করিয়া দর্শকচিত্ত বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু 'নীচের মহলে' চরিত্রগুলির নাম, পরিচ্ছদ ও পরিবেশ সব কিছুরই জাতীয়-করণ হইয়াছে। কলিকাতার বস্তিতে চরিত্রগুলির সমাবেশ ঘটায় খুব বড় রকমের অসঙ্গতি চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু তাহাদের স্বভাব, আচরণ ও কথা বলিবার ভঙ্গি বিচার করিলে কোথাও কোথাও একটু বিজাতীয় গন্ধ যে না পাওয়া

যায় তাহা নহে। আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি—গোর্কির জগৎকে আমরা পাইলাম না। গোর্কিকে রুশ জানিয়াই আমরা ভালোবাসি এবং তাঁহার চরিত্রগুলিকেও আমরা রুশ দেখিয়াই ভালোবাসিতে চাই। গোর্কি ও তাঁহার চরিত্রগুলিকে যেই আমরা বাঙালীর ছদ্মবেশে সাজাইব সেই মুহূর্তেই তাহাদের সম্বন্ধে সব আগ্রহ ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিব। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখার '২০শে জুন' নাটকের অভিনয়ও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নাটকের চরিত্রগুলির নাম, পোশাক ও পরিবেশ অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিয়াই রোজেনবার্গ দম্পতির করুণ ঘটনাশ্রয়ী রসধারা এত গভীরভাবে আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে।

অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, অনুবাদ মৌলিক সৃষ্টির অনুবর্তন করিবে, কখনও অগ্রগমন করিবে না। নাট্যকারগণ মৌলিক নাটক রচনার দায়িত্ব পালন করিয়া তবেই অনুবাদের দিকে নজর দিতে পারেন। আমাদের যদি দিবার কিছু না থাকে তবে অন্য কোন ভাষা হইতে কিছু নিতে গেলেই আমাদের লজ্জাকর হীনতা প্রকটিত হইয়া পড়িবে। নবীন নাট্যকারগণ অনেক সময় মৌলিক নাট্যসৃষ্টি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন, কারণ নাট্যসংস্থাগুলির নিকট হইতে তাঁহারা যথোপযুক্ত উৎসাহ পান না। বাংলা দেশের শক্তিশালী নাট্যসংস্থাগুলি বর্তমানে অনূদিত নাটক অভিনয়ের দিকে যে অত্যধিক প্রবণতা দেখাইতেছেন তাহা বাংলা নাটকের সুসমৃদ্ধ আত্মবিকাশের অনুকূল নহে। দেশের নাটক কিছু দুর্বল হইলেও সর্বতোভাবে তাহাকে উৎসাহ দান করা উচিত। অনূদিত নাটকের অভিনয় মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের জন্য চলিতে পারে এবং অনূদিত নাটকের ভাষাই শুধু বাংলা হইবে, আর সব দিক দিয়া অনূদিত নাটক মূল নাটকেরই অনুরূপ হইবে ইহাই আমরা কামনা করি।

একাঙ্ক নাটক

সাম্প্রতিক কালের নাট্যসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে একাঙ্ক নাটক। মাত্র আট-দশ বৎসর পূর্বেও শ্রীমন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকগুলি ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ ছিল না। কিন্তু আজ প্রায় সব শক্তিমান নাট্যকারই বহুতর একাঙ্ক নাটক লিখিয়া চলিয়াছেন এবং বেশ কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকের সঙ্কলনগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

একাঙ্ক নাটকের এই সমৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রসারের কারণ কি তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

গত কয়েক বছর নাট্য-আন্দোলনের যে বিপুল উদ্দীপনা ও প্রবল প্রভাব দেখা গিয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নাটকের অভিনয় ও অনুশীলনের উদ্দেশ্য লইয়া সংখ্যাতীত অপেশাদার নাট্যসংস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহারা অভিনয়ের জন্য প্রধানত একাঙ্ক নাটকেরই সন্ধান করিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় করিতে গেলে অনেক অর্থ, অনেক লোক এবং অনেক সময় দরকার, সেগুলি স্বল্পশক্তি নাট্যসংস্থাগুলি আয়ত্তের বাহিরে, সেজন্য একাঙ্ক নাটকের অভিনয়ের দিকে ঝোঁক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাহারা প্রথমত, বিদেশী একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করিয়া এবং তারপর মৌলিক একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া সেই সব নাটকের অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল। ইহারই ফলে বহু একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করিতে হইবে। বর্তমানে বহুস্থানে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা হইতেছে, আবার বহু নাট্য-সংস্থাও একাঙ্ক নাটকের উৎসবের আয়োজন করিতেছে। এই সব প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ফলেও একাঙ্ক নাটকের অনেকখানি পরিপুষ্টি ঘটিতেছে। আর একটি সাধারণ যুগপ্রবণতার কথাও এখানে উল্লেখ করিতে হইবে। বর্তমানে মানুষের সময় অল্প, মনোযোগ দিবার অবসরও কম। সেজন্য সে অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের কোনও রসরূপ দেখিতে ও দেখাইতে চাহে। এই কারণে বর্তমান যুগে যেমন ছোট গল্প প্রসার লাভ করিতেছে, তেমনি প্রসার লাভ করিতেছে একাঙ্ক নাটক।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রকৃত জন্মদাতা হইলেন বর্তমান বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা মন্মথ রায়। তাঁহার পূর্বে একাঙ্ক নাটকের সচেতন শিল্প-বোধ লইয়া কেহ এই নাটক রচনা করেন নাই। অবশ্য পূর্ববর্তী অনেক নাট্য-কারের বিশেষ বিশেষ নাটককে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন নাটককে একাঙ্ক নাটকরূপে বিচার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাট্য-কাব্য ও 'হাস্যকৌতুকে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি নাটিকাকেও এই একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

মন্মথ রায় শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। চারখানি সংকলন-

গ্রন্থের তাঁহার একাঙ্কিকাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে, যথা 'একাঙ্কিকা', 'নব একাঙ্ক', 'ফকিরের পাথর' ও 'বিচিত্র একাঙ্ক'। 'একাঙ্কিকা'য় প্রকাশিত নাটিকাগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে তো নাই-ই, এমন কি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটকাবলীর সহিত ইহারা সমতুল্য একথা সাহসের সহিত বলা চলে। বইখানির মধ্যে কয়েকটা চোখ ঝলসানো রত্ন ইতস্তত পড়িয়া আছে, ইহাদের দীপ্তিপ্রাখর্য আমাদের বিচার করিবার, তুলনা করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া ফেলে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে এক একটা নাটিকা পড়িবার পরে উত্তেজিত মনের মধ্যে অসংখ্য সুরের ঝঙ্কার ক্রমাগত উত্থিত হইতে থাকে। গীতিকবিতার ন্যায় ইহাদের অভ্যন্তরস্থ প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী অনুরণন সৃষ্টি করিয়া চলে। নাটিকাগুলির প্রত্যেকটিই অত্যুত্তম হইলেও খুব চুলচেরা বিচার করিয়া 'বিদ্যুৎপর্ণা'কে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। বিষকন্যার তীব্র জ্বালাময় হলাহল নাটিকাখানির মধ্যে যেন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। দর্শন করিবার সময় গ্লানিকের বিষের প্রভাবে আমাদের মনপ্রাণ জর্জরিত হইয়া পড়ে। বিদ্যুৎপর্ণা হাস্যে-লাস্যে, কটাক্ষে-বিদ্রূপে চতুর্দিকে তরল বিষ ছড়াইয়াছে। পুরোহিতের গোপন কামনা এবং গূঢ় ঈর্ষা, শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিয়া এই বিষময়ী ভয়ঙ্করীর পদে লুটাইয়া পড়িয়াছে। 'বিদ্যুৎপর্ণা'র ন্যায় সুতীব্র কামনাময়, অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ নাটিকা 'রাজপুরী'। রাণী চরিত্রটি চঞ্চল ভালোবাসায় পূর্ণ, কাবের প্রতি তাঁহার উদ্দাম কামনা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তবুও সে অসত্যসাধিকা নহে। নিজে কলঙ্কতিলক ললাটে ধারিয়া সে সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া গেল। 'পঞ্চভূত' রূপক নাটিকা। 'মাতৃমূর্তি'র মধ্যে শিল্পীর মিনতি ভরা সুগভীর অন্তরকামনাকে লেখক এইভাবে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার কামনার প্রকৃতি সম্বন্ধে রাণীর মত আমাদেরও ভুল হয়। শিল্পীর অশান্ত আবেগময় প্রেম যে মাতৃমূর্তির কল্পনা করিয়াছিল তাহা আমরা প্রথম ধরিতে পারি না। প্রণয়ীর প্রেমের সহিত এই প্রেমের অভিব্যক্তি অভিন্ন। 'উপচার' নাটিকায় সাধ্বীশিরোমণি ভৈরবী স্বামীর কল্যাণের আশায় নারীর ঘৃণ্যতম কলঙ্ক বরণ করিয়া লইল। এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ এত অদ্ভুত, এত বিচিত্র যে বিস্ময়ে, বেদনায় আমাদের মন স্তব্ধ হইয়া যায়।

'নব একাঙ্কে'র মধ্যে দশটি একাঙ্ক নাটক রহিয়াছে। কয়েকটিতে একটু কৌতুক ও বিদ্রূপের সুর প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রক্তকদম, সূর্যমুখী, এই অসাধারণ নাটিকাগুলি শিল্পরসের দিক দিয়া খুবই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ নাটক হইল 'টোটাপাড়া'। একটি বলীয়মান উপজাতির ইতিহাস

সুতীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। 'ফকিরের পাথরে' নয়টি একাঙ্কিকা রহিয়াছে। 'বিবসনা' ও 'হারিকেন' এই দুইটি একাঙ্কিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্মথবাবুর একাঙ্ক নাটকের সর্বশেষ সঙ্কলনগ্রন্থ হইল 'বিচিত্র একাঙ্ক'। নানা ধরনের ভাব ও আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায় এই সঙ্কলনে। কয়েকটি নাটক রূপক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং কয়েকটি নাটকের মধ্যে সাঙ্কেতিকতার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে। কয়েকটিতে আবার পাত্রপাত্রীদের নামই উল্লেখ করা হয় নাই। এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ নাটক নিঃসন্দেহে 'জন্মদিন'।

শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি আধুনিক সুবিখ্যাত নাট্যকারগণ বেশি সংখ্যায় একাঙ্ক নাটক লেখেন নাই। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে কোন কোন সাহিত্যিক শখের প্রেরণায় কিছু কিছু একাঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামীর নাম বিশেষ ভাবে করা যায়। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের একাঙ্ক নাটকের একটি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম 'প্রথম অঙ্কে সমাপ্ত'। নাটিকাগুলির মধ্যে কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীরস বিশেষভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ও গতিবেগ তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। পরিমল গোস্বামীর 'ঘুঘু' নামক সঙ্কলনগ্রন্থে কয়েকটি উপভোগ্য বিদ্রূপরসাত্মক নাটক রহিয়াছে। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'নতুন তারা' বইতে কয়েকটি শিল্পরসোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটক রহিয়াছে। কাহিনীর বাঁধুনি এবং সংলাপের দ্যুতি অচিন্ত্যকুমারের নাটকগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, অখিল নিয়োগী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ কয়েকখানি একাঙ্কিকা রচনা করিয়াছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বনফুল একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও অসাধারণ উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'দশভাণে'র মধ্যে কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক রহিয়াছে। আদি, করুণ, হাস্য ও বীভৎস প্রভৃতি বিভিন্ন রসের ক্ষেত্রে তিনি সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক একাঙ্ক কাব্যনাট্য 'কবয়ঃ' এবং কাল্পনিক দেবদেবীর পরিবেশে রচিত 'অন্তরীক্ষে' অভিনব এবং অতিশয় উপভোগ্য। 'শিককাবাব', 'বাণপ্রস্থ' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটকরূপে বিচার্য।

খ্যাতনামা নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার

ছাপ রহিয়াছে। কয়েকখানি নাটকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়া সামাজিক সমস্যার উপর তিনি আলোকপাত করিয়াছেন; যথা, পূর্ণগ্রাস, অপচয়, এপিঠ-ওপিঠ ইত্যাদি। 'দাম্পত্যকলহে চৈব' উপভোগ্য কৌতুকরসাত্মক নাটক।

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য খুব বেশি একাঙ্ক নাটক লেখেন নাই। কিছুকাল আগে প্রকাশিত তাঁহার 'কান্না হাসির পালা'র মধ্যে দুইটি একাঙ্ক নাটক স্থান পাইয়াছে। হাসির পালাতে তিনটি দৃশ্য রহিয়াছে, সেজন্য একাঙ্ক নাটকের কঠোর নিয়ম এখানে লঙ্ঘিত হইয়াছে। তবে কান্নার পালাটি একটি নিখুঁত একাঙ্ক নাটক।

সুদক্ষ নাট্যকার সলিল সেন স্বল্পসংখ্যক একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বহু-অভিনীত ও অতিশয় জনপ্রিয় নাটক 'সন্ন্যাসী'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃতি নাট্যরচয়িতা কিরণ মৈত্রের নাট্যরচনানৈপুণ্য একাঙ্ক নাটকের মধ্যেও প্রকাশিত। তাঁহার 'এক অঙ্কে শেষ' নামক সঙ্কলনপুস্তকে চারটি একাঙ্ক নাটক স্থান পাইয়াছে। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক 'বুদ্‌বুদ্'। সমাজের ঘোর অকল্যাণকারী ব্যক্তির মুখোশ অনাবৃত হইয়াছে 'ভাগ্যে লেখা' নাটিকায়। ভাগ্যহত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে 'অন্ধকারায়' নামক নাটিকাটিতে।

সাম্প্রতিক কালে একাঙ্ক নাটক রচনায় যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীগিরিশঙ্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশঙ্কর খুব বেশি সংখ্যায় নাটক রচনা করেন নাই, সেজন্য তাঁহার শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার নাটকের মধ্যে আমরা পাই নাই। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাঁহার 'শেষ সংলাপে' বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা কয়েকটি বিশেষ জোরালো একাঙ্ক নাটক সঙ্কলিত হইয়াছে। 'শেষ সংলাপ' নামক নাটিকাটি একটি আত্মালাপী নাটিকা (Dramatic Monologue)। ইহাতে বিরোধী ভাবাবেগের প্রবল তাড়নায় একটি লোকের সংলাপই যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী একাঙ্ক নাটকের একজন নিপুণ ও একনিষ্ঠ শিল্পী। তাঁহার 'সকাল সন্ধ্যার নাটক' ও 'চাঁদের হাট' নামক সঙ্কলন-গ্রন্থ দুইটিতে অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক স্থান পাইয়াছে, ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকখানি বিদেশী নাটকের অনুবাদ। অভিনব আঙ্গিক নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সোমেন্দ্রচন্দ্রের অত্যধিক

আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও ঝলকিত বৈদগ্ধ্যে তাঁহার নাটিকাগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে।

সুনীল দত্ত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিকবিরোধ অবলম্বনে লিখিত দুইটি দৃশ্যসম্বলিত নাটক হইল 'লুঠতবাজ'। 'ত্রিনয়নে' তিনটি একাঙ্কিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। তরুণ নাট্যকার রমেন লাহিড়ী পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে একাঙ্ক নাটক রচনাতেও হাত দিয়াছেন। তাঁহার একাঙ্ক সঙ্কলন-গ্রন্থ 'অনুবীক্ষণে' চারটি একাঙ্ক নাটক স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি নাটকের বিষয় ও রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নাটকগুলি দীর্ঘবিস্তৃত, সেজন্য ইহাদের কাহিনী জটিল আবর্তসঙ্কুল ও রসঘন হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

উপরিলিখিত খ্যাতনামা নাট্যকারবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য বহু স্বল্পখ্যাত নবীন পথযাত্রী একাঙ্ক নাটকের পথে চলিতে শুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম অবশ্য উল্লেখ করা সম্ভব নহে। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক' সাম্প্রতিক কালের একখানি শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক। বিদ্যুৎ বসুর গিরিশ একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত একাঙ্কিকা 'লারনিং ফ্রম দি বারনিং ঘাট' অত্যন্ত হাস্য রসের অথচ বহু-জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক। অগ্নিমিত্রের 'নবজন্ম', অমরেশ দাশগুপ্তের 'দৈনন্দিন', গোপীকানাথ রায়চৌধুরীর 'সম্রাজ্ঞী', আগন্তুকের 'শতাব্দীর স্বপ্ন', অচল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিনটি একাঙ্ক নাটক', সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের '১৪ জুলাই', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের মতো সমুদ্র', শ্যামল ঘোষের অনুদত্ত 'অঙ্কুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শৈলেশ গুহনিয়োগী (পিকলু নিয়োগী) রচিত একাঙ্ক নাটকগুলি বহু অভিনীত এবং বিশেষ জনপ্রিয়। 'বিদিশ'-এ কয়েকটি বিপথগামী যুবককে সৎপথে বাঁচিবার নূতন আলোকোজ্জ্বল পথ দেখানো হইয়াছে। নানা রকম রোগ-চরিত্র লইয়া উদ্ভট কৌতুকরসাত্মক নাটক 'ফ্লু' লেখা হইয়াছে। নাট্যকারের অন্যান্য কৌতুকরসাত্মক একাঙ্ক নাটক হইল 'রিহার্সাল', 'রিএ্যাকশন', 'পলিটিক্স', 'গোলপার্ক', 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' ইত্যাদি। আরও একজন কৃতী তরুণ নাট্যকার বিমল রায় কয়েকখানি একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একাঙ্ক রহস্য-নাটক হইল 'অভিনয়'। তাঁহার অন্যান্য একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'অন্তরালে', 'ব্রীজ', 'গ্রহ সম্মেলন', 'দি নিউ শ্রীহরি অপেরা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাণিক রায়ের

পরীক্ষামূলক একাঙ্ক নাটক সংকলন হইল 'স্ফুলিঙ্গ' ও 'কয়েদখানা'। চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'কন্টুকা'র মধ্যে তিনটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন রহিয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে যেমন প্রচুর পরিমাণে একাঙ্ক নাটক লেখা হইতেছে, তেমনি এই নাটকের ভাব ও রূপরীতির মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছে। বাস্তব সমস্যা অবলম্বনে সমাজ-ভাবনা অনেক নাটকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উৎপল দত্তের 'নীলকণ্ঠে' ম্যানহোলের মধ্যে একটি ধাঙ্গড় ছেলের করুণ মৃত্যুবরণের কাহিনীতে ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার 'কাকদ্বীপের' এক মা'র মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর নৃশংস অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। কৃষক-বিপ্লবের জলন্ত রূপ ফুটিয়াছে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান', কিরণ মৈত্রের 'বিচারক', মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আরক্ত আঁখি' প্রভৃতি নাটকে। মালিকের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার এবং শ্রমিক-মালিক-দ্বন্দ্ব দেখান হইয়াছে রমেন লাহিড়ীর 'ষড়যন্ত্র', জোছন দাস্তিদারের 'পঙ্গপাল', এবং খনির শ্রমিকদের কাহিনী লইয়া লেখা 'কালো মাটির কান্না' প্রভৃতি নাটকে। উপেক্ষিত ও অনালোচিত জীবন অবলম্বনে লেখা পবিমল দত্তের 'ব্যাণ্ডমাস্টার' এবং জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজিকর' সমস্যার অভিনবত্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নবিত্ত মানুষের বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'দিনান্তে', অগ্নিদূতের 'রবিবারের সকাল', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রৌদ্রাভিসার', সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সূর্যের সন্তান' প্রভৃতি নাটকে। অভিনয়-সফল অথচ অবিশ্বাস্য ও অতিনাটকীয় উপাদানবিশিষ্ট নাটক হইল বসন্ত ভট্টাচার্যের 'সারি সারি পাঁচিল', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিচার' অগ্নিদূতের 'ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না' প্রভৃতি। দ্বিধা বিভক্ত মন এবং পরস্পর বিরোধী মানসিক প্রবৃত্তি লইয়া মনস্তত্ত্ব-প্রধান নাটকের মধ্যে অতনু সর্বাধিকারীর 'অন্য স্বর', সমর মুখোপাধ্যায়ের 'খুন' উল্লেখযোগ্য। লঘু সুরে লেখা উপভোগ্য নাটকগুলির মধ্যে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'স্পুটনিক', মনোজ মিত্রের 'টাপুরটুপুর', সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'বিষণ্ণ সকাল' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। একাঙ্ক নাটকের নানা রূপ ও রীতির পরীক্ষা দেখা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে। তাঁহার 'বাইরের দরজায়' নাটকের নায়িকা মঞ্জুর অবচেতন মনের পরস্পরবিরোধী কামনার দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'রাক্ষস' নাটকে লেখকের অন্তর্লোকের প্রেমসুন্দর কামনাগুলিই মহারাজ, মহারাণী, উদয় ও শঙ্খমালার রূপ ধারণ করিয়াছে। লেখক তাহার প্রত্যয় ও আনন্দ কিভাবে ফিরিয়া পাইল আশাবাদী সুরে তাহাই নাটকে দেখান হইয়াছে। বিদেশী

নাটকের অনুবাদ অথবা ভাব অনুসরণে দেশী পরিবেশে লেখা যে নাটকগুলি জনপ্রিয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উৎপল দত্তের 'সমাধান' এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' এর নাম করা যাইতে পারে।

রতনকুমার ঘোষের একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে রূপকধর্মী ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা এবং মূকাভিনয়, সম্মিলিত গান ও আবৃত্তি, ছড়াজাতীয় কবিতা প্রভৃতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁহার বহু অভিনীত নাটক 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে'র মধ্যে পঞ্চবিংশ শতাব্দীর বিচারশালায় বিংশ শতাব্দীর বিচারদৃশ্য দেখান হইয়াছে। বক্তব্য অদ্ভুত সন্দেহ নাই। বিংশ শতাব্দীর অভিযুক্তদের মধ্যে লেখক, প্রশাসক ও আজ্ঞাবাহককে দেখান হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, লেখক ও আজ্ঞাবাহক কি সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক অপরাধী ব্যক্তি? পঞ্চবিংশ শতাব্দীর লোকেরা ঈশ্বরকে বর্জন করিয়া শস্য, অস্ত্র ও শিল্প সব দিক দিয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়া সভ্যতার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে ইহাও তো লেখকের কল্পনা মাত্র। সুতরাং কোন শতাব্দী অপর কোন শতাব্দীকে বিচার করিবে তাহা মহাকাল ছাড়া কে বলিবে? রতনকুমার ঘোষের 'শেষ বিচার' নাটকটিও জনপ্রিয়, কিন্তু তাহা সঙ্গতি ওপারম্পযহীন। আজকালকার গুণ্ডা, খুনী, বদমায়েশ চরিত্রগুলিই বড় বড় কথা বলে এবং তাহাদের সকল অন্যায় অপরাধ জোর গলায় প্রচার করিয়া দর্শকদের কাছে বাহবা আদায় করে। এই নাটকেও তাহাই দেখিলাম। শেষ পর্যন্ত অপরাধী হইয়া পড়িল কমল মাস্টার মহাশয়। ঘটনার কি উদ্ভট পরিবর্তন! এখানকার দর্শকবৃন্দ মঞ্চ ও অভিনয় হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এ-নাটকেও তাহারা মঞ্চ অভিনয়ের অঙ্গীভূত। 'মহাকাব্য' নাটকের প্রেরণা আসিয়াছে মহাভারতের ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মীয় সংঘাতের বিষময় পরিণতির ভাবনা হইতে। সেই বিরোধ সংঘাতের ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সাধারণ মানুষ। নাট্যকার বর্তমান ভারতীয় সমাজেও সেই মহাকাব্যের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন। শ্বেতাধিপতি, সংগ্রামসিংহ, অগ্নিদূত, বিচিত্রকুমার ও সর্বশূন্য এই পাঁচজন পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়াছে এবং জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের সকলের লোভ ক্ষমতার সিংহাসনের উপর। অবশেষে মা (ভারতমাতা) আসিলেন জনতার আহ্বানে। নাটকের মূল চরিত্র বাজিকর। সেই যেন চরিত্রগুলি লইয়া খেলা দেখাইয়াছে। নাট্যকার এ-নাটকে নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কেই যেন অধিকতর সচেতন। নাটকের সংলাপ ছন্দময় ও গতিশীল। 'তৃতীয় কণ্ঠ' সঙ্কেতধর্মী একাঙ্ক নাটক। এই নাটকেও

একটি বিচারের ঘটনা অবতারণা করা হইয়াছে। একজন আসামী সম্পর্কে দুইটি কণ্ঠ দুই বিপরীত বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে। একজন ঈশ্বর ও ধর্মের নামে তাহার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিতেছে, আর একজন মানবিকতার নামে তাহার পুরস্কার জানাইতেছে মুক্ত জীবনকে। তাহার মুখ দিয়া বিবৃত হইয়াছে তাহার যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের ভাবনারাজি। সে উপলব্ধি করিল যে, সে আত্মাকেই হনন করিয়াছে। দুই কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত পুরস্কার ও তিরস্কারের ঘোষণায় বিভ্রান্ত হইয়া সে অবশেষে তৃতীয় কণ্ঠের সিদ্ধান্ত শুনিবার জন্যই যেন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া উঠিল।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী নাট্যকার। শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা ও প্রতিবাদ অতীব সোচ্চার। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটকেই শ্রেণীসংগ্রামের বহ্নিময় পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অতিরঞ্জন ও আতিশয্য, এবং ছকে-বাঁধা সমস্যা ও সম্মিলিত গণ-প্রতিরোধ তাঁহার সব নাটকেই বর্তমান। 'আলোর নিশানা'র মধ্যে দীন ও দুঃস্থ হরিজনদের উপর জমিদারের অত্যাচার এবং অবশেষে অগ্নিগর্ভে পতিত সংগ্রামী হরিজনদের মৃত্যুর মুখে মুক্ত জীবনের শপথগ্রহণে নাটকের শেষ। 'এক যে ছিল রাজা'য় রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়া অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখান হইয়াছে। তবে রূপকের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। কৃষক ও শ্রমিকের মিলিত সংগ্রামের ইঙ্গিতও নাটকে দেখান হইয়াছে। বিদ্রোহী জনতার নায়ক হইল সত্যকাম। রাজার রক্ষকরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলেই রাজা ও তাহার অত্যাচারী সহকারীদের পতন ঘটিল। 'অশান্ত বিবরে' যুদ্ধবাদী শক্তি ও পুঁজিবাদী শক্তি কিভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অত্যাচারের নব নব অস্ত্র দ্বারা তাহাদের উপর নির্মম আঘাত হানে তাহাই দেখান হইয়াছে।

'ডাইনোসেরাস' সমর দত্ত রচিত অভিনয়সফল একটি একাঙ্ক নাটক। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণী ডাইনোসেরাস যুগ যুগব্যাপী অত্যাচারের প্রতীক-রূপেই এ-নাটকে ব্যবহার করা হইয়াছে। নাট্যকারের পরিকল্পনা ও নাট্য-উপস্থাপনা কৌশল প্রশংসনীয়। শ্যামলতনু দাশগুপ্তের 'যাদুকর' আর একখানি অভিনন্দিত একাঙ্ক নাটক। এ নাটকেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হইল যাদুকর, সেই যেন সমস্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখানেও ছড়া, কোরাস এবং সংলাপে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত ছন্দময় বাক্যের অবতারণা রহিয়াছে। পরিণতিতে বন্ধন-শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত শপথ গ্রহণ দেখান হইয়াছে।

উপন্যাসের নাট্যরূপ

সব দেশেই চিরকাল প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে। বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইবার পরে মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনীত হইয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই অনেকদিন ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে রস পরিবেশন করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রভাবই রঙ্গমঞ্চে সর্বাপেক্ষা বেশি গভীর ও ব্যাপক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রস যেমন গিরিশচন্দ্রের অদ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্য দিয়া দর্শকচিত্তকে সুতীব্রভাবে আলোড়িত করিত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের রসও তেমনি শিশিরকুমারের অসাধারণ অভিনয়-চমৎকারিত্বে বহুদিন ধরিয়া দর্শকহৃদয়কে অভিভূত করিয়া রাখিত। গিরিশযুগে যেমন বঙ্কিম ও গিরিশের প্রতিভার মিলন ঘটিয়াছিল, শিশিরযুগেও তেমন শরৎ ও শিশিরের প্রতিভার পরম ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার ছাড়াও অন্যান্য প্রতিভাধর অভিনেতার অভিনয়ের মধ্য দিয়া শরৎসাহিত্যের রস সব শ্রেণীর দর্শকচিত্তকে আনন্দ দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপন্যাস যথা, 'গোরা' ও 'যোগাযোগ' নাটকায়িত হইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপন্যাসগুলি একটু বুদ্ধিকেন্দ্রিক ও তত্ত্বময় হওয়াতে সর্বসাধারণের কাছে খুব গভীর আবেদন জাগাইতে পারে নাই। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন অভিনয় বেশ জনপ্রিয়ও হইয়াছে। শরৎপরবর্তী অনেক ঔপন্যাসিকদের, যেমন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে।

উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয় প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, যখন অভিনয়ের জন্য ভালো মৌলিক নাটক পাওয়া যায় না তখন রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে প্রসিদ্ধ কোন উপন্যাস নাটকের আকারে রূপান্তরিত করা হয়। মৌলিক নাটকের অভাব ও দীনতাবশতঃই এ-ক্ষেত্রে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, কোন উপন্যাস জনসমাজে আদৃত হইলে নাট্যামোদী দর্শকগণ যেমন সেই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে চোখের সম্মুখে দেখিতে চাহে, তেমনি রঙ্গমঞ্চের মালিকও সেই সুবিখ্যাত উপন্যাসের রস অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করিয়া আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন। এখানে নাট্যরূপদাতার

কৃতিত্ব তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, অভিনীত নাটকের কাহিনীরস ও চরিত্রের আকর্ষণই এখানে বড় হইয়া উঠে।

উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া সত্যই কঠিন কাজ। একটি বৃহৎ উপন্যাসের কাহিনীকে আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া আনিতে হইবে, অথচ মূল বক্তব্য অস্পষ্ট এবং চরিত্রগুলি অস্ফুট রাখিলে চলিবে না। উপন্যাসের মধ্যে অনেক বিস্তার, লেখকের অনেক নিজস্ব মন্তব্য, ভাষ্য ইত্যাদি থাকে, কিন্তু নাটকে সে-সবের কোন সুযোগ থাকে না। নাট্যকারকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাকে শুধুমাত্র উপন্যাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপ বসাইয়া দিলে চলিবে না, তাঁহাকে নাটক লিখিতে হইবে। অর্থাৎ ঘাতপ্রতিঘাতময় পরিস্থিতিগুলি তাঁহাকে নির্বাচন করিতে হইবে এবং নাট্য-শিল্পের দাবী অনুযায়ী ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি করিয়া পরে সেই জটিলতার গ্রন্থি মোচন করিতে হইবে।

কিন্তু নাট্যরূপদাতাকে যেমন স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করিতে হইবে, তেমনি আবার অন্যদিকে মূল উপন্যাস যাহাতে বিকৃত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহাকে স্বাধীনতার পথ গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যথেচ্ছ-চারিতাকে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, উপন্যাসের গঠনরীতি রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব তাঁহার, কিন্তু উপন্যাসের বক্তব্য, চরিত্রচিত্রণ ও রসসৃষ্টি পরিবর্তন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। অথচ নাট্যরূপদাতা এবং বহুক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের মালিক ব্যবসাগত স্বার্থের জন্য অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের বহুজ্ঞাত কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত কদর্যভাবে বিকৃত করিয়া থাকেন। বিগত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের কত যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথের কোন লেখার মধ্যে নাট্যরূপদাতা অথবা প্রয়োগকর্তা নিজেদের খুশি মত চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা যে কি অমার্জনীয় অপরাধ তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। শুধু মঞ্চের প্রয়োগকর্তা নহেন, চলচ্চিত্রের পরিচালকরাও এ-বিষয়ে কম অপরাধী নহেন। সত্যজিৎ রায়ের মত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রপরিচালকও রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিকৃতি ঘটাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহাই নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে শরৎচন্দ্রের কথাই ধরা যাক।

উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্র নাটকের বিষয়বস্তুকে উপন্যাসের মত সাজাইয়াছেন। এখানেই তাঁহার নাটকের দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক ধীরে সুস্থে ঘটনার পর ঘটনার জাল বুনিয়া চলিতে পারেন। তাঁহার কোন নিয়মের বন্ধন নাই, স্থান কাল পরিবেশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু নাটকের মধ্যে নাট্যকার একটি বিশেষ জীবনসত্য উদ্‌ঘাটনের সংকল্প নিয়া নাটকের চরিত্রগুলি উপস্থাপিত করেন এবং প্রতিকূল ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে দ্বন্দসংঘাত ঘটাইয়া তাহাদের একটি নাট্যরসাত্মক পরিণতি দান করেন। শরৎচন্দ্র নাট্যপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপন্যাসের কাহিনীকে নূতনভাবে সন্নিবেশিত করেন নাই। সেজন্য তাঁহার নাটকের দৃশ্যগুলি উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির সংলাপাশ্রিত রূপ পাইয়াছে মাত্র: নাটকের রসঘন অবিচ্ছেদ্য অংশ হইতে পারে নাই। একমাত্র 'ষোড়শী' ব্যতীত তাঁহার অপর কোন নাটকে উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক নাটকীয় গুণ আছে। সেগুলি তাঁহার নাটকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীর যে জটিল, বৈচিত্র্যময়, রসঘন ও কৌতূহলোদ্দীপক রূপ আছে তাহা নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। নাটকের মধ্যে কাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণ-ক্ষমতা না থাকিলে নাটক কখনও জমিয়া উঠিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের নাটকগুলির মঞ্চসাফল্যের কারণ কাহিনীর এই নিটোল, রসঘন রূপ। শরৎচন্দ্র তাহার উপন্যাসে ঘটনার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত গতি-পরিবর্তনের দ্বারা নাটকীয়তা সঞ্চার করিয়াছেন। ঘটনার এই নাটকীয়তাও নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বাহ্য ক্রিয়ার প্রাধান্য না থাকিলেও সূক্ষ্ম ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে চরিত্রগুলির অভাবনীয় আচরণ ও দুজ্ঞেয় পরিবর্তন বিশেষ নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। সংলাপ সৃষ্টিতেও শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সংলাপের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বক্রোক্তি, অর্থব্যঞ্জনা ও অন্তর্বিরোধ দেখা যায় তাহা বিশেষ নাট্যরসাত্মক হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের লেখা সব নাটকগুলি নায়িকা-নামাঙ্কিত হইয়াছে। নারীচরিত্রের প্রতি তাঁহার যে সুগভীর দরদ ও অনুরাগ ছিল, সম্ভবত তাহার ফলেই নাটকগুলির এরূপ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেই পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্রই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেজন্য নায়িকা-নামাঙ্কিত হওয়ার ফলে নামকরণের সঙ্গতিই মোটামুটি বজায় রহিয়াছে। তবে ইহার যে

ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটকের নাম 'ষোড়শী' হইলেও এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ষোড়শী নহে জীবানন্দ। জীবানন্দ অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, তাহাকে নিয়াই নাটকের সূচনা এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের শেষ। সুতরাং এই নাটকের নামকরণ যে সার্থক হয় নাই তাহা বলা পাইতে পারে।

'রমা' বোধ হয় শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বল নাটক। নাটকটির দৃশ্যসন্নিবেশের মধ্যে কোনই কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিকে সংলাপাত্মক দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হইয়াছে মাত্র। 'পল্লীসমাজে'র মধ্যে উনিশটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে এবং নাটকের মধ্যে সেগুলিই হইল তাঁহার নাটকের দৃশ্য। নাটকের দৃশ্যগুলি খুব ছোট এবং সংক্ষিপ্ত। সেজন্য নাটকটি কোথাও জমিয়া উঠিতে পারে নাই। রমার যে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বহুতর চরিত্র সমাবেশের ফলে রমা ও রমেশের সম্বন্ধটি নাটকের মধ্যে ভালভাবে পরিস্ফুট হতে পারে নাই।

'বিজয়া'—'রমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিণত নাটক। এখানে দৃশ্যগুলি দীর্ঘ এবং সেজন্য নাট্যরস জমিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নরেনের সঙ্গে বিলাস ও রাসবিহারীর দ্বন্দ্ব এবং বিজয়া চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। শেষ দিকে নলিনীকে নিয়া নাটকের মধ্যে বেশ একটু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে কমেডির সরস উপভোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'বিজয়া' একটি সার্থক রোমান্টিক কমেডি। কমেডি সরস জটিল কাহিনী, সাময়িক সঙ্কটসৃষ্টি এবং তাহা দূরীকরণ, প্রচ্ছন্ন ও সর্বত্রসঞ্চারী কৌতুকময়তা ইত্যাদির ফলে নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত বলিয়াছেন যে, 'ষোড়শী' শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। 'ষোড়শী'র মধ্যে শরৎচন্দ্র নিপুণ নাট্যকলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদের বৃহৎ উপন্যাসটিকে তিনি চার অঙ্কের নয়টি মাত্র দৃশ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। উপন্যাসের নাটকীয় অংশটুকু নাট্যকার সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়াছেন এবং তাহার দীর্ঘ বর্ণনা, অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের অহেতুক প্রাধান্য, বহু খুঁটিনাটি ঘটনার অনর্থক আতিশয্য প্রভৃতি বর্জন করিয়াছেন। তাহার ফলে নাটকে উপন্যাসের ধীর মন্থর বিভিন্ন-মুখী গতির স্থানে দৃঢ়সংবদ্ধ ঘটনার আঘাত-প্রতিঘাতময় দ্রুত গতিবেগের পরিচয়

পাওয়া যায়। দুর্দান্ত অথচ দুর্বল জীবনানন্দ চরিত্রের মধ্যে একটি অদ্ভুত নাটকীয়তা আছে। সেই নাটকীয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার নাট্যকার করিয়াছেন। হৈম ও নির্মলের বৃত্তান্ত নাট্যকাহিনীতে জটিলতা আনিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের মত সেই সব বৃত্তান্ত অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করিয়া, মূল কাহিনীর ধারাতে ব্যাহত করে নাই। লম্পট ও অত্যাচারী জমিদারের করুণ জীবনতৃষ্ণা, ষোড়শীর মনে প্রেম ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব এবং নীচ ও নিষ্ঠুর সমাজশক্তির সঙ্গে তাহার তীব্র সংঘাত প্রভৃতি যথেষ্ট নাট্যরস-সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু জীবনানন্দের মৃত্যু নাটকের মধ্যে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিলেও এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নহে।

শরৎচন্দ্র স্বয়ং যে সব উপন্যাসের নাট্য-রূপান্তর করিয়াছিলেন সেগুলি উপরে আলোচনা করা হইল। শরৎচন্দ্র সমসাময়িক কালে ও পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক নাট্যকার তাঁহার উপন্যাসগুলিকে নাটকে রূপায়িত করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্বয়ং 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেন। যোগেশ চৌধুরী 'চরিত্রহীন,' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'চন্দ্রনাথ' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য 'মেজদিদি,' 'বৈকুণ্ঠের উইল' ও 'বিপ্রদাস' উপন্যাসগুলি নাট্যরূপায়িত করেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করিয়া সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। তিনি 'বামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'অনুপমার প্রেম', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসগুলি নাটকে রূপায়িত করেন। সাম্প্রতিক কালে শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) অবলম্বনে কমললতা নাটক রচনা করিয়াছেন। এই নাট্যরূপগুলি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে খুব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। দেবনারায়ণ বাবু শরৎচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা লইয়াই তাহার উপন্যাসগুলি নাটকে রূপায়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাহার নাট্যরূপগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের মূল কাহিনীধারা ও চরিত্ররূপ কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেবনারায়ণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গুলি ছাড়া আরও বহু ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। মনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসখানিকে 'ডাকবাংলো' নাম দিয়া নাটকায়িত করিয়াছেন এবং সুবোধ ঘোষের উপন্যাস অবলম্বনে 'শ্রেয়সী' নাটক রচনা করিয়াছেন। বিমল মিত্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ 'একক-দশক-শতক' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বহুদিন অভিনীত হইয়াছে।

তারাশঙ্কর তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন' এগুলির নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত

হইয়াছে। 'মঞ্জরী অপেরা'র নাট্যরূপ কিছুদিন আগে একটি অপেশাদার নাট্য-সংস্থা কর্তৃক মঞ্চস্থ হইয়াছে। বিমল মিত্রের 'সাহেক-বিবি-গোলাম' শচীন সেনগুপ্তের দ্বারা নাটকায়িত হইয়াছিল। সলিল সেন নরেন মিত্রের 'দূরভাষিণী,' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী নিজের লেখা 'একমুঠো আকাশ' উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙমহল নাট্যমঞ্চে বহুদিন ধরিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক কালে প্রসিদ্ধ উপন্যাসসমূহের যে সব নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ দাশগুপ্ত ও মণি দত্তের নাট্যরূপায়িত, যথাক্রমে জরাসন্ধের 'লৌহকপাট', সমরেশ বসুর 'আবর্ত', আশাপূর্ণা দেবীর 'শশীবাবুর সংসার', প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পেশাদার মঞ্চগুলি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হইতেছে। বিমল মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে 'আসামী হাজির' ও 'পরস্ত্রী', সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' ও 'বিবর', সুবোধ ঘোষের রচনা অবলম্বনে 'বারবধূ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নতন করিয়া তাঁহার বহু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়া অভিনয় করা হইতেছে।

পরিশিষ্ট

নবনাট্য-আন্দোলন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলা নাটকের বক্তব্য বিষয় ও শিল্পরীতির মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক রূপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি। নাটকের এই বিপ্লবাত্মক রূপের পিছনে যে নবনাট্য-আন্দোলনের বলিষ্ঠ প্রেরণা রহিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য-আন্দোলনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনের 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোন বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয় তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যেও প্রচলিত নাট্য মঞ্চধারা ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিদ্রোহী মনোভাব রহিয়াছে। প্রাণবান নাটক, মঞ্চজগৎ, এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেজন্য নবনাট্য আন্দোলনের 'আন্দোলন' কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিল। ঐ সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাঁহাদের অদ্বিতীয় অভিনয় গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন, কেহ কেহ বা রঙ্গমঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাঁহাদের অভাবে রঙ্গমঞ্চের আর্কর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চ পরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই. সেজন্য সিনেমার নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত সৌখীন জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল,

তাঁহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র-শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। •নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোন বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এই সব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাহিরে তখন নব-জীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।

ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে যে, জাতির মহা সঙ্কট ও দুর্গতির মুহূর্তে তাহার সঞ্জীবনী শক্তি আশ্চর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যুদ্ধের আঘাত ও মন্বন্তরের বিভীষিকা যখন বাংলার সমাজকে প্রায় ধ্বংসের মুখে নিয়া গিয়াছিল তখনই সমাজকে বাঁচাইবার জন্য একটি প্রবল জীবনীশক্তি নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল। ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু সমাজের সম্মুখে এই নাট্য-আন্দোলন এক নূতন জীবনের আশা ও স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিল। বিভেদ, শোষণ ও অত্যাচারের অবসানে এই জীবনের অভ্যুদয় এবং সাম্য ও সম্মিলিত সুখের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। কৃষক, শ্রমিক ও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে বাঁচিবার ও সংগ্রাম করিবার নূতন প্রেরণা খুঁজিয়া পাইল। দেশের সর্বত্র, এমন কি বহু দূরবর্তী অবজ্ঞাত অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়া নবনাট্য আন্দোলনের শিল্পীরা যে আনন্দ ও রস সঞ্চার করিয়া চলিলেন, তাহাতে সমাজের চিত্ত আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

সমাজ সম্বন্ধে এই বিপ্লবী মতবাদ এবং নূতন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বপ্রথম ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর বহুরূপী, লিটল্ থিয়েটার প্রভৃতি যে সব নাট্য সংস্থা নাট্য-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা সেই একই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হইয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই নাট্য-আন্দোলন চলিয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে এই আন্দোলন একই বৈপ্লবিক ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। সেজন্য কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক ও মালিকের সংগ্রাম, শোষণজীবি ও অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাম—এইগুলিই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য পাইতেছে। শুধু সংগ্রাম নহে, সংগ্রামের মধ্য দিয়া জনগণের মুক্তির সুস্পষ্ট আভাসও এই নাট্য-আন্দোলনের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। আজিকার সমাজে প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের যে প্রসার হইয়াছে

তাহার পিছনে নবনাট্য আন্দোলনের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে তাহা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত।

নবনাট্য-আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিল প্রয়োগরীতি ও মঞ্চআঙ্গিকের নূতনত্বের মধ্যে। সাধারণ নাট্যশালায় পূর্বে এক একজন প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিকেই শুধু লক্ষ্য রাখা হইত। ছোট ছোট চরিত্রগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হইত এবং সেজন্য অভিনয়ের মধ্যে একটি সামগ্রিক রসরূপ ফুটিয়া উঠিত না। কিন্তু নবনাট্য-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলি প্রত্যেকটি চরিত্রের সুষ্ঠু সহযোগিতার মধ্য দিয়াই নাট্যরস ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন। সেজন্য ছোট ছোট চরিত্রগুলির অভিনয়ের দিকেও তাঁহারা গভীর মনোযোগ দিলেন। নাটকের অভিনয় জন-মানসের কাছে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহারা নাটকের মাঝে জনতার দৃশ্য বেশি আনিতে আরম্ভ করিলেন এবং আশ্চর্য দক্ষতার সহিত রঙ্গমঞ্চে তাঁহারা বহির্জগতের চলমান গণজীবনের বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত জীবনযাত্রাকে অবিকল রূপায়িত করিতে সমর্থ হইলেন। রঙ্গমঞ্চে জনতা-জীবন কতখানি বাস্তবভাবে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব তাহা লিটল্ থিয়েটারের 'সিরাজদ্দৌলা', 'নীচের মহল', 'অঙ্গার' প্রভৃতির অভিনয় দেখিলে খুব ভালোভাবেই বুঝা যায়। এই সব নাট্য-সংস্থা অভিনয়-শিক্ষা ও অনুশীলনের দিকে সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখেন বলিয়াই ইহাদের অভিনয় এত নিখুঁত ও পরিপাটি হইয়া উঠে। নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া মহড়া দিয়া এবং প্রত্যেকের পার্ট সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ হইবার পর ইঁহারা নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয়ের সময় অভিনেতৃগণ স্মারকের উপর নির্ভর করেন না বলিয়াই তাঁহাদের কথা তাঁহাদেরই আবেগ-সংঘাতপূর্ণ হৃদয়ের কথা হইয়া উঠে, স্মারকের শেখানো প্রাণহীন কথা হয় না।

মঞ্চমায়া প্রয়োগের দিক দিয়াও অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিতে নানা অভিনব ধারার প্রবর্তন দেখা গিয়াছে। আলোকসম্পাতের যে নূতন বিস্ময়কর লীলা বর্তমানে দেখা হইতেছে তার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ প্রথমত অপেশাদার অভিনয়েই দেখা গিয়াছে। বর্তমান কালের যুগান্তকারী আলোকনিয়ন্ত্রণশিল্পী তাপস সেনের উদ্ভব হইয়াছে এই অপেশাদার নাট্যজগৎ হইতেই—ইহা মনে রাখিতে হইবে। চলচ্চিত্রের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চে সাদা পর্দা স্থাপন করিয়া তাহার উপর বিচিত্র আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করা বর্তমানে তো একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য আলোকের যাদুজাল অনেক সময় নাটকের প্রয়োজন

ছাপাইয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দৃশ্যসজ্জা ও ভাবপরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি আলোক সম্পাতিত হয় তাহা হইলে নাটকের আবেদন যে কী গভীর হয় তাহা লিটল্ থিয়েটারের 'ফেরারী ফৌজ', মিতালী সম্মিলনীর 'নীলদর্পণ', স্টীল কণ্ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। দৃশ্যসজ্জা নির্মাণেও অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি বহু চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখাইয়া চলিয়াছেন। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' লিটল্ থিয়েটারের 'অঙ্গার' ও 'ফেরারী ফৌজ', রঙবেরঙের 'শুধু ছায়া', দশরূপকের 'ডানাভাঙ্গা পাখী', গন্ধর্বের 'দলিল', চতুর্মুখের 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যসজ্জার অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অভিনয়ে উচ্চ শব্দবহ যন্ত্রের ব্যবহার বর্তমান অপেশাদার নাট্যাভিনয়ে বহু ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে বোধহয় সর্বপ্রথম মাইকের ব্যবহার হইয়াছিল। তারপর কারণে অকারণে বহু অভিনয়ের মধ্যে এই মাইকের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে অবশ্য সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশি দেখা যাইতেছে। যন্ত্রযুগের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল যে, যন্ত্রকে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই, অথচ যন্ত্রকে একবার গ্রহণ করিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। আজিকার মঞ্চে এই সমস্যাই প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য দিয়া যখন নবনাট্য-আন্দোলনের সূচনা হইল তখন নাট্যাভিনয়ই এই আন্দোলনের প্রধান অংশ ছিল। অবশ্য গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল, দেশের প্রগতিমূলক নাট্যসংস্থাগুলিকে একটি সাধারণ কর্মপন্থার মধ্যে একত্রিত করা। কিন্তু তখনও নাটকসম্বন্ধে আলোচনাসভার আয়োজন করা, নাট্যসম্মেলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া নাট্যামোদী জনগণের মধ্যে একটি সংঘশক্তি গড়িয়া তোলা, নিয়মিত একটি বিশেষ স্থানে অভিনয়ের আয়োজন করা, দল ও মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটি নাট্যচেতনা জাগাইয়া তোলা—এসব নাট্য-আন্দোলনের মধ্যে দেখা যায় নাই। গণনাট্য সংঘ হইতে পৃথক হইয়া নানা স্বতন্ত্র নাট্যসংস্থার উদ্ভব হইবার [illegible] দেশের সকল অপেশাদার নাট্যসংস্থার নেতৃত্ব করিবার অধিকার তাহার আর রহিল না। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ জড়িত থাকায়, ভিন্ন মতাবলম্বী নাট্যসংস্থাগুলির সঙ্গে গণনাট্য সংঘের আর যোগ রহিল না।

অপেশাদার অভিনয়সম্বন্ধে দেশের মধ্যে প্রচুর কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে, অথচ তখনও নাট্যামোদী জনগণকে কোন সংঘশক্তির দ্বারা একত্রিত

করিতে পারা যায় নাই। একটি বৃহৎ নাট্য-সম্মেলনের মধ্য দিয়া সকলকে একই সাধারণ কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বোধ করিলেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যবিশারদ এই ধরনের একটি সম্মেলনের জন্য অনেকখানি উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ সার্থকতামণ্ডিত হইতে পারিতেছিল না। কিছুকাল পরে নাট্যকার শ্রীগিরিশঙ্কর এবং আরও কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তির উদ্যোগে একটি নাটকের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত, নাট্যকার, অভিনেতা প্রভৃতি উৎসাহের সঙ্গে এই সেমিনারে যোগ দেন। নাট্যামোদী ব্যক্তিদের এ-ধরনের পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। নাট্যকারদের সংঘবদ্ধ করিবার জন্য প্রধানত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় নাট্যকার-সংঘ স্থাপিত হইল। এই সংঘ স্থাপিত হইবার পর নাট্যকারগণ তাঁহাদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার একটি সুযোগ পাইলেন এবং অভিনয়ের রয়্যালটি প্রভৃতি আদায়ের জন্য তাঁহাদের দাবী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেন।

সাম্প্রতিক নাট্যআন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির প্রতিষ্ঠা।[১] ১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নাটক ও মঞ্চের সর্ববিধ উন্নয়নের জন্য এই কমিটি স্থাপিত হইল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির অভিনয়ের জন্য নিজেদের রঙ্গমঞ্চ খুলিয়া দিলেন এবং নাট্যামোদী ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইয়া নাট্যোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন—ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। পরিকল্পনা কমিটি দশ দফার একটি কার্যসূচী গ্রহণ করিলেন: যথা, ১। গিরিশ গ্রন্থাগার, ২। গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা (পূর্ণাঙ্গ নাটক), ৩। গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা (একাঙ্ক নাটক), ৪। গিরিশ নাট্যোৎসব, ৫। শিশু নাট্যশাখা, ৬। বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন, ৭। আন্তঃকলেজ নাট্যপ্রতিযোগিতা, ৮। বিশ্বরূপা পত্রিকা, ৯। গিরিশ নাটক সেমিনার, ১০। গিরিশ নাটক প্রতিযোগিতা। গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা তিন বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিটির নাট্যবোদ্ধা

১। বর্তমান নাম বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ।

সদস্যগণই নাট্যবিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অবশ্য সর্বপ্রথম থিয়েটার সেণ্টারেই আরম্ভ হইয়াছিল। তবে গিরিশ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতাতেও খ্যাত ও অখ্যাত বহু নাট্যসংস্থা যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। গিরিশ গ্রন্থাগারে নাটক ও বঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী বহু গ্রন্থের সংগ্রহ রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নাটক ও মঞ্চসম্বন্ধে আলোচনা করিবার বহু সুযোগ এখানে পাইয়া থাকেন। বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন সাত বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে প্রত্যেক বার নাটক ও মঞ্চের বিভিন্ন দিক লইয়া বহু সারগর্ভ আলোচনা, বিতর্ক ও বিচার হইয়াছে। নাট্যামোদী ব্যক্তিগণ সম্মেলনসম্বন্ধে অভূতপূর্ব আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখাইয়াছেন। পরিকল্পনা কমিটি বিভিন্ন সময়ে যে নাটক সেমিনারের আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ নাটকের আঙ্গিকগত নানা বিষয়সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। গিবিশ নাট্যোৎসবে প্রতি বৎসর বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে বিশ্বরূপা মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মঞ্চে অভিনয়ের জন্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ যাত্রাদলকেও আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। মঞ্চে যাত্রাভিনয় অভিনব সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ধরনের যাত্রাভিনয়ও নাট্যামোদী ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়াছে। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা-ব্যবস্থায় হয়তো দোষত্রুটি রহিয়াছে কিন্তু পরিষদ দেশের মধ্যে সর্বাত্মক নাট্য-উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে যে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

মঞ্চ ও নাটকসম্বন্ধে আলোচনা, ·'তিযোগিতা, সম্মেলন প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেব উদ্‌যোগেও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বঙ্গীয় নাট্যসংসদ কাশিমবাজার ভবনে একটি নাট্যসম্মেলনের আয়োজন করিলেন। সেই সম্মেলনেও নাটকের নানা দিক নিয়া বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। নাট্যকার সংঘও নিয়মিত-ভাবে নাটক-পাঠ ও নাটক-আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সংঘের উদ্‌যোগে নাট্যকার-সম্মেলনও হইয়া গেল। বঙ্গীয় নাট্যসংসদের মঞ্চে বিভিন্ন নবীন নাট্যকার তাঁহাদের একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

দেশের কত স্থানে আজ যে নাট্য-প্রতিযোগিতা, নাট্য-উৎসব ও নাট্য-আলোচনার আয়োজন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে এবং

সুদূর মফস্বলের নানা অঞ্চলে একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা হইতেছে। জেলায় জেলায় স্থানীয় নাট্যসংস্থাগুলিকে নিয়া বেশ সাফল্যের সঙ্গে এই ধরনেব প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কেবল নাট্যামোদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই নহে, কারখানার শ্রমিকদের-মধ্যেও নাটক ও অভিনয়সম্বন্ধে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যাইতেছে। চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, কুলটি, বার্ণপুর, মাইথন, বজবজ, হাওড়া ও হুগলীর শিল্পাঞ্চলে নাট্য-প্রতিযোগিতা ও নাট্য-আলোচনার আয়োজন হইতেছে। বিভিন্ন অফিস ক্লাবের উদ্যোগেও এই ধরনেব প্রতিযোগিতা ও আলোচনা নিয়মিতভাবে হইতেছে। কেবল প্রতিযোগিতা নহে নাট্য-উৎসবও সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাৎসরিক নাট্য-উৎসব তো আছেই, তাহা ছাড়াও অসংখ্য বহুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত নাট্যসংস্থা বর্তমানে বার্ষিক নাট্য-উৎসবেব আয়োজন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে নাটক আলোচনাব ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইতেছে। রূপমঞ্চ, সূত্রধার, গন্ধর্ব, সংলাপ প্রভৃতি নাট্যপত্রিকায় নাটকসম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্যনিষ্ঠ ও সারগর্ভ আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় যে আনন্দলোক বিভাগ খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এভাবে নানা দিক দিয়া নাট্য-আন্দোলন দেশের সর্বপ্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।

অবশ্য এই নাট্য-আন্দোলনে যোগদানকারী ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়া আবার কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে একটু সতর্ক ও সম্বৃত করিবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নিয়া অনেক নাট্যসংস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা সত্য—কিন্তু নিষ্ঠাহীন, শ্রদ্ধাহীন, হুযুগপ্রিয়তা ও আত্মপ্রচারেব উদ্দেশ্যও যে অনেকের মধ্যে নাই তাহা নহে। দৃশ্যসজ্জা ও আলোকচাতুর্যের দিকে বহু স্থানে যতখানি দৃষ্টি দেখা যায়, নিপুণ অভিনয়-সাধনা ও নাটকের ভাবাভিব্যক্তির দিকে ততখানি দৃষ্টি দেখা যায় না। অনেক তরুণ নাট্যসংস্থা অভিনয় ও প্রয়োগরীতির অনুকরণ-প্রচেষ্টা যতখানি দেখান, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও স্বাধীন উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় ততখানি দেন না। অভিনয়সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা না বলিলে চলে না। অনেক নাট্যসংস্থা সম্মিলিত অভিনয়ের দিকে নজর দিতে গিয়া ব্যক্তি-অভিনয়ের উৎকর্ষসাধনের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন না। কণ্ঠের লালিত্য ও গাম্ভীর্য কিভাবে আনা যাইতে পারে অনেক অভিনেতাই সে সম্বন্ধে উদাসীন। মিনমিনে কথা কিংবা হঠাৎ চীৎকার আজিকার অভিনয়ের

যেন অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চারণের অশুদ্ধি প্রতি মুহূর্তে শ্রোতাদের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিতে থাকে, অথচ অভিনেতা একেবারে নির্বিকার। 'র' ও 'ড়'-এর পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন এবং 'শ', 'ষ' ও 'স' এই বর্ণগুলিকে ইংরাজী 's'-এর মত উচ্চারণ করা তো প্রায় সর্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে।

এবার প্রধান প্রধান নাট্যসংস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। প্রথমেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উল্লেখ করিতে হয়। সমস্ত প্রগতিবাদী শক্তির মিলনের ফলেই গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্নে'র অভিনয়ের মধ্যে সংঘের পূর্ণতম শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। তারপর আদর্শগত বিরোধের ফলে অনেকেই গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র নাট্যসংস্থা গঠন করেন। বহুরূপী, লিটল্ থিয়েটার, শৌভনিক, অনুশীলন নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব এইভাবেই হইল। গণনাট্য সংঘের মধ্যে যাঁহারা রহিলেন তাঁহারাও পৃথক্ পৃথক্ অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাখা স্থাপন করিয়া নাট্যাভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সব শাখার মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার প্রান্তিক শাখা ও রাজাবাজার শাখার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রান্তিক শাখার 'নীলদর্পণ', 'সংক্রান্তি', '২০শে জুন', 'নৌকাডুবি', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় জন-সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে। রাজাবাজার শাখা ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'পুনর্জন্ম' ও 'গাঙ্গুলী মশাই'-এর অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

অভিনয়ের উৎকর্ষ দ্বারা দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বহুরূপী সম্প্রদায়। নিখুঁতভাবে পার্ট মুখস্থ করিয়া এত সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে এবং মাঝে মাঝে অনাড়ষ্ট দ্রুততার মধ্য দিয়া ইঁহারা অভিনয় করিয়া যান যে, নাটকের রস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' ও 'ছেঁড়া তারে'র অভিনয়ের মধ্য দিয়াই ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'চার অধ্যায়', 'মুক্তধারা', 'পুতুল খেলা', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'রাজা', 'রাজা ওয়েদিপাউস', 'বাকী ইতিহাস', 'পাগলা ঘোড়া', 'অপরাজিতা' প্রভৃতির অভিনয় জনসাধারণের দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছে. রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক ইহারা অভিনয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের তত্ত্ব ও রস পরিস্ফুটনের দিক দিয়া বিচার করিলে বহুরূপীর সঙ্গে হয়তো অনেকেরই মতভেদ হইবে। 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'র মূল বক্তব্যবস্তু ও বিভিন্ন চরিত্রসম্বন্ধে ইহাদের অভিনয়ের মধ্যে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে অনেকেই ঘোর আপত্তি করিবেন। 'রক্তকরবী'র চরিত্রগুলির রূপসজ্জার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু বলিবার

আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপ্রধান নাটকও আঙ্গিকের বিচিত্র প্রয়াগনৈপুণ্যের দ্বারা কিভাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলা যায় তাহা ইহারা দেখাইয়া দিলেন।

লিটল্ থিয়েটারের সর্বশ্রেষ্ঠ দান সম্মিলিত অভিনয়নৈপুণ্য। এদিক দিয়া ইহারা বর্তমানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই হয়। ইহাদের অভিনয়ধারাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—শেকস্‌পীয়রের নাট্যাভিনয়, কৌতুরসাত্মক নাট্যাভিনয়, এবং জনতাপ্রধান বাস্তবধর্মী অভিনয়। প্রথম শ্রেণীতে 'ম্যাকবেথ' ও 'ওথেলো'র নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'ওথেলো'তে ইহাদের অভিনয়-নৈপুণ্য এক অবিস্মরণীয় স্তরে পৌঁছিয়াছে। কৌতুকরসাত্মক অভিনয়ের শ্রেণীতে 'অলীকবাবু', ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নাম করা যাইতে পারে। এই ধরনের অভিনয়ে ইহাদের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত, কিন্তু একটু আতিশয্যের দিকে ইহাদের ঝোঁক বেশি। জনতাপ্রধান বাস্তবধর্মী অভিনয়ের শ্রেণীতে 'নীচের মহল' ও 'অঙ্গারে'র অভিনয় অন্তভুর্ক্ত করিতে হয়। সম্মিলিত অভিনয়-নৈপুণ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে 'নীচের মহলে'র সহিত এ-পর্যন্ত অন্য কোনও অভিনয়ই সমকক্ষ নহে। নাট্যরস ও প্রয়োগরীতির সর্বাপেক্ষা সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বোধ হয় ইহাদের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের অভিনয়ে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-নাটকের মঞ্চরূপের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এই নাটকের মধ্যেও অনেক দুর্বল গ্রন্থি রহিয়াছে। ইহাদের 'কল্লোল' নাটকের মঞ্চসজ্জার বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব সকলকে অভিভূত করিয়াছে। নিগ্রো-সমস্যা লইয়া রচিত 'মানুষের অধিকারে'র মধ্যে পরিচ্ছন্ন প্রযোজনার নৈপুণ্য পরিস্ফুট। পিপলস্ লিটল্ থিয়েটারের সাম্প্রতিক প্রযোজনাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'টিনের তলোয়ার' ও 'ব্যারিকেড'। রসসৃষ্টি অপেক্ষা তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যই ইহাদের অনেক সময় বড় হইয়া উঠে বলিয়া ইহাদের নিখুঁত অভিনয় বুদ্ধিকে নাড়া দেয় যতখানি, হৃদয়ে ততখানি সাড়া পায় না। অনেক অভিনয়ের আগে ইহারা দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্য দিয়া দর্শকের কাছে সমাজের কোন সমস্যাসম্পর্কিত বক্তব্য শুনাইয়া যান। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের মাস্টারী-বক্তৃতা অবশ্য বর্জনীয়।

নাট্য-আলোচনা, নাট্য-প্রতিযোগিতা, নাট্য-শিক্ষাদান ইত্যাদি, উদ্দেশ্য লইয়া থিয়েটার সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এই থিয়েটার সেণ্টারেই সর্বপ্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষার নাটক লইয়া বার্ষিক নাট্যোৎসব-অনুষ্ঠান ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৬০ সাল হইতে ইহা সাধারণ পেশাদার নাট্যশালায় রূপান্তরিত হয়।

বর্তমান অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে 'শৌভনিক'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কয়েক বৎসর গণ-রঙমহলের আয়োজন করিয়া ইঁহারা মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে বহু সহস্র লোকের সম্মুখে অভিনয় করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতায় ইঁহারা স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছেন। শৌভনিকের তরুণ শিল্পীগোষ্ঠি বিভিন্ন ধরনের নাটক অভিনয়ে কৌতুহলী নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বিদেশী নাটকের অভিনয়ে ইঁহারা শুধুমাত্র মূল নাটকের ভাষা অনুবাদ করেন, চরিত্রের নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই মূল নাটকের অনুরূপ থাকে। 'মা' ও 'দি গোস্টস্'—এই দুইটি নাটকের অভিনয় নাট্যামোদী সমাজে অশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের অন্যান্য সুখ্যাত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে 'গোরা', 'দ্বিতীয় মহীপাল', 'মৃচ্ছকটিক', 'ঝাঁসির রাণী', 'তাসের দেশ', 'শেষ রক্ষা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালের নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে নান্দীকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূপান্তরিত বিদেশী নাটকের অভিনয়ের দিকেই ইঁহাদের ঝোঁক বেশি। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রে'র অভিনয় হইতেই নান্দীকারের জনপ্রিয়তা শুরু হয়। তবে ইঁহাদের সর্বাপেক্ষা অভিনয়সফল নাটক ব্রেখটের *Three Penny Opera* অবলম্বনে রচিত 'তিন পয়সার পালা'। ছড়া, গান, বাজনা, অভিনয় ও চমকপ্রদ উপস্থাপনরীতির মধ্য দিয়া নাটকটির অভিনয় সর্বক্ষণ দর্শকদের মাতাইয়া রাখে। আর একটি প্রশংসিত অভিনয় হইল ব্রেখটের '*Good Soul of Setznan*'-অবলম্বনে রচিত 'ভালোমানুষ' নাটক। পিয়ান্দেলোর 'চতুর্থ হেনরী' অবলম্বনে রচিত 'শের আফগান' নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফারুকসিয়ারের ঐতিহাসিক কাহিনীঅবলম্বনে রচিত 'শাহী সংবাদ' নাট্যাভিনয় অবশ্য বেশিদিন চলে নাই। সফোক্লিসের 'আন্তিগোনে' নাটকটিও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় দর্শকসমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থাগুলি ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য নাট্যসংস্থা নাট্যাভিনয় ও নাট্যসংক্রান্ত আলোচনা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়া অপেশাদার নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। মাত্র কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংস্থার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ওল্ড ক্লাব একটি পুরাতন এবং প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা। সাধারণত ইঁহারা ক্লাসিক নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। অভিনয়নৈপুণ্য ইঁহাদের অসাধারণ।

'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'শাস্তি কি শান্তি', 'জনা' প্রভৃতি নাট্যাভিনয় সাম্প্রতিক কালে দর্শকদের অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে। পুরাতন ক্লাসিক নাটকের অভিনয়ে বৃহস্পতিবার আসরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পুরাতন নাটকের অভিনয়ে মিতালী সম্মিলনীর নৈপুণ্যও খুবই অভিনন্দনযোগ্য। ইহাদের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের তুলনা নাই। 'চন্দ্রা', 'মীরকাশিম', 'গোরা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিক কালে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইহাদের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঞ্জনা নাট্যসংস্থার 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয়। সুধা প্রধান প্রযোজিত অচলায়তন নাট্যসংস্থার 'কুলীনকুল সর্বস্বে'র অভিনয়ও সাম্প্রতিক কালের অপেশাদার নাট্যাভিয়ের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটকের রস পুনরায় পরিবেশন করিবার জন্য সুধী প্রধান নাট্যামোদী সমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা পথিকের 'জামাই-বারিক' অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

প্রগতিবাদী দৃষ্টি নিয়া অনেকগুলি নাট্যসংস্থাই বর্তমানে সু-অভিনয়ের দ্বারা সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। অনুশীলন সম্প্রদায়ের বহু অভিনয়ই দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছে। 'ইস্পাত', 'শেষ সংবাদ', 'বিসর্জন', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে ইহারা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাহয়াছেন। আর একটি শক্তিশালী নাট্যসংস্থা হইল থিয়েটার ইউনিট। 'মৃচ্ছকটিক', 'চার দেয়াল' প্রভৃতি অনূদিত নাটকের অভিনয়ে ইহারা যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন নাটক এবং অন্যান্য নাটকের অভিনয়েও ইহারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালের অপেশাদার নাট্যাভিনয়ে চতুরঙ্গের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহাদের 'ডাউন ট্রেনে'র অভিনয় দ্বিতীয় গিরিশ-নাট্য প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিল। বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত ক্যালকাটা থিয়েটারের 'গোত্রান্তর', 'মরা চাঁদ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী পরিচালিত 'গন্ধর্ব' বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনয় ও দীর্ঘকালব্যাপী নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়া নাট্যানুরাগী দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। ইহাদের পত্রিকা 'গন্ধর্ব' বর্তমান কালের নাট্য-আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। গন্ধর্ব নাট্যসংস্থার 'থানা থেকে আসছি', 'দলিল', 'অমৃত অতীত', 'অঙ্কুর', 'মোরগের ডাক' প্রভৃতির

অভিনয় প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শক্তিশালী অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন বৈশাখী নাট্যসংস্থা। বৈশাখীর 'দুই মহল' ও 'লবণাক্তে'র অভিনয় খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীগিবিশঙ্কর পরিচালিত লোকমঞ্চের কতকগুলি অভিনয়ও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'টোটোপাড়া', 'এক চিলতে', 'বর্ণ পবিচয়' প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অভ্যুদয় নাট্যসংস্থা কিরণ মৈত্রেব নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় কবিয়াছেন। তাহাদেব সবাপেক্ষা প্রশংসিত অভিনয় হইল 'বারো ঘণ্টা' নাটকেব অভিনয়। বঙ্গীয় নাট্যসংসদের কয়েকটি অভিনযও নাট্যানুবাগী সমাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'সমান্তরাল', 'জনক', 'গণ্ডার' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য। সবিতাব্রত দত্ত পরিচালিত রূপকাবের কয়েকটি অভিনয়ও প্রশংসনীয় হইয়াছে। ইহাদেব সর্বাপেক্ষা প্রশংসাধন্য 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর অভিনয় ছাড়াও 'তিলতর্পণ', 'শাস্তি', 'ত্যাগ', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'সাহিত্যিক' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে ইহারা কৃতিত্ব দেখাইযাছেন। চতুর্মুখেব 'বিসর্জন' ও 'নির্বোধ' নাটকের অভিনয়ও সম্প্রতি দর্শকেব প্রশংসা অর্জন কবিয়াছে। 'জনৈকের মৃত্যু'ব অভিনযে ইহারা প্রশংসনীয় প্রয়োগকুশলতা দেখাইয়াছেন। চতুর্মুখেব সাম্প্রতিক নাটক 'মালতী-বৃষভ কথা' ব্রেখটের একটি নাটক অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারা রচিত। নাটকটি এত দীর্ঘ, এত এলোমেলো ও এত বক্তৃতাসর্বস্ব যে ধৈর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়। ফ্যানটাসি, কোরাস, মাইম প্রভৃতি কত রীতি যে ইহাতে আছে তাহার হয়ত্তা নাই। চতুর্মুখ বর্তমানে পেশাদাব থিয়েটারের ন্যায় নিয়মিত বিতর্কিত নাটক 'বাববধূ' অভিনয় কবিতেছে। প্রেমাংশু বসু পরিচালিত শ্রীমঞ্চেব কয়েকটি অভিনয়ের কথাও উল্লেখ কবা প্রয়োজন। ইহাদের সফল অভিনয়গুলির মধ্যে 'মালিনী', 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিল্পীমহলের কয়েকটি অভিনয়ও অনেকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে। ইহাদের সাম্প্রতিক অভিনয়গুলির মধ্যে '১৪ই জুলাই' ও 'নটী'র নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পীমনের 'ঘুম নেই' নাটকের অভিনয় অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ইহাদেব প্রশংসিত অভিনয়রূপে 'দাদা ও দিদি' ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে সানডে ক্লাবের 'নষ্টনীড়' ও 'যোগাযোগ', পথিকৃতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', লোকসংস্কৃতি-সংঘের 'দ্বান্দ্বিক', নাট্যরূপার তৃতীয় গিরিশনাট্য-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যাভিনয় 'রাজা ও রাণী', সাজঘরের 'সন্ন্যাসী' ও 'নারী-

জাতি বিপন্ন', কথাকলির 'সয়লাক্ষ হোম' ও 'বিসর্জন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকদের দ্বারা গঠিত রবীন্দ্রনাট্য পরিষদের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'রমা', 'দুই পুরুষ', 'বিসর্জন', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাট্যাভিনয় নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে কোন কোন নাট্যসংস্থা মঞ্চসজ্জা ও প্রয়োগরীতির দিক দিয়া নানা প্রশংসনীয় মৌলিকত্ব দেখাইয়া চলিয়াছেন। রঙবেরঙের 'শুধু ছায়া' ও 'সমুদ্র থামে না' নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও প্রয়োগরীতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রয়োগরীতির নূতনত্ব দেখা গিয়াছে বৈজয়ন্তিকের 'নচিকেতা' নাটকের অভিনয়ে। দশরূপকের 'ডানাভাঙ্গা পাখী'র অভিনয়ে ত্রিস্তর মঞ্চের রূপ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ছদ্মবেশীর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'ইস্পাতের কবিতা'র মধ্যে নিখুঁত প্রয়োগ ও পরিচালননৈপুণ্য দেখা গিয়াছে। কুশীলবের 'বরণীয়া বারনারী'র অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনেক অফিস ক্লাব অভিনয়ের দিক দিয়া বিশেষ অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। বাটানগর স্পোর্টস ক্লাবের 'মৌচোর' নাটকের অভিনয় অবিস্মরণীয়। স্টীল কণ্ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'শেষ প্রশ্নে'র অভিনয়ও সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। অফিসারস্ ক্লাবের 'গোরা' নাট্যাভিনয় তৃতীয় গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

রূপান্তরী নাট্যগোষ্ঠীর রাজমিস্ত্রীর জীবন অবলম্বনে রচিত জোছন দস্তিদারের 'কর্ণিক' নাটকের মঞ্চসজ্জায় নির্মাণবাদী (Constructivist) মঞ্চের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। চলাচল নাট্যসংস্থার 'ঠগ' সংবাদপত্রের মিথ্যাচার অবলম্বনে রচিত ব্যঙ্গমূলক নাটক। নব দরবারী সংস্থায় প্রযোজিত নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেহাগ' নাটকে একজন সঙ্গীত-সাধিকা নারীর করুণ ট্র্যাজেডি দেখানো হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মন কষাকষি ও বিবাহবিচ্ছেদ এই দুইটি বিষয় অবলম্বনে রচিত 'জীবনরঙ্গ' নাটক নটলীলা কর্তৃক সু-অভিনীত হইয়াছে। আণবিক বোমার আক্রমণে কি বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে তাহা দেখানো হইয়াছে পিপলস থিয়েটারের 'কোনোদিন যদি' নাটকে। ঐ নাটকের মঞ্চসজ্জায় যে সব যান্ত্রিক কলাকৌশল দেখানো হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব।

গত কয়েক বছরের নাট্য আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলন জীবনের বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতার পথ সন্ধান করিতেছে। শুধু কারখানার ধর্মঘট ও মালিক-শ্রমিকের বিরোধ নহে, সামগ্রিক জীবনের নানা দ্বন্দ্ব ও সমস্যাই বর্তমান নাটকে রূপায়িত হইতেছে।

চীনের আক্রমণের ফলে যে সব দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্ভব হইল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সেই আক্রমণের জন্যই বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে অনিবার্য দ্বিধা, সংশয় ও বিরোধ দেখা দিল। আজ সমগ্র বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজিবাদের সহিত সাম্যবাদের যতখানি বিরোধ ঠিক ততখানি বিরোধই দেখা গিয়াছে রাশিয়ার সহ-অবস্থান নীতি ও চীনের আগ্রাসী নীতির মধ্যে। বিশ্ব-সাম্যবাদী শক্তির এই পারস্পরিক বিরোধ ভারতের সাম্যবাদী দলের উপরেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সেজন্য সাম্যবাদী দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ ধনতন্ত্রী শক্তির বিরুদ্ধে তাহার প্রতিরোধ-সংগ্রাম খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সাম্যবাদের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সঙ্কটের ফলে সাম্যবাদী নাট্যকারগণও আজ নাটকের লক্ষ্যবস্তু খুঁজিয়া পাইতেছেন না। স্বাভাবিক কারণেই আজ তাঁহাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা দেখা গিয়াছে। বামপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে নাটক ও শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়াও মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উগ্র প্রচারধর্মী—শিল্পের প্রয়োজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের উগ্র রাজনৈতিক মতবাদই তাঁহারা নাটকের মধ্যে প্রচার করিতে চাহেন। আবার কেহ কেহ রাজনৈতিক মত ও তত্ত্ব অবলম্বনে নাটক লিখিলেও উগ্র প্রচারধর্মিতা সমর্থন করেন না। যে নাট্যকার মানসিক ভাবসাম্য হারাইয়া ফেলেন, যেখানে চরিত্রচিত্রণে অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, প্রতিপক্ষকে বিদ্বেষবশত অকারণে হেয় ও ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করেন, পরিস্থিতির প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া নিজের কথাগুলি জোর করিয়া পাত্রপাত্রীর মুখে বসাইয়া দেন—তিনি যত জোরালো মতবাদই প্রচার করুন না কেন তাহা কখনো রসিক চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কয়েকজন নাট্যকারের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত কয়েক বছর তাঁহাদের বহু অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলির পুনরভিনয় হইল। তাঁহাদের নাটকগুলি এখনো দর্শকচিত্তকে কি ভাবে আলোড়িত করে তাহা সাম্প্রতিক অভিনয়গুলি হইতে বুঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি নাটকগুলির জনসম্বর্ধিত অভিনয় হইয়া গেল। ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য', 'দাদা ও দিদি', 'আলিবাবা' প্রভৃতি একদা-খ্যাত নাটকগুলির অভিনয় হইল। 'আলিবাবা'র জনপ্রিয়তা যে বিন্দুমাত্র কমে নাই তাহা এখনকার অভিনয় হইতেই বেশ বুঝা যায়।

শেকসপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কলিকাতার ন্যায় এত আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতের আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। শেকসপীয়রকে বাঙালী যে কতখানি আপনার করিয়া লইয়াছে তাহা এই উৎসবের মধ্য দিয়া আবার বুঝা গেল। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা শেকসপীয়রের নাটকের অভিনয় করিয়াছে। এই উপলক্ষে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েকদিন ধরিয়া শেকসপীয়রের সাহিত্য আলোচনা এবং নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বহু স্কুল-কলেজ শেকসপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছিল। শেকসপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা ও বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাও শেকসপীয়র উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে যে সব অভিনয় হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য লিটল্ থিয়েটারের অভিনয়গুলি। লিটল্ থিয়েটার 'ওথেলো' (ইংরাজী ও বাংলা), 'জুলিয়াস সিজার' (নব পরিকল্পনায়), 'রোমিও জুলিয়েট' ও 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। উদয়াচলের 'হ্যামলেট', থিয়েটার ইউনিটের 'জুলিয়াস সিজার', শ্রীমঞ্চের 'কোরিওলেনাস', শৌভনিকের 'ওথেলো' প্রভৃতির অভিনয়ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ শেকসপীয়র রচিত নাটকগুলির একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করিয়াছিল।

সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি নাট্যসংস্থা পুরাতন ক্লাসিক নাটকের অভিনয় করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রূপকারের 'ব্যাপিকা বিদায়' সাম্প্রতিক কালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনয়সমূহের অন্যতম। রূপকারের পরিচালক সবিতাব্রত দত্তের গান এবং কয়েকটি টাইপ অভিনয় এই নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের বিস্মৃত নাটক 'য্যায়সা-কা ত্যায়সা' শ্রীমঞ্চ নাট্যসংস্থার অভিনয়গুণে পুনরায় নাট্যামোদী সমাজের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে। অমৃতলালের 'বাবু' চতুরঙ্গ নাট্যসম্প্রদায় পুনরায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করিয়া দর্শকদিগকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছেন। চলাচলের অভিনীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হঠাৎ নবাব'ও কৌতুকরসে দর্শকচিত্তকে আমোদিত করিতে সফল হইয়াছে। উপরিউক্ত নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও কৌতুকরসের প্রতি আধুনিক দর্শকের আগ্রহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে।

বর্তমানে নাট্য-আন্দোলনের কতকগুলি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি নাট্যসংস্থার কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছেন। স্বভাবতই তাঁহারা তাঁহাদের রাজনৈতিক মতবাদের পরিপোষণ করে এমন নাটক নির্বাচন করেন। নাটকের পাণ্ডুলিপি এখন আর পুলিশের অনুমোদনের জন্য পেশ করার প্রয়োজন হয় না। সেজন্য নাট্যকারেরা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাটকের মধ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার যে অপব্যবহার হয় না তাহা নহে। অতি উগ্র প্রচারধর্মিতা, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদ ও নেতৃত্বসম্পর্কে ঘৃণাসূচক অশালীন মন্তব্য, অকারণে নিতান্ত অশ্লীল সংলাপের অবতারণা প্রভৃতি অনেক নাটকেই দেখা যায়। সংযম, সহিষ্ণুতা ও শালীনতার অভাব দেখিয়া অনেক স্থলেই মর্মাহত হইতে হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শ্রমশিল্পের পরিবেশে মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব অবলম্বনেই শ্রেণীসংগ্রামমূলক প্রগতিবাদী নাটকসমূহ রচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে প্রধানত নকসালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রেই শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব স্থানান্তরিত। সেজন্য বর্তমান কালে কৃষিবিপ্লব অবলম্বনে অনেকগুলি নাটক রচিত ও অভিনীত হইতেছে।

বর্তমানে বিশ্বের রাজনৈতিক আন্দোলন কয়েকটি মূল শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন আর সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না। সম মতাবলম্বী বিদেশী ব্যক্তি এখন বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দেশী লোক অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে। এই রাজনৈতিক সীমানা সম্প্রসারণের ব্যাপারটি নাটকের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। আজ সেজন্য কঙ্গো, রোডেসিয়া, কিউবা এবং আমেরিকার নিগ্রোদের সমস্যা লইয়া নাটক লেখা হইতেছে। মূল সমস্যাগুলি হয়তো নাটকের মধ্যে ঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়, কিন্তু ঐসব দেশের সমাজ ও অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি-সম্পর্কে নাট্যকারদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে নাটকীয় চরিত্রগুলি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে না।

বাস্তববাদী ও প্রচারধর্মী নাটকের বিপরীত আর এক প্রকার নাট্যধারাও বর্তমানে সমান জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই নাট্যধারা বাস্তববিমুখ, শূন্যতাবাদী, অ্যাবসার্ড জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যকার এই নাট্যধারার পরিচালক। প্রধানত দক্ষিণ কলিকাতায় শৌভনিকের মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে এই ধরনের পরীক্ষামূলক নাটক অভিনীত হয়। মৌলিক নাটকের সঙ্গে আয়োনেস্কো, বেকেট, অ্যালবি প্রভৃতি অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকারের নাটকের অনুবাদও অভিনীত হইতেছে। সুগঠিত, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত

নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের মৌলিক পার্থক্যের জন্য এই সব নাটকের পরিচালনায় অভিনয়ের নিখুঁত পারিপাট্য, আলো ও শব্দের সার্থক ব্যঞ্জনা, সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি অতিশয় প্রয়োজনীয়। বাস্তবধর্মী নাটকের প্রযোজনায় যেমন স্থূল, অতিশয়িত ও সোচ্চার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়, এই শ্রেণীর নাটকের প্রযোজনায় তেমনি সূক্ষ্ম, কল্পনাশ্রিত ও ব্যঞ্জনাধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি সুপ্রযোজিত নাট্যাভিনয় সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাইতেছে। রঙ্গসভা প্রযোজিত 'ডিরোজিও' এখনকার শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়গুলির অন্যতম। পীযূষ বসু পরিচালিত এই নাটকটিতে ডিরোজিও ও তাঁহার ছাত্রদের চরিত্রগুলি যেমন সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি সমসাময়িক যুগের চিত্রটিও অতিশয় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেরই অভিনয় অনবদ্য এবং টিম-ওয়ার্ক খুবই প্রশংসনীয়। পোশাক, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত সব কিছুই অতি উচ্চাঙ্গের। ইঙ্গিত প্রযোজিত এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'শেষ থেকে সুরু' আর একটি প্রশংসাধন্য নাটক। মাঝে মাঝে ভাবপ্রবণতার একটু আতিশয্য থাকিলেও নীলমণি ও তাহার সহকারী ভোলার হাসি-কান্নামিশ্রিত ও স্নেহ-অভিমানজড়িত প্রাণস্পর্শী অভিনয় দর্শকদিগকে মাতাইয়া রাখে। দক্ষিণ পরিষদের 'শেষ সংবাদ'ও সু-অভিনীত নাটক, তবে একটু বিলম্বিত-গতি। চলাচলের 'ধনপতি গ্রেপ্তার' নাটকের চরিত্রগুলি একটু বেশি কথা বলিয়াছে, সেজন্য নাটক দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই। চোরদের সকলের বক্তব্যই এক ধরনের। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটু একঘেয়ে লাগে। ধনপতির ভূমিকায় রবি ঘোষ ভাল অভিনয় করিয়াছেন। অনামী প্রযোজিত এবং নীলোৎপল দে পরিচালিত নাটক 'প্রতিচ্ছবি'তে একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসারের চরিত্র উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সোমনাথের ভূমিকায় নীলোৎপলের আবেগদীপ্ত অভিনয় এবং সেকেণ্ড অফিসারের ভূমিকায় নির্লিপ্ত, তীক্ষ্ণবাক্ বিশু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অভিনন্দনযোগ্য। মিতালী প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়ে'র নাট্যরূপ ত্রুটিপূর্ণ, অনেক অ-নাটকীয় ও অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ইহাতে রহিয়াছে। তবে ব্রজবিহারীর ভূমিকায় লক্ষ্মীজনার্দন চক্রবর্তী এবং নতুন মা'র ভূমিকায় সঙ্গীতা করের অভিনয় চমৎকার। গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যম্ প্রযোজিত 'অস্তরাগ' নাটকের উপস্থাপনায় সিনেমা রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। তবে ইহার সংলাপ তীক্ষ্ণ ও

ব্যঞ্জনামণ্ডিত, অভিনয়ও প্রশংসাযোগ্য। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মাস থিয়েটাসের্র 'গবর্ণমেণ্ট ইনস্পেকটর' নাটকে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর সকলের অভিনয়ই দুর্বল। প্যাভলভ ইনস্টিটিউটের 'কল্মাষপাদ' ব্যঙ্গমূলক ফ্যানটাসিয়া নাটক। বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতাবাদ, যৌনবিকৃতি, রূপসর্বস্বতা প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ নিক্ষেপ কবা হইয়াছে। বুদ্ধিমূলক আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া নাটক লেখার চেষ্টা প্রশংসনীয়। তবে অসংলগ্নভাবে নানা পার্শ্ব ঘটনা ও চবিত্র আমদানী করিয়া একটু আঁকা-বাঁকা গতিতে নাটকেব কাহিনী গাঁথা হইয়াছে। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'ছায়ায় আলোয়' নাটকে নিম্নবিত্ত জীবনেব বাস্তব সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত অভিনয় ও টিম-ওয়ার্ক চমৎকার। বাবার ভূমিকায় বিভূতি চক্রবর্তীব অভিনয় অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তবানুগ।

কৃষিবিপ্লব অবলম্বনে লেখা যে নাটকগুলিব অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'দেবীগর্জন', 'জন্মভূমি', 'ইস্তাহাব' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত ক্যালকাটা থিয়েটাবের 'দেবীগজন' নাটকে আঞ্চলিক রূপটি ভালো ফুটিয়াছে। তবে নাটকে বক্তৃতাব আতিশয্য এবং বক্তব্য সোচ্চাব। দৃশ্যগুলিব মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষিত হয় নাই। থিয়েটাব ইউনিটেব 'জন্মভূমি'তে ব্রেখটীয় বীতি অনুসবণে ঘটনাব মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা ও ভাষ্যেব সন্নিবেশ কবা হইয়াছে। নকসালবাড়ী আন্দোলনেব স্পষ্ট সমর্থন ইহাতে বহিয়াছে। জোতদার হাজী সাহেবেব ভূমিকাটি সর্বাপেক্ষা সু-অভিনীত। বি ডি ও-ব ভূমিকায় শেখব চট্টোপাধ্যায়েব অভিনয়ও ভালো হইয়াছে। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও এ্যাপোচাব ইউনিট প্রযোজিত 'ইস্তাহার' নাটকেও সমস্যা একই রকমেব। এখানেও কৃষকদেব বৈপ্লবিক সংগ্রামের চিত্র পবিস্ফুট। দলবদ্ধ অভিনয় প্রশংসনীয়।

পরবর্তী নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। নাট্য-আন্দোলন এখনও বামপন্থী আন্দোলনের দ্বাবা অনেকখানি প্রভাবান্বিত, বিশেষ করিয়া মফঃস্বল অঞ্চলে রাজনৈতিক বক্তব্য নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই জোরালোভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তবে বামপন্থী শিবিরে নানা বিভেদের ফলে রাজনৈতিক বক্তব্য কোন বিশেষ দলীয় তাত্ত্বিক মতবাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয় না। শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সব নাটকেরই বক্তব্য অতিশয় সোচ্চার। সেই বক্তব্য সূক্ষ্ম মননশীল ব্যাখ্যা অপেক্ষা বহুশ্রুত কয়েকটি তরল আবেগসর্বস্ব উক্তির মধ্যে ব্যক্ত। সমাজের কতকগুলি সমস্যা বার বার

আমরা বিভিন্ন নাটকে দেখিতে পাইয়াছি। বেকার-সমস্যা, অভাব-অনটন, হতাশা-অবক্ষয়, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অনাস্থা সব নাটকেই দেখা যায়। যাহারা প্রতিবাদে মুখর তাহারা নিরুদ্যম ও নিষ্ক্রিয়, নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন, কর্তব্য সম্পর্কে বেপরোয়া। সমাজকে গালাগালি দিয়া অনেক সময় তাহারা নিজেদের অসামাজিক কাজকর্মগুলির মধ্য দিয়া যেন বাহবা আদায় করিতে চাহে। সামাজিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। স্নেহ-প্রীতি দরদ-সহানুভূতির মূল্য এখন উপেক্ষিত। ব্যক্তিসম্পর্কের উপরে শ্রেণীচেতনা আজ প্রাধান্য পাইতেছে। শ্রেণীমুক্তির লক্ষ্যই বড় হইয়া উঠিতেছে। উপায় সম্পর্কে কেহ আর তেমন ভ্রূক্ষেপ করে না। হিংসা-বিদ্বেষ-হত্যা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে সেজন্য অনেকেরই আর কোনো দ্বিধা নাই।

জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে পরাজয়, ধনী ও নির্ধনের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, বৈষয়িক জীবনে ব্যর্থতা এবং ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নির্ভরতার অভাব প্রভৃতির ফলে সমাজের যুবক শ্রেণী আজ বিভ্রান্ত, কেন্দ্রচ্যুত ও সর্ববিষয়ে আস্থাহীন। সেজন্য তাহারা যেন ক্রমে ক্রমে নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম, সংশয়ী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হইয়া পড়িতেছে। সাম্প্রতিক কালের অনেক নাটকে সমাজের এই ক্লান্ত, অবসন্ন, বিচ্ছিন্ন ও বিবর্ণরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবাদ আসিয়াছে অতি-প্রাচুর্যের ফলে আর আমাদের দেশে আসিয়াছে অপ্রাচুর্য ও অসাফল্যের পরিণাম হিসাবে। উন্নয়নকামী সমাজের পক্ষে এই মানসিকতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আজিকার মানুষ কিছুতেই যেন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাইতেছে না। পুরাতন ভিত্তি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং নূতন ভিত্তিও সে সন্ধান করিয়া পাইতেছে না। চারিদিকের চলার মধ্যে সে যেন স্থাণু, কর্মপ্রবাহের মধ্যে সে নিষ্কর্মা, পরিণামমুখী ঘটনার মধ্যে সে অপরিণামের আবর্তে ঘূর্ণ্যমান। সাম্প্রতিক কালের অনেক নাটকে এই সামাজিক মানসিকতা প্রতিফলিত।

এখনকার নাটকে পারিবারিক জীবনের কাহিনী প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্য-বোধ সম্পর্কে বর্তমান মানুষের উদাসীনতার ফলেই পারিবারিক নাটকের কদর কমিয়া আসিতেছে। মানুষের বহির্জীবন ও শ্রেণীগত জীবন অবলম্বনেই এখন অধিকাংশ নাটক লিখিত হইতেছে। যে-সব নাটকে ব্যক্তিজীবনের কাহিনী

উপস্থাপিত হইতেছে সে-সব স্থানে চরিত্রের বিশ্লিষ্ট সত্তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতাই প্রধান হইয়া উঠে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার উপরে বাহিরের নানা ঘটনার প্রতিফলন এবং ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়াই নাটকের মধ্যে দেখান হইতেছে।

বর্তমান সহিষ্ণু ও নির্বিকার সমাজের অবাধ প্রশ্রয়ের সুযোগ লইয়া বহু নাট্যকার ও পরিচালক যৌন ও অশ্লীল ব্যাপারে বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে নামিয়া বহু প্রয়োগকর্তা দুঃসাহসিক সব দৃশ্য উপস্থাপনা করিতেছেন। ক্যাবারে নাচ ত অনেক নাট্যাভিনয়ের মূল আকর্ষণ হইয়া উঠিতেছে। দর্শকদের যৌনকামনায় সুড়সুড়ি দিয়া ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করাই এই সব নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য।

বাস্তবধর্মী উপস্থাপনারীতি আজকাল আর জনপ্রিয় নহে। সহজ বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার দিকে নাট্য পরিচালকদের আগ্রহ নাই। রূপক ও সাঙ্কেতিক রীতির মধ্য দিয়া গূঢ়, ব্যঞ্জনাধর্মী উপস্থাপনার দিকেই এখনকার প্রয়োগকর্তাদের ঝোঁক বেশি। ব্রেখটীয় রীতির প্রভাবই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রধান। সেজন্য মূকাভিনয়, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার, কোরাস, ছড়া ও গানের প্রয়োগ। মাঝে মাঝে ভাষ্যকারের দীর্ঘ বক্তৃতাও লক্ষ্য করা যায়। বহু নাটকে একজন জাদুকর অথবা বাজিকরকে আনিয়া সমগ্র নাটকের ঘটনা তাহারই নির্দেশে যেন পরিচালিত হইতেছে এরূপ দেখান হয়। একটি বাস্তব ঘটনার অন্তর্গত আর একটি নাট্য ঘটনা উপস্থাপিত করিয়া দুইটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। আজকাল সরলরেখায় পরপর ঘটনার বিবর্তন খুব কম নাটকেই দেখান হয়। কখনো পশ্চাৎপ্রসারী দৃষ্টিতে অতীত ঘটনাদর্শন, কখনো বা মানসিক চিন্তার দৃশ্যরূপ উপস্থাপনা ইত্যাদি দেখান হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে, ঘটনা সম্পর্কে মানসিক ভাবনার রূপায়ণই যেন বর্তমান নাটকে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। মুখের ভাষা এখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ ও অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। মুখের ভাষার পরিবর্তে এখন আসিতেছে আলোর ভাষা, ধ্বনির ভাষা ইত্যাদি।

ব্রেখটীয় রীতি প্রয়োগে নান্দীকারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থার সাম্প্রতিক অভিনয়গুলি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। চেতনা প্রযোজিত নাট্যাভিনয়গুলিও মোটামুটি ব্রেখটীয় রীতি অনুসরণ করিয়াছে। 'ভালো মানুষের পালা' তেমন মঞ্চসাফল্য অর্জন করে নাই, কিন্তু 'মারীচ সংবাদ'

তাহাদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় নাটক। বক্তব্যে কোন নূতনত্ব নাই, কিন্তু উপস্থাপনা কৌশল চমকপ্রদ। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙ্গা মধু' প্রত্যক্ষ বাস্তবরীতিতে উপস্থাপিত। প্রত্যেকের প্রাণবন্ত অভিনয় এবং জৈব ও মানবিক প্রবৃত্তিলীলার বাস্তব উপস্থাপনায় নাটকটির আবেদন অত্যন্ত জোরালো। বহুরূপী প্রযোজিত 'পাগলা ঘোড়া'য় শ্মশানে একটি মেয়ে পোড়াইতে আসিয়া চার ব্যক্তি চারটি প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। মৃত মেয়েটির আত্মা যেন প্রেমের গল্প শুনিবার জন্য অতিব্যগ্র। সুপ্রযোজিত নাটকটির অভিনয় এবং আলো ও শব্দের ব্যবহার খুবই প্রশংসনীয়। বহুরূপীর 'অপরাজিতা' এক সংলাপী পূর্ণাঙ্গ নাটক। একটি মেয়ে স্বাধীনভাবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় নানা প্রতিকূল শক্তির আক্রমণে কিরূপ ক্ষতবিক্ষত হইল তৃপ্তি মিত্রের সু-অভিনয়ে তাহা সজীব রূপ লাভ করিয়াছে। নকসাল আন্দোলন অবলম্বনে লেখা 'সুতরাং' নাটকেও বহুরূপীর প্রযোজনা-নৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে। কুমার রায়ের মঞ্চ পরিকল্পনা চমকপ্রদ। আলো ও নেপথ্যে কণ্ঠ সঙ্গীতের ব্যবহার নাটকের ভাব পরিস্ফুটনে সার্থক। থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত 'রাজরক্ত' নাটকে আলো, ধ্বনি, কম্পোজিশন ও টিমওয়ার্ক বিশেষ চমৎকারিত্বপূর্ণ। দুইটি চরিত্রের মাথায় নানা রঙের আলো জ্বলা আর নেভা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অ্যাবসার্ড প্রয়োগ-রীতি অনুসরণে একই চরিত্র বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। 'চতুরঙ্গ' প্রযোজিত 'সবিনয় নিবেদনে'ও দুইটি চাকর চরিত্রের সমগ্র নাট্যঘটনা উপস্থাপিত। বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, শুধু অর্থহীন কথার রাশি। নকসাল আন্দোলন অবলম্বনে রচিত আর একটি সাড়া জাগান নাটক নটনাট্যম প্রযোজিত জগমোহন মজুমদারের 'ভুলছি না ভুলব না' নাটক। হিংসার দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না—নাট্যকার দুর্লভ সৎসাহসের সঙ্গে এই বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বদেশ বসু পরিচালিত 'অপমানিত' নাটকের অভিনয়ে বাউড়ি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও জয় নাট্য পরিণতিতে দেখান হইয়াছে। সু-অভিনীত নাটক, তবে শেষের দিকে অতিনাটকীয়তার আতিশয্য রহিয়াছে। অভিযাত্রিক নাট্যসংস্থা প্রযোজিত 'অবৈধ' নাটকটি মনস্তত্ত্বমূলক। ফ্ল্যাসব্যাক দৃশ্যটি সিনেমা রীতিতে উপস্থাপিত এবং অতিশয় চমকপ্রদ। বর্তমানে অপরাধমূলক সম্ভবত সিনেমার প্রভাবেই বেশ জনপ্রিয়। যাযাবর সংস্থা প্রযোজিত 'মতিবিবি' নাটকেও অনেক রহস্য ও আরো অনেক খুন রহিয়াছে। চিন্তার বস্তু বিশেষ কিছু নাই তবে নাটকের দুরন্ত গতি দর্শকদিগকে উত্তেজিত করিয়া রাখে। অন্বেষক প্রযোজিত 'বিদ্রোহ, ১৭৯২'

নাটকটি বাখরগঞ্জের কৃষকবিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত। এ-নাটকের টিমওয়ার্ক অপূর্ব, আলোর কাজ তুলনাহীন। একতারা শিল্পীচক্রের 'কোলকাতা থেকে দূরে' সঙ্গীত-সমৃদ্ধ সুপ্রযোজিত নাট্যাভিনয়।

পেশাদার নাট্যশালা

অপেশাদার নাট্যাভিনয় বর্তমানে এত বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, পেশাদার নাট্যশালার অভিনয় যেন বর্তমানে খানিকটা গৌণ হইয়া গিয়াছে। এ-কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে নব নাট্য-আন্দোলন দেশের মধ্যে নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সাধারণ পেশাদার নাট্যশালাগুলিও বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালে পেশাদার নাট্যশালাগুলির যে শোচনীয় অবস্থা দেখা গিয়াছিল, সুখের বিষয় আজ আর তাহা নাই। আজ চিত্রগৃহগুলির মত স্থায়ী নাট্যশালা-গুলিও রসিক দর্শকদের দ্বারা নিয়মিতভাবে পৃষ্ঠপোষিত হইতেছে। অপেশাদার নাট্য-আন্দোলন সাধারণ দর্শকের মধ্যে নাট্য-রসাস্বাদের ইচ্ছা এমনভাবে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে যে, নিয়মিতভাবে নাটক না দেখিয়া আর তাঁহারা পারেন না। সেজন্য সাধারণ নাট্যশালাগুলিতে এখন আর উৎসাহী দর্শকের অভাব হয় না।

পেশাদার নাট্যশালায় অভিনীত নাটকের বিষয়বস্তু ও মঞ্চ আঙ্গিকের মধ্যে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অপেশাদার নাট্যাভিনয়ে যে বিপ্লবাত্মক সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আজ পেশাদার মঞ্চের নাটকের মধ্যেও বহু স্থানে পরিস্ফুট। শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমানে'র মত বাস্তবধর্মী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশ্বরূপায় অভিনীত 'ক্ষুধা', মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'এরাও মানুষ', রঙমহলে অভিনীত 'এক মুঠো আকাশ' প্রভৃতি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দ্বিধা ও সংস্কার দূর করিয়া দিয়াছে। লিটল্ থিয়েটার বর্তমানে পেশাদার নাট্যশালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ায় এবং বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সকল প্রকার অপেশাদার অভিনয়ের সুযোগ উন্মুক্ত হইবার ফলে, নাটকের বিষয় নির্বাচনে পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যমঞ্চের পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মঞ্চ-আঙ্গিক প্রয়োগের দিক দিয়াও পেশাদার-নাট্যশালাগুলি অপেশাদার নাট্যসংস্থার কাছে অনেকাংশে ঋণী। আলোক সম্পাতের এত যে চোখ ঝলসানো চাতুর্য বর্তমানে পেশাদার অভিনয়ে দেখা

যাইতেছে, ইহার উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেশাদার অভিনয়েই প্রথম দেখা গিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে উচ্চ শব্দবহ যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রের প্রয়োগও অপেশাদার অভিনয় হইতে পেশাদার নাট্যশালাসমূহ গ্রহণ করিয়াছে। অভিনয়ের সাবলীলতা, দ্রুত গতিশীলতা ও দলগত নৈপুণ্যবিধানের দিক দিয়াও অপেশাদার অভিনয়ের প্রভাব কম নহে। অবশ্য পেশাদার নাট্যশালাগুলি যখন কোন নাটক মঞ্চস্থ করেন তখন প্রচুর অর্থব্যয় করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন না। সেজন্য দৃশ্যসজ্জার জাঁকজমক, পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, আলোক ও আবহসংগীতের প্রাচুর্য এবং সুবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমাবেশ ঘটাইয়া তাঁহারা মঞ্চের অভিনয়কে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন। এই জৌলুস ও জাঁকজমক অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর নাই, কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও নূতন পথে পাদচারণার সাহস তাঁহারাই যে দেখান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

পেশাদার নাট্যশালায় আজ যে নূতন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু নাট্যশালাগুলিতে শিল্পীদের যে উদ্বেগ, অস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে অভিনয় করিতে হয় তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য শিল্পীদের যে নিয়মভ্রষ্টতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলিও নিন্দনীয়। শিল্পীদের অধিকারবোধ ও সংঘশক্তি যেমন জাগ্রত হওয়া উচিত, তেমনি তাঁহাদের নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতিও শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে আজকাল এক একখানা নাটক একাদিক্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। এই রকম সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একই নাটক অভিনীত হইবার ফলে দর্শকরাও যেমন নূতন নূতন নাটকের অভিনয়ের রস হইতে বঞ্চিত হয়, শিল্পীরাও তেমনি বিচিত্র ধরনের অভিনয়দক্ষতা দেখাইবার কোনই সুযোগ পান না। পেশাদার মঞ্চসমূহের কর্তৃপক্ষ যদি অন্তত সপ্তাহের মধ্যভাগেও এক একখানা নূতন নাটক মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ করেন, তবে দর্শক ও শিল্পী উভয় সম্প্রদায়ই কিছু বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করিতে পারেন।

পেশাদার নাট্যশালাগুলির মধ্যে নানা প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নাট্যামোদী সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন বিশ্বরূপা। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতনে'র অভিনয়ের মধ্য দিয়াই ইহারা প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' বর্তমান কালের নাট্য-শালার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা জনসম্বর্ধিত নাটক। 'সেতু'র অভিনয়ে জীবনরস অপেক্ষা মঞ্চআঙ্গিকই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'লগ্ন' নাটকে পরিচালক

রাসবিহারী সরকার থিয়েটারস্কোপ মঞ্চরূপের প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু ঐ নাটকে অসঙ্গতভাবে যান্ত্রিকতার আতিশয্য প্রবেশ করিয়াছে। সমগ্র নাটকের সংলাপ উচ্চ শব্দবহ যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের পক্ষে ইহা খুবই আপত্তিকর। 'হাসি' নাটকে পুরাতন ঘূর্ণায়মান মঞ্চরীতি পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বনফুলের 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'জাগো' নাটকের পর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘের উপর প্রাসাদ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ঘর' অভিনীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে গ্রামীণ মাধুর্য রসাশ্রিত 'কোথায় পাবো তারে', ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত 'বেগম মেরী বিশ্বাস,' সামন্ততান্ত্রিক কলুষিত সমাজ অবলম্বনে রচিত 'আসামী হাজির' অভিনীত হইয়াছে। বর্তমানে চলিতেছে 'পরস্ত্রী'।

পেশাদার নাট্যশালাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য প্রেক্ষাগৃহ ও মনোরম মঞ্চের অধিকারী হইল ষ্টার। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমাবেশও এই রঙ্গমঞ্চে সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতীয় জীবনাদর্শ ও সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি একটি অবিচল শ্রদ্ধাশীলতার ভাবই এই মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে দেখা যায়। 'শ্যামলী', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত', 'রাজলক্ষ্মী', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রেয়সী', 'তাপসী', 'একক-দশক-শতক', 'শর্মিলা', 'দাবী' প্রভৃতি নাট্যাভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত বিদ্রোহী নাটকের পর বর্তমানে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' চলিতেছে।

নৃত্যগীতপ্রধান, রোমাঞ্চকর ও অপরাধমূলক নাটকের অভিনয়ের দিকেই রঙমহলের প্রবণতা অধিক। অবশ্য মনোজ বসুর 'শেষলগ্ন' এবং বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলামে'র মত সাহিত্যরসাশ্রিত নাটকের অভিনয়ও এখানে হইয়াছে। 'উল্কা'র অভিনয়সাফল্য দেখিয়াই সম্ভবত বিশেষ ধরনের নাটকের দিকে এই নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের আগ্রহ দেখা গিয়াছে। বর্তমানে এই রঙ্গমঞ্চ শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শিল্পীদের এই প্রয়াস বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। 'চক্র', 'অনর্থ', 'স্বীকৃতি' প্রভৃতি এবং 'কথা কও,' 'নামবিভ্রাট,' 'সেমসাইড', 'আমি মন্ত্রী হব', 'স্বর্ণ গোলক' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। এই মঞ্চের অভিনয়ে কৌতুকরসের প্রতি একটু বেশী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নাট্যশালার ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হইল নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব। ১৮৭২ সালে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একশত বর্ষ পরে নাট্যশালার শতবার্ষিকী উৎসব

অনুষ্ঠিত হইল। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁহারই আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে শতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নাট্যজগৎ ও মঞ্চজগতের সঙ্গে যুক্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সভ্য হইলেন। আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও গোলমালের ফলে কমিটি যেরূপ আড়ম্বরের সঙ্গে শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সম্ভব হইল না। তবুও কমিটির কয়েকজন উৎসাহী সভ্য, যথা, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, অজিতকুমার ঘোষ, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, ইন্দ্রজিৎ সেন, সুনীল দত্ত, দীপ্তিকুমার শীল প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টায় অনাড়ম্বরভাবে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। ৭ই ডিসেম্বর ঘড়িওয়ালা মল্লিক বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং 'নীলদর্পণ' নাটকটি মঞ্চস্থ হইল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে জানুয়ারী হইতে পনেরো দিন ব্যাপী একটি নাট্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। প্রত্যেক দিন একটি করিয়া নাটক অভিনীত হইল এবং অভিনয়ের পূর্বে নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষের সম্পাদনায় 'শতবর্ষে নাট্যশালা' নামে একটি রঙ্গমঞ্চ-বিষয়ক সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পঞ্জী

(ক) সাধারণ

১। Aristotle's Poetics—Tr. by Bouchier

[নাট্যশাস্ত্রীদেব গুরু আজও পর্যন্ত নাট্যবিচারের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক]

২। The Theory of Drama by A. Nicoll

[নাট্যসমালোচনার অদ্বিতীয় গ্রন্থ। নাটকের সমস্ত দিক ইহাতে আলোচিত]

৩। Dramatic Art and Literature by Schlegel

[জার্মান সমালোচকের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আলোচনা আছে]

৪। European Theories of Drama by Barret A. Clark

[আরিষ্টোটল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাট্য-সমালোচনাব ইতিহাস]

৫। Tragedy by W. M. Dixon

[ট্র্যাজেডির বিভিন্ন দিকে দার্শনিকতাপূর্ণ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি]

৬। Tragedy by A. H. Thorndike

[ইংরাজী ট্র্যাজেডির ধাবাবাহিক ইতিহাস]

৭। Dramatic Essays by Dryden

[নাটকসম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-সমালোচকের তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণ্য প্রবন্ধসমষ্টি]

৮। An Introduction to the Study of Literature by Hudson

[সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সরল ও মনোরম আলোচনা]

৯। An Essay on the Idea of Comedy by Meredith

[সংক্ষিপ্ত হইলেও সরল আলোচনা]

১০। Principles of Criticism by Worsfold

[সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধসহ নাটক সম্বন্ধে একটি উপাদেয় নিবন্ধ]

১১। Shakespearean Tragedy by Bradley

[শেক্‌সপীয়রের প্রধান চারখানি বিয়োগান্ত নাটক অবলম্বন করিয়া ট্র্যাজেডির অতি গভীর ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ]

১২। Shakespeare as a Dramatic Artist by R. G. Moulton
[শেক্‌সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকের অতি সূক্ষ্ম টেকনিকের অবতারণা ও বিশ্লেষণ]

১৩। World Drama by A. Nicoll
[বিশ্বের নাট্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। নাট্যসমালোচনার মহাভারত]

১৪। Theatre and Stage edited by Harold Downs
[নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের কোষগ্রন্থ]

১৫। The Playwright by O. Greenwood
[মঞ্চের আঙ্গিক, প্রয়োগরীতি ও ঐতিহ্যধারা]

১৬। The Theatre by Sheldon Cheney
[বিশ্বের নাট্যশালার বিস্তৃত ইতিহাস]

১৭। An Introduction to Playwriting by Samuel Selden

১৮। Tragedy by F. L. Lucas
[ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্ম ও সারগর্ভ আলোচনা]

১৯। British Drama by A. Nicoll
[ইংরাজী নাটকের প্রামাণ্য ইতিহাস]

২০। The Tragic Drama of the Greeks by A. E. Haigh
[গ্রীক ট্র্যাজেডির সব দিক লইয়া সুনিপুণ বিশ্লেষণ]

২১। Comedy by L. T. Pottes

২২। Specimens of English Dramatic Criticism by A. C. Ward
[প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় ও অভিনয়-প্রথা সম্বন্ধে মূল্যবান নিবন্ধ-সংকলন]

২৩। Discovering Drama by Elizabeth Drew
[নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিচার ও ব্যাখ্যা]

২৪। On Poetry in Drama by Harley Granville Barker
[নাটকে কাব্যের স্থান লইয়া আলোচনা]

২৫। The Art of Drama by Ronald Peacock
[প্রতিকৃতি ও নাট্যকলা সম্বন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণ]

২৬। Tragic Relief by P. K. Guha
[ট্র্যাজেডির আনন্দ-তত্ত্ব লইয়া চিত্তাকর্ষক আলোচনা]

২৭। The Theatre and Dramatic Theory by A. Nicoll
[নাটক ও মঞ্চের সম্পর্ক এবং ট্র্যাজেডি ও কমেডির লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ লইয়া আলোচনা]

২৮। Form and Meaning in Drama by H. D. F. Kitto
[প্রধানত কয়েকটি গ্রীক নাটক লইয়া নাটকের রূপ ও রীতির বিচার]

২৯। The Harvest of Tragedy by T. R. Henn
[ট্র্যাজেডিতত্ত্ব ও বিভিন্ন প্রকার ট্র্যাজেডির আলোচনা]

৩০। The Frontiers of Drama by Una Ellis-Fermor
[বিচিত্র ধরনের নাট্য আলোচনার কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন]

৩১। The Elements of Drama by J. L. Styan
[বিভিন্ন ধরনের নাটক অবলম্বনে নাটকের নানা উপাদান বিশ্লেষণ]

৩২। Play Making by William Archer
[নাটক লেখার মূল সূত্র লইয়া সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ]

৩৩। Theory and Technique of Playwriting by John Howard Lawson
[বিভিন্ন যুগের নাট্যধারা ও নাটকের গঠনরীতি লইয়া আলোচনা]

৩৪। The Death of Tragedy by George Steinor
[আধুনিক কালের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা]

৩৫। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৩৬। নাটকের কথা—অজিতকুমার ঘোষ

৩৭। নাট্যতত্ত্ব পরিচয়—অজিতকুমার ঘোষ

৩৮। Sanskrit Drama by Keith
[সংস্কৃত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ]

৩৯। Encyclopaedia Britannica

৪০। নাট্যশাস্ত্র—ভরত।

৪১। অভিনয়দর্পণ—অশোক শাস্ত্রী অনূদিত।

৪২। বিশ্বকোষ।

৪৩। Bengali Literature in the Nineteenth Century by Dr. S. K. De
[১৮০০-১৮২৫—এই ২৫ বৎসরের কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচয়িতাদের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস]

৪৪। Western Influence in Bengali Literature by P. R. Sen
[উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব লইয়া আলোচনা]

৪৫ The Bengali Theatre by S. P. Mookerjee
[রঙ্গশালার ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা]

৪৬। The Indian Stage by Hemendranath Dasgupta (Vols. I-IV)
[হিন্দু রাজত্ব হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস]

৪৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[পুরাতন সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিয়া সাবধানতার সহিত লিখিত]

৪৮। নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা—বিভাস রায় চৌধুরী
[বাংলা ভাষায় নাটকের রীতি ও রস লইয়া মনোজ্ঞ আলোচনা]

৪৯। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন
[বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আদি ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস]

৫০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
[উনবিংশ শতাব্দীর সমুদয় বিখ্যাত ও বিস্মৃত সাহিত্যিকদের রচনাবলী সম্বন্ধে অশেষ তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য ইতিহাস]

৫১। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
[নির্ভুল সন-তারিখসহ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর বিবরণ]

৫২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
[উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ]

৫৩ সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু
[নানা সংবাদসমৃদ্ধ সুরসাল পুস্তিকা]

৫৪ The Bengali Drama by Dr. P. C. Guha Thakurta
[বাংলা নাটকের সর্বপ্রথম ইতিহাস]

৫৫ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
[নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সারগর্ভ বিচার এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ]

৫৬। শতবর্ষে নাট্যশালা—আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত

(খ) মাইকেল মধুসূদন

৫৭। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
[মধুসূদনের জীবনী ও সাহিত্যালোচনাসহ সমসামযিক বহু বৃত্তান্তে সমৃদ্ধ অতুলনীয় গ্রন্থ]

৫৮। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম
[বহু তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী-গ্রন্থ]

৫৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মধুসূদনের গ্রন্থাবলী

৬০। হরফ প্রকাশিত মধুসূদন রচনাবলী

(গ) দীনবন্ধু মিত্র

৬১। দীনবন্ধু জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[দীনবন্ধু-সমালোচনার পথ-প্রদর্শক]

৬২। দীনবন্ধু মিত্র—ড সুশীলকুমার দে
[দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সরস ও মৌলিক আলোচনা]

৬৩। হরফ প্রকাশিত দীনবন্ধু রচনাবলী

(ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখে তাঁহার জীবনের স্মৃতিকথা বর্ণিত হইয়াছে]

৬৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা

(ঙ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৬। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায
[গিরিশচন্দ্র রচিত নাট্য আলোচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ]

৬৭। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন
[গিরিশচন্দ্রের সহিত কুমুদবাবুর কথোপকথনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নীতি ও মত ব্যক্ত হইয়াছে]

৬৮। গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন

৬৯। গিরিশ-প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
[গিরিশ-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা]

৭০। গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—অমরেন্দ্রনাথ রায়

৭১। গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু

৭২। আমার কথা—বিনোদিনী দাসী
৭৩। অর্ধেন্দুশেখর—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৭৪। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

(চ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৭৫। দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী
[দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবকুমারের দ্বারা তাঁহার জীবনচরিত ও সাহিত্যপ্রতিভা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে]
৭৬। দ্বিজেন্দ্রলাল—নবকৃষ্ণ ঘোষ
৭৭। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন
৭৮। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়
[সরস কথোপকথনের ভাষায় রচিত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ আলেখ্য]
৭৯। দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়
৮০। হরফ প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

(ছ) রবীন্দ্রনাথ

৮১। Rabindranath : Poet and Dramatist by Edward Thompson
[টমসন সাহেব প্রকৃত নাটকত্বের দিক দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নাটকের অতি সার্থক সমালোচনা করিয়াছেন]
৮২। রবি-রশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
[রবীন্দ্রনাথের স্বীয় বক্তব্য এবং বহু প্রবন্ধ ও পত্র উদ্ধার করিয়া কবির অন্যতম অন্তরঙ্গ সমালোচক বিশেষ সারগর্ভ সমালোচনা করিয়াছেন]
৮৩। রবীন্দ্রজীবনী (১ম ও ২য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
[কবির একমাত্র প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত]
৮৪। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
[রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণ]
৮৫। রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত
[রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন ধারা আলোচিত হইয়াছে]
৮৬। কাব্য-পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী
[রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার পথপ্রদর্শক]

৮৭। রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ (১ম ও ২য় খণ্ড)—প্রমথনাথ বিশী
[রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ]
৮৮। রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় পর্ব)—অশোক সেন
[সাঙ্কেতিকতা ও সাঙ্কেতিক নাটক লইয়া বিচার]
৮৯। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
[রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের আলোচনা]
৯০। রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
৯১। রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[রবীন্দ্রনাথেব গ্রন্থাবলীব নির্ভুল সন ও তারিখ ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে]
৯২। Symbolist Movement in Literature by A. Symons
[সাঙ্কেতিকতা ও সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ]
৯৩। Ideas of Good and Evil by W. B. Yeats
[রূপক ও সাঙ্কেতিকতা লইয়া সারগর্ভ বিচার]
৯৪। The Treasure of the Humble by Maeterlink

(জ) সাম্প্রতিক যুগ

৯৫। Modern Drama by J. W. Marriott
[আধুনিক নাটকের গতি ও প্রবণতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোচনা]
৯৬। Tendencies of Modern English Drama by A. E. Morgan
[বর্তমান ইংবাজী নাট্যকারদেব সমালোচনা]
৯৭। Twentieth Centu y Literature by A. C. Ward
[বর্তমান কালেব বিভিন্ন সাহিত্য-ধারার বিশ্লেষণ]
৯৮। The Twentieth Century Drama by Lynton Hudson
[আধুনিক ইংরাজী নাট্যধাবা ও কয়েকখানি নাটকের নির্বাচিত অংশ-সংকলন]
৯৯। Drama since 1939 by Robert Speaight
[যুদ্ধকালীন নাটকেব আলোচনা]
১০০। The Theatre of the Absured by Martin Esslin
১০১। Absured Drama—Martin Esslin
১০২। Brecht—Martin Esslin
১০৩। The Modern American Theater Ed. by Kernan

(ঝ) পরিশিষ্ট

১০৪। The English Theatre by A. Nicoll

[লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য-সমালোচক আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ইংরাজী-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন]

১০৫। Form and Idea of Modern Theatre by Gassner

১০৬। My Life in Art by Konstantin Stanislavsky

[মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চশিল্পীর আত্মকথা]

১০৭। Theatre Arts Anthology Ed. by R. Gilder and Others

১০৮। অভিনয়-শিক্ষা—ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বহু চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থখানিতে অভিনয়, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত হইয়াছে]

১০৯। মঞ্চে ও নেপথ্যে—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মহেন্দ্রবাবু যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাই বইখানিতে ব্যক্ত হইয়াছে]

১১০। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র রঙ্গালয়, অভিনেতা ও অনেক প্রসিদ্ধ নাটক সম্বন্ধে সরস আলোচনা করিয়াছেন]

১১১। নাট্যমন্দির (তিন খণ্ড)

[রঙ্গালয়, অভিনয়, অভিনেতা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন]

১১২। বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

[রঙ্গালয়ের অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক, সমালোচক প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা সরস আলোচনা]

১১৩। রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে ঘটিত বহু রসাল ও হাস্যজনক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে]

নির্দেশিকা

(ক) সাধারণ

(খ) বাংলা নাটক ও নাট্যকার